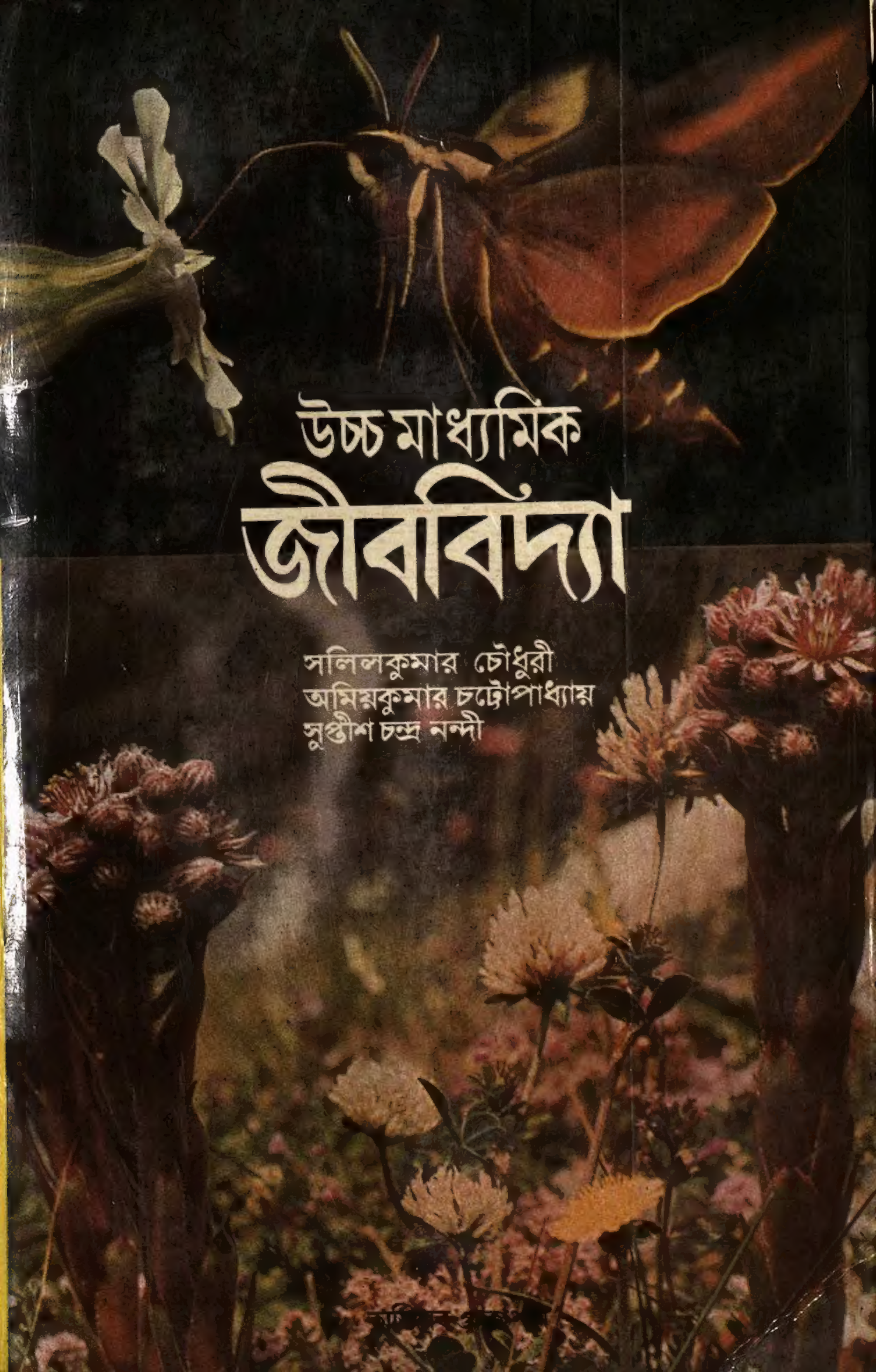
উচ্চ মাধ্যমিক
জীববিদ্যা
সলিলকুমার চৌধুরী
অমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
সুপ্তীশ চন্দ্র নন্দী

Written according to the New Syllabus (Session 1985-1986) framed by the West Bengal Council of Higher Secondary Education for Class XI.

উচ্চ মাধ্যমিক জীববিদ্যা

[প্রথম খণ্ড — প্রথম পত্র]

[একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক সলিলকুমার চৌধুরী, এম্. এস্-সি.
বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, আনন্দমোহন কলেজ, কলিকাতা ;
শিক্ষক (আংশিক সময়) জগদ্বন্ধু ইন্‌স্টিটিউশান, কলিকাতা ;
'জীবন বিজ্ঞান পরিচয়', 'মাধ্যমিক ঐচ্ছিক জীববিদ্যা',
Higher Secondary Biology, উদ্ভিদ বিজ্ঞান;
Studies in Botany প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ।

অধ্যাপক অমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্. এস্-সি.
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার অফ্ জুওলজি, প্রেসিডেন্সী কলেজ,
কলিকাতা ; ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ,
ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ ; বারাসাত গভর্নমেণ্ট কলেজ ;
'মাধ্যমিক জীববিদ্যা' (নবম ও দশম শ্রেণী)
প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ।

সুধীশ চন্দ্র নন্দী, এম্. এস্-সি., বি. এড্.
কনভেনার, জীববিদ্যা বিভাগ, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, কলিকাতা ;
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ শিক্ষক-শিক্ষণ
মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা ; 'প্রাণ-বিজ্ঞান', 'মাধ্যমিক
জীবন বিজ্ঞান' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ।

সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৯

অভিনব প্রকাশন
৩০/এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক
সরস্বতী সাউ, বি. এস্-সি.
৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

© গ্রন্থকারত্রয় কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৮৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই, ১৯৮৭
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই, ১৯৮৮
সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : জুলাই, ১৯৮৯

প্রচ্ছদপট : অঞ্জন চক্রবর্তী

Acc no - 16612

মূল্য : পঞ্চান্ন টাকা মাত্র

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার অগণিত অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও তরুণ ছাত্র-ছাত্রীমহল থেকে সাধুবাদ প্রাপ্তির ফলশ্রুতি হল আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক জীববিদ্যার বর্তমান সংস্করণ। এ কথা জেনে আজ আমরা আনন্দিত যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার সর্বত্র সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। আশা করি বর্তমান সংস্করণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আরও সমাদর লাভ করবে।

কলিকাতা,
জুলাই, ১৯৮৯

বিনীত
গ্রন্থকারত্রয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার প্রথিতযশা শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দের মধ্যে যাঁরা পুস্তকটি সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনা ও সুচিন্তিত মতামত পোষণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন—

● শ্রীমুকুলচন্দ্র ত্রিপাঠী (বারাসাত গভর্নমেণ্ট স্কুল)। ● শ্রীপ্রবোধ পাণ্ডা (সিটি কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা)। ● শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী (যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, কলিকাতা)। ● শ্রীমতি মানসী পাল (বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়, কলিকাতা)। ● শ্রীপ্রদীপকুমার বসু (সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা)। ● শ্রীঅমরেন্দ্র সরকার (হেয়ার স্কুল, কলিকাতা)। ● শ্রীরূপক হোমরায় (হেয়ার স্কুল, কলিকাতা)। ● শ্রীস্বপনকুমার সাহা (হিন্দু স্কুল, কলিকাতা)। ● শ্রীঅমল মিস্ত্রি (জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশান, কলিকাতা)। ● শ্রীজয়ন্তকুমার ভৌমিক (তীর্থপতি ইনস্টিটিউশান, কলিকাতা)। ● ডঃ সত্যকিঙ্কর বেরা (তীর্থপতি ইনস্টিটিউশান, কলিকাতা)। ● ডঃ অসীমকুমার ভদ্র (ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ, কলিকাতা)। ● ডঃ দিলীপকুমার চক্রবর্তী (চন্দননগর গভর্নমেণ্ট কলেজ)। ● ডঃ গদাধর সাহু (প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা)। ● অধ্যাপক, শেখর মুখোপাধ্যায় (বারাসাত গভর্নমেণ্ট কলেজ)। ● অধ্যাপক সামসুল আলম (কৃষ্ণনগর গভর্নমেণ্ট কলেজ)। ● শ্রীঅশোককুমার সরকার (টাকী গভর্নমেণ্ট স্কুল)। ● অধ্যাপক বসন্ত ঘোড়া (আনন্দমোহন কলেজ, কলিকাতা)। ● অধ্যাপক অম্বুজ পাল (গুরুদাস কলেজ, কলিকাতা)। ● অধ্যাপক দুর্গা মান্না (হরিমোহন ঘোষ কলেজ)। ● অধ্যাপক পরিমল নাগ (তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়)। ● অধ্যাপক অমল সরকার (নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া)। ● অধ্যাপিকা আরতি দেব (দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজ, কলিকাতা)। ● ডঃ তরুণ গুপ্ত (দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজ, কলিকাতা)। ● অধ্যাপিকা অঞ্জলি রায় (মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা)। ● ডঃ অশোককুমার সরকার (ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ, কলিকাতা)। ● অধ্যাপক শান্তিনাথ সরকার (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা)। ● শ্রীমতি কাকলী দত্ত ও ● শ্রীমতি উমা পাল (কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় বারাসাত)।

সর্বোপরি প্রুফ-রীডিং বিভাগ ও প্রেসের কর্মীবৃন্দ নিরলস সহযোগিতায় আমাদের যেভাবে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন, তাতে আমরা অভিভূত। এঁদের প্রত্যেককেই জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভালবাসা।

গ্রন্থকারত্রয়

ভূমিকা

পৃথিবীর ইতিহাসে নানা জীবের বহু পরিচ্ছেদের উপসংহারে এসেছে মানুষ—এমন একটা কথা চলে আসছে। মানুষের সঙ্গে প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও প্রকৃতিজগতের সম্বন্ধ পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষকাল থেকেই স্বীকৃত। বাঁচার জন্য প্রাগৈতিহাসিক সমাজে ব্যক্তিমাত্রই প্রয়োজন বোধ করেছিল তার পরিবেশকে বাস্তবভাবে জানতে, তাকে আয়ত্ত করতে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পরিশীলিত ক্রমবিকাশ এবং জটিলতর সভ্যতা ক্রমাগত মানুষেরই উপর চাপ সৃষ্টি করেছে তার অধুনাতম প্রসারিত পরিবেশকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে।

আধুনিক শিক্ষায় পৃথিবীব্যাপী একটি নীতি স্বীকৃত যে, বিদ্যালয়ের নীচু স্তর থেকেই ধাপে ধাপে প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে এমন মানুষ তৈরি করতে হবে যে 'Organism' এবং 'Environment'—এই দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবে। বস্তুত, সুধী ব্যক্তিমাত্রেই জ্ঞাত যে, জীববিদ্যা বিষয়টির গুরুত্ব ও বহুব্যাপকতা জ্ঞানের নব নব দিগন্ত উন্মোচন করছে। এই বিষয়টির বিবিধক্ষেত্রে যুগান্তকারী আবিষ্কার এই দশকেই কয়েকবার ঘটেছে, যার ফলাফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী, পরিবর্তিত হয়েছে এতদিন চলে আসা ধারণা।

জ্ঞানের বিশালতা আজ বহুক্ষেত্রে আমাদের পরান্নভোজী করেছে। কিন্তু জীববিদ্যার ক্ষেত্রে বোধ হয় আমাদের হীনম্মন্যতাবোধের অবকাশ নেই। বৈদিক সূক্ত ও উপনিষদে বৃক্ষাদি পরিপোষণ এবং পত্র-চয়নের পূর্বে বৃক্ষবিশেষের উদ্দেশ্যে স্তব ও ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহারের জন্য মার্জনা ভিক্ষা প্রমাণ করে দেয় উদ্ভিদের প্রাণময়তা সম্পর্কে তাঁদের স্বচ্ছ ধারণা ও আত্মিক সম্পর্কের নিবিড় চেতনা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বহু-পঠিত গল্পের উদ্ধৃতি ব্যবহারের সুযোগ নিতে চাই। "এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগের দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে।...বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্যুলোককে দোহন করে পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্য প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশ আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব'।"

এই বোধি আজ আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে **'পরিবেশ-বিজ্ঞান'** নামে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। আধুনিক জীবনে 'Ecology' ('the totality or pattern of relations between organism and their environment') শব্দটি সদা ব্যবহৃত। এই বিষয়টিও বর্তমান পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ মনস্ক ও জীববিদ্যার আধুনিকতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে প্রয়াসী।

এই সুদীর্ঘ ভূমিকা হয়ত নিষ্প্রয়োজন ছিল। তবুও আমাদের এই বিনীত প্রয়াসের প্রেক্ষাপটে যে বোধি নিরন্তর আমাদের প্ররোচিত করেছে তার একটা প্রতিফলন উপরে বিবৃত করার প্রয়াস পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ছাত্রছাত্রী যারা আমাদের আত্মার আত্মীয়, তাদের জন্য সহজভাবে বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা করেছি তাদের আগ্রহকে তীক্ষ্ন করার জন্য। পরীক্ষাসর্বস্ব মূলধনী বিদ্যাকে অতিক্রম করে এ পুস্তক পাঠের ফলে যেন তারা একদিন সানন্দে বলে উঠতে পারে 'আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ চুনি উঠলো রাঙা হয়ে।' তবেই বুঝবো জীববিদ্যার পর্যালোচনা তাদের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে, আমাদের শ্রম ফলপ্রসূ হয়েছে। সর্বোপরি, বিষয়বস্তুর তথ্যযুক্তি সম্পর্কে বিদগ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকা, সুধীজনের সুচিন্তিত মতামত ও গঠনমূলক সমালোচনায় এই ক্ষুদ্র প্রয়াস হয়ে উঠবে আরও সমৃদ্ধ। আমরা সকলের সুচিন্তিত মতামত প্রার্থনা করছি।

এই অবকাশে যাঁরা আমাদের বিভিন্ন দিক থেকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন, তাঁদের অবনত মস্তকে জানাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা—ভালবাসা।

বিনীত—

কলকাতা
জুলাই, ১৯৮৫

সলিলকুমার চৌধুরী
অমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
সুপ্তীশচন্দ্র নন্দী

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বিষয়-বস্তুর তথ্যযুক্তি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বিদগ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দের সুচিন্তিত মতামত ও গঠনমূলক সমালোচনাকে কেন্দ্র করে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক জীববিদ্যার বর্তমান সংস্করণটি হয়ে উঠেছে আরও সমৃদ্ধ, তথ্যবহুল। আমাদের প্রয়াসের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় ছড়িয়ে থাকা সহস্র সহস্র ছাত্রছাত্রী, যারা আমাদের আগামী প্রজন্মের কাণ্ডারী, তাদের তীব্র জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করার জন্য শিক্ষক হিসেবে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে।

শিক্ষা কেবল বিদ্যায়তনের মধ্যে, পরীক্ষাসর্বস্ব পাঠক্রমের মধ্যেই সীমিত থাকবে না, জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রের সঙ্গেও অবশ্য ভাবযোগে যুক্ত হবে—এই মূল মন্ত্রে আজ ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। একথা মনে রেখে আমরা প্ররোচিত হয়েছি বর্তমান সংস্করণকে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন তথ্যে আরও অনেক বেশী সমৃদ্ধ করতে। জীববিদ্যার প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছে যেদিন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সমানভাবে সমাদৃত হবে, সেইদিনই আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো।

যাঁরা আমাদের বিভিন্ন দিক থেকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন এই অবকাশে তাঁদের জানাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভালবাসা।

কলকাতা
আগস্ট, ১৯৮৮

বিনীত—
গ্রন্থকারত্রয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার প্রথিতযশা শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দের মধ্যে যাঁরা পুস্তকটি সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনা ও সুচিন্তিত মতামত পোষণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন—

● শ্রীমুকুলচন্দ্র ত্রিপাঠী (বারাসাত গভর্নমেন্ট স্কুল)। ● শ্রীপ্রবোধ পাণ্ডা (সিটি কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা)। ● শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী (যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, কলিকাতা)। ● শ্রীমতি মানসী পাল (বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়, কলিকাতা)। ● শ্রীপ্রদীপকুমার বসু (সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা)। ● শ্রীঅমরেন্দ্র সরকার (হেয়ার স্কুল, কলিকাতা)। ● শ্রীরূপক হোমরায় (হেয়ার স্কুল, কলিকাতা)। ● শ্রীস্বপনকুমার সাহা (হিন্দু স্কুল, কলিকাতা)। ● শ্রীঅমল মিস্ত্রি (জগম্বন্ধু ইন্‌স্টিটিউশান, কলিকাতা)। ● শ্রীজয়ন্তকুমার ভৌমিক (তীর্থপতি ইন্‌স্টিটিউশান, কলিকাতা)। ● ডঃ সত্যকিঙ্কর বেরা (তীর্থপতি ইন্‌স্টিটিউশান, কলিকাতা)। ● ডঃ অসীমকুমার ভদ্র (ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ, কলিকাতা)। ● ডঃ দিলীপকুমার চক্রবর্তী (চন্দননগর গভর্নমেন্ট কলেজ)। ● ডঃ গদাধর সাহু (প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা)। ● অধ্যাপক শেখর মুখোপাধ্যায় (বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজ)। ● অধ্যাপক সামসুল আলম (কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ)। ● শ্রীঅশোককুমার সরকার (টাকী গভর্নমেন্ট স্কুল)। ● অধ্যাপক বসন্ত ঘোড়া (আনন্দমোহন কলেজ, কলিকাতা)। ● অধ্যাপক অম্বুজ পাল (গুরুদাস কলেজ, কলিকাতা)। ● অধ্যাপক দুর্গা মান্না (হরিমোহন ঘোষ কলেজ)। ● অধ্যাপক পরিমল নাগ (তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়)। ● অধ্যাপক অমল সরকার (নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া)। ● অধ্যাপিকা আরতি দেব (দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজ, কলিকাতা)। ● ডঃ তরুণ গুপ্ত (দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজ, কলিকাতা)। ● অধ্যাপিকা অঞ্জলি রায় (মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা)। ● ডঃ অশোককুমার সরকার (ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ, কলিকাতা)। ● অধ্যাপক শান্তিনাথ সরকার (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা)। ● শ্রীমতি কাকলী দত্ত ও ● শ্রীমতি উমা পাল (কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়, বারাসাত)।

সর্বোপরি প্রুফ-রীডিং বিভাগ ও প্রেসের কর্মীবৃন্দ নিরলস সহযোগিতায় আমাদের যেভাবে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন, তাতে আমরা অভিভূত। এঁদের প্রত্যেককেই জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভালবাসা।

গ্রন্থকারত্রয়

Revised Curriculum & Syllabus of Higher Secondary Education BIOLOGICAL SCIENCES

(General Stream)

Distribution of Marks :

Theoretical :

Paper I		80
Paper II	Bot.···27 Zoo.···27 Phy.···26	80

Practical :

Bot.·······6 Zoo.·······6 Phy.·······6 Identification (5 × 3)·······15 Lab. Note Book·······7 & Field records (5+2) (Bot. Zoo. Phy.)	40
Total	200

PAPER I (Marks—80)

1. Biological Sciences—Introduction.
2. Cell structure :
   (*a*) Prokaryotic cell : Definition and examples—Bacterium & Blue-green algae.
   (*b*) Eukaryotic cell : Definition and examples—Plant cell and animal cell ; Structure in outline and functions (in brief) of the following—cell wall and cell-membrane, cytoplasm, vacuoles, membrane bound organelles i. e., nucleus, ribosomes, plastids and Golgi bodies. Mention only—endoplasmic reticulum, mitochondria, lysosome, centriole and microtubules.
   Ergastic substances—starch grains, glycogen, fat droplets, zymogen granules.

(*c*) Differences between Prokaryotic and Eukaryotic cells ; mention only (i) plastids, (ii) nuclear membrane and (iii) chromosome.

(*d*) Functions : diffusion, osmosis water and ion absorption (mechanism of ion absorption is not required).

3. (*a*) Structure of chromosome—mentioning chromatids, centromere, matrix, gene, chemical nature of DNA & RNA (detailed structure and chemical composition not required).

(*b*) Cell division : examples—plant and animal cell.

(i) Amitosis

(ii) Mitosis and its significance

(iii) Meiosis (outline idea about stages and substages) and its significance.

4. Tissue : General idea about tissues in plants and animals—outline only.

(*a*) Plant tissues—occurrence, functions and classifications—meristematic and permanent, simple and complex.

(*b*) Animal tissues—occurrence, functions and outline idea of epithelial, connective, muscular, nervous and secretory tissue

Blood as a fluid connective tissue : (mention only) ; its components—plasma, types of blood cells, haemoglobin & haemocyanin.

5. **Elementary idea about life processes.**

A. **Transpiration** : Definition, factors (mention only) ; one simple experiment showing transpiration.

B. **Photosynthesis** : Components—CO_2 and H_2O (with their sources), chlorophyll and sunlight ; mechanism—outline of light and dark reactions ; brief idea of entrapping of solar energy by chloroplasts (names of enzymes not required) ; significance of photosynthesis.

C. **Respiration** : Fundamental process—external and internal respiration (site of respiration) ; aerobic respiration,

anaerobic respiration and fermentation (outline of the processes, mentioning respective end products) ; Glycolysis [mention—hexose—triose—pyruvic acid—acetyl CoA—Kreb's cycle (mention only) CO_2, H_2O and release of energy].

D. **Nutrition :** (*a*) Autotrophic—definition, sources of raw materials, macro and micro-nutrients (mention only).

(*b*) Heterotrophic—definition, types and sources of food—Carbohydrate, Protein, Fats and oils, vitamins and minerals. (Details and chemical composition not required). Significance of nutrition.

E. **Circulation :** Principles of circulation in plants and animals (details not required) ; structures concerned (mention only).

F. **Excretion :** Principles of excretion in plants and animals—mention excretory products of plants and animals.

G. **Growth :** Definition, factors controlling growth in plants and animals (mention only) ; differences between growth of plants and animals.

H. **Movement : Types of movement**

(*a*) Movement in plants—

(i) Tactic :—chemo. and thermo. —

(ii) Tropic :—photo.—, geo. — and hydro. —

(iii) Nastic :—seismo. — and nycti. —

(*b*) Movement in animals—

(i) Terrestrial — man (Bipedal locomotion only)

(ii) Aquatic — fish,

(iii) Aerial — pigeon

(Structure and mechanism not required)

I. **Reproduction :** Asexual and sexual — differences only ; Units of sexual reproduction ; iso-, aniso- and oo-gamous types ; outline of the process of fertilization—union of gametes leading to zygote formation. General idea about alternation of generations (outline only) ; Mention one example in plant and one in animal.

2. **Hormones : Definition :**

   (*a*) **Plant hormones :** auxin—role in growth, phototropic and geotropic movements ; role in agriculture (mention Indole acetic acid, chemical formula not required).

   (*b*) Animal hormones :—position of glands—pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal, testis and ovary.

   Pituitary — ACTH, STH, TSH, CTH & ADH,
   Thyroid —Thyroxin
   Adrenal — Adrenalin
   Testis — Androgen
   Ovary — Oestrogen

   (Mention respective functions ; histology of glands and chemical composition of hormones not required.)

7. **Heredity :** Definition, Mendel's experiment, monohybrid and di-hybrid cross (cite one example from plant and one from animal) ; Mendel's laws.

8. **Evolution :** Definition, evidences—morphological, palaeontological (mention only Archaeopteryx) and embryological (ontogenesis not required).

   (Evidences in outline only)

   Theories of Darwin, Lamarck & de Vries (In brief).

9. **Taxonomy** : Brief idea about principles and basis of classification, Binomial nomenclature.

10. (*a*) Eco-system : Explanation ; General idea about food chain and energy flow.

    (*b*) Conservation—definition ; conservation of soil, water ; forest and animals (example—Rhinoceros in West Bengal).

    (*c*) Pollution—in reference to human beings (Mention air, water and noise).

সূচীপত্র

1. জীববিদ্যা : সূচনা 1—19

জীববিজ্ঞানের গোড়ার কথা 1 ; জীবন কি? 2 ; জীবনের বৈশিষ্ট্য 2 ; জড় ও জীবের পার্থক্য 6 ; জীববিজ্ঞানের প্রধান প্রধান বিভাগ 7 ; জীববিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক 10 ; জীববিজ্ঞানের পরিধি, গুরুত্ব ও প্রয়োগ 12 ; জীববিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্য 14 ; উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য 15 ; উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরশীলতা 16 ; বিষয়-সংক্ষেপ 17 ; অনুশীলনী 18।

2. কোষের গঠন 20—107

সূচনা 20 ; কোষ আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 20 ; কোষের সংজ্ঞা 23 ; কোষ অঙ্গাণু ও কোষস্থ অজীবীয় বস্তু 23 ; কোষ ও তার অঙ্গাণুর পরিমাপের একক 24 ; কোষের আকৃতি 25 ; কোষের আয়তন 26 ; কোষের সংখ্যা 26 ; কোষের প্রকারভেদ 26 ; প্রোক্যারিওটিক কোষ 26 ; ইউক্যারিওটিক কোষ 31 ; ইউক্যারিওটিক কোষের গঠন 31 ; প্লাজমা পর্দা বা কোষ পর্দা 33 ; কোষপ্রাচীর 35 ; সাইটোপ্লাজম 41 ; কোষ-গহ্বর বা ভ্যাকুওল 46 ; নিউক্লিয়াস 47 ; রাইবোসোম 53 ; প্লাসটিড 55 ; গলগি বডি 60 ; এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম 62 ; মাইটোকনড্রিয়া 64 ; লাইসোসোম 67 ; মাইক্রোটিউবিউল 69 ; সেন্ট্রিওল 71 ; কোষস্থ বস্তু বা আগ্যাস্টিক পদার্থ 73 ; প্রোক্যারিওটিক কোষ ও ইউক্যারিওটিক কোষের পার্থক্য 76 ; উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের পার্থক্য 77।

ব্যাপন 78 ; গ্যাসের ব্যাপনের পরীক্ষা 79 ; তরলের ব্যাপনের পরীক্ষা 79 ; কঠিন ও তরলের ব্যাপনের পরীক্ষা 80 ; ব্যাপনের শর্ত 80।

অভিস্রবণ 80 ; অভিস্রবণের শর্ত 85 ; অভিস্রবণের গুরুত্ব 85 ; অভিস্রবণের পরীক্ষা 85 ; কোষান্তর অভিস্রবণের পরীক্ষা 87 ; ব্যাপন এবং অভিস্রবণের মধ্যে পার্থক্য 88 ; অভিস্রবণ চাপ ও রসস্ফীতি চাপের সম্পর্ক 88 ; জল শোষণ 90 ; জল শোষণের শর্ত 93 ; আয়ন বিশোষণ 93 ; সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় আয়ন বিশোষণের পার্থক্য 96 ; বিষয়-সংক্ষেপ 96 ; অনুশীলনী 103।

3. ক্রোমোসোমের গঠন ও কোষ বিভাজন 108—152

ক্রোমোসোমের সংজ্ঞা 108 ; ক্রোমোসোমের সংখ্যা 108 ; ক্রোমোসোমের আকৃতি ও প্রকারভেদ 109 ; ক্রোমোসোমের বহির্গঠন 111 ; ক্রোমোসোমের রাসায়নিক উপাদান 115 ; জীন 117 ; নিউক্লিক অ্যাসিডের রাসায়নিক প্রকৃতি 119 ; **DNA** ও **RNA**-র পার্থক্য 120।

কোষ বিভাজন 123 ; অ্যামাইটোসিস 123 ; মাইটোসিস 124 ;

মাইটোসিসের সংঘটন স্থল 124 ; মাইটোটিক কোষ বিভাজন পদ্ধতি 124 ; মাইটোসিসের গুরুত্ব 130 ; মায়োসিস বা মিয়োসিস 132 ; মায়োসিসের সংঘটন স্থল 133 ; মায়োটিক চক্র 133 ; প্রথম মায়োটিক বিভাজন 134 ; দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজন 141 ; মায়োসিসের তাৎপর্য 142 ; মাইটোসিস ও মায়োসিসের তুলনা 143 ; বিষয়-সংক্ষেপ 145 ; অনুশীলনী 149 ।

4. **কলা** 153—232

সূচনা 153 ।

উদ্ভিদ কলা 153—178

কলা কাকে বলে ? 153 ; উদ্ভিদ কলার শ্রেণীবিন্যাস 154 ; **ভাজক কলা ঃ** সংজ্ঞা 154 ; ভাজক কলার শ্রেণীবিভাগ 155 ; **স্থায়ী কলা ঃ** সংজ্ঞা 158 ; ভাজক কলা এবং স্থায়ী কলার মধ্যে পার্থক্য 159 ; স্থায়ী কলার শ্রেণীবিভাগ 160 ; **সরল কলা ঃ** প্যারেনকাইমা 160 ; কোলেনকাইমা 161 ; ক্লোরেনকাইমা ও কোলেনকাইমার মধ্যে পার্থক্য 163 ; স্ক্লেরেনকাইমা 163 ; প্যারেন-কাইমা, কোলেনকাইমা এবং স্ক্লেরেনকাইমা কলার পার্থক্য 166 ; **জটিল কলা ঃ** জাইলেম 168 ; ট্র্যাকীড 168 ; ট্র্যাকীয়া 169 ; জাইলেম প্যারেনকাইমা 169 ; কাষ্ঠিক তন্তু 170 ; ফেনায়েম 170 ; সীভ নল 170 ; সঙ্গীকোষ 172 ; ফেনায়েম প্যারেনকাইমা 172 ; ফেনায়েম তন্তু 173 ; সীভ কোষ 173 ; কাষ্ঠিক তন্তু ও বাস্ট তন্তুর মধ্যে পার্থক্য 174 ; জাইলেম ও ফেনায়েমের মধ্যে পার্থক্য 174 ; সরল কলা ও জটিল কলার মধ্যে পার্থক্য 175 ; **বিশেষ কলা** 175 ।

প্রাণী কলা 178—232

কলা কাকে বলে ? 178 ; কলার প্রকারভেদ 179 ; **স্থির কলা ঃ** আবরণী কলা 179 ; যোগকলা 184 ; পেশী কলা 195 ; নার্ভ কলা 200 ; ক্ষরণ কলা বা গ্রন্থি কলা 208 ; গ্রন্থির প্রকারভেদ 208 ; **তরল কলা ঃ** রক্ত 211 ; রক্তের উপাদান 212 ; প্লাজমা 212 ; লোহিত রক্তকণিকা 213 ; শ্বেত রক্তকণিকা 215 ; গ্র্যানুলোসাইট 216 ; আগ্র্যানুলোসাইট 217 ; থ্রম্বোসাইট বা অণুচক্রিকা 218 ; শ্বাসকণা 219 ; রক্তের কার্য 220 ; লসিকা 222 ; লসিকার কার্য 223 ; বিষয়-সংক্ষেপ 223 ; অনুশীলনী 228 ।

5 **জীবের জীবনক্রিয়া সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা** 233—460

বাষ্পমোচন বা প্রস্বেদন 234 – 245

সূচনা 234 ; সংজ্ঞা 234 ; বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া 234 ; প্রস্বেদন ও বাষ্পীভবনের মধ্যে পার্থক্য 238 ; বাষ্পমোচনের গুরুত্ব 238 ; বাষ্পমোচন একটি ক্ষতিকর প্রয়োজনীয় পদ্ধতি 239 ; বাষ্পমোচনের শর্ত 239 ; বাষ্পমোচনের পরীক্ষাসমূহ 241 ।

সালোকসংশ্লেষ **245—261**

সূচনা 245 ; সংজ্ঞা 245 ; সালোকসংশ্লেষের উপাদান 245 ; সালোকসংশ্লেষ কোথায় হয় ? 249 ; সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া 249 ; হিল বিক্রিয়া 257 ; ব্যাকটিরিয়ার সালোকসংশ্লেষ 257 ; সালোকসংশ্লেষের প্রয়োজনীয় শর্ত 258 ; সালোকসংশ্লেষের তাৎপর্য 259।

শ্বসন **261—284**

সূচনা 261 ; শ্বসন বস্তু ও শক্তি 262 ; শ্বসন স্থল 262 ; শ্বসনের সংজ্ঞা 263 ; শ্বসনের প্রকারভেদ 263 ; কোহল সন্ধান 264। শ্বাস প্রক্রিয়া 264 ; গ্লাইকোলিসিস 265 ; ক্রেবস চক্র 268 ; প্রান্তীয় শ্বসন 270 ; সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসনের পার্থক্য 272 ; অবাত শ্বসন ও কোহল সন্ধানের পার্থক্য 273 ; শ্বাস অঙ্গ 273 ; শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া 281 ; সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের পার্থক্য 284।

পুষ্টি **284—321**

সূচনা 284 ; পুষ্টির সংজ্ঞা 285 ; স্বভোজী পুষ্টি 285 ; পরভোজী পুষ্টি 287 ; খাদ্যের মুখ্য উপাদান 296। **খাদ্যের সহায়ক উপাদান ঃ** ভিটামিন 302 ; ভিটামিনের শ্রেণীবিভাগ 302 ; ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন 302 ; জলে দ্রবণীয় ভিটামিন 305। **খনিজ পদার্থ ঃ** লোহ 313 ; ক্যালসিয়াম 314 ; ফসফরাস 314 ; আয়োডিন 315 ; সোডিয়াম 315 ; পটাসিয়াম 316 ; ম্যাগনেসিয়াম 316 ; সালফার 317 ; তাম্র 317 ; কোবাল্ট 317।

সংবহন **322—351**

ভূমিকা 322 ; সংবহনের সংজ্ঞা 322 ; সংবহনের মাধ্যম 322 ; উদ্ভিদের সংবহন 322। **প্রাণীর সংবহন ঃ** অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহন 327 ; মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহন 329 ; অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহন তন্ত্রের পার্থক্য 330 ; রক্ত 331 ; প্রাণিদেহে রক্তের পরিমাণ 331 ; রক্তের উপাদান 331 ; রক্তের কার্য 331 ; রক্ত তঞ্চন 331 ; রক্তগোষ্ঠী 331 ; রক্ত-সংবহন তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ 333 ; ধমনী ও শিরার পার্থক্য 340 ; মানবদেহে সংবহন 341 ; মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের গঠন 342 ; হৃৎস্পন্দনের উৎপত্তি ও বিস্তার 345 ; হৃৎস্পন্দনের হারের উপর প্রভাবকারী কারণসমূহ 346 ; হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত সংবহন 346 ; ফুসফুসীয় সংবহন 348 ; সিস্টেমিক সংবহন 348 ; পোর্টাল সংবহন 349 ; করোনারী সংবহন 349 ; লসিকা ও লসিকা সংবহন 349।

রেচন 351—372
ভূমিকা 351 ; রেচনের সংজ্ঞা 352 ; উদ্ভিদের রেচন 352 ; উদ্ভিদের রেচন প্রক্রিয়া 353 ; প্রাণীদের রেচন 357 ; অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেচনতন্ত্র 358 ; মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেচনতন্ত্র 362 ; বৃক্কের গঠন 362 ; নেফ্রন 364 ; মূত্র সৃষ্টি 368 ; মূত্র ত্যাগ 369 ; বৃক্কের কাজ 369 ; মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্যান্য রেচন অঙ্গ 371 ; উদ্ভিদ ও প্রাণীর রেচন ক্রিয়ার পার্থক্য 372 ।

বৃদ্ধি 372—385
ভূমিকা 372 ; সংজ্ঞা 373 ; উদ্ভিদের বৃদ্ধি 374 ; বৃদ্ধির দশা 375 ; উদ্ভিদের বৃদ্ধির পরিমাপ 376 ; বৃদ্ধির শর্ত 379 ; প্রাণীর বৃদ্ধি 381 ; প্রাণীর বৃদ্ধির শর্ত 383 ; উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির পার্থক্য 385 ।

চলন 385—401
ভূমিকা 385 ; গমনের উদ্দেশ্য 386 ; উদ্ভিদে চলন 386 ; চলন ও গমনের পার্থক্য 394 ; প্রাণীর চলন ও গমন 394 ।

জনন 402—460
ভূমিকা 402 ; সংজ্ঞা 402 ; জননের গুরুত্ব 402 ; জননের প্রকারভেদ 402 ; অযৌন ও যৌন জননের মধ্যে পার্থক্য 403 , উদ্ভিদের জনন 404 ; অঙ্গজ জনন 404 ; অযৌন জনন 408 ; যৌন জনন 409 ; সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদে নিষেক পদ্ধতি 412 ; প্রাণীর জনন 415 ; কয়েকটি 'প্রাণীর জনন তন্ত্র 420 ; জনুক্রম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা 429 ; জনুক্রমের উদাহরণ 430 ; বিষয়-সংক্ষেপ 431 ; অনুশীলনী 444 ।

6. হরমোন 461—494
সূচনা 461 ; উৎপত্তিস্থল ও কার্যস্থল 461 ; রাসায়নিক দূত 462 ; হরমোন ও রাসায়নিক সমন্বয় 462 ; সংজ্ঞা 462 ; হরমোনের বৈশিষ্ট্য 462 ।

উদ্ভিদ হরমোন 463—474
উদ্ভিদ হরমোনের কাজ 466 ; উদ্ভিদ হরমোনের শ্রেণীবিন্যাস 466 ; অক্সিন 467 ; অক্সিনের কাজ 467 ; জিব্বারেল্লিন 470 ; জিব্বারেল্লিনের উৎপত্তিস্থল ও কাজ 470 ; সাইটোকাইনিন 471 ; সাইটোকাইনের উৎপত্তিস্থল ও কাজ 471 ।

প্রাণী হরমোন 474—490
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি 474 ; ট্রফিক হরমোন ও লোকাল হরমোন 474 ; নিউরোহরমোন 475 ; প্রাণিদেহে হরমোনের ভূমিকা 475 ; প্রাণীদের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি 476 ; পিটুইটারি 476 ; থাইরয়েড 481 ; প্যারাথাইরয়েড 483 ; অ্যাড্রিনাল 484 ; শুক্রাশয় 485 ;

ডিম্বাশয় 486 ; পাঠ্যসূচীভুক্ত হরমোনগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 488 ; বিষয়-সংক্ষেপ 490 ; অনুশীলনী 492 ।

7. বংশগতি **495—527**

বংশগতি 495 ; মেন্ডেল—সুপ্রজননবিদ্যার জনক 495 ; মেন্ডেলের পরীক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য 496 ; কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় 496 ; মনোহাইব্রিড ক্রস বা এক-সংকর ক্রস সংক্রান্ত মেন্ডেলের পরীক্ষা 498 ; অসম্পূর্ণ প্রকটতা 506 ; 3 : 1 অনুপাত কখন সম্ভব ? 507 ; মেন্ডেল কেন ভোজ্য মটর গাছকে পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করেন ? 508 ; প্রাণীতে মনোহাইব্রিড ক্রস 508 ; গিনিপিগের দেহবর্ণ 509 ; ডাই-হাইব্রিড ক্রস বা দ্বি-সংকর ক্রস সংক্রান্ত মেন্ডেলের পরীক্ষা 510 ; গিনিপিগে ডাই-হাইব্রিড ক্রস 515 ; 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাত নির্ণয়ের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি 518 ; মেন্ডেলের সূত্রগুলির যুক্তিসিদ্ধতা 519 ; বংশগতি সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা ও সেগুলির সমাধান 519 ; বিষয়-সংক্ষেপ 523 ; অনুশীলনী 525 ।

8. অভিব্যক্তি বা বিবর্তন **528—566**

আলোচনা ও সংজ্ঞা 528 ; জীবনের ক্রমবিকাশ 528 ; জীব-বিবর্তনের প্রমাণ 533 ; অঙ্গসংস্থানঘটিত প্রমাণ 534 ; প্রত্নজীববিদ্যা থেকে প্রমাণ 540 ; ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ 546 ; রক্ষাপ্রদ সাদৃশ্যঘটিত প্রমাণ 548 ; অভিব্যক্তি বা বিবর্তনের বিভিন্ন মতবাদ 549 ; ল্যামার্কের মতবাদ 549 ; ডারউইনের মতবাদ 552 ; দ্য ভ্রিসের মতবাদ বা পরিব্যক্তিবাদ 561 ; বিষয়-সংক্ষেপ 562 ; অনুশীলনী 565 ।

9. শ্রেণীবদ্ধবিদ্যা বা ট্যাকসোনমি **567—582**

সূচনা 567 ; শ্রেণীবদ্ধবিদ্যার সংজ্ঞা 568 ; শ্রেণীবদ্ধবিদ্যার বিভিন্ন প্রতিপাদ্য বিষয় 575 ; বৈজ্ঞানিক নামকরণের নিয়মকানুন 577 ; বিষয়-সংক্ষেপ 579 ; অনুশীলনী 581 ।

10. ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র **583—635**

A. ইকোসিস্টেম : সূচনা 583 ; ইকোসিস্টেমের জড় বা অজীব ও সজীব উপাদান 585 ; ইকোসিস্টেমের কার্য পদ্ধতি 589 ; স্বয়ংসম্পূর্ণ পুষ্করিণীর বাস্তুতন্ত্রের বিবরণ 589 ; খাদ্য-শৃঙ্খল 592 ; ইকোসিস্টেমের পুষ্টিস্তর 593 ; ইকোসিস্টেমে শক্তিপ্রবাহ 597 ।

B. সংরক্ষণ : সংরক্ষণের গুরুত্ব 601 ; বিভিন্ন বস্তুর সংরক্ষণ 602 ; জল সংরক্ষণ 602 ; ভূমি সংরক্ষণ 603 ; বন সংরক্ষণ 605 ; বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ 606 ; ভারতের সংরক্ষিত অরণ্য 607 ; কয়েকটি বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী 608 ; পশ্চিমবঙ্গে গণ্ডার সংরক্ষণ 609 ।

C. দূষণ : দূষণ 612 ; দূষণের উৎপত্তি ও তার প্রতিক্রিয়া 613 ; দূষণকারক পদার্থ ও তাদের শ্রেণীবিন্যাস 613 ; বায়ু দূষণ 614 ; বায়ু দূষণের কারণ 615 ; বায়ু দূষণের জন্য দায়ী বিভিন্ন পদার্থ 619 ; বায়ু দূষণে বিভিন্ন রোগ 619 ; বায়ু দূষণ প্রতিকারের উপায় 620 ; জল দূষণ 621 ; জল দূষণের কারণ 621 ; জল দূষণের কয়েকটি রাসায়নিক নির্দেশক 623 ; জল দূষণ প্রতিকারের উপায় 623 ; শব্দ দূষণ 624 ; শব্দ দূষণের প্রতিক্রিয়া 625 ; শব্দ দূষণের প্রতিকারের উপায় 625 ; মৃত্তিকা দূষণ 626 ; বিষয়-সংক্ষেপ 626 ; অনুশীলনী 631 ।

পরিশিষ্ট **636—643**

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র i—xvi

---

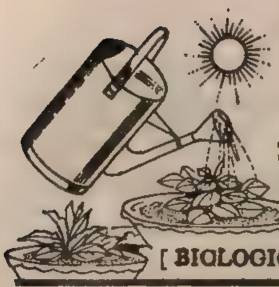

জীববিদ্যা: সূচনা 1

[BIOLOGICAL SCIENCES : INTRODUCTION]

Syllabus : Biological Sciences—Introduction.

1.1. জীববিজ্ঞানের গোড়ার কথা (Fundamentals of Biology)

বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক **অ্যারিস্টটলের** (Aristotle, 384—322 B.C.) সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমাদের পরিবেশ এবং তার অন্তর্গত জীবজগতের বহু রহস্য আজ উদ্ঘাটিত। আজ আমরা বর্তমান ও অতীতের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করেছি, দূর হয়েছে অজ্ঞতা, ভ্রান্ত ধারণা। এই পৃথিবীর বিভিন্ন সজীব বস্তুর উৎপত্তি, গঠন, গতি-প্রকৃতি, শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ, বাস্তু-সংস্থান প্রভৃতির সম্পর্কে যে বিশেষ জ্ঞান, তাই হল জীববিজ্ঞান বা Biology। ফরাসী জীববিজ্ঞানী **জ্যঁ ব্যাপটিস্ট দ্য ম‍ঁনে ল্যামার্ক** (Jean Baptiste de Monet Lamarck) সর্বপ্রথম 'Biology' শব্দটি প্রবর্তন করেন (Bios = life, Logos = science)।

এই পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ সজীব বস্তু, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে যেমন প্রচুর পার্থক্য বা বৈচিত্র্য দেখা যায়, তেমনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব থেকে শুরু করে বহুকোষী উন্নত জীবের মধ্যে একটা মূল সম্পর্কও রয়েছে। প্রত্যেক সজীব বস্তুর দেহই কোষ দিয়ে তৈরি। সুতরাং এটা ঠিক যে, বহুবিধ অমিলের মধ্যেও মিলই হল জীবজগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই অভিন্নতার আর একটা দিক হল—সজীব বস্তুদের সজীবতা বা জীবন।

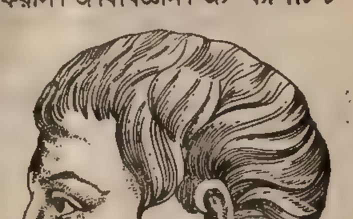

চিত্র 1.1 : অ্যারিস্টটল

বিজ্ঞানের যে শাখার বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করলে উদ্ভিদ এবং মানুষ সহ বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর আকৃতি, প্রকৃতি ও তাদের বৈচিত্র্যময় জীবন যাপনের বিভিন্ন প্রণালী, পরিবেশের সঙ্গে আন্তঃক্রিয়া, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, জীবনসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকেই **জীববিজ্ঞান** বা **জীববিদ্যা** বা **বায়োলজি** (Biology) বলে।

1.2. জীবন কি ? (What is Life ?)

জীবন কি বা জীবের উৎপত্তিই বা কিভাবে হয়েছে এটা আজও জীববিজ্ঞানীদের কাছে একটা প্রশ্ন হয়ে রয়েছে। জীবন বা প্রাণের আজ পর্যন্ত কোন সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এর অস্তিত্ব অনুভব করা যায় মাত্র। প্রাচীন কালের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নানা রকম উপমা সহযোগে প্রাণ বা জীবনের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ; কিন্তু তা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। জীববিদ্যার জনক গ্রীক দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জীবিত বস্তু হিসেবে বর্ণনা করেছেন মাত্র, কিন্তু প্রাণের প্রকৃত সংজ্ঞা দেন নি।

প্রকৃতপক্ষে সজীব বস্তু সংগঠিত বলেই এদের জীব বলা হয়। তাই অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা—সুসংগঠিত, ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহই জীবন, যার সঙ্গে বস্তু ও প্রক্রিয়ার একটা অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র আছে এবং এই পারস্পরিক যোগসূত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী জীবনের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। যেহেতু কোন একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সক্ষম নয়, তাই জীবনের কয়েকটি সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হল :

(i) **জীব ও তার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতা এবং সেই ক্রিয়াশীলতার বহিঃপ্রকাশই হল জীবন।**

(ii) **সজীব বস্তুর জটিল গতি-প্রকৃতির সংগঠিত বিশেষ অবস্থাই হল জীবন।**

(iii) **প্রজনন, জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু ও বৈবর্তনিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত কোষীয় জটিল জৈব যৌগের ক্রিয়াশীলতাই হল জীবন।**

বাস্তবিকপক্ষে জীবনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে—"যে ঐক্যটি আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন সামঞ্জস্যকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা বহির্জগতের সহিত সংগ্রাম করিতেছে, বহির্জগতের ধাতুকে স্বধাতুতে পরিবর্তিত করিতেছে ও প্রয়োজন অনুসারে আপন স্বভাবে পরিবর্তন করিয়া বহির্জগতের সহিত অনুকূলতা রক্ষা করিতেছে এবং আপনার মধ্য হইতে স্বানুরূপ নূতন নূতন সামঞ্জস্যের কেন্দ্রকে বীজীভূত করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া আপনার মধ্যে আপনি পর্যাপ্ত থাকিয়া আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে—তাহাকেই জীবন বলে।"

1.3. জীবনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Life)

জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল, যার ভিত্তিতে জীবকে জড় বস্তু থেকে আলাদা করা যায়—

A. আকার ও আয়তন (Shape and Size) : জীব সাধারণত নির্দিষ্ট আকার ও সীমিত আয়তন বিশিষ্ট। কোন নির্দিষ্ট জীবের আকার ও আয়তন নির্দিষ্ট। যেমন—মানুষের আকার ও আয়তন কখনোই কুকুর বা বিড়াল বা অন্য কোন প্রাণীর মত নয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। আম গাছ কখনোই এবং কোথাও জামগাছ বা বটগাছের মত নয়।

B. প্রোটোপ্লাজমের অস্তিত্ব (Presence of Protoplasm) : জীবদেহ কোষ দিয়ে তৈরি এবং কোষের মূলভিত্তি হল প্রোটোপ্লাজম, যা জীবদেহের সমস্ত

চিত্র 1.2 জীবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য।

শারীরবৃত্তীয় কাজ পরিচালনা করে। জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমের ক্রিয়াশীলতা বন্ধ হলে জীবের মৃত্যু হয় এবং তখন জীব জড়ে পরিণত হয়।

C. উত্তেজিতা (Irritability) **:** জীবদেহের ভেতরের বা বাইরের স্বাভাবিক পরিবেশের সামান্যতম পরিবর্তন ঘটলে জীবদেহ উত্তেজিত হয় এবং দেহের কোন-না-কোন অঙ্গে সেই উত্তেজনা প্রকাশ পায়।

স্বাভাবিক পরিবেশের সামান্যতম পরিবর্তনে জীবদেহকে যা উত্তেজিত করে, তাই হল **উদ্দীপক** (Stimulus)। উত্তেজিতার কয়েকটি উদাহরণ হল—স্পর্শের ফলে কেন্নোর কুন্ডলী পাকানো অথবা শামুকের খোলকের মধ্যে দেহকে গুটিয়ে নেওয়া ; লজ্জাবতী উদ্ভিদের পাতাকে হাত বা কোন কিছু দিয়ে স্পর্শ করলে পত্রকগুলি নুইয়ে পড়া ইত্যাদি।

D. অভিযোজন ক্ষমতা (Adaptability) **:** নির্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে **অভিযোজন** বলে। প্রতিটি জীবের এই অভিযোজন ক্ষমতা আছে। তাই পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে বিভিন্ন জীবও ধীরে ধীরে নিজেদের পরিবর্তন ঘটিয়ে মানিয়ে নিয়েছে এবং অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। যে সমস্ত জীব পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি, তারা চিরতরে এই পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়েছে।

E. চলন ও গমন (Movement and Locomotion) **:** একই স্থানে থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার পদ্ধতিকে **চলন** এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের মাধ্যমে স্থানান্তরে যাওয়ার ক্ষমতাকে **গমন** বলে। অধিকাংশ জীবই প্রয়োজনের তাগিদে চলন ও গমন করে থাকে। চলন সকল জীবেরই বৈশিষ্ট্য।

F. বৃদ্ধি (Growth) **:** জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমের সম্প্রসারণের মাধ্যমে আকার, আয়তন ও শুষ্ক ওজনের স্থায়ী ঊর্ধ্বমুখী পরিবর্তনকে **বৃদ্ধি** বলে। প্রত্যেক জীবেরই বৃদ্ধি ঘটে।

কোন পদার্থের সঙ্গে নতুন কোন পদার্থের অণুর সংযোজনের ফলে যে বৃদ্ধি ঘটে, তাকে **অন্তঃসংযোজন** বা **ইনটুসাসেপশন** (intussusception) বলে। জীবদেহের বৃদ্ধি এই প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। আবার কোন পদার্থের সঙ্গে সমজাতীয় পদার্থের অণুর সংযোজনের ফলে যে বৃদ্ধি ঘটে, তাকে **বহিঃসংযোজন** বা **অ্যাক্রিশন** (accretion) বলে। জড় পদার্থের বৃদ্ধি এই প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। যেমন—একটুকরো তুঁতে বা কপার সালফেটের সোদক কেলাস (crystal)-কে অতিপৃক্ত তুঁতের দ্রবণে (super saturated solution) ডোবালে, কেলাসটির উপর কপার সালফেটের অণু জমা হবে এবং কেলাস আয়তনে বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু জীবদেহের বৃদ্ধি অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ সংশ্লেষণের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

G. বিপাক (Metabolism) **:** জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া চলে, সেগুলিকেই সামগ্রিকভাবে **বিপাক** বলে। বিপাক জীবদেহের একটা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিপাক দু রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে গঠিত। কতকগুলি বিক্রিয়া হল গঠনমূলক এবং কতকগুলি বক্রিয়া ভাঙ্গনমূলক বা ধ্বংসাত্মক। প্রথম ধরনের বিক্রিয়াগুলিকে বলা হয়

অ্যানাবলিজম বা **উপচিতি** এবং দ্বিতীয় ধরনের বিক্রিয়াগুলিকে বলা হয় **ক্যাটাবলিজম** বা **অপচিতি**। জীবদেহেই কেবল বিপাক সম্ভব।

নিচে কয়েক রকম বিপাক পদ্ধতির উল্লেখ করা হল ঃ

(a) **পুষ্টি** (Nutrition) ঃ খাদ্যবস্তুর সরল অবস্থায় কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমের অঙ্গীভূত হওয়াকেই **পুষ্টি** বলে। পুষ্টি জীবদেহের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপচিতি প্রক্রিয়া।

(b) **শ্বসন** (Respiration) ঃ জীবকোষস্থ খাদ্যবস্তুর দহনের ফলে খাদ্যের ভিতরকার স্থৈতিক শক্তির বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তর হওয়াকেই **শ্বসন** বলে। শ্বসনের ফলে উৎপন্ন শক্তি জীবদেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। শ্বসন জীবের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অপচিতিমূলক ক্রিয়া।

(c) **রেচন** (Excretion) ঃ বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে জীবদেহে নানা রকম অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর পদার্থের সৃষ্টি হয়। দেহ থেকে এইসব পদার্থের অপসারণ প্রক্রিয়াকে **রেচন** বলে। ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি বস্তু প্রাণীদের রেচন পদার্থ ও বিভিন্ন উপক্ষার, তরুক্ষীর ইত্যাদি উদ্ভিদদের রেচন পদার্থ।

(d) **ক্ষরণ** (Secretion) ঃ বিভিন্ন বিপাকীয় কাজের ফলে জীবদেহে কতকগুলি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় এইসব রাসায়নিক পদার্থকে বলা হয় ক্ষরিত পদার্থ। ক্ষরিত পদার্থ সৃষ্টি হওয়ার পদ্ধতিকে বলে **ক্ষরণ**। জীবদের ক্ষরিত পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন উৎসেচক (enzyme), হরমোন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

H. ছন্দোবদ্ধতা (Rhythmicity) ঃ জীবদেহের সবরকম শারীরবৃত্তীয় কাজ নির্দিষ্ট ছন্দে চলে। পুষ্টি, শ্বসন, ক্ষরণ প্রভৃতি বিপাকীয় কাজ নির্দিষ্ট ছন্দে কখনও সক্রিয় আবার কখনও অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় দশার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়। হৃৎপিণ্ডের সক্রিয় সঙ্কোচনের পর অল্পক্ষণের জন্য আসে একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা, এই অবস্থার পরেই ঘটে আবার সক্রিয় সঙ্কোচন। ফুসফুসের সঙ্কোচন-প্রসারণ, রেচন, ক্ষরণ প্রভৃতি সকল কাজেই দেখা যায় একটা ছন্দোবদ্ধ ক্রিয়া অর্থাৎ সমস্ত শারীরবৃত্তীয় কাজই একটি নির্দিষ্ট ছন্দ বা পর্যায়ক্রমে দেহের মধ্যে সংঘটিত হয়। এই ছন্দোবদ্ধতা জীবনের একটা বিশেষ ধর্ম।

I. জনন (Reproduction) ঃ যে প্রক্রিয়া নতুন বংশধর বা অপত্য সৃষ্টি করে তার নাম **জনন**। জনন প্রত্যেক জীবেরই একটা অনুপম বৈশিষ্ট্য। জীবমাত্রেই অপত্য সৃষ্টির মাধ্যমে নিজ প্রজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখে।

J. জরা ও মৃত্যু (Senescence and Death) ঃ জন্মের পর জীবদেহ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং পরিণতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ক্রমে তার কর্মক্ষমতা কমে আসে এবং জরাগ্রস্ত হয়। অবশেষে নির্দিষ্ট সময় পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই জরা ও মৃত্যু জীবের অবধারিত পরিণতি।

K. জীবনচক্র (Life cycle) ঃ প্রত্যেক জীবের জীবনকাল কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত ; যেমন—মানুষের ক্ষেত্রে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্য দশা ; পতঙ্গদের ক্ষেত্রে ডিম, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ দশা ; উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বীজ, শিশু উদ্ভিদ, পরিণত উদ্ভিদ ইত্যাদি। এই ধারাবাহিক পর্যায়কালের মাধ্যমে জীব তার

আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করে। একে **জীবনচক্র** বলে। উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট জীবনচক্র বর্তমান, যা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবর্তিত হয়।

L. পরিবৃত্তিতা (Mutability) ঃ জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রক হল জিন, যা জীবকোষের ক্রোমোসোমে থাকে। ক্রোমোসোম তথা জিনের আকস্মিক কোন স্থায়ী পরিবর্তন হলে, জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীব সৃষ্টি হয়। জিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাবকে **পরিবৃত্তি** বা **মিউটেশন** (mutation) বলে। পরিবৃত্তির ক্ষমতাকে **পরিবৃত্তিতা** বলা হয়—এটি জীবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বেশীর ভাগ সময়ে এই পরিবর্তন ক্ষতিকারক হলেও অনেক সময় ঐসব পরিবর্তন থেকে ভাল বৈশিষ্ট্যেরও আবির্ভাব ঘটে। পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হলে নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত অপত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়।

M. জৈব অভিব্যক্তি (Organic evolution) ঃ জীবমাত্রেই পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। এর ফলে জীবের দেহে নানা রকমের পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের মাত্রা বংশ-পরম্পরায় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পেতে একসময়ে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জীবের সৃষ্টি হয়। পরিবর্তনের মাধ্যমে পুরাতন জীব থেকে নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের আবির্ভাবকে বলা হয় **জৈব অভিব্যক্তি**। এই জৈব অভিব্যক্তি জীবের বৈশিষ্ট্য।

1.4. জড় ও জীবের পার্থক্য (Differences between non-living and living body)

আমাদের চারদিকে যে সমস্ত পদার্থের মধ্যে জীবনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তাদের **জীব** বলে আর যে সমস্ত পদার্থের মধ্যে জীবনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না, তাদের **জড় পদার্থ** বলে। জীবজগৎকে আবার প্রাথমিকভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী—এই দুই গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। ইট, বালি, চেয়ার, টেবিল, ঘর-বাড়ি প্রভৃতি জড় পদার্থের দৃষ্টান্ত। নিচে জড় ও জীবের পার্থক্য উল্লেখ করা হল ঃ

জড়	জীব
1. জড়ের কোন নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন নেই।	1. প্রতিটি জীবের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে।
2. জড় পদার্থে প্রোটোপ্লাজম নেই।	2. জীবদেহ প্রোটোপ্লাজম দিয়ে গঠিত।
3. জড় পদার্থ কোষ দিয়ে গঠিত নয়।	3. জীবদেহ কোষ দিয়ে গঠিত।
4. জড়ের কোন পুষ্টি নেই।	4. জীবের পুষ্টি আছে।
5. জড় পদার্থ শ্বাসকার্য পরিচালনা করে না।	5. জীব শ্বাসকার্য পরিচালনা করে।
6. জড়ের বৃদ্ধি নেই। তবে বহিঃসংযোজন বা অ্যাক্রিশন পদ্ধতিতে জড়ের আয়তন বাড়তে পারে।	6. জীবের বৃদ্ধি হয় এবং এই বৃদ্ধি অন্তঃসংযোজন বা ইনটুসাসেপশন পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।
7. জড় পদার্থের কোন বিপাক নেই।	7. জীবের বিপাক আছে, যা উপচিতি এবং অপচিতি এই দুভাগে বিভক্ত।

জড়	জীব
8. জড়ের জন্ম, জরা ও মৃত্যু নেই।	8. জীবের জন্ম, জরা ও মৃত্যু আছে।
9. জড়ের রেচন ক্ষমতা নেই।	9. জীবের রেচন ক্ষমতা আছে।
10. জড় পদার্থের চলন ও গমন নেই।	10. জীব মাত্রেই চলন ও গমনে সক্ষম।
11. জড়ের কোন জীবনচক্র নেই।	11. জীবের নির্দিষ্ট জীবনচক্র আছে।
জড় পদার্থের উদাহরণ ঃ ইট, বালি, চেয়ার, টেবিল, ঘর-বাড়ি প্রভৃতি।	জীবের উদাহরণ ঃ আম, জাম, কাঁঠাল, প্রভৃতি উদ্ভিদ এবং সাপ, ব্যাঙ, গরু, ছাগল, মানুষ প্রভৃতি প্রাণী।

1.5. জীববিজ্ঞানের প্রধান প্রধান বিভাগ
(Principal divisions of Biology)

জীবের প্রকৃতি অনুসারে জীববিদ্যার বিভিন্ন শাখাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—**উদ্ভিদবিদ্যা** (Botany) এবং **প্রাণিবিদ্যা** (Zoology)। উদ্ভিদবিদ্যায় উদ্ভিদ এবং প্রাণিবিদ্যায় প্রাণীদের বিষয়ে আলোচিত হয়।

আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী উদ্ভিদবিদ্যা নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত ঃ

(i) **ব্যাকটিরিওলজি** (Bacteriology) ঃ ব্যাকটিরিয়াদের সম্পর্কে আলোচ্য বিদ্যা।

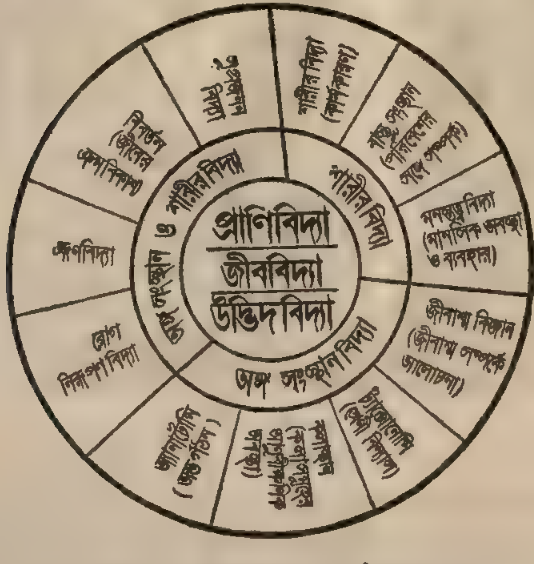

চিত্র 1.3 ঃ জীববিজ্ঞানের প্রধান বিভাগসমূহ।

(ii) **অ্যাগ্রোস্টোলজি** (Agrostology) ঃ ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ সম্পর্কে আলোচ্য বিদ্যা।

(iii) **ডেণ্ড্রোলজি** (Dendrology) : বৃক্ষদের সম্পর্কে আলোচ্য বিদ্যা।

(iv) **মাইকোলজি** (Mycology) : ছত্রাকদের সম্পর্কে আলোচ্য বিদ্যা।

(v) **প্যালিওবোটানি** (Paleobotany) : পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত উদ্ভিদের সম্পর্কে আলোচ্য বিদ্যা।

আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী প্রাণিবিদ্যাকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয় :

(i) **প্রোটোজুলজি** (Protozoology) : আদ্যপ্রাণী অর্থাৎ এককোষী প্রাণীদের সম্পর্কে আলোচ্য বিদ্যা।

(ii) **হেলমিনথোলজি** (Helminthology) : কৃমিদের সম্পর্কে আলোচ্য বিদ্যা।

(iii) **এণ্টোমোলজি** (Entomology) : কীটপতঙ্গ সম্পর্কে আলোচ্য বিদ্যা।

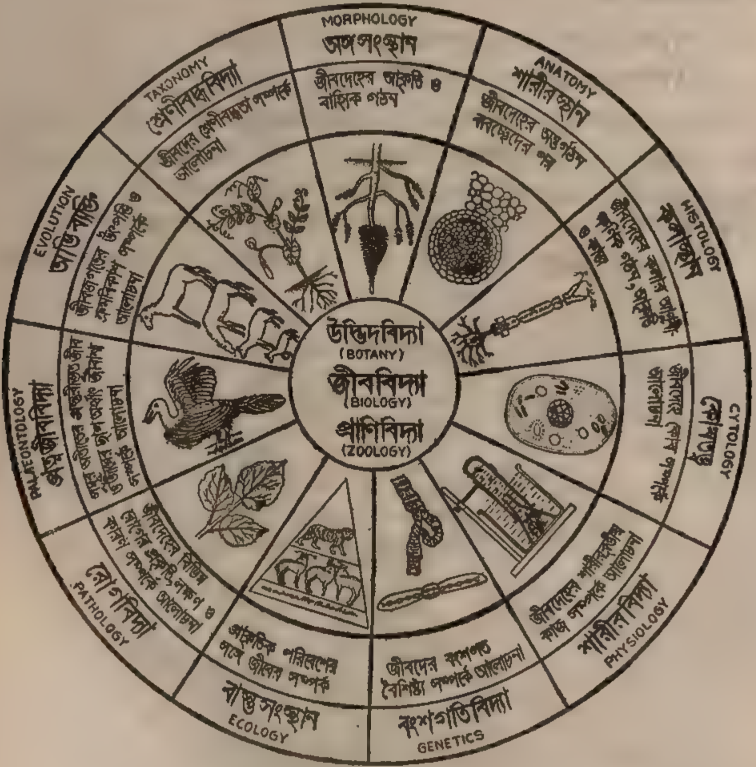

চিত্র 1.4 : জীববিজ্ঞানের প্রধান বিভাগগুলি ছকের সাহায্যে দেখানো হল।

(iv) **ম্যালাকোলজি** (Malacology) : শামুকদের সম্পর্কে আলোচ্য বিদ্যা।

(v) **ইকথিওলজি** (Ichthyology) : মাছেদের সম্পর্কে আলোচ্য বিদ্যা।

(vi) **অরনিথোলজি** (Ornithology) : পাখিদের সম্পর্কে আলোচ্য বিদ্যা।

পাঠের পদ্ধতি অনুসারে জীববিদ্যাকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় :

(I) **জীবদের এককভাবে পাঠ।** (II) **সমষ্টিগতভাবে পাঠ।**

এককভাবে পাঠ করলে জীববিদ্যাকে আবার নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(i) **মরফোলজি বা অঙ্গসংস্থানবিদ্যা** (Morphology) ঃ এই বিভাগে জীবদেহের বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এটি আবার কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত ; যেমন—

(a) **বাহ্যিক অঙ্গসংস্থান** (External morphology) ঃ এই বিভাগে জীবদেহের বাহ্যগঠন, আকার, আয়তন প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

(b) **অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান** (Anatomy) ঃ জীবদেহের অন্তর্গঠন সম্বন্ধে এই বিভাগে আলোচনা করা হয়।

(c) **কলাস্থানবিদ্যা** (Histology) ঃ জীবদেহের বিভিন্ন কলার অবস্থান, গঠন, কার্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করে এই বিভাগ।

(d) **কোষতত্ত্ব** (Cytology) ঃ জীবদেহের গঠন ও কার্যসম্বন্ধীয় একক কোষের বিভিন্ন বিষয় এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

(ii) **ফিজিওলজি** বা **শারীরবিদ্যা** (Physiology) ঃ জীবদেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার আলোচনা করা হয় এই বিভাগে।

(iii) **এমব্রায়োলজি** বা **ভ্রূণতত্ত্ব** (Embryology) ঃ জীবের ভ্রূণের গঠন-প্রকৃতি, পরিপূর্ণতা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এই বিভাগে।

(iv) **প্যাথোলজি** বা **রোগনিরূপণবিদ্যা** (Pathology) ঃ এই বিভাগে জীবদেহের বিভিন্ন প্রকার রোগের লক্ষণ, কারণ, প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

জীবজগৎকে সামগ্রিকভাবে পাঠ করলেও জীববিদ্যাকে নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(i) **শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যা** বা **ট্যাক্সোনোমি** (Taxonomy) ঃ এতে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিশেষ বিশেষ গঠন-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়।

(ii) **বাস্তুসংস্থান** বা **ইকোলজি** (Ecology) ঃ এতে পরিবেশের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

(iii) **প্রত্নজীববিদ্যা** বা **প্যালিওণ্টোলজি** (Palaeontology) ঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবদের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ সম্পর্কিত বিদ্যা।

(iv) **পরজীবীবিদ্যা** বা **প্যারাসাইটোলজি** (Parasitology) ঃ এতে পরজীবী উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়।

(v) **সুপ্রজননবিদ্যা** বা **জেনেটিক্স** (Genetics) ঃ বংশগতি সম্পর্কিত বিদ্যা।

(vi) **জৈব অভিব্যক্তি** বা **অরগ্যানিক ইভলিউশান** (Organic evolution) ঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরলতম জীব থেকে ধীরে ধীরে বর্তমান যুগের জটিল জীব সৃষ্টি সম্পর্কিত যে বিশেষ জ্ঞান।

(vii) **মনস্তত্ত্ববিদ্যা** বা **সাইকোলজি** (Psychology) ঃ এতে প্রাণীর মানসিক অবস্থা ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়।

(viii) **সমাজবিদ্যা** বা **সোসিওলজি** (Sociology)ঃ প্রাণী তথা মানুষের সমাজ সম্পর্কিত বিদ্যা।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত জীববিদ্যারও দুটি প্রধান দিক আছে—**বিশুদ্ধ জীববিদ্যা** (Pure Biology) এবং **ফলিত জীববিদ্যা** (Applied Biology)। জীববিদ্যার যেদিক কেবলমাত্র বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করে, তাকে **বিশুদ্ধ জীববিদ্যা** বলে এবং বিশুদ্ধ জীববিদ্যায় সংগৃহীত তত্ত্ব ও তথ্যগুলি যখন মানবকল্যাণে প্রয়োগ হয়, তখন তাকে **ফলিত জীববিদ্যা** বলে।

বিশুদ্ধ জীববিদ্যা ঃ **অঙ্গসংস্থান বিদ্যা** (Morphology), শারীরবিদ্যা (Physiology), ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology), রোগনিরূপণবিদ্যা (Pathology), **শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যা** (Taxonomy), **বাস্তুসংস্থান** (Ecology), **প্রত্নজীববিদ্যা** (Palaeontology), **সুপ্রজননবিদ্যা** বা **বংশগতিবিদ্যা** (Genetics), **অভিব্যক্তি** (Evolution) প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত।

ফলিত জীববিদ্যাকে প্রাথমিক পর্যায়ে **ফলিত উদ্ভিদবিদ্যা** (Applied Botany) এবং **ফলিত প্রাণিবিদ্যা** (Applied Zoology)—এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

ফলিত উদ্ভিদবিদ্যা ঃ **কৃষিবিদ্যা** (Agriculture), **উদ্যানবিদ্যা** (Horticulture), **বনসংরক্ষণ বিদ্যা** (Forestry), **ভেষজবিদ্যা** (Pharmacognosy), **অণুজীববিদ্যা** (Microbiology) প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত।

ফলিত প্রাণিবিদ্যা ঃ **মৎস্যচাষ** (Pisciculture), **রেশমচাষ** (Sericulture), **মক্ষিকাচাষ** (Apiculture), **লাক্ষাচাষ** (Lac culture), **মুক্তাচাষ** (Pearl culture), **পরজীবীবিদ্যা** (Parasitology), **পতঙ্গবিদ্যা** (Entomology) প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত।

1.6. জীববিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক (Relationship of Biology with other branches of Science)

জীববিদ্যার পরিধি নিশ্চিতরূপে সীমাবদ্ধ, কিন্তু এর সম্যক সার্থক জ্ঞানের জন্য রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের মত মূলশাস্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন। জীববিদ্যা সমস্ত শাস্ত্রেরই সাহায্য নিয়ে থাকে, কারণ সকল বিদ্যার মূল কথা হল জীবনকে সার্থক করা। জীববিদ্যা নানাভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে নতুন নতুন বিদ্যার জন্ম দিয়েছে। সুতরাং জীববিদ্যাও একটা মূল বিজ্ঞানশাস্ত্র। চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, পশু চিকিৎসাবিদ্যা, মৎস্যচাষ এগুলিও জীববিদ্যারই অংশ। জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত একক হচ্ছে কোষ। কোষের প্রোটোপ্লাজমের গঠন ও ধর্ম রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রানুসারে নিয়ন্ত্রিত। এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জন্ম দিয়েছে বিজ্ঞানের নতুন দুটি শাখার—**জৈব রসায়ন** (Bio-Chemistry) ও **জৈব পদার্থবিদ্যার** (Bio-Physics)। সুতরাং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে জীববিদ্যা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

নিচে জীববিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

1. **জৈব রসায়ন** (Bio-Chemistry) ঃ রসায়ন বিদ্যার সহযোগে গঠিত জীববিজ্ঞানের বিশেষ শাখাকে **জৈব রসায়ন** বলে। জীববিজ্ঞানের এই শাখায় জীবকোষস্থ প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক প্রকৃতি, ধর্ম, রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ, হরমোন, উৎসেচক প্রভৃতির রাসায়নিক গঠন, প্রকৃতি, ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়।

2. **জৈব পদার্থবিদ্যা** (Bio-Physics) ঃ পদার্থবিদ্যার সহযোগে গঠিত জীব-বিজ্ঞানের শাখাকে **জৈব পদার্থবিদ্যা** বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, স্নায়ুর মধ্য দিয়ে উদ্দীপনা প্রেরণ পদ্ধতি, তড়িৎপ্রবাহের মূলনীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। এটি পদার্থবিদ্যার সূত্রানুসারে নিয়ন্ত্রিত। তাছাড়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার পদার্থবিদ্যারই অবদান। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র হল জীববিজ্ঞানের গবেষণার একটি মূল হাতিয়ার।

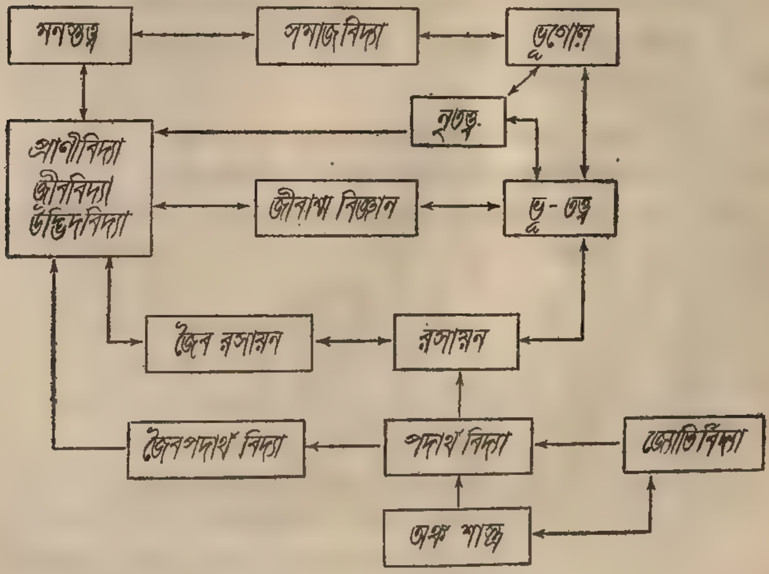

চিত্র 1.5 ঃ জীববিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক।

3. জীবপরিসংখ্যানবিদ্যা (Biometrics) ঃ জীব পরিসংখ্যানবিদ্যা জীব-বিজ্ঞানের এমন এক বিশেষ শাখা, যা পরিসংখ্যানবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই বিশেষ বিদ্যার সাহায্যে জীববিজ্ঞানের সমস্ত পরিসংখ্যানের তথা পরিমাণের ব্যাখ্যা করা হয়।

4. **জৈব-ভূগোল** (Bio-Geography) ঃ ভূ-বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

জীববিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখা বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে জীবের বিস্তার ও জীবের উপর তার প্রভাব ব্যাখ্যা করে।

5. **নৃতত্ত্ব** (Anthropology)ঃ জীববিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখা মানুষের উৎপত্তি, বিবর্তনের ধারা, মানব-সভ্যতার প্রকৃতি, মানুষের সামাজিক চেতনা প্রভৃতি বিষয়ে জানতে সাহায্য করে।

6. **সমাজবিদ্যা** (Sociology)ঃ মানুষের সামাজিক চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত জীববিজ্ঞানের এই শাখায় সমাজ সম্পকীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

7. **প্রত্নজীববিদ্যা** (Palaeontology)ঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম জীবের দেহ বা দেহাংশের পাললিক শিলাস্তরে রক্ষিত প্রস্তরীভূত অবস্থাকে **জীবাশ্ম** (Fossil) বলে। জীবাশ্ম সম্পর্কিত জীববিজ্ঞানের শাখাকে **প্রত্নজীববিদ্যা** বলে, যা জীববিবর্তনের ধারাকে নির্দেশ করে।

8. **মনস্তত্ত্ব** (Psychology)ঃ মানুষের মানসিক সংগঠন ও তার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কিত জীববিজ্ঞানের বিশেষ শাখা।

9. **জীববাস্তুবিদ্যা** (Bio-Engineering)ঃ জীববিজ্ঞানের এই শাখায় জীব-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন বাস্তুবিদ্যার মূলনীতির দ্বারা আলোচিত হয়।

10. **জীববৈদ্যুতিন** (Bionics)ঃ জীববিজ্ঞানের এই শাখা জীববিদ্যা ও ইলেকট্রনিক্সের সমন্বয়ে গঠিত।

1.7. জীববিজ্ঞানের পরিধি, গুরুত্ব ও প্রয়োগ
(Scope, importance and application of Biology)

জীববিজ্ঞান—বিজ্ঞানের একটা উল্লেখযোগ্য শাখা এবং এতে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। তাই আপাতদৃষ্টিতে জীববিজ্ঞানের পরিধি সঙ্কীর্ণ বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু এই পৃথিবীতে জীব বলতে যা বোঝায়, তার বেশীর ভাগই উদ্ভিদ ও প্রাণী। আর এই জীবজগতের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে উন্নত। তাই মানুষের প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের বিচারে কোন বিষয়ের মূল্যায়ন হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে মানুষের বহুমুখী প্রয়োজনের অনেকটাই মেটাচ্ছে জীববিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের নানা কলাকৌশল ও ব্যবহারিক প্রয়োগ।

জীববিজ্ঞান ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

(i) **খাদ্যোৎপাদনে**ঃ ক্রমবর্ধমান খাদ্য-সমস্যা সমাধান করতে হলে চাই বেশী পরিমাণে খাদ্যোৎপাদন—যার জন্য জীববিজ্ঞানের বিশেষ ফলিত শাখা কৃষি-বিদ্যায় প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সুপ্রজননবিদ্যা ও তার কলাকৌশলের সাহায্যে আজকাল উচ্চ ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা, পাট, তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন ফলের আকার ও সংখ্যা বাড়ানো। তাছাড়া খাদ্য-শস্যদানা, বীজ, ফল ইত্যাদির আকার, গঠন, রঙ, স্বাদ প্রভৃতির গুণগত মানেরও উন্নতিসাধন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে মানিয়ে বসবাস করতে পারে এরূপ উদ্ভিদ প্রকার (variety) সৃষ্টি করার সুবাদে কৃষিক্ষেত্রে

জীববিজ্ঞানের অবদান অস্বীকার্য। তাছাড়া, স্বাভাবিকভাবে পরাগযোগ ঘটতে না দিয়ে অক্সিন (**IAA**—ইন্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড) নামক উদ্ভিদ হরমোন প্রয়োগ করে বীজহীন ফল উৎপন্ন করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে পার্থেনোকার্পি বলে। সব উদ্ভিদ সব রকম মাটিতে ভালভাবে জন্মায় না। সেজন্য উচ্চ ফলনশীল খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হলে নির্বাচন করতে হবে উপযুক্ত জমি। কি ধরনের গাছ কোন্ প্রকার মাটিতে ভালভাবে জন্মায়, তা নির্ণয় করা সম্ভব জীববিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে। **কীটতত্ত্ব** বা Entomology নামক জীববিজ্ঞানের বিশেষ শাখার চর্চার মাধ্যমে ফসলের বিভিন্ন রকম কীট-পতঙ্গের জীবনচক্র সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানা সম্ভব হয়েছে। ফলে কিভাবে এদের দমন করা যায়, সে সম্বন্ধে নানারকম কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করে প্রণোদিত প্রজনন (**induced breeding**) ঘটিয়ে খাদ্যোপযোগী মাছের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া, ডেয়ারী বা গো-মহিষ পালন ও পোল্ট্রী বা হাঁস-মুরগী পালন শিল্পে জীববিজ্ঞানের আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে প্রচুর পরিমাণে দুধ, ডিম, মাংস পাওয়া যাচ্ছে।

(ii) **রোগ প্রতিরোধেঃ** জটিল জীবনযাত্রার আবর্তে মানুষের রোগও বেড়ে চলেছে। জীববিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় মানুষের বিভিন্ন রোগের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ও অন্যান্য আণুবীক্ষণিক জীবের সম্পর্ক নিরূপিত হচ্ছে। এই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে এবং জীববিজ্ঞানের আর একটি শাখা 'ভেষজবিদ্যায়' লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। পেনিসিলিন, অরিওমাইসিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, টেরামাইসিন, অ্যাম্পিসিলিন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অব্যর্থ রোগজীবাণুনাশক জীবনদায়ী অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ তৈরি করা হয় বিভিন্ন ছত্রাক ও জীবাণুর দেহ থেকে। বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় উপক্ষার। যেমন—সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে উৎপন্ন ম্যালেরিয়া রোগের মহৌষধ কুইনাইন; আফিং গাছের কাঁচাফলের ত্বক থেকে উৎপন্ন মরফিন—ব্যথা-বেদনা উপশম ও গাঢ় নিদ্রার ঔষধ রূপে কার্যকর; সর্পগন্ধা গাছের মূল থেকে উৎপন্ন রেসারপিন—উচ্চ রক্তচাপ প্রশমনে কার্যকর ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রাণীর উপজাত পদার্থ থেকেও ঔষধ তৈরি করা হচ্ছে। যেমন—মৌমাছির বিষ থেকে এপিস, সাপের বিষ থেকে ল্যাকেসিস, পাগলা কুকুরের লালারস থেকে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রাণীর ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে অস্ত্রোপচার বিদ্যা ও শারীরবিদ্যা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করে তা মানুষের চিকিৎসায় কার্যকর করা হচ্ছে; সদ্য আবিষ্কৃত কোন ঔষধের গুণাগুণ এবং কার্যকারিতা বিভিন্ন প্রাণীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, তবে তা মানবদেহে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

(iii) **শিল্পোদ্যোগেঃ** বিভিন্ন শিল্পে জীববিজ্ঞানের অবদান আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জীববিজ্ঞানের বিশেষ শাখা **রেশম চাষ** বা **সেরিকালচার** বিভাগে ক্রমাগত গবেষণার ফলে আজ বিভিন্ন রকম রেশম মথ থেকে উন্নত মানের রেশম উৎপন্ন হচ্ছে; ফলে রেশম শিল্প সমৃদ্ধ হচ্ছে। জীববিজ্ঞানের সাহায্যে আজ অধিক ফলনশীল তুলা ও পাটের চাষ হচ্ছে, যা পাট ও তুলা শিল্পকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে তুলছে। বিশ্বের দরবারে ভারতের চায়ের বিশেষ মূল্য আছে। চা শিল্পে

ভারতের উন্নতির মূলে জীববিদ্যার বিশেষত উদ্ভিদবিদ্যা ও কীটতত্ত্বের জ্ঞান বিশেষভাবে সাহায্য করছে।

(iv) **বন ও প্রাণী সংরক্ষণে :** ঘর-বাড়ি তৈরি করতে, রেলের স্লিপার, নানা রকম আসবাবপত্র, জ্বালানি প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন রকম কাঠের প্রয়োজন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বন নষ্ট হয়। সুতরাং বনসম্পদ রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন বনভূমির রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন বৃক্ষ রোপণ। এ ব্যাপারে উদ্ভিদবিদ্যার জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। অবলুপ্তপ্রায় বহু মূল্যবান প্রাণীর যথাযথ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও জীববিজ্ঞানীদের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

(v) **পরিবেশ সংরক্ষণে :** আমাদের তথা সমস্ত জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন পরিবেশ সংরক্ষণ। যথাযথভাবে আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণ হচ্ছে না বলে আমাদের জীবন নানাভাবে বিপন্ন হচ্ছে। কলকারখানার দূষিত রাসায়নিক পদার্থ নদনদী, খালবিলের জলকে করছে কলুষিত। কলকারখানার ধোঁয়া, যানবাহনের ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলকে করছে দূষিত। এভাবে প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষিত হতে থাকলে মনুষ্যজাতির সমূহ বিপদ। জনসাধারণকে এই বিপদ সম্পর্কে সজাগ করে দেওয়ার দায়িত্ব জীববিজ্ঞানীদের।

(vi) **তৈল সন্ধানে :** প্রয়োজনের তুলনায় প্রাকৃতিক তেলের সরবরাহ এত সীমিত যে, আজ মানব-সভ্যতা ভীষণভাবে বিপদগ্রস্ত। প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাসের সন্ধানে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যথা—**প্রত্নজীববিদ্যা** (Palaeontology), **রেণুবিজ্ঞান** (Palynology) ইত্যাদি নানাভাবে সাহায্য করছে।

(vii) **অবসর বিনোদনে :** অবসর ও চিত্ত বিনোদনে জীববিজ্ঞানের দান অনস্বীকার্য। আমাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য প্রয়োজন বর্ণাঢ্য পুষ্প ও লতাগুল্ম শোভিত উদ্যান। জীববিজ্ঞানের একটি শাখা **উদ্যানবিজ্ঞান** (Horticulture)-এর সম্যক জ্ঞান এ ব্যাপারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়া চিত্ত বিনোদনের অন্যান্য উপায় হিসেবে আছে চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি। এগুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার।

(viii) **চন্দ্রলোক অভিযানে :** চন্দ্রলোকে অভিযান করার সময় মহাকাশচারীরা ক্লোরেলা (Chlorella) নামক এক ধরনের সবুজ শৈবাল সঙ্গে রাখে। শুধু যে শৈবালেরা মহাকাশচারীদের খাদ্য যোগায় তা নয়, উপরন্তু সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে নির্গত অক্সিজেন গ্যাস মহাকাশচারীদের শ্বসনে কাজ করে।

1.8. জীববিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্য (Aims of studying Biology)

জীববিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাপক, যার কয়েকটির বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

(i) আমাদের পরিবেশের মধ্যে যে অজস্র গাছপালা, কীটপতঙ্গ ও পশুপাখি আছে তাদের সম্পর্কে স্বাভাবিক আগ্রহ ও কৌতূহল চরিতার্থ করা।

(ii) পরিবেশের প্রতিটি জীব ও জড় পদার্থকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতা

ও অভ্যাস অর্জন করা এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য আহরণে অভ্যস্ত হওয়া।

(iii) পৃথিবীর সমস্ত জীবের মধ্যেই যে জীবনের একই মৌলরূপ ও প্রকৃতি রয়েছে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া।

(iv) পৃথিবীর পরিবেশের মূল পাঁচটি উপাদান—মাটি, জল, বায়ু, আলো ও উষ্ণতা—এগুলির সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং এগুলির কোন একটা দূষিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে, বাকী উপাদানগুলি এবং সর্বোপরি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে—সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

(v) আমাদের দেশের নিজস্ব গাছপালা, কীটপতঙ্গ পশুপাখি সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা এবং তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

(vi) মানুষসহ সমস্ত জীবজগৎ পৃথিবীতে যাতে স্বাভাবিকভাবে স্থায়ী ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সে বিষয়ে সচেতন হওয়া।

(vii) সামাজিক চেতনা বাড়ানো, অবসর ও চিত্ত বিনোদনের শিক্ষা নেওয়া, সৎ ও নিষ্ঠাবান হয়ে গড়ে ওঠার শিক্ষা নেওয়া। সর্বোপরি বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি, বিজ্ঞানসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা জীববিদ্যা পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য।

1.9 উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য (Difference between Plants and Animals)

উদ্ভিদ	প্রাণী
1. উদ্ভিদদেহের আকৃতি নির্দিষ্ট নয় অর্থাৎ দেহ বিষম।	1. প্রাণিদেহের আকৃতি নির্দিষ্ট অর্থাৎ দেহ সুষম।
2. উদ্ভিদদেহ সাধারণত শাখা-প্রশাখার দ্বারা গঠিত।	2. প্রাণিদেহ সাধারণত শাখা-প্রশাখার দ্বারা গঠিত নয়।
ব্যতিক্রম ঃ নারিকেল, খেজুর ইত্যাদি উদ্ভিদ।	**ব্যতিক্রম ঃ** ওবেলিয়া (*Obelia*)।
3. উদ্ভিদ মাটির সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধভাবে আটকে থাকে, তাই সাধারণ অবস্থায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পারে না।	3. প্রাণীরা কোথাও দৃঢ়বদ্ধভাবে আটকে থাকে না, তাই সাধারণ অবস্থায় স্বচ্ছন্দেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পারে।
ব্যতিক্রম ঃ ক্ল্যামাইডোমোনাস, ভলভক্স (*Chlamydomonas, Volvox*) ইত্যাদি শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ।	**ব্যতিক্রম ঃ** প্রবাল (Coral), স্পঞ্জ (Sponge) ইত্যাদি প্রাণী।
4. উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে স্পষ্ট শ্রমবিভাগ দেখা যায় না।	4. প্রাণীদের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে স্পষ্ট শ্রমবিভাগ দেখা যায়।
5. উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগ সারা জীবন বৃদ্ধি পায়।	5. প্রাণীদের পরিণত বয়সে কোনও বৃদ্ধি হয় না।

উদ্ভিদ	প্রাণী
6. সকল উন্নত উদ্ভিদই নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরি করে, তাই তারা স্বভোজী (Autophyte)।	6. প্রাণীরা নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরি করতে পারে না, তাই তারা পরভোজী (Heterophyte)।
ব্যতিক্রম : ক্লোরোফিলবিহীন উদ্ভিদ যেমন, ছত্রাক।	**ব্যতিক্রম :** **ইউগ্লিনা** (*Euglena*)।
7. উদ্ভিদ তরল ও গ্যাসীয় খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে।	7. প্রাণীরা কঠিন খাদ্য গ্রহণ করে।
ব্যতিক্রম : পতঙ্গভুক কলস উদ্ভিদ।	**ব্যতিক্রম :** পরজীবী প্রাণী।
8. পরিপাকের পর খাদ্যবস্তুর কোন কঠিন অবশিষ্টাংশ থাকে না।	8. পরিপাকের পর খাদ্যবস্তুর কঠিন অবশিষ্টাংশ থাকে।
9. শ্বসন, রেচন ইত্যাদির জন্য কোন নির্দিষ্ট অঙ্গ উদ্ভিদের দেহে থাকে না।	9. শ্বসন, রেচন ইত্যাদির জন্য প্রাণীদের দেহে নির্দিষ্ট অঙ্গ থাকে। **ব্যতিক্রম :** আদ্য প্রাণী মনোসিস্টিস (*Monocystis*), অ্যামিবা (*Amœba*) ইত্যাদি।
10. উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ভ্রূণ বীজের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে।	10. প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভ্রূণ কখনও সুপ্ত অবস্থায় থাকে না।
11. উদ্ভিদের দেহে কোন স্নায়ুতন্ত্র নেই।	11. প্রাণীদের দেহে স্নায়ুতন্ত্র আছে। **ব্যতিক্রম :** আদ্য প্রাণী ও ছিদ্রাল প্রাণী।
12. উদ্ভিদে কার্বোহাইড্রেট খাদ্যবস্তু শ্বেতসাররূপে সঞ্চিত থাকে। কিন্তু ছত্রাকের ক্ষেত্রে থাকে গ্লাইকোজেন রূপে।	12. সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট খাদ্যবস্তু প্রাণিদেহে থাকে গ্লাইকোজেন রূপে।

1.10. উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরশীলতা
(Interdependence of Plants and Animals)

উদ্ভিদ ও প্রাণীর আকৃতিগত ও জীবনযাপনে অনেক পার্থক্য থাকলেও এরা একে অন্যের সাহায্য ছাড়া স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে না, এরা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হল :

(i) খাদ্যের জন্য তৃণভোজী প্রাণী উদ্ভিদের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। কলস উদ্ভিদ, ঝাঁঝি ইত্যাদি পতঙ্গভুক উদ্ভিদেরা আবার পতঙ্গদের দেহ থেকে খাদ্য

গ্রহণ করে। প্রাণিদেহ নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থ এবং ওদের গলিত দেহাবশেষ মাটিতে মিশে যাবার ফলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে; ঐ যে নাইট্রোজেন উদ্ভিদেরা শোষণ করে নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্য তৈরি করে।

(ii) শ্বসন পদ্ধতির সময় উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই O_2 গ্রহণ করে এবং CO_2 ত্যাগ করে। ফলে বাতাসে CO_2-এর পরিমাণ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু উদ্ভিদেরা সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে বাতাস থেকে CO_2 গ্রহণ করে এবং O_2 ত্যাগ করে। ফলে বাতাসে O_2 এবং CO_2-এর ভারসাম্য বজায় থাকে। বাতাস দূষিত হয়ে প্রাণীর শ্বসনে বিঘ্ন ঘটায় না।

(iii) বিভিন্ন কীটপতঙ্গ উদ্ভিদের পরাগযোগে, ফল ও বীজ বিস্তারে সাহায্য করে, তার পরিবর্তে ওরা ফুলের মধু ও অন্যান্য সামগ্রী খাদ্য হিসেবে পেয়ে উপকৃত হয়।

(iv) ব্যাকটিরিয়া প্রাণী ও মানুষের পৌষ্টিক নালীতে থেকে বিপাকে ও খাদ্যপ্রাণ সংশ্লেষে কাজ করে। তার পরিবর্তে ব্যাকটিরিয়া পৌষ্টিক নালীর মধ্যস্থিত অজীর্ণ খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। দুটি জীবের এ ধরনের পরস্পর নির্ভরশীলতাকে বলে **কমেন্সালিজম্** বা **ব্যতিহার**।

(v) আম, জাম, লিচু ইত্যাদি গাছে পিঁপড়েরা বসবাস করে এবং পাতার রস খেয়ে নিজেদের জীবন কাটায়। ঐসব দংশক পিঁপড়েরা গাছগুলিকে শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করে। গাছ যেমন একদিকে এদের আশ্রয় ও খাদ্য যোগায় অন্য দিকে তেমনি পিঁপড়েরা সৈনিকের কাজ করে গাছগুলিকে রক্ষা করে। উদ্ভিদের এরূপ আত্মরক্ষার কৌশলকে বলে **সহকৃতি** (myrmecophily)।

● বিষয়-সংক্ষেপ ●

1. জীবনের কয়েকটি সংজ্ঞা হল—
(a) জীব ও তার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতা এবং সেই ক্রিয়াশীলতার বহিঃপ্রকাশই হল জীবন। (b) সজীব বস্তুর জটিল গতি-প্রকৃতির সংগঠিত বিশেষ অবস্থাই হল জীবন। (c) প্রজনন, জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু ও বৈবর্তনিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত কোষীয় জটিল জৈব যৌগের ক্রিয়াশীলতাই হল জীবন।
2. জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—
(a) আকার ও আয়তন, (b) প্রোটোপ্লাজমের অস্তিত্ব, (c) উত্তেজিতা, (d) অভিযোজন ক্ষমতা, (e) চলন ও গমন, (f) বৃদ্ধি, (g) বিপাক, (h) ছন্দোবদ্ধতা, (i) জনন, (j) জরা ও মৃত্যু, (k) জীবনচক্র, (l) পরিবৃত্তিতা, (m) জৈব অভিব্যক্তি।
3. আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী উদ্ভিদবিদ্যা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত; যথা—
(i) ব্যাকটিরিওলজি, (ii) অ্যাগ্রোস্টোলজি, (iii) ডেন্ড্রোলজি, (iv) মাইকোলজি, (v) প্যালিওবোটানি।
4. আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী প্রাণিবিদ্যা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত; যথা—
(i) প্রোটোজুলজি, (ii) হেলমিনথোলজি, (iii) এন্টোমোলজি, (iv) ম্যালাকোলজি, (v) ইকথিওলজি, (vi) অরনিথোলজি।

5. পাঠের পদ্ধতি অনুসারে জীববিদ্যাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (a) **জীবদের এককভাবে পাঠ**, (b) **সমষ্টিগতভাবে পাঠ।**

5. পাঠের পদ্ধতি অনুসারে জীববিদ্যাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা— (i) মরফোলজি বা অঙ্গসংস্থানবিদ্যা, (ii) ফিজিওলজি বা শারীরবিদ্যা, (iii) এমব্রায়োলজি বা ভ্রূণতত্ত্ব, (iv) প্যাথোলজি বা রোগনিরূপণবিদ্যা।

সামগ্রিকভাবে পাঠকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা— (i) ট্যাক্সোনোমি, (ii) ইকোলজি, (iii) প্যালিওণ্টোলজি (iv) প্যারাসাইটোলজি, (v) জেনেটিক্স, (vi) অরগ্যানিক ইভলিউশান, (vii) সাইকোলজি, (viii) সোসিওলজি।

6. জীববিজ্ঞান ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি হল— (i) খাদ্যোৎপাদনে, (ii) রোগ প্রতিরোধে, (iii) শিল্পোদ্যোগে, (iv) বন ও প্রাণী সংরক্ষণে, (v) পরিবেশ সংরক্ষণে, (vi) তৈল সন্ধানে, (vii) অবসর বিনোদনে, (viii) চন্দ্রলোক অভিযানে।

7. জীববিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্যগুলি হল—
   (i) পরিবেশের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্পর্কে স্বাভাবিক আগ্রহ ও কৌতূহল চরিতার্থ করা।
   (ii) পরিবেশের প্রতিটি জীব ও জড় পদার্থের সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য আহরণে অভ্যস্ত হওয়া।
   (iii) পৃথিবীর সমস্ত জীবের জীবনের একই মৌলরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
   (iv) পরিবেশের মূল পাঁচটি উপাদানের সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
   (v) আমাদের দেশের নিজস্ব গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা এবং তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা।
   (vi) মানুষসহ সমস্ত জীবজগৎ পৃথিবীতে যাতে স্বাভাবিকভাবে স্থায়ী ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সে বিষয়ে সচেতন হওয়া।
   (vii) সামাজিক চেতনা বাড়ানো, অবসর ও চিত্ত বিনোদনের শিক্ষা নেওয়া, সৎ ও নিষ্ঠাবান হওয়ার শিক্ষা নেওয়া, সর্বোপরি বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি, বিজ্ঞানসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা।

অনুশীলনী

(A) দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Long Answer type questions) :

1. জীবন কি? জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর। [উঃ 1·2 ও 1·3 দেখ]
2. জীববিজ্ঞানের প্রধান বিভাগগুলি কি কি? [উঃ 1·5 দেখ]
3. জীববিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক নির্দেশ কর। [উঃ 1·6 দেখ]

4. জীববিজ্ঞানের পরিধি, গুরুত্ব ও ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে উল্লেখ কর। [উঃ 1·7 দেখ]
5. জীববিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্যগুলি কি কি? [উঃ 1·8 দেখ]
6. উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উঃ 1·10 দেখ]

(B) **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer type questions) :**

7. বায়োলজি (Biology) শব্দটি কে প্রথম প্রবর্তন করেন? [উঃ 1·1 দেখ]
8. বিপাক কাকে বলে? জীবের কয়েকটি বিপাক পদ্ধতি উল্লেখ কর। [উঃ 1·3 দেখ]
9. আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যাকে কয়টি ও কি কি ভাগে ভাগ করা যায়? [উঃ 1·5 দেখ]
10. জীববিদ্যাও একটি মূল বিজ্ঞান শাস্ত্র—আলোচনা কর। [উঃ 1·6 দেখ]
11. বর্তমানে ক্রমবর্ধমান খাদ্য-সমস্যা সমাধানে জীববিদ্যার ভূমিকা উল্লেখ কর। [উঃ 1·7 দেখ]
12. পরিবেশ সংরক্ষণের অভাবে আমাদের জীবন কিভাবে বিপন্ন হচ্ছে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও। [উঃ 1·7 দেখ]
13. "অবসর ও চিত্ত বিনোদনে জীববিজ্ঞানের দান অনস্বীকার্য"—যথার্থতা নিরূপণ কর। [উঃ 1·7 দেখ]
14. ক্লোরেলা কোন্ ধরনের উদ্ভিদ? জীববিজ্ঞানে এর ভূমিকা কি? [উঃ 1·7 দেখ]
15. পরিবেশের মূল উপাদানগুলি কি কি? এই উপাদানগুলির সঙ্গে আমরা কিভাবে জড়িত? [উঃ 1·8 দেখ]
16. কমেন্সালিজম্ বা ব্যতিহার কি? উদাহরণ দাও। [উঃ 1·10 দেখ]
17. মির্মিকোফিলি (Myrmecophily) বা সহকৃতি কথাটির অর্থ কি? উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দাও। [উঃ 1·10 দেখ]

(C) **পার্থক্য নির্দেশ কর (Differences between) :**

18. (ক) উপচিতি ও অপচিতি। [উঃ 1·3 দেখ]
(খ) রেচন ও ক্ষরণ। [উঃ 1·3 দেখ]
(গ) অ্যাগ্রোস্টোলজি ও ম্যালাকোলজি। [উঃ 1·5 দেখ]
(ঘ) ইকোলজি ও মাইকোলজি। [উঃ 1·5 দেখ]
(ঙ) চলন ও গমন। [উঃ 1·3 দেখ]

(D) **টীকা লেখ (Write notes on) :**

19. (ক) পরিব্যক্তিতা (Mutability)। [উঃ 1·3 দেখ]
(খ) জৈব অভিব্যক্তি (Organic evolution)। [উঃ 1·5 দেখ]
(গ) বন ও প্রাণী সংরক্ষণ। [উঃ 1·7 দেখ]
(ঘ) চন্দ্রলোক অভিযান। [উঃ 1·7 দেখ]
(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ। [উঃ 1·7 দেখ]

কোষের গঠন

[CELL STRUCTURE]

2

Syllabus : (a) Prokaryotic cell : Definition and examples—Bacterium & Blue-green alga.

(b) Eukaryotic cell : Definition and examples—Plant cell and animal cell ; Structure in outline and functions (in brief) of the following—cell wall and cell membrane, cytoplasm, vacuoles, membrane bound organelles, i.e., nucleus, ribosomes, plastids and golgi bodies, Mention only :—endoplasmic reticulum, mitochondria, lysosome, centriole and micro-tubules.

Ergastic substances :—Starch grains, glycogen, fat droplets, zymogen granules.

(c) Differences between prokaryotic and eukaryotic cells ; mention only—(i) Plastids, (ii) nuclear membrane, (iii) chromosome,

(d) Functions : Diffusion, osmosis, water and ion absorption (mechanism of ion absorption is not required),

2.1. সূচনা (Introduction)

এই পৃথিবীতে যে নানা ধরনের অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখা যায় তাদের প্রত্যেকের দেহই 'কোষ' দিয়ে তৈরি ; এমনকি মানুষের দেহও অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত। সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু বিজ্ঞানীর নিরলস সাধনার ফলে 'কোষ' সম্পর্কে বহু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। অধিকাংশ কোষের আকৃতিই এত ছোট যে তাদের দেখার জন্য লেন্সের প্রয়োজন হয়। তাই লেন্সের সমন্বয়ে গঠিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলেই কোষ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোষ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

2.2. কোষ আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Brief history of cell discovery)

কোষ আবিষ্কারের পশ্চাৎপট হিসেবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ষোড়শ শতকের শেষভাগে (1590 খ্রীষ্টাব্দে) **জেড. জানসেন** ও **এইচ. জানসেন** (Z. Janssen and H. Janssen) নামে দুই ব্যক্তির প্রচেষ্টায় প্রথম কার্যকর অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। 1665 খ্রীষ্টাব্দে **রবার্ট হুক** (Robert Hooke) নামে একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী কোষের অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি কর্কের (Cork) ছিপির একটি সূক্ষ্ম ফালি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে লক্ষ্য করেন যে, তাতে মৌচাকের মত অসংখ্য প্রকোষ্ঠ রয়েছে। মৌচাকের ছোট ছোট প্রকোষ্ঠকে ইংরেজীতে বলা হয় 'সেল' (Cell)। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের

চিত্র 2.1 : রবার্ট হুক।

নিচে রবার্ট হুক যা লক্ষ্য করেন তার সঙ্গে মৌচাকের সেলের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায় তিনিই প্রথম ঐগুলির নাম দেন **'সেল'** বা **কোষ**। যেহেতু কর্কের ছিপি একটি মৃত পদার্থ, অতএব রবার্ট

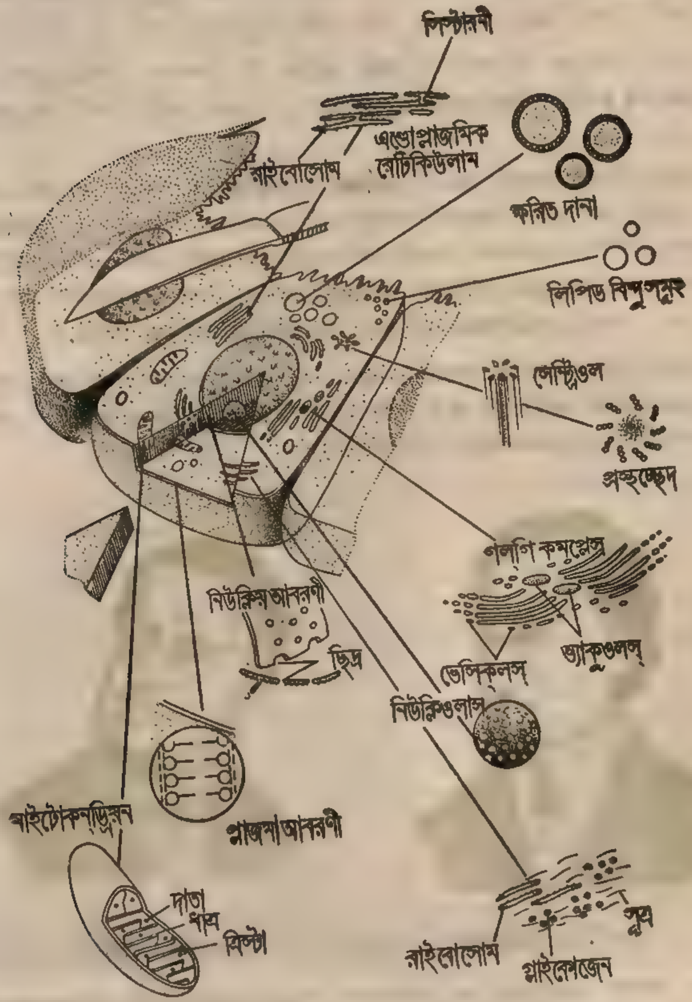

চিত্র **2.2 :** সমস্ত কোষীয় অঙ্গাণু সমেত একটি আদর্শ কোষের ছবি।
(ছবিতে কোষীয় অঙ্গাণুগুলিকে পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে।)

হুক যা দেখেছিলেন সেগুলি ছিল নিশ্চিতরূপেই মৃত কোষের প্রাচীর (cell wall)। তাদের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

লিউয়েনহক (Leewenhock) নামে সুইডেনের একজন বিজ্ঞানী তৎকালে প্রচলিত অণুবীক্ষণ

Acc no - 16612

যন্ত্রের কিছুটা উন্নতি ঘটিয়ে তার সাহায্যে 1674 খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকটিরিয়া, প্রোটোজোয়া, শুক্রাণু, রক্তকোষ ইত্যাদি অবলোকন করেন।

এই ঘটনার প্রায় দেড় শ' বছর পর 1824 খ্রীষ্টাব্দে **ডুট্রোশে** (Dutrochet) নামে ফরাসীদেশীয় একজন বিজ্ঞানী জানান যে, সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহই কোষ দ্বারা গঠিত।

1833 খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডবাসী **রবার্ট ব্রাউন** (R. Brown) উদ্ভিদকোষের ভিতর **নিউক্লিয়াসের** উপস্থিতি লক্ষ্য করেন এবং নিউক্লিয়াস যে কোষের একটি বিশিষ্ট অংশ, এই মত ব্যক্ত করেন।

1835 খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী **ফেলিক্স দুজারদিন** (F. Dujardin) সজীব কোষের ভিতর জেলির মত একটি অর্ধ-তরল পদার্থের অস্তিত্ব সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন। **পারকিনজে** (Purkinje, 1837) ঐ অর্ধ-তরল পদার্থের নাম দেন **প্রোটোপ্লাজম**। 1863 খ্রীষ্টাব্দে **সুলজ** (Schultz) প্রোটোপ্লাজমকে **'জীবনের পদার্থিক আধার'** (Physical basis of life) রূপে আখ্যা দেন। অর্থাৎ, প্রোটোপ্লাজমই সেই পদার্থ, যা 'জীবন'কে ধারণ করে রেখেছে।

এইভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর গবেষণার মাধ্যমে রবার্ট হুকের কোষ সম্পর্কে যে ধারণা হয়েছিল (জড় প্রাচীরবেষ্টিত ছোট ছোট শূন্য প্রকোষ্ঠ) তার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রোটোপ্লাজমের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়।

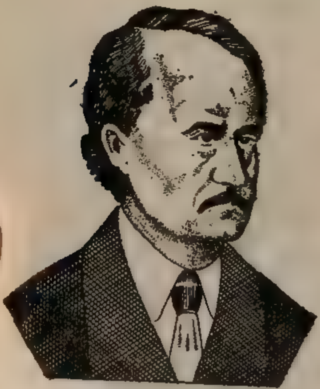

চিত্র 2.3 : শ্লেইডেন।

চিত্র 2.4 : শোয়ান।

কোষ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের নানা প্রকার জ্ঞান আহরণের ভিত্তিতে 1839 খ্রীষ্টাব্দে জার্মান-দেশীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী **শ্লেইডেন** (Schleiden) এবং প্রাণিবিজ্ঞানী **শোয়ান** (Schwann) **কোষ মতবাদ** (Cell Theory) ঘোষণা করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী : (i) প্রত্যেক জীবের দেহ এক বা একাধিক কোষ ও কোষ থেকে উদ্ভূত পদার্থ দ্বারা গঠিত ; (ii) বহুকোষী জীবের দেহে প্রতিটি কোষ এককভাবে সব রকমের জৈবনিক কাজ করার সক্ষম হলেও, দেহের স্বার্থে তারা যৌথভাবে নানা প্রকার কার্য সম্পাদন করে।

2.3. কোষের সংজ্ঞা (Definition of cell)

বিভিন্ন জীবকোষের মধ্যে নানারকমের পার্থক্য দেখা যায়। প্রায় সব কোষে নিউক্লিয়াস থাকলেও কিছু কিছু কোষ আছে (যেমন—স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পরিণত লোহিত রক্তকণিকা, উদ্ভিদের সীভনল ইত্যাদি) যাদের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে না। আবার, অধিকাংশ জীবের নিউক্লিয়াস একটি আবরণী দিয়ে ঘেরা থাকলেও ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবাল প্রভৃতির কোষে নিউক্লীয় বস্তুকে ঘিরে কোন আবরণী থাকে না। উদ্ভিদকোষের পরিধিতে জড় পদার্থ নির্মিত একটি কোষপ্রাচীর থাকলেও প্রাণিকোষে ঐরূপ কোন প্রাচীর সাধারণত দেখা যায় না। এইসব নানা ধরনের পার্থক্য থাকার জন্য কোষের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাই নানাভাবে কোষের সংজ্ঞা দেওয়া হয় ; যেমন—

(i) **জীবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপের একককে কোষ বলে।**

(ii) **আবরণীবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমের নাম কোষ।**

(iii) **আবরণীবেষ্টিত নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইটোপ্লাজমকে কোষ বলা হয়।**

(iv) **কোষ হচ্ছে জীবনের ক্ষুদ্রতম একক, যা আত্মনির্ভরশীল এবং বংশবৃদ্ধিতে সক্ষম।**

(v) ম্যাক্স সুলৎস (Max Schultz)-এর মতে, **কোষ হচ্ছে জীবনের প্রকাশ ঘটাবার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একখণ্ড প্রোটোপ্লাজম।**

(vi) কোষের আধুনিকতম সংজ্ঞা দিয়েছেন লোয়ি ও সীকেভিজ (Lowey and Siekevitz) নামে দুজন কোষবিজ্ঞানী। তাঁদের মতে, **কোষ একটি আংশিক ভেদ্য পর্দা দ্বারা সীমা নির্দেশিত জীবনের সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াকলাপের একটি একক, যা কোন সজীব মাধ্যম ব্যতিরেকেই বংশবৃদ্ধি করতে পারে।**

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, ব্যাকটিরিয়াকে অবশ্যই একটি কোষ বলা যেতে পারে, কিন্তু ভাইরাস কোষরূপে গ্রাহ্য নয়—কেননা, ভাইরাসের দেহে কোন আংশিক ভেদ্য পর্দা থাকে না এবং কোন সজীব মাধ্যমের (পোষক কোষের) ভিতরে অবস্থান না করলে এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে না।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভাইরাসদের দেহ কোষ দ্বারা গঠিত না হলেও, তাদের মধ্যে জীবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, যথা—বংশবৃদ্ধি, মিউটেশন ইত্যাদির ক্ষমতা বর্তমান। এই কারণে ভাইরাসদের **কোষবিহীন জীব** বলা হয়।

2.4. কোষ অঙ্গাণু ও কোষস্থ অজীবীয় বস্তু (Cell organelles and Cell inclusions)

প্রথম দৃষ্টিতেই প্রায় প্রতিটি কোষের মধ্যে যে গোলাকার অংশটি সুস্পষ্টরূপে চোখে পড়ে তার নাম **নিউক্লিয়াস** (চিত্র 2.5) ও বাকী অংশটুকুর নাম **সাইটোপ্লাজম**।

সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কতকগুলি গঠন বা অংশ থাকে, যেগুলি কোষের পক্ষে প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক জৈবনিক কার্য করে। এদের অধিকাংশের দেহই লাইপোপ্রোটীন (লিপিড ও প্রোটীনের সমন্বয়ে গঠিত) পর্দা দিয়ে ঘেরা এবং এরা

প্রত্যেকেই সজীব। এদের **কোষ অঙ্গাণু** বা **কোষ উপাংশ** বলে। উদাহরণ—প্লাসটিড, মাইটোকনড্রিয়া, গলগি বডি, লাইসোসোম ইত্যাদি।

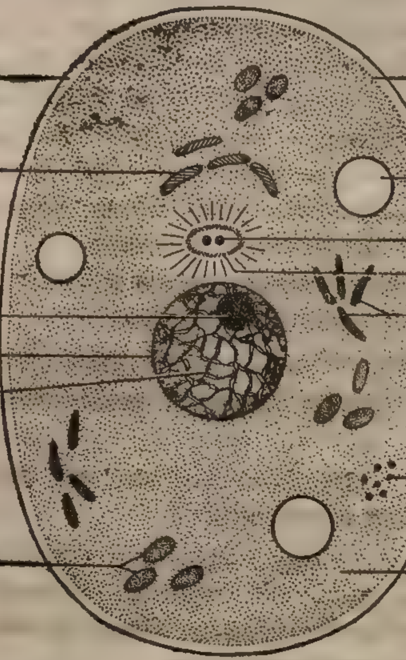

চিত্র 2.5 : একটি আদর্শ কোষ।

সাইটোপ্লাজমের মধ্যে নানা প্রকার সঞ্চিত পদার্থ, নিঃসৃত দানা, রঞ্জক পদার্থ ইত্যাদি থাকে। এদের **কোষস্থ অজীবীয় বস্তু** বলা হয়। এরা মৃত। এরা কোষের কোন নির্দিষ্ট জৈবনিক কার্য করে না, বা এমন কতকগুলি কাজ করে যা কোষের জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় নয়।

2.5. কোষ ও তার অঙ্গাণুর পরিমাপের একক
(Units of measurement of cell and its organelles)

অধিকাংশ কোষই এত ছোট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত তাদের দেখা যায় না। তাই কোষ ও কোষের অঙ্গাণুসমূহের পরিমাপের জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম কয়েকটি একক (unit) নির্ধারিত হয়েছে, যেমন—মাইক্রন (μ), মিলিমাইক্রন ($m\mu$), অ্যাংস্ট্রম (Å) ইত্যাদি। বর্তমানে অবশ্য মাইক্রনের পরিবর্তে মাইক্রোমিটার (μm) এবং মিলিমাইক্রনের পরিবর্তে ন্যানোমিটার (nm) ব্যবহার করা হয়। এইসব বিভিন্ন এককের পারস্পরিক সম্পর্ক নিচে উল্লেখ করা হল :

1 মাইক্রন
বা
1 মাইক্রোমিটার $\Big\} = \frac{1}{1,000}$ মিলিমিটার

$$\left.\begin{array}{l}1 \text{ মিলিমাইক্রন} \\ \text{বা} \\ 1 \text{ ন্যানোমিটার}\end{array}\right\} = \frac{1}{1,000} \text{ মাইক্রন} = \frac{1}{10,00,000} \text{ মি.মি.}$$

$$1 \text{ অ্যাংস্ট্রম} = \frac{1}{10} \text{ মিলিমাইক্রন} = \frac{1}{1,00,00,000} \text{ মি.মি.}$$

2.6. কোষের আকৃতি (Cell shape)

কোষের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। এটি গোল, চতুর্ভুজ, বহুভুজ, ঘনকাকার (cubical), স্তম্ভাকার (columnar), এমনকি সূচের মত লম্বা এবং সরুও হতে পারে। অর্থাৎ কোষের আকৃতির বৈচিত্র্যের শেষ নেই (চিত্র 2.6)। তবে অধিকাংশ কোষই গোল আকৃতিবিশিষ্ট—যেমন, বহু প্রাণীর ডিম, বহু ব্যাকটিরিয়া, ঈস্ট নামক ছত্রাক, মানুষের রক্তের লোহিত কণিকা ইত্যাদি। কিছু ব্যাকটিরিয়ার কোষ আবার দন্ড (rod), কমা (comma) অথবা সর্পিল (spiral) আকৃতির হতে পারে। অদ্ভুত আকৃতির কোষ দেখা যায় 'অ্যাসিটেবুলেরিয়া' (Acetabularia)

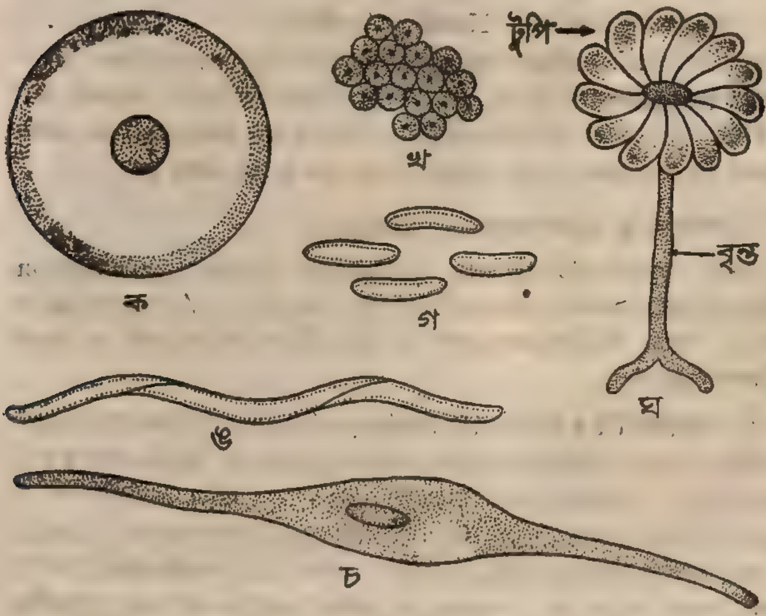

চিত্র 2.6 : বিভিন্ন আকৃতির কোষ। (ক) শামুকের ডিম ; (খ), (গ) ও (ঙ) যথাক্রমে গোলাকার, দন্ডাকার ও সর্পিলাকার ব্যাকটিরিয়ার কোষ ; (ঘ) অ্যাসিটেবুলেরিয়া ; (চ) অনৈচ্ছিক পেশী কোষ।

নামে একটি সামুদ্রিক শৈবালে। এদের দেহ একটিমাত্র কোষ দিয়ে তৈরি। ঐ কোষটি 9—10 cm উঁচু একটি বৃন্ত এবং তার মাথায় ছাতার মত একটি টুপি (cap) এবং গোড়ায় মূলের মত রাইজয়েড নিয়ে গঠিত। উদ্ভিদের মধ্যে এটাই সর্বাপেক্ষা বড় কোষ। বহুকোষী প্রাণীদের স্নায়ুকোষ ও পেশীকোষের আকৃতিও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এরা লম্বাটে ধরনের কোষ। এদের মধ্যে

নার্ভকোষগুলি আবার শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট। প্রায় প্রতি প্রকার কোষেরই একটি নির্দিষ্ট আকৃতি থাকলেও, অ্যামিবা ও রক্তের একপ্রকার শ্বেতকণিকার আকৃতির ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে।

2.7. কোষের আয়তন (Cell size)

আকৃতির ন্যায় কোষের আয়তনও বিভিন্ন প্রকারের হয়। অদ্যাবধি যত কোষের কথা জানা গেছে, তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম হচ্ছে **মাইকোপ্লাজমা (Mycoplasma)** নামে ব্যাকটিরিয়ার কোষ। **মাইকোপ্লাজমা লেডলাই** (*Mycoplasma laidlawii**) নামে মাইকোপ্লাজমার ক্ষুদ্রতম প্রজাতির কোষের ব্যাস 0·1 মাইক্রন। সর্বাপেক্ষা বড় কোষ হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নার্ভকোষ। শাখাপ্রশাখা সহ এদের দৈর্ঘ্য 1 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। বিভিন্ন পাখির ডিম নার্ভকোষের মত অত বড় না হলেও, জীবজগতের অধিকাংশ কোষের তুলনায় আয়তনে বেশ বড় হয়। পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ডিম হচ্ছে উটপাখীর—খোসাসহ তার দৈর্ঘ্য প্রায় 6 ইঞ্চি এবং খোসা ছাড়া দৈর্ঘ্য 3 ইঞ্চি।

তবে অল্প কয়েকটি ছাড়া প্রায় সব জীবকোষই আকারে খুব ছোট, এতই ছোট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তাদের দেখা যায় না।

2.8. কোষের সংখ্যা (Number of cells)

আদ্য প্রাণী (যেমন—**অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম** ইত্যাদির) এবং এককোষী উদ্ভিদ (যেমন—**ক্লামাইডোমোনাস, ক্লোরেলা** ইত্যাদির) দেহ একটিমাত্র কোষ দিয়ে গঠিত। বহুকোষী প্রাণী এবং উদ্ভিদের দেহে কোষের সংখ্যা তাদের আকৃতি ও আয়তনের উপর নির্ভর করে; যেমন—একজন 80 কিলো ওজনের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহকোষের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ কোটির মত।

2.9. কোষের প্রকারভেদ (Cell types)

বিজ্ঞানী ডগহার্টি (Dougherty) নিউক্লিয়াসের সংগঠনের (organization) ভিত্তিতে জীবজগতের সমস্ত কোষকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেন—(A) 'প্রোক্যারিওটিক কোষ' বা 'আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ' ও (B) 'ইউক্যারিওটিক কোষ' বা 'আদর্শ নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ'।

(A) প্রোক্যারিওটিক কোষ (Prokaryotic cells) : শক্তিশালী ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে জীবজগতে এই প্রকার কোষের অস্তিত্ব জানা সম্ভব হয়েছে। এই প্রকার কোষে নিউক্লীয় বস্তুকে ঘিরে কোন নিউক্লীয় পর্দা বা আবরণী থাকে না। ফলে নিউক্লীয় বস্তু সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে**। তাছাড়া, এই প্রকার কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাসটিড, গলগি বডি, লাইসোসোম প্রভৃতি বিশিষ্ট অঙ্গাণু থাকে না। অতএব, **যে কোষে নিউক্লীয় পর্দা ঘেরা সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস এবং মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাসটিড প্রভৃতি বিশিষ্ট কোষীয় অঙ্গাণু থাকে না,**

---

* এরা নর্দমার ময়লা জলে স্বাধীনজীবী জীব হিসেবে বাস করে। এদের চেয়ে আকারে সামান্য বড় মাইকোপ্লাজমার আর একটি প্রজাতি হচ্ছে 'মাইকোপ্লাজমা গ্যালিসেপটিকাম' (*M. gallisepticum*) ; এরা মুরগীর শ্বাসযন্ত্রে একপ্রকার রোগের সৃষ্টি করে।

** সাইটোপ্লাজমের যে অংশে নিউক্লীয় বস্তু ছড়ানো থাকে, নিউক্লীয় বস্তুসহ সেই অংশকে 'নিউক্লিয়য়েড (Nucleoid) বলে।

তাকে প্রোক্যারিওটিক কোষ বলে। উদাহরণ ঃ ব্যাকটিরিয়া ও নীলাভ-সবুজ শৈবাল (Blue-green algae) প্রভৃতি।

নিচে কয়েকটি প্রোক্যারিওটিক কোষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল ঃ

*1. **রিকেটসিয়া** (Rickettsia) **ঃ** বিজ্ঞানী **হাওয়ার্ড টেইলর রিকেটস** (Howard Taylor Ricketts)-এর সম্মানার্থে বিজ্ঞানী **দা রোচা লিমা** (da Rocha Lima) ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়ার মধ্যবর্তী জীব রিকেটসিয়া গণটির নামকরণ করেন।

জীবজগতে অবস্থান ঃ রিকেটসিয়া গণটি ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়ার মধ্যবর্তী একপ্রকার আদিম প্রকৃতির জীব।

আকার ও আকৃতি ঃ রিকেটসিয়া সাধারণত গোলাকার বা দন্ডাকার হয়। তবে জীবনচক্রে আকৃতির বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। রিকেটসিয়ার কোষ দৈর্ঘ্যে প্রায় 0·3μm—0·5μm হয়ে থাকে (চিত্র 2.7)।

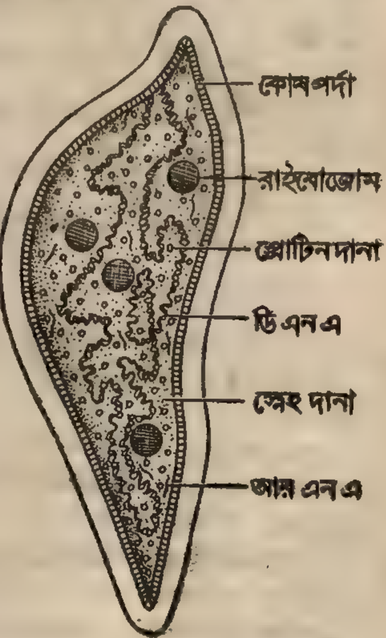

চিত্র 2.7 ঃ রিকেটসিয়া।

প্রকৃতি ঃ এরা ভাইরাসের মত পূর্ণপরজীবী এবং পোষক জীবকোষ ছাড়া অকোষীয় পোষক মাধ্যমে (culture medium) বংশবিস্তার করতে পারে না। এদের কোষে ব্যাকটিরিয়ার মত সাইটোপ্লাজম ও কোষপ্রাচীর বর্তমান। কোষপ্রাচীর শর্করা ও নাইট্রোজেনের যৌগ মিউকোপলিস্যাকারাইড দ্বারা গঠিত। কোষপ্রাচীরের বাইরের দিকে একটি পুরু আবরণী বা ক্যাপসুল বর্তমান। সাইটোপ্লাজমে DNA, RNA, উৎসেচক, সঞ্চিত খাদ্যবস্তু প্রভৃতি আছে। কিন্তু কোন সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস নেই।

বংশবিস্তার ঃ রিকেটসিয়া দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে।

*2. **মাইকোপ্লাজমা** (Mycoplasma) **ঃ জীবজগতে অবস্থান ঃ** মাইকোপ্লাজমা ব্যাকটিরিয়া-সদৃশ একপ্রকার আদিম প্রকৃতির জীব, তবে ব্যাকটিরিয়ার মত এদের কোষে কোন কোষপ্রাচীর থাকে না।

আকার ও আকৃতি ঃ এরা সাধারণত গোলাকার হয়, ব্যাস প্রায় 0·1μm—1·25μm হয়ে থাকে। **মাইকোপ্লাজমা লেডলাই** (*Mycoplasma laidlawii*) নামক প্রজাতির কোষের পরিমাপ প্রায় 0·1μm এবং এই কোষই জীবজগতের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কোষ। তবে এদের আকৃতি সর্বদাই পরিবর্তনশীল—অর্থাৎ এরা বিভিন্ন

* উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

পরিবেশে নিজেদের অঙ্গসংস্থান বা বাহ্যআকৃতির পরিবর্তন করতে পারে—এই বৈশিষ্ট্যকে **প্লিওমরফিজম** (**Pleomorphism**) বলে (চিত্র 2.8)।

প্রকৃতি : মাইকোপ্লাজমা স্বাধীনজীবী, মৃতজীবী বা পরজীবীরূপে বাস করে। এদের কোন কোষপ্রাচীর নেই, তাই সাইটোপ্লাজম শুধু কোষ পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। কোষে **DNA, RNA,** রাইবোসোম এবং প্রোটীন, স্নেহপদার্থ, শর্করা প্রভৃতি সঞ্চিত খাদ্যবস্তু বর্তমান। মাইকোপ্লাজমা যেহেতু প্রোক্যারিওট (প্রোক্যারিওটিক কোষযুক্ত জীবকে প্রোক্যারিওট বলে) তাই কোষে কোন সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস নেই। সাইটোপ্লাজমে বিপাকীয় কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক বর্তমান।

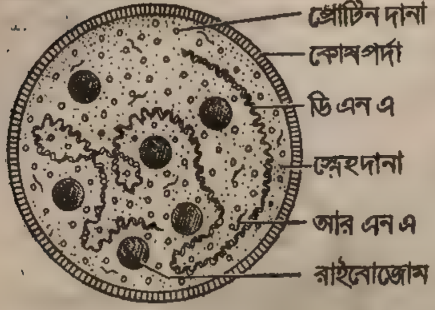

চিত্র 2.8 : মাইকোপ্লাজমা।

বংশবিস্তার : মাইকোপ্লাজমা সাধারণত দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে।

মাইকোপ্লাজমার একটি পরজীবী প্রজাতি মানুষের নিউমোনিয়া-সদৃশ রোগ সৃষ্টি করে বলে এদের **প্লুরোনিউমোনিয়া-সদৃশ জীব** (**Pleuropneumonia-like organism—PPLO**)-ও বলে।

3. **ব্যাকটিরিয়া** (**Bacteria**) **:** ব্যাকটিরিয়া একপ্রকার স্বভোজী বা পরভোজী আণুবীক্ষণিক জীব।

আকার ও আকৃতি : ব্যাকটিরিয়া বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে ; যথা—গোলাকার বা কক্কাস (**Coccus**), দণ্ডাকার বা ব্যাসিলাস (**Bacillus**), সর্পিলাকার বা স্পাইরিলাম (**Spirillum**) ও কমা (**Comma**) চিহ্নের মত বা কমা ব্যাসিলাস। এরা দৈর্ঘ্যে প্রায় $2\mu m$—$10\mu m$ এবং প্রস্থে গড়ে $0{\cdot}2\mu m$—$2\mu m$ পর্যন্ত হয়।

প্রকৃতি : অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া পরজীবী, কিছু সংখ্যক মৃতজীবী এবং স্বল্প সংখ্যক স্বভোজী ও মিথোজীবী হয়ে থাকে। পরজীবী বা মৃতজীবী ব্যাকটিরিয়া ক্লোরোফিলবিহীন, কিন্তু স্বভোজী ব্যাকটিরিয়ার দেহে ব্যাকটিরিও-ক্লোরোফিল নামক এক বিশেষ ধরনের রঙ্গক পদার্থ থাকে। ব্যাকটিরিয়ার কোষ চারদিকে মৃত কোষপ্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তবে এই কোষপ্রাচীর শর্করা ও নাইট্রোজেনের যোগ মিউকোপলিস্যাকারাইড দ্বারা গঠিত, উদ্ভিদের কোষপ্রাচীরের মত সেলুলোজ দ্বারা নয়। ব্যাকটিরিয়ার কোষ সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। এদের নিউক্লিয়াস সুসংগঠিত নয় অর্থাৎ আদি প্রকৃতির এবং অনুন্নত নিউক্লিয়াসে নিউক্লীয় আবরণী ও নিউক্লিওলাস থাকে না। ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোম একটিমাত্র প্যাঁচানো গোলাকার **DNA** তন্তু দ্বারা গঠিত। কোষ পর্দা দিয়ে আবৃত কোন কোষীয় অঙ্গাণু, যথা—মাইটোকনড্রিয়া, গলগি বডি, সেন্ট্রোসোম, প্লাসটিড প্রভৃতি থাকে

না। তবে সাইটোপ্লাজমে RNA থাকে। ব্যাকটিরিয়ার দেহ ফ্ল্যাজেলাবিহীন বা ফ্ল্যাজেলাযুক্ত হতে পারে।

বংশবিস্তার ঃ ব্যাকটিরিয়ার কোষে মাইটোসিস প্রক্রিয়া ঘটে না। ব্যাকটিরিয়া প্রধানত দ্বি-বিভাজন, মুকুলোদ্গম ইত্যাদি পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যাকটিরিয়া ...রেণু উৎপাদনের মাধ্যমে অযৌন উপায়ে এবং জীনগত পুনঃসংযুক্তির (Genetic recombination) মাধ্যমে যৌন উপায়ে বংশবিস্তার করতে পারে।

চিত্র 2.9 ঃ ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা ই. কোলাই নামে ব্যাকটিরিয়ার কোষ (প্রোক্যারিওটিক কোষ)।

*4. **স্পাইরোকিটা (Spirochaeta) ঃ ফন ইহরেনবার্গ** (Von Ehrenbergh, 1838) সর্বপ্রথম স্পাইরোকিটার নামকরণ করেন।

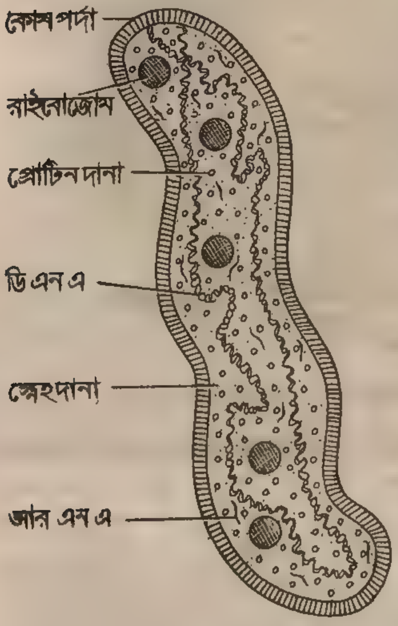

চিত্র 2.10 ঃ স্পাইরোকিটা।

জীবজগতে অবস্থান ঃ স্পাইরোকিটা একপ্রকার লম্বাটে প্যাঁচানো বা সর্পিলাকার আণুবীক্ষণিক, ব্যাকটিরিয়া ও আদ্য প্রাণীর বৈশিষ্ট্যযুক্ত সরল প্রকৃতির প্রোক্যারিওটিক কোষযুক্ত জীব।

আকার ও আকৃতি ঃ স্পাইরোকিটা লম্বাটে প্যাঁচানো বা সর্পিলাকার, দৈর্ঘ্যে প্রায় 6μm—500μm এবং প্রস্থে প্রায় 0·2μm—0·75μm হয়ে থাকে (চিত্র 2.10)।

প্রকৃতি ঃ স্পাইরোকিটা পরজীবী, স্বাধীনজীবী বা অনোন্যজীবীরূপে বাস করে। পোষক জীবকোষ (Host cell) ছাড়া এদের কোন বংশবিস্তার হয় না। স্পাইরোকিটার কোষে কোন কোষপ্রাচীর থাকে না, কোষ পর্দা ঢেউখেলানো বলে এদের সর্পিলাকার মনে হয়। সাইটোপ্লাজমে কোন সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস নেই, তবে দ্বিতন্ত্রী DNA বর্তমান।

* উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ ছাড়া সাইটোপ্লাজমে বিপাকীয় কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক থাকে। এদের দেহ ফ্ল্যাজেলাবিহীন।

বংশবিস্তার : স্পাইরোকিটা প্রধানত দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে থাকে।

5. **নীলাভ-সবুজ শৈবাল (Blue-green algae) :** নীলাভ-সবুজ শৈবালই সম্ভবত পৃথিবীর আদি স্বভোজী জীব এবং প্রায় 300 কোটি বছর আগেও এ ধরনের শৈবালের অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এদের দেহ এক বা একাধিক কোষযুক্ত হয়ে থাকে। কোষের সাইটোপ্লাজমকে ঘিরে তিনস্তরবিশিষ্ট একটি কোষপ্রাচীর বর্তমান। কোষপ্রাচীরের বাইরের স্তরটি মিউসিলেজ, মাঝখানের স্তরটি পেকটিন এবং ভিতরের স্তরটি সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। কোষপ্রাচীরের বাইরে জিলেটিনের একটি পাতলা আস্তরণ থাকে। কোষপ্রাচীরের ভিতর দিকে প্রোটীন ও লিপিড দ্বারা গঠিত কোষ পর্দা বর্তমান।

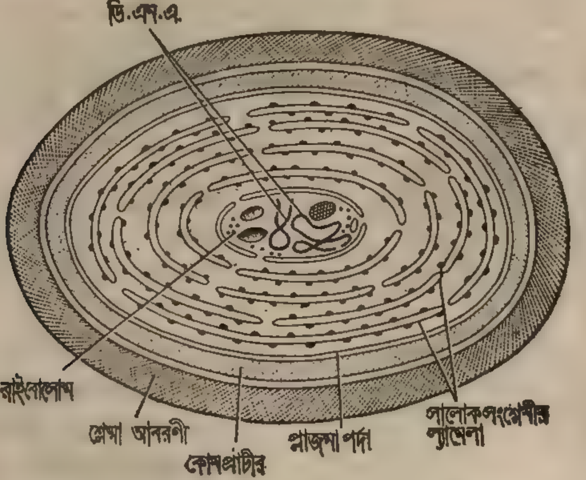

চিত্র 2.11 : নীলাভ-সবুজ শৈবালের কোষ (প্রোক্যারিওটিক কোষ)।

কোষস্থ প্রোটোপ্লাস্ট দুটি অংশে বিভক্ত। মাঝখানের স্বচ্ছ ও বর্ণহীন অংশকে সেন্ট্রোপ্লাজম এবং সেন্ট্রোপ্লাজমের চারদিকে বর্ণযুক্ত অংশকে ক্রোমোপ্লাজম বলে। ক্রোমোপ্লাজম অংশে থাইলাকয়েড থাকে, কিন্তু থাইলাকয়েডের সমন্বয়ে গঠিত প্লাসটিড থাকে না। এই থাইলাকয়েডে ক্লোরোফিল রঙ্গক কণাসহ অন্যান্য রঙ্গক থাকে। ক্রোমোপ্লাজমে একপ্রকার পর্দা স্তরে স্তরে সাজানো থাকে, এদের সালোক-সংশ্লেষীয় ল্যামেলা বলে (চিত্র 2.11)। ক্লোরোফিল কণাগুলি এই ল্যামেলার উপর

[N.B. ভাইরাসকে প্রোক্যারিওটিক কোষ হিসেবে গণ্য করা যায় না। বাস্তবিকপক্ষে ভাইরাস অকোষীয় জীব, কারণ ভাইরাসে প্রোটোপ্লাজমের কোন অস্তিত্ব নেই।]

বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। ক্রোমোপ্লাজমে ক্রোমাটিন দানা বর্তমান যা **DNA** ও প্রোটীন দ্বারা গঠিত, কিন্তু কোন সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না। কোষে **RNA** ও সঞ্চিত খাদ্যবস্তু বর্তমান।

বংশবিস্তার : নীলাভ-সবুজ শৈবাল অঙ্গজ ও অযৌন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে। কোন যৌন জনন পরিলক্ষিত হয় না।

(B) ইউক্যারিওটিক কোষ (Eukaryotic cells) : প্রোক্যারিওটিক কোষের তুলনায় ইউক্যারিওটিক কোষকে উন্নত ধরনের কোষ বলা হয়। ইউক্যারিওটিক কোষে নিউক্লীয় বস্তুকে ঘিরে একটি নিউক্লীয় পর্দা বা আবরণী থাকে। ফলে নিউক্লীয় বস্তু সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথগীকৃত অবস্থায় থাকে। তাছাড়া এই প্রকার কোষে মাইটোকনড্রিয়া, প্লাসটিড, গলগি বডি, লাইসোসোম প্রভৃতি বিশিষ্ট অঙ্গাণু থাকে। অতএব, **যে কোষে নিউক্লীয় পর্দা ঘেরা সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস এবং মাইটোকনড্রিয়া, প্লাসটিড প্রভৃতি বিশিষ্ট কোষীয় অঙ্গাণু থাকে, তাকে ইউক্যারিওটিক কোষ বলে** (চিত্র 2.12 ও 2.13)। উদাহরণ—নীলাভ-সবুজ শৈবাল ব্যতীত সকল উদ্ভিদকোষ ও সকল প্রাণিকোষ।

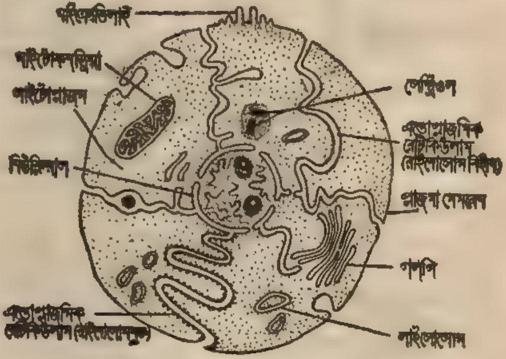

চিত্র 2.12 : একটি প্রাণিকোষ।

চিত্র 2.13 : একটি উদ্ভিদকোষ।

2.10. ইউক্যারিওটিক কোষের গঠন
(Structure of an Eukaryotic cell)

শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে (অর্থাৎ দৃশ্যমান আলোক-নিয়ন্ত্রিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে) ইউক্যারিওটিক (গ্রীক Eu=আদর্শ বা প্রকৃত, Karyon=নিউক্লিয়াস) কোষের মধ্যে যে বস্তুটি সহজেই চোখে পড়ে তার নাম **নিউক্লিয়াস**। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে যে জেলির মত অংশটি থাকে, তার নাম **সাইটোপ্লাজম**। সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসকে একসঙ্গে বলা হয় **প্রোটোপ্লাজম**। সাইটোপ্লাজমকে ঘিরে একটি অতি সূক্ষ্ম আবরণী থাকে—এর নাম **প্লাজমা পর্দা** বা **কোষ পর্দা** (চিত্র 2.14)।

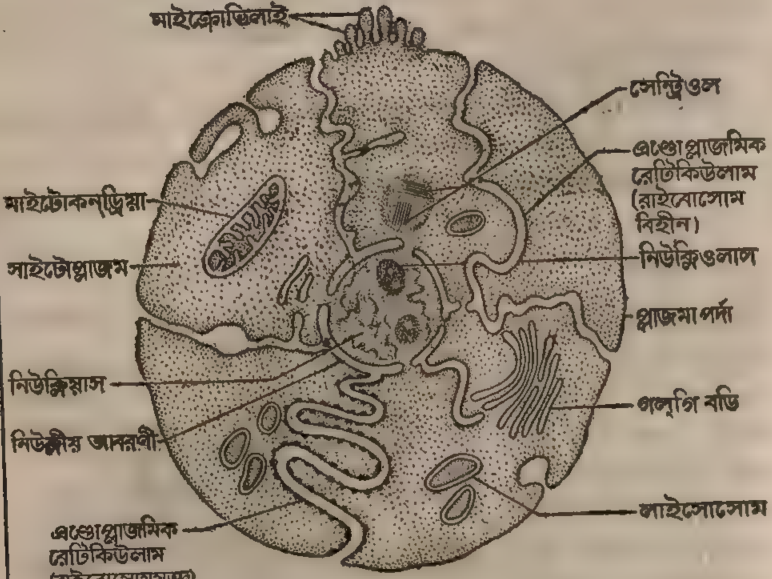

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট একটি প্রাণিকোষ

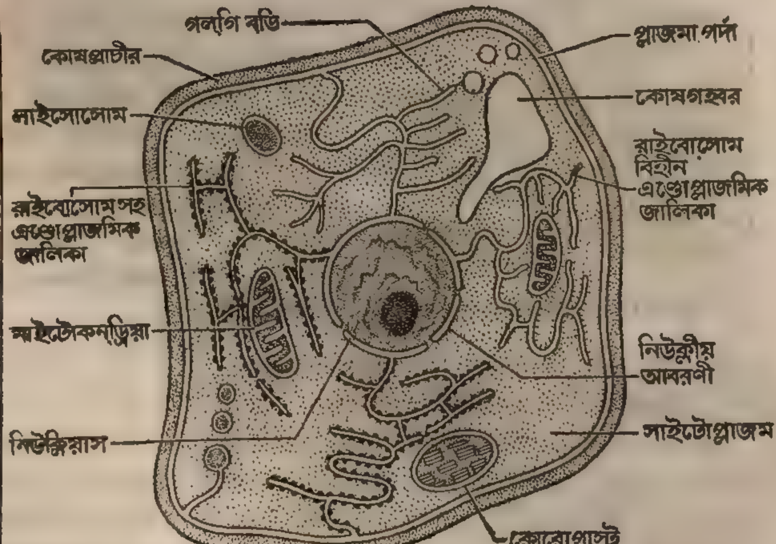

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট একটি উদ্ভিদকোষ

দৃশ্যমান আলোক-নিয়ন্ত্রিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই পর্দাকে দেখা যায় না। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে নানা প্রকার কোষীয় অঙ্গাণু ও অজীবীয় বস্তু থাকে

চিত্র 2.14 : ইউক্যারিওটিক কোষের আলট্রা গঠন।

(2.4 প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। ঐ সকল অঙ্গাণু ও অজীবীয় বস্তুসহ ইউক্যারিওটিক কোষের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল।

2.10A. প্লাজমা পর্দা বা কোষ পর্দা (Plasma Membrane or Cell Membrane)

(a) ইলেক্‌ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গঠন বা আলট্রা গঠন (Ultra Structure) : প্রতিটি সজীব কোষ একটি পাতলা, স্থিতিস্থাপক, পছন্দমাফিক

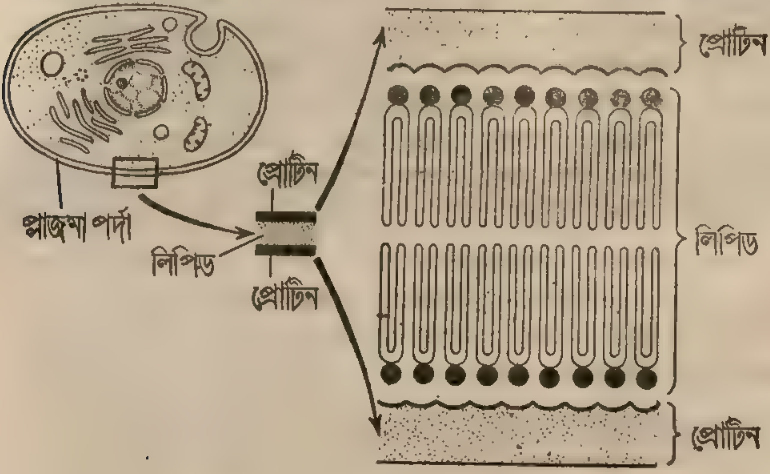

চিত্র 2.15 : প্লাজমা পর্দার আলট্রা গঠন।

ভেদ্য বা বিভেদমূলক ভেদ্য (Differentially permeable) **আবরণী দিয়ে ঘেরা থাকে—ঐ আবরণীর নাম প্লাজমা পর্দা বা কোষ পর্দা**। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই পর্দাকে দেখা সম্ভব হয়েছে।

কোষ পর্দা আনুমানিক 75-100 অ্যাংস্ট্রম পুরু এবং ত্রিস্তরবিশিষ্ট। এই তিনটি স্তরের মধ্যে মাঝেরটি **লিপিড** দ্বারা গঠিত এবং লিপিডের দুধারে থাকে **প্রোটীনের** আস্তরণ (চিত্র 2.15)। লিপিড স্তর আনুমানিক 35 অ্যাংস্ট্রম পুরু এবং প্রতিটি প্রোটীন স্তর আনুমানিক 20 অ্যাংস্ট্রম পুরু। বহিঃপ্রোটীন স্তরটি শ্বেতসারযুক্ত হয়। লিপিড অংশে অণুগুলি দুটি স্তরে সাজানো থাকে; অপরপক্ষে, প্রোটীন অংশ একস্তর অণু দ্বারা গঠিত।

লিপিড স্তরটি ফসফোলিপিড দ্বারা গঠিত। ফসফোলিপিড অণুগুলির বাইরের দিকের প্রান্তটি তড়িৎশক্তিসম্পন্ন থাকে। ঐ প্রান্তকে **তড়িৎ প্রান্ত** বা **পোলার এন্ড** বলে। অপরপক্ষে, ভিতরের দিকের প্রান্তটি তড়িৎশক্তিবিহীন—তাই ঐ প্রান্তের নাম **নন-পোলার এন্ড**।

কোন-কোন কোষে প্লাজমা পর্দার একটি নির্দিষ্ট অংশে কতকগুলি আঙুলের মত প্রসারিত অংশ দেখা যায়—ঐগুলির নাম **মাইক্রোভিলাই** (Microvilli)। ক্ষুদ্রান্ত্র, রেনাল টিউবিউল ইত্যাদির অন্তর্গাত্রের কোষে মাইক্রোভিলাই থাকে।

[কোষের সমস্ত অঙ্গাণুর আবরণী প্রোটীন-লিপিড-প্রোটীন (P-L-P)—এই তিন স্তর দ্বারা গঠিত বলে কোষবিজ্ঞানী **রবার্টসন** এই ত্রিস্তরবিশিষ্ট পর্দাকে সকল সজীব আবরণীর একক বা **একক পর্দা** (unit membrane) রূপে অভিহিত করেন।]

(b) **কার্য ঃ** কোষ পর্দা যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

(i) এই পর্দার সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে, কোষ থেকে কোষের বাইরে এবং বাইরে থেকে কোষের ভিতরে বিভিন্ন বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা। (ii) ফ্যাগোসাইটোসিস ও পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় খাদ্য গ্রহণ করা। (iii) কোষের ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গকে রক্ষা করাও এর অন্যতম কাজ। (iv) একটি কোষকে একটি নির্দিষ্ট আকার দান করে। (v) কোষের কোন-কোন অঙ্গাণুর আবরণী কোষ পর্দা থেকে তৈরি হয়। (vi) বাইরের পরিবেশের সঙ্গে কোষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতে কোষ পর্দা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, পরিবেশের সঙ্গে কোষের নানা রকম ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্র এই কোষ পর্দা।

কোষ পর্দাকে 'বিভেদমূলক ভেদ্য' পর্দা বা 'প্রভেদক ভেদ্য' (differentially permeable) পর্দা বলার কারণ ঃ যে পর্দার ভিতর দিয়ে দ্রাব ও দ্রাবক (solute and solvent) উভয়েই চলাচল করতে পারে, তাকে **ভেদ্য পর্দা** (permeable membrane) বলে।

কোষ পর্দার ভিতর দিয়ে সকল দ্রাব চলাচল করতে পারে না। আবার যে সকল দ্রাব এর ভিতর দিয়ে চলাচল করতে পারে তাদের ক্ষেত্রেও কোষ পর্দা সব সময় ভেদ্য থাকে না; অর্থাৎ কোষ পর্দার ভিতর দিয়ে নির্দিষ্ট কোন-কোন দ্রাব বিশেষ বিশেষ সময়ে

চলাচল করতে পারে। কোষ পর্দার পছন্দমত বিশেষ বিশেষ দ্রাবের এর ভিতর দিয়ে চলাচল ঘটে বলে একে **বিভেদমূলক ভেদ্য পর্দা** বা **প্রভেদক ভেদ্য পর্দা** (Semi-permeable membrane) বলা হয়।

[যে পর্দার মধ্য দিয়ে দ্রাব ও দ্রাবক কোনটিই চলাচল করতে পারে না, তাকে অভেদ্য পর্দা (Impermeable membrane) বলে।]

ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis) : এই প্রক্রিয়ায় কোষ পর্দার সক্রিয়তায় বিভিন্ন কঠিন (solid) কণিকা কোষের ভিতর প্রবেশ করে। কণিকাটি কোষ পর্দার সংস্পর্শে এলে কণিকা-সংলগ্ন কোষ পর্দার অংশটি কণিকাটি-সহ ভিতর দিকে ঢুকে গিয়ে একটি ছোট থলির সৃষ্টি করে (চিত্র 2.16)। এর পর থলির মুক্ত প্রান্ত যুক্ত হয়ে কণিকাটিকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলে। অবশেষে থলিটি কোষ পর্দা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোষের মধ্যে চলে যায়। অ্যামিবা এই প্রক্রিয়ায় খাদ্য গ্রহণ করে। রক্তের শ্বেতকণিকা এই প্রক্রিয়াতেই বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া এবং দেহের মৃত কোষকে আত্মসাৎ করে। 1883 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী **মেটচুনিকফ** (Metchunikoff) ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিটির নামকরণ করেন।

পিনোসাইটোসিস (Pinocytosis) : এই প্রক্রিয়া ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার মতই। তবে, কঠিন কণিকার পরিবর্তে তরল পদার্থ অথবা অতি ক্ষুদ্র কণাবিশিষ্ট বস্তু এই উপায়ে কোষে প্রবেশ করে। পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় থলির পরিবর্তে একটি লম্বা নালীর সৃষ্টি হয় এবং ঐ নালীপথে তরল পদার্থ কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। কণিকাগুলির ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র থলির সৃষ্টি হয়। 1931 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী **লুইস** (Lewis) পিনোসাইটোসিস পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন।

ফ্যাগোসাইটোসিস ও পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়াকে একসঙ্গে **এন্ডোসাইটোসিস** (Endocytosis) বলা হয়। কোষ থেকে বিভিন্ন বস্তু ফ্যাগোসাইটোসিস ও পিনোসাইটোসিসের বিপরীত প্রক্রিয়ায় কোষের বাইরে যায়। এই প্রক্রিয়াগুলি যথাক্রমে **রিভার্স ফ্যাগোসাইটোসিস** ও **রিভার্স পিনোসাইটোসিস** নামে পরিচিত। রিভার্স ফ্যাগোসাইটোসিস ও রিভার্স পিনোসাইটোসিসকে একসঙ্গে **এক্সোসাইটোসিস** (Exocytosis) বলা হয়।

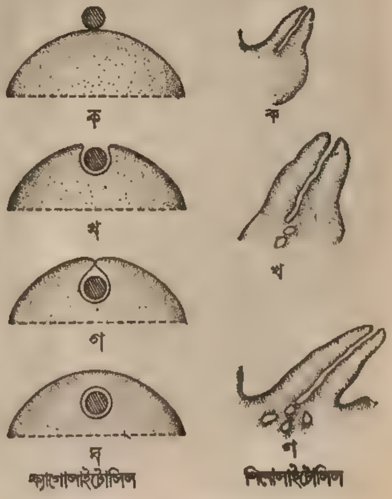

চিত্র 2.16 : ফ্যাগোসাইটোসিস ও পিনোসাইটোসিস।

2.10B. কোষপ্রাচীর (Cell wall)

উদ্ভিদকোষে কোষ পর্দার বাইরের দিকে কোষপ্রাচীর দেখা যায়। কোষ থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন জড় বস্তু কোষ পর্দার বাইরের দিকে জমা হওয়ার ফলে কোষপ্রাচীর সৃষ্টি হয়। অতএব, **উদ্ভিদকোষে কোষ পর্দার বাইরের দিকে জড় বস্তু নির্মিত যে আবরণী থাকে, তার নাম কোষপ্রাচীর।**

(a) **গঠন** (Structure) : পরিণত কোষপ্রাচীরে সাধারণত তিনটি স্তর দেখা যায় : (i) **মধ্যচ্ছদা** বা **মধ্যপর্দা**, (ii) **প্রাইমারী** বা **প্রাথমিক কোষপ্রাচীর** ও (iii) **সেকেন্ডারী** বা **গৌণ কোষপ্রাচীর**। কোন কোন ক্ষেত্রে কোষপ্রাচীরে আরও একটি অতিরিক্ত স্তর দেখা যায়—ঐ স্তরের নাম **টার্শ্যারি** বা **তৃতীয় কোষপ্রাচীর** (চিত্র 2.17)।

(i) **মধ্যচ্ছদা বা মধ্যপর্দা** (Middle lamella) : কোষ বিভাজনের সময় দুটি নতুন উৎপন্ন কোষের মাঝখানে কোষপ্রাচীরের যে স্তরটি প্রথম গঠিত হয় তার নাম মধ্যচ্ছদা বা মধ্যপর্দা। এই স্তরটি **পেকটিন** (**Pectin**) নামে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর সঙ্গে কিছু পরিমাণ **প্রোটীন** ও **ক্যালসিয়াম** থাকে।

(ii) **প্রাইমারী বা প্রাথমিক কোষপ্রাচীর** (Primary cell wall) : প্রাথমিক কোষপ্রাচীর প্রধানত **সেলুলোজ** (**cellulose**) নামে একপ্রকার কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি। দুদিকের দুটি কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে উৎপন্ন সেলুলোজ মধ্যচ্ছদার দুদিকে জমে জমে এই স্তরটির সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গেছে, সেলুলোজ অণু সূক্ষ্ম তন্তুর মত অসংখ্য **মাইক্রোফাইব্রিল** (microfibril) দ্বারা গঠিত।

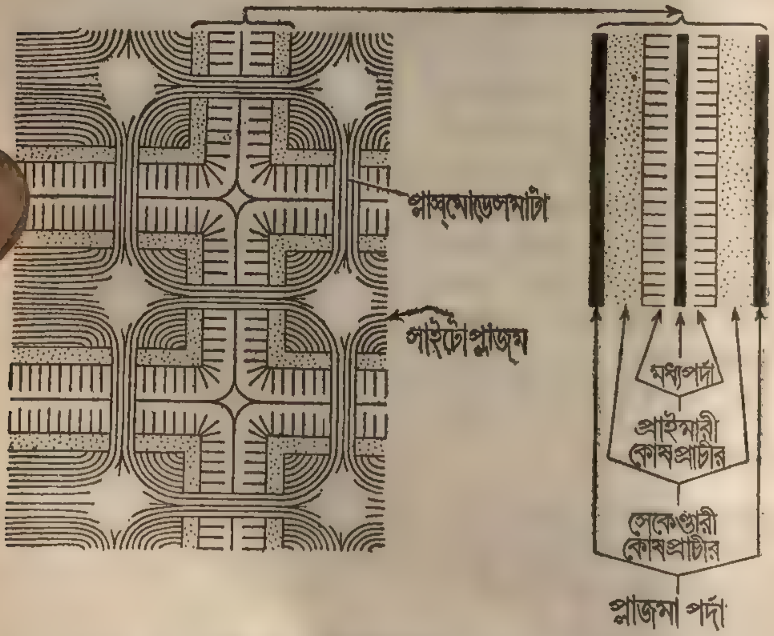

চিত্র 2.17 : কোষপ্রাচীরের নকশাকার চিত্র।

প্যারেনকাইমা কলার কোষপ্রাচীরে মধ্যচ্ছদার উপর কেবলমাত্র এই স্তরটি থাকে। এই স্তর গঠিত হওয়ার পর কোষের আয়তন আর বৃদ্ধি পায় না।

(iii) **সেকেণ্ডারী বা গৌণ কোষপ্রাচীর** (Secondary cell wall) ঃ প্রাইমারী কোষপ্রাচীরের ভিতর দিকে এই স্তরটি গঠিত হয়। এই স্তরে সেলুলোজ ছাড়া **লিগনিন***, **সুবেরিন**** অথবা কোন-কোন ক্ষেত্রে **কিউটিন**** নামে জৈব যোগ থাকে। শিরাত্মক কলা (vascular tissue) এবং স্ক্লেরেনকাইমা কলার কোষপ্রাচীরে এই স্তর দেখা যায়। যে সকল কোষের কোষপ্রাচীর এই স্তর দিয়ে গঠিত, সেই কোষগুলি মৃত।

প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী কোষপ্রাচীরে সেলুলোজের মাইক্রোফাইব্রিলের বিন্যাসে পার্থক্য দেখা যায়। সেকেন্ডারী কোষপ্রাচীরে মাইক্রোফাইব্রিলগুলি পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ও ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় থাকে (চিত্র 2.18)। প্রাইমারী কোষপ্রাচীরের মাইক্রোফাইব্রিলগুলি এলোমেলোভাবে (haphazardly) ছড়ানো থাকে এবং তাদের ফাঁকে ফাঁকে অনেক জায়গা থাকে। ঐসব জায়গা জল ও অন্যান্য পদার্থে পূর্ণ থাকে।

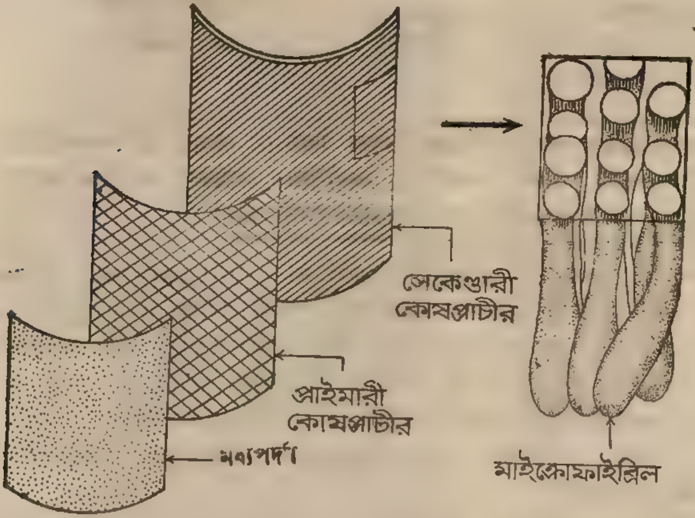

চিত্র 2.18 ঃ কোষপ্রাচীরের বিভিন্ন অংশে মাইক্রোফাইব্রিলের (সেলুলোজ তন্তু) বিন্যাস।

(iv) **টার্শ্যারি বা তৃতীয় কোষপ্রাচীর** (Tertiary cell wall) ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে সেকেন্ডারী বা গৌণ কোষপ্রাচীর স্তরের উপর এই স্তরটিকে দেখা যায়। এই স্তরটি তৈরি হয় একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জৈব উপাদান দিয়ে, তার নাম **জাইলান** (Xylan)।

---

* 'লিগনিন' কোষপ্রাচীরকে দৃঢ়তা দান করে।

** 'সুবেরিন' ও 'কিউটিন' কোষপ্রাচীরের মধ্য দিয়ে জলের চলাচল বন্ধ করে।

কোষপ্রাচীরের বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে পাতলা ও সূক্ষ্ম তন্তুর মত সাইটোপ্লাজমীয় অংশ পাশাপাশি অবস্থিত কোষগুলির সাইটোপ্লাজমকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে। সংযোগকারী ঐ সাইটোপ্লাজমীয় অংশগুলিকে **প্লাজমোডেস্‌মাটা** (Plasmodesmata) বলা হয়। প্লাজমোডেস্‌মাটার মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম নালিকা (tubule) থাকে, যারা সন্নিহিত দুটি কোষের এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে। অনেকে আবার বহিঃত্বকের কোষে বর্তমান প্লাজমোডেস্‌মাটার নামকরণ করেন **এক্টোডেস্‌মাটা** (Ectodesmata) (চিত্র 2.19)। উদাহরণ—কফি (*Coffea*), খেজুর (*Phoenix*) ইত্যাদি।

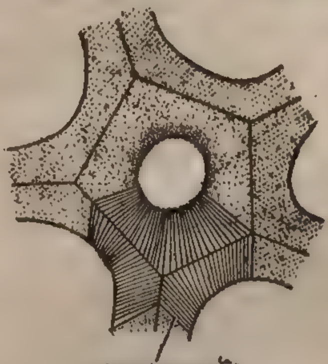

চিত্র 2.19 ঃ প্লাজমোডেস্‌মাটা।

কোষপ্রাচীরে অবস্থিত ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যে সূক্ষ্ম নালিকা-সমন্বিত সাইটোপ্লাজমীয় অংশ পাশাপাশি অবস্থিত কোষের সাইটোপ্লাজমকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে, তাকে প্লাজমোডেস্‌মাটা বলে।

প্রাণিকোষে সাধারণত কোষপ্রাচীর থাকে না। তবে কোন-কোন এককোষী প্রাণীতে এবং বহুকোষী প্রাণীদের কোন-কোন কোষে প্লাজমা পর্দার বাইরের দিকে কোষ থেকে নির্গত কিছু বস্তু সঞ্চিত হয়ে কোষপ্রাচীরের সঙ্গে তুলনীয় অঙ্গের সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সিলিয়েটা শ্রেণীভুক্ত এককোষী প্রাণীদের প্লাজমা পর্দার বাইরের আস্তরণটির নাম **পেলিক্‌ল** (Pellicle)। এটি কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটীনের সংমিশ্রণে গঠিত। পতঙ্গদের দেহের বহির্ভাগের কোষসমূহের বহির্গাত্রে থাকে **কাইটিনের** আস্তরণ।

(b) **কোষপ্রাচীরের স্থূলীভবন** (Thickening of cell wall) ঃ উদ্ভিদকোষে প্রাথমিক কোষপ্রাচীরের উপর গৌণ কোষপ্রাচীরের উপাদানগুলি অসম ও অনিয়মিত ভাবে জমা হতে পারে। এর ফলে কোষপ্রাচীরে নানারকম অলঙ্করণ সৃষ্টি হয়—যেমন, (ক) বলয়াকার (Annular), (খ) সর্পিলাকার (Spiral), (গ) সোপানাকার (Scalariform), (ঘ) জালিকাকার (Reticulate) ও (ঙ) কূপাঙ্কিত (Pitted)।

(ক) **বলয়াকার ঃ** এই প্রকার স্থূলীভবনে গৌণ প্রাচীরের উপাদানগুলি প্রাথমিক কোষপ্রাচীরের ভিতর দিকে বলয় বা বেড়ির আকারে নির্দিষ্ট ব্যবধানে জমা হয়। জাইলেমের ট্র্যাকীয়া নামক উপাদানে এই প্রকার অলঙ্করণ দেখা যায় (চিত্র 2.20)।

(খ) **সর্পিলাকার ঃ** গৌণ প্রাচীরের উপাদানগুলি যখন প্রাথমিক কোষ-প্রাচীরের ভিতর দিকে সর্পিলাকারে অর্থাৎ প্যাঁচানো সিঁড়ির মত জমা হয় তখন তাকে সর্পিলাকার স্থূলীভবন বলা হয়। এই প্রকার স্থূলীভবনও জাইলেমের ট্র্যাকীয়াতে দেখা যায়।

(গ) **সোপানাকার ঃ** এই প্রকার স্থূলীভবনে গৌণ প্রাচীরের উপাদানগুলি প্রাথমিক প্রাচীরের উপর সিঁড়ির ধাপের আকারে জমা হয়।

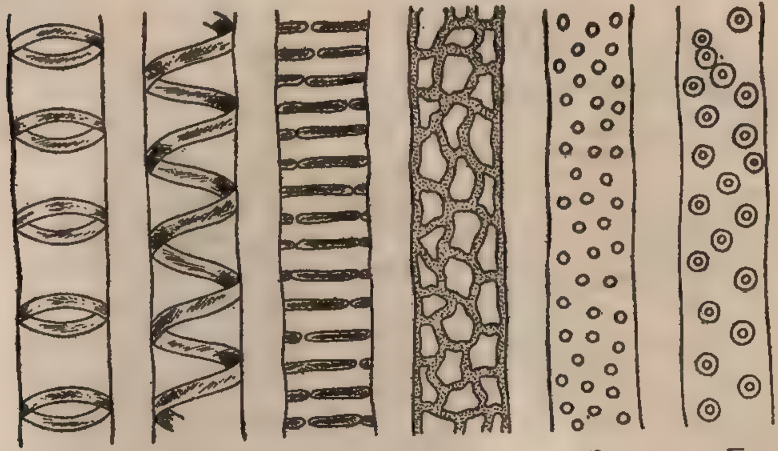

চিত্র 2.20 ঃ কোষপ্রাচীরের বিভিন্ন প্রকার স্থূলীভবন।
(ক) বলয়াকার, (খ) সর্পিলাকার, (গ) সোপানাকার, (ঘ) জালিকাকার, (ঙ) ও (চ) কূপাঙ্কিত।

(ঘ) **জালিকাকার ঃ** এই প্রকার স্থূলীভবনে গৌণ প্রাচীরের উপাদানগুলি প্রাথমিক প্রাচীরের উপর অনিয়মিতভাবে জমা হওয়ার ফলে স্থূলীভবন জালের আকার ধারণ করে।

(ঙ) **কূপাঙ্কিত ঃ** এই প্রকার স্থূলীভবনে গৌণ প্রাচীরের উপাদানগুলি প্রাথমিক প্রাচীরের ভিতর দিকে খুব ছোট ছোট কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত প্রায় সর্বত্রই সমানভাবে জমা হয়। ঐ ছোট ছোট স্থূলীভবনবিহীন অঞ্চল ছিদ্রের মত দেখায় এবং ছিদ্রগুলিকে **কূপ** (pit) বলা হয়। কূপের ভিতর দিয়ে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কোষের মধ্যে রসের (sap) চলাচল ঘটে। সেই কারণে কূপগুলি কোষপ্রাচীরের উভয় দিকে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি হয়। জোড়ায়-জোড়ায় উৎপন্ন কূপকে **জোড়-কূপ** (pit-pair) বলে। কখনও কখনও প্রাথমিক প্রাচীরের কেবলমাত্র একদিকে কূপ উৎপন্ন হয়; এই প্রকার কূপকে **অন্ধ-কূপ** (blind pit) বলা হয়।

জোড়-কূপে নিম্নলিখিত অংশগুলি দেখা যায় (চিত্র 2.21) ঃ

(ক) **কূপ-গহ্বর** বা **কূপকক্ষ** (Pit cavity) ঃ কূপের ভিতর অবস্থিত গহ্বরকে কূপ-গহ্বর বলা হয়।

(খ) কূপ-ছিদ্র (Pit aperture) **:** যে ছিদ্র দ্বারা কূপ-গহ্বর কোষের ভিতর দিকে উন্মুক্ত হয়, তার নাম কূপ-ছিদ্র।

(গ) **কূপ-পর্দা** (Pit membrane) **:** দুটি জোড় কূপের মধ্যবর্তী পর্দাকে কূপ-পর্দা বলে। এটি প্রাথমিক কোষপ্রাচীর ও মধ্যচ্ছদা নিয়ে গঠিত।

কূপ সাধারণত দু রকমের হয়—(i) **সরল কূপ** (Simple pit) ও (ii) **সপাড় কূপ** (Bordered pit)।

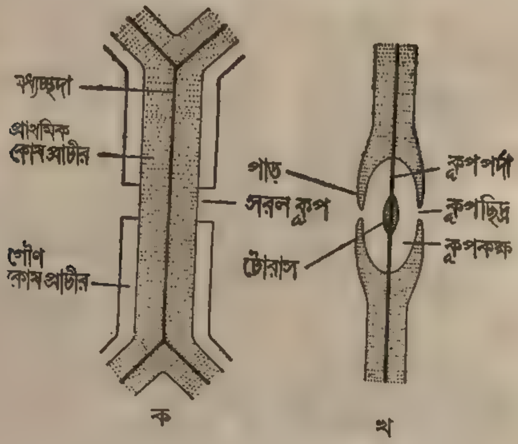

চিত্র 2.21 **:** দুই প্রকার কূপের লম্বচ্ছেদ।
(ক) সরল কূপ ; (খ) সপাড় কূপ।

(i) **সরল কূপ :** সরল কূপে কূপ-ছিদ্রকে ঘিরে কোষপ্রাচীরের বেড়ির মত স্থূলীভবন ঘটে না।

(ii) **সপাড় কূপ :** সপাড় কূপে কূপ-ছিদ্রকে ঘিরে কোষপ্রাচীর উপাদান একটি বেড়ির মত অংশের সৃষ্টি করে। ফলে প্রতিটি সপাড় কূপে দুটি বৃত্তের মত অংশ দেখা যায়—একটি ছোট বৃত্ত এবং তাকে ঘিরে একটি বড় বৃত্ত (চিত্র 2.20চ)। ছোট বৃত্তটি কূপ-ছিদ্র এবং বড় বৃত্তটি কূপ-গহ্বরের অবস্থান নির্দেশ করে। সপাড় কূপের কূপ পর্দাটি অনেক ক্ষেত্রে স্ফীত হয়—ঐ স্ফীত অংশের নাম **টোরাস** (torus)।

(c) **কোষপ্রাচীরের কার্য** (Functions of cell wall) **:** (i) এটি প্রোটোপ্লাজমকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে ; (ii) এটি কোষকে নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে ; (iii) এটি কোষকে দৃঢ়তা প্রদান করে ; (iv) ভেদ্য হওয়ার জন্য এর ভিতর দিয়ে জল ও খনিজ লবণ সহজেই চলাচল করতে পারে ; (v) এটি প্লাজমোডেসমাটার মাধ্যমে এক কোষ থেকে অপর কোষে খাদ্য ও অন্যান্য বস্তুর চলাচলে সহায়তা করে।

• কোষ পর্দা ও কোষপ্রাচীরের পার্থক্য •

কোষ পর্দা	কোষপ্রাচীর
1. উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় প্রকার কোষেই থাকে।	1. কেবলমাত্র উদ্ভিদকোষে থাকে।
2. সজীব।	2. জড় বস্তু।
3. পাতলা ও স্থিতিস্থাপক।	3. পুরু ও দৃঢ়।
4. প্রধানত লিপিড ও প্রোটীন দ্বারা গঠিত ; সামান্য পরিমাণ শ্বেতসারও থাকে।	4. সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ও পেকটিন এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে লিগনিন, সুবেরিন ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।
5. তিন স্তরবিশিষ্ট—দুদিকে দুটি প্রোটীনের স্তরের মাঝে একটি লিপিডের স্তর থাকে।	5. তিন স্তরবিশিষ্ট—মধ্যচ্ছদা, প্রাথমিক ও গৌণ প্রাচীর নিয়ে গঠিত।
6. বিভেদমূলক ভেদ্য।	6. ভেদ্য।
7. কোষকে দৃঢ়তা প্রদান করে না।	7. কোষকে দৃঢ়তা প্রদান করে।
8. ফ্যাগোসাইটোসিস ও পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়া ঘটাতে পারে।	8. ফ্যাগোসাইটোসিস ও পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়া ঘটাতে পারে না।
9. মাইক্রোভিলাই সৃষ্টি করতে পারে।	9. মাইক্রোভিলাই সৃষ্টি করতে পারে না।

2.10C. সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)

কোষের ভিতরকার বড়-বড় গহ্বর (vacuole), কোষরস (cell sap) এবং খাদ্যরূপে গৃহীত পদার্থসমূহকে বাদ দিয়ে বাকী সমস্ত বস্তুকে (প্লাজমা পর্দা সহ) একসঙ্গে **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm) বলে। হুগো ভন মল (Hugo Von Mohl) 1846 খ্রীষ্টাব্দে কোষে প্রোটোপ্লাজমের উপস্থিতি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন। দেহ-কোষের প্রোটোপ্লাজমকে **সোমাটোপ্লাজম** (Somatoplasm) এবং জননকোষের প্রোটোপ্লাজমকে **জার্মপ্লাজম** (Germplasm) বলে। প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তার নাম **সাইটোপ্লাজম**। এটি বর্ণহীন, অর্ধ-স্বচ্ছ, দানাদার ও সান্দ্র (viscous) ; অনেকটা জেলির মত কোলয়েড জাতীয় একটি সজীব পদার্থ।

সাইটোপ্লাজমের যে স্বচ্ছ তরল অংশের মধ্যে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব উপাদান দ্রবীভূত বা ভাসমান অবস্থায় থাকে তার নাম **হায়ালোপ্লাজম** (Hyaloplasm) বা **কিনোপ্লাজম** (Kinoplasm)। কোষ পর্দা সংলগ্ন সাইটোপ্লাজমের দানাবিহীন জেলিরূপী পাতলা স্তরটিকে **এক্টোপ্লাজম** (Ectoplasm) বলে। এক্টোপ্লাজমের ভিতর দিকের দানাদার ও সলরূপী সাইটোপ্লাজমের বাকী অংশটির নাম

এন্ডোপ্লাজম (Endoplasm)। কোষগহ্বরকে পরিবৃত করে সাইটোপ্লাজমের যে আবরণ থাকে, তাকে **টনোপ্লাজম** (Tonoplasm) বলে।

A. ভৌত গঠন ঃ সাইটোপ্লাজমের ভিতর অসংখ্য অণুসমষ্টি (aggregates of molecules) থাকে। ঐসব অণু-কণার বিভিন্নতার জন্য সাইটোপ্লাজমের আকৃতি

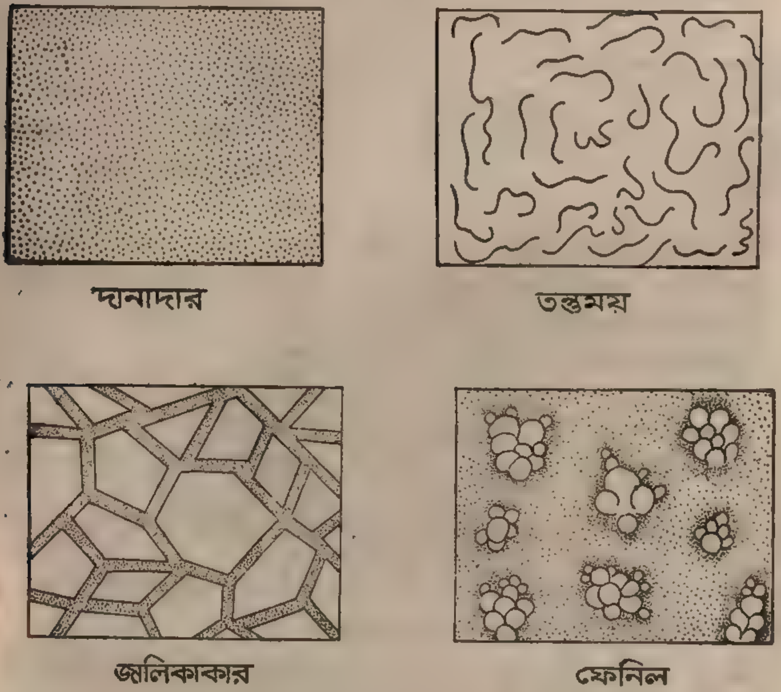

চিত্র **2.22** ঃ সাইটোপ্লাজমের বিভিন্ন রূপ।

কখনও **দানাদার** (granular), কখনও **তন্তুময়** (fibrillar), কখনও **জালিকাকার** (reticular), আবার কখনও বা **ফেনিল** (alveolar) হয় (চিত্র 2.22)।

B. ভৌত ধর্মাবলী (Physical properties) **ঃ** সাইটোপ্লাজমের ভৌত ধর্মাবলী নিম্নরূপ ঃ

(i) **কোলয়েডরূপী অবস্থা* ঃ** সাইটোপ্লাজম একটি কোলয়েডজাতীয় পদার্থ। এই কোলয়েডের 'বিক্ষেপক' হচ্ছে জল। ঐ বিক্ষেপকের মধ্যে অসংখ্য অণু ও অণুসমষ্টি (aggregates of molecules) থাকে।

* যে পদার্থের মধ্যে অণুর চেয়েও বড়-বড় কণা অথবা সমষ্টিকৃত অণুর কণা নিলম্বিত (suspended) অবস্থায় থাকে, সেই পদার্থকে 'কোলয়েড' বলে। কোলয়েডের তরল অংশটিকে 'বিক্ষেপক' (dispersion medium) বলা হয়।

(ii) **দশা পরিবর্তন** (Phase reversal) : সাইটোপ্লাজম একটি কোলয়েড-জাতীয় পদার্থ হওয়ার ফলে এটি কখনও **জেল**-রূপে আবার কখনও **সল**-রূপে অবস্থান করে (চিত্র 2.23)। এর ভিতরকার অণুসমষ্টি যদি জেলির মত অর্ধ-তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় তবে তাকে 'জেল' (gel) দশা বলে। জলযোজনের (hydration) ফলে অর্ধ-তরল জেল অধিকতর তরল অবস্থা প্রাপ্ত হলে তাকে 'সল' (sol) দশা বলা

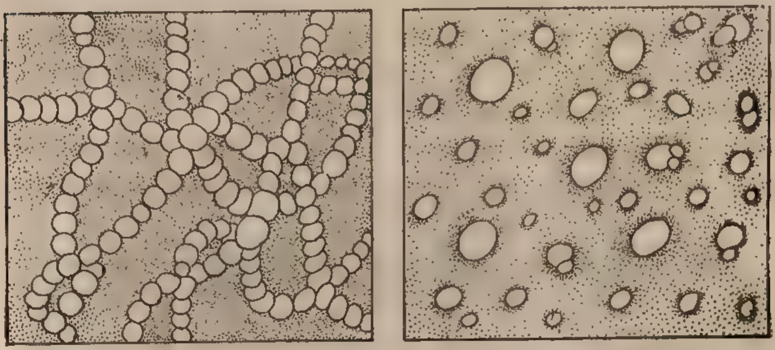

চিত্র 2.23 : সাইটোপ্লাজমের 'জেল' ও 'সল' দশা।

হয়। সল থেকে জল অপসারিত হলে তা আবার জেল-এ পরিণত হয়। উত্তাপ, চাপ প্রভৃতি নানারকম পারিপার্শ্বিক অবস্থার এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অবস্থার প্রভাবে সাইটোপ্লাজমের উক্তরূপ দশান্তর ঘটে।

(iii) **সান্দ্রতা** (Viscosity) : সাইটোপ্লাজমের একটি সান্দ্রতা বা আঠালো ভাব আছে। এর ভিতরকার বিভিন্ন অণুর পারস্পরিক আকর্ষণের ফলেই এই আঠালো ভাবের উদ্ভব হয়। সাধারণত সক্রিয় কোষসমূহে এই আঠালো ভাব গ্লিসারিনের সমান এবং উদ্ভিদকোষের চেয়ে প্রাণিকোষে এই ভাব কিছুটা বেশী।

(iv) **স্থিতিস্থাপকতা** (Elasticity) : এটি সাইটোপ্লাজমের একটি বিশেষ ধর্ম, বিশেষত এর পরিধি-সংলগ্ন অঞ্চলের। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে যে, প্লাজমা পর্দাকে (যা সাইটোপ্লাজমেরই একটি অংশ) কোষের গাত্র থেকে মাইক্রোনীডলের সাহায্যে খানিকটা টেনে তুলে পুনরায় ছেড়ে দিলে তা আবার আগের জায়গায় ফিরে যায়। শুধু তাই নয়, তা কোষের বহির্গাত্রের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে যায়। প্রকৃতপক্ষে, প্লাজমা পর্দার স্থিতিস্থাপকতা এত বেশী যে তাকে তার প্রকৃত মাপের চেয়ে প্রায় 25 গুণ লম্বা করা যেতে পারে।

(v) **সঙ্কোচনশীলতা** (Contractility) : এটি প্রোটোপ্লাজমের আর একটি বিশেষ গুণ। উত্তাপ, তড়িৎপ্রবাহ, শক্তিশালী রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির প্রভাবে সাইটোপ্লাজমকে সঙ্কুচিত হতে দেখা যায়। ঐসব কার্যকারিকা শক্তিকে সরিয়ে নিলে আবার তার প্রসারণ ঘটে।

(vi) **চলন** (Movements) : সাইটোপ্লাজমের নানারকম চলন দেখা যায় ; এইসব চলন সাইটোপ্লাজমের সান্দ্রতা, স্থিতিস্থাপকতা ও সঙ্কোচনশীলতার উপর নির্ভরশীল।

সাইটোপ্লাজমের বিভিন্ন চলন সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল :

(ক) **ব্রাউনীয় চলন** (Brownian movement) : কোলয়েডরূপী যে কোন পদার্থের বিভিন্ন অণুর আঁকাবাঁকাভাবে নড়াচড়াকে **ব্রাউনীয় চলন** বলে। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে মাঝে মাঝে এই রকম চলন দেখা যায়। কোলয়েডের বিভিন্ন অণুর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে উক্ত রূপ চলনের সৃষ্টি হয়। দেখা গেছে যে, সাইটোপ্লাজমের সান্দ্রতা যত হ্রাস পায় ব্রাউনীয় চলন তত বৃদ্ধি পায়।

(খ) **সাইক্লোসিস বা আবর্তন** : কোন-কোন কোষের সাইটোপ্লাজমকে কোষের ভিতরেই নির্দিষ্ট পথে ঘুরতে দেখা যায়—একেই সাইটোপ্লাজমের আবর্তন

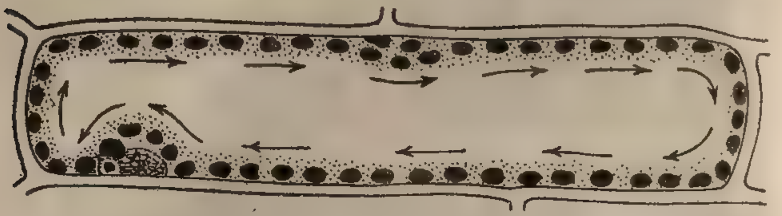

চিত্র 2.24 : সাইটোপ্লাজমের আবর্তন।

বলে (চিত্র 2.24)। ব্রাউনীয় চলনের মতই, সান্দ্রতা হ্রাস পেলে আবর্তন বৃদ্ধি পায়।

(গ) **অ্যামিবা-সদৃশ চলন** (Amoeboid movement) : অ্যামিবা বা শ্বেত রক্তকণিকায় যে বিশেষ ধরনের চলন দেখা যায় তা সাইটোপ্লাজমের ক্রমাগত জেল দশা থেকে সল দশায় ও সল দশা থেকে জেল দশায় রূপান্তরের ফলে ঘটে থাকে।

(vii) **আলোক প্রতিসরণ ক্ষমতা** (Refringence) : সাইটোপ্লাজমের মধ্য দিয়ে চলার সময়ে আলোর প্রতিসরণ ঘটে। সাইটোপ্লাজমের প্রতিসরাঙ্ক (refractive index) প্রায় 1·4*।

(viii) **হাইড্রোজেন আয়নের ঘনীভবন (pH) নিয়ন্ত্রণ** : যদিও কোষের বিভিন্ন অংশে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনীভবনের মাত্রা বিভিন্ন রকমের তবুও মোটামুটি ভাবে বলা চলে যে, সাইটোপ্লাজম অল্পমাত্রায় আম্লিক (acidic)—pH আনুমানিক 6·8**। পরীক্ষামূলকভাবে সাইটোপ্লাজমের অম্ল বা ক্ষার ভাব বৃদ্ধি করে দেখা গেছে যে, শীঘ্রই তা আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে ; অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের নিজস্ব pH নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে।

---

* বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক 1·0।

** কোন তরলের অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব সেই তরলে হাইড্রোজেন আয়নের মাত্রার উপর নির্ভরশীল।

C. রাসায়নিক ধর্মাবলী (Chemical properties) : সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক গঠন সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুব কঠিন, কেননা সাইটোপ্লাজমের সঙ্গে সব সময়েই সাইটোপ্লাজম থেকে তৈরি কিছু কিছু পদার্থ মিশে থাকে। তার উপর বিভিন্ন বিকারকের (reagents) ক্রিয়ায় অতি অল্পেই এর মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যুর পর এর গঠনের বহুল পরিবর্তন ঘটে। ফলে এর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করার কাজটা বেশ অসুবিধাজনক। তবুও, উন্নত পরীক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে এর গঠন সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। একটি সক্রিয় কোষের সাইটোপ্লাজমে,

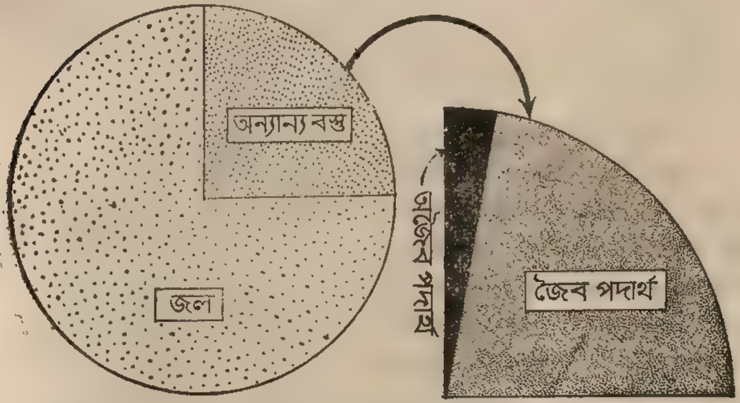

চিত্র 2.25 : সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক উপাদানসমূহের পরিমাণের নক্শাকার চিত্র।

আরও সঠিকভাবে বললে প্রোটোপ্লাজমে, সাধারণত 75 ভাগ **জল** ও 25 ভাগ অন্যান্য বস্তু থাকে (চিত্র 2.25)। শেষোক্ত 25 ভাগের মধ্যে আবার আনুমানিক 90 ভাগ হচ্ছে জৈব পদার্থ (প্রোটীন, শ্বেতসার ও শর্করা, স্নেহদ্রব্য, নিউক্লিক অ্যাসিড, ভিটামিন, হরমোন ইত্যাদি) এবং 10 ভাগ **অজৈব পদার্থ**। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, এইসব বিভিন্ন বস্তুর পরিমাণ বিভিন্ন কোষে অথবা একই কোষে বিভিন্ন সময়ে কিছু কমবেশী হতে পারে।

জল (Water) : প্রোটোপ্লাজমের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হচ্ছে জল। এটি মুক্ত অবস্থায় সাধারণ জল রূপে অবস্থান করতে পারে অথবা বিভিন্ন জৈব পদার্থের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে। হায়ালোপ্লাজম, কোষরস ও নিউক্লীয় রসে এটিকে পাওয়া যায়।

মৌলগোষ্ঠী (Elements) : প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে প্রায় 34 রকম মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। মৌলগুলি অংশত 'মুক্ত জল'-এর মধ্যে এবং অংশত আয়ন (ion) হিসেবে প্রোটোপ্লাজমের অন্যান্য জৈব উপাদানের সঙ্গে যুক্ত থাকে। মৌলগুলির মধ্যে কয়েকটি থাকে অতি অল্প পরিমাণে (trace elements) এবং কেবলমাত্র অতি সংবেদনশীল (highly sensitive) বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তাদের

উপস্থিতি ধরা পড়ে। **ওয়েট** (Weight)-এর মতে মৌলগুলির শতকরা পরিমাণ নিম্নরূপ :

অক্সিজেন	(O)	··· 76%	গন্ধক	(S)	··· 0·2%
কার্বন	(C)	··· 10·5%	ক্লোরিন	(Cl)	··· 0·1%
হাইড্রোজেন	(H)	··· 10·0%	সোডিয়াম	(Na)	··· 0·05%
নাইট্রোজেন	(N)	··· 2·5%	ম্যাগনেসিয়াম	(Mg)	··· 0·02%
ফসফরাস	(P)	··· 0·3%	ক্যালসিয়াম	(Ca)	··· 0·02%
পটাসিয়াম	(K)	··· 0·3%	লোহ	(Fe)	··· 0·01%

উপরিউক্ত মৌলগুলি ছাড়া অতি অল্প পরিমাণে যেসব মৌল প্রোটোপ্লাজমে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হল—সিলিকন, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ, বোরন, ব্রোমিন ইত্যাদি।

D. **কার্য :** সাইটোপ্লাজমের কাজগুলি সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হল :

(i) **বিপাকীয় ক্রিয়া সম্পাদন** (Performance of Metabolic activities) **:** কোষের বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়া, যথা—প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড ইত্যাদির সংশ্লেষ, ক্ষরণজাত বস্তু উৎপাদন, শ্বসন ইত্যাদি ক্রিয়া সাইটোপ্লাজমে সম্পাদিত হয়।

(ii) **উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া** (Irritability) **:** যে কোন উত্তেজনার প্রভাবে সাড়া দেওয়া জীবের একটি বিশেষ ধর্ম। এই বিশেষ জীবধর্মটি প্রকৃতপক্ষে সাইটোপ্লাজমেরই ধর্ম।

(iii) **পরিবহণ** (Conduction) **:** সাইটোপ্লাজমের আবর্তনের ফলে বিভিন্ন বস্তু কোষের এক স্থান থেকে অপর স্থানে পরিবাহিত হতে পারে।

(iv) **কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন** (Cell growth and division) **:** কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন পদ্ধতিতে সাইটোপ্লাজমের ভূমিকা আছে।

2.10D. কোষ-গহ্বর বা ভ্যাকুওল (Vacuoles)

সাইটোপ্লাজমের মধ্যে একক আবরণীবেষ্টিত জলীয় পদার্থে পূর্ণ থলির মত কিছু কিছু অংশ দেখা যায়—ঐগুলি কোষ-গহ্বর বা ভ্যাকুওল নামে পরিচিত। প্রাণিকোষে গহ্বর সচরাচর দেখা যায় না। তবে যেসব প্রাণিকোষে এদের দেখা মেলে, সেখানেও এরা আকারে বেশ ছোট হয়। উদ্ভিদকোষের গহ্বরগুলি প্রাণিকোষের তুলনায় আকারে অনেক বড়, তবে নবীন উদ্ভিদকোষগুলিতে একাধিক ছোট-ছোট গহ্বর থাকে। কোষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি বড় গহ্বর সৃষ্টি করে এবং সাইটোপ্লাজমকে কোষপ্রাচীরের দিকে ঠেলে দেয় (চিত্র 2.24)। এই অবস্থায় কোষপ্রাচীর সংলগ্ন সাইটোপ্লাজমের পাতলা স্তরকে **প্রাইমর্ডিয়াল ইউট্রিকল** বলে।

গহ্বরের ভিতরের বস্তুসমূহ **কোষরস** (cell sap) নামে পরিচিত। কোষরসের মুখ্য উপাদান 'জল'। ঐ জলের সঙ্গে নানাপ্রকার রাসায়নিক লবণ, শর্করা, অ্যাসিড ও বিভিন্ন রঙ্গক (pigments) মিশে থাকে। বীট মূলের লাল রঙ, ফুলের পাপড়ি

ও ফলের খোসার লাল, নীল, বেগুনী ইত্যাদি রঙের জন্য প্রয়োজনীয় রঙ্গক পদার্থের অবস্থান কোষরসে। এছাড়া কোষের বর্জ্য পদার্থগুলিও গহ্বরের মধ্যে জমা হয়।

গহ্বরের পরিধিতে একটি পর্দা থাকে, যেটি কোষরসকে সন্নিহিত সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক করে রাখে। এই পর্দাটির নাম **টনোপ্লাস্ট** (Tonoplast)। টনোপ্লাস্টের গঠনের সঙ্গে কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর পর্দার গঠনের মিল আছে। ভেদ্যতার (permeability) ব্যাপারে টনোপ্লাস্টের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। জল সহজেই এর মধ্য দিয়ে গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু কোষরসে দ্রবীভূত বস্তুগুলি সহজে বের হতে পারে না। এর ফলে কোষের রসস্ফীতি চাপ (**Turgor pressure**) বজায় থাকে।

কার্য: (i) গহ্বরগুলি কোষের সঞ্চয়ী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। এর মধ্যে শর্করা, খনিজ লবণ, বিভিন্ন রঙ্গক, নানাবিধ গ্যাস প্রভৃতি সঞ্চিত থাকে। (ii) গহ্বরের ভিতরে সঞ্চিত রঙ্গক **অ্যান্থোসায়ানিন*** ফুলের পাপড়িকে বিচিত্র বর্ণ দান করে কীটপতঙ্গকে আকর্ষণের মাধ্যমে পরাগ সংযোগে (pollination) সাহায্য করে। (iii) উদ্ভিদকোষের বিভিন্ন রেচন পদার্থ সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক হয়ে গহ্বরে জমা থাকার ফলে তাদের বিষক্রিয়া থেকে সাইটোপ্লাজম রক্ষা পায়। (iv) প্রাণিকোষে সঙ্কোচী গহ্বর (contractile vacuole) অতিরিক্ত জলকে দেহ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করে দেহের জলসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে (osmoregulation)। (v) গহ্বর-কোষের রসস্ফীতি চাপ বজায় রাখে। (vi) জলজ উদ্ভিদের গহ্বরে সঞ্চিত গ্যাস উদ্ভিদকে জলে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।

2.10 E. নিউক্লিয়াস (Nucleus)

সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত যে অঙ্গাণুটি কোষের যাবতীয় কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার নাম নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস কোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। **রবার্ট ব্রাউন** 1831 খ্রীষ্টাব্দে এই অঙ্গাণুটির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

সংখ্যা (Number): অধিকাংশ কোষেই সাধারণত একটি করে নিউক্লিয়াস থাকে। তবে কোন কোন কোষে তাদের সংখ্যা একাধিকও হতে পারে। যেমন, এককোষী প্রাণী প্যারামিসিয়াম (*Paramoecium*)-এর বিভিন্ন প্রজাতিতে এই সংখ্যা বিভিন্ন রকমের। সর্বনিম্ন সংখ্যা 2 এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা 10। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ঐচ্ছিক পেশীসমূহের (voluntary muscles) কোষেও একাধিক নিউক্লিয়াস দেখা যায়। ভাউকেরিয়া (*Vaucheria*) নামে একপ্রকার শৈবালের কোষগুলি বেশ বড়-বড় হয় এবং প্রতিটি কোষে শতাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। একাধিক নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রাণিকোষকে বলা হয় **সিনসিটিয়াম** (Syncytium) এবং একাধিক নিউক্লিয়াসযুক্ত উদ্ভিদকোষকে বলা হয় **সিনোসাইট** (Coenocyte)।

আকৃতি (Shape): অধিকাংশ কোষেই নিউক্লিয়াসের আকৃতি মোটামুটি গোলাকার অথবা ডিম্বাকার। তবে কোন-কোন কোষে (যথা—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্বেত রক্তকণিকায় ও রেশম মথের লার্ভার রেশম গ্রন্থির কোষে) অদ্ভুত আকৃতির নিউক্লিয়াস দেখা যায় (চিত্র 2.26)।

---

* কোষরসের pH-এর তারতম্যের ফলে অ্যান্থোসায়ানিন-নিয়ন্ত্রিত রঙের তারতম্য ঘটে। কোষরস অম্লীয় প্রকৃতির হলে **রঙ হয় লাল**, ক্ষারীয় প্রকৃতির হলে **রঙ হয় নীল** এবং নিউট্রাল প্রকৃতির হলে **রঙ হয় বেগুনী**।

আয়তন (Volume) : প্রতিটি কোষে নিউক্লিয়াসের আয়তন সমান হয় না। আবার কোন একটি বিশেষ কোষের নিউক্লিয়াস কোষটির জীবদ্দশার সবসময়ে একই আয়তনবিশিষ্ট থাকে না। তবে সাধারণত প্রতি প্রকার কোষের নিউক্লিয়াস ও কোষের সাইটোপ্লাজমের আয়তনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে, যা নির্দিষ্ট প্রকার কোষের বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া, নিউক্লিয়াসের আয়তন তার ভিতরের DNA-এর উপর নির্ভরশীল। ডিপ্লয়েড সংখ্যার চেয়েও বেশী-সংখ্যক ক্রোমোসোম যেসব কোষে থাকে তাদের নিউক্লিয়াস সাধারণত বড় হয়।

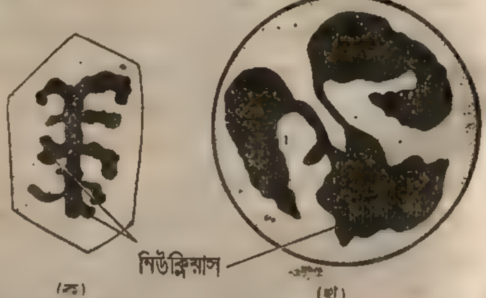

চিত্র 2.26 : অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট নিউক্লিয়াস। (ক) রেশম মথের লার্ভার রেশম গ্রন্থির কোষে, (খ) শ্বেতকণিকায়।

ইলেক্‌ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গঠন বা আলট্রা গঠন (Ultra structure) বা পরাণুবীক্ষণিক গঠন : নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে নিউক্লিয়াস

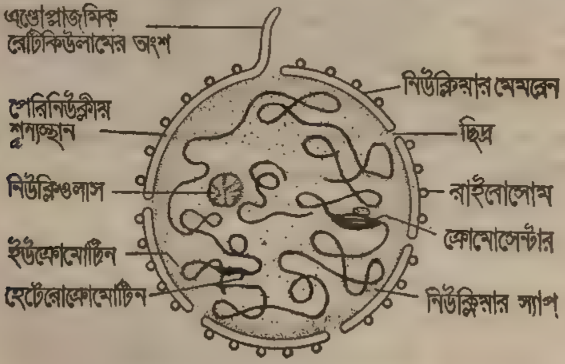

চিত্র 2.27 : একটি নিউক্লিয়াসের গঠন।

গঠিত : (i) নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বা নিউক্লীয় পর্দা, (ii) নিউক্লীয় রস বা কেরিওলিম্ফ, (iii) ক্রোমাটিন ও (iv) নিউক্লিওলাস।

(i) **নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বা নিউক্লীয় পর্দা** (Nuclear membrane) : **যে পর্দা নিউক্লিয়াসের ভিতরের বস্তুগুলিকে আশপাশের সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক করে রাখে তার নাম নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বা নিউক্লীয় পর্দা** (চিত্র 2.27)।

ইলেক্‌ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গেছে নিউক্লীয় পর্দা দুই স্তরবিশিষ্ট। প্রতিটি স্তর লিপিড ও প্রোটীন (**P-L-P**) দ্বারা গঠিত এক-একটি একক পর্দা (unit membrane)। প্রতিটি একক পর্দা প্রায় **90** অ্যাংস্ট্রম পুরু। দুটি পর্দার মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গার নাম **পেরিনিউক্লীয় স্পেস** (Perinuclear space) ; এটি 100-300

অ্যাংস্ট্রম চওড়া। নিউক্লীয় পর্দায় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **ছিদ্র** (pore) থাকে। প্রতিটি ছিদ্রের ব্যাস আনুমানিক 400 অ্যাংস্ট্রম। ঐসব ছিদ্রের নিকট নিউক্লীয় পর্দার স্তরদুটিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। নিউক্লিয়াসের কোন-কোন জায়গায় ছিদ্রগুলিকে ঘিরে একটি নলাকার গঠন (cylindrical structure) বা **অ্যানুলাস** (Annulus) দেখা যায়। প্রতিটি ছিদ্রকে অ্যানুলাসের ভিতর আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত একটি পাতলা পর্দা দ্বারা বন্ধ থাকতে দেখা যায় (চিত্র 2.28)।

নিউক্লীয় পর্দার বাইরের স্তরের বহির্গাত্রে কখনও কখনও রাইবোসোম থাকে। অনেক ক্ষেত্রে নিউক্লীয় পর্দার বাইরের স্তরটি এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার (2.10 I প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য) সঙ্গে যুক্ত থাকে।

নিউক্লীয় পর্দার ছিদ্রপথে বড়-বড় অণু নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে চলাচল করে। এই পথেই নিউক্লিয়াস থেকে রাইবোসোম সাইটোপ্লাজমে আসে। অবশ্য নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যেসব পদার্থের আদান-প্রদান হয় তার

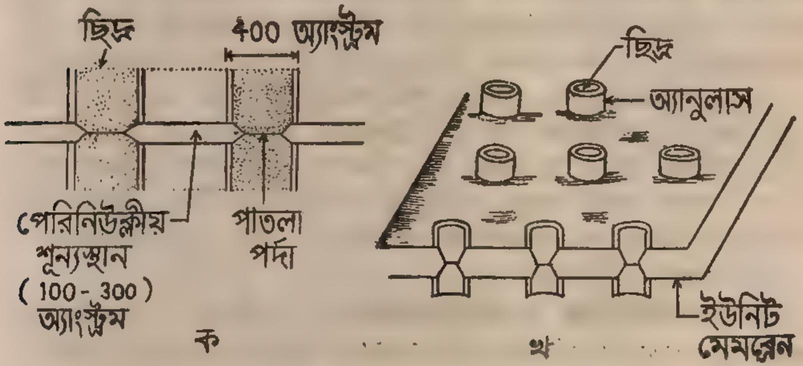

চিত্র 2.28 : নিউক্লীয় পর্দায় অ্যানুলাস।

বেশ কিছুটা অংশ নিউক্লীয় পর্দার ছিদ্রবিহীন অঞ্চল দিয়েই ঘটে, কেননা পর্দার পৃষ্ঠাঞ্চলের শতকরা মাত্র 10 ভাগ স্থান ছিদ্রযুক্ত। নিউক্লীয় পর্দা প্লাজমা পর্দার মতই 'প্রভেদক ভেদ্য' (differentially permeable) পর্দা এবং এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বস্তুর চলাচলের পদ্ধতি প্লাজমা পর্দার মধ্য দিয়ে ঐসব বস্তুর চলাচলের পদ্ধতির মতই।

(ii) **নিউক্লীয় রস** বা **কেরিওলিম্ফ** (Nuclear sap or Karyolymph) : **নিউক্লীয় পর্দা দিয়ে ঘেরা নিউক্লিয়াসের ভিতরের সমস্ত অংশটি একটি স্বচ্ছ, দানাদার, অর্ধ-তরল, ঈষৎ অম্লীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে। এই পদার্থকে নিউক্লীয় রস বা কেরিওলিম্ফ বলে।** নিউক্লীয় রসে নানাপ্রকার এনজাইম (যথা—রাইবোনিউক্লিয়েজ, DNA পলিমারেজ, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ ইত্যাদি), নিউক্লিক অ্যাসিড এবং সামান্য পরিমাণে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ থাকে।

কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডল বা বেমযন্ত্র গঠনে নিউক্লীয় রস বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে বলে মনে করা হয়।

(iii) **ক্রোমাটিন** (Chromatin)ঃ **নিউক্লিয়াসের ইন্টারফেজ দশায়** (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) **নিউক্লীয় রসের মধ্যে ক্ষারীয় রঙ গ্রহণকারী যে সূক্ষ্ম সূতার মত অংশগুলিকে দেখা যায়, তাদের নাম ক্রোমাটিন।** ক্রোমাটিন সূত্রগুলি জালের আকারে বিন্যস্ত থাকার জন্য তাদের **ক্রোমাটিন জালিকা** (Chromatin reticulum) রূপেও বর্ণনা করা হয়। কোষ বিভাজনের সময় এই জালিকা থেকে কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক স্থূল সূতার মত অঙ্গ গঠিত হয়—ঐগুলি **ক্রোমোসোম** নামে পরিচিত। ক্রোমোসোমগুলি বংশগত বৈশিষ্ট্যসমূহের বাহক।

ক্রোমাটিন বস্তু দু রকমের—যথা, **হেটেরোক্রোমাটিন** (heterochromatin) ও **ইউক্রোমাটিন** (euchromatin)। ইন্টারফেজ দশায় ও প্রোফেজ দশার প্রথম দিকে (early prophase) ক্রোমাটিন বস্তুর কতকগুলি অঞ্চল গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয়—ঐ অংশগুলিকে 'হেটেরোক্রোমাটিন' বলে। উক্ত সময়ে ক্রোমাটিন বস্তুর যে অঞ্চলগুলি হাল্কা রঙ গ্রহণ করে, তাদের বলা হয় 'ইউক্রোমাটিন'। হেটেরোক্রোমাটিন অঞ্চলে ক্রোমাটিন সূত্র খুব আঁটসাঁট (tightly) ভাবে পেঁচিয়ে (coiled) থাকে। ফলে ঐসব স্থানে ক্রোমাটিন পদার্থের ঘনত্ব বেশী হয় এবং অঞ্চলগুলি গাঢ়ভাবে রঞ্জিত হয়।

জীনের সক্রিয়তার জন্য ক্রোমোসোমদেহ প্যাঁচবিহীন হওয়া প্রয়োজন। তাই একটি ক্রিয়াশীল কোষে সক্রিয় জীনগুলি ইউক্রোমাটিন অংশে এবং নিষ্ক্রিয় জীনগুলি হেটেরোক্রোমাটিন অংশে উপস্থিত থাকে। এক-এক প্রকার কোষে এক-এক ধরনের জীনের সক্রিয়তা ঘটে। তাই এক-এক প্রকার কোষে ক্রোমাটিনের এক-এক অংশ ইউক্রোমাটিন এবং তদ্রূপ এক-এক অংশ হেটেরোক্রোমাটিন রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটায়।

হেটেরোক্রোমাটিন দু'রকমের, যথা—

(a) **কনস্টিটিউটিভ হেটেরোক্রোমাটিন** (Constitutive heterochromatin)ঃ এই প্রকার হেটেরোক্রোমাটিনে DNA (অর্থাৎ জীনগুলি) স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে—কখনই তারা সক্রিয় হয় না।

(b) **ফ্যাকাল্‌টেটিভ হেটেরোক্রোমাটিন** (Facultative heterochromatin)ঃ এই প্রকার হেটেরোক্রোমাটিনে ক্রোমাটিন সূত্রগুলি সবসময় প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে না। ফলে এই অংশে উপস্থিত জীনগুলি মাঝে-মাঝে (অর্থাৎ ক্রোমাটিন সূত্রের প্যাঁচবিহীন অবস্থায়) সক্রিয় হয়।

● হেটেরোক্রোমাটিন এবং ইউক্রোমাটিনের পার্থক্য ●

হেটেরোক্রোমাটিন	ইউক্রোমাটিন
1. ইন্টারফেজ দশায় ও প্রোফেজ দশার প্রথম দিকে গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয়।	1. ইন্টারফেজ ও প্রোফেজ দশায় হালকা রঙ গ্রহণ করে।
2. ইউক্রোমাটিন অংশের রেপ্লিকেশনের পর হেটেরোক্রোমাটিন অংশের রেপ্লিকেশন (প্রতিরূপ সৃষ্টি) ঘটে।	2. হেটেরোক্রোমাটিনের রেপ্লিকেশনের পূর্বে ইউক্রোমাটিনের রেপ্লিকেশন ঘটে।
3. হেটেরোক্রোমাটিন অংশে উপস্থিত জীনগুলি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।	3. ইউক্রোমাটিন অংশে উপস্থিত জীনগুলি সক্রিয় অবস্থায় থাকে।

(iv) **নিউক্লিওলাস** (Nucleolus) **: নিউক্লিয়াসের ভিতর এক বা একাধিক বড়, গোলাকার ও ঘন বস্তু থাকে যেগুলি অম্লীয় রঙে রঞ্জিত হয়। ঐ বস্তুগুলির নাম নিউক্লিওলাস।** এদের সংখ্যা সাধারণত কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের ক্ষেত্রে প্রতি প্রস্থ হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোসোমের জন্য এক জোড়া করে নিউক্লিওলাস থাকে। অর্থাৎ, মানুষের প্রতি ডিপ্লয়েড ($2n$) কোষে দু' জোড়া করে নিউক্লিওলাস পাওয়া যায়। সাধারণত নির্দিষ্ট এক বা একাধিক ক্রোমোসোমের হেটেরোক্রোমাটিক অঞ্চলের সঙ্গে নিউক্লিওলাস যুক্ত থাকে। কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিওলাসের অবলুপ্তি ঘটে এবং বিভাজনের শেষ দশায় তা পুনর্গঠিত হয়।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জানা গেছে যে, নিম্নলিখিত চারটি অংশ নিয়ে নিউক্লিওলাস গঠিত (চিত্র 2.29) :

(i) **দানাদার অংশ** (Granular zone) **:** নিউক্লিওলাসের পরিধির দিকে দানাদার অংশ থাকে। রাইবো-নিউক্লিওপ্রোটীন দিয়ে গঠিত এই দানাগুলি যদিও রাইবোসোমের চেয়ে আকারে ছোট, এদের থেকেই যথাসময়ে রাইবোসোমের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ, এরা রাইবোসোমের পূর্বসূরী (precursors)।

(ii) **সূত্রাকার অংশ** (Fibrillar zone) **:** সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম সুতার মত বস্তু দিয়ে গঠিত এই অংশটি নিউক্লিওলাসের কেন্দ্রের দিকে থাকে। সুতার মত বস্তুগুলি দানাদার বস্তুগুলির মতই রাইবো-নিউক্লিওপ্রোটীন দিয়ে তৈরি এবং এই সুতার মত বস্তুগুলিই ধীরে ধীরে দানাদার বস্তুতে রূপান্তরিত হয়।

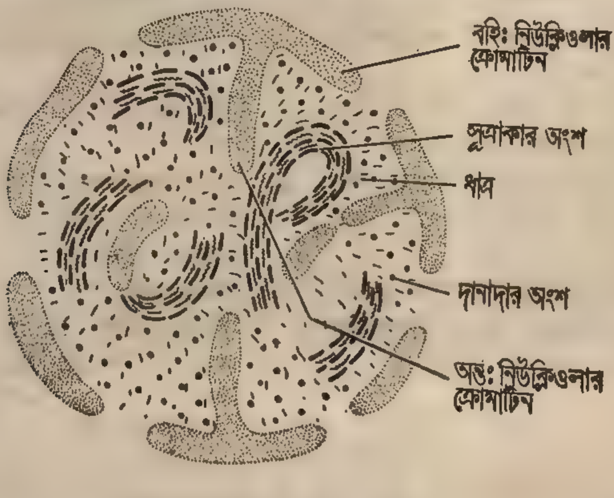

চিত্র 2.29 : নিউক্লিওলাসের আলট্রা গঠন।

(iii) **অনিয়তাকার অংশ** (Amorphous zone) **:** এই অংশটিই নিউক্লিওলাসের ধাত্র (matrix)। এই অংশের মধ্যেই দানাদার ও সূত্রাকার অংশ ভাসমান থাকে। এই অংশ প্রোটীন দ্বারা গঠিত। এর অপর নাম **পার্স অ্যামরফা** (Pars amorpha)।

(iv) **ক্রোমাটিন অঞ্চল** (Chromatin zone) ঃ নিউক্লিওলাসের পরিধি বরাবর কিছু ক্রোমাটিন সূত্র দেখা যায়। এই সূত্রগুলি **DNA** দ্বারা গঠিত। কোন-কোন স্থানে এই সূত্রের অংশবিশেষ নিউক্লিওলাসের ধাত্রের মধ্যেও প্রসারিত থাকে এবং **অন্তঃনিউক্লিওলার ক্রোমাটিন** (intranucleolar chromatin) রূপে পরিচিত হয়।

নিউক্লিওলাসের কার্য ঃ (i) নিউক্লিওলাসের মুখ্য কাজ রাইবোসোম গঠন। অতএব বলা যায়, প্রোটীন সংশ্লেষেও নিউক্লিওলাসের পরোক্ষ ভূমিকা আছে। (ii) কোষ বিভাজনেও নিউক্লিওলাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেখা গেছে, যেসব কোষে দুটি নিউক্লিওলাস থাকে, তাদের মধ্যে একটিও যদি কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে কোষ বিভাজন চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

নিউক্লিয়াসের কার্য ঃ (i) কোষের যাবতীয় বিপাকীয় কার্য (metabolic activities) নিউক্লিয়াসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নিউক্লিয়াসের ভিতর অবস্থিত জীন বিভিন্ন উৎসেচক সৃষ্টির সঙ্কেত দানের মাধ্যমে (by supplying codes) উক্ত কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। (ii) কোষের নিজস্ব যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে (গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয়) সেগুলিও নিউক্লিয়াসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। (iii) পিতামাতা থেকে সন্তান-সন্ততির মধ্যে বংশধারা হস্তান্তরের কাজে নিউক্লিয়াস প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

● নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিওলাসের পার্থক্য ●

নিউক্লিয়াস	নিউক্লিওলাস
1. এটি কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু।	1. এটি নিউক্লিয়াসের একটি অংশ
2. একটি পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকে —ঐ পর্দার নাম নিউক্লীয় পর্দা।	2. কোন পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকে না।
3. এটি নিউক্লীয় পর্দা, নিউক্লীয় রস, ক্রোমাটিন ও নিউক্লিওলাস নিয়ে গঠিত।	3. এটি দানাদার অংশ, সূত্রাকার অংশ, অনিয়তাকার অংশ ও ক্রোমাটিন অঞ্চল নিয়ে গঠিত।
4. কোষে উপস্থিত ক্রোমোসোমের গ্রন্থ (set) সংখ্যার সঙ্গে নিউক্লিয়াসের সংখ্যার কোন সম্পর্ক নেই।	4. ক্রোমোসোমের গ্রন্থ সংখ্যার সঙ্গে নিউক্লিওলাসের সংখ্যার সম্পর্ক আছে। প্রত্যেক প্রজাতিতে প্রতি গ্রন্থ ক্রোমোসোম পিছু নিউক্লিওলাসের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট।
5. কোষের যাবতীয় বিপাকীয় কার্য নিয়ন্ত্রণ করে।	5. রাইবোসোম গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
6. এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে বংশধারা পরিবহণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।	6. বংশধারা পরিবহণে কোন ভূমিকা নেই।

2.10F. রাইবোসোম (Ribosome)

সাইটোপ্লাজমে এবং এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের বহির্গাত্রে অবস্থিত রাইবো-নিউক্লিওপ্রোটীন দ্বারা গঠিত যেসব ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণা (particles) প্রোটীন সংশ্লেষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, তাদের নাম রাইবোসোম।

ক্লড (Claude) 1943 খ্রীষ্টাব্দে রাইবোসোমের উপস্থিতি কোষের মধ্যে প্রথম লক্ষ্য করেন। কিন্তু **প্যালাডে** (Palade) 1955 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এদের নামকরণ করেন **রাইবোসোম** বলে।

অবস্থান (Site) : প্রোক্যারিওটিক কোষে রাইবোসোমের অবস্থান সাইটোপ্লাজমে। ইউক্যারিওটিক কোষে সাইটোপ্লাজমে এবং এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের বহির্গাত্রে—এই দু' জায়গাতেই এদের দেখা যায়। বস্তুতপক্ষে, সাইটোপ্লাজম থেকে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের পর্দায়, আবার সেখান থেকে সাইটোপ্লাজমে এদের ক্রমিক স্থান পরিবর্তন ঘটে।

প্রকার (Type) : আয়তন বা মাপ (size) এবং অবক্ষেপণ গুণাঙ্ক* (sedimentation coefficient) অনুযায়ী রাইবোসোম তিন প্রকারের।

(i) **80 S রাইবোসোম** : এদের অবক্ষেপণ গুণাঙ্ক 80 S। এই প্রকার রাইবোসোম ইউক্যারিওটিক কোষে পাওয়া যায়।

(ii) **70 S রাইবোসোম** : এদের অবক্ষেপণ গুণাঙ্ক 70 S। ব্যাকটিরিয়ার কোষে এই প্রকার রাইবোসোম পাওয়া যায়।

(iii) **55 S রাইবোসোম** : এদের অবক্ষেপণ গুণাঙ্ক 55 S। ইউক্যারিওটিক কোষের মাইটোকনড্রিয়ায় এই প্রকার রাইবোসোম পাওয়া যায়।

পরাণুবীক্ষণিক গঠন বা আলট্রা গঠন (Ultra structure) : রাইবোসোমের আকৃতি অনেকটা গোল বা ডিমের মত ; আনুমানিক ব্যাস 230Å। প্রত্যেক রাইবোসোম দুটি করে অংশ বা **সাব-ইউনিট** নিয়ে গঠিত। অধিকাংশ কোষে বড় অংশ বা সাব-ইউনিটটি দেখতে অনেকটা গম্বুজের মত (dome-shaped) এবং ছোট সাব-ইউনিটটি একটি টুপির মত বড় সাব-ইউনিটটির চ্যাপ্টা দিকে লেগে থাকে (চিত্র 2.30)। যকৃতের কোষে উক্ত দুটি সাব-ইউনিটের আকৃতি (shape) উপরিউক্ত আকৃতি থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের বলে জানা গেছে।

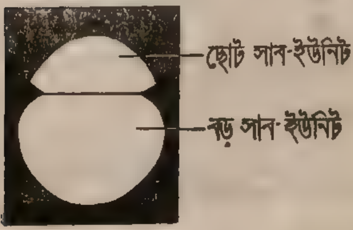

চিত্র 2.30 : রাইবোসোম।

70 S রাইবোসোমের বড় ও ছোট সাব-ইউনিটের অবক্ষেপণ গুণাঙ্ক যথাক্রমে

* দ্রুতগতিসম্পন্ন সেণ্ট্রিফিউজ যন্ত্রে ঘূর্ণনকালে কোষের উপাংশগুলি অবক্ষেপিত হয়ে তাদের আণবিক গুরুত্ব (molecular weight) অনুযায়ী এক-একটি স্তরে জমা হয়—এরই নাম 'অবক্ষেপণ গুণাঙ্ক'।

50 S এবং 30 S। সেইরকম, 80 S রাইবোসোমের বড় ও ছোট সাব-ইউনিটের অবক্ষেপণ গুণাঙ্ক যথাক্রমে 60 S এবং 40 S। 55 S রাইবোসোমের দুটি সাব-ইউনিটের অবক্ষেপণ গুণাঙ্ক 35 S ও 25 S (সারণী 2.1)।

সারণী 2.1 : একনজরে বিভিন্ন প্রকার রাইবোসোম সম্পর্কিত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান	সামগ্রিক অবক্ষেপণ গুণাঙ্ক	বড় সাব-ইউনিটের অবক্ষেপণ গুণাঙ্ক	ছোট সাব-ইউনিটের অবক্ষেপণ গুণাঙ্ক
ইউক্যারিওটিক কোষ	80 S	60 S	40 S
ব্যাকটিরিয়া	70 S	50 S	30 S
মাইটোকনড্রিয়া	55 S	35 S	25 S

ইউক্যারিওটিক কোষের এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের বা অন্য কোন উপাংশের পর্দাগাত্রে (যথা—নিউক্লীয় পর্দায়) সংলগ্ন থাকার সময় রাইবোসোমের কেবলমাত্র বড় সাব-ইউনিটটি (বা বৃহৎ এককটি) পর্দাগাত্রের সংস্পর্শে থাকে এবং ছোট সাব-ইউনিটটি (বা ক্ষুদ্র এককটি) বড় সাব-ইউনিটের চ্যাপ্টা দিকে টুপির মত লেগে থাকে (চিত্র 2.31)। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা গেছে, রাইবোসোম বহু ছিদ্রবিশিষ্ট

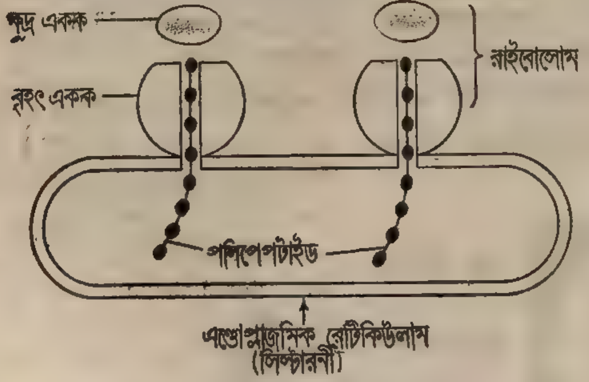

চিত্র **2.31** : এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের গাত্র-সংলগ্ন রাইবোসোমের শীর্ষক ছেদ।

(porous) এবং বড় সাব-ইউনিটটির মধ্যে শীর্ষকভাবে (vertically) একটি সূক্ষ্ম নালী আছে। ঐ নালীপথে রাইবোসোমে সংশ্লেষিত পলিপেপটাইডগুলি বেরিয়ে আসে।

রাইবোসোমের সাব-ইউনিটের সংযুক্তি ও বিযুক্তিভবন (Association and Dissociation of Ribosomal sub-units) : সাধারণত রাইবোসোমের

সাব-ইউনিটগুলি পরস্পর থেকে মুক্ত অবস্থায় সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ছড়ানো থাকে। কোষে প্রোটীন সংশ্লেষের (**Protein synthesis**) সময় দুটি-দুটি করে সাব-ইউনিট যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ রাইবোসোম গঠিত হয়। প্রোটীন সংশ্লেষ সম্পূর্ণ হলে সাব-ইউনিট দুটি পরস্পর থেকে আবার বিযুক্ত হয়ে যায় (চিত্র 2.32)।

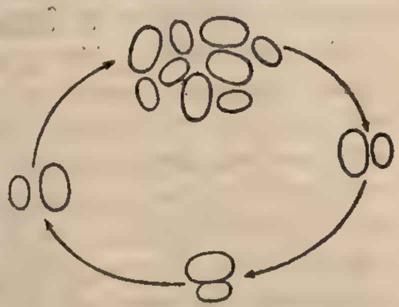

চিত্র 2.32 : রাইবোসোমের দুটি সাব-ইউনিটের সংযুক্তি ও বিযুক্তিভবন।

রাসায়নিক উপাদান (Chemical composition) : রাইবোসোম প্রধানত **RNA ও প্রোটীন** দ্বারা গঠিত—স্বল্প পরিমাণে লিপিড এবং ধাতব আয়ন (**metallic ions**)-ও এতে থাকে। **RNA** ও প্রোটীন প্রায় সম-পরিমাণে থাকে। **RNA**-র পরিমাণ ইউক্যারিওটিক কোষের রাইবোসোমে শতকরা প্রায় 45 ভাগ (45%) এবং ব্যাকটীরিয়ার কোষের রাইবোসোমে শতকরা প্রায় 65 ভাগ (65%)। রাইবোসোমে উপস্থিত প্রোটীনগুলির মধ্যে অধিকাংশই **উৎসেচক** এবং তারা প্রোটীন সংশ্লেষে অংশ গ্রহণ করে।

রাইবোসোম যে **RNA** দ্বারা গঠিত, তাকে *r* **RNA** (Ribosomal **RNA**) বলা হয়। নিউক্লিওলাসের মধ্যে *r* **RNA** সংশ্লেষিত হয়।

রাইবোসোমের কার্য (Function of Ribosome) **:** রাইবোসোমকে কোষের **'প্রোটীন কারখানা'** (**Protein factory**) বলা হয়। কেননা, রাইবোসোমের মধ্যে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড নির্দিষ্ট ক্রমে (**sequence**) যুক্ত হয়ে এক-একটি পলিপেপটাইড গঠিত হয় এবং ঐ পলিপেপটাইডগুলির সংযোগে গঠিত হয় প্রোটীন। অতএব, রাইবোসোমের কাজ **প্রোটীন সংশ্লেষ** (**protein synthesis**) করা।

প্রোটীন সংশ্লেষের সময় কয়েকটি করে রাইবোসোম একসঙ্গে মিলিত হয়ে এক-একটি দল গঠন করে। প্রোটীন সংশ্লেষে নিয়োজিত রাইবোসোমের এইরকম এক-একটি দল **পলিরাইবোসোম** (**polyribosome**) বা **পলিসোম** (**polysome**) নামে পরিচিত।

2.10G. প্লাস্টিড (Plastids)

ছত্রাক ব্যতীত অন্যান্য উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত রঞ্জকযুক্ত বা রঞ্জকবিহীন, স্ববিভাজনশীল এবং বিভিন্ন খাদ্যবস্তু সংশ্লেষ অথবা সঞ্চয়ে সক্ষম অঙ্গাণুকে প্লাসটিড বলে।

প্লাসটিড উদ্ভিদকোষের বৈশিষ্ট্য। ছত্রাক ব্যতীত সমস্ত উদ্ভিদে প্লাসটিড পাওয়া যায়। ব্যাকটীরিয়ায়, প্রাণিকোষে এবং ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদে প্লাসটিড পাওয়া যায় না। **ই. হেকেল** 1866 খ্রীষ্টাব্দে প্লাসটিড কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। এদের ব্যাস সাধারণত **4-6**μ এবং এরা **1-3**μ পর্যন্ত পুরু হয়।

শ্রেণীবিভাগ (Classification) **:** বর্ণ অনুযায়ী প্লাসটিড প্রধানত তিন রকমের : (1) **ক্লোরোপ্লাস্ট** বা সবুজ বর্ণের প্লাসটিড, (2) **ক্রোমোপ্লাস্ট** বা অ-সবুজ রঙিন প্লাসটিড ও (3) **লিউকোপ্লাস্ট** বা বর্ণহীন প্লাসটিড।

(1) **ক্লোরোপ্লাস্ট** (Chloroplasts ; গ্রীক শব্দ Chloros=সবুজ, plasticas=ছাঁচে তৈরি) : এদের রঙ সবুজ। উদ্ভিদের সবুজ অংশে (যথা—পাতা, কচি কান্ড, ফুলের বৃতি ইত্যাদিতে) এদের পাওয়া যায়। এদের সবুজ রঙের মূলে আছে **ক্লোরোফিল** (chlorophyll) নামে একপ্রকার সবুজ রঙ্গক (pigment)। এই ক্লোরোফিল প্রকৃতপক্ষে চার রকম রঙ্গকের সমষ্টি—যথা, **ক্লোরোফিল a** (নীলাভ-সবুজ), **ক্লোরোফিল b** (হরিদ্রাভ-সবুজ), **ক্যারোটিন** (কমলা) এবং **জ্যান্থোফিল** (হলুদ)। বিজ্ঞানী **শিম্পার** (Schimper) 1883 খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভিদকোষ মধ্যস্থিত সবুজ কণিকাগুলির নামকরণ করেন ক্লোরোপ্লাসটিডস।

আকৃতি : উন্নততর উদ্ভিদে ক্লোরোপ্লাস্ট কিছুটা চ্যাপ্টা ও ডিম্বাকার বা গোলাকার; কিন্তু শৈবালদের মধ্যে নানা আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায়; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—স্পাইরোগাইরায় (*Spirogyra*) ফিতার মত, ইউলোথ্রিক্সে (*Ulothrix*) কটিবন্ধের মত (girdle-shaped), ক্ল্যামাইডোমোনাসে (*Chlamydomonas*) কাপের মত এবং ইডোগোনিয়ামে (*Oedogonium*) জালের মত দেখতে (চিত্র 2.33)।

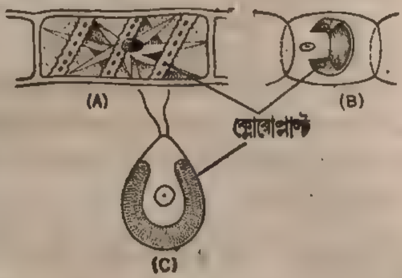

চিত্র 2.33 : শৈবালে বিভিন্ন আকৃতির ক্লোরোপ্লাসটিড।

সংখ্যা : উন্নততর উদ্ভিদের সবুজ অংশে কোষপ্রতি 20-40টি ক্লোরোপ্লাসটিড পাওয়া যায়, কিন্তু শৈবালে সাধারণত কোষপ্রতি 1টি করে ক্লোরোপ্লাসটিড থাকে।

আলট্রা গঠন বা পরাণুবীক্ষণিক গঠন : বিভিন্ন প্রকার প্লাসটিডের মধ্যে ক্লোরোপ্লাসটিডের আলট্রা গঠন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেছে।

চিত্র 2.34 : ক্লোরোপ্লাস্টের পরাণুবীক্ষণিক গঠন (ত্রিমাত্রিক চিত্র)।

প্রতিটি ক্লোরোপ্লাসটিড লাইপোপ্রোটীন দিয়ে তৈরি দুটি করে একক আবরণী দ্বারা ঘেরা থাকে। ঐ আবরণীগুলিকে **ক্লোরোপ্লাস্ট পর্দা** বলা হয়। ক্লোরোপ্লাসটিডের ভিতর একটা কোলয়েড জাতীয় দ্রবণ থাকে, যার নাম **স্ট্রোমা** (stroma) (চিত্র 2.34)। স্ট্রোমার মধ্যে সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন উৎসেচক, প্রোটীন

দানা, শ্বেতসার দানা, রাইবোসোম, DNA, RNA, সাইটোক্রোম রঙ্গক, খনিজ আয়ন ইত্যাদি উপস্থিত থাকে। এছাড়া স্ট্রোমার মধ্যে অসংখ্য চাকতির মত (disc-shaped) অংশ থাকে—ঐগুলির নাম **থাইলাকয়েড** (Thylakoid)। প্রতিটি থাইলাকয়েড একক আবরণী দিয়ে ঘেরা থাকে। কতকগুলি করে থাইলাকয়েড একটির উপর একটি সজ্জিত হয়ে এক-একটি থাক (stack) গঠন করে। এই থাকগুলিকে **গ্রানা*** (Grana) বলে। প্রতিটি ক্লোরোপ্লাস্টে গ্রানার সংখ্যা 60—80টি।

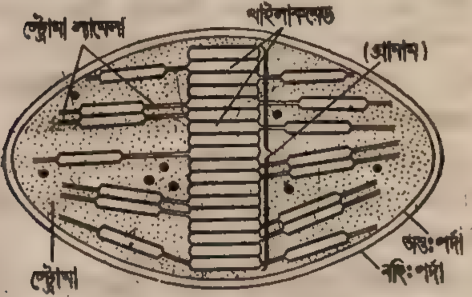

চিত্র 2.35 : ক্লোরোপ্লাস্টের পরাণুবীক্ষণিক গঠন (প্রস্থচ্ছেদ)।

সন্নিহিত গ্রানাগুলি একে অপরের সঙ্গে সূক্ষ্ম নালিকা দ্বারা যুক্ত থাকে—ঐ নালিকাগুলিকে **স্ট্রোমা ল্যামেলী** (Stroma lamellae) বা **ফ্রেট** (Fret) বলা হয়। থাইলাকয়েডের আবরণীর মধ্যে অসংখ্য ছোট-ছোট কেলাসিত কণার মত অংশ (paracrystalline particles) দেখা যায়। ঐগুলির নাম **কোয়াণ্টাসোম** (Quantasome)। অনেকগুলি ক্লোরোফিল কণা ও কিছু ক্যারোটিনয়েড** কণা নিয়ে এক-একটি কোয়াণ্টাসোম কণা গঠিত হয়। এই কোয়াণ্টাসোম কণা সালোকসংশ্লেষের **হিল বিক্রিয়ায়** (Hill's reaction) অংশ গ্রহণ করে।

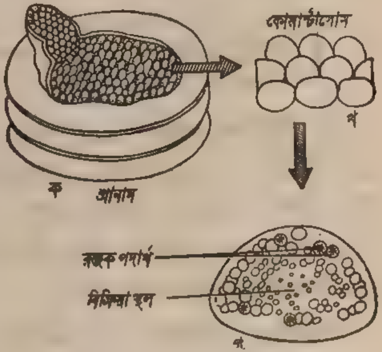

চিত্র 2.36 : ক্লোরোপ্লাস্টের অংশবিশেষের পরাণুবীক্ষণিক গঠন।

কার্য : (i) ক্লোরোপ্লাসটিডের প্রধান কাজ সালোকসংশ্লেষ ঘটিয়ে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈরি করা। (ii) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক শক্তি অর্থাৎ ATP সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে সরবরাহ করা। (iii) কোন-কোন বিজ্ঞানীর মতে ক্লোরোপ্লাসটিড রাইবোসোমের সাহায্যে প্রোটীন সংশ্লেষে সহায়তা করে।

সালোকসংশ্লেষে সক্ষম সবুজ বর্ণের প্লাসটিডের নাম ক্লোরোপ্লাস্ট।

---

* ইংরেজীতে একবচনে **গ্রানাম** (Granum) ও বহুবচনে **গ্রানা** (Grana)।

** ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল প্রভৃতি আরও কতকগুলি অ-সবুজ রঙ্গককে সামগ্রিকভাবে 'ক্যারোটিনয়েড' বলা হয়।

(2) **ক্রোমোপ্লাস্ট** (Chromoplasts ; গ্রীক শব্দ Chroma=রঙিন, plasticas=ছাঁচে তৈরি) ঃ সবুজ ভিন্ন অন্যান্য যেসব রঙিন প্লাসটিড উদ্ভিদদেহে পাওয়া যায়, তাদের ক্রোমোপ্লাস্ট বলা হয়। ফুলের রঙিন পাপড়ি, পাকা ফলের খোসা ও গাজরের মূলে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে। লাল, হলুদ, কমলা প্রভৃতি নানা রঙের ক্রোমোপ্লাসটিড দেখা যায়। এদের বিভিন্ন রঙের মূলে আছে **ক্যারোটিন** (কমলা), **জ্যান্থোফিল** (হলুদ), **লাইকোপিন** (লাল) প্রভৃতি রঙ্গক (pigments)। কমলালেবুর খোসা ও গাজরের মূলে উপস্থিত ক্রোমোপ্লাস্টে ক্যারোটিন ; পাকা কলা, পেয়ারা ইত্যাদিতে জ্যান্থোফিল এবং পাকা লঙ্কা, টম্যাটো ও গোলাপের পাপড়িতে লাইকোপিন নামক রঙ্গক থাকে।

আকৃতি ঃ নানা আকৃতির ক্রোমোপ্লাস্ট দেখা যায়—তবে অধিকাংশই সরু সূচের মত, তারার (star) মত অথবা মাকুর (spindle) মত দেখতে।

কার্য ঃ (i) ফুলে উপস্থিত ক্রোমোপ্লাসটিড পতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাণীকে আকৃষ্ট করে উদ্ভিদের পরাগযোগে (pollination) সাহায্য করে। (ii) ফলে উপস্থিত ক্রোমোপ্লাসটিড বিভিন্ন প্রাণীকে আকৃষ্ট করে ফল ও বীজের বিস্তার (dispersal) ঘটাতে সাহায্য করে।

সবুজ কণাবিহীন রঙিন প্লাসটিডের নাম ক্রোমোপ্লাস্ট।

(3) **লিউকোপ্লাস্ট** (Leucoplasts ; গ্রীক শব্দ Leucos=সাদা, plasticas =ছাঁচে তৈরি) ঃ এরা বর্ণহীন। এদের মধ্যে কোন রঙ্গক থাকে না। উদ্ভিদের যেসব কোষে সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারে না সেইসব কোষে লিউকোপ্লাসটিড থাকে। উদ্ভিদের মূল, ভূ-নিম্নস্থ কান্ড প্রভৃতি সঞ্চয়ী অঙ্গের (storage organs) কোষে প্রচুর লিউকোপ্লাসটিড পাওয়া যায়।

আকৃতি ঃ দন্ডাকার (rod-shaped), গোলাকার (spherical), ডিম্বাকার (ovoid) প্রভৃতি নানা আকৃতির লিউকোপ্লাস্ট দেখা যায়।

শ্রেণীবিভাগ ঃ লিউকোপ্লাসটিড তিন রকমের, যথা—(i) **অ্যামাইলোপ্লাস্ট** (Amyloplasts), (ii) **অ্যালিউরোনপ্লাস্ট** (Aleuroneplast), (iii) **এলাইয়োপ্লাস্ট** (Elaioplast)।

(i) **অ্যামাইলোপ্লাস্ট ঃ** এরা দ্রবণীয় শর্করাকে অদ্রবণীয় শ্বেতসারে পরিণত করে সঞ্চয় করে।

(ii) **অ্যালিউরোনপ্লাস্ট ঃ** এদের অপর নাম প্রোটীনোপ্লাস্ট। এরা প্রোটীন জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে।

(iii) **এলাইয়োপ্লাস্ট ঃ** এরা তৈলজাতীয় খাদ্যকে সঞ্চয় করে রাখে।

কার্য ঃ এরা উদ্ভিদের বিভিন্ন সঞ্চয়ী অঙ্গে দ্রবীভূত খাদ্যবস্তুকে সঞ্চয়যোগ্য খাদ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করে।

বর্ণহীন প্লাসটিডের নাম লিউকোপ্লাসটিড

● ক্রোমোপ্লাস্ট ও অ্যামাইলোপ্লাস্টের পার্থক্য ●

ক্রোমোপ্লাস্ট	অ্যামাইলোপ্লাস্ট
1. সবুজ রঙ্গক (ক্লোরোফিল) ছাড়া অন্য যে কোন বর্ণযুক্ত প্লাসটিডকে ক্রোমোপ্লাসটিড বলে। এতে কমলা বর্ণের ক্যারোটিন ও হলুদ বর্ণের জ্যান্থোফিল নামক রঙ্গক পদার্থ থাকে।	1. শ্বেতসার সঞ্চয়কারী এবং রঙ্গক পদার্থবিহীন লিউকোপ্লাসটিডকে অ্যামাইলোপ্লাস্ট বলে।
2. এগুলি দেখতে দন্ডাকার, গোলাকার, তারকার মত অথবা মাকুর মত।	2. এগুলি দেখতে দন্ডাকার, ডিম্বাকার বা গোলাকার হয়।
3. ফুল, ফল, মূল, কান্ড ইত্যাদি অঙ্গে থাকে।	3. উদ্ভিদের যে সকল অঙ্গে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, যথা—মূল, ভূ-নিম্নস্থ কান্ড ইত্যাদি, সেই সব অঙ্গে থাকে।
4. কাজ ঃ এরা পরাগযোগে এবং ফল ও বীজের বিস্তারে সাহায্য করে।	4. কাজ ঃ এরা দ্রবণীয় শর্করাকে অদ্রবণীয় শ্বেতসারে পরিণত করে সঞ্চয় করে রাখে।

প্লাসটিডের রূপান্তর (Transformation of plastids) **ঃ** বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে প্লাসটিডের রূপান্তর ঘটে ; অর্থাৎ এক প্রকার প্লাসটিড অন্য আর এক প্রকার প্লাসটিডে পরিবর্তিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, (i) কাঁচা কলা, পেয়ারা, কমলালেবু ইত্যাদির খোসায় উপস্থিত ক্লোরোপ্লাস্ট, ঐসব ফল পাকার সময় ক্রোমোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয়। (ii) দীর্ঘকাল সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত হলে ক্লোরোপ্লাস্ট বর্ণহীন লিউকোপ্লাস্টে পরিণত হয় ; পুনরায় সূর্যের আলো পেলে ঐসব লিউকোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয়।

প্লাসটিডের উৎপত্তি (Origin of plastids) **ঃ** দুই পর্দাবেষ্টিত **প্রোপ্লাসটিড** (**Proplastid**) নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গাণু থেকে প্লাসটিডের উৎপত্তি হয়। প্লাসটিডে রূপান্তরের সময় প্রোপ্লাসটিডগুলি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং তাদের অন্তঃপর্দাটি স্থানে স্থানে ভিতর দিকে ঢুকে ছোট-ছোট **ভেসিকল** সৃষ্টি করে। পরে ভেসিকলগুলি অন্তঃপর্দা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরের কাছে এসে কালক্রমে **গ্রানা** গঠন করে।

● তিন প্রকার প্লাসটিডের তুলনামূলক আলোচনা ●

ক্লোরোপ্লাস্ট	ক্রোমোপ্লাস্ট	লিউকোপ্লাস্ট
1. সবুজ প্লাসটিড।	1. অ-সবুজ রঙিন প্লাসটিড।	1. বর্ণহীন প্লাসটিড।
2. প্রধান রঙ্গক ক্লোরোফিল। সামান্য পরিমাণে ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল থাকে।	2. প্রধান রঙ্গক ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল। ক্লোরোফিল থাকে না।	2. কোন রঙ্গক থাকে না।
3. থাইলাকয়েড আছে।	3. থাইলাকয়েড নেই।	3. থাইলাকয়েড নেই।
4. সালোকসংশ্লেষ ঘটায়।	4. পরাগযোগে এবং ফল ও বীজের বিস্তারে সাহায্য করে।	4. খাদ্যবস্তু সঞ্চয়ে সাহায্য করে।

2.10H. গলগি বডি (Golgi body)

কোষীয় ক্ষরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পর্দাবেষ্টিত কোষ অঙ্গাণুর নাম গলগি বডি।

এল. সেন্ট. জর্জ (L. St. George) 1867 খ্রীষ্টাব্দে কোষের মধ্যে এই অঙ্গাণুটির অস্তিত্ব সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন। তবে এর গঠন সম্পর্কে প্রথম বিবরণ দান করেন **ক্যামিলো গলগি** (Camilo Golgi) 1898 খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁর নাম অনুসারেই অঙ্গাণুটির নাম দেওয়া হয় 'গলগি বডি'। তবে এই নাম ছাড়া আরও অনেকগুলি নামে অঙ্গাণুটি পরিচিত, যথা—গলগি অ্যাপারেটাস, গলগি সাবস্ট্যান্স, গলগি কমপ্লেক্স, লাইপোকনড্রিয়া (Lipochondria), ডিকটিওসোম (Dictyosome), ইডিওসোম (Idiosome) ইত্যাদি। বর্তমানে মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এই অঙ্গাণুটিকে **গলগি** এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে ও উদ্ভিদে **ডিকটিওসোম** বলা হয়।

সমস্ত ইউক্যারিওটিক কোষে গলগি বডি পাওয়া যায়, কিন্তু কোন প্রোক্যারিওটিক কোষে এর অস্তিত্ব নেই।

অবস্থান (Site) : (i) মেরুদণ্ডী প্রাণীতে কোষের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গলগি বডিকে দেখা যায়। এইসব প্রাণীতে নিউক্লিয়াসের কাছে এবং সেন্ট্রিওলের আশেপাশে গলগি বডির অবস্থান।

(ii) অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের কোষে, উদ্ভিদকোষে এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের যকৃত ও নার্ভকোষে গলগি বডি কোন নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে না। এইসব কোষে গলগির উপাদানগুলি সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো থাকে।

আকার ও আয়তন (Shape and Size) : বিভিন্ন কোষে গলগির আকার ও আয়তনে যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। ক্ষরণ কোষে এই অঙ্গাণুটি অত্যন্ত সুগঠিত হয়। তাছাড়া, প্রবীণ কোষের তুলনায় নবীন কোষে অঙ্গাণুটি সুগঠিত থাকে। কোষের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাণুটি ছোট হতে থাকে এবং অবশেষে তার বিনাশ ঘটে।

আলট্রা গঠন বা পরাণুবীক্ষণিক গঠন ঃ কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপে গলগি বডিকে জালের মত দেখায়। ইলেক্‌ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এর গঠন স্পষ্টভাবে বোঝা

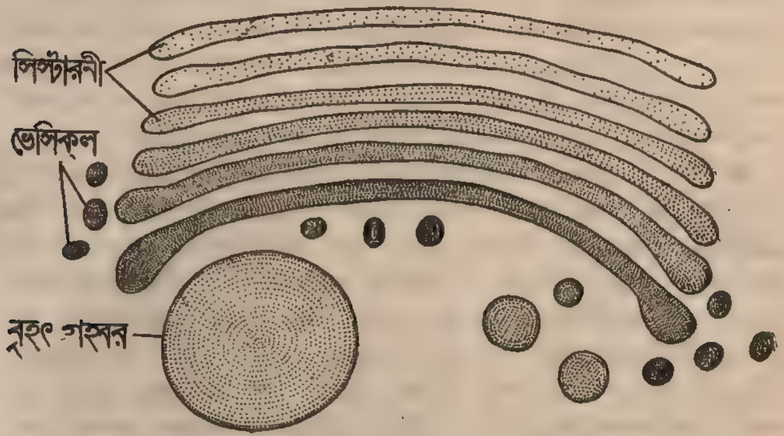

চিত্র 2 37 ঃ গলগি বডি।

যায়। শেষোক্ত যন্ত্রে পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে, গলগি বডি তিন রকম উপাদান দ্বারা গঠিত—(A) **সিস্টারনী** (Cisternae) বা **চ্যাপ্টা থলি,** (B) **ভ্যাকুওল** (Vacuole) বা **গহ্বর** এবং (C) **ভেসিক্‌ল** (Vesicles) বা **অণু গহ্বর** (চিত্র 2.37)।

(A) **সিস্টারনী*** ঃ এরা লম্বা ও চ্যাপ্টা নালী বা থলির মত দেখতে এবং পর পর সমান্তরালভাবে থাকে। সিস্টারনাগুলির একটি দিক উত্তল (Convex) এবং অপর দিক অবতল (Concave)। উত্তল দিকটি এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের (2.10 I প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য) কাছে থাকে—অবতল দিকটিকে গলগির পরিণত তল (maturing face) বলে। এক-একটি গলগি বডিতে 3-12টি সিস্টারনী থাকে। সিস্টারনীগুলি লাইপোপ্রোটীন নির্মিত দুটি করে একক পর্দা দ্বারা গঠিত—পর্দা দুটি দুই প্রান্তে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রতিটি পর্দা 60-70Å পুরু এবং মসৃণ গাত্রবিশিষ্ট। পর্দা দুটির মধ্যবর্তী নালিকাটি 60-90Å চওড়া হয়। সিস্টারনীর অপর নাম **ল্যামেলী** (Lamellae)।

(B) **ভ্যাকুওল** বা **গহ্বর** ঃ এগুলি দেখতে গোল থলির মত। মনে করা হয় সিস্টারনী বিস্তৃত হয়ে ভ্যাকুওলের সৃষ্টি হয়। এক-একটি গলগি বডিতে একাধিক ভ্যাকুওল থাকে। প্রতিটি ভ্যাকুওলের আনুমানিক ব্যাস 60-200Å।

(C) **ভেসিক্‌ল বা অণু গহ্বর ঃ** এগুলি দেখতে ছোট-ছোট জল-বিন্দুর (droplets) মত। সিস্টারনীর প্রান্তদেশে এরা পুঞ্জাকারে (clusters) থাকে।

* একবচনে 'সিস্টারনা'—বহুবচনে 'সিস্টারনী'।

সিস্টারনীর প্রান্ত থেকে কোরকোদ্গম (budding) প্রক্রিয়ায় এদের উৎপত্তি ঘটে বলে মনে করা হয়। এদের আনুমানিক ব্যাস 30-40Å।

উৎপত্তি (Origin) : গলগি বডির উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত আছে। কারও মতে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম থেকে, কারও মতে প্লাজমা পর্দা থেকে, আবার কারও মতে নিউক্লীয় পর্দা থেকে এদের উৎপত্তি হয়। তবে এদের গঠনের সঙ্গে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের গঠনের গভীর মিল থাকায় এবং কোন-কোন কোষে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের সঙ্গে গলগির প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকায়, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম থেকে এদের উৎপত্তি সমর্থিত হয়।

কার্য : (i) কোষের অন্যত্র সংশ্লেষিত বস্তুসমূহ গলগি বডিতে পৌঁছানোর পর, গলগি ঐসব বস্তু থেকে অতিরিক্ত জলকে নিষ্কাশন করে তাদের **ক্ষরণ দানায়** (secretary granules) পরিণত করে। (ii) ক্ষরণ দানাকে একক পর্দা দিয়ে ঘিরে তাদের ক্ষরণ ভেসিকল বা **প্রাথমিক লাইসোসোমে** (2.10K প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য) পরিণত করা গলগি বডির অন্যতম কাজ। (iii) গলগি সরল শর্করা থেকে নানাবিধ পলিস্যাকারাইড সৃষ্টিতে সহায়তা করে। (iv) গ্লাইকোপ্রোটীন সৃষ্টিতেও গলগি বডির একটি ভূমিকা আছে। (v) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে হরমোন ক্ষরণে গলগি সাহায্য করে। (vi) এনজাইম বা উৎসেচক ক্ষরণেও গলগি সাহায্য করে। (vii) উদ্ভিদে কোষপ্রাচীর গঠনে গলগি সক্রিয় ভূমিকা নেয়। (viii) শুক্রাণুর **অ্যাক্রোসোম*** (Acrosome) সৃষ্টিতেও গলগি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

2.10I. এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম (Endoplasmic reticulum)

ইউক্যারিওটিক কোষের সাইটোপ্লাজমে একক পর্দা (unit membrane) ঘেরা অসংখ্য সূক্ষ্ম গহবর জালের আকারে চারদিকে বিস্তৃত থাকে—ঐ গহবর তন্ত্রের (vacuolar system) নাম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পরিণত (mature) লোহিত কণিকা ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার ইউক্যারিওটিক কোষেই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম দেখা যায়। কোন প্রোক্যারিওটিক কোষে এর অস্তিত্ব নেই।

1945 খ্রীষ্টাব্দে **পোর্টার** (Porter) ও তাঁর সহকর্মীরা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোষের মধ্যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

আকার (Shape) : এরা দেখতে লম্বা ও চ্যাপ্টা, গোলাকার, ডিম্বাকার বা অনিয়ত শাখান্বিত সূক্ষ্ম নালীর মত হয়।

আলট্রা গঠন বা পরাণুবীক্ষণিক গঠন :

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের তিনটি বিভিন্ন রূপ (form) আছে ; যথা—(i) **সিস্টারনী** বা **ল্যামেলী** (Cisternae or Lamellae), (ii) **ভেসিকল** (Vesicles) ও (iii) **টিউবিউল** (Tubules) **বা নালিকাকার**।

---

* শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসের শীর্ষভাগে অবস্থিত এই অংশটির (অ্যাক্রোসোমের) মধ্যে গর্ভাধানের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলি থাকে।

(i) **সিস্টারনী** বা **ল্যামেলী** : এগুলি লম্বা ও চ্যাপ্টা ধরনের এবং একসঙ্গে অনেকগুলি সমান্তরালভাবে সজ্জিত থাকে (চিত্র 2.38)। ভিতরকার গহ্বরসহ প্রতিটি সিস্টারনা 400-500Å (40-50 ন্যানোমিটার) পুরু।

যেসব কোষ সক্রিয়ভাবে প্রোটীন সংশ্লেষ করে সেইসব কোষে সিস্টারনী দেখা যায় ; উদাহরণ— যকৃত, অগ্ন্যাশয় ও মস্তিষ্কের কোষ।

চিত্র 2.38 : এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম (দ্বিমাত্রিক চিত্র)।

(ii) **ভেসিক্‌ল** : এগুলি গোল বা ডিম্বাকার এবং এদের ব্যাস 250-5000Å (অর্থাৎ 25-500 ন্যানোমিটার)। যকৃত, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি যেসব অঙ্গ সক্রিয়ভাবে প্রোটীন সংশ্লেষ করে সেইসব অঙ্গের কোষে এদের দেখা যায়।

(iii) **টিউবিউল** বা **নালিকাকার** : এগুলি দেখতে শাখান্বিত সূক্ষ্ম নালীর মত ; এদের ব্যাস 500-1000Å (অর্থাৎ 50-100 ন্যানোমিটার)। স্টেরয়েড সংশ্লেষে সক্ষম কোষসমূহে এদের দেখা যায়। তাছাড়া, পেশীকোষ এবং ক্ষরণের সঙ্গে সম্পর্কহীন অন্যান্য কোষে (non-secretory cells)-ও এদের দেখা যায়।

চিত্র 2.39 : অমসৃণ গাত্রবিশিষ্ট এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম (ত্রিমাত্রিক চিত্র)।

এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামরূপী গহ্বর তন্ত্রের আবরণী, কোষের অন্যান্য অঙ্গাণুর আবরণীর মতই লিপিড ও প্রোটীন নির্মিত একক আবরণী।

সিস্টারনারূপী এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের আবরণীর বহির্গাত্র টি ভেসিক্‌ল ও টিউবিউলের বহির্গাত্রের তুলনায় অমসৃণ (rough) দেখায়। এই অমসৃণতার কারণ তাদের আবরণীর বহির্গাত্রে অসংখ্য রাইবোসোম যুক্ত থাকে (চিত্র 2.39)। রাইবোসোমের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে অনেকে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামকে

দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন, যথা—(i) **অমসৃণ গাত্রবিশিষ্ট এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম** (Rough surfaced endoplasmic reticulum) ও (ii) **মসৃণ গাত্রবিশিষ্ট এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম** (Smooth surfaced endoplasmic reticulum)। সিস্টারনাগুলি প্রথমোক্ত শ্রেণীভুক্ত এবং ভেসিকল ও টিউবিউলগুলি শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত।

কোন-কোন কোষে অথবা কোষের কোন-কোন অংশে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের সন্নিহিত অংশগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে যায়। এমনকি স্থানে স্থানে তাদের প্লাজমা পর্দা ও নিউক্লীয় পর্দার সঙ্গেও যুক্ত থাকতে দেখা যায়। এইরূপ সংযুক্তির ফলে কোষের ভিতর বিভিন্ন বস্তুর চলাচলের উপযোগী লম্বা নালিকাপথের সৃষ্টি হয়।

কার্য : (i) এটি কোলয়েডরূপী সাইটোপ্লাজমকে **যান্ত্রিক ঠেস** (mechanical support) দান করে। (ii) এর পর্দাগাত্রে কোষের বিভিন্ন **বিপাকীয় কার্য সংঘটিত হয়**—রাইবোসোমযুক্ত পর্দাগাত্রে প্রোটীন সংশ্লেষ এবং রাইবোসোমবিহীন পর্দাগাত্রে ফসফোলিপিড, স্টেরয়েড (যথা—কোলেস্টেরল, আর্গোস্টেরল, প্রোজেস্টেরোন, টেস্টোস্টেরোন) প্রভৃতির সংশ্লেষ ঘটে। (iii) এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের পর্দাঘেরা শূন্যস্থানে কোষের **সংশ্লেষিত বস্তুসমূহ জমা হয়**। অর্থাৎ, এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম কোষের সংশ্লেষিত বস্তুগুলিকে হায়ালোপ্লাজম থেকে পৃথক করে সঞ্চিতাবস্থায় রাখে। (iv) এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের নালিকাগুলি কোষের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় অথবা কোষ থেকে কোষের বাইরে **সংশ্লেষিত বস্তুগুলির চলাচলের পথ** হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (v) এর পর্দা কোষমধ্যে নার্ভের মত **স্পন্দন** (impulse) **চলাচলে** সাহায্য করে। (vi) এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম থেকে কোষের বিভিন্ন **অঙ্গাণু** (যথা—গলগি বডি) ও **অঙ্গাণুর পর্দা** (যথা—নিউক্লীয় পর্দা) গঠিত হয়। (vii) এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের পর্দাগাত্রে সামান্য পরিমাণে **ATP সংশ্লেষিত হয়**।

2.10J. মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria)

ইউক্যারিওটিক কোষে দ্বিপর্দাবেষ্টিত যে অঙ্গাণুগুলি খাদ্যের ভিতরকার স্থৈতিক শক্তিকে ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরিত করে, তাদের নাম মাইটোকনড্রিয়া।

দুটি গ্রীক শব্দ হতে মাইটোকনড্রিয়ন শব্দটির উৎপত্তি, যথা—Mito = thread = সূত্র এবং Chondrion = granule = দানা।

কোষের ভিতর এই অঙ্গাণুটির অস্তিত্ব সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন **ফ্লেমিং** (Flemming, 1882) এবং তিনি এদের নাম দেন **ফিলা** (fila)। 1894 খ্রীষ্টাব্দে **অল্টম্যান** (Altmann) এদের নাম দেন **বায়োপ্লাস্ট** (Bioplast)। **বেন্ডা** (Benda) 1897 খ্রীষ্টাব্দে এদের **মাইটোকনড্রিয়া** নামে অভিহিত করেন।

রক্তের পরিণত লোহিত কণিকা ব্যতীত সমস্ত ইউক্যারিওটিক কোষে মাইটোকনড্রিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু কোন প্রোক্যারিওটিক কোষে এদের অস্তিত্ব নেই।

অবস্থান (Site) : অধিকাংশ কোষেই মাইটোকনড্রিয়াগুলি সাইটোপ্লাজমের সর্বত্র ছড়ানো থাকে, কিন্তু কোন কোন কোষে তারা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে।

যেমন—নার্ভকোষে সাইন্যাপ্‌সে অঞ্চলে অর্থাৎ যে অঞ্চল দিয়ে এক কোষ থেকে অপর কোষে আবেগ (nerve impulse) প্রেরিত হয়, সেই অঞ্চলে এদের দেখা যায়।

মাঝে মাঝে কোষের মধ্যে মাইটোকনড্রিয়ার চলাচল অর্থাৎ স্থানান্তর গমন লক্ষ্য করা যায়। কোষের মধ্যে যখন যেখানে শক্তির জরুরী প্রয়োজন হয় তখনই সেখানে অধিক সংখ্যায় মাইটোকনড্রিয়ার সমাবেশ ঘটে; যেমন—কোষ বিভাজনের সময় স্পিণ্ডল বা বেমযন্ত্রকে ঘিরে প্রচুর মাইটোকনড্রিয়ার আবির্ভাব চোখে পড়ে।

সংখ্যা : বিভিন্ন কোষে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যায় তারতম্য দেখা যায়। যকৃত কোষে এদের সংখ্যা সাধারণত 1,000—1,600 পর্যন্ত হয়। কোন-কোন উসাইটে (অনিষিক্ত ডিম্বাণু) এদের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। প্রাণিকোষের তুলনায় সবুজ উদ্ভিদের কোষে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হয়। প্রকৃতপক্ষে, কোষের জীবন ক্রিয়ার সঙ্গে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা সম্পর্কযুক্ত। এককোষী বড় অ্যামিবা **ক্যাওস ক্যাওস** (*Chaos chaos*)-এর দেহে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা পাঁচ লক্ষের মত।

আয়তন (Size) : বিভিন্ন কোষে মাইটোকনড্রিয়ার আয়তনে তারতম্য দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা 3-7 মাইক্রা লম্বা হয়, তবে কোন-কোন ক্ষেত্রে তাদের দৈর্ঘ্য আরও বেশী হতে পারে। তাদের ব্যাস সাধারণত 0·2-2·0 মাইক্রা পর্যন্ত হয়।

গঠন (Structure) : কম্পাউন্ড অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মাইটোকনড্রিয়াকে কখনও দণ্ডের মত (rod-shaped), আবার কখনও বা সুতার মত (filamentous) অথবা গোলাকার দেখায়। প্রকৃতপক্ষে, একরকম আকৃতি থেকে অন্যরকম আকৃতিতে তারা পরিবর্তিত হতে পারে।

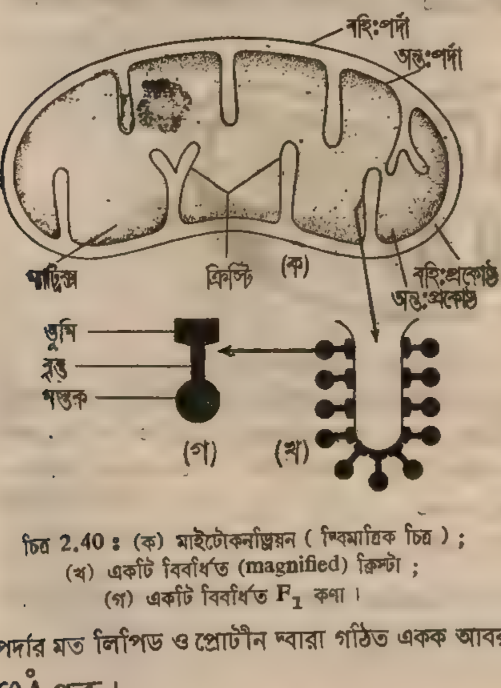

চিত্র 2.40 : (ক) মাইটোকনড্রিয়ন (ত্রিমাত্রিক চিত্র); (খ) একটি বিবর্ধিত (magnified) ক্রিস্টা; (গ) একটি বিবর্ধিত F_1 কণা।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মাইটোকনড্রিয়াকে দেখতে অনেকটা দুই মুখ বন্ধ থলির মত। এদের দেহ দুটি পর্দা দিয়ে ঘেরা থাকে—বাইরের দিকেরটি **বহিঃপর্দা** (outer membrane) ও ভিতরের দিকেরটি **অন্তঃপর্দা** (inner membrane) (চিত্র 2.40)। প্রতিটি পর্দা কোষের অন্যান্য অঙ্গাণুর পর্দার মত লিপিড ও প্রোটীন দ্বারা গঠিত একক আবরণী। প্রতিটি পর্দা আনুমানিক 60Å পুরু।

প্রতিটি মাইটোকনড্রিয়ায় দুটি করে প্রকোষ্ঠ থাকে। দুটি পর্দার মাঝখানে অবস্থিত **বহিঃপ্রকোষ্ঠ** (outer chamber) এবং মাইটোকনড্রিয়ার কেন্দ্রে অবস্থিত, অন্তঃপর্দা দিয়ে ঘেরা, **অন্তঃপ্রকোষ্ঠ** (inner chamber)। বহিঃপ্রকোষ্ঠের ব্যাস 60-80Å। এই প্রকোষ্ঠটি একপ্রকার তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে—ঐ তরল পদার্থে নানাপ্রকার কো-এনজাইম* (coenzyme) থাকে। অন্তঃপ্রকোষ্ঠটি অপেক্ষাকৃত ঘন একপ্রকার পদার্থে পূর্ণ থাকে, যার নাম **মাইটোকনড্রিয়াল ম্যাট্রিক্স** (mitochondrial matrix)। এই ম্যাট্রিক্সে DNA, RNA, রাইবোসোম দানা ও ক্রেবস্ চক্রের জন্য প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার এনজাইম বা উৎসেচক থাকে। DNA দ্বিতন্ত্রীবিশিষ্ট এবং গোলাকার ; সংখ্যায় 2-6টি। রাইবোসোমের আকার প্রোক্যারিওটিক কোষের রাইবোসোমের মত, অর্থাৎ ইউক্যারিওটিক কোষের তুলনায় ছোট।

> **বহিঃ আবরণ ব্যতীত মাইটোকনড্রিয়নগুলিকে মাইটোপ্লাস্ট** (Mitoplast) **বলে**।

মাইটোকনড্রিয়ার অন্তঃপ্রাচীর থেকে কয়েকটি ভাঁজের সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি অন্তঃপ্রকোষ্ঠের ভিতর ঝুলে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাঁজগুলি অন্তঃপ্রকোষ্ঠের সঙ্গে লম্বভাবে থাকে, তবে কোন-কোন ক্ষেত্রে অন্তঃপ্রকোষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবেও থাকতে পারে ; যেমন—রেখাঙ্কিত পেশীকোষে (striated muscle cells) ও নার্ভ কোষে। উক্ত ভাঁজগুলিকে বলা হয় **ক্রিস্টি**** (cristae) (চিত্র 2.41)। কোন-কোন ক্রিস্টা শাখান্বিত (branched) হতে পারে। বিশেষ পরীক্ষা পদ্ধতির

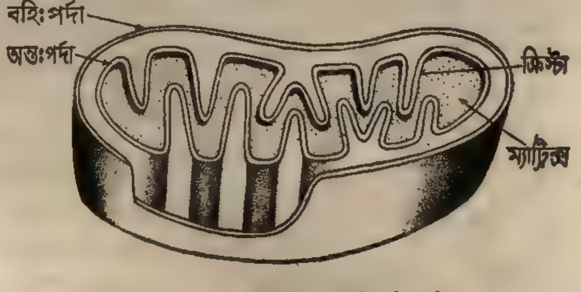

চিত্র 2.41 : মাইটোকনড্রিয়ন (ত্রিমাত্রিক চিত্র)।

সাহায্যে ক্রিস্টি ও অন্তঃপর্দার অন্তর্গাত্রে অসংখ্য ছোট-ছোট কণার মত অংশ দেখা যায়— ঐগুলিকে বলা হয় **প্রাথমিক কণা** (elementary particles) বা F_1 কণা (F_1 particles) বা **ফারনানডেজ-মোরান সাব-ইউনিট** (Fernandez-Moran sub-unit) বা **অক্সিজোম** (Oxysome)। প্রতিটি F_1 কণায় তিনটি করে অংশ থাকে, যথা—**ভূমি** (base), **বৃন্ত** (stalk) ও **মস্তক** (head)। বৃন্তের দৈর্ঘ্য ও

* যে পদার্থ কোন এনজাইমের বা উৎসেচকের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাকে কর্মক্ষম করে, সেই পদার্থকে ঐ এনজাইমের কো-এনজাইম বলা হয়।

** ইংরেজীতে একবচনে—ক্রিস্টা ; বহুবচনে—ক্রিস্টি।

ব্যাস যথাক্রমে 45-50Å ও 30-35Å এবং মস্তকের ব্যাস 75-80Å। প্রতিটি F_1 কণা আসলে একপ্রকার ATP-ase উৎসেচক।

পূর্বে ধারণা ছিল যে, মাইটোকনড্রিয়ার বহিঃপর্দার বহির্গাত্রে একপ্রকার গোলাকার কণা থাকে। কিন্তু বর্তমানে জানা গেছে, মাইটোকনড্রিয়ার বহিঃপর্দায় ঐরূপ কোন কণার অস্তিত্ব নেই।

কার্য : (i) মাইটোকনড্রিয়া ক্রেবস্ চক্রের বিক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর ভিতর জমা স্থৈতিক শক্তিকে নির্গত করে। খাদ্যবস্তুর ভিতর জমে থাকা শক্তিকে নির্গত করার জন্য মাইটোকনড্রিয়াকে কোষের **শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র** (Power house) বলা হয় [**সিকেভিৎস** (Siekevits) 1957]। (ii) মাইটোকনড্রিয়া খাদ্য থেকে নির্গত শক্তিকে ATP (অ্যাডিনোসিন ট্রাই-ফসফেট) নামক রাসায়নিক যৌগ রূপে সঞ্চয় করে রাখে এবং কোষের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে এই ATP-রূপী শক্তি সরবরাহ করে। (iii) কোন-কোন প্রাণীর বিকাশমান ডিম্বাণুতে (developing egg) মাইটোকনড্রিয়া কুসুমে (yolk) রূপান্তরিত হয়। (iv) কোন-কোন গবেষকের মতে, ফ্যাট বা স্নেহপদার্থের বিপাকে মাইটোকনড্রিয়ার ভূমিকা আছে।

2.10K. লাইসোসোম (Lysosome)

একক পর্দাবেষ্টিত এবং নানাপ্রকার উৎসেচকে পূর্ণ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র থলির মত কোষ অঙ্গাণুর নাম লাইসোসোম।

প্রায় সব প্রাণিকোষেই লাইসোসোম পাওয়া যায়। তবে ম্যাক্রোফেজ* (macrophage) নামক কোষে তাদের সংখ্যা অন্যান্য কোষের তুলনায় অনেক বেশী থাকে। তাছাড়া যকৃত, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি যেসব অঙ্গের কোষে উৎসেচকের যথেষ্ট

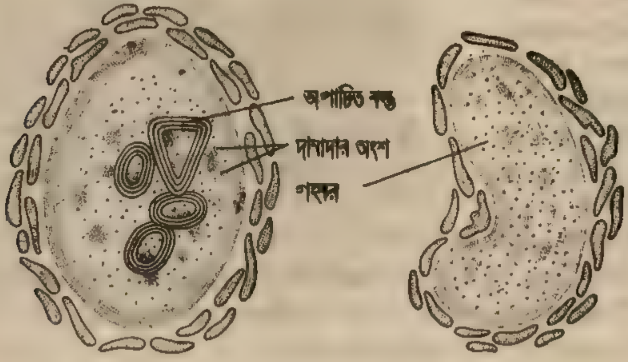

চিত্র 2.42 : দুটি বিভিন্ন ধরনের লাইসোসোম।

সক্রিয়তা দেখা যায়, সেইসব কোষেও লাইসোসোমের আধিক্য চোখে পড়ে। উদ্ভিদে ভাজক কলার কোষে (meristematic cells) লাইসোসোম পাওয়া যায়।

* আগ্রাসী (Phagocytosis) ক্ষমতাবিশিষ্ট কোষ, যথা—রক্তের শ্বেত কণিকা।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে লাইসোসোমের অস্তিত্ব পূর্বে জানা গেলেও এই অঙ্গাণুটির ক্রিয়া সংক্রান্ত প্রকৃত স্বরূপটি প্রথম আবিষ্কার করেন **ক্রিশ্চিয়ান ডি ডিউভ** (Christian de Duve) 1955 খৃীষ্টাব্দে। তিনিই অঙ্গাণুটির নামকরণ করেন লাইসোসোম (Lyso = পরিপাক-কারক, some = অঙ্গ), কেননা, বিভিন্ন জৈব বস্তুকে পরিপাক করার ক্ষমতাসম্পন্ন নানাপ্রকার উৎসেচক এর মধ্যে থাকে। **নোভিকফ** (Novikoff) 1960 খৃীষ্টাব্দে ইঙ্গিত করেন যে পিনোসাইটিক ভেসিকল থেকে লাইসোসোম উদ্ভূত হয়।

আকার (Shape) **:** লাইসোসোমের ব্যাস সাধারণত 0·2—0·8mμ হয়।

গঠন (Structure) **:** লাইসোসোমের গঠন অনেকটা গোলাকার থলির মত। লাইপোপ্রোটীন নির্মিত একটি একক পর্দা দিয়ে এরা ঘেরা থাকে। এদের পর্দাবেষ্টিত ভিতরকার অংশের চেহারা খুব অনির্দিষ্ট ধরনের। কতকগুলির কেন্দ্রস্থল বেশ ঘন বা নিরেট ; কতকগুলির বহিরাঞ্চল বেশ ঘন, সেই তুলনায় কেন্দ্রস্থল অপেক্ষাকৃত কম ঘন, আবার কতকগুলির ভিতরে কিছু দানাদার বস্তু ও ছোট-ছোট গহ্বরও দেখা যায় (চিত্র 2.42)। প্রকৃতপক্ষে, এদের আয়তন (size) ও চেহারা (appearance) এতই পরিবর্তনশীল যে, কেবলমাত্র গঠনের উপর নির্ভর করে নির্ভুলভাবে এদের চেনা সম্ভব নয়। লাইসোসোমের এই **বহুরূপতা** (polymorphism) তার কার্য-দশার (functional state) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (চিত্র 2.43)।

লাইসোসোমের আবরণীবেষ্টিত স্থানে নানাপ্রকার **আর্দ্র-বিশ্লেষক** উৎসেচক (hydrolytic enzymes) থাকে। এই কারণে লাইসোসোমকে **উৎসেচকের এক-একটি ক্ষুদ্র থলি** বলে বর্ণনা করা হয়। কোষের ভিতরকার অঙ্গাণুসমূহকে পরিপাক করার ক্ষমতা বিশিষ্ট যাবতীয় উৎসেচক লাইসোসোমের মধ্যে পাওয়া যায়। এই উৎসেচকগুলি যতক্ষণ লাইসোসোমের আবরণী দিয়ে ঘেরা থাকে ততক্ষণ তারা থাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। কিন্তু কোনক্রমে আবরণীটি ছিন্ন হলেই তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে।

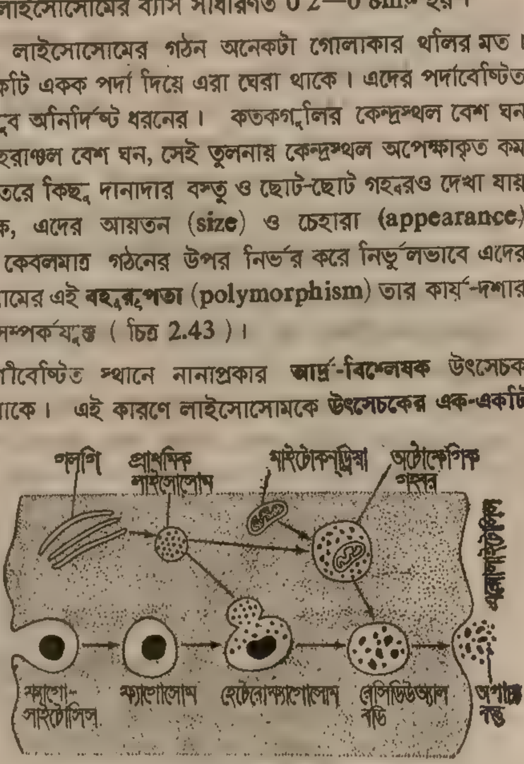

চিত্র 2.43 : কোষমধ্যে পরিপাক ক্রিয়া ও লাইসোসোমের বহুরূপতা।

লাইসোসোমের বহুরূপতা : লাইসোসোমকে চারটি বিভিন্ন রূপে (form) পাওয়া যায়—এক-একটি রূপ লাইসোসোমের এক-একটি কার্য-দশার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

নিচে রূপগুলির উল্লেখ করা হল :

(1) **প্রাথমিক লাইসোসোম** (Primary Lysosome) **:** উৎসেচকে পূর্ণ সদ্যগঠিত ছোট-ছোট থলি।

(2) **হেটেরোফ্যাগোসোম** (Heterophagosome) : ফ্যাগোসোম* (phagosome) ও প্রাথমিক লাইসোসোমের মিলনে গঠিত (চিত্র 2.43)।

(3) **রেসিডিউঅ্যাল বডি** (Residual body) : হেটেরোফ্যাগোসোমের ভিতরকার বস্তুর পরিপাকের পর অপাচ্য অংশসহ হেটেরোফ্যাগোসোম।

(4) **অটোফ্যাগিক গহ্বর** (Autophagic vacuole) : নিজ কোষের অঙ্গাণুকে পাচনে রত লাইসোসোমের নাম অটোফ্যাগিক গহ্বর।

কার্য : (i) কোষ যেসব খাদ্যকণা গ্রহণ করে, লাইসোসোম সেগুলিকে পরিপাক করে। (ii) রক্তের শ্বেতকণিকা যেসব ব্যাকটিরিয়া ও ক্ষতিকর পদার্থকে কোষমধ্যে গ্রহণ করে, লাইসোসোম নিজ উৎসেচকের ক্রিয়ায় সেগুলিকে ধ্বংস করে। (iii) কোষের যেসব অঙ্গাণুর কর্মক্ষমতা কমে যায়, লাইসোসোম সেগুলিকে আত্মসাৎ করে পরিপাক করে ফেলে। এই ঘটনার নাম **অটোফ্যাগী** (Autophagy) বা নিজদেহ ভক্ষণ। (iv) লাইসোসোমের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল **অটোলাইসিস** (Autolysis) বা নিজকোষ বিনাশ। ক্ষতিগ্রস্ত ও মৃতপ্রায় কোষের অটোলাইসিস ঘটে। এই ঘটনার সময় লাইসোসোমের আবরণীটি ছিন্ন হয়ে তার উৎসেচকগুলি বের হয়ে আসে এবং সম্পূর্ণ কোষটিকে ধীরে-ধীরে পরিপাক করে ফেলে। এর ফলে একটি সুস্থ ও নবীন কোষ বিনষ্ট কোষের জায়গাটি পায়। (v) প্রয়োজনবোধে লাইসোসোম কোষ আবরণীর বাইরে উৎসেচকগুলিকে প্রেরণ করে বহিঃকোষীয় পাচন (Extracellular digestion) ঘটাতে পারে।

● অটোফ্যাগী ও হেটেরোফ্যাগীর পার্থক্য ●

অটোফ্যাগী	হেটেরোফ্যাগী
লাইসোসোমের মধ্যস্থিত উৎসেচকগুলি যখন কোষস্থ বিভিন্ন অঙ্গাণুর অংশকে পরিপাক করে, তখন সেই প্রক্রিয়াকে নিজদেহ ভক্ষণ বা অটোফ্যাগী বলে।	লাইসোসোম থেকে নিঃসৃত উৎসেচক যখন কোষের মধ্যে গৃহীত বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটিরিয়া, খাদ্যবস্তু প্রভৃতিকে জারিত করে, তখন সেই প্রক্রিয়াকে হেটেরোফ্যাগী বলে।

2.10L. মাইক্রোটিউবিউল (Microtubules)

ইউক্যারিওটিক কোষের সাইটোপ্লাজমে প্রাপ্ত এবং টিউবিউলিন (tubulin) নামক প্রোটীনে গঠিত অতি সূক্ষ্ম ও ফাঁপা নলের মত অংশের নাম মাইক্রোটিউবিউল।

অবস্থান (Site) : মাইক্রোটিউবিউল সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ছড়ানো অবস্থায় অথবা সেণ্ট্রিওল, সিলিয়া, ফ্ল্যাজেলা ইত্যাদির দেহের অংশ হিসেবে থাকে।

প্রকৃতি (Nature) : কোষে দু রকম প্রকৃতির মাইক্রোটিউবিউল দেখা যায়— (i) স্থায়ী (stable) প্রকৃতির ও (ii) অস্থায়ী (unstable) প্রকৃতির। সেণ্ট্রিওল,

* ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ যেসব বড়-বড় অণু, ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদিকে গ্রহণ করে, সেগুলি প্লাজমা পর্দা দিয়ে ঘেরা অবস্থায় সাইটোপ্লাজমে আসে। শিকারসহ প্লাজমা পর্দার থলিটিকে বলা হয় 'ফ্যাগোসোম'।

সিলিয়া, ফ্ল্যাজেলা ইত্যাদিতে উপস্থিত মাইক্রোটিউবিউলগুলি স্থায়ী প্রকৃতির। কিন্তু সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত মাইক্রোটিউবিউলগুলি এবং কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডল গঠনে অংশগ্রহণকারী মাইক্রোটিউবিউলগুলি অস্থায়ী প্রকৃতির।

গঠন (Structure) : মাইক্রোটিউবিউল দেখতে ঋজু (straight), ফাঁপা এবং অতি সূক্ষ্ম নলের মত। টিউবিউলগুলি বেশ দৃঢ় (stiff)। প্রতিটি টিউবিউলের ব্যাস 250 অ্যাংস্ট্রম বা 25 ন্যানোমিটার। এদের দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট নয়। কোন-কোন ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য নিজ প্রস্থের 100 গুণেরও বেশী হতে পারে (অর্থাৎ 2·5 মাইক্রনেরও বেশী)। এদের প্রাচীর 60 অ্যাংস্ট্রম (বা 6 ন্যানোমিটার) পুরু।

টিউবিউলিন নামক প্রোটীন দিয়ে মাইক্রোটিউবিউলগুলি গঠিত। টিউবিউলিন দুই রকমের— α-টিউবিউলিন ও β-টিউবিউলিন। এই দুই রকম টিউবিউলিনের একটি করে অণু ক্রমে পরস্পর যুক্ত হয়ে টিউবিউলিনের এক-একটি ডাইমার (dimer) গঠিত হয়। পরে এই ডাইমারগুলি একে-একে যুক্ত হয়ে এক-একটি মাইক্রোটিউবিউল সৃষ্টি হয় (চিত্র 2.44)। টিউবিউলিনের ডাইমারগুলি প্রকৃতপক্ষে মাইক্রোটিউবিউলরূপী নলের প্রাচীরটি গঠন করে এবং ডাইমারগুলি সামান্য প্যাঁচানো ভাবে প্রাচীরে অবস্থান করে। একটি প্যাঁচ সম্পূর্ণ হতে 13টি ডাইমারের প্রয়োজন হয়—তাই মাইক্রোটিউবিউলের প্রস্থচ্ছেদে দেখা যায়, প্রাচীরটি 13টি একক (unit) দিয়ে গঠিত।

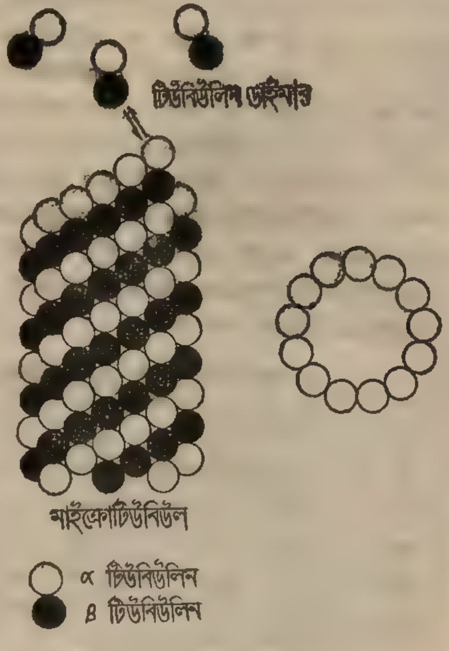

চিত্র 2.44 : আলফা ও বিটা টিউবিউলিনের ডাইমার থেকে মাইক্রোটিউবিউল সৃষ্টি পদ্ধতি।

কার্য : (i) কোষের পরিধি-বরাবর অসংখ্য মাইক্রোটিউবিউল সমান্তরাল ভাবে সজ্জিত থেকে কোষের **অন্তর্কাঠামো** বা **সাইটোস্কেলিটন** (Cytoskeleton) গঠন করে। ফলে কোষ তার নির্দিষ্ট আকৃতি লাভ করে। (ii) কোষ বিভাজনের সময় মাইক্রোটিউবিউল দ্বারা **স্পিন্ডল** গঠিত হয়। (iii) স্পিন্ডলের মাইক্রোটিউবিউলের সক্রিয়তায় অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমোসোমের বিচলন ঘটে। (iv) সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলার সঞ্চালনের মূলেও আছে মাইক্রোটিউবিউল। (v) কোন-কোন গবেষকের মতে

মাইক্রোটিউবিউলের মধ্য দিয়ে কোষের এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় বড়-বড় অণুর চলাচল ঘটে।

2.10M. সেণ্ট্রিওল (Centriole)

প্রাণিকোষ এবং কোন কোন উদ্ভিদকোষে নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থিত যে অঙ্গাণুগুলি কোষ বিভাজনের সময় স্পিণ্ডল গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে, তাদের নাম সেন্ট্রিওল।

সমস্ত প্রাণিকোষে এবং বহু শৈবাল, ছত্রাক, মস জাতীয় উদ্ভিদ (Bryophyta), ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ (Pteridophyta) ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের (Gymnosperms) কোষে সেন্ট্রিওল পাওয়া যায়। কিন্তু কোন গুপ্তবীজী উদ্ভিদের (Angiosperms) কোষে এবং প্রোক্যারিওটিক কোষে সেন্ট্রিওল পাওয়া যায় না।

অবস্থান (Site) : নিউক্লিয়াসের যে দিকটা কোষের বাইরের দিকে অর্থাৎ মুক্ত প্রান্তের দিকে ফেরানো সেইদিকের কাছাকাছি জায়গায় সেন্ট্রিওল থাকে। সেন্ট্রিওলকে ঘিরে সাইটোপ্লাজমের একটি ছোট্ট অঞ্চল দেখা যায়, যেখানে কোন বড় কোষীয় অঙ্গাণু (যথা—মাইটোকনড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, রাইবোসোম ইত্যাদি) অথবা অন্য কোন বড় কণা (যথা—গ্লাইকোজেন দানা, শ্বেতসার দানা ইত্যাদি) থাকে না। সেন্ট্রিওল-সংলগ্ন উক্ত দানাবিহীন সাইটোপ্লাজমীয় অংশটির নাম **সেন্ট্রোস্ফিয়ার** (Centrosphere)। সেন্ট্রোস্ফিয়ারের মধ্যে একটি অথবা দুটি সেন্ট্রিওল থাকতে পারে। সেন্ট্রোস্ফিয়ার সহ সেন্ট্রিওলকে বলা হয় **সেন্ট্রোসোম** (Centrosome) (চিত্র 2.45)—(গ্রীক শব্দ Kentron = কেন্দ্র, Soma = দেহ)। **টি. বোভেরী** (T. Boveri) 1888 খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট্রোসোম নামকরণ করেন।

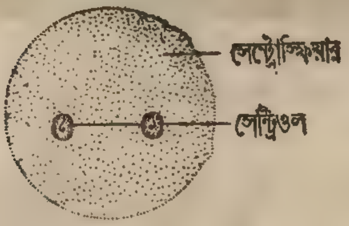

চিত্র 2.45 : সেন্ট্রোসোমের গঠন।

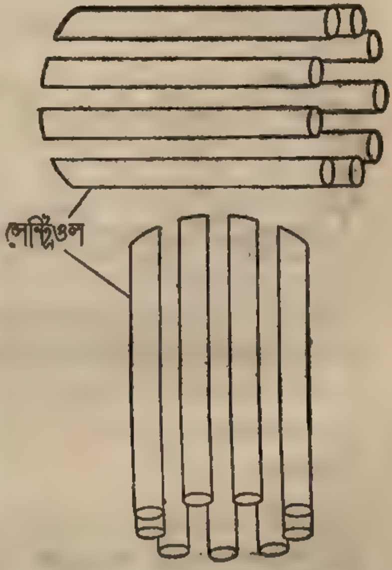

চিত্র 2.46 : একজোড়া সেন্ট্রিওল।

আকার (Shape) : সেন্ট্রিওল আকারে দুমুখ খোলা নলের মত। প্রতিটি নলের দৈর্ঘ্য প্রায় 0·3—2mμ এবং প্রস্থ 0·15—0·25mμ।

গঠন (Structure) : কম্পাউন্ড অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সেন্ট্রিওলকে বিন্দুর মত

(dot-like) দেখায়। কিন্তু ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে, সেন্ট্রিওলের আকার দুমুখ খোলা নলের মত। প্রতিটি নলের দৈর্ঘ্য 0·3—2 মাইক্রন এবং প্রস্থ 0·15—0·25 মাইক্রন। ঐ নলের পরিধি 9টি ত্রয়ী-মাইক্রোটিউবিউল (Microtubule triplet) দিয়ে গঠিত (চিত্র 2.46)। অর্থাৎ তিনটি-তিনটি করে মাইক্রোটিউবিউলের 9টি গুচ্ছ দিয়ে সেন্ট্রিওলের পরিধিটি রচিত। টিউবিউলের গুচ্ছগুলি পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকে এবং পরস্পর থেকে সমদূরত্বে অবস্থান করে। প্রতি গুচ্ছের তিনটি মাইক্রোটিউবিউলকে কেন্দ্রের দিক থেকে পরিধির দিক বরাবর যথাক্রমে A, B ... অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয় (...47) এবং এরাও পরস্পরের ...সমান্তরালভাবে থাকে।

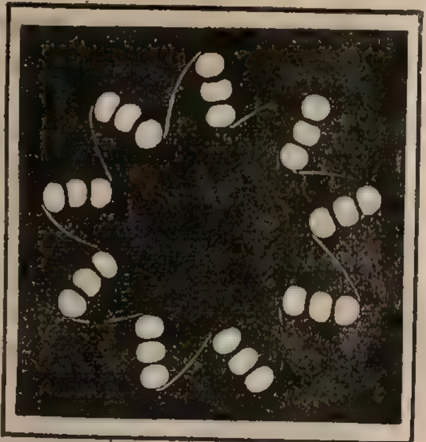

চিত্র 2.47 : সেন্ট্রিওলের প্রস্থচ্ছেদ।

মাইক্রোটিউবিউল-A 13টি একক (units) দ্বারা গঠিত। মাইক্রোটিউবিউল B-এর 13টি এককের মধ্যে 3টি A-টিউবিউলের অংশ; সেইরকম মাইক্রোটিউবিউল C-এর 13টি এককের মধ্যে 2টি টিউবিউল B-এর অংশ (চিত্র 2.48)।

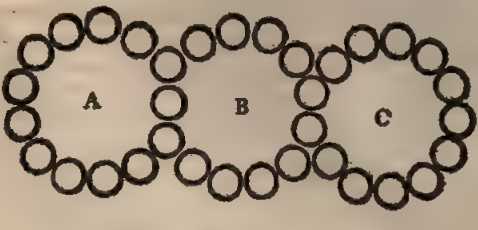

চিত্র 2.48 : সেন্ট্রিওলের ত্রয়ী-মাইক্রোটিউবিউল।

প্রতি টিউবিউল গুচ্ছের A-টিউবিউল তার পার্শ্ববর্তী গুচ্ছের C-টিউবিউলের সঙ্গে একটি ঘন পদার্থ নির্মিত সংযোজক দ্বারা যুক্ত থাকে। কোন-কোন প্রজাতিতে A-C সংযোগের (link) পরিবর্তে A-A সংযোগ দেখা যায়; আবার কোন-কোন প্রজাতিতে A-C সংযোগ ছাড়াও C-C সংযোগ থাকে।

প্রতিটি সেন্ট্রিওলকে ঘিরে কতকগুলি গোলাকার অংশ দেখা যায়—ঐগুলির নাম **পেরিসেন্ট্রিওলার স্যাটেলাইট** (pericentriolar satellite) বা **সেন্ট্রিওল-পরিধিস্থ উপগ্রহ**। এই উপগ্রহগুলি দুটি আবর্তে সাজানো থাকে—একটি উপরের আবর্ত ও একটি নীচের আবর্ত (চিত্র 2.49)। প্রতি আবর্তে 9টি করে উপগ্রহ

থাকে এবং এক-একটি উপগ্রহ এক-একটি ত্রয়ী-মাইক্রোটিউবিউলের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র বৃন্ত দিয়ে যুক্ত থাকে।

রাসায়নিক উপাদান (Chemical Composition) : সেণ্ট্রিওলের মাইক্রোটিউবিউলগুলি **টিউবিউলিন** নামক প্রোটীন দ্বারা গঠিত। উক্ত প্রোটীন ছাড়াও তাদের মধ্যে **লিপিড** এবং প্রচুর পরিমাণে **ATP-ase** উৎসেচক থাকে।

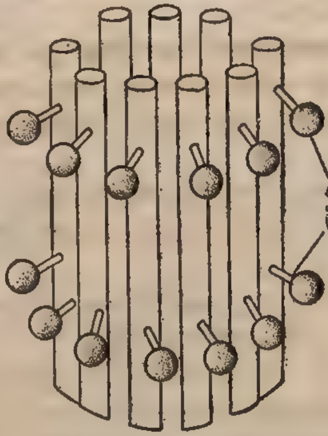

চিত্র 2.49 : উপগ্রহ সহ সেণ্ট্রিওল।

কার্য : (i) সেণ্ট্রিওল কোষ বিভাজনের সময় **স্পিণ্ডল গঠনে** বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। কোষ বিভাজন শুরুর সঙ্গে-সঙ্গেই একটি সেণ্ট্রিওল অপরটি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এই সময় বিচ্ছিন্নতাপ্রাপ্ত সেণ্ট্রিওল দুটির মধ্যে স্পিন্ডল তন্তুর আবির্ভাব ঘটতে থাকে। অবশেষে চলমান সেণ্ট্রিওলটি, তার সঙ্গী সেণ্ট্রিওলটি নিউক্লিয়াসের যে দিকে থাকে, তার বিপরীত দিকে পৌঁছায় এবং দুটি সেণ্ট্রিওলের মাঝে তখন স্পিন্ডল তন্তুর অবিচ্ছিন্ন বিন্যাস দেখা যায়। (ii) সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলার **বেসাল বডি** (basal body) বা **কাইনেটোসোম** (Kinetosome)* সেণ্ট্রিওল থেকে গঠিত হয়। (iii) স্পামাটিডের** দুটি সেণ্ট্রিওলের একটি থেকে শুক্রাণুর (sperm) **অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট** (Axial filament)† গঠিত হয়।

2.10N. কোষস্থ বস্তু বা আর্গ্যাস্টিক পদার্থ (Ergastic substances)

কোষের বিপাকের ফলে উৎপন্ন কোষস্থ বিভিন্ন জড় বস্তুকে বলা হয় আর্গ্যাস্টিক পদার্থ। এরা তিন শ্রেণীর—(i) **সঞ্চিত খাদ্যবস্তু** (Reserve food materials), (ii) **ক্ষরিত বস্তু** (Secretory materials) ও (iii) **বর্জ্য বস্তু** (Excretory materials)। এই সকল বস্তুর কতকগুলি দ্রবণীয় অবস্থায় কোষরসের মধ্যে এবং বাকীগুলি অদ্রবণীয় অবস্থায় সাইটোপ্লাজমে অথবা কোষপ্রাচীরের গায়ে (বিশেষত বর্জ্য বস্তুগুলি) থাকে।

(I) শ্বেতসার দানা বা স্টার্চ গ্রেন (Starch grains) **:** এটি একপ্রকার অদ্রবণীয় **কার্বোহাইড্রেট**। উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজমে **সঞ্চিত খাদ্য** রূপে এটি

---

* প্রত্যেক সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলার গোড়ায় সেণ্ট্রিওলের মত গঠনবিশিষ্ট একটি অংশ থাকে। ঐ অংশটি থেকেই সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলার উৎপত্তি হয়। উক্ত অংশের নাম 'বেসাল বডি' বা 'কাইনেটোসোম'।

** এই কোষের রূপান্তর (Metamorphosis) ঘটে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়।

† এটি শুক্রাণুর লেজের একটি অংশ।

উপস্থিত থাকে। ছত্রাক ব্যতীত সকল উদ্ভিদেই শ্বেতসার দানা বা স্টার্চ গ্রেন পাওয়া যায়।

উদ্ভিদদেহের সমস্ত অঙ্গে স্টার্চ গ্রেন পাওয়া গেলেও, সঞ্চয়ী অঙ্গে (Storage organs), যথা—বীজ, ভূ-নিম্নস্থ কান্ড, মূল ইত্যাদিতে তারা বেশী পরিমাণে থাকে। ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি বিভিন্ন শস্যকণায় প্রচুর পরিমাণে স্টার্চ গ্রেন পাওয়া যায়।

স্টার্চ গ্রেন নানা আকৃতির হয়—যেমন, আলুতে ডিম্বাকার (oval), মটরে গোল, ভুট্টায় বহুভুজাকার এবং আকন্দের তরুক্ষীরে (Latex) দণ্ড (Rod) অথবা ডাম্বেলের মত।

প্রত্যেক স্টার্চ গ্রেনে একটি উজ্জ্বল বিন্দুর মত অথবা সামান্য লম্বাটে একটি অংশ দেখা যায়—ঐটির নাম **হাইলাম** (Hilum)। হাইলামকে কেন্দ্র করে পর পর কয়েকটি স্তরে স্টার্চ বা শ্বেতসার জমা হয়ে এক-একটি স্টার্চ গ্রেন গঠিত হয় (চিত্র 2.50)। অতএব প্রতিটি স্টার্চ গ্রেন স্তরীভূত আকৃতির। হাইলামের অবস্থান অনুযায়ী স্টার্চ গ্রেন দু রকমের—(i) **উৎকেন্দ্রীয়** (Eccentric) ও (ii) **সমকেন্দ্রীয়** (Concentric)। যদি হাইলামটি স্টার্চ গ্রেনের এক প্রান্তে থাকে তাহলে স্টার্চ গ্রেনটিকে **উৎকেন্দ্রীয়** স্টার্চ গ্রেন বলা হয়। পক্ষান্তরে, হাইলামটি যদি স্টার্চ গ্রেনের কেন্দ্রে অবস্থান করে তাহলে তাকে **সমকেন্দ্রীয়** স্টার্চ গ্রেন বলে। আলুতে উৎকেন্দ্রীয় এবং ভুট্টা, মটর ও অন্যান্য অনেক ডাল শস্যে সমকেন্দ্রীয় স্টার্চ গ্রেন পাওয়া যায়।

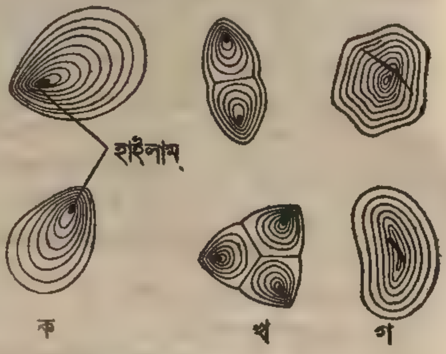

চিত্র 2.50 : বিভিন্ন প্রকার শ্বেতসার দানা। (ক) উৎকেন্দ্রীয় (সরল) ; (খ) অর্ধ-যৌগিক (উপরে) ও যৌগিক (নিচে) ; (গ) সমকেন্দ্রীয় (সরল)।

স্টার্চ গ্রেনগুলি পৃথক পৃথক ভাবে থাকতে পারে অথবা কতকগুলি স্টার্চ গ্রেন পরস্পর যুক্ত হয়ে থাকতে পারে। প্রথমোক্ত প্রকার স্টার্চ গ্রেনকে **সরল** (Simple) স্টার্চ গ্রেন এবং শেষোক্ত প্রকার স্টার্চ গ্রেনকে **যৌগিক** (Compound) স্টার্চ গ্রেন বলে। কখনও কখনও যৌগিক স্টার্চ গ্রেনকে ঘিরে স্টার্চের কয়েকটি সাধারণ স্তর (Common layers) রচিত হয়—এইরূপ স্টার্চ গ্রেনকে **অর্ধ-যৌগিক** (Semi-compound) স্টার্চ গ্রেন বলা হয়।

স্টার্চ গ্রেন জল ও অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়। এর রাসায়নিক সঙ্কেত $(C_6H_{10}O_5)n$।

পরীক্ষা (Test) : আয়োডিন দ্রবণের সংস্পর্শে স্টার্চ গ্রেন **নীল** বা **কালো** রঙ ধারণ করে। রঙের তারতম্য আয়োডিন দ্রবণের ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল।

ব্যবহার (Uses) **:** মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য হিসেবে বহুল ব্যবহার ছাড়াও নানা শিল্পে স্টার্চের ব্যবহার আছে। জলের সঙ্গে ফুটিয়ে স্টার্চ থেকে যে আঠালো পদার্থ (মাড়) পাওয়া যায় তা বস্ত্র শিল্পে, কাগজ শিল্পে এবং চীনামাটির দ্রব্য তৈরিতে কাজে লাগে। সুগন্ধী পাউডার ও অ্যালকোহল তৈরিতেও স্টার্চ ব্যবহার করা হয়।

(II) গ্লাইকোজেন (Glycogen) **:** এটিও একপ্রকার অদ্রবণীয় **কার্বোহাইড্রেট**। ছত্রাক ও প্রাণীদের কোষে **সঞ্চিত খাদ্য** রূপে এটি উপস্থিত থাকে। ছত্রাক ব্যতীত অন্য কোন উদ্ভিদে গ্লাইকোজেন পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাণীদের দেহে সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট হিসেবে গ্লাইকোজেনই প্রধান। সেই কারণে গ্লাইকোজেনকে 'প্রাণী স্টার্চ' (Animal starch) বলা হয়। প্রাণীদের দেহের সমস্ত কোষে পাওয়া গেলেও যকৃত ও পেশী কোষে গ্লাইকোজেনের আধিক্য দেখা যায়। ছোট ছোট দানার আকারে এটি সাইটোপ্লাজমে থাকে। এটি গরম জলে দ্রবণীয়। এর রাসায়নিক সঙ্কেত স্টার্চ গ্রেনের মতই $(C_6H_{10}O_5)n$।

পরীক্ষা (Test) **:** আয়োডিন দ্রবণের সংস্পর্শে গ্লাইকোজেন **লালচে-বাদামী** (reddish brown) রঙ ধারণ করে। উত্তাপ প্রয়োগে উক্ত রঙ অদৃশ্য হয়; কিন্তু ঠাণ্ডা হলে রঙটি আবার ফিরে আসে।

***(III) ইনিউলিন** (Inulin) **:** এটি একপ্রকার দ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট এবং সঞ্চিত খাদ্য। কোষরসে কোলয়েডীয় দ্রবণরূপে এটি অবস্থান করে। হাতিচোখ ও ডালিয়ার স্ফীতকন্দের (Tuber) কোষরসে সঞ্চিত থাকতে দেখা যায়। এর রাসায়নিক সঙ্কেত স্টার্চ গ্রেনের মতই $(C_6H_{10}O_5)n$।

পরীক্ষা (Test) **:** গ্লিসারিনে ইনিউলিন কেলাসিত হয়ে **হাতপাখার মত** (fan-shaped) দেখতে হয়।

***(IV) প্রোটীন** (Protein) **:** প্রোটীন একপ্রকার সঞ্চিত খাদ্য। এটি কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত একপ্রকার জৈব যৌগ। কখনও কখনও সালফার ও ফসফরাস প্রোটীনে থাকতে পারে। প্রোটীন তরল অবস্থায় কোষের মধ্যে থাকে। আবার উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজমে কঠিন অবস্থায় দানার মত প্রোটীন বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে। ঐ দানাগুলিকে **প্রোটিড দানা** (Proteid grain) বা **অ্যালিউরোন দানা** (Aleurone grain) বলে। রেড়ির বীজে গোলাকার বা ডিম্বাকার অ্যালিউরোন দানা দেখা যায়। এটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত—প্রোটীন দ্বারা গঠিত বহুভুজাকৃতি বড় কেলাসটিকে **ক্রিস্টালয়েড** (Crystalloid) এবং স্বচ্ছ ধাতব পদার্থ দ্বারা গঠিত গোলাকার ক্ষুদ্র কেলাসকে **গ্লোবয়েড** (Globoid) বলে।

(V) স্নেহদ্রব্য (Fats and oils) **:** উদ্ভিদ ও প্রাণীদের কোষে **সঞ্চিত খাদ্য** রূপে স্নেহদ্রব্য পাওয়া যায়। স্নেহদ্রব্য কার্বোহাইড্রেটের মতই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত। তবে স্নেহদ্রব্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত কখনই কার্বোহাইড্রেটের মত (অর্থাৎ 2 : 1) হয় না। এদের মধ্যে কার্বন ও

---

* উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাইড্রোজেনের পরমাণু অক্সিজেনের তুলনায় অনেক বেশী থাকে। যেমন, 'পামিটিন' (Palmitin) নামক উদ্ভিজ্জ স্নেহদ্রব্যের রাসায়নিক সঙ্কেত $C_{51}H_{98}O_6$।

যেসব স্নেহদ্রব্য সাধারণ উষ্ণতায় তরল থাকে তাদের বলা হয় **তৈল** (oils), অন্যগুলিকে বলা হয় **ফ্যাট** বা **মেদ**। কোষের সাইটোপ্লাজমে স্নেহদ্রব্য ছোট-ছোট বিন্দুর (drops) আকারে থাকে। সরষে, বাদাম, রেড়ি, সূর্যমুখী প্রভৃতির বীজে, নারিকেলের সস্যে এবং প্রাণীদের মেদকলার (adipose tissue) কোষে স্নেহদ্রব্যের আধিক্য দেখা যায়। প্রাণিকোষে স্নেহদ্রব্য প্রধানত মেদরূপে এবং উদ্ভিদকোষে প্রধানত তৈলরূপে থাকে।

স্নেহদ্রব্য জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু ইথার, ক্লোরোফর্ম ইত্যাদিতে সহজে দ্রবীভূত হয়।

পরীক্ষা (Test) : স্নেহদ্রব্য অসমিক অ্যাসিডের (Osmic acid) লঘু দ্রবণের সংস্পর্শে **কালো** রঙ ধারণ করে।

ব্যবহার (Uses) : স্নেহদ্রব্যের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া সাবান প্রস্তুতে, রঙের কাজে এবং জ্বালানিরূপে স্নেহদ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

(VI) জাইমোজেন দানা (Zymogen granules) : কোষের সাইটোপ্লাজমে কোন-কোন উৎসেচক, যেমন—পেপসিনোজেন, ট্রিপসিনোজেন ইত্যাদি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। এইসব নিষ্ক্রিয় উৎসেচককে **জাইমোজেন** বলা হয়। জাইমোজেনগুলি অন্যান্য উৎসেচকের প্রভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অগ্ন্যাশয় কোষে উৎপন্ন ট্রিপসিনোজেন অন্ত্রের মধ্যে এন্টেরোকাইনেজ উৎসেচকের প্রভাবে সক্রিয় হয়। পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন পেপসিনোজেন পাকস্থলীর মধ্যে HCl-এর প্রভাবে সক্রিয় হয়। প্রকৃতপক্ষে, যেসব উৎসেচকের কর্মস্থল উৎপাদক কোষের বাইরে কোন স্থানে, তারাই উৎপাদক কোষের মধ্যে জাইমোজেনরূপে থাকে।

2.11. প্রোক্যারিওটিক কোষ ও ইউক্যারিওটিক কোষের পার্থক্য (Differences between Prokaryotic and Eukaryotic cells)

প্রোক্যারিওটিক কোষ	ইউক্যারিওটিক কোষ
1. **নিউক্লীয় মেমব্রেন** থাকে না, ফলে নিউক্লীয় বস্তু সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো থাকে।	1. **নিউক্লীয় মেমব্রেন** নিউক্লিয়াসের ভিতরের বস্তুসমূহকে সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক করে রাখে।
2. অধিকাংশ **DNA মুক্ত অবস্থায় থাকে**। কোন কোন ক্ষেত্রে (যথা—নীলাভ-সবুজ শৈবালে) তারা প্রোটীনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রোমোসোমের আকার ধারণ করে বটে, কিন্তু ঐ প্রোটীনের মধ্যে কখনই **হিস্টোন জাতীয় প্রোটীন থাকে না**।	2. DNA প্রোটীনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে **ক্রোমোসোম** গঠন করে। ক্রোমোসোমে অন্যান্য প্রোটীনের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে **হিস্টোন*** **জাতীয় প্রোটীন থাকে**।

* এটি একটি ক্ষারধর্মী প্রোটীন।

প্রোক্যারিওটিক কোষ	ইউক্যারিওটিক কোষ
3. সালোকসংশ্লেষের জন্য ক্লোরোপ্লাসটিড থাকে না। তার পরিবর্তে একক পর্দা বেষ্টিত অঙ্গাণু **থাইলাকয়েড** থাকে।	3. সালোকসংশ্লেষের জন্য দুই পর্দা বেষ্টিত অঙ্গাণু **ক্লোরোপ্লাসটিড** পাওয়া যায়। ক্লোরোপ্লাসটিডের ভিতর থাইলাকয়েড থাকে।
4. নিউক্লিওলাস নেই।	4. নিউক্লিওলাস আছে।
5. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম, গলগি বডি, মাইটোকন্ড্রিয়া, লাইসোসোম প্রভৃতি অঙ্গাণু থাকে না।	5. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম, গলগি বডি, মাইটোকন্ড্রিয়া, লাইসোসোম প্রভৃতি অঙ্গাণু বর্তমান।
6. শ্বাসক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকগুলির অবস্থান প্লাজমা পর্দায়।	6. উৎসেচকগুলির অবস্থান মাইটোকন্ড্রিয়ায়।
7. ইউক্যারিওটিক কোষের রাইবোসোমের তুলনায় প্রোক্যারিওটিক কোষের রাইবোসোম আকারে ছোট।	7. প্রোক্যারিওটিক কোষের রাইবোসোমের তুলনায় ইউক্যারিওটিক কোষের রাইবোসোম আকারে বড়।
8. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম না থাকায় রাইবোসোম সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ছড়ানো অবস্থায় প্রোটীন সংশ্লেষ করে।	8. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের গাত্র সংলগ্ন রাইবোসোমে প্রোটীন সংশ্লেষ হয়।
9. স্পিন্ডল বা বেমযন্ত্রের অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েনি।	9. কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডল বা বেমযন্ত্র গঠিত হয়।

2.12. উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের পার্থক্য (Differences between Plant cell and Animal cell)

উদ্ভিদকোষ	প্রাণিকোষ
1. উদ্ভিদকোষ পুরু মৃত কোষপ্রাচীর দিয়ে ঢাকা থাকে।	1. প্রাণিকোষে কোষপ্রাচীর থাকে না।
2. কোষ প্রাচীর ক্যারিওকাইনেটিক কোষ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে না।	2. কোষ আবরণী কোষ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে।
3. উদ্ভিদকোষে প্লাসটিড থাকে। **ব্যতিক্রম :** ছত্রাক।	3. প্রাণিকোষে প্লাসটিড থাকে না।

উদ্ভিদকোষ	প্রাণিকোষ
4. ক্লোরোফিলযুক্ত উদ্ভিদ কোষ স্বভোজী অর্থাৎ নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করতে পারে।	4. প্রাণিকোষে ক্লোরোফিল না থাকায় ঐ কোষ পরভোজী। **ব্যতিক্রম :** ইউগ্লিনা।
5. সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম ক্লোরাইড উদ্ভিদকোষের পক্ষে **ক্ষতিকারক**।	5. সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম ক্লোরাইড প্রাণিকোষকে সিক্ত করে (**Bathes**) এবং একে পরিষ্কার রাখে।
6. পরিণত উদ্ভিদকোষের মধ্যে কোষ-রস ভর্তি একটি অথবা দুটি বড় আকারের কোষ-গহ্বর থাকে।	6. প্রাণিকোষে সাধারণত কোষগহ্বর থাকে না—থাকলেও সেগুলি আকারে খুব ছোট হয়।
7. লাইসোসোম সাধারণত থাকে না, থাকলে খুব কম সংখ্যায় থাকে।	7. লাইসোসোম থাকে এবং সংখ্যায় অনেক।
8. উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদকোষে সেণ্ট্রোসোম থাকে না।	8. সব প্রাণিকোষে সেণ্ট্রোসোম থাকে। এটি কোষ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে।
9. উদ্ভিদকোষে সাধারণত এণ্ডো-সাইটোসিস দেখা যায় না।	9. প্রাণিকোষে এণ্ডোসাইটোসিস প্রক্রিয়া দেখা যায়।
10. উদ্ভিদকোষে মাইক্রোভিলাই দেখা যায় না।	10. কোন-কোন প্রাণিকোষে মাইক্রো-ভিলাই দেখা যায়।

2.13. ব্যাপন (Diffusion)

দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, ফুল থেকে তার সুগন্ধ অতি সহজেই বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। জলে চিনি বা গুড় মেশালে তা অতি সহজেই জলের সর্বত্র সমান মিষ্টত্ব এনে দেয়। আবার ন্যাপথলিনের মত কঠিন পদার্থ থেকেও আমরা সহজেই তার গন্ধ বাতাসে পেয়ে থাকি।

যদি আমরা পদার্থের সূক্ষ্ম কণাগুলি দেখতে পেতাম, তাহলে দেখা যেত কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের সূক্ষ্ম কণা বা অণুগুলি সব সময় সরলরেখায় গতিময়। এরকম গতিশীলতা পদার্থের সূক্ষ্ম অণু, আয়ন বা কোলয়েড কণাগুলির নিজস্ব গতিশক্তির গুণেই হয়ে থাকে। এই কারণেই গন্ধদ্রব্যের গন্ধ সহজেই বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনাকে বলা হয় **ব্যাপন**। **কোন পদার্থের অণুগুলি যখন নিজস্ব গতিশক্তির গুণে তাদের ঘনতর অংশ থেকে লঘুতর অংশে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে ব্যাপন (diffusion) বলে।**

ব্যাপনকারী অণুগুলি তাদের গতিশক্তির জন্য এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপকে **ব্যাপন চাপ** (Diffusion pressure) বলে। এই ব্যাপন চাপ পদার্থের অণুর ঘনত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক। অর্থাৎ, যেখানে পদার্থের অণুর ঘনত্ব বেশী

সেখানে ব্যাপন চাপ বেশী, আর যেখানে ঘনত্ব কম সেখানে ব্যাপন চাপও কম। উচ্চ ও নিম্ন ব্যাপন চাপের পার্থক্যই পদার্থের ব্যাপন ঘটায়। পদার্থের কম ঘনত্বযুক্ত অংশে ব্যাপন চাপের ঘাটতির (**Diffusion pressure deficit** বা **DPD**) জন্যই ব্যাপন হয়।

মনে রাখা দরকার, ব্যাপন চাপের ফলেই পদার্থের ব্যাপন ঘটে, কিন্তু ব্যাপন ঘটার জন্য ব্যাপন চাপের সৃষ্টি হয় না।

2.13A. গ্যাসের ব্যাপনের পরীক্ষা

একটা কাচের আবদ্ধ পাত্রের একপ্রান্তে অবস্থিত একটা নল দিয়ে অল্প পরিমাণ ব্রোমিন গ্যাস ধীরে ধীরে পাত্রের ভিতরে প্রবেশ করানো হল। ব্রোমিন গ্যাস রঙিন বলে ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ঐ গ্যাস ধীরে ধীরে পাত্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এক সময় ঐ গ্যাস সমানভাবে সম্পূর্ণ পাত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার আতরের একটা শিশি খুললে, আতরের গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আতর তরল হলেও খুব উদ্বায়ী। তাই আতরের গ্যাসীয় অণুগুলি দ্রুত চারদিকে বিস্তৃতি লাভ করে।

এই ঘটনার কারণ হিসেবে বলা যায় যে, প্রথম ক্ষেত্রে ব্রোমিন গ্যাসের অণুগুলি প্রবেশ পথের কাছে সর্বাধিক পরিমাণে থাকায় কিংবা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আতরের গ্যাসীয় অণুগুলি শিশির নির্গমন পথে বেশী পরিমাণে থাকায়, ঐ স্থানে ব্রোমিন বা আতরের গ্যাসীয় অণুর ব্যাপন চাপ সর্বাধিক ছিল। অধিক ব্যাপন চাপযুক্ত অঞ্চল থেকে গ্যাসীয় অণু অন্যান্য জায়গার কম ব্যাপন চাপযুক্ত অঞ্চলে ব্যাপিত হয়েছে। সাম্যাবস্থায় আসার পরও ব্রোমিনের অণুগুলি গতিময় থাকবে। কিন্তু যেহেতু ঐ অবস্থায় পাত্রের সব জায়গাতেই ব্রোমিন গ্যাসের ব্যাপন চাপ সমান, সেইজন্য পাত্রের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ব্রোমিন অণুর কোন সামগ্রিক গমন (**Net movement**) হবে না এবং এই অবস্থাকে ব্যাপন বলা যাবে না।

জীবের শ্বাসকার্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের আদান-প্রদান গ্যাসের ব্যাপনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

2.13B. তরলের ব্যাপনের পরীক্ষা

একটা কাচের গ্লাসে বা বিকারে পরিষ্কার জল নিয়ে তার মধ্যে একফোঁটা কালি ফেলা হল। দেখা যাবে ধীরে ধীরে কালি গ্লাসের বা বিকারের জলে ছড়িয়ে পড়ছে এবং কিছুক্ষণ পর ঐ কালি সমানভাবে সম্পূর্ণ জলে ছড়িয়ে পড়বে এবং জল সেই কালির রঙ ধারণ করবে।

এক্ষেত্রেও বলা যায় যে, যখন কালি জলে ফেলা হল, তখন কালির ফোঁটার কাছে কালির ব্যাপন চাপ সবচেয়ে বেশী ছিল। ফলে বেশী ব্যাপন চাপের অঞ্চল থেকে কালির অণুগুলি কম ব্যাপন চাপের অঞ্চলে ব্যাপিত হয়েছে এবং এক সময় গ্লাসের সর্বত্র কালির অণুগুলির ব্যাপন চাপ সমান হওয়ায় ব্যাপন বন্ধ হয়েছে।

জীবদেহে জল বিশেষ ধরনের ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের সর্বত্র জল-সমতা বজায় থাকে। এটা তরলের ব্যাপনের একটি উদাহরণ।

2.13C. কঠিন ও তরলের ব্যাপনের পরীক্ষা

একটা গ্লাসে বা বিকারে একটুকরো মিছরি ফেলে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পর সরু নল (Straw) দিয়ে খুব সাবধানে গ্লাসের উপরের দিকের, মাঝখানের ও নিচের অংশ থেকে একটু একটু জল পান করলে দেখা যাবে যে, উপরের অংশের জল একেবারেই মিষ্টি নয়, মাঝখানের জল সামান্য মিষ্টি এবং নিচের অংশের জলের

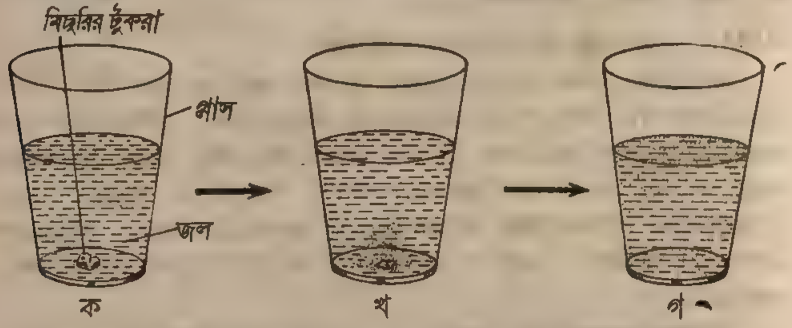

চিত্র 2.51 : কঠিন ও তরলের ব্যাপন পরীক্ষা।
(ক) গ্লাসে একটুকরো মিছরি দেওয়া হয়েছে ; (খ) মিছরির টুকরো গলে যাচ্ছে ; (গ) মিছরির অণুগুলি জলের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

মিষ্টতা একটু বেশী। কয়েক ঘন্টা না নেড়ে গ্লাসের জল রেখে দেওয়া হল। তারপর মিছরি গলে গেলে নল দিয়ে যে কোন অংশের জল পান করলে দেখা যাবে সব অংশের জলই সমান মিষ্টি। এখানেও মিছরির অণুগুলি জলের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ার জন্যই জলের সর্বত্র মিষ্টতা সমান হয়েছে।

জীবদেহে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু, লবণ প্রভৃতি ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশিত হওয়া কঠিনের ব্যাপনের উদাহরণ।

2.13D. ব্যাপনের শর্ত (Conditions effecting diffusion)

(i) **পদার্থের ঘনত্ব :** ব্যাপনকারী পদার্থের ঘনত্ব যত বেশী হবে, তার ব্যাপনের হারও তত বেশী হবে।

(ii) **ব্যাপনের মাধ্যম :** মাধ্যমের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে, ব্যাপনকারী পদার্থের কণা অধিক বাধার সম্মুখীন হয়, ফলে ব্যাপনের হার কমে যায়।

(iii) **তাপমাত্রা ও চাপ :** ব্যাপনের সময় তাপমাত্রা ও চাপ বাড়লে পদার্থের অণুর গতিশক্তিও বাড়ে, ফলে ব্যাপনের হারও বৃদ্ধি পায়।

(iv) **ব্যাপন চাপের পার্থক্য :** দুটি অঞ্চলের মধ্যে একই পদার্থের অণুর ব্যাপন চাপের পার্থক্য বা ঘাটতি (DPD) যত বেশী হবে ব্যাপন ক্রিয়া ততই দ্রুত হবে। আর ব্যাপন চাপের এই পার্থক্য যত কম হবে, ব্যাপনও তত মন্থর হবে।

2.14. অভিস্রবণ (Osmosis)

দুটি ভিন্ন ঘনত্বের তরলের দ্রবণ একটি অর্ধভেদ্য পর্দা (যে ধরনের পর্দার মধ্য দিয়ে শুধু দ্রবণের দ্রাবকের অণু প্রবেশ করতে পারে কিন্তু দ্রাব প্রবেশ করতে

পারে না, তাকে অর্ধভেদ্য পর্দা বলে) **দিয়ে পৃথক থাকলে, কম ঘনত্বের দ্রবণের দ্রাবক অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে বেশী ঘনত্বের দ্রবণে প্রবেশ করে, এই প্রক্রিয়াকে অভিস্রবণ (Osmosis) বলে।**

যে প্রক্রিয়ায় কম ঘনত্বপূর্ণ তরল দ্রবণ ভেদ্য বা অর্ধভেদ্য পর্দার* মধ্য দিয়ে বেশী ঘনত্বের তরল দ্রবণের দিকে ব্যাপিত হয়, তাকে **অন্তঃঅভিস্রবণ** বা **এণ্ডোসমোসিস** (Endosmosis) বলে। আবার যে প্রক্রিয়ায় বেশী ঘনত্বপূর্ণ তরল দ্রবণ ভেদ্য বা অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে কম ঘনত্বের তরল দ্রবণের দিকে ব্যাপিত হয়, তাকে **বহিঃঅভিস্রবণ** বা **এক্সোসমোসিস** (Exosmosis) বলে।

অভিস্রবণও একটি ব্যাপন প্রক্রিয়া। তবে অভিস্রবণে দ্রবণের দ্রাবকের মধ্যে ব্যাপন ক্রিয়া চলে, দ্রাবের মধ্যে নয়। প্রকৃতপক্ষে লঘু দ্রবণে দ্রাবকের ঘনত্ব বেশী থাকে এবং গাঢ় দ্রবণে দ্রাবকের ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম। তাই লঘু দ্রবণের দ্রাবক গাঢ় দ্রবণে ব্যাপন ক্রিয়ায় প্রবেশ করে।

অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কতকগুলি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। নিচের পরীক্ষা থেকে ঐ ঘটনাগুলি বোঝা যাবে ঃ

একটি মাছের পটকার একদিক কেটে তার ভিতরে কিছু পরিমাণ চিনির দ্রবণ রেখে কাটা মুখটি সুতো দিয়ে ভালভাবে বাঁধা হল। এই অবস্থায় ঐ চিনির দ্রবণপূর্ণ

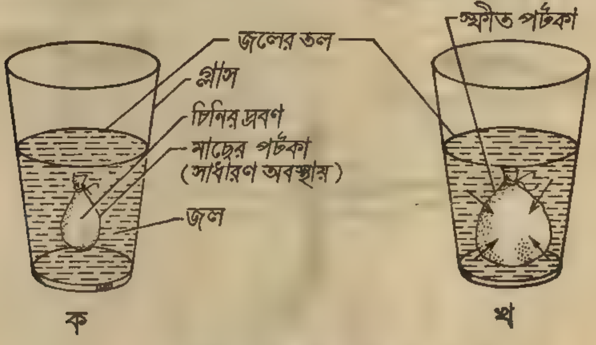

চিত্র 2.52 ঃ মাছের পটকা দিয়ে অভিস্রবণের পরীক্ষা।
(ক) চিনির দ্রবণসহ মাছের পটকা, (খ) মাছের পটকাটি স্ফীত হয়েছে।

পটকাটিকে একটি **মডেল কোষ** (Cell model) বলা যেতে পারে। পটকার অর্ধভেদ্য পর্দা ও তার ভিতরের চিনির দ্রবণ প্লাজমা মেমব্রেন ও কোষরসের মত কাজ করবে।

---

* (ক) **ভেদ্য পর্দা** (Permeable membrane) ঃ এই পর্দার মধ্য দিয়ে যে কোনও তরল দ্রবণ যাতায়াত করতে পারে। উদাহরণ ঃ—কোষপ্রাচীর।

(খ) **অর্ধভেদ্য পর্দা** (Semi permeable membrane) ঃ এর মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পদার্থ যাতায়াত করতে পারে। উদাহরণ ঃ—সাইটোপ্লাজমীয় পর্দা।

(গ) **অভেদ্য পর্দা** (Impermeable membrane) ঃ কোন দ্রবণই এই পর্দা দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না। উদাহরণ ঃ—প্লাস্টিকের চাদর।

এখন মডেল কোষটিকে একটি জলপূর্ণ প্লাসে রাখলে জল (দ্রাবক) প্লাস থেকে মডেল কোষে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করবে। ক্রমাগত জল গ্রহণের ফলে কোষরসের আয়তন বেড়ে কোষটির **রসস্ফীতি** (Turgidity) ঘটবে। রসস্ফীতির ফলে কোষের কোষরস পর্দার উপর একধরনের চাপ প্রয়োগ করবে, যাকে **রসস্ফীতি চাপ** (**Turgor Pressure** বা **T.P.**) বলে। এই রসস্ফীতি চাপের ফলে কোষটি প্রসারিত হতে থাকবে। কয়েক ঘণ্টা কোষটিকে প্লাসের জলে রেখে দিলে দেখা যাবে কোষটি আর আয়তনে বাড়ছে না। এই অবস্থায় কোষটিকে **পূর্ণ রসস্ফীত** বলা হয়। রসস্ফীতি চাপের ফলে কোষের প্রাচীর ক্রমেই আয়তনে বাড়তে থাকে, কিন্তু যেহেতু পর্দাটি স্থিতিস্থাপক, সেজন্য পর্দাটিও কোষরসের উপর সমান ও বিপরীতমুখী চাপ প্রয়োগ করে। একে **প্রাচীর চাপ** (**Wall Pressure** বা **W.P.**) বলে। উপরিউক্ত ক্ষেত্রে যদিও

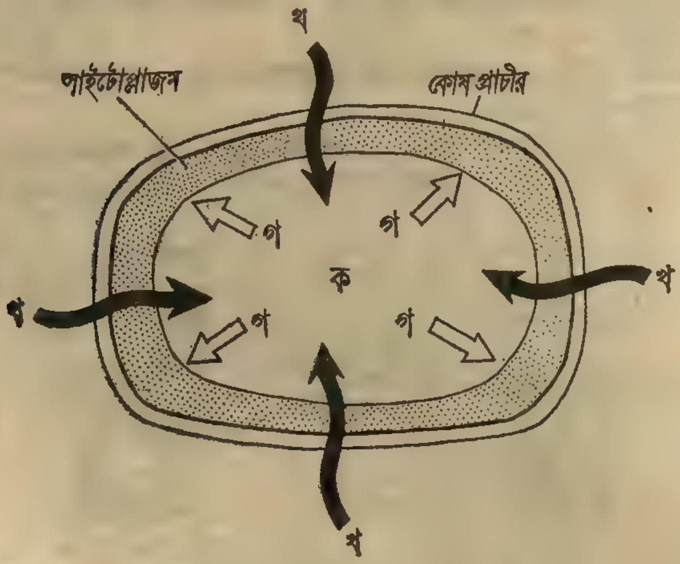

চিত্র 2.53 : উদ্ভিদকোষের রসস্ফীতি।
(ক) কোষরসের মধ্যে দ্রবীভূত লবণ এবং শর্করাগুলি কোষকে দেয় নিম্ন অভিস্রবণ চাপ ; (খ) অভিস্রবণ পদ্ধতিতে জল প্রবেশ করে কোষপ্রাচীর এবং অর্ধভেদ্য সাইটোপ্লাজমের মধ্য দিয়ে যায় ; (গ) কোষরসের আয়তন বাড়ে, সৃষ্টি হয় কোষপ্রাচীরের উপর বহিঃচাপ, ফলে কোষটি হয় রসস্ফীত (Turgid)।

কোন সময়ই কোষস্থ দ্রবণের ঘনত্ব বাইরের দ্রবণের সমান হয় না, কিন্তু প্রাচীর চাপের ফলেই কোষস্থ জলের ব্যাপন চাপ বৃদ্ধি পায় এবং বাইরের জলের ব্যাপন চাপের সমান হয়। সেজন্যই কোষটি পূর্ণ রসস্ফীত হলে অভিস্রবণ বন্ধ হয়ে যায়।

পূর্বপৃষ্ঠার পরীক্ষায় বোঝা গেল যে, অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে জল কোষস্থ দ্রবণে প্রবেশ করে। যদি ঐ কোষস্থ দ্রবণের উপর কোন চাপ প্রয়োগ করা যায়, তাহলে অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে বাইরে থেকে জল কোষে প্রবেশ করার সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোষস্থ দ্রবণে ঠিক যে পরিমাণ বহিঃস্থ চাপ প্রয়োগের ফলে ঐ কোষে বাইরে থেকে দ্রাবকের প্রবেশ বন্ধ হয়, তা ঐ দ্রবণের **অভিস্রবণ চাপের** (Osmotic Pressure বা O.P.) সমান। অর্থাৎ অভিস্রবণ চাপ বলতে কোন দ্রবণের অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক পরিমাণ দ্রাবক গ্রহণের ক্ষমতা বোঝায়। অভিস্রবণ চাপ দ্রবণে উপস্থিত দ্রাবের পরিমাণের সমানুপাতিক। একই বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ও তাপে কোন একটি দ্রবণ যখন একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে তার দ্রাবক থেকে পৃথক থাকে, তখন দ্রবণের দ্রাবকের ব্যাপন চাপ ও কেবলমাত্র দ্রাবকের ব্যাপন চাপের পার্থক্যকে বলা হয় ঐ দ্রবণের **শোষণ চাপ** (Suction Pressure বা S.P.)। কোষস্থ দ্রবণের শোষণ চাপের জন্যই জল অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে কোষের ভেতরে প্রবেশ করে।

● বীরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদের খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য রসস্ফীতি চাপ কিভাবে কাজ করে?

বীরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদের দেহে যান্ত্রিক কলা জাইলেম খুব অল্প পরিমাণে থাকায় স্বাভাবিক কারণে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এইসব বীরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদের প্যারেনকাইমা কলার কোষগুলি পূর্ণ রসস্ফীত অবস্থায় যে সম্মিলিত রসস্ফীতি চাপ (Turgor Pressure বা T.P.) দেয়, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে এরা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

সমসারক দ্রবণ, অতিসারক দ্রবণ ও লঘুসারক দ্রবণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব : পরিবেশের দ্রবণ কোষের দ্রবণের মত সমঘনত্বযুক্ত হলে অভিস্রবণ

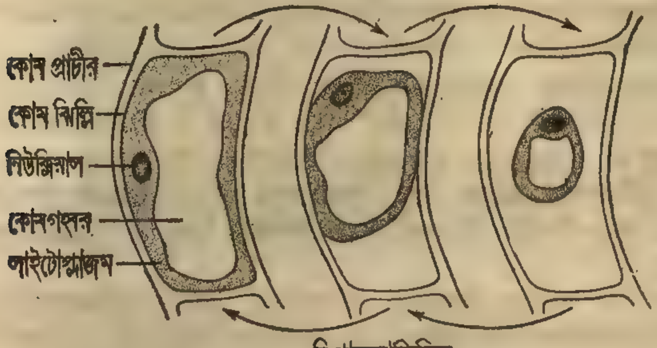

চিত্র 2.54 : প্লাজমোলিসিস এবং ডিপ্লাজমোলিসিস।

হবে না। বাইরের পরিবেশের এরকম দ্রবণকে **সমসারক দ্রবণ** (Isotonic solution) বলে। পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব বেশী হলে, সে রকম দ্রবণকে **অতিসারক দ্রবণ** (Hypertonic solution) বলে। অতিসারক দ্রবণে কোন কোষ রাখলে, কোষ

থেকে জল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বাইরে বেরিয়ে যাবে এবং প্রোটোপ্লাজমের সঙ্কোচন ঘটবে। প্রোটোপ্লাজমের সঙ্কোচনের ফলে সৃষ্ট কোষীয় অবস্থাকে **প্লাজমোলিসিস** (Plasmolysis) বলে এবং ঐ কোষগুলিকে **প্লাজমোলাইজড্** (Plasmolysed) কোষ বলে। প্লাজমোলাইজড্ কোষকে পরিবেশের কম ঘনত্বযুক্ত দ্রবণ বা **লঘুসারক দ্রবণ** (Hypotonic solution)-এ রাখলে কোষ পুনরায় জল শোষণ করে স্ফীত হবে। একে **ডিপ্লাজমোলিসিস** (Deplasmolysis) বলে। কোন কারণে কোষটির মৃত্যু ঘটলে ডিপ্লাজমোলিসিস হবে না।

● **লোহিত রক্তকণিকার উপর সমসারক, অতিসারক ও লঘুসারক দ্রবণের প্রভাব** (Effect of isotonic solution, hypertonic solution and hypotonic solution on R.B.C.) : মানুষের লোহিত রক্তকণিকা 0·9% NaCl-এর দ্রবণে নিমজ্জিত করলে লোহিত কণিকার আকৃতিগত কোন পরিবর্তন হবে না, কারণ লোহিত কণিকার ভিতরের দ্রবণ বাইরের 0·9% NaCl-এর দ্রবণের মত সমঘনত্বযুক্ত অর্থাৎ সমসারক। কিন্তু লোহিত রক্তকণিকাকে 0·9% NaCl-এর দ্রবণ অপেক্ষা অধিক ঘনত্বযুক্ত NaCl-এর দ্রবণে নিমজ্জিত করলে অর্থাৎ অতিসারক দ্রবণে রাখলে লোহিত কণিকার ভিতর থেকে জল (দ্রাবক) অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বাইরে বেরিয়ে যাবে এবং প্রোটোপ্লাজমের সঙ্কোচন ঘটবে অর্থাৎ প্লাজমোলিসিস ঘটবে। আবার লোহিত রক্তকণিকাকে 0·9% NaCl-এর দ্রবণ অপেক্ষা কম ঘনত্বযুক্ত NaCl-এর দ্রবণে নিমজ্জিত করলে অর্থাৎ লঘুসারক দ্রবণে রাখলে লোহিত কণিকার ভিতরে জল (দ্রাবক) অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করবে এবং লোহিত কণিকা জল শোষণ করে স্ফীত হবে অর্থাৎ কোষের ডিপ্লাজমোলিসিস ঘটবে। অধিক রসস্ফীতি ঘটলে ক্ষেত্রবিশেষে লোহিত কণিকার বিদারণ হবে এবং ঐ ধরনের বিদারণকে **হিমোলাইসিস** (Haemolysis) বলে।

অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ ও তার দৃষ্টান্ত (Osmoregulation and its example) : প্রতিটি জীব তার দেহস্থ কোষের দ্রবণের গাঢ়ত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। ফলে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় জীবদেহ থেকে যে জল ও খনিজ আয়ন বেরিয়ে যায় তার অভাব পূরণ করে অথবা জীবদেহে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যে অতিরিক্ত জল ও আয়ন প্রবেশ করে তা পরিবেশে মুক্ত করে জীব নিজদেহের কোষস্থ দ্রবণের গাঢ়ত্ব বজায় রাখে। **জীবকোষস্থ দ্রবণের গাঢ়ত্ব বজায় রাখার জন্য যে প্রক্রিয়ায় জীব কোষের অতিরিক্ত জল পরিবেশে মুক্ত করে, তাকে অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ বা Osmoregulation বলে।**

এককোষী অ্যামিবা মিঠাজলে বসবাসকারী একটি স্বাধীনজীবী প্রাণী। অ্যামিবার কোষ-মধ্যস্থ দ্রবণ পারিপার্শ্বিক জল অপেক্ষা অতিসারক। ফলে বাইরের পরিবেশ থেকে জল অ্যামিবার দেহে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। পরিবেশের এই অতিরিক্ত জল কোষের মধ্যে প্রবেশ করে কোষীয় দ্রবণের **অভিস্রবণিক ভারসাম্য** (Osmotic balance) নষ্ট করে দেয়। ফলে কোষের মধ্যে প্রবিষ্ট এই অতিরিক্ত জল **সঙ্কোচী গহবর** (Contractile vacuole) সৃষ্টির মাধ্যমে অ্যামিবার দেহ থেকে বাইরে পরিত্যক্ত হয়। স্থলজ মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তে জলের পরিমাণ হ্রাস পেলে

বৃক্কের বৃক্কীয় নালিকার মাধ্যমে জলশোষণ বৃদ্ধি পায়, ফলে মূত্রের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং মূত্রের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রক্তের তারল্য বৃদ্ধি পেলে অর্থাৎ রক্তে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বৃক্কীয় নালিকার মাধ্যমে জলশোষণের পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং মূত্রের গাঢ়ত্ব হ্রাস পায়। এইভাবে স্থলজ মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া কার্যকর হয়।

● **সমুদ্রের জলের মাছকে মিঠাজলে রাখলে কি হবে ?** : সমুদ্রের জলের মাছের কলারস সমুদ্রের লবণাক্ত জল থেকে সামান্য অতিসারক বা প্রায় সমসারক। সমুদ্রের জলের অভিস্রবণ ঘনত্ব মিঠাজলের প্রায় 4 গুণ অর্থাৎ মিঠাজলের তুলনায় অধিকমাত্রায় অতিসারক। তাই সমুদ্রের জলের মাছকে মিঠাজলে রাখলে মাছের দেহের বাইরের পরিবেশের অভিস্রবণ ঘনত্ব লঘুসারক হওয়ায়, মাছের দেহ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল শোষণ করবে, ফলে কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমে ডিপ্লাজমোলিসিস ঘটবে এবং মাছের দেহ স্ফীত হবে। এর ফলে মাছটির মৃত্যু হবে।

● **মিঠাজলের মাছকে সমুদ্রের জলে রাখলে কি হবে ?** : এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ঘটনার ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ মিঠাজলের মাছের দেহ থেকে জল অতিসারক দ্রবণ সমুদ্রের জলে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে যাবে। অর্থাৎ কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমের প্লাজমোলিসিস ঘটবে এবং প্রোটোপ্লাজমের সঙ্কোচন ঘটবে। এর ফলে মাছটির দেহ বিশুষ্ক হবে এবং মাছটি পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

2.15A. অভিস্রবণের শর্ত

অভিস্রবণকে মূলত ব্যাপন প্রক্রিয়া বলে, ব্যাপনের শর্তগুলি দিয়ে অভিস্রবণও প্রভাবিত হয়।

2.15B. অভিস্রবণের গুরুত্ব

(1) অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় স্থলজ উদ্ভিদ মূলরোম দিয়ে মাটি থেকে এবং জলজ উদ্ভিদ সমগ্র দেহ দিয়ে জল শোষণ করে।

(2) অভিস্রবণ প্রক্রিয়া জলশোষণ তথা জল সরবরাহের মাধ্যমে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও কোষের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(3) অভিস্রবণের ফলে ভাজক কলার কোষ রসস্ফীত হওয়ার জন্য কোষের বৃদ্ধি ঘটে।

(4) ফুলের দলমণ্ডল বিকশিত হওয়া, পত্ররন্ধ্রের উন্মোচন ও বন্ধে, ফল ও রেণুস্থলীর বিদারণ প্রভৃতিতে অভিস্রবণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

(5) অভিস্রবণের ফলে বীরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

(6) অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রাণিকোষে দ্রবণের প্রবেশ, মূত্র সৃষ্টি, রক্তের তারল্য প্রভৃতি বজায় থাকে।

2.15C. অভিস্রবণের পরীক্ষা

● **প্রথম পরীক্ষা** :

উপকরণ : একটি লম্বা নলযুক্ত ফানেল বা থিস্ল ফানেল, অর্ধভেদ্য পর্দা

হিসেবে পার্চমেণ্ট কাগজ, চিনির ঘন দ্রবণ, স্ট্যাণ্ড ও ক্ল্যাম্প, পাতিত জল, বিকার ও সুতো।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ থিস্‌ল ফানেলের চওড়া মুখে পার্চমেণ্ট কাগজ ভালভাবে বেঁধে দেওয়া হল। এখন থিস্‌ল ফানেলের সরু নলের সামান্য দূরত্ব পর্যন্ত সাবধানে চিনির ঘন দ্রবণ দিয়ে ভর্তি করা হল। দ্রবণের তল সুতোর সাহায্যে চিহ্নিত করা হল। স্ট্যাণ্ড ও ক্ল্যাম্প দিয়ে ফানেলটিকে পাতিত জলপূর্ণ একটি বিকারে এমন ভাবে রাখা হল, যাতে ফানেলের চওড়া মুখটি জলে ডুবে থাকে। এই অবস্থায় প্রায় একঘণ্টা রেখে দেওয়া হল।

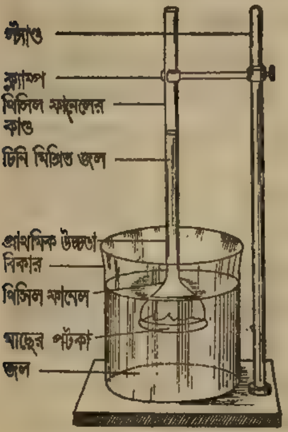

চিত্র 2.55 ঃ পার্চমেণ্ট কাগজের সাহায্যে অভিস্রবণের পরীক্ষা।

পর্যবেক্ষণ ঃ প্রায় একঘণ্টা পর দেখা যাবে যে, থিস্‌ল ফানেলের নলের দ্রবণের তল কিছুটা উপরে উঠেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ এই পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিকারের জলে কোনও চিনির অণু না থাকায় ঐ স্থানের জলের ব্যাপন চাপ ফানেলের ভিতরের দ্রবণের জলের ব্যাপন চাপ থেকে বেশী। বিকারের অধিক ব্যাপন চাপযুক্ত জল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় ফানেলে প্রবেশ করেছে এবং তার ফলে ফানেলের দ্রবণের জল উপরে উঠেছে।

● দ্বিতীয় পরীক্ষা ঃ

থিস্‌ল ফানেলের অভিস্রবণের পরীক্ষাটি ডিমের সাহায্যেও করা যায়। পরীক্ষার আগে ডিমের সুচালো দিকে একটা ছোট ফুটো করে ভিতরের কুসুম সহ সাদা অংশ ঝাঁকিয়ে বের করে দিতে হবে। তারপর ডিমের ভিতরটা ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে গালা দিয়ে ঐ ছিদ্রপথে একটা সরু ফাঁপা কাচের নল লাগিয়ে নিতে হবে। কাচের

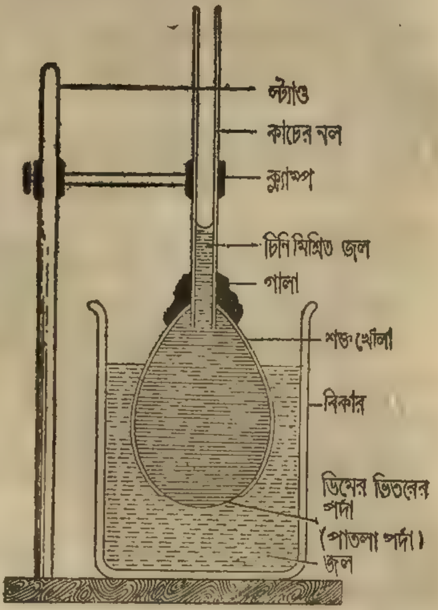

চিত্র 2.56 ঃ ডিমের পাতলা আবরণের সাহায্যে অভিস্রবণের পরীক্ষা।

নলযুক্ত ডিমের খোসাটিকে একটা বিকারের লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে অর্ধেক ডুবিয়ে কিছুক্ষণ খোসাটিকে ঘোরালে খোসাটি ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হয়ে যাবে এবং ভিতরের পাতলা পর্দাটি উম্মুক্ত হবে। এর পর ড্রপার দিয়ে ধীরে ধীরে নলের মধ্যে ঘন চিনির দ্রবণ ঢুকিয়ে ডিমসহ কাচের নলের কিছুটা পূর্ণ করতে হবে। সমস্ত ব্যবস্থাপনাটিকে এখন স্ট্যান্ড ও ক্ল্যাম্প দিয়ে জলপূর্ণ একটা বড় বিকারে কিছুক্ষণ নিমজ্জিত করলে দেখা যাবে, বিকার থেকে জল ডিমের পাতলা অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় ডিমের ভিতরে প্রবেশ করবে এবং নলে জলের তল বাড়বে।

বিকারের জলের ব্যাপন চাপ ডিমের খোলার ভিতরের দ্রবণের জলের ব্যাপন চাপ থেকে বেশী হওয়ার ফলেই এটা সম্ভব হয়।

2.15D. কোষান্তর অভিস্রবণের পরীক্ষা

উপকরণ ঃ একটা বড় গোল আলু, একটা স্ক্যালপেল, একটা পেট্রিডিস, চিনির ঘন জলীয় দ্রবণ, পাতিত জল, একটা আলপিন।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ গোল আলুটির দুই প্রান্ত এমনভাবে কেটে ফেলা হল যাতে আলুটিকে কোন পাত্রে খাড়াভাবে বসানো যেতে পারে। এখন সাবধানে স্ক্যালপেল দিয়ে আলুর ব্লকটির একদিকে একটা বড় গর্ত করা হল। আলুর ব্লকটির বাইরের খোসা ছাড়িয়ে ফেলে গর্তটি চিনির ঘন জলীয় দ্রবণ দিয়ে ভর্তি করা হল। এখন পেট্রিডিসে এমনভাবে পাতিত জল ঢালা হল, যাতে আলুর ব্লকটির অর্ধেক জলে ডুবে থাকে। আলুর ব্লকটির গর্তের চিনির দ্রবণের তল আলপিন গেঁথে চিহ্নিত করা হল।

পর্যবেক্ষণ ঃ কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে আলুর গর্তে দ্রবণের তল উপরে উঠেছে। বেশীক্ষণ রেখে দিলে দেখা যাবে ভিতরের দ্রবণ গর্ত থেকে উপচে পড়ছে।

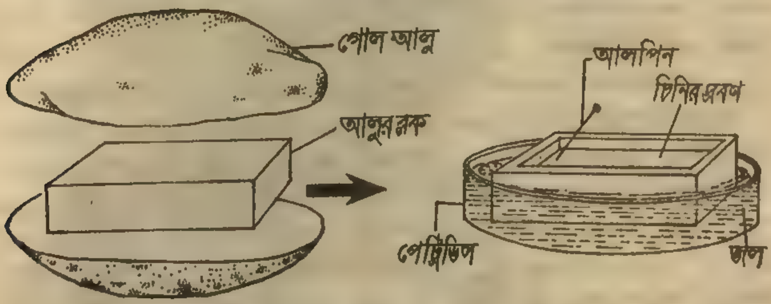

চিত্র 2.57 ঃ কোষান্তর অভিস্রবণের পরীক্ষা।
আলু—অসমোস্কোপের সাহায্যে (Potato Osmoscope)।

সিদ্ধান্ত ঃ আলুর ব্লকের ভিতরের দ্রবণের জলের ব্যাপন চাপ পেট্রিডিসের পাতিত জলের ব্যাপন চাপ থেকে কম। সুতরাং আলুর ব্লকের সজীব কোষগুলির

পারস্পরিক অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাইরে থেকে জল ভিতরের দ্রবণে প্রবেশ করেছে এবং ভিতরের দ্রবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক কোষ থেকে তার পার্শ্ববর্তী কোষে দ্রাবকের এরকম অভিস্রবণকে **কোষান্তর অভিস্রবণ** বলে।

[অভিস্রবণের পরীক্ষার সময় বিকার কিংবা পেট্রিডিসে ইওসিন বা অন্য কোন দ্রাব মিশিয়ে পরীক্ষা করা উচিত নয়; কারণ অভিস্রবণে শুধু দ্রাবকের অণুই অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে বেশী ঘনত্বের দ্রবণে প্রবেশ করবে; দ্রাবের অণুর প্রবেশ অভিস্রবণকে সমর্থন করে না।]

● ব্যাপন এবং অভিস্রবণের মধ্যে পার্থক্য ●

ব্যাপন	অভিস্রবণ
1. পদার্থের গাঢ় ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা।	1. যে ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে লঘু দ্রবণের দ্রাবক গাঢ় দ্রবণে অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে প্রবেশ করে।
2. কোন ব্যবধায়ক পর্দার প্রয়োজন হয় না।	2. অর্ধভেদ্য পর্দার প্রয়োজন হয়।
3. ব্যাপন সংঘটিত হয় গ্যাস এবং গ্যাস, তরল এবং তরল, তরল এবং গ্যাস, কঠিন এবং তরল, কঠিন এবং গ্যাসের মধ্যে।	3. অভিস্রবণ কেবলমাত্র তরল এবং তরলের মধ্যে সংঘটিত হয়।
4. দ্রাব (solute) এবং দ্রবণ (solution)-এর মধ্যে ব্যাপন ক্রিয়া স্বাধীনভাবে সংঘটিত হয়, যখন দুটি দ্রবণ (solution)-কে মেশান হয়।	4. অভিস্রবণ শুধু দ্রাবক অণুর মধ্যে সংঘটিত হয়। কিন্তু দ্রবণ অণুর মধ্যে হয় না।
5. ব্যাপন বিভিন্ন ধরনের দ্রাবক (solvents)-এর মধ্যে সম্পন্ন হয়।	5. অভিস্রবণ একই জাতীয় দ্রাবক (solvent)-এর মধ্যে সম্পন্ন হয়।
6. ব্যাপনে কোন চাপের সৃষ্টি হয় না।	6. অভিস্রবণে রসস্ফীতি চাপের সৃষ্টি হয়।

2.16. অভিস্রবণ চাপ ও রসস্ফীতি চাপের সম্পর্ক
(Relation between Osmotic pressure and Turgor pressure)

● **অভিস্রবণ চাপ** (Osmotic pressure) ঃ **অন্তঃঅভিস্রবণের ফলে কোন কোষের দ্রবণে ঠিক যে পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হলে ঐ কোষে বাইরে থেকে দ্রাবকের প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়, সেই চাপকে ঐ কোষের অভিস্রবণ চাপ বলে।** অর্থাৎ, অন্তঃঅভিস্রবণের দ্বারা **সম্ভাব্য সর্বাধিক** যে পরিমাণ চাপ কোন কোষের দ্রবণে সৃষ্টি হতে পারে, সেই চাপই ঐ কোষের অভিস্রবণ চাপ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার (যথা—উষ্ণতা, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ, কোষরসে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ ইত্যাদির) কোন পরিবর্তন না হলে কোন কোষের অভিস্রবণ চাপ নির্দিষ্ট থাকে—এর পরিবর্তন হয় না।

● **রসস্ফীতি চাপ** (Turgor pressure) ঃ কোষ কর্তৃক ক্রমাগত জল গ্রহণের ফলে কোষরসের আয়তন বাড়ে এবং কোষটি স্ফীত হয়—এই ঘটনাকে বলা হয় কোষের

রসস্ফীতি (Turgidity)। রসস্ফীতির ফলে কোষরস কোষ পর্দার উপর যে চাপ সৃষ্টি করে তারই নাম রসস্ফীতি চাপ।

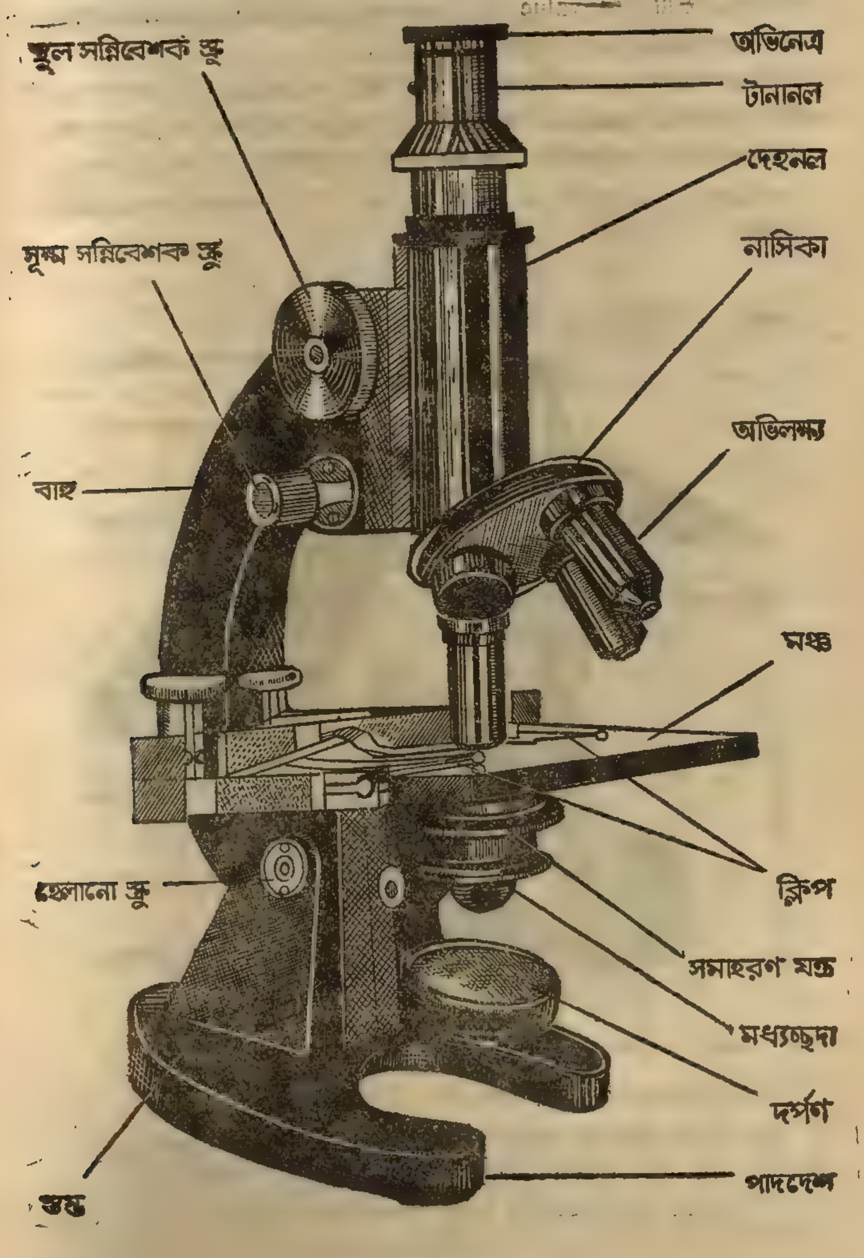

জল গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কোষের রসস্ফীতি চাপ বাড়তে থাকে। অর্থাৎ এই চাপ অভিস্রবণ চাপের মত নির্দিষ্ট নয়—এটি পরিবর্তনশীল। সাধারণত কোন কোষের রসস্ফীতি চাপের মান (value) শূন্য থেকে শুরু হয়ে উক্ত কোষের অভিস্রবণ চাপ পর্যন্ত যে-কোন মানের হতে পারে।

অভিস্রবণ চাপ ও রসস্ফীতি চাপের পার্থক্যকে বলা হয় দ্রাবকের **ব্যাপন-চাপের ঘাটতি** (Diffusion-pressure deficit)। যতক্ষণ এই ঘাটতি থাকে ততক্ষণ কোষে জল প্রবেশ করে। এই ঘাটতি পূরণ হয়ে গেলে কোষে জল প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়।

অভিস্রবণ চাপ (O.P.) − রসস্ফীতি চাপ (T.P.)=ব্যাপন-চাপের ঘাটতি (D.P.D.)।

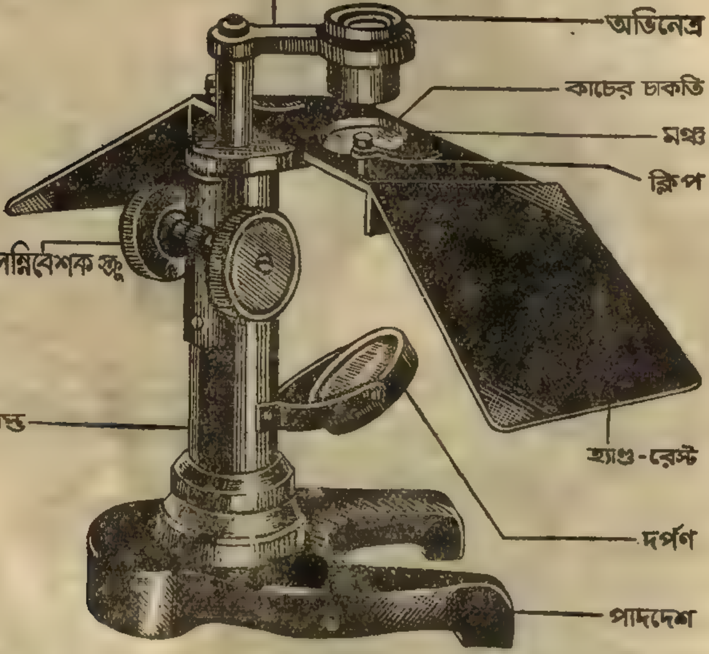

2.17. জল শোষণ (Water absorption)

উদ্ভিদ-জীবনে জলের গুরুত্ব অপরিসীম। জলে বসবাসকারী উদ্ভিদ তাদের সারা দেহ দিয়েই অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল শোষণ করে। স্থলজ উদ্ভিদ মাটি থেকে প্রধানত মূলরোম দিয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় জল শোষণ করে থাকে। মাটিতে উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য জলকে **কৈশিক জল** (Capillary water) বলে। কৈশিক জল মাটির কণাগুলিকে ঘিরে চারপাশে অবস্থান করে।

স্থলজ উদ্ভিদ মূলরোম দিয়েই প্রধানত জল গ্রহণ করলেও মূলত্বকের অন্যান্য কোষও কিছু পরিমাণ জল সংগ্রহ করতে পারে। মূলত্বকের কিছু কিছু কোষ বর্ধিত হয়ে এককোষী মূলরোম গঠন করে। মূলরোমের কোষ-মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজম কোষ-প্রাচীর ঘেঁষে পাতলা পর্দার মত অবস্থান করে বলে তাদের কোষগহ্বর অপেক্ষাকৃত বড়। কোষগহ্বর সবসময় কোষরসে পূর্ণ থাকে। এককোষী নলাকার মূলরোম কৈশিক জলের সংস্পর্শে আসে এবং প্রায় সর্বাঙ্গ দিয়েই জল শোষণ করতে পারে। মূলরোম এককোষী বলে শোষিত জল সরাসরি মূলের বহিঃস্তরের কোষে প্রবেশ করে।

মূল দিয়ে জল শোষণ দু ভাবে হয়ে থাকে। যেমন—(1) **নিষ্ক্রিয় শোষণ** (Passive absorption) ও (2) **সক্রিয় শোষণ** (Active absorption)।

1. নিষ্ক্রিয় শোষণ : এই পদ্ধতিতে গাছের বাষ্পমোচনকারী অংশ (পাতা) জল শোষণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। পাতার বায়ুপ্রকোষ্ঠের কাছের মেসোফিল কোষ থেকে জল ক্রমাগত বাষ্পীভূত হয়ে আন্তঃকোষীয় স্থান (Intercellular

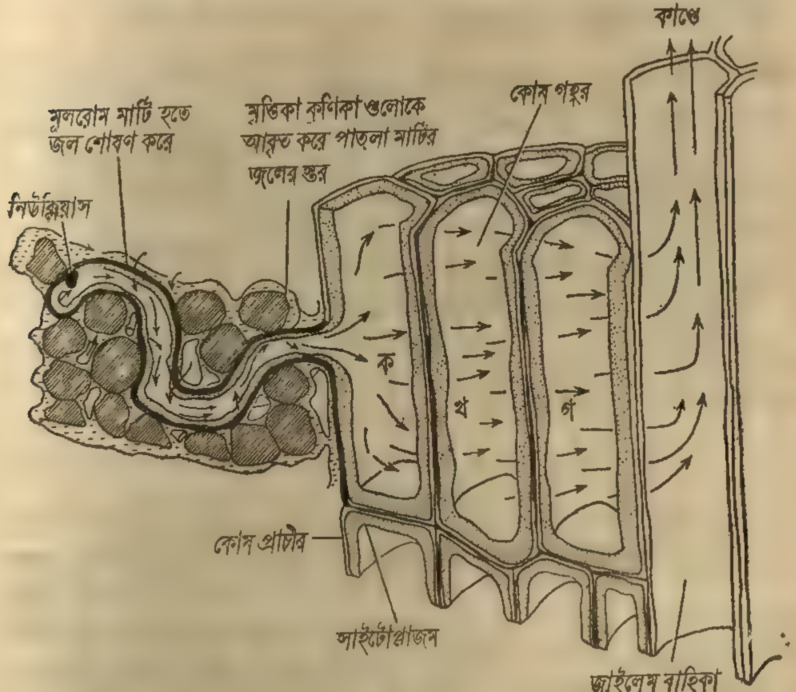

চিত্র 2.58 : মূলরোম মাটি থেকে জল শোষণ করার পর কিভাবে সেই জল জাইলেম বাহিকায় পৌঁছায় তা চিত্রের সাহায্যে দেখান হয়েছে।

space) ও বায়ু-প্রকোষ্ঠে জমা হয়। বায়ু-প্রকোষ্ঠের বাষ্প পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে অধিক ব্যাপন চাপের মাধ্যমে পাতার বাইরে প্রেরিত হয়। মেসোফিল কোষ থেকে জল

বেরিয়ে যাওয়ায় কোষগুলির কোষরসের রসস্ফীতি চাপ (Turgor pressure) কমে যায়, ফলে কোষগুলি শিথিল (flaccid) হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় পাশের রসস্ফীত কোষ থেকে তারা জল শোষণ করে। এভাবে ক্রমে পাতার জাইলেম বাহিকা থেকে জল তার পাশের কোষগুলিতে প্রবাহিত হয়। জাইলেম বাহিকা থেকে জল বেরিয়ে যাওয়ায় তার জলস্তম্ভের উপর একরকম টানের সৃষ্টি হয়। এই টান ক্রমে মূলের জাইলেম বাহিকা ও বহিঃস্তরের কোষ দিয়ে রসস্ফীত মূলরোমে সঞ্চালিত হয় এবং মূলরোম থেকে জল পাশের বহিঃস্তরের কোষে স্থানান্তরিত হয়। মূলরোম থেকে জল বেরিয়ে গেলে তার কোষরসের রসস্ফীতি চাপ কমে যায় এবং মাটি থেকে জল মূলরোমে প্রবেশ করে পুনরায় তাকে রসস্ফীত করে তোলে। এই পদ্ধতিতে জল শোষণে মূল কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে না বলে একে **নিষ্ক্রিয় শোষণ** বলে।

2. সক্রিয় শোষণ ঃ সক্রিয় জল শোষণ মূলের কোষের কার্যকারিতার জন্যই সম্ভব। মূলরোমের কোষরসে ব্যাপন চাপের ঘাটতি (Diffusion-pressure deficit) থাকায় মাটি থেকে জল অন্তঃ-অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোমে প্রবেশ করে।

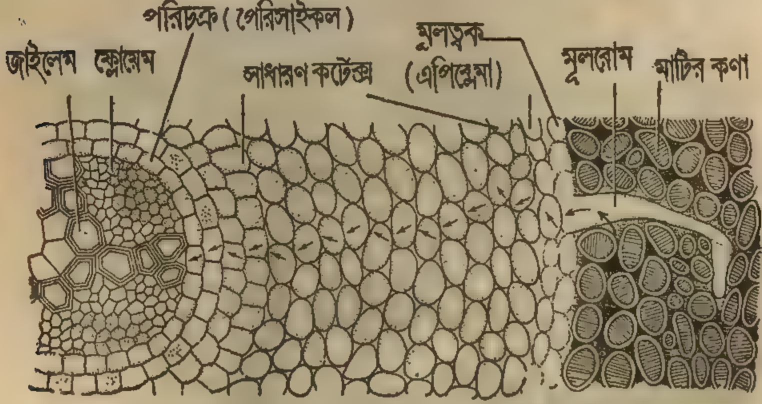

চিত্র 2.59 ঃ সক্রিয় জল শোষণ পদ্ধতি চিত্রে দেখান হয়েছে।

মূলরোমে জল প্রবেশ করায় রসস্ফীতি চাপ বাড়তে থাকে। পূর্ণ রসস্ফীত হওয়ার পর আংশিক প্রাচীর চাপের জন্য এবং সেইসঙ্গে মূলরোমের পাশের বহিঃস্তরের কোষে ব্যাপন-চাপের ঘাটতির জন্য জল মূলরোম থেকে ঐ কোষে প্রবেশ করে, ফলে মূলরোম শিথিল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় মূলরোম আবার জল শোষণের ক্ষমতা ফিরে পায়। মূলরোম-সংলগ্ন বহিঃস্তরের জল কোষান্তর অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় ভিতরের অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যাপন-চাপের ঘাটতিযুক্ত কোষে সঞ্চালিত হয়। শোষিত জল এসে অন্তঃস্ত্বকের মধ্য দিয়ে পরিচক্রে পৌঁছায়। ইতিমধ্যে বহিঃস্তরের কোষগুলি পুনরায় রসস্ফীত হয়ে পড়ে। এর ফলে রসস্ফীত পরিচক্রের কোষ থেকে জল সজোরে মৃত জাইলেম বাহিকায় প্রবেশ করে। ক্রমাগত মূলের বিভিন্ন কোষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে চাপে জল জাইলেম বাহিকায় প্রবেশ করে, তাকে **মূলজ প্রেস**

(Root pressure) বলে। মূলজ প্রেস-এর কার্যকারিতায় জাইলেম বাহিকায় জলস্তম্ভ উপরে উঠতে থাকে।

সক্রিয় জল শোষণে অভিস্রবণের মাধ্যমে জল শোষিত হয় বলে প্রত্যক্ষভাবে কোষের শক্তি ব্যয় হয় না। কিন্তু মূলের বিভিন্ন কোষে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণের উপর কোষরসের অভিস্রবণ চাপ নির্ভর করে বলে বিভিন্ন লবণের যোগান ও সঞ্চয়ের পরিমাণ ঠিক রাখতে কোষকে শক্তি ব্যয় করতে হয়। সুতরাং সক্রিয় জল শোষণ পরোক্ষভাবে শারীরবৃত্তীয় কাজে উৎপন্ন শক্তির উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয় পদ্ধতিতে জল শোষণ করলেও সাধারণত নিষ্ক্রিয় উপায়ে শোষিত জলের পরিমাণ সক্রিয় শোষণে গৃহীত জলের পরিমাণ থেকে বেশী।

2.18. জল শোষণের শর্ত

জল শোষণ পদ্ধতি নিম্নলিখিত শর্তগুলির উপর নির্ভরশীল ঃ

(ক) **বাহ্যিক শর্ত** (External condition) ঃ

(i) **মাটিতে শোষণযোগ্য জলের পরিমাণ ঃ** মাটির শোষণযোগ্য জলের পরিমাণ বেশী থাকলে শোষণের হার বৃদ্ধি পায়।

(ii) **মাটির উষ্ণতা ঃ** উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ 25°C থেকে 30°C-এ সবচেয়ে ভাল হয়। তাই উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে শোষণ সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

(iii) **মাটিতে অক্সিজেনের পরিমাণ ঃ** মাটিতে বায়ুর অক্সিজেনের পরিমাণের উপর মূলের কোষগুলির বৃদ্ধি ও বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া নির্ভরশীল বলে মাটির অক্সিজেনের পরিমাণ জল শোষণকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

(iv) **অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব ঃ** মাটির অম্লত্ব বেশী হলে জল শোষণের হার বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষারকত্ব বেশী হলে তা কমে যায়।

(v) **মাটির জলীয় দ্রবণের ঘনত্ব ঃ** যেহেতু জল শোষণ ব্যাপন চাপের পার্থক্য অনুযায়ী হয়ে থাকে, সেজন্য মাটির জলীয় দ্রবণের ঘনত্ব নির্দিষ্ট মাত্রার বেশী হওয়া উচিত নয়।

(খ) **অভ্যন্তরীণ শর্ত** (Internal condition) ঃ

(i) **মূলরোমের অভিস্রবণ চাপ ঃ** (Osmotic pressure of root hairs) ঃ মূলরোমের কোষরসে অভিস্রবণ চাপ বৃদ্ধি পেলে শোষণের হারও বেড়ে যায়।

(ii) **মূলজ প্রেস** (Root pressure) ঃ যেহেতু মূলজ প্রেস মূলরোম থেকে জাইলেম বাহিকার বিভিন্ন লবণের অপসারণে অংশগ্রহণ করে, সেইজন্য মূলজ প্রেস বাড়লে শোষণও বাড়ে।

2.19. আয়ন বিশোষণ (Ion absorption)

জলের মত বিভিন্ন ধরনের অজৈব লবণও উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য অপরিহার্য। উদ্ভিদ মাটি থেকে জলে দ্রবীভূত অবস্থায় ঐসব লবণ মূলরোম দিয়ে শোষণ করে। পূর্বে ধারণা করা হত, অজৈব লবণের দ্রবণ মাটি থেকে উদ্ভিদ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষণ

করে থাকে। কিন্তু মূলের কোষরসে দ্রবীভূত লবণের ঘনত্ব মাটির জলীয় দ্রবণ থেকে বেশী হওয়ায় শুধু ব্যাপন প্রক্রিয়ায় লবণ বিশোষণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

মাটির লবণের জলীয় দ্রবণ কেবলমাত্র আয়ন রূপেই উদ্ভিদকোষে প্রবেশ করে। কোষে আয়নের এই প্রবেশকে বলা হয় **আয়ন বিশোষণ** (ion absorption)। উদ্ভিদ বিভিন্ন অজৈব লবণের আয়নগুলিকে নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়—এই দু ভাবে শোষণ করে। ব্যাপন প্রক্রিয়ার মত ভৌত প্রক্রিয়ায় আয়ন শোষণকে **নিষ্ক্রিয় আয়ন বিশোষণ** ও শারীরবৃত্তীয় কার্যের ফলে উদ্ভূত শক্তির বিনিময়ে আয়ন শোষণকে **সক্রিয় আয়ন বিশোষণ** বলে।

(i) নিষ্ক্রিয় আয়ন বিশোষণ (Passive ion absorption) :

নিষ্ক্রিয় আয়ন বিশোষণ সরল ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। এই ব্যাপন শুধু আয়নের ঘনত্বের পার্থক্যই নয়, কোষ পর্দার দু পাশের তড়িৎ শক্তির পার্থক্যও নিষ্ক্রিয় আয়ন বিশোষণের জন্য দায়ী। কোষ পর্দার দু পাশের এই তড়িৎ শক্তির পার্থক্যকে **তড়িৎ-বিভব পার্থক্য** (Electrical gradient) বলে। নিষ্ক্রিয় বিশোষণে খনিজ লবণ প্রথমে আয়নিত হয়ে ধনাত্মক আয়ন বা ক্যাটায়ন (+) এবং ঋণাত্মক আয়ন বা অ্যানায়ন (−)-এ বিশ্লেষিত হয় এবং পরে এই অবস্থায় শোষিত হয়। এই বিশোষণ সাধারণত ঘনত্বের সপক্ষে ঘটে থাকে, অর্থাৎ ভিতর থেকে বাইরে ধনাত্মক আয়ন বা ক্যাটায়নের ঘনত্ব বেশী হলে, বাইরে থেকে ভিতরে ধনাত্মক আয়ন বা ক্যাটায়নের প্রবেশ ঘটে। একই নিয়মে কোষের বাইরে ঋণাত্মক আয়ন বা অ্যানায়নের ঘনত্ব বেশী হলে, বাইরে থেকে ভিতরে ঋণাত্মক আয়ন বা অ্যানায়নের প্রবেশ ঘটে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল, মূলরোমের ভিতরের ও বাইরের লবণের তড়িৎ আধানের সমতা বজায় রাখা।

অনেকক্ষেত্রে পদার্থের আয়ন বা অণু দলবদ্ধ অবস্থায় ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। এরকম দলবদ্ধভাবে অণু বা আয়নের প্রবাহকে **দলবদ্ধ প্রবাহ** (Bulk flow) বলে। এরূপ প্রবাহ উচ্চ চাপযুক্ত অঞ্চল থেকে নিম্ন চাপযুক্ত অঞ্চলের দিকে হয়ে থাকে। এই প্রবাহের মাত্রা বা হার চাপের পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল। এই চাপের পার্থক্যকেই **প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট** (Pressure gradient) বলে। ব্যাপন দ্বারা অণুর বিস্তার স্বল্প দূরত্ব পর্যন্ত হতে পারে কিন্তু এরূপ দলবদ্ধ প্রবাহ দ্বারা অণুর বিস্তার অনেক দূর পর্যন্ত হতে পারে। জাইলেম বাহিকার মাধ্যমে জলের পরিবহণ দলবদ্ধ প্রবাহের একটি দৃষ্টান্ত।

(ii) সক্রিয় আয়ন বিশোষণ (Active ion absorption) :

পরিবেশে আয়নের ঘনত্ব কোষরসের আয়নের ঘনত্ব থেকে কম হলেও যে প্রক্রিয়ায় কোষ আয়ন শোষণ করে, তাকে **সক্রিয় আয়ন বিশোষণ** বলে। এই প্রক্রিয়ায় কোষের শ্বসনের হার অর্থাৎ খাদ্যবস্তুর জারণের ফলে উৎপন্ন শক্তি ব্যবহৃত হয়।

সক্রিয় আয়ন বিশোষণের জন্য কোন-না-কোন বাহকের প্রয়োজন হয় এবং প্রয়োজনীয় শক্তি ATP যোগান দেয়। অর্থাৎ ATP, উৎসেচক ATP-ase দিয়ে আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে শক্তি নির্গত করে। **ডেভলিন** (Devlin, 1966)-এর মতে সক্রিয়

আয়ন বিশোষণে বাহক ও আয়ন মিশে **'বাহক আয়ন কমপ্লেক্স'** গঠন করে। এই প্রক্রিয়ায় শুধু বাইরের পরিবেশ থেকে আয়ন কোষের ভিতরেই প্রবেশ করতে পারে এবং কোষের ভিতরের আয়ন বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারায় সেখানে আয়ন জমা হতে থাকে। এই ধারণা অনুযায়ী অনেকে মনে করেন ধনাত্মক আয়ন ও ঋণাত্মক আয়নের জন্য পৃথক পৃথক বাহকের প্রয়োজন হয়।

আয়ন শোষণে বাহক কিভাবে বাহক আয়ন কমপ্লেক্স গঠনের মাধ্যমে কাজ করে, তা নিচের চিত্রে (চিত্র 2.60) দেখানো হল ঃ

বিজ্ঞানী **লুনডিগার্দ** (**Lundegardh, 1934**)-এর মতে উদ্ভিদকোষে সাইটোক্রোম নামক রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে ধনাত্মক আয়ন যুক্ত থাকে। এই সাইটোক্রোম উৎসেচকের সহায়তায় অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে প্লাজমা পর্দার দিকে সরে যায় এবং অ্যানায়ন বা ঋণাত্মক আয়ন গ্রহণ করে। এইভাবে সৃষ্ট বাহক আয়ন কমপ্লেক্সটি কোষের ভিতরে গিয়ে বিজারিত হয় এবং ঋণাত্মক আয়ন কোষগহ্বরে মুক্ত হয়। বিজারিত বাহকটি আবার প্লাজমা পর্দার দিকে এগিয়ে যায়। কোষরসে ক্রমাগত ঋণাত্মক আয়ন প্রবেশের ফলে কোষ-গহ্বরের লবণের তড়িতাধান ঋণাত্মক হতে থাকে। ফলে তড়িতাধানের ভারসাম্য বজায় রাখতে ধনাত্মক আধানযুক্ত হাইড্রোজেন আয়ন (H^+)-এর বিনিময়ে বাইরে থেকে ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়নগুলি ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সরাসরি কোষ গহ্বরে প্রবেশ করে।

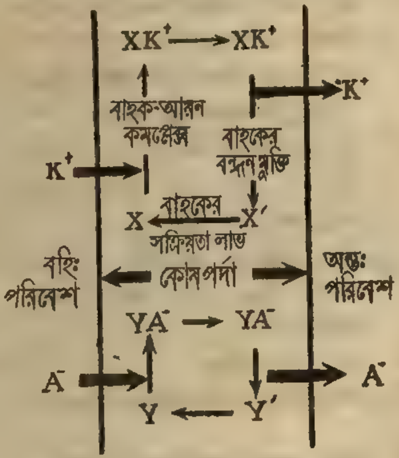

চিত্র 2.60 ঃ সক্রিয় আয়ন বিশোষণ।

বেনেট-ক্লার্ক (**Bennet-Clark, 1956**)-এর মতে প্লাজমা পর্দা গঠনকারী ফসফোলিপিড আয়ন শোষণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। লেসিথিন হল এক ধরনের ফসফো-লিপিড। এর ক্ষারীয় কোলিন অংশের সঙ্গে ঋণাত্মক আয়ন এবং ফসফ্যাটিডের সঙ্গে ধনাত্মক আয়ন যুক্ত হয়ে সাইটোপ্লাজমে আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে

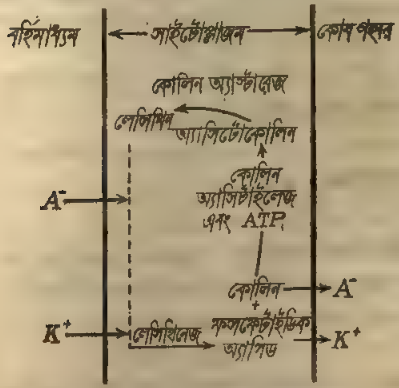

চিত্র 2.61 ঃ বেনেট-ক্লার্কের মত অনুযায়ী সক্রিয় আয়ন বিশোষণ।

আয়নের মুক্তি ঘটায়। এই প্রক্রিয়ায় আয়ন শোষণের সময় ATP প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয় এবং উৎসেচকের উপস্থিতিতে বাহকটি পুনরায় সংশ্লেষিত হয়। এই প্রক্রিয়াটি চক্রাকারে চলে। এই চক্রটিকে **'ফসফ্যাটিড চক্র'** (Phosphatid cycle) বলে।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় আয়ন বিশোষণের পার্থক্য (Differences between Active and Passive ion absorption) ঃ

সক্রিয় আয়ন বিশোষণ	নিষ্ক্রিয় আয়ন বিশোষণ
1. এটি একটি বিপাকীয় পদ্ধতি।	1. এটি একটি ভৌত পদ্ধতি।
2. এই পদ্ধতি শক্তির উপর নির্ভরশীল কারণ ATP ব্যয় হয়।	2. এই পদ্ধতি শক্তির উপর নির্ভরশীল নয় কারণ ATP ব্যয় হয় না।
3. এই শোষণ পদ্ধতিতে অণু সক্রিয় বাহকরূপে অংশ গ্রহণ করে।	3. এই শোষণ পদ্ধতিতে কোন অণু বাহকরূপে কাজ করে না।
4. এই শোষণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন হয় না, যার ফলে কোন সময়ই সাম্যাবস্থায় পৌঁছায় না।	4. এই শোষণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন হয়, যার ফলে সাম্যাবস্থায় পৌঁছায়।
5. এই প্রক্রিয়ায় ধনাত্মক (+) ও ঋণাত্মক (−) আয়ন শোষণ একই সঙ্গে ঘটে।	5. এই প্রক্রিয়ায় ধনাত্মক (+) ও ঋণাত্মক (−) আয়ন শোষণ একই সঙ্গে ঘটে না।
6. শ্বসন হার বাড়ে।	6. শ্বসন হার বাড়ে না।
7. উৎসেচকের সক্রিয় ভূমিকা থাকে।	7. উৎসেচকের কোন ভূমিকা দেখা যায় না।
8. সক্রিয় শোষণ ঘটে সজীব কোষের সক্রিয় কার্যকারিতার ফলে।	8. নিষ্ক্রিয় শোষণে সজীব কোষের কোন সক্রিয় কার্যকারিতা থাকে না।

লবণ শ্বসন (Salt respiration) ঃ সক্রিয় আয়ন বিশোষণের সময় কোষীয় শ্বসন (cellular respiration)-এর হার বৃদ্ধি পায়। এই শ্বসন সক্রিয় আয়ন বিশোষণের জন্য হয় বলে একে **লবণ শ্বসন** বা **সল্ট রেসপিরেশন** বলে।

● বিষয়-সংক্ষেপ ●

● **কোষের গঠন** ঃ

1. আংশিক ভেদ্য পর্দা দ্বারা বেষ্টিত যেসব ক্ষুদ্রতম অংশ জীবনের সংগে সম্পর্কযুক্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে সক্ষম এবং কোন সজীব মাধ্যম ব্যতিরেকেই বংশবৃদ্ধি করতে পারে, তাদের 'কোষ' বলে। কোষ হচ্ছে জীবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপের একক।
2. সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত এবং একক পর্দা-বেষ্টিত যেসব সজীব অংশ কোষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক কাজ করে, তাদের 'কোষ অঙ্গাণু' বা 'কোষ উপাংশ' (cell organelles) বলে। উদাহরণ ঃ প্লাসটিড, মাইটোকনড্রিয়া, গলগি বডি, লাইসোসোম ইত্যাদি।

3. সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত যেসব পদার্থ কোষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন কাজ করে না, তাদের 'কোষস্থ অজীবীয় বস্তু' (cell inclusions) বলে। উদাঃ নানা প্রকার সঞ্চিত খাদ্য, নিঃসৃত দানা, রঞ্জক পদার্থ ইত্যাদি।
4. কোষ দু'রকমের—(i) প্রোক্যারিওটিক ও (ii) ইউক্যারিওটিক।
5. যেসব কোষে নিউক্লীয় পর্দা ঘেরা সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না এবং মাইটোকনড্রিয়া, প্লাসটিড প্রভৃতি কোষীয় অঙ্গাণুসমূহও থাকে না, তাদের প্রোক্যারিওটিক কোষ বলে। উদাঃ ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবাল।
6. যেসব কোষে নিউক্লীয় পর্দা ঘেরা সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে এবং মাইটোকনড্রিয়া, প্লাসটিড প্রভৃতি কোষীয় অঙ্গাণুসমূহও থাকে, তাদের ইউক্যারিওটিক কোষ বলে। উদাঃ নীলাভ-সবুজ শৈবাল ব্যতীত সকল উদ্ভিদকোষ ও সকল প্রাণিকোষ।
7. প্রতিটি সজীব কোষ যে পাতলা, স্থিতিস্থাপক, লাইপোপ্রোটীন নির্মিত এবং প্রভেদক ভেদ্য পর্দা দ্বারা ঘেরা থাকে, তার নাম 'প্লাজমা পর্দা' বা 'কোষ পর্দা'।
8. কোষের সমস্ত অঙ্গাণুর আবরণী, এমনকি প্লাজমা পর্দাও প্রোটীন-লিপিড-প্রোটীন (P-L-P)—এই তিন স্তর দ্বারা গঠিত। মাঝের স্তরটি লিপিড দ্বারা গঠিত এবং লিপিডের উভয় পাশে থাকে প্রোটীনের আস্তরণ। এই ত্রিস্তর-বিশিষ্ট লাইপোপ্রোটীন পর্দাকে 'একক পর্দা' বা 'ইউনিট মেমব্রেন' বলা হয়।
9. কোষ পর্দার প্রধান কাজ, কোষ থেকে কোষের বাইরে এবং বাইরে থেকে কোষের ভিতরে বিভিন্ন বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা। তাছাড়া কোষের ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গকে রক্ষা করা, কোষের কোন-কোন অঙ্গাণুর আবরণী সৃষ্টি করা, ফ্যাগোসাইটোসিস ও পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় খাদ্যগ্রহণ, বাইরের পরিবেশের সঙ্গে কোষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি প্রভৃতি কাজও কোষ পর্দা করে।
10. উদ্ভিদকোষে কোষ পর্দার বাইরের দিকে জড় বস্তু নির্মিত যে আবরণী থাকে তার নাম 'কোষপ্রাচীর'।

পরিণত কোষপ্রাচীরে সাধারণত তিনটি স্তর দেখা যায়—(i) প্রধানত পেকটিন এবং সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণ প্রোটীন ও ক্যালসিয়াম দ্বারা গঠিত 'মধ্যচ্ছদা' বা 'মধ্যপর্দা', (ii) সেলুলোজ দ্বারা গঠিত 'প্রাথমিক কোষপ্রাচীর' এবং (iii) সেলুলোজ ও লিগনিন বা সুবেরিন বা কিউটিন দ্বারা নির্মিত 'গৌণ কোষপ্রাচীর'।

সেলুলোজ অণু যে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম তন্তুর মত অংশ দ্বারা গঠিত তাদের নাম 'মাইক্রোফাইব্রিল'।
11. কোষপ্রাচীরে উপস্থিত ছিদ্রের ভিতর দিয়ে সন্নিহিত দুটি কোষের মধ্যে সংযোগকারী সূক্ষ্ম সাইটোপ্লাজমীয় অংশসমূহকে 'প্লাজমোডেস্‌মাটা' বলে।
12. প্রাথমিক কোষপ্রাচীরের উপর গৌণ কোষপ্রাচীরের উপাদানগুলি অসম ভাবে জমা হওয়ার ফলে কোষপ্রাচীরে নানাপ্রকার অলঙ্করণ দেখা যায়, যথা—বলয়াকার, সর্পিলাকার, সোপানাকার, জালিকাকার ও কূপাঙ্কিত। কূপাঙ্কিত অলঙ্করণ আবার দু'রকমের, যথা—সরল কূপ-যুক্ত ও সপাড় কূপ-যুক্ত।

কোষপ্রাচীরের উভয় পাশে জোড়বদ্ধ ভাবে কূপ সৃষ্টি হলে তাকে 'জোড় কূপ' বলে ; কিন্তু কোষপ্রাচীরের কেবলমাত্র এক দিকে কূপ উৎপন্ন হলে তাকে 'অন্ধ কূপ' বলে।

প্রত্যেক কূপে কূপ-গহ্বর বা কূপকক্ষ, কূপ-ছিদ্র ও কূপ-পর্দা থাকে।

13. কোষপ্রাচীর কোষকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে এবং কোষকে নির্দিষ্ট আকৃতি ও দৃঢ়তা দান করে।
14. বড়-বড় গহ্বর, কোষরস এবং খাদ্যরূপে গৃহীত বস্তুগুলিকে বাদ দিয়ে প্লাজমা পর্দা ও নিউক্লিয়াস-সহ কোষের ভিতরকার সমস্ত বস্তু একসঙ্গে 'প্রোটোপ্লাজম' নামে পরিচিত।
15. নিউক্লিয়াস ব্যতীত প্রোটোপ্লাজমের অবশিষ্ট অংশের নাম 'সাইটোপ্লাজম'। এটি বর্ণহীন, অর্ধস্বচ্ছ, দানাদার ও সান্দ্র ; অনেকটা জেলির মত পদার্থ।
16. কোষ অঙ্গাণুসমূহ ও কোষস্থ অজীবীয় বস্তুসমূহ ব্যতীত সাইটোপ্লাজমের স্বচ্ছ তরল অংশের নাম 'হায়ালোপ্লাজম' বা 'কিনোপ্লাজম'।
17. সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত অণু-কণার বিভিন্নতার জন্য সাইটোপ্লাজম দানাদার, তন্তুময়, জালিকাকার, ফেনিল প্রভৃতি নানা রূপের হয়।
18. সাইটোপ্লাজমের উল্লেখযোগ্য ভৌত ধর্মগুলি হচ্ছে—এটি কোলয়েড-জাতীয় পদার্থ, দশা পরিবর্তনে সক্ষম, সান্দ্র, স্থিতিস্থাপক, সংকোচনশীল, নানা প্রকার চলনক্ষম, আলোক প্রতিসরণে সক্ষম এবং নিজস্ব pH নিয়ন্ত্রণক্ষম।
19. সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক গঠন সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই দুরূহ, তবে এর মধ্যে সাধারণত 75% জল ও 25% অন্যান্য বস্তু থাকে। শেষোক্ত 25% বস্তুর মধ্যে 90% হচ্ছে জৈব পদার্থ (প্রোটীন, শ্বেতসার ও শর্করা, স্নেহদ্রব্য, নিউক্লিক অ্যাসিড, ভিটামিন, হরমোন ইত্যাদি) এবং 10% অজৈব পদার্থ।
20. সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত একক পর্দা বেষ্টিত কোষরসে পূর্ণ থলির মত অংশগুলির নাম কোষ-গহ্বর বা ভ্যাকুওল।
21. কোষ-গহ্বরে নানা প্রকার রাসায়নিক লবণ, শর্করা, অ্যাসিড ও বিভিন্ন রঞ্জকের মিশ্রণে গঠিত যে জলীয় পদার্থ থাকে তার নাম 'কোষরস'।
22. কোষ-গহ্বরের পরিধিতে অবস্থিত যে একক পর্দা কোষরসকে সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক করে রাখে তার নাম টনোপ্লাস্ট।
23. কোষ-গহ্বর কোষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তুর, এমনকি রেচন পদার্থেরও, সঞ্চয়ী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া কোষের জলসাম্য নিয়ন্ত্রণ, রসস্ফীতি বজায় রাখা প্রভৃতি কাজও করে।
24. সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত যে অঙ্গাণুটি কোষের যাবতীয় কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম নিউক্লিয়াস।
25. নিউক্লিয়াস যেসব অংশ নিয়ে গঠিত সেগুলি হচ্ছে—নিউক্লীয় পর্দা, নিউক্লীয় রস, ক্রোমাটিন ও নিউক্লিওলাস।
26. নিউক্লীয় পর্দা নিউক্লিয়াসের ভিতরের বস্তুগুলিকে আশপাশের সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক করে রাখে। পেরিনিউক্লীয় স্পেস দ্বারা পৃথগীকৃত দুটি একক পর্দার সমন্বয়ে নিউক্লীয় পর্দা গঠিত ; এই পর্দা সছিদ্র।
27. নিউক্লিয়াসটি যে স্বচ্ছ, দানাদার, অর্ধ-তরল ও ঈষৎ অম্লীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে তার নাম নিউক্লীয় রস বা কেরিওলিম্ফ।
28. নিউক্লিয়াসের ইন্টারফেজ দশায় নিউক্লীয় রসের মধ্যে ক্ষারীয় রঙ গ্রহণকারী যে সূক্ষ্ম সুতার মত অংশগুলিকে দেখা যায় তাদের নাম ক্রোমাটিন।
29. ক্রোমাটিন দু রকমের—হেটেরোক্রোমাটিন ও ইউক্রোমাটিন।

হেটেরোক্রোমাটিন ইন্টারফেজ দশায় ও প্রোফেজ দশার প্রথম দিকে গাঢ়

ভাবে রঞ্জিত হয় এবং এই অংশে জীনগুলি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। ইউক্রোমাটিন ইণ্টারফেজ দশায় ও প্রোফেজ দশার প্রথম দিকে হালকা রঙ গ্রহণ করে এবং এই অংশে জীনগুলি সক্রিয় অবস্থায় থাকে।

30. নিউক্লিয়াসের ভিতর এক বা একাধিক বড়, গোলাকার ও ঘন বস্তু থাকে যেগুলি অম্লীয় রঙে রঞ্জিত হয়। ঐ বস্তুগুলির নাম নিউক্লিওলাস। চারটি অংশ নিয়ে নিউক্লিওলাস গঠিত, যথা—দানাদার অংশ, সূত্রাকার অংশ, অনিয়তাকার অংশ ও ক্রোমাটিন অঞ্চল।

নিউক্লিওলাসের মুখ্য কাজ রাইবোসোম গঠন। কোষ বিভাজনেও নিউক্লিওলাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

31. কোষের যাবতীয় বিপাকীয় কার্য নিউক্লিয়াসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া, ক্রোমোসোমে অবস্থিত জীনের মাধ্যমে পিতামাতা থেকে সন্তান-সন্ততির মধ্যে বংশধারা হস্তান্তরের কাজে নিউক্লিয়াস প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

32. সাইটোপ্লাজমে এবং এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের বহির্গাত্রে অবস্থিত রাইবোনিউক্লিওপ্রোটীন দ্বারা গঠিত যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা প্রোটীন সংশ্লেষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তাদের নাম রাইবোসোম।

প্রোক্যারিওটিক কোষে রাইবোসোম সাইটোপ্লাজমে থাকে ; ইউক্যারিওটিক কোষে সাইটোপ্লাজম থেকে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের পর্দাগাত্রে, আবার সেখান থেকে সাইটোপ্লাজমে এদের ক্রমিক স্থান পরিবর্তন ঘটে।

প্রত্যেক রাইবোসোমে একটি বড় ও একটি ছোট সাব-ইউনিট থাকে।

প্রোটীন সংশ্লেষে নিয়োজিত রাইবোসোমের এক-একটি দল পলিরাইবোসোম বা পলিসোম নামে পরিচিত।

33. ছত্রাক ব্যতীত অন্যান্য উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত রঙ্গকযুক্ত বা রঙ্গকবিহীন, স্ববিভাজনশীল এবং বিভিন্ন খাদ্যবস্তু সংশ্লেষ অথবা সঞ্চয়ে সক্ষম অঙ্গাণুকে প্লাসটিড বলে।

34. প্লাসটিড তিন রকমের—(i) সবুজ বর্ণের ক্লোরোপ্লাস্ট, (ii) অ-সবুজ কিন্তু রঙিন ক্রোমোপ্লাস্ট ও (iii) বর্ণহীন লিউকোপ্লাস্ট।

লিউকোপ্লাসটিড আবার তিন রকমের—অ্যামাইলোপ্লাস্ট, অ্যালিউরোনপ্লাস্ট এবং এলাইয়োপ্লাস্ট।

ক্লোরোপ্লাস্ট সালোকসংশ্লেষ ঘটায়, ক্রোমোপ্লাস্ট পরাগযোগ এবং ফল ও বীজের বিস্তারে সাহায্য করে, লিউকোপ্লাস্ট খাদ্যবস্তু সঞ্চয়ে সাহায্য করে।

35. কোষীয় ক্ষরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একক-পর্দা বেষ্টিত কোষ অঙ্গাণুর নাম গলগি বডি।

গলগি বডি তিন রকম উপাদান দ্বারা গঠিত, যথা—সিস্টারনী, ভ্যাকুওল ও ভেসিক্‌ল।

গলগি বডির কাজগুলির মধ্যে প্রাথমিক লাইসোসোম ও অ্যাক্রোসোম সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য।

36. ইউক্যারিওটিক কোষের সাইটোপ্লাজমে একক-পর্দা ঘেরা অসংখ্য সূক্ষ্ম গহ্বর জালের আকারে চারদিকে বিস্তৃত থাকে—ঐ গহ্বর তন্ত্রের নাম এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম। এর তিনটি বিভিন্ন রূপ আছে, যথা—সিস্টারনী বা ল্যামেলী, ভেসিক্‌ল ও টিউবিউল।

সিস্টারনীগুলির পর্দার বহির্গাত্রে রাইবোসোম উপস্থিত থাকে ; ফলে তাদের

বহির্গাত্র অমসৃণ—তাই তারা অমসৃণ গাত্রবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম নামে পরিচিত। ভেসিক্‌ল ও টিউবিউলের বহির্গাত্রে রাইবোসোম থাকে না—তাই তারা মসৃণ গাত্রবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম নামে পরিচিত।

সাইটোপ্লাজমকে যান্ত্রিক ঠেস দান, বিপাকীয় কার্য সম্পাদন, কোষের সংশ্লেষিত বস্তুসমূহ সঞ্চয় করে রাখা, সংশ্লেষিত বস্তুর চলাচলের পথ হিসেবে কার্য করা, কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু গঠন বা অঙ্গাণুর পর্দা গঠন ইত্যাদি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের কাজগুলির মধ্যে অন্যতম।

37. ইউক্যারিওটিক কোষে দ্বিপর্দাবেষ্টিত যে অঙ্গাণুগুলি খাদ্যের ভিতরকার স্থৈতিক শক্তিকে ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরিত করে, তাদের নাম মাইটোকনড্রিয়া।

প্রত্যেক মাইটোকনড্রিয়নে দুটি করে প্রকোষ্ঠ থাকে—অন্তঃপর্দা দিয়ে ঘেরা এবং ম্যাট্রিক্সে পূর্ণ একটি অন্তঃপ্রকোষ্ঠ এবং দুই পর্দার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি বহিঃপ্রকোষ্ঠ। অন্তঃপর্দা থেকে কতকগুলি ভাঁজের সৃষ্টি হয়, যেগুলির নাম ক্রিস্টি। ক্রিস্টিসহ অন্তঃপর্দার অন্তর্গাত্রে F_1 কণা বা অক্সিজোম নামে অসংখ্য ছোট-ছোট কণা দেখা যায়। এরূপ প্রতিটি কণা ভূমি, বৃন্ত ও মস্তক নামে তিনটি করে অংশে বিভক্ত। প্রতিটি F_1 কণা একপ্রকার ATP-ase উৎসেচক।

মাইটোকনড্রিয়া কোষের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র।

38. একক পর্দাবেষ্টিত এবং নানা প্রকার উৎসেচকে পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলির মত কোষ অঙ্গাণুর নাম লাইসোসোম। লাইসোসোমের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আর্দ্র-বিশ্লেষক উৎসেচক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। লাইসোসোমের আবরণীটি ছিন্ন হলে এরা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তখন কোষের যাবতীয় অঙ্গাণুকে এরা পরিপাক করে ফেলতে পারে।

বহুরূপতা লাইসোসোমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আবার, এই বহুরূপতা এদের কার্য-দশার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। লাইসোসোমের বিভিন্ন রূপ হচ্ছে—প্রাথমিক লাইসোসোম, হেটেরোফ্যাগোসোম, রেসিডিউঅ্যাল বডি ও অটোফ্যাগিক গহ্বর।

কোষে প্রবিষ্ট খাদ্য, রোগজীবাণু ইত্যাদিকে পরিপাক করা, অটোফ্যাগী, অটোলাইসিস প্রভৃতি লাইসোসোমের অন্যতম কাজ।

39. ইউক্যারিওটিক কোষের সাইটোপ্লাজমে টিউবিউলিন নামে প্রোটীনে গঠিত অতি সূক্ষ্ম ও ফাঁপা নলের মত যে অংশগুলি পাওয়া যায় তাদের নাম মাইক্রোটিউবিউল।

মাইক্রোটিউবিউল দু'রকমের—স্থায়ী ও অস্থায়ী।

কোষের অন্তর্কাঠামো গঠন, স্পিণ্ডল বা বেমযন্ত্র গঠন এবং সেণ্ট্রিওল, সিলিয়া, ফ্ল্যাজেলা ইত্যাদির সঞ্চালন মাইক্রোটিউবিউলের কাজ।

40. প্রাণিকোষে এবং কোন-কোন উদ্ভিদকোষে নিউক্লিয়াসের নিকট অবস্থিত যে অঙ্গাণুগুলি কোষ বিভাজনের সময় স্পিণ্ডল গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের নাম সেণ্ট্রিওল।

সেণ্ট্রিওল-সংলগ্ন দানাবিহীন ক্ষুদ্র সাইটোপ্লাজমীয় অংশের নাম সেণ্ট্রোস্ফিয়ার। সেণ্ট্রোস্ফিয়ার-সহ সেণ্ট্রিওলকে বলা হয় সেণ্ট্রোসোম।

প্রতিটি সেণ্ট্রিওলের আকার দু' মুখ খোলা নলের মত। ঐ নলের পরিধি

9-টি ত্রয়ী-মাইক্রোটিউবিউল দিয়ে গঠিত। প্রতিটি ত্রয়ী-মাইক্রোটিউবিউলের সঙ্গে দুটি করে পেরিসেণ্ট্রিওলার স্যাটেলাইট যুক্ত থাকে—একটি উপরের দিক বরাবর এবং একটি নিচের দিক বরাবর।

সেণ্ট্রিওল থেকে স্পিণ্ডল বা বেমযন্ত্র, সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলার বেসাল বডি এবং শুক্রাণুর অ্যাক্সিয়াল ফিলামেণ্ট গঠিত হয়।

41. কোষের বিপাকের ফলে উৎপন্ন কোষস্থ বিভিন্ন জড় বস্তুকে বলা হয় আর্গ্যাস্টিক পদার্থ। এরা তিন শ্রেণীর—সঞ্চিত খাদ্যবস্তু, ক্ষরিত বস্তু ও বর্জ্য বস্তু।

সঞ্চিত খাদ্যবস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে—(i) শ্বেতসার দানা বা স্টার্চ গ্রেন—এরা একপ্রকার অদ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট। উদ্ভিদকোষে এদের পাওয়া যায়। প্রত্যেক স্টার্চ গ্রেনে হাইলাম নামে একটি উজ্জ্বল বিন্দু থাকে এবং তাকে ঘিরে স্তরে স্তরে স্টার্চ বা শ্বেতসার জমা হয়। হাইলামের অবস্থান অনুযায়ী স্টার্চ গ্রেন উৎকেন্দ্রীয় বা সমকেন্দ্রীয় হয়। এছাড়া পৃথকভাবে অথবা সংযুক্তভাবে থাকার ভিত্তিতে স্টার্চ গ্রেনগুলি সরল, যৌগিক বা অর্ধ-যৌগিক হতে পারে। (ii) গ্লাইকোজেন—এরাও একপ্রকার অদ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট। ছত্রাক ও প্রাণীদের কোষে এদের পাওয়া যায়। (iii) স্নেহদ্রব্য—উদ্ভিদ ও প্রাণী—উভয়প্রকার কোষেই পাওয়া যায়। যেসব স্নেহদ্রব্য সাধারণ উষ্ণতায় তরল থাকে তারা তৈল, অন্যগুলি ফ্যাট বা মেদ।

জাইমোজেন দানাও কোষের একপ্রকার সঞ্চিত বস্তু, তবে খাদ্যবস্তু নয়—নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকা উৎসেচক।

● ব্যাপন ●

42. কোন পদার্থের অণুগুলি যখন নিজস্ব গতিশক্তির গুণে তাদের ঘনতর অংশ থেকে লঘুতর অংশে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে **ব্যাপন** (diffusion) বলে।

43. ব্যাপনকারী অণুগুলি তাদের গতিশক্তির জন্য এক বিশেষ ধরনের চাপ সৃষ্টি করে এবং বেশী ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানে ব্যাপিত হয়। এই চাপকে **ব্যাপন চাপ** (Diffusion pressure) বলে।

44. ব্যাপন চাপ পদার্থের অণুর ঘনত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক। যেখানে পদার্থের অণুর ঘনত্ব বেশী সেখানে ব্যাপন চাপও বেশী, আর যেখানে ঘনত্ব কম সেখানে ব্যাপন চাপও কম।

45. উচ্চ ও নিম্ন ব্যাপন চাপের পার্থক্যই পদার্থের ব্যাপন ঘটায়।

46. পদার্থের কম ঘনত্বযুক্ত অংশে ব্যাপন চাপের পার্থক্যকে ব্যাপন চাপের ঘাটতি (Diffusion pressure deficit বা D. P. D.) বলে।

47. জীবের শ্বাসকার্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের আদান-প্রদান গ্যাসীয় ব্যাপনের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

48. জীবদেহে জল দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের সর্বত্র জল-সমতা বজায় রাখে। এটা তরলের ব্যাপনের একটি দৃষ্টান্ত।

49. জীবদেহে খাদ্যবস্তু, লবণ প্রভৃতি ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের সর্বত্র পরিবেশিত হয়। এটা কঠিন পদার্থের ব্যাপনের একটি দৃষ্টান্ত।

50. ব্যাপনের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি হল—
(i) পদার্থের ঘনত্ব, (ii) ব্যাপনের মাধ্যম, (iii) তাপমাত্রা ও চাপ এবং (iv) ব্যাপন চাপের পার্থক্য।

• অভিস্রবণ •

51. দুটি ভিন্ন ঘনত্বের তরলের দ্রবণ একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে পৃথক থাকলে, কম ঘনত্বের দ্রবণের দ্রাবক অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে বেশী ঘনত্বের দ্রবণে প্রবেশ করে। এই প্রক্রিয়াকে **অভিস্রবণ** (Osmosis) বলে।

52. অভিস্রবণও একপ্রকার ব্যাপন ক্রিয়া। তবে অভিস্রবণে দুটি তরলের দ্রবণের দ্রাবকের মধ্যে ব্যাপন ক্রিয়া হয়, দ্রাবের মধ্যে ব্যাপন ক্রিয়া হয় না।

53. কোন কোষ রসস্ফীত অবস্থায় কোষ পর্দার উপর যে চাপ প্রয়োগ করে, তাকে **রসস্ফীতি চাপ** (Turgor Pressure বা T. P.) বলে।

54. পূর্ণ রসস্ফীতি অবস্থায় কোষ পর্দা কোষরসের উপর রসস্ফীতি চাপের সমান ও বিপরীতমুখী চাপ প্রয়োগ করে। একে **প্রাচীর চাপ** (Wall Pressure বা W. P.) বলে।

55. পূর্ণ রসস্ফীত অবস্থায় প্রাচীর চাপের ফলেই কোষস্থ দ্রাবকের ব্যাপন চাপ বৃদ্ধি পায় এবং বাইরের দ্রাবকের ব্যাপন চাপের সমান হয়। যদিও এই অবস্থায় কোষস্থ দ্রবণের ঘনত্ব কখনোই বাইরের দ্রবণের সমান হয় না। তথাপি কোষস্থ দ্রাবকের ব্যাপন চাপ ও বাইরের দ্রাবকের ব্যাপন চাপ সমান হওয়ার দরুন অভিস্রবণ বন্ধ হয়ে যায়।

56. অভিস্রবণ চাপ বলতে কোন দ্রবণের অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক পরিমাণ দ্রাবক গ্রহণের ক্ষমতাকে বোঝায়।

57. একই বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ও তাপে কোন একটি দ্রবণ যখন একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে তার দ্রাবক থেকে পৃথক থাকে, তখন দ্রবণের দ্রাবকের ব্যাপন চাপ ও কেবলমাত্র দ্রাবকের ব্যাপন চাপের পার্থক্যকে বলা হয় ঐ দ্রবণের শোষণ চাপ (Suction Pressure বা S. P.)। কোষস্থ দ্রবণের শোষণ চাপের জন্যই কম ঘনত্বযুক্ত দ্রবণের দ্রাবক অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে অধিক ঘনত্বযুক্ত দ্রবণের মধ্যে প্রবেশ করে।

58. পরিবেশের দ্রবণ কোষের দ্রবণের মত সমঘনত্বযুক্ত হলে, বাইরের পরিবেশের এরকম দ্রবণকে সমসারক দ্রবণ (Isotonic solution) বলে। পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব কোষের দ্রবণের চেয়ে বেশী হলে, তাকে অতিসারক দ্রবণ (Hypertonic solution) বলে। পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব কোষের দ্রবণের চেয়ে কম হলে, তাকে লঘুসারক দ্রবণ (Hypotonic solution) বলে।

59. অতিসারক দ্রবণে কোন কোষ রাখলে, কোষ থেকে জল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বাইরে বেরিয়ে যাবে এবং প্রোটোপ্লাজমের সঙ্কোচন ঘটবে। প্রোটোপ্লাজমের সঙ্কোচনের ফলে সৃষ্ট কোষীয় অবস্থাকে প্লাজমোলিসিস (Plasmolysis) বলে এবং কোষগুলিকে প্লাজমোলাইজড্ কোষ বলে।

60. প্লাজমোলাইজড্ কোষকে লঘুসারক দ্রবণে রাখলে কোষ পুনরায় জল শোষণ করে স্ফীত হবে। একে ডিপ্লাজমোলিসিস (Deplasmolysis) বলে।

61. এক কোষ থেকে তার পার্শ্ববর্তী কোষে দ্রাবকের অভিস্রবণ হলে, তাকে কোষান্তর অভিস্রবণ (Cell to Cell Osmosis) বলে।

• শোষণ •

62. পরিবেশ থেকে যে প্রক্রিয়ায় জল উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত হয়, তাকে জল শোষণ

বলে। মূল দিয়ে জল শোষণ দু'ভাবে হয়ে থাকে। যেমন—(a) নিষ্ক্রিয় শোষণ (Passive absorption) এবং (b) সক্রিয় শোষণ (Active absorption)।

63. নিষ্ক্রিয় জল শোষণ প্রক্রিয়ায় মূল কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে না। কিন্তু সক্রিয় জল শোষণ পরোক্ষভাবে শারীরবৃত্তীয় কাজে উৎপন্ন শক্তির উপর নির্ভরশীল।

64. ক্রমাগত মূলের বিভিন্ন কোষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে চাপে জল জাইলেম বাহিকায় প্রবেশ করে, তাকে মূলজ প্রেস (Root Pressure) বলে।

65. **জল শোষণের শর্ত**: (a) **বাহ্যিক শর্ত**: (i) মাটিতে শোষণযোগ্য জলের পরিমাণ, (ii) মাটির উষ্ণতা, (iii) মাটিতে অক্সিজেনের পরিমাণ, (iv) মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব, (v) মাটির জলীয় দ্রবণের ঘনত্ব। (b) **অভ্যন্তরীণ শর্ত**: (i) মূলরোমের অভিস্রবণ চাপ, (ii) মূলজ প্রেস।

● আয়ন বিশোষণ ●

66. মাটির লবণের জলীয় দ্রবণ কেবলমাত্র আয়ন রূপেই উদ্ভিদকোষে প্রবেশ করে। কোষে আয়নের এই প্রবেশকে বলা হয় আয়ন বিশোষণ (Ion absorption)।

67. আয়ন বিশোষণ দু'ভাবে হতে পারে, যথা—(a) নিষ্ক্রিয় আয়ন বিশোষণ, যা কেবলমাত্র সরল ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। (b) সক্রিয় আয়ন বিশোষণ, যা শ্বসনের হার অর্থাৎ খাদ্যবস্তুর জারণের ফলে উৎপন্ন শক্তির বিনিময়ে ঘটে থাকে।

অনুশীলনী

(A) **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন** (Long Answer type questions)

1. কোষের সংজ্ঞা লেখ। কোষ আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর। [উঃ 2·3 ও 2·2 দেখ]
2. কোষের প্রকারভেদ সম্পর্কে কি জান লেখ। [উঃ 2·9 দেখ]

2(a). চিত্রসহ একটি প্রোক্যারিওটিক উদ্ভিদকোষের বর্ণনা দাও। [উঃ 30 পৃঃ দেখ]

3. ছবিসহ একটি ইউক্যারিওটিক কোষের বিভিন্ন অংশের নাম এবং তাদের প্রত্যেকের কাজের উল্লেখ কর। [উঃ 2·10A থেকে 2·10N দেখ]
4. একটি আদর্শ ইউক্যারিওটিক উদ্ভিদ অথবা প্রাণিকোষের সংক্ষেপে সচিত্র বর্ণনা দাও। [উঃ 2·10A থেকে 2·10N দেখ]
5. প্লাজমা পর্দা কি? চিত্রসহ প্লাজমা পর্দার/কোষ পর্দার গঠন ও কার্য বর্ণনা কর। [উঃ 2·10A দেখ]
6. কোষপ্রাচীর কাকে বলে? চিত্রসহ কোষপ্রাচীরের গঠন ও কার্য বর্ণনা কর। [উঃ 2·10B দেখ]
7. চিত্রসহ কোষপ্রাচীরের বিভিন্ন প্রকার স্থূলীভবন সম্পর্কে আলোচনা কর। [উঃ 2·10B(b) দেখ]
8. সাইটোপ্লাজম কি? সাইটোপ্লাজমের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলীর বিবরণ দাও। [উঃ 2·10C দেখ]
9. কোষ-গহ্বর বলতে কি বোঝ? এর সম্পর্কে যা জান লেখ। [উঃ 2·10D দেখ]

10. নিউক্লিয়াসের সংজ্ঞা লেখ। চিত্রসহ এর আলট্রা গঠন ও কার্য বর্ণনা কর। [উঃ 2·10E দেখ]
11. নিউক্লিওলাস কাকে বলে? চিত্রসহ নিউক্লিওলাসের গঠন ও কার্য বর্ণনা কর। [উঃ 2·10E দেখ]
12. রাইবোসোম কাকে বলে? এর অবস্থান, আলট্রা গঠন ও কার্য উল্লেখ কর। [উঃ 2·10F দেখ]
13. প্লাসটিড কি? এটি কয় প্রকার? বিভিন্ন প্রকার প্লাসটিডের বিবরণ ও কার্য উল্লেখ কর। [উঃ 2·10G দেখ]
14. ক্লোরোপ্লাস্টের সচিত্র আলট্রা গঠন বর্ণনা কর। এই অঙ্গাণুটি কি কাজ করে? [উঃ 2·10G(1) দেখ]
15. গলগি বডি কাকে বলে? চিত্রসহ এর আলট্রা গঠন ও কার্যের বিবরণ দাও। [উঃ 2·10H দেখ]
16. এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম কি? চিত্রসহ এর আলট্রা গঠন ও কার্য উল্লেখ কর। [উঃ 2·10I দেখ]
17. মাইটোকনড্রিয়া কি? চিত্রসহ মাইটোকনড্রিয়ার আলট্রা গঠন ও কার্য উল্লেখ কর। [উঃ 2·10J দেখ]
18. লাইসোসোম কি? এই অঙ্গাণুটি সম্পর্কে যা জান লেখ। [উঃ 2·10K দেখ]
19. মাইক্রোটিউবিউল কি? এর অবস্থান, প্রকৃতি, গঠন ও কার্যের বিবরণ দাও। [উঃ 2·10L দেখ]
20. সেন্ট্রিওল কি? সেন্ট্রিওলের অবস্থান, আলট্রা গঠন ও কার্যের বিবরণ দাও। [উঃ 2·10M দেখ]
21. কোষস্থ বস্তু বা আর্গাস্টিক পদার্থ বলতে কি বোঝ? বিভিন্ন আর্গাস্টিক পদার্থের বিবরণ দাও। [উঃ 2·10N দেখ]
22. প্রোক্যারিওটিক কোষ ও ইউক্যারিওটিক কোষের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 2·11 দেখ]
23. ব্যাপন ও অভিস্রবণের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 88 পৃঃ দেখ]
24. ব্যাপন কোন্ কোন্ শর্তের উপর নির্ভরশীল? [উঃ 2·13D দেখ]
25. একটি পরীক্ষার সাহায্যে ব্যাপন প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দাও। [উঃ 2·13A অথবা 2·13B দেখ]
26. অভিস্রবণ কোন্ কোন্ শর্তের উপর নির্ভরশীল? [উঃ 2·15A দেখ]
27. একটি পরীক্ষার সাহায্যে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দাও। [উঃ 2·15C দেখ]
28. কিভাবে প্রমাণ করা যায় যে, উদ্ভিদদেহে কোষান্তর অভিস্রবণ প্রক্রিয়া ঘটে? [উঃ 2·15D দেখ]
29. উদ্ভিদ কি কি ভাবে জল শোষণ করে? নিষ্ক্রিয় জল শোষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উঃ 2·17 দেখ]
30. উদ্ভিদে সক্রিয় জল শোষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উঃ 2·17(2) দেখ]
31. জীবদেহে অভিস্রবণের গুরুত্ব উল্লেখ কর। [উঃ 2·15B দেখ]

32. উদ্ভিদের জল শোষণ কোন্ কোন্ শর্তের উপর নির্ভরশীল? [উঃ 2·18 দেখ]

33. আয়ন বিশোষণ বলতে কি বোঝ? নিষ্ক্রিয় আয়ন বিশোষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উঃ 2·19 দেখ]

34. সক্রিয় আয়ন বিশোষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উঃ 2·19(ii) দেখ]

(B) **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন** (Short Answer type questions)

1. কোষ মতবাদের প্রবক্তা কারা? এই মতবাদ কি? [উঃ 22 পৃঃ দেখ]
2. প্লিওমরফিজম বলতে কি বোঝায়? [উঃ 28 পৃঃ দেখ]
3. উদাহরণসহ কোষ অঙ্গাণু ও কোষস্থ অজীবীয় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [উঃ 2·4 দেখ]
4. প্রোক্যারিওটিক কোষ বলতে কি বোঝ? উদাহরণ দাও। [উঃ 2·9 দেখ]
5. প্লাজমা পর্দার কার্য উল্লেখ কর। [উঃ 2·10A(b) দেখ]
6. ফ্যাগোসাইটোসিস ও পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। [উঃ 2·10A(b) দেখ]
7. কোন্ কোষে কোষপ্রাচীর থাকে? মধ্যচ্ছদা ও প্রাথমিক কোষপ্রাচীরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ 2·10B দেখ]
8. কোষ পর্দা ও কোষপ্রাচীরের পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 2·10B-এর শেষাংশ দেখ]
9. কোষপ্রাচীরের কূপাঙ্কিত স্থূলীভবন বলতে কি বোঝ? সরল কূপের সচিত্র গঠন বর্ণনা কর। [উঃ 2·10B(b) দেখ]
10. কূপ কয় প্রকারের হয়? চিত্রসহ সপাড় কূপের বর্ণনা দাও। [উঃ 2·10B(b) দেখ]
11. সাইটোপ্লাজমের কার্য উল্লেখ কর। [উঃ 2·10C(d) দেখ]
12. কোষ-গহ্বরের কার্য উল্লেখ কর। [উঃ 2·10D দেখ]
13. নিউক্লীয় পর্দার গঠন বর্ণনা কর। [উঃ 2·10E দেখ]
14. ক্রোমাটিন কি? হেটেরোক্রোমাটিন ও ইউক্রোমাটিনের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 2·10E দেখ]

14(a). কন্স্টিটিউটিভ ও ফ্যাকাল্টেটিভ হেটেরোক্রোমাটিন বলতে কি বোঝ? [উঃ 50 পৃঃ দেখ]

15. নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিওলাসের কার্য উল্লেখ কর। [উঃ 2·10E দেখ]
16. নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিওলাসের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [উঃ 2·10E-র শেষাংশ দেখ]
17. কোষের কোন্ অঙ্গাণুকে 'প্রোটীন কারখানা' বলা হয়? কেন ঐ প্রকার বলা হয়? [উঃ 2·10F-এর শেষাংশ দেখ]
18. প্লাসটিড কোন্ কোষে পাওয়া যায়? ক্লোরোপ্লাসটিডের রঙ সবুজ কেন? এই প্লাসটিডে কি কি রঞ্জক পাওয়া যায়? [উঃ 2·10G(1) দেখ]
19. প্লাসটিডের রূপান্তর সম্পর্কে কি জান? [উঃ 59 পৃষ্ঠা দেখ]

20(a). ক্রোমোপ্লাস্ট ও অ্যামাইলোপ্লাস্টের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 60 পৃষ্ঠার সারণী দেখ]

20.(a) ক্রোমোপ্লাস্ট ও অ্যামাইলোপ্লাস্টের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 59 পৃঃ দেখ]

21. লাইসোসোমের কার্য উল্লেখ কর। [উঃ 2·10K দেখ]
22. স্টার্চ গ্রেন কি? এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ 2·10N(I) দেখ]
23. গ্লাইকোজেন ও জাইমোজেন দানা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [উঃ 2·10N(II) ও (VI) দেখ]
24. সমসারক দ্রবণ, অতিসারক দ্রবণ ও লঘুসারক দ্রবণ বলতে কি বোঝ? তিন প্রকার দ্রবণে তিনটি জীবিত কোষকে রাখলে কি ঘটবে? [উঃ 83-84 পৃঃ দেখ]
25. ব্যাপন ও অভিস্রবণের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 88 পৃঃ দেখ]
26. কূপ-গহবর, কূপ ছিদ্র ও কূপ পর্দা বলতে কি বোঝ? [উঃ 39-40 পৃষ্ঠা দেখ]
27. টীকা লেখঃ (i) প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল (46নং পৃষ্ঠা), (ii) কোষরস (46নং পৃষ্ঠা), (iii) সিনসিটিয়াম ও সিনোসাইট (47নং পৃষ্ঠা), (iv) পেরি-নিউক্লীয় স্পেস (48নং পৃষ্ঠা), (v) রাইবোসোম (53নং পৃষ্ঠা), (vi) লিউ-কোপ্লাস্ট (58নং পৃষ্ঠা), (vii) সিস্টারনী (61 ও 63নং পৃষ্ঠা), (viii) ক্রিস্টি (66নং পৃষ্ঠা), (ix) লাইসোসোম (67নং পৃষ্ঠা), (x) অটো-ফ্যাগী (69নং পৃষ্ঠা), (xi) মাইক্রোটিউবিউল (69নং পৃষ্ঠা), (xii) সেন্ট্রিওল (71নং পৃষ্ঠা), (xiii) ব্যাপন (78নং পৃষ্ঠা), (xiv) রসস্ফীতি চাপ (82নং পৃষ্ঠা), (xv) প্রাচীর চাপ (82নং পৃষ্ঠা), (xvi) শোষণ চাপ (83নং পৃষ্ঠা), (xvii) প্লাজমোলিসিস (84নং পৃষ্ঠা), (xviii) ডিপ্লাজমোলিসিস (84নং পৃষ্ঠা), (xix) মূলজ প্রেস (92নং পৃষ্ঠা), (xx) টনোপ্লাস্ট (47নং পৃষ্ঠা)।
28. জীবদেহে ব্যাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর। [উঃ 2·13 A, B ও C-এর শেষাংশ দেখ]
29. ফুলের পাপড়ির বিচিত্র রঙের কারণ কি? [উঃ 47নং পৃষ্ঠা দেখ]

(C) অতি সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্ট উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short or specific Answer type questions)

1. ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম জীবকোষের নাম লেখ। [উঃ 26 পৃঃ দেখ]
2. ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি জীবের নাম কর। [উঃ 27 পৃঃ দেখ]
3. PPLO বলতে কি বোঝায়? [উঃ 28 পৃঃ দেখ]
4. ব্যাকটিরিয়া কি কোষযুক্ত জীব? [উঃ 2·3 দেখ]
5. কোষবিহীন জীব কাদের বলে? [উঃ 2·3 দেখ]
6. দুটি 'কোষ অঙ্গাণুর' ও দুটি 'কোষস্থ অজীবীয় বস্তুর' উদাহরণ দাও। [উঃ 2·4 দেখ]
7. কোন্ প্রকার কোষে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে নিউক্লীয় পর্দা থাকে না? [উঃ 2·9A দেখ]
8. মাইক্রোভিলাই কি? [উঃ 2·10A(a) দেখ]
9. 'একক পর্দা' কাকে বলে? [উঃ ঐ]
10. 'বিভেদমূলক ভেদ্য পর্দা' বা 'প্রভেদক ভেদ্য পর্দা' বলতে কি বোঝ? [উঃ ঐ]
11. প্লাজমা পর্দা কি রকমের পর্দা? [উঃ ঐ]
12. নিউক্লিয়াস ব্যতীত প্রোটোপ্লাজমকে কি বলে? [উঃ 2·10C দেখ]

13. সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসকে একসঙ্গে কি বলা হয়? [উঃ 2·10C দেখ]
14. উদ্ভিদকোষে প্লাজমা পর্দা থাকে কি? [উঃ 2·10B দেখ]
15. প্রাথমিক কোষপ্রাচীর কি দিয়ে তৈরি? [উঃ 2·10B(a)(ii) দেখ]
16. মাইক্রোফাইব্রিল কি? [উঃ ঐ]
17. সেকেন্ডারী কোষপ্রাচীরে কি কি জৈব যৌগ থাকে? [উঃ 2·10B(a)(iii) দেখ]
18. প্লাজমোডেস্‌মাটা কি? [উঃ 38 পৃষ্ঠা দেখ]
19. নিচের বাক্যগুলির সঠিক অংশে '✓' চিহ্ন দাওঃ
   A. প্লাসটিড একপ্রকার কোষ অঙ্গাণু/অজীবীয় বস্তু।
   B. নীলাভ-সবুজ শৈবালের কোষ ইউক্যারিওটিক/প্রোক্যারিওটিক।
   C. উদ্ভিদকোষে প্লাজমা পর্দা থাকে না/থাকে।
   D. প্লাজমা পর্দা একপ্রকার ভেদ্য পর্দা/প্রভেদক ভেদ্য পর্দা।
   E. প্রাথমিক কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ থাকে না/থাকে।
   F. নিউক্লীয় পর্দা দুই স্তরবিশিষ্ট/এক স্তরবিশিষ্ট।
   G. কোষের প্রোটীন সংশ্লেষকারী অঙ্গাণুর নাম লাইসোসোম/রাইবোসোম।
   H. ক্লোরোপ্লাসটিডের ভিতরের কোলয়েড জাতীয় দ্রবণের নাম স্ট্রোমা/থাইলাকয়েড।
   I. অ্যামাইলোপ্লাস্ট/এলাইয়োপ্লাস্ট দ্রবণীয় শর্করাকে অদ্রবণীয় শ্বেতসারে পরিণত করে।
   J. অ্যাক্রোসোম সৃষ্টিতে মাইটোকনড্রিয়া/গলগি বডি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।
   K. মাইটোকনড্রিয়ার বহিঃপর্দায়/অন্তঃপর্দায় F_1 কণা থাকে।
   L. মাইক্রোটিউবিউল গ্লোবিউলিন/টিউবিউলিন নামক প্রোটীন দিয়ে গঠিত।
20. বন্ধনীর ভিতর দেওয়া শব্দ থেকে শূন্যস্থান পূরণ করঃ
   A. ব্যাকটিরিয়ার কোষ —— (ইউক্যারিওটিক/প্রোক্যারিওটিক)।
   B. দুটি নতুন উদ্ভিদকোষের মাঝখানে কোষপ্রাচীরের যে স্তরটি সর্বপ্রথম গঠিত হয় তার নাম —— (মধ্যচ্ছদা/প্রাথমিক কোষপ্রাচীর)।
   C. প্রাণিকোষে কোষপ্রাচীর —— (থাকে/থাকে না)।
   D. প্রাথমিক কোষপ্রাচীরের কেবলমাত্র একদিকে কূপ উৎপন্ন হলে তাকে —— বলে (জোড়-কূপ/অন্ধ-কূপ)।
   E. স্পাইরোগাইরা নামক শৈবালে ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি —— (ফিতার মত/কাপের মত)।
   F. লিউকোপ্লাস্ট —— (সালোকসংশ্লেষ ঘটায়/খাদ্যবস্তু সঞ্চয়ে সাহায্য করে)।
   G. প্রাথমিক লাইসোসোম গঠন করে —— (গলগি বডি/মাইটোকনড্রিয়া)।
   H. —— গাত্রবিশিষ্ট এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামে প্রোটীন সংশ্লেষ ঘটে (মসৃণ/অমসৃণ)।
   I. অধিকাংশ —— সেন্ট্রিওল থাকে না (প্রাণিকোষে/উদ্ভিদকোষে)।
   J. —— স্টার্চ গ্রেনে হাইলাম এক প্রান্তে থাকে (উৎকেন্দ্রীয়/সমকেন্দ্রীয়)।
   K. —— জাতীয় উদ্ভিদে গ্লাইকোজেন পাওয়া যায় (শৈবাল/ছত্রাক)।

ক্রোমোসোমের গঠন ও কোষ বিভাজন

3

[STRUCTURE OF CHROMOSOME AND CELL DIVISION]

Syllabus : (a) Structure of chromosome—Mentioning chromatids, centromere, matrix, gene, chemical nature of DNA & RNA (detailed structure and chemical composition not required.)
(b) Cell division : Examples—Plant and animal cell. (i) Amitosis, (ii) Mitosis and its significance, (iii) Meiosis (outline idea about stages and substages) and its significance.

3.1 ক্রোমোসোমের সংজ্ঞা (Definition of Chromosome)

নিউক্লিয়াসের ভিতর অবস্থিত এবং নিউক্লিওপ্রোটীন দ্বারা গঠিত যে সূতার মত অংশ বংশগত বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রক জীনকে ধারণ করে এবং বংশ পরম্পরায় পরিবাহিত করে তার নাম ক্রোমোসোম।

দুটি গ্রীক শব্দ Chroma (রঙ) ও Soma (দেহ) হতে ক্রোমোসোম (Chromosome) শব্দটির উৎপত্তি। ক্রোমোসোম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী ডবলিউ ওয়ালডেয়ার (W. Waldier) 1888 খ্রীষ্টাব্দে।

● **সেক্স ক্রোমোসোম (Sex Chromosome) :** পুরুষ ও স্ত্রী ভেদ আছে এমন সব জীবের দেহকোষের (Somatic or vegetative cells) ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে দুটি ক্রোমোসোম লিঙ্গ নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। উক্ত ক্রোমোসোম দুটিকে **সেক্স ক্রোমোসোম** বা **অ্যালোসোম** (Allosome) বা **হেটেরোক্রোমোসোম** (Heterochromosome) বা **অ্যাক্সেসরি ক্রোমোসোম** (Accessory chromosome) বলা হয়। এদের X ও Y দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

অধিকাংশ প্রাণীতে পুরুষদের দেহকোষে একটি করে X ও একটি করে Y ক্রোমোসোম থাকে এবং স্ত্রীদের দেহকোষে দুটি করে X ক্রোমোসোম থাকে।

● **অটোসোম (Autosome) :** সেক্স ক্রোমোসোম ব্যতীত নিউক্লিয়াসের অন্যান্য ক্রোমোসোমগুলিকে **অটোসোম** বলে।

3.2 ক্রোমোসোমের সংখ্যা (Chromosome number)

কোন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি জীবে ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে (3·1 নং তালিকা দ্রষ্টব্য)। এই সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি সোমাটিক কোষের* ক্রোমোসোম সংখ্যা।

অধিকাংশ জীবের সোমাটিক কোষের ক্রোমোসোমগুলিকে জোড়ায়-জোড়ায় (In pairs) ভাগ করা যায়। প্রতি জোড়ার ক্রোমোসোম-দুটির মধ্যে আয়তন (Size) ও সেণ্ট্রোমিয়ারের অবস্থানে

* কোন জীবের 'জার্ম কোষ' বা গ্যামেট ব্যতীত দেহের অন্যান্য কোষকে 'সোমাটিক কোষ' বা 'দেহকোষ' বলে।

মিল থাকে। যেসব জীবে ও যেসব কোষে ক্রোমোসোমগুলি এইরকম জোড়ায়-জোড়ায় থাকে সেইসব জীবকে ও কোষকে যথাক্রমে **ডিপ্লয়েড জীব** (Diploid organism) ও **ডিপ্লয়েড কোষ** (Diploid cell) বলে। ডিপ্লয়েড জীবের গ্যামেটে সোমাটিক কোষের প্রতি জোড়া ক্রোমোসোম থেকে একটা করে ক্রোমোসোম উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ক্রোমোসোম সংখ্যা সোমাটিক কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার তুলনায় অর্ধেক হয়ে যায়। ডিপ্লয়েড সংখ্যার এইরকম অর্ধভাগকে **হ্যাপ্লয়েড সংখ্যা** (Haploid number) বলে। হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোম সংখ্যা বোঝানোর জন্য 'n' ও ডিপ্লয়েড ক্রোমোসোম সংখ্যা বোঝানোর জন্য '2n' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

3·1 নং তালিকা

কতিপয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর ডিপ্লয়েড ক্রোমোসোম সংখ্যা

উদ্ভিদ	প্রাণী
ধান = 24	কিউলেক্স মশা = 6
গম = 42, 28	অ্যানোফেলিস মশা = 6
ভুট্টা = 20	বাসগৃহের মাছি = 12
মটর = 14	কুকুর = 78
চা = 30	বিড়াল = 38
পিঁয়াজ = 16	সোনা ব্যাঙ = 26
মূলা = 18	কুনো ব্যাঙ = 22
বাঁধাকপি = 18	মানুষ = 46
পেঁপে = 18	বানর = 42
তরমুজ = 22	শিম্পাঞ্জী = 48

3.3 ক্রোমোসোমের আকৃতি ও প্রকারভেদ
(Shape and types of chromosome)

কোষ বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমোসোমগুলি দুই মেরুর দিকে চলার সময় দণ্ড (rod) এবং ইংরেজী বর্ণমালার 'J', 'V' অথবা 'L' অক্ষরের মত দেখায়। এই আকৃতি তাদের দেহে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল।

সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ক্রোমোসোমকে নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

A. আসেন্ট্রিক (Acentric) ঃ সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন ক্রোমোসোম*।

B. মনোসেন্ট্রিক (Monocentric) ঃ একটি সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম।

C. ডাইসেন্ট্রিক (Dicentric) ঃ দুটি সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম।

D. পলিসেন্ট্রিক (Polycentric) ঃ দুটির বেশী সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম।

* সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত কোন ক্রোমোসোম আকস্মিকভাবে খণ্ডিত হলে এই প্রকার ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার ক্রোমোসোম স্থায়ী হয় না। অচিরেই বিনষ্ট হয়।

সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ভিত্তিতে মনোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ

(i) **মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম** (Metacentric chromosome) ঃ এই প্রকার ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি ক্রোমোসোমের ঠিক মাঝখানে থাকে, ফলে ক্রোমোসোমের বাহু দুটির দৈর্ঘ্য পরস্পরের সমান। অ্যানাফেজ দশায় এই জাতীয় ক্রোমোসোম 'V' আকৃতি ধারণ করে (চিত্র 3.1ক)।

(ii) **সাবমেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম** (Submetacentric chromosome) ঃ এই জাতীয় ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি ক্রোমোসোম দেহের ঠিক মধ্যস্থল থেকে কোন এক প্রান্তের দিকে কিছুটা সরানো থাকে। ফলে ক্রোমোসোমের বাহু দুটি অসমান দৈর্ঘ্যের হয়। অ্যানাফেজ দশায় এই জাতীয় ক্রোমোসোম 'L' আকৃতি ধারণ করে (চিত্র 3.1খ)।

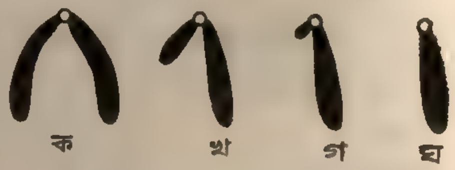

চিত্র 3.1 ঃ বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোসোম। (ক) মেটাসেন্ট্রিক, (খ) সাবমেটাসেন্ট্রিক, (গ) অ্যাক্রোসেন্ট্রিক, (ঘ) টেলোসেন্ট্রিক।

(iii) **অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম** (Acrocentric chromosome) ঃ এই জাতীয় ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি ক্রোমোসোমের কোন এক প্রান্তের কাছে থাকে, ফলে ক্রোমোসোমের একটি বাহু খুব বড় এবং অপরটি খুব ছোট হয়। অ্যানাফেজ দশায় এই জাতীয় ক্রোমোসোম 'J' আকৃতি ধারণ করে (চিত্র 3.1গ)।

*(iv) **টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম** (Telocentric chromosome) ঃ এই জাতীয় ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি ক্রোমোসোমের একটি প্রান্তে অবস্থান করে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে সেন্ট্রোমিয়ারের একধারে কোন ক্রোমাটিন বস্তু থাকে না। অ্যানাফেজ দশায় এই জাতীয় ক্রোমোসোম দণ্ডের আকার ধারণ করে (চিত্র 3.1ঘ)।

সেন্ট্রোমিয়ারের উপস্থিতি ও অবস্থানের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার ক্রোমোসোম ছকের আকারে দেখানো হল ঃ

- ক্রোমোসোম
  - আসেন্ট্রিক
  - মনোসেন্ট্রিক
    - মেটাসেন্ট্রিক
    - সাবমেটাসেন্ট্রিক
    - অ্যাক্রোসেন্ট্রিক
    - টেলোসেন্ট্রিক
  - ডাইসেন্ট্রিক
  - পলিসেন্ট্রিক

* [জীবজগতে এই ধরনের ক্রোমোসোম সচরাচর দেখা যায় না। কেবলমাত্র কয়েকটি প্রোটোজোয়ায় এই ধরনের ক্রোমোসোমের অস্তিত্বের কথা জানা গেছে।]

3.4 ক্রোমোসোমের বহির্গঠন (Structure or Morphology of chromosome)

ক্রোমোসোমের গঠন বর্ণনা করার সময় সাধারণত মেটাফেজ বা অ্যানাফেজ দশায় তাদের গঠনের উল্লেখ করা হয়। কেননা, উক্ত দশাগুলিতেই তাদের বিভিন্ন অংশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। মেটাফেজ দশার ক্রোমোসোমে নিম্নলিখিত অংশগুলি দেখা যায়ঃ (i) ক্রোমাটিড, (ii) ক্রোমোনিমা, (iii) ক্রোমোমিয়ার, (iv) মুখ্য সঙ্কোচ ও সেন্ট্রোমিয়ার, (v) গৌণ সঙ্কোচ, (vi) স্যাটেলাইট বডি এবং (vii) টেলোমিয়ার।

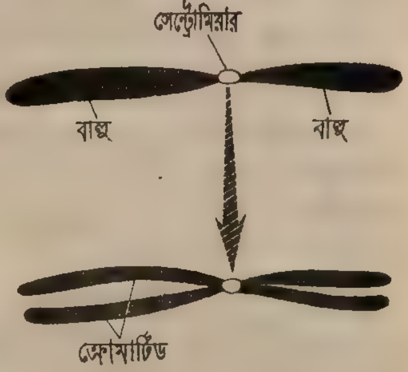

চিত্র 3.2 ঃ মাইটোসিসের মেটাফেজ দশায় একটি মেটাসেণ্ট্রিক ক্রোমোসোম।

(i) ক্রোমাটিড (Chromatid) ঃ প্রোফেজ ও মেটাফেজ দশায় প্রতিটি ক্রোমোসোম লম্বালম্বি ভাবে দুটি অংশে বিভক্ত থাকে—তাদের প্রত্যেকটিকে **ক্রোমাটিড** বলা হয় (চিত্র 3.2)। সেন্ট্রোমিয়ার অংশে ক্রোমাটিড-দুটি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ দশায় যাদের দুহিতা ক্রোমোসোম বলা হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে এক-একটি ক্রোমাটিড। প্রতিটি ক্রোমাটিডের অপর নাম **জেনোনিমা** (Genonema)।

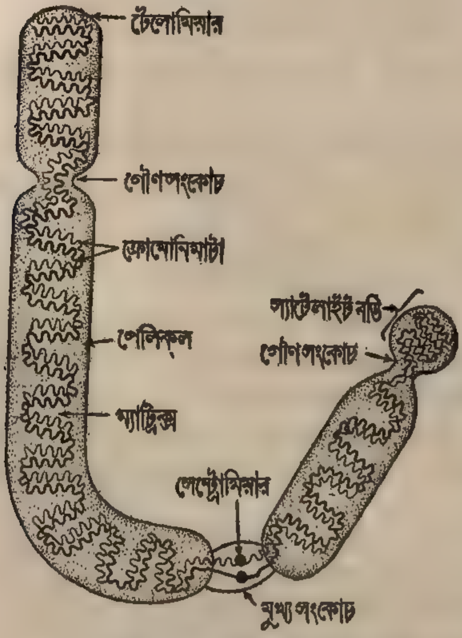

চিত্র 3.3 ঃ অ্যানাফেজ দশার ক্রোমোসোমের (অর্থাৎ মেটাফেজ দশার ক্রোমাটিডের) সূক্ষ্ম গঠন।

● প্রোফেজ ও মেটাফেজ দশায় প্রতিটি ক্রোমোসোম যে দুটি লম্বালম্বি অর্ধাংশে বিভক্ত থাকে, তাদের প্রত্যেকটির নাম ক্রোমাটিড।

(ii) ক্রোমোনিমা (Chromonema) ঃ ক্রোমাটিডদেহ অতি সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা গঠিত। ঐ সূক্ষ্ম তন্তুগুলির নাম **ক্রোমোনিমাটা*** (Chromonemata) [চিত্র 3.3]। সাধারণত ক্রোমোনিমাগুলি সুতার মত সরু,

* একবচনে—ক্রোমোনিমা, বহুবচনে—ক্রোমোনিমাটা।

লম্বা ও প্যাঁচানো। প্রতি ক্রোমাটিডে ক্রোমোনিমাটার সংখ্যা সম্পর্কে অতীতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য মত হল, প্রত্যেক ক্রোমাটিড দুটি করে ক্রোমোনিমাটা দ্বারা গঠিত। ঐ ক্রোমোনিমাগুলি পরস্পরকে নিবিড় ভাবে পেঁচিয়ে থাকে।

ইন্টারফেজ দশায় ক্রোমোসোমদেহ যে সূক্ষ্ম সুতার মত অংশ দ্বারা গঠিত থাকে তা প্রকৃতপক্ষে এই ক্রোমোনিমা সূত্র। প্রোফেজ ও মেটাফেজ দশায় এই ক্রোমোনিমা সূত্রের দেহে একাদিক্রমে প্যাঁচ পড়তে থাকে, ফলে সুতাগুলি ক্রমশ মোটা ও হ্রস্ব হয়ে এক-একটি ক্রোমোসোমের আকার গ্রহণ করে (চিত্র 3.5)।

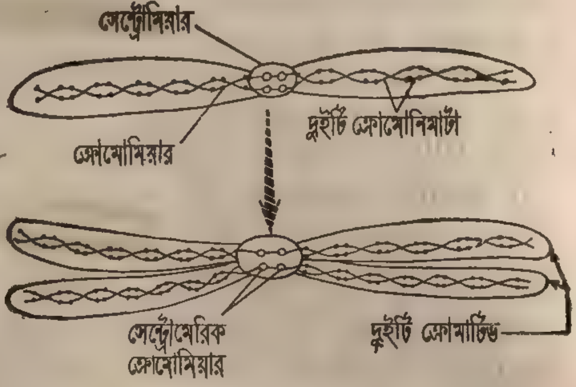

চিত্র 3.4 : ক্রোমোসোমের সূক্ষ্ম গঠন।

● **ক্রোমোসোমদেহ যে সরু, লম্বা ও প্যাঁচানো সুতার মত অংশ দ্বারা গঠিত, তাদের নাম ক্রোমোনিমা।**

(iii) **ক্রোমোমিয়ার** (Chromomere) : মায়োসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ দশায় ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্য বরাবর পুঁতির মত ছোট-ছোট অনেক দানা দেখা যায়। প্রতিটি দানাকে **ক্রোমোমিয়ার** বলে। প্রতি ক্রোমাটিডে এদের সংখ্যা, আয়তন ও অবস্থান নির্দিষ্ট থাকে। দুটি ক্রোমোমিয়ারের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম তন্তুকে **আন্তঃক্রোমোমেরাল ফাইব্রিল** (Inter-Chromomeral fibril) বা আন্তঃক্রোমোমিয়ার তন্তু বলে (চিত্র 3.4)। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, ক্রোমোমিয়ার অংশে নিউক্লিওপ্রোটীন বেশী মাত্রায় থাকে। ক্রোমোমিয়ারগুলি প্রকৃতপক্ষে ক্রোমাটিডদেহে সৃষ্ট অতি সূক্ষ্ম ও আঁটসাঁট (tight) প্যাঁচ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

● **মায়োসিসের প্রোফেজ দশায় ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্য বরাবর নির্দিষ্ট দূরত্বে আঁটসাঁট প্যাঁচ পড়ার ফলে পুঁতির মত ছোট-ছোট যেসব দানা দেখা যায়, তাদের নাম ক্রোমোমিয়ার।**

(iv) **মুখ্য সঙ্কোচ ও সেন্ট্রোমিয়ার** (Primary constriction and Centromere) : ক্রোমোসোমদেহের একটি নির্দিষ্ট অংশে একটি সঙ্কোচ বা খাঁজ দেখা যায়। ক্রোমোসোম যেসব রঙ দ্বারা রঞ্জিত হয়, সেইসব রঙ দ্বারা রঞ্জিত করলে ক্রোমোসোমের ঐ অংশটি রঞ্জিত হয় না। ঐ অংশের নাম **মুখ্য** বা **প্রাথমিক সঙ্কোচ**। মুখ্য সঙ্কোচ অংশে এক বা একাধিক ক্রোমোমিয়ার থাকতে পারে। তারা পরস্পরের সঙ্গে ক্রোমোনিমা তন্তু (আন্তঃক্রোমোমিয়ার তন্তু) দ্বারা যুক্ত

থাকে। মুখ্য সংকোচ অংশের ঐ ক্রোমোমিয়ার সমষ্টি ও তৎসংলগ্ন ক্রোমোমিয়ার তন্তুকে একত্রে **সেন্ট্রোমিয়ার** বলে। ক্রোমাটিডের ক্রোমোনিমা তন্তুগুলিও সেন্ট্রোমিয়ারের ক্রোমোমিয়ারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সেন্ট্রোমিয়ারকে ঘিরে দুটি চাকতির বা কাপের মত অংশ থাকে, তাদের নাম **কাইনেটোকোর (Kinetochore)**। এই কাইনেটোকোর দ্বারা প্রতিটি ক্রোমোসোম কোষ বিভাজনের সময় বেমতন্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়।

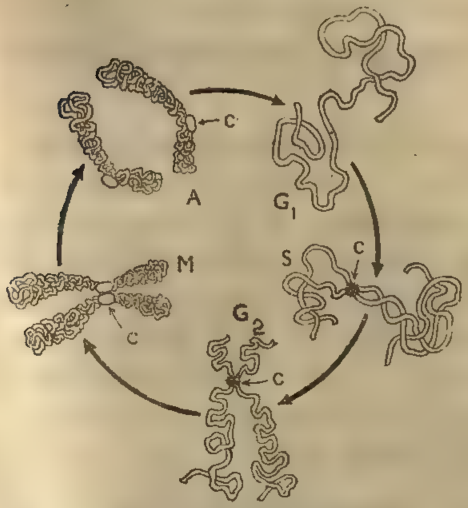

চিত্র 3.5 : ক্রোমোনিমা সূত্রথেকে ক্রোমোসোমের আবির্ভাব।
(G_1, S, G_2 = ইন্টারফেজ ; M = মেটাফেজ ;
A = অ্যানাফেজ।)

কখনও কখনও ক্রোমোসোমে একাধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যার উপর নির্ভর করে ক্রোমোসোমকে **মনোসেন্ট্রিক** (এক সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত), **ডাইসেন্ট্রিক** (দুই সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত) অথবা **পলিসেন্ট্রিক** (বহু সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত) ক্রোমোসোম বলে। সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন ক্রোমোসোমকে **অ্যাসেন্ট্রিক** (Acentric) ক্রোমোসোম বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে সেন্ট্রোমিয়ারগুলি ক্রোমোসোমের সমস্ত দেহে ছড়িয়ে থাকে। ঐরূপ সেন্ট্রোমিয়ারকে **পরিব্যাপ্ত** (Diffused) সেন্ট্রোমিয়ার বলে। অ্যাসকারিস নামে গোল কৃমির জনন অঙ্গের ক্রোমোসোমে পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার থাকে।

মুখ্য সংকোচ অংশে অবস্থিত যে ক্রোমোসোমীয় অংশ কোষ বিভাজনের সময় কাইনেটোকোরের মাধ্যমে বেমতন্তুর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং অ্যানাফেজ দশার শেষে ক্রোমোসোমকে মেরু অঞ্চলের দিকে চলতে সাহায্য করে, তার নাম সেন্ট্রোমিয়ার।

(ব) **গৌণ সঙ্কোচ** (Secondary Constriction) : কোন কোন ক্রোমোসোমে মুখ্য সংকোচ ছাড়া আরও একটি সঙ্কুচিত স্থান বা খাঁজ দেখা যায়। ঐ স্থানটি **গৌণ সংকোচ** নামে পরিচিত। এই অংশের সঙ্গে নিউক্লিওলাস যুক্ত থাকে। তাছাড়া, কোষ বিভাজনের শেষ দশায় এই অংশটি নিউক্লিওলাসের পুনর্গঠনে সাহায্য করে বলে একে **নিউক্লিওলার জোন** বা **নিউক্লিওলাস সংগঠক অঞ্চল** বলা হয়। প্রতি ডিপ্লয়েড কোষে কমপক্ষে দুটি ক্রোমোসোমে গৌণ সংকোচ থাকে। এই ক্রোমোসোমগুলিকে **নিউক্লিওলার ক্রোমোসোম** বলে।

ক্রোমোসোমের যে সঙ্কীর্ণ স্থানে নিউক্লিওলাস যুক্ত থাকে এবং যে স্থানটি নিউক্লিওলাসের গঠনে সাহায্য করে, সেই স্থানটির নাম গৌণ সঙ্কোচ।

(vi) **স্যাটেলাইট বডি** (Satellite body) : কোন কোন ক্ষেত্রে গৌণ সঙ্কোচ ক্রোমোসোমের কোন-এক প্রান্তের খুব কাছে থাকে। ঐরূপ ক্ষেত্রে গৌণ সঙ্কোচের শেষ প্রান্তে ক্রোমোসোমের যে ক্ষুদ্র অংশটি থাকে, তাকে **স্যাটেলাইট বডি** বলা হয়। স্যাটেলাইট বডিযুক্ত ক্রোমোসোমের নাম **স্যাট ক্রোমোসোম** (Sat chromosome)।

প্রান্তীয় গৌণ সঙ্কোচের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ক্রোমোসোমদেহের ক্ষুদ্র বিন্দুর মত অংশের নাম স্যাটেলাইট বডি।

(vii) **টেলোমিয়ার** (Telomere) : বিজ্ঞানী **মুলার** (Muller) ক্রোমোসোমের প্রান্ত-দুটিকে **টেলোমিয়ার** আখ্যা দেন। ক্রোমোসোমের অন্যান্য অংশের সঙ্গে এর গঠনগত কোন প্রভেদ নেই, কিন্তু আচরণে পার্থক্য আছে বলেই তিনি এর বিশেষ নামকরণ করেন। এই বিশেষ আচরণটি হচ্ছে, একটি ক্রোমোসোমের টেলোমিয়ার অংশ অপরটির টেলোমিয়ারের সঙ্গে জোড়া লাগে না। কিন্তু কোন ক্রোমোসোম ভেঙ্গে গেলে তার টেলোমিয়ারবিহীন প্রান্ত তারই মত আর একটি ভাঙ্গা ক্রোমোসোমের টেলোমিয়ারবিহীন প্রান্তের সঙ্গে জোড়া লেগে যায়। আবার, টেলোমিয়ারবিহীন প্রান্তের সঙ্গে টেলোমিয়ারযুক্ত প্রান্তেরও কোন সংযোগ স্থাপিত হয় না। তাছাড়া, টেলোমিয়ার না থাকলে ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

অভগ্ন ক্রোমোসোমের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণযুক্ত প্রান্তের নাম টেলোমিয়ার।

ক্রোমোসোমের গঠন বর্ণনাকালে উপরিউক্ত অংশগুলি ছাড়াও অনেক সময় আরও দুটি অংশের উল্লেখ করা হয় ; যথা—(i) পেলিকল ও (ii) ম্যাট্রিক্স।

(i) **পেলিকল** (Pellicle) : অতীতে কোন কোন বিজ্ঞানী ক্রোমোসোমের বাইরের দিকে একটি আবরণী আছে বলে মনে করতেন। তাঁরা ঐ আবরণীটির নাম দেন 'পেলিকল'। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পেলিকলের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ মেলে নি।

(ii) **ম্যাট্রিক্স** (Matrix) বা **ধাত্র** : উক্ত বিজ্ঞানীরা ক্রোমোসোমের পেলিকল বা আবরণী দিয়ে ঘেরা অংশে জেলির মত সান্দ্র একটি তরল পদার্থের অস্তিত্ব আছে বলে মনে করতেন। তাঁরা ঐ তরল পদার্থটির নাম দেন ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র। তাঁরা মনে করতেন, প্রোফেজ দশায় নিউক্লিওলাস থেকে ম্যাট্রিক্স তৈরি হয় এবং টেলোফেজ দশায় ম্যাট্রিক্স থেকে নিউক্লিওলাস পুনর্গঠিত হয়।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ক্রোমোসোমদেহে ম্যাট্রিক্সের অস্তিত্ব ধরা পড়ে নি।

প্রাথমিক সঙ্কোচ ও গৌণ সঙ্কোচের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Primary constriction and Secondary constriction)

প্রাথমিক সংকোচ বা খাঁজ	গৌণ সঙ্কোচ বা খাঁজ
1. ইউক্যারিওটিক কোষের সমস্ত ক্রোমোসোমে দেখা যায়।	1. ইউক্যারিওটিক কোষের কোন কোন ক্রোমোসোমে দেখা যায়।
2. এই অংশে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। তাই এই অংশের অপর নাম **সেন্ট্রোমেরিক অঞ্চল** (Centromeric region)।	2. এই অংশের সঙ্গে নিউক্লিওলাস যুক্ত থাকে; তাছাড়া এই অংশ নিউক্লিওলাসের গঠনেও সাহায্য করে। তাই এই অংশের অপর নাম **নিউক্লিওলাস সংগঠক অঞ্চল** (Nucleolar organizing region)।
3. কোষ বিভাজনের সময় এই অংশের সঙ্গে বেমতন্তু যুক্ত হয়।	3. এই অংশের সঙ্গে বেমতন্তু যুক্ত হয় না।

3.4A. ক্রোমোসোমের রাসায়নিক উপাদান (Chemical constituents of chromosome)

ক্রোমোসোমের মুখ্য রাসায়নিক উপাদান হল, **নিউক্লিক অ্যাসিড** (Nucleic acid) ও **প্রোটীন**। দু রকম নিউক্লিক অ্যাসিডই, যথা—DNA এবং RNA ক্রোমোসোমে পাওয়া যায়। তবে DNA-র পরিমাণ RNA-র তুলনায় অনেক বেশী। ক্রোমোসোমের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে শতকরা 45 ভাগ হচ্ছে DNA এবং শতকরা 1·2–1·4 ভাগ RNA।

ক্রোমোসোমে প্রোটীনের পরিমাণ শতকরা 55 ভাগ। নিউক্লিক অ্যাসিডের মত ক্রোমোসোমে উপস্থিত প্রোটীনও দু রকমের; যথা—নিম্ন আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন **ক্ষারীয় প্রোটীন** (Basic proteins) এবং উচ্চ আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন **আম্লিক প্রোটীন** (Acidic proteins)।

ক্ষারীয় প্রোটীনের মধ্যে **হিস্টোন*** (Histone) অথবা **প্রোটামিন**** (Protamine)-এর যে কোন একটিকে ক্রোমোসোমে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্রোমোসোমেই হিস্টোন থাকে; কেবলমাত্র শুক্রাণুর ক্রোমোসোমে হিস্টোনের পরিবর্তে প্রোটামিন পাওয়া যায়।

ক্ষারীয় প্রোটীন ছাড়াও কয়েক রকম আম্লিক প্রোটীনও ক্রোমোসোমে থাকে, যথা—**DNA-পলিমারেজ, RNA-পলিমারেজ** ইত্যাদি।

ক্রোমোসোমের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদান হল **ক্যালসিয়াম** (Calcium)। এই খনিজ পদার্থটি ক্রোমোসোমের কাঠামোকে দৃঢ়তা দান করে। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন জীবের খাদ্যবস্তুতে ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটলে তাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোমোসোম ভঙ্গের (Spontaneous chromosome breakage) ঘটনা বৃদ্ধি পায়।

---

* এই প্রকার প্রোটীনে বেশী পরিমাণে আর্জিনিন (Arginine) ও লাইসিন (Lysine) নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে।

** এই প্রকার প্রোটীনে বেশী পরিমাণে 'আর্জিনিন' পাওয়া যায়।

● **ইউক্রোমাটিন ও হেটেরোক্রোমাটিন ঃ** ক্রোমোসোম যে বংশগত বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী DNA বহন করে, এ ধারণা স্পষ্ট হওয়ার পর বর্তমানে এও জানা গেছে যে শুধু DNA দিয়েই ক্রোমোসোম গঠিত নয়, DNA ও প্রোটীন সম্মিলিতভাবে ক্রোমোসোম গঠন করে। এই DNA ও প্রোটীন যৌথভাবে তৈরি করে **ক্রোমাটিন** (Chromatin) বস্তু, যা ক্রোমোসোমের মূল গঠনগত বস্তু। ক্রোমাটিন তৈরি হয় **নিউক্লিওসোম** (Nucleosome) নামক অসংখ্য একক দিয়ে। **উডকক** (Woodcock, 1973), **কর্ণবার্গ** (Kornberg, 1974), **জিউথেস ও বাক** (Zeuthes and Bak, 1978) নিউক্লিওসোম সম্পর্কে আধুনিক ধারণা দেন।

1966 খ্রীষ্টাব্দে ডুপ্র (Dupraw) ক্রোমোসোমের প্যাঁচানো-তন্তু নক্শা (Folded fibre model) দ্বারা ক্রোমোসোমের ভৌত গঠনের বিবরণ দেন। তাঁর মতে DNA অণুগুলি নিউক্লিওপ্রোটীনকে ঘিরে এবং স্প্রিং-এর মত থেকে তন্তুর সৃষ্টি

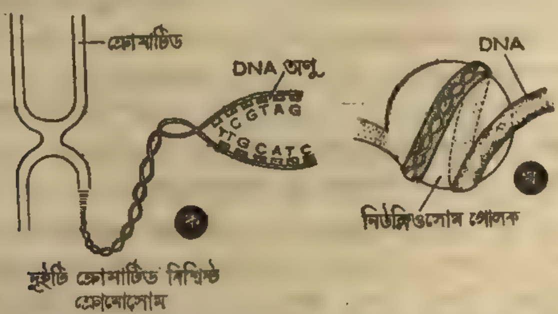

চিত্র 3 6 ঃ (ক) ক্রোমোসোমের প্যাঁচানো-তন্তু নক্শা ;
(খ) নিউক্লিওসোমে হিস্টোন ও DNA অণুর পারস্পরিক সম্পর্ক।

করে। **রজার কর্ণবার্গ** (Roger Kornberg, 1974)-এর মত অনুযায়ী প্রতিটি ক্রোমাটিডে পুঁতির মালার মত হিস্টোনযুক্ত ছোট-ছোট গোলক বর্তমান। DNA অণু সর্পিলাকারে ঐ গোলকগুলিকে আবৃত করে থাকে। DNA অণুসহ ঐ গোলকগুলি **নিউক্লিওসোম** (Nucleosome) নামে অভিহিত (চিত্র 3.6)।

ক্রোমাটিন দু প্রকার—(i) **ইউক্রোমাটিন** (Euchromatin) এবং (ii) **হেটেরোক্রোমাটিন** (Heterochromatin) [50 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

(i) **ইউক্রোমাটিন ঃ** ইন্টারফেজ দশায় ক্রোমোসোমকে রঞ্জিত করলে ক্রোমোসোমের যে অংশগুলি হালকাভাবে রঞ্জিত হয়, সেই অংশগুলিই **ইউক্রোমাটিন।** এই ইউক্রোমাটিন অংশ ইন্টারফেজ দশায় প্রসারিত থাকে এবং বিভাজনকালে কুণ্ডলীকৃত হয়। ক্রোমাটিনের এই অংশটি সক্রিয়। এই অংশে DNA খুব বেশী থাকে এবং এতে প্রজননিক বস্তু (genetic material) বা জীন থাকে।

(ii) **হেটেরোক্রোমাটিন ঃ** ক্রোমোসোমের যে অংশ ইন্টারফেজ ও নিউক্লিয়াসের বিভাজনকালে রঞ্জিত করলে গাঢ় রঙ ধারণ করে, তাকে **হেটেরোক্রোমাটিন** বলে। এই হেটেরোক্রোমাটিন অংশ ইন্টারফেজ ও নিউক্লিয়াসের বিভাজনকালে সবসময়ই কুণ্ডলীকৃত থাকে। ক্রোমাটিনের এই অংশটি নিষ্ক্রিয় এবং প্রজননিক বস্তু

বা জীন এই অংশে না থাকায় এই অংশটি জীনগতভাবে নিষ্ক্রিয় (genetically inert)। তবে ক্রোমাটিনের এই অংশটি বিপাক ক্রিয়া, নিউক্লিক অ্যাসিডের সংশ্লেষ প্রভৃতি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাণীর সেক্স ক্রোমোসোমে হেটেরোক্রোমাটিন খুব বেশী থাকে। **ব্রাউন** (Brown, 1976) হেটেরোক্রোমাটিনকে দু ভাগে ভাগ করেছেন; যেমন—

(a) **কনস্টিটিউটিভ হেটেরোক্রোমাটিন** (Constitutive heterochromatin) ঃ এ ধরনের হেটেরোক্রোমাটিন সর্বদাই কুণ্ডলীকৃত বা ঘনীভূত অবস্থায় থাকে। অনেক ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারের কাছে কনস্টিটিউটিভ হেটেরোক্রোমাটিন দেখা যায়।

(b) **ফ্যাকালটেটিভ হেটেরোক্রোমাটিন** (Facultative heterochromatin) ঃ এ ধরনের হেটেরোক্রোমাটিন বিশেষ কিছু কোষে বা কোষের বিশেষ কোন দশায় কুণ্ডলীকৃত বা ঘনীভূত অবস্থায় থাকে। স্ত্রীলোকের দুটি **X**-ক্রোমোসোমের একটি এ ধরনের হেটেরোক্রোমাটিন অবস্থায় থাকে, কিন্তু অপরটি ইউক্রোমাটিন অবস্থায় সক্রিয় থাকে।

ইউক্রোমাটিন ও হেটেরোক্রোমাটিন সম্পর্কে আধুনিক ধারণা (Modern concept regarding Euchromatin and Heterochromatin) ঃ বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে, ইউক্রোমাটিন ও হেটেরোক্রোমাটিনের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কোন প্রভেদ নেই। উভয় প্রকার ক্রোমাটিনই গঠনগত বিষয়ে অভিন্ন এবং উভয়ের মধ্যে জীন থাকায় জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করে। ইউক্রোমাটিন ইন্টারফেজ দশায় প্রসারিত থাকে এবং নিউক্লিয়াসের বিভাজনকালে কুণ্ডলীকৃত হয়। ফলে বিভাজনকালে গাঢ়ভাবে রঞ্জিত হয়। অপরপক্ষে, হেটেরোক্রোমাটিন ইন্টারফেজ ও নিউক্লিয়াসের বিভাজনকালে সর্বদাই কুণ্ডলীকৃত থাকে। তাই ইন্টারফেজেও গাঢ় ভাবে রঞ্জিত হয়।

3.4B. জীন (Gene)

যে কোন ব্যক্তি বা জীবের যাবতীয় দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রককে (determiners) **জীন বলে। জীনের মাধ্যমেই পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরিবাহিত হয়।**

1866 খ্রীষ্টাব্দে মেণ্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশের পর থেকে গত এক শতাব্দীরও অধিককাল যাবৎ জীন সম্পর্কে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। মেণ্ডেল তাঁর গবেষণা পত্রে মটরশুঁটি উদ্ভিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রক হিসেবে যেসব **ফ্যাকটরের** (Factors) কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেগুলিই পরবর্তী কালে 'জীন' রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। 1909 খ্রীষ্টাব্দে **জোহানসেন** (Johansen) বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত কোন বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী এককে 'জীন' বলে অভিহিত করেন। জীন সম্পর্কে এক শতাব্দীরও বেশী সময় যাবৎ নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যেসব উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

(1) জীন হচ্ছে বংশগত বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রক।

(2) জীনের অবস্থান ক্রোমোসোমদেহে।

(3) একটি ক্রোমোসোমে অসংখ্য জীন থাকে এবং তারা রৈখিক সজ্জাক্রমে অবস্থান করে (linearly arranged)।

(4) ক্রোমোসোমে জীনের সংখ্যা ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল। ছোট ক্রোমোসোমের তুলনায় বড় ক্রোমোসোমে বেশী সংখ্যক জীন থাকে।

(5) ক্রোমোসোমদেহে প্রত্যেক জীনের স্থান নির্দিষ্ট, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট জীন একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের একটি নির্দিষ্ট অংশে অবস্থান করে। ক্রোমোসোমের ঐ অংশটিকে ঐ বিশেষ জীনের **লোকাস** (Locus) বলা হয়।

(6) ক্রোমোসোমের মাধ্যমে পিতামাতার জীন সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরিবাহিত হয়।

(7) মাঝে মাঝে জীনের গঠনগত পরিবর্তনের ফলে তাদের আচরণগত পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হয়। জীনের এই গঠনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাবকে **মিউটেশন** (Mutation) বা **পরিব্যক্তি** বলে। উদাহরণঃ **ড্রসোফিলায়** (Drosophila) লাল রঙের চোখের পরিবর্তে সাদা রঙের চোখের আবির্ভাব।

(8) সাধারণত এক-একটি বৈশিষ্ট্য একাধিক জীনের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফল। যেমন, ড্রসোফিলা নামক পতঙ্গে চোখের রঙ কমপক্ষে 20টি জীনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের দেহবর্ণের (Skin colour) মূলেও আছে বেশ কয়েক জোড়া জীন।

(9) আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে একটি জীন একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে একাধিক বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অ্যালবিনো (Albino) মানুষদের কথা উল্লেখ করা যায়। এদের চুল, দেহ ও চোখে কোন রঙ্গক (pigment) না থাকায় চুল ও দেহ হয় সাদা এবং চোখগুলি হয় রক্তাভ। একটিমাত্র জীনের মিউটেশনের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে একটিমাত্র জীন দেহের বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।

(10) কোন একটি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণকারী সব জীন একসঙ্গে থাকে না। যেমন, ড্রসোফিলায় দেহবর্ণের নিয়ন্ত্রণকারী জীনগুলির সবকয়টি একটিমাত্র ক্রোমোসোমে না থেকে বিভিন্ন ক্রোমোসোমে ছড়ানো থাকে। তাছাড়া, কোন একটি ক্রোমোসোমে একটি 'দেহবর্ণের জীন' একটি 'চক্ষুবর্ণের জীনের' পাশেই থাকতে পারে, আবার অন্য একটি ক্রোমোসোমে তা 'ডানার গঠন' নিয়ন্ত্রণকারী একটি জীনের পাশে থাকতে পারে।

(11) সকল প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক জীবে এবং অধিকাংশ ভাইরাসে জীন **ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড** (Deoxyribonucleic acid বা DNA) নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত।

(12) কোন কোন ভাইরাসের (যথা—টোবাকো মোজাইক ভাইরাস—Tobacco Mosaic Virus বা TMV) জীন **রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড** (Ribonucleic acid বা RNA) নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত।

3.4C. নিউক্লিক অ্যাসিডের রাসায়নিক প্রকৃতি
(Chemical Nature of Nucleic Acids)

জীবদেহে দুরকমের নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায়—ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড, সংক্ষেপে **DNA** এবং রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড, সংক্ষেপে **RNA**। এদের রাসায়নিক প্রকৃতি সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

(i) নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুগুলি আকারে খুব বড়। তাই এদের আণবিক গুরুত্বও (molecular weight) খুব বেশী (25,000—3,00,00,000)। তবে RNA-র আণবিক গুরুত্ব DNA-র চেয়ে কম।

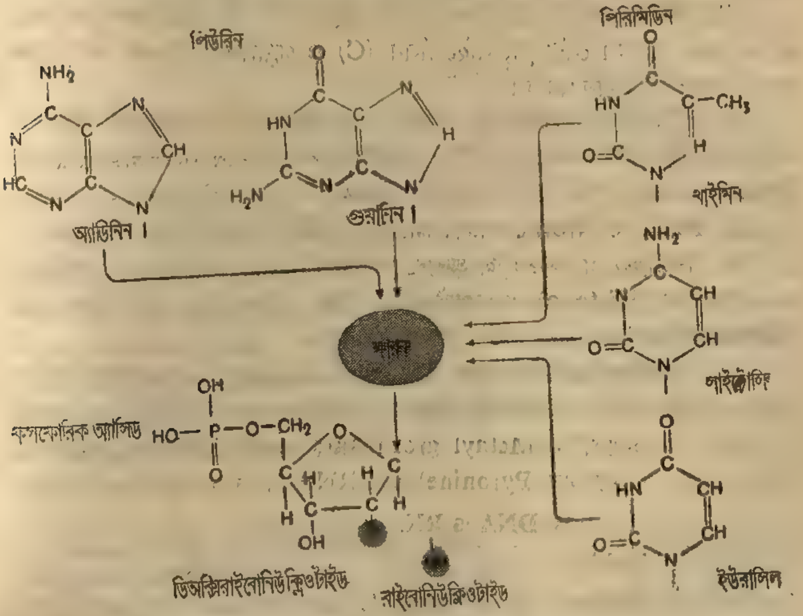

চিত্র 3.7 ঃ DNA ও RNA-র একক নিউক্লিওটাইডের গঠন।

(ii) নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুগুলি রেখার মত (linear) এবং দীর্ঘ এক-একটি পলিমার (Polymer)।

(iii) অন্যান্য পলিমারের মত এরাও অনেক ছোট-ছোট মনোমার (monomer)-এর সংযোগে গঠিত। এই মনোমারগুলির নাম **নিউক্লিওটাইড** (Nucleotide)। এরাই নিউক্লিক অ্যাসিডের একক।

(iv) প্রত্যেক নিউক্লিওটাইডে **পেন্টোজ** বা **পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করার** একটি অণু, **ফসফোরিক অ্যাসিডের** একটি অণু এবং একটি **নাইট্রোজেনযুক্ত বেস বা ক্ষারক** (Nitrogenous base) থাকে।*

* পেন্টোজ শর্করা ও নাইট্রোজেনযুক্ত বেসের সংযোগে গঠিত যৌগকে 'নিউক্লিওসাইড' বলা হয়।

(v) RNA-র পেন্টোজ শর্করাটি **রাইবোজ** (Ribose) এবং DNA-র উক্ত শর্করাটি **ডিঅক্সিরাইবোজ** (Deoxyribose)। ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করার চেয়ে রাইবোজ শর্করায় একটি অক্সিজেন পরমাণু বেশী থাকে (চিত্র 3.7)।

(vi) নিউক্লিক অ্যাসিডে দুই শ্রেণীর বেস বা ক্ষারক পাওয়া যায় ; যথা— **পিউরিন** (Purines) ও **পিরিমিডিন** (Pyrimidines) বেস। পিউরিন বেসগুলি দুই বলয়যুক্ত (double-ringed) এবং পিরিমিডিনগুলি এক বলয়যুক্ত।

(vii) DNA-তে **অ্যাডিনিন** (Adenine) ও **গুয়ানিন** (Guanine) নামে দু রকমের পিউরিন বেস এবং **থাইমিন** (Thymine) ও **সাইটোসিন** (Cytosine) নামে দু রকমের পিরিমিডিন বেস থাকে।

(viii) DNA অণুতে অ্যাডিনিন (A) ও থাইমিন (T)-এর পরিমাণগত অনুপাত সর্বদা সমান থাকে। সেইরূপ, সাইটোসিন (C) ও গুয়ানিন (G)-এর অনুপাতও সর্বদা পরস্পরের সমান থাকে।

(ix) RNA-তে DNA-এর মতই অ্যাডিনিন (A), গুয়ানিন (G) ও সাইটোসিন (C) বেস পাওয়া যায়, কিন্তু থাইমিন পাওয়া যায় না—তার পরিবর্তে **ইউরাসিল** (Uracil) নামে পিরিমিডিন বেস থাকে।

(x) RNA-তে বিভিন্ন বেসের পরিমাণের মধ্যে DNA-র মত মিল দেখা যায় না।

(xi) নিউক্লিক অ্যাসিডগুলি অত্যন্ত অম্লধর্মী হওয়ায় এরা ক্ষারীয় প্রোটীন ; যথা—হিস্টোন (Histone) ও প্রোটামাইন (Protamine)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে **নিউক্লিওপ্রোটীন** (Nucleoprotein) অবস্থায় থাকে।

(xii) **ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ** (Deoxyribonuclease) এনজাইমের প্রভাবে DNA-র বিনাশ ঘটে। **রাইবোনিউক্লিয়েজ** এনজাইমের প্রভাবে RNA-র বিনাশ ঘটে।

(xiii) মিথাইল গ্রীন (Methyl green) রঞ্জক (stain) DNA-কে সবুজ রঙে রঞ্জিত করে। পাইরোনিন (Pyronine) রঞ্জক RNA-কে লাল রঙে রঞ্জিত করে।

● DNA ও RNA-র পার্থক্য ●

DNA	RNA
1. **দ্বিতন্ত্রী** অর্থাৎ দেহ দুটি রজ্জুর মত অংশ দ্বারা গঠিত।	1. **একতন্ত্রী** অর্থাৎ দেহ একটি রজ্জুর মত অংশ দ্বারা গঠিত।
2. **ডিঅক্সিরাইবোজ** শর্করা থাকে।	2. **রাইবোজ** শর্করা থাকে।
3. **থাইমিন** নামে পিরিমিডিন বেস থাকে।	3. থাইমিন থাকে না—তার পরিবর্তে **ইউরাসিল** পাওয়া যায়।
4. অ্যাডিনিন ও থাইমিন এবং সাইটোসিন ও গুয়ানিনের পরিমাণে মিল থাকে [A = T, C = G]।	4. বিভিন্ন বেসের পরিমাণের মধ্যে কোন মিল থাকে না।
5. **ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ** এনজাইমের প্রভাবে বিনাশ ঘটে।	5. **রাইবোনিউক্লিয়েজ** এনজাইমের প্রভাবে বিনাশ ঘটে।
6. মিথাইল গ্রীন রঞ্জকের সংস্পর্শে সবুজ রঙ ধারণ করে।	6. পাইরোনিন রঞ্জকের সংস্পর্শে লাল রঙ ধারণ করে।

***বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্রোমোসোম** (Special type of Chromosome) :

A. **ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম** (Lampbrush Chromosome) : মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীদের কুসুম (yolk)-সমৃদ্ধ ডিম্বাণু বা প্রাইমারী উসাইট কোষে মায়োসিসের ডিপ্লোটিন উপদশায় ক্রোমোসোমগুলি

চিত্র 3.8 : ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম।

দীর্ঘাকৃতি ও পুরাকালের লণ্ঠনের চিমনি-ধোয়া ব্রাশের মত দেখতে হয় বলে, এদের ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম বলে (চিত্র 3.8)। **রুকার্ট** (Ruckeort) 1892 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই বিশেষ ধরনের ক্রোমোসোমগুলির অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন।

গঠন (Structure) : সাধারণত ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম দৈর্ঘ্যে 700-800μ হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে এই দৈর্ঘ্য প্রায় 5,900μ পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম প্রকৃতপক্ষে দুটি করে সমসংস্থ ক্রোমোসোম দ্বারা গঠিত; তারা স্থানে স্থানে X-এর মত কায়াসমা গঠন করে। প্রত্যেক সমসংস্থ ক্রোমোসোমে একটি কেন্দ্রীয় অক্ষ (Central axis) থাকে এবং অক্ষ বরাবর দু পাশে অসংখ্য লুপ (loop) বা পার্শ্বীয় ফাঁস উৎপন্ন হয়। কেন্দ্রীয় অক্ষটি দুটি করে ক্রোমাটিড দ্বারা গঠিত এবং ক্রোমাটিডের ক্রোমোনিমাগুলি পার্শ্বদেশে লুপের আকারে বেরিয়ে আসে। লুপগুলি RNA ও প্রোটীন দ্বারা গঠিত।

B. **পলিটিন ক্রোমোসোম** (Polytene Chromosome) : ডিপটেরা (Diptera) বর্গের অন্তর্গত বহু পতঙ্গের লার্ভার লালাগ্রন্থিতে এবং ট্র্যাকীয়া, ম্যালপিজিয়ান নালিকা প্রভৃতির কোষে পলিটিন ক্রোমোসোম দেখা যায়। 1881 খ্রীষ্টাব্দে **ই. জি. বলবিয়ানি** (E. G. Balbiani) সর্বপ্রথম এই বিশেষ ধরনের ক্রোমোসোম আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে **কোলার** (Kollar) এই বিশেষ ধরনের ক্রোমোসোমের নামকরণ করেন **পলিটিন ক্রোমোসোম**, কারণ এই বিশেষ ক্রোমোসোমে অনেকগুলি করে ক্রোমোনিমা থাকে (চিত্র 3.9)।

গঠন (Structure) : দেহকোষের অন্যান্য ক্রোমোসোমের তুলনায় পলিটিন ক্রোমোসোম দৈর্ঘ্যে অনেক বড়। **ড্রসোফিলা মেলানোগাস্টার** (*Drosophila melanogaster*) নামক একপ্রকার ফলের মাছির পলিটিন ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য প্রায় 2,000μ অথচ তাদের একটি সাধারণ দেহকোষের ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য গড়ে প্রায় 7·5μ। একটি পলিটিন ক্রোমোসোমে পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত অংশগুলি দেখা যায় :

* উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

1. ডার্ক ব্যাণ্ড ও লাইট ব্যাণ্ড বা ইণ্টার ব্যাণ্ড (**Dark band and Light band or Inter band**) **:** বিশেষভাবে রঞ্জিত করলে পলিটিন ক্রোমোসোমে দৈর্ঘ্য বরাবর পর্যায়ক্রমে গাঢ় বা ঘন দাগ এবং হালকা দাগ দেখা যায়। এই ঘন দাগগুলিকে **ডার্ক ব্যান্ড** এবং হালকা দাগগুলিকে **লাইট ব্যান্ড** বা **ইণ্টার ব্যান্ড** বলে।

চিত্র 3.9 : পলিটিন ক্রোমোসোম।

প্রকৃতপক্ষে ডার্ক ব্যান্ড অঞ্চলগুলি ইউক্রোমাটিন অংশ এবং এতে অধিক পরিমাণে **DNA**, সামান্য পরিমাণে **RNA** এবং কিছু ক্ষারীয় প্রোটীন থাকে। অপরপক্ষে, লাইট ব্যান্ড অঞ্চলগুলি হেটেরোক্রোমাটিন অংশ এবং এতে সামান্য পরিমাণে **DNA**, অধিক পরিমাণে **RNA** এবং কিছু পরিমাণে আম্লিক প্রোটীন থাকে। ডার্ক ব্যান্ডে প্রজননিক বস্তু বা জীন থাকে।

2. পাফ্ ও বলবিয়ানি রিং (**Puff and Balbiani ring**) **:** পলিটিন ক্রোমোসোমের মাঝখানের কোন কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্ফীত অংশ দেখা যায়। এই স্ফীত অংশকে **ক্রোমোসোম পাফ্** বলে। এই পাফ্গুলি প্রোটীন ও **RNA** সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ করে। পলিটিন ক্রোমোসোমের পাফ্ অঞ্চলে ক্রোমোনিমাগুলি অসংখ্য পার্শ্বীয় লুপ বা আংটির মত অংশ সৃষ্টি করে। এই আংটির মত লুপগুলিকে **বলবিয়ানি রিং** বলে। এই বলবিয়ানি রিং অঞ্চলটিতে খুব বেশী পরিমাণে **DNA** ও **RNA** থাকে। এই অঞ্চলটির গঠন ও কাজ ক্রোমোসোম পাফ্ অঞ্চলের মত।

জননকোষ* ও দেহকোষের পার্থক্য (**Differences between Germ cell and Somatic cell or Vegetative cell**)

জননকোষ	দেহকোষ
1. যৌন জননে অংশগ্রহণকারী কোষকে জননকোষ বলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জনন অঙ্গের জার্মিনাল কলায় এই কোষ দেখা যায়।	1. উদ্ভিদ ও প্রাণীর জার্মিনাল কলা ব্যতীত দেহের সমস্ত কলা যে কোষ দ্বারা গঠিত, তাদের দেহকোষ বা সোমাটিক কোষ বলে।
2. জননকোষ হ্যাপ্লয়েড (n)।	2. দেহকোষ ডিপ্লয়েড ($2n$)।
3. মায়োসিস প্রক্রিয়ার কোষ বিভাজনের দ্বারা জননকোষ সৃষ্টি হয়।	3. মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় নতুন দেহকোষ সৃষ্টি হয়।

* জননকোষের অপর নাম গ্যামেট (**Gamete**)।

3.5 কোষ বিভাজন (Cell Division)

ঈস্ট, অ্যামিবা প্রভৃতি বিভিন্ন **এককোষী** জীবের (অর্থাৎ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর) ক্ষেত্রে কোষদেহটি পরিণত হলে তার বিভাজন ঘটে একটি জীব থেকে দুটি জীবের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, এইসব জীবে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জনন ঘটে। আবার, **বহুকোষী** যে কোন জীবের জীবন শুরু হয় একটিমাত্র কোষ নিয়ে—ঐ কোষটির নাম **জাইগোট** (Zygote) বা **ভ্রূণাণু** বা **নিষিক্ত ডিম্বাণু** (fertilized egg)। জাইগোটের ক্রমাগত বিভাজনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় একটি বহুকোষী জীবের।

আবার, জীবদেহের কোন অংশে ক্ষতের সৃষ্টি হলে ক্ষতের কাছাকাছি যেসব অক্ষত কোষ থাকে তাদের বিভাজনের ফলে ক্ষতস্থান পুনরায় পূর্বের অবস্থা ফিরে পায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, যে কোন জীবের জীবনে কোষ বিভাজনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। জীবের জনন (reproduction), পরিস্ফুরণ (development), বৃদ্ধি (growth) এবং ক্ষত (sore) নিরাময়ের জন্য কোষ বিভাজন একান্ত প্রয়োজন।

যে প্রক্রিয়ায় একটি কোষ থেকে একাধিক কোষের উৎপত্তি হয়, তাকে কোষ বিভাজন বলে।

কোষ বিভাজন জীনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

জীবজগতে তিন রকমের কোষ বিভাজন দেখা যায় ; যথা—(A) অ্যামাইটোসিস, (B) মাইটোসিস ও (C) মায়োসিস।

3.5A. অ্যামাইটোসিস (Amitosis)

এই প্রকার কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লীয় পর্দার অবলুপ্তি ঘটে না এবং স্পিন্ডল বা বেমযন্ত্র গঠিত হয় না। এই প্রক্রিয়ার শুরুতে নিউক্লিয়াসটি প্রথমে

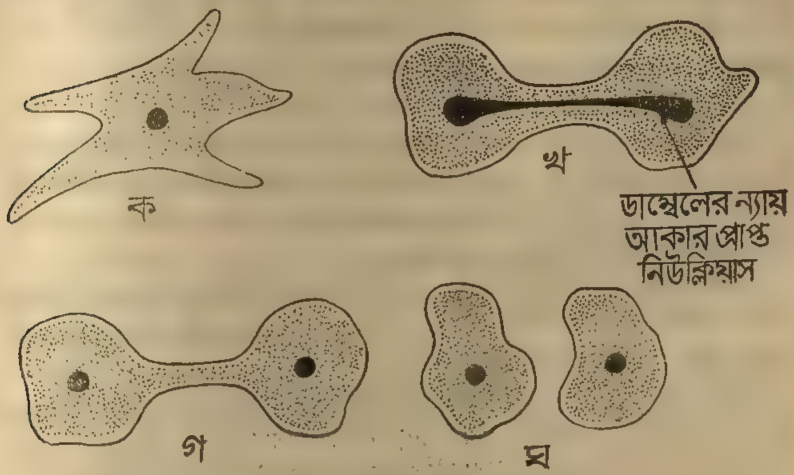

চিত্র 3.10 : অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন।

লম্বাটে এবং পরে ডাম্বেলের আকার ধারণ করে ; অবশেষে তা থেকে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয় (চিত্র 3.10)। নিউক্লিয়াসের বিভাজনের পর কোষের

মধ্যভাগ বরাবর একটি খাঁজ বা সঙ্কোচের (constriction) সৃষ্টি হয়; ফলে সাইটোপ্লাজমটিও দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং প্রত্যেক অংশ একটি করে অপত্য নিউক্লিয়াসকে লাভ করে এক-একটি অপত্য কোষ গঠন করে।

এই প্রকার কোষ বিভাজনে নিউক্লীয় পর্দার অবলুপ্তি না ঘটে, নিউক্লিয়াসের মাঝ বরাবর খাঁজ সৃষ্টির দ্বারা নিউক্লিয়াসের সরাসরি বিভাজন ঘটে বলে একে **প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন** (direct cell division) বলে। উদাহরণ : 'কারা' (*Chara*) নামক শৈবাল, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ফিটাল মেমব্রেন (foetal membrane) বা ভ্রূণ-পর্দার কোষ ইত্যাদি।

3.5B. মাইটোসিস (Mitosis)

যে প্রক্রিয়ার কোষ বিভাজনে একটি কোষ থেকে প্রায় সমান আকারবিশিষ্ট দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় এবং প্রতিটি অপত্য কোষের ক্রোমোসোম-সংখ্যা ও ক্রোমোসোমগুলির আকৃতি, প্রকৃতি ও গুণাবলী জন্মদাতা কোষের অনুরূপ হয়, সেই কোষ বিভাজন পদ্ধতির নাম মাইটোসিস।

3.5B.(I) মাইটোসিসের সংঘটন স্থল (Place of occurrence of Mitosis)

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের **সোমাটিক কলায়** (Somatic tissue)* বা দেহকলায় মাইটোটিক কোষ বিভাজন ঘটে। এছাড়াও, উদ্ভিদের রেণুস্থলীতে রেণুমাতৃকোষ (Spore-mother cells) সৃষ্টি পর্যন্ত এবং প্রাণীদের শুক্রাশয়ে প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইট (Primary spermatocyte) এবং ডিম্বাশয়ে প্রাইমারী উসাইট (Primary oocyte) সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত মাইটোটিক কোষ বিভাজন দেখা যায়। কিন্তু জার্মিনাল কলায় মাইটোটিক কোষ বিভাজন হয় না।

3.5B.(II) মাইটোটিক কোষ বিভাজন পদ্ধতি (Process of Mitotic cell division)

কোষ বিভাজনের প্রথম ধাপে নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে এবং নিউক্লিয়াসের বিভাজনের পর সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয়। নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে বলা হয় **মাইটোসিস** বা **ক্যারিওকাইনেসিস** (Karyokinesis) এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে বলা হয় **সাইটোকাইনেসিস** (Cytokinesis)।

সাইটোকাইনেসিসের ফলে উৎপন্ন সাইটোপ্লাজমের দুটি খণ্ডের প্রত্যেকটিতে পূর্বে বিভাজিত নিউক্লিয়াসের একটি করে খণ্ড থাকে। ফলে একটি কোষ থেকে দুটি **অপত্য কোষ** (daughter cells)-এর জন্ম হয়।

যেহেতু 'মাইটোসিস' কথাটির অর্থ নিউক্লিয়াসের বিভাজন, সেই কারণে দেহকলার কোষ বিভাজনকে বোঝানোর জন্য শুধু 'মাইটোসিস' কথাটি ব্যবহার না করে 'মাইটোটিক কোষ বিভাজন' বা 'সোমাটিক কোষ বিভাজন' কথাটি ব্যবহৃত হয়।

---

* দেহের যে কলা থেকে গ্যামেট বা জননকোষ সৃষ্টি হয়, সেই কলাকে 'জার্মিনাল কলা' বলে। গোনাডের মধ্যে জার্মিনাল কলা থাকে। জার্মিনাল কলা ছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের যাবতীয় কলা 'সোমাটিক কলা' রূপে পরিচিত।

ইন্টারফেজ দশা বা ইন্টারকাইনেসিস (Interphase stage or Interkinesis) **: পর পর সংঘটিত দুটি কোষ বিভাজনের মধ্যবর্তী সময়কালকে বলা হয় ইন্টারফেজ বা ইন্টারকাইনেসিস বা অন্তর্বর্তী দশা।** এই দশাটিকে কোষ বিভাজনের একটি দশা হিসেবে ধরা হয় না বটে, কিন্তু কোষকে বিভাজনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য এই দশাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে এই দশাটিকে **বিশ্রামকালীন দশা** (Resting phase) এবং নিউক্লিয়াসটিকে **বিশ্রামরত নিউক্লিয়াস** (Resting nucleus) রূপে বর্ণনা দেওয়া হত, কিন্তু বর্তমানে এইরূপ বলা হয় না। কেননা, বর্তমানে পরিষ্কার ভাবে জানা গেছে যে, এই সময়ে নিউক্লিয়াস মোটেই বিশ্রাম গ্রহণ করে না ; বরং এই দশায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর সংশ্লেষ (Synthesis) ঘটে। কোষ বিভাজনের জন্য এইসব বস্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

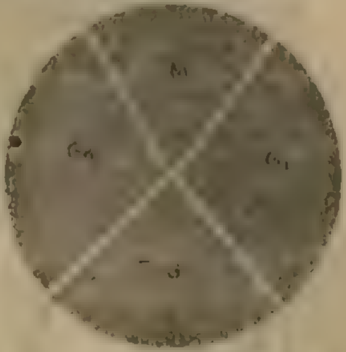

চিত্র 3.11 : ইন্টারফেজ দশার উপদশাগুলি সহ সমগ্র কোষ-চক্র।

সংশ্লেষমূলক ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে ইন্টারফেজ দশাকে তিনটি উপদশায় ভাগ করা হয়, যথা—(i) উত্তর মাইটোটিক বৃদ্ধি দশা বা প্রথম বৃদ্ধি দশা (First Growth period or G_1-period), (ii) সংশ্লেষ দশা (Synthetic period or S-period), (iii) প্রাক্-মাইটোটিক বৃদ্ধি দশা বা দ্বিতীয় বৃদ্ধি দশা (Second Growth period or G_2-period) [চিত্র 3.11]।

(i) **উত্তর মাইটোটিক বৃদ্ধি দশা** বা **প্রথম বৃদ্ধি দশা** (G_1-period) **:** একবার মাইটোটিক কোষ বিভাজনের ফলে যে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়, এই দশায় তাদের প্রত্যেকটির কিছুটা বৃদ্ধি ঘটে। এই দশায় DNA সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক ও অন্যান্য বস্তু (যথা—RNA) সংশ্লেষিত হয়। যেসব কোষের আর বিভাজন হয় না তাদের ক্ষেত্রে এই দশাটি চিরস্থায়ী হয়।

(ii) **সংশ্লেষ দশা** (S-period) **:** এই দশায় DNA-র দ্বিত্বভবন (Duplication) ঘটে। যদি 24-48 ঘন্টার মধ্যে DNA-র দ্বিত্বভবন না ঘটে, তাহলে কোষটির পুনর্বিভাজন হয় না।

(iii) **প্রাক্-মাইটোটিক বৃদ্ধি দশা** বা **দ্বিতীয় বৃদ্ধি দশা** (G_2-period) **:** পরবর্তী মাইটোটিক বিভাজন শুরু হওয়ার পূর্বে কোষটির আর একবার, অর্থাৎ দ্বিতীয় বার বৃদ্ধি ঘটে।

মাইটোসিস বা ক্যারিওকাইনেসিস (Mitosis or Karyokinesis) **:** আগেই বলা হয়েছে, মাইটোসিস বা ক্যারিওকাইনেসিস কথাটির অর্থ নিউক্লিয়াসের বিভাজন। নিউক্লিয়াসের যখন বিভাজন ঘটে তখন তার মধ্যে একাদিক্রমে

নানারকমের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শুধু নিউক্লিয়াসের মধ্যেই নয়, এই সময়ে সাইটোপ্লাজমের মধ্যেও নানা রকমের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়।

মাইটোসিস বা ক্যারিওকাইনেসিসকে কয়েকটি নির্দিষ্ট দশায় (Stages) ভাগ করা হয়। ঐ দশাগুলি হচ্ছে যথাক্রমে—**প্রোফেজ, প্রোমেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ** ও **টেলোফেজ**। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সম্পূর্ণ মাইটোটিক চক্রটি একটি অবিচ্ছিন্ন চক্র এবং উক্ত দশাগুলি মনুষ্য-সৃষ্ট। কেবলমাত্র বর্ণনা দানের সুবিধার জন্যই সম্পূর্ণ চক্রটিকে বিভিন্ন দশায় ভাগ করা হয়।

নিচে একটি প্রাণিকোষে মাইটোসিস প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া হল ঃ

(I) প্রোফেজ (Prophase) ঃ মাইটোসিসের দশাগুলির মধ্যে প্রোফেজের স্থিতিকাল (duration) সবচেয়ে বেশী।

এই দশায় কোষের ভিতর নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি ঘটে ঃ

(A) নিউক্লিয়াসের ভিতরকার ঘটনাবলী (Nuclear events) ঃ

(1) এই দশায় ক্রোমাটিন সূত্রগুলি জল ত্যাগ করার ফলে ধীরে ধীরে স্পষ্ট রূপ লাভ করে।

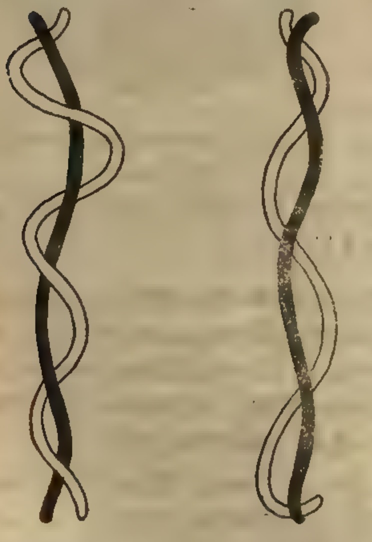

চিত্র 3.12 ঃ বিভিন্ন প্রকার প্রোফেজ কয়েল।

(2) ক্রোমাটিন সূত্রগুলির দেহে স্প্রিং-এর মত প্যাঁচ (coil) পড়তে থাকে (চিত্র 3.5)। ফলে তারা আকারে ছোট ও মোটা হয়। এই কারণেই এই দশায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমাটিন জালকের পরিবর্তে পৃথক পৃথক ক্রোমোসোমের আবির্ভাব ঘটে।

(3) যদিও ইন্টারফেজ দশার S-উপদশায় DNA-র দ্বিত্বভবনের ফলে ক্রোমোসোমেরও দ্বিত্বভবন ঘটে, তথাপি ঐ সময়ে ক্রোমোসোমের নিজস্ব সত্ত্বা (identity) স্পষ্ট না হওয়ায় ঐ ঘটনা চোখে পড়ে না। প্রোফেজ দশায় ক্রোমোসোমগুলি স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করার ফলে দেখা যায়, প্রতিটি ক্রোমোসোম লম্বালম্বি ভাবে দুটি অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অর্ধাংশের নাম **ক্রোমাটিড** (Chromatid)। কোন ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড-দুটি প্রোফেজ দশায় পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায় না। সেন্ট্রোমিয়ার দ্বারা তারা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে (চিত্র 3.13)।

(4) প্রতিটি ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড-দুটি এই দশায় পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, তারা একসঙ্গে পাক খেয়ে (twisted) থাকে। ক্রোমাটিড-

দুটির এইরূপ পাক খেয়ে থাকা অবস্থার নাম **প্লেকটোনেমিক কয়েলিং** (Plectonemic coiling) [চিত্র 3.12]।

(5) প্রোফেজ দশায় নিউক্লিওলাস আকারে ক্রমশ ছোট হতে থাকে এবং এই দশার শেষ দিকে নিউক্লিওলাস সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়।

(6) প্রোফেজ দশার শেষ ভাগে নিউক্লীয় পর্দার বিলুপ্তি ঘটে।

(B) **সাইটোপ্লাজমীয় ঘটনাবলী** (Cytoplasmic events) ঃ

(1) সেন্ট্রোসোমের সেন্ট্রিওল দুটি এই সময়ে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে নিউক্লিয়াসের দুই বিপরীত প্রান্তে চলে যায়। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে 180° ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

(2) সেন্ট্রিওল দুটি যখন পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তখন তাদের মাঝখানে একপ্রকার তন্তুর (fibres) আবির্ভাব ঘটতে দেখা যায়, ঐ তন্তুগুলিকে **বেমতন্তু** বা **স্পিণ্ডল ফাইবার** (spindle fibre) বলা হয়। বেমতন্তুগুলি মাইক্রোটিউবিউল (2.10L প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য) দিয়ে গঠিত হয়।

বেমতন্তুসমষ্টিকে বলা হয় **বেমযন্ত্র** বা **স্পিণ্ডল** (Spindle)। স্পিণ্ডল দেখতে অনেকটা মাকুর মত। এর সূক্ষ্ম প্রান্ত দুটি **মেরু** (Poles) এবং মাঝখানের প্রশস্ত অংশটা **নিরক্ষীয় অঞ্চল** (Equatorial region) নামে পরিচিত।

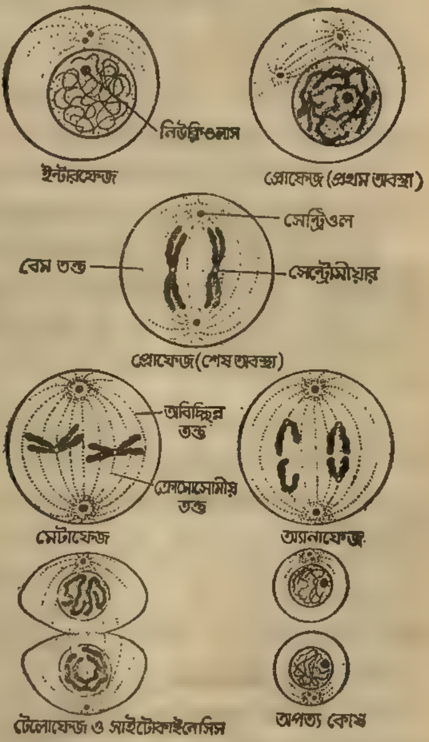

চিত্র 3.13 ঃ প্রাণিকোষে মাইটোসিসের নক্শাকার চিত্র।

সেন্ট্রিওল-দুটি বেমযন্ত্রের দুই মেরুতে অবস্থান করে।

(II) **প্রোমেটাফেজ** (Prometaphase) ঃ বিখ্যাত কোষবিজ্ঞানী **হোয়াইট** (White, M. J. D.) প্রোফেজ ও মেটাফেজ দশার মধ্যবর্তী সময়ে ক্রোমোসোমগুলির যখন এক বৈশিষ্ট্যমূলক আচরণ দেখা যায়, সেই সময়টিকে প্রোমেটাফেজ দশা রূপে বর্ণনা করার পক্ষপাতী।

(1) এই সময়ে ক্রোমোসোমগুলি নির্মীয়মাণ স্পিণ্ডলের নিরক্ষীয় অঞ্চলে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা চালায়, ফলে একের সঙ্গে অপরের ধাক্কাধাক্কি ঘটে।

(2) প্রতিটি ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার এইসময় স্পিন্ডল ফাইবারের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এই সংযুক্তিই ক্রোমোসোমগুলিকে স্পিন্ডলের নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে চালিত হতে সাহায্য করে।

এই দশা মাইটোসিসের সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী দশা।

(III) **মেটাফেজ** (Metaphase) ঃ প্রোফেজের তুলনায় মেটাফেজের স্থিতিকাল খুব কম, তবে অ্যানাফেজের তুলনায় কিছুটা বেশী।

(1) এই দশায় ক্রোমোসোমগুলি বেমযন্ত্রের নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থান করে। প্রত্যেক ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারটি থাকে প্রকৃত নিরক্ষরেখায় এবং বাহুগুলি নিরক্ষরেখার সামান্য এদিকে বা ওদিকে প্রসারিত থাকে।

(2) এই দশায় ক্রোমাটিডগুলি আর পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে না, অর্থাৎ প্লেকটোনেমিক কয়েলের অস্তিত্ব থাকে না।

(3) এই দশায় ক্রোমোসোমগুলি সবচেয়ে বেশী প্যাঁচানো (coiled) হয়। ফলে মাইটোসিসের এই দশায় ক্রোমোসোমগুলির আকৃতি সবচেয়ে ছোট ও মোটা হয়।

(4) মেটাফেজ দশায় দু রকমের বেমতন্তু চোখে পড়ে—(a) **অবিচ্ছিন্ন তন্তু** বা **কণ্টিনিউয়াস ফাইবার** (Continuous fibre)—এইগুলি এক মেরু থেকে অপর মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে ; (b) **ক্রোমোসোমীয় তন্তু** বা **ক্রোমোসোমাল ফাইবার** (Chromosomal fibre)—এইগুলির সাহায্যে ক্রোমোসোমগুলি স্পিন্ডলের মেরুর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

(5) মেটাফেজ দশার শেষ দিকে সেন্ট্রোমিয়ারটি বিভক্ত হয়ে যায়, ফলে প্রতিটি ক্রোমাটিড নিজস্ব সেন্ট্রোমিয়ার লাভ করে।

(IV) **অ্যানাফেজ** (Anaphase) ঃ এই দশা মেটাফেজ দশার চেয়ে স্বল্পস্থায়ী।

(1) এই দশায় প্রতিটি ক্রোমোসোম থেকে উৎপন্ন অপত্য ক্রোমাটিড-দুটি বেমযন্ত্রের দুই বিপরীত মেরুর দিকে চলতে শুরু করে। যে মুহূর্তে এই চলন শুরু হয়, সেই মুহূর্ত থেকেই অ্যানাফেজ দশার শুরু বলে ধরা হয় এবং ক্রোমাটিড-গুলিকে **অপত্য ক্রোমোসোম** (daughter chromosomes) বলা হয়।

(2) অপত্য ক্রোমোসোমগুলির চলনের সময় তাদের সেন্ট্রোমিয়ারটি মেরুর দিকে সবচেয়ে এগিয়ে থাকে এবং তাদের বাহুগুলি থাকে সেন্ট্রোমিয়ারের পিছনে। সেই কারণে এই সময়ে অপত্য ক্রোমোসোমগুলি (তাদের দেহে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী) 'V', 'J', 'L' অথবা 'I' বা দণ্ডের আকৃতির হয় (3.3 প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

(3) চলমান অপত্য ক্রোমোসোমগুলির মাঝখানে এই সময়ে নতুন একপ্রকার বেমতন্তুর আবির্ভাব ঘটে ; সেগুলিকে বলা হয় **আন্তর্মণ্ডলীয় তন্তু** বা **ইন্টারজোনাল ফাইবার** (Interzonal fibre) [চিত্র 3.16]।

(4) অপত্য ক্রোমোসোমগুলির মেরুর দিকে চলন কিভাবে নির্বাহ হয় সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এই মতবাদগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বাস-যোগ্য মতবাদ হচ্ছে, **অ্যাসেম্বলি-ডিসঅ্যাসেম্বলি** মতবাদ (Assembly-disassembly hypothesis)।

এই মতবাদ অনুযায়ী অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমোসোমাল ফাইবারগুলির দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় এবং ইন্টারজোনাল ফাইবারগুলির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। পূর্বোক্ত ফাইবারগুলির দৈর্ঘ্যের হ্রাস ঘটে মেরুপ্রান্তে তাদের মাইক্রোটিউবিউল থেকে টিউবিউলিন ডাইমার (2.10L প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য) ক্রমাগত বিযুক্ত হওয়ার ফলে। শেষোক্ত ফাইবারগুলির দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটে সেন্ট্রোমিয়ারের কাছ বরাবর তাদের মাইক্রোটিউবিউলে ক্রমাগত টিউবিউলিন ডাইমার যুক্ত হওয়ার ফলে। অর্থাৎ, দু রকমের ফাইবারের যুগপৎ অ্যাসেম্বলি ও ডিসঅ্যাসেম্বলি বা গঠন ও ভাঙন চলার ফলে ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে এগিয়ে যায়।

(5) অ্যানাফেজ দশার শেষ দিকে ক্রোমোসোমগুলির প্যাঁচ খুলতে আরম্ভ করে, ফলে প্রতিটি ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য সামান্য বৃদ্ধি পায়।

সব কয়টি অপত্য ক্রোমোসোম নিজ নিজ মেরুতে পৌঁছে গেলে অ্যানাফেজ দশার শেষ হয়।

(V) **টেলোফেজ (Telophase)** ঃ প্রোফেজ দশায় যেসব ঘটনা ঘটে টেলোফেজ দশায় ঠিক তার বিপরীতধর্মী ঘটনাসমূহ ঘটতে দেখা যায়।

(1) এই দশায় ক্রোমোসোমগুলির প্যাঁচ খুলে যাওয়ার ফলে তাদের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটে। ফলে তারা পরস্পরের সঙ্গে আবার জট পাকিয়ে যায় এবং তাদের আর পৃথক ভাবে চেনা যায় না।

(2) এই দশায় নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে।

(3) প্রতিটি ক্রোমোসোমগোষ্ঠীকে ঘিরে নতুন নিউক্লীয় আবরণীর সৃষ্টি হয়। এইভাবে একটি নিউক্লিয়াস দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।

(4) কোন কোন কোষে এই দশাতেই প্রতিটি নিউক্লিয়াস-সংলগ্ন সেন্ট্রিওলের বিভাজন ঘটে। আবার, কোন-কোন কোষে ইন্টারফেজ দশার **S**-উপদশায় সেন্ট্রিওলের বিভাজন হয়।

সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis) ঃ সাইটোকাইনেসিসের অপর নাম **সেল ক্লীভেজ** (Cell cleavage)।

টেলোফেজ দশা চলাকালীনই সাইটোপ্লাজমের বিভাজন বা সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়ে যায় এবং টেলোফেজ ও সাইটোকাইনেসিসের সমাপ্তি প্রায় একই সময়ে ঘটে।

প্রাণিকোষে সাইটোকাইনেসিসের শুরুতে কোষের মাঝামাঝি জায়গায় একটি খাঁজের সৃষ্টি হয়। ঐ খাঁজ ক্রমশ গভীর হয়, যতক্ষণ না সাইটোপ্লাজমটি সম্পূর্ণরূপে দু ভাগ হয়ে যায়। প্রতি ভাগে একটি করে অপত্য নিউক্লিয়াস থাকে। এইভাবে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়।

মাইটোসিস একপ্রকার **অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোষ বিভাজন** (Indirect cell division)। কেননা, এই পদ্ধতিতে নিউক্লিয়াসের সরাসরি বিভাজন ঘটে না। প্রথমে নিউক্লীয় পর্দার অবলুপ্তি ঘটে এবং ক্রোমোসোমগুলি দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। অতঃপর প্রতিটি ক্রোমোসোমগোষ্ঠীকে ঘিরে নতুন নিউক্লীয় পর্দা সৃষ্টির মাধ্যমে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসের আবির্ভাব ঘটে।

মাইটোসিস প্রক্রিয়ার কোষ বিভাজনে একটি কোষ থেকে সম-সংখ্যক ক্রোমোসোম-বিশিষ্ট দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় বলে মাইটোসিসকে **সম-বিভাজন** বা **ইকুয়েশনাল ডিভিশন** (Equational division) বলে।

উদ্ভিদকোষে মাইটোটিক প্রক্রিয়ার বিভাজন (Mitotic cell division in plants) **:** উদ্ভিদকোষের মাইটোটিক বিভাজন প্রাণিকোষের মতই। কেবলমাত্র দুটি বিষয়ে প্রাণিকোষ ও উদ্ভিদকোষের মাইটোটিক বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

প্রথমত, গুপ্তবীজী উদ্ভিদের (Angiosperms) কোষে কোন সেন্ট্রিওল না থাকায়, প্রোফেজ দশায় নিউক্লিয়াসের বাইরে **সেন্ট্রিওল দুটির পৃথগভবনের** যে ঘটনাটি প্রাণিকোষে দেখা যায়, তা ঐসব উদ্ভিদের কোষে ঘটে না।

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ উদ্ভিদকোষে দৃঢ় কোষপ্রাচীর থাকার জন্য প্রাণিকোষের মত সঙ্কোচন প্রক্রিয়ায় সাইটোকাইনেসিস সম্ভব হয় না। **সেল-প্লেট** (Cell plate) বা **কোষপাত** গঠনের মাধ্যমে উদ্ভিদকোষে সাইটোকাইনেসিস ঘটে (চিত্র 3.14)।

কোষপাত গঠন পদ্ধতি (Process of cell plate formation) **:** উদ্ভিদকোষে সাইটোকাইনেসিসের সময়ে স্পিন্ডলের বিষুব অঞ্চলের কিছু মাইক্রোটিউবিউল ও সন্নিহিত কিছু গলগি ভেসিক্‌ল যুক্ত হয়ে কোষের মাঝ বরাবর **ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট** (Phragmoplast) নামে একটি অস্থায়ী কাঠামোর সৃষ্টি করে। এই ফ্র্যাগমোপ্লাস্টই পরে কোষপাতে রূপান্তরিত হয়। পরে গলগি ভেসিক্‌লগুলির মধ্যে উপস্থিত পেকটিন দ্বারা কোষপাত থেকে ধীরে ধীরে প্রাথমিক কোষপ্রাচীর গঠিত হয়।

- **অ্যাসট্রাল বা অ্যাম্ফিঅ্যাসট্রাল মাইটোসিস** (Astral or Amphiastral mitosis) **:** যেসব কোষে সেন্ট্রিওল ও অ্যাস্টার থাকে সেইসব কোষের মাইটোসিসকে অ্যাস্ট্রাল বা অ্যাম্ফিঅ্যাস্ট্রাল মাইটোসিস বলে। **উদাহরণ :** প্রাণিকোষ।
- **অ্যান্যাসট্রাল মাইটোসিস** (Anastral mitosis) **:** যেসব কোষে সেন্ট্রিওল ও অ্যাস্টার থাকে না, সেইসব কোষের মাইটোসিস অ্যান্যাসট্রাল মাইটোসিস নামে পরিচিত। **উদাহরণ :** উদ্ভিদকোষ।

মাইটোসিসের গুরুত্ব (Significance of Mitosis) **:**

(1) মাইটোটিক কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জীবদেহে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে।

(2) এককোষী জাইগোট বা ভ্রূণাণুর বহুকোষী ভ্রূণে রূপান্তর এবং তা থেকে পরিণত জীবের আবির্ভাব ঘটে মাইটোটিক কোষ বিভাজনের ফলে।

(3) বহু এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর জনন বা বংশবিস্তার ঘটে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায়।

(4) উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীদের যৌন জননেও মাইটোসিসের ভূমিকা আছে।

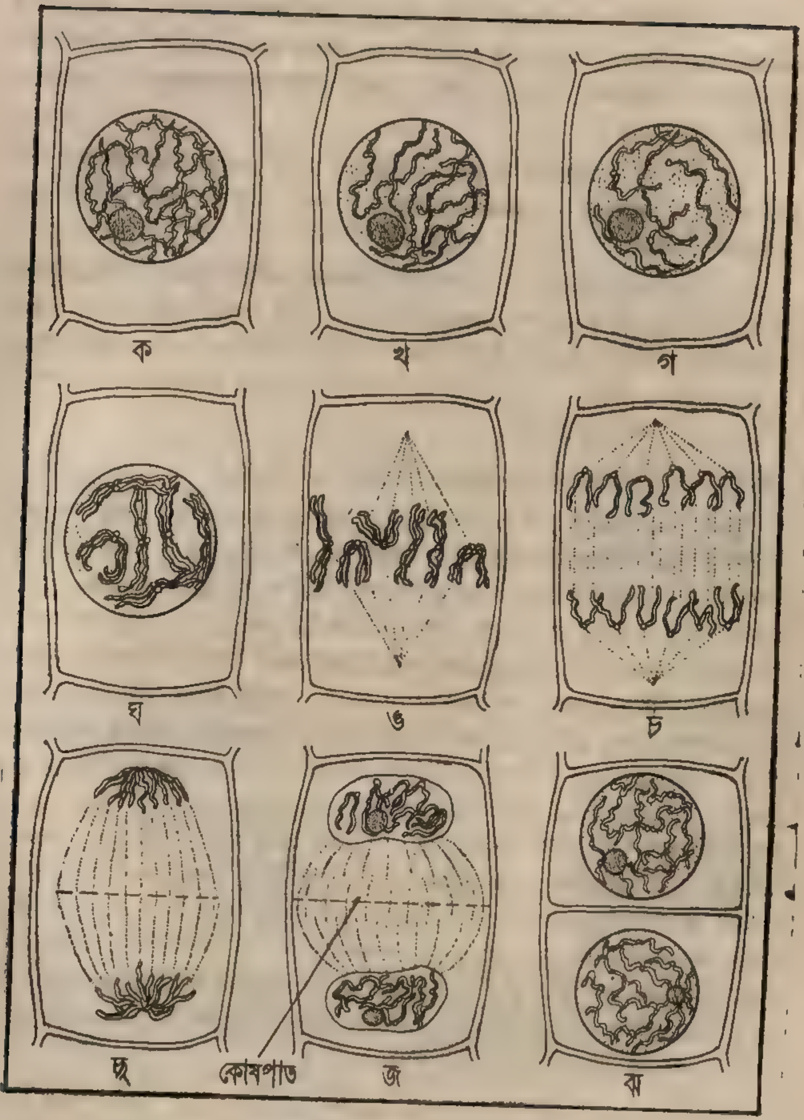

চিত্র 3.14 : উদ্ভিদকোষে মাইটোসিসের নক্‌শাকার চিত্র।
(ক) ইণ্টারফেজ ; (খ), (গ) ও (ঘ) প্রোফেজ ; (ঙ) মেটাফেজ ; (চ) অ্যানাফেজ ; (ছ) ও (জ) টেলোফেজ ও সাইটোকাইনেসিস ; (ঝ) দুটি অপত্য কোষ।

(5) উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের দেহে নতুন রক্তকণিকার সৃষ্টিতে, ত্বকের মৃত কোষগুলির পরিবর্তে নতুন কোষ সৃষ্টিতে এবং দেহের অন্যান্য অংশে আঘাতের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত কোষগুলির পরিবর্তে নতুন কোষ সৃষ্টিতে মাইটোসিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(6) টিকটিকি, তারামাছ ও অন্যান্য কয়েকটি প্রাণী নিজেদের দেহের কোন কোন নষ্ট অঙ্গকে পুনরুৎপন্ন (regenerate) করতে পারে। এই পুনরুৎপাদনের মূলে আছে মাইটোসিস।

(7) ক্রোমোসোমে বংশগত বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রক 'জীন' থাকে। মাইটোসিসের সময়ে ক্রোমোসোমের লম্বালম্বি বিভাজনের মাধ্যমে দুটি অপত্য কোষের মধ্যে জীনের সুষম বন্টন ঘটে। এছাড়া, মাইটোসিসের ফলে দুটি অপত্য কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যাও সমান থাকে। দেহের প্রতিটি কোষের সুশৃঙ্খল আচরণের জন্য এই দুটি ঘটনাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

3.5C. মায়োসিস বা মিয়োসিস (Meiosis)

প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা নির্দিষ্ট ; যেমন—মানুষের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা 46, ধানগাছের 24, মটরশুঁটির 14 ইত্যাদি। যৌন পদ্ধতিতে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশবিস্তার ঘটে তাদের মধ্যে একটি পুরুষ গ্যামেট ও একটি স্ত্রী গ্যামেটের মিলনের ফলে শিশু-উদ্ভিদ বা প্রাণীর জন্ম হয়। উক্ত গ্যামেটগুলি এক-একটি কোষ। প্রতি গ্যামেটে উপস্থিত ক্রোমোসোমের সংখ্যা যদি পিতা ও মাতার দেহকোষে উপস্থিত ক্রোমোসোম সংখ্যার সমান হয়, তাহলে শিশু-উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহে ক্রোমোসোমের সংখ্যা তাদের পিতা বা মাতার ক্রোমোসোম সংখ্যার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এইভাবে প্রতি প্রজন্মেই ক্রোমোসোম সংখ্যা পূর্ববর্তী প্রজন্মের দ্বিগুণ হতে থাকবে। বাস্তবে এইরকম ঘটনা ঘটে না। প্রজাতির ক্রোমোসোম সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখার জন্য জীবজগতে এক বিশেষ ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়। এই কোষ বিভাজন পদ্ধতির নাম **মায়োসিস** বা **মিয়োসিস**। এই প্রকার কোষ বিভাজনের মাধ্যমে অপত্য কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা জন্মদাতা কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। অর্থাৎ, ডিপ্লয়েড কোষ হ্যাপ্লয়েড কোষে পরিণত হয়। যৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারে সক্ষম অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীতে মায়োসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে গ্যামেট সৃষ্টি হয়। ফলে দুটি গ্যামেটের মিলনে উৎপন্ন শিশু-উদ্ভিদ বা প্রাণীর ক্রোমোসোম সংখ্যা পিতা বা মাতার ক্রোমোসোম সংখ্যার সমান থাকে।

মায়োসিস কোষ বিভাজনে একটি কোষের পর পর দুবার বিভাজন ঘটে, কিন্তু সেই সময়ে ক্রোমোসোমের বিভাজন ঘটে মাত্র একবার। ফলে একবার মায়োসিস বিভাজনে চারটি হ্যাপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি হয়।

সংজ্ঞা : যে প্রক্রিয়ার কোষ বিভাজনে একটি ডিপ্লয়েড কোষ থেকে চারটি হ্যাপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি হয়, তাকে মায়োসিস বা মিয়োসিস কোষ বিভাজন বলে।

3.5C. (I) মায়োসিসের সংঘটন স্থল (Place of occurrence of Meiosis)

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের **জার্মিনাল কলায়** মায়োটিক কোষ বিভাজন ঘটে। বহুকোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে জার্মিনাল কলা থাকে শুক্রাশয় (Testis) ও ডিম্বাশয় (Ovary)-এর মধ্যে এবং সপুষ্পক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পরাগধানী (Anther) ও ডিম্বক (Ovule)-এর মধ্যে।

প্রাণীদের শুক্রাশয়ে **প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইট** ও ডিম্বাশয়ে **প্রাইমারী উসাইট** কোষ মায়োটিক বিভাজনের দ্বারা যথাক্রমে শুক্রাণু (sperm) ও ডিম্বাণু (ovum) সৃষ্টি করে। এই জাতীয় মায়োটিক বিভাজনকে, অর্থাৎ যে মায়োটিক বিভাজনের দ্বারা জননকোষ বা গ্যামেট সৃষ্টি হয়, তাকে **গ্যামেটিক মায়োসিস** (Gametic meiosis) বলে।

সপুষ্পক উদ্ভিদে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় মাইক্রোস্পোর বা পরাগরেণু ও মেগাস্পোর বা ভ্রূণথলি (Embryo sac) গঠিত হয়। (এদের যথাক্রমে দুবার ও তিনবার মাইটোটিক বিভাজনের দ্বারা পুং গ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেট সৃষ্টি হয়)। কোন কোন নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে (যথা—মস, ফার্ণ ইত্যাদিতে) রেণুস্থলীর **রেণুমাতৃকোষে** মায়োটিক বিভাজন ঘটে রেণু (spore) উৎপন্ন হয়। এই জাতীয় মায়োটিক কোষ বিভাজনকে, অর্থাৎ যে মায়োটিক বিভাজনের দ্বারা স্পোর বা রেণু উৎপন্ন হয়, তাকে **স্পোরিক মায়োসিস** (Sporic meiosis) বলে।

কিছু শৈবাল (যথা—স্পাইরোগাইরা), ছত্রাক (যথা—মিউকর) ও এককোষী প্রাণীতে (যথা—মনোসিসটিস) ডিপ্লয়েড **জাইগোস্পোর** বা **জাইগোটের** মায়োটিক বিভাজন ঘটে। এই জাতীয় মায়োটিক বিভাজনকে **জাইগোটিক মায়োসিস** (Zygotic meiosis) বলে।

3.5C. (II) মায়োটিক চক্র (Meiotic Cycle)

মায়োটিক কোষ বিভাজনে একটি কোষ ও তার নিউক্লিয়াসের পর পর দুবার বিভাজন ঘটে। উক্ত দুটি বিভাজন যথাক্রমে **প্রথম মায়োটিক বিভাজন** ও **দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজন** নামে পরিচিত।

প্রথম মায়োটিক বিভাজনের সময় একটি ডিপ্লয়েড কোষ থেকে দুটি হ্যাপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ অপত্য কোষগুলিতে ক্রোমোসোম সংখ্যা জন্মদাতা কোষের অর্ধেক হয়ে যায়। সেই কারণে এটি **রিডাকশনাল ডিভিশন** (Reductional division) বা **হ্রাসকরণ বিভাজন** নামে পরিচিত। দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনের সময় প্রথম বিভাজনের ফলে উৎপন্ন কোষ-দুটি সাধারণ মাইটোটিক প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়। অতএব, একবার মায়োসিসের ফলে একটি কোষ থেকে মোট চারটি কোষের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনের ফলে উৎপন্ন প্রতি জোড়ার অন্তর্গত দুটি কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যাগত ও গুণগত (অর্থাৎ জীন-সংক্রান্ত) দিক থেকে পরস্পরের সমান হয়। এই কারণে দ্বিতীয় বিভাজনকে **ইকুয়েশনাল ডিভিশন** বা **সম-বিভাজন** বলে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় বিভাজনের ফলে উৎপন্ন প্রতি

জোড়ার অন্তর্ভুক্ত দুটি কোষের ক্রোমোসোম গুণগত দিক থেকে পরস্পরের সমান হলেও, অপর দুটি কোষের ক্রোমোসোমের সঙ্গে তাদের হুবহু গুণগত (অর্থাৎ জীন-সংক্রান্ত) মিল থাকে না [3.5C. III(2) অংশ দ্রষ্টব্য]। কোন কোন লেখক প্রথম মায়োটিক বিভাজনকে **হেটেরোটাইপিক** (Heterotypic) ও দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনকে **হোমিওটাইপিক** (Homeotypic) বিভাজন আখ্যা দেন।

মায়োসিসকে হ্রাসকরণ বিভাজন বলা হয় কেন ? (Why Meiosis is called Reductional division ?) ঃ মায়োসিস কোষ বিভাজনের পরিণতিতে অপত্য কোষগুলিতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা জন্মদাতা কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। এই কারণে মায়োসিসকে 'হ্রাসকরণ বিভাজন' বলা হয়।

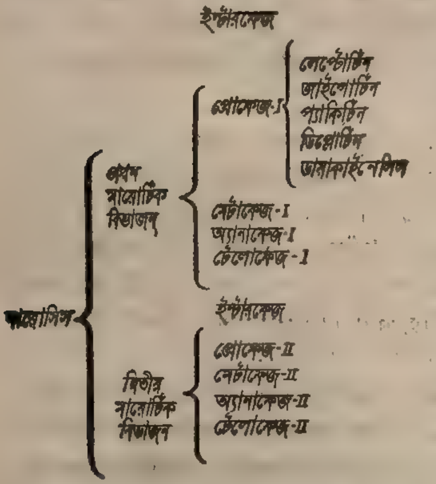

বিবরণ দানের সুবিধার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় মায়োটিক বিভাজনকেই প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ—এই চারটি দশায় ভাগ করা হয়।

আবার, প্রথম মায়োটিক বিভাজনের প্রোফেজ দশাকে লেপ্টোটিন, জাইগোটিন, প্যাকিটিন, ডিপ্লোটিন ও ডায়াকাইনেসিস—এই পাঁচটি উপদশায় (Sub-stages) ভাগ করা হয়।

উক্ত দশা ও উপদশাগুলিকে ঘটনাক্রম অনুসারে একটি ছকের আকারে উপরে উল্লেখ করা হল।

● প্রথম মায়োটিক বিভাজন ●

প্রথম মায়োটিক বিভাজনকে চারটি দশায় ভাগ করা হয়। ঐ দশাগুলি হল ঃ

1. প্রথম প্রোফেজ 2. প্রথম মেটাফেজ 3. প্রথম অ্যানাফেজ 4. প্রথম টেলোফেজ।

1. প্রথম প্রোফেজ (Prophase I) ঃ প্রথম মায়োটিক বিভাজনের প্রোফেজ দশাটি বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং মাইটোসিসের প্রোফেজের সঙ্গে এর অনেক প্রভেদ দেখা যায়। এই দশায় নিউক্লিয়াসের ভিতর ক্রোমোসোমগুলিকে ঘিরে অনেক ঘটনা ঘটে। ঐ ঘটনাগুলির বর্ণনা দানের সুবিধার্থে এই দশাটিকে কয়েকটি উপদশায় ভাগ করা হয়। ঐ উপদশাগুলি হচ্ছে যথাক্রমে—**লেপ্টোটিন** বা **লেপ্টোনিমা**, **জাইগোটিন** বা **জাইগোনিমা**, **প্যাকিটিন** বা **প্যাকিনিমা**, **ডিপ্লোটিন** বা **ডিপ্লোনিমা** এবং **ডায়াকাইনেসিস**।

A. লেপ্টোটিন বা লেপ্টোনিমা (Leptotene or Leptonema) :

(i) এই দশায় ক্রোমোসোমগুলি ডিপ্লয়েড সংখ্যায় থাকে।

(ii) প্রথম দিকে ক্রোমোসোমগুলি লম্বা ও প্যাঁচবিহীন হয়—ধীরে ধীরে তাদের দেহে প্যাঁচ সৃষ্টি হতে থাকে।

(iii) তেজস্ক্রিয় পরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে জানা গেছে যে, এই দশার পূর্ববর্তী ইন্টারফেজ দশার S-উপদশায় DNA-র দ্বিত্বভবন ঘটে এবং সেইসঙ্গে ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডে বিভাজন ঘটে, তথাপি এই লেপ্টোটিন দশায় কম্পাউন্ড অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ক্রোমাটিডের অস্তিত্ব চোখে পড়ে না।

(iv) এই দশায় ক্রোমোসোমের দেহে সুস্পষ্ট দানার মত অনেক ক্রোমোমিয়ারের আবির্ভাব ঘটে।

(v) এই দশায় ক্রোমোসোমের টেলোমিয়ারগুলি সেন্ট্রিওল কর্তৃক আকৃষ্ট হয় এবং সেন্ট্রিওলের দিকের নিউক্লীয় পর্দা অভিমুখে ধাবিত হয়ে উক্ত পর্দার সঙ্গে যুক্ত হয়। টেলোমিয়ারগুলির এইরকম আচরণের ফলে ক্রোমোসোমগুলি ফুলের তোড়ার রূপ গ্রহণ করে; ক্রোমোসোমের এইরূপ সজ্জারীতি **'বুকে দশা'** (bouquet arrangement) নামে পরিচিত (চিত্র 3.15)। বুকে দশার অপর নাম—ক্রোমোসোমের **পোলারাইজড** (Polarized) অবস্থা।

চিত্র 3.15 : ক্রোমোসোমের 'বুকে দশা'।

(vi) এই দশায় নিউক্লিওলাসটিকে খুব স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই দশায় নিউক্লিওলাসটির কিছুটা বৃদ্ধিও ঘটে।

B. জাইগোটিন বা জাইগোনিমা (Zygotene or Zygonema) :

(i) এই দশার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, সমসংস্থ (Homologous)* ক্রোমোসোমগুলি পরস্পরের কাছাকাছি আসে এবং সমান্তরালভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে (চিত্র 3.16খ)। এই ঘটনাকে **সাইন্যাপসিস** (Synapsis) বা **জোড়-বন্ধন** (Pairing) বলা হয়। প্রতিটি সমসংস্থ ক্রোমোসোম-জোড়ার দুটি সাথীর মধ্যে নিখুঁত সাইন্যাপসিস ঘটে। অর্থাৎ, একটি সাথীর প্রতিটি অংশের সঙ্গে অপর সাথীর প্রতিটি অংশের সাইন্যাপসিস হয় (চিত্র 3.16গ)।

> ● **প্রথম মায়োটিক কোষ বিভাজনের সময় জাইগোটিন উপদশায় সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলির পরস্পরের কাছে এসে পাশাপাশি অবস্থানের ঘটনাকে সাইন্যাপসিস বলে।**

* ডিপ্লয়েড কোষে ক্রোমোসোমগুলি জোড়ায়-জোড়ায় উপস্থিত থাকে। প্রতি জোড়ার ক্রোমোসোম-দুটিকে 'সমসংস্থ ক্রোমোসোম' বলা হয়। এই সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলির একটি মাতার কাছ থেকে এবং অপরটি পিতার কাছ থেকে পাওয়া।

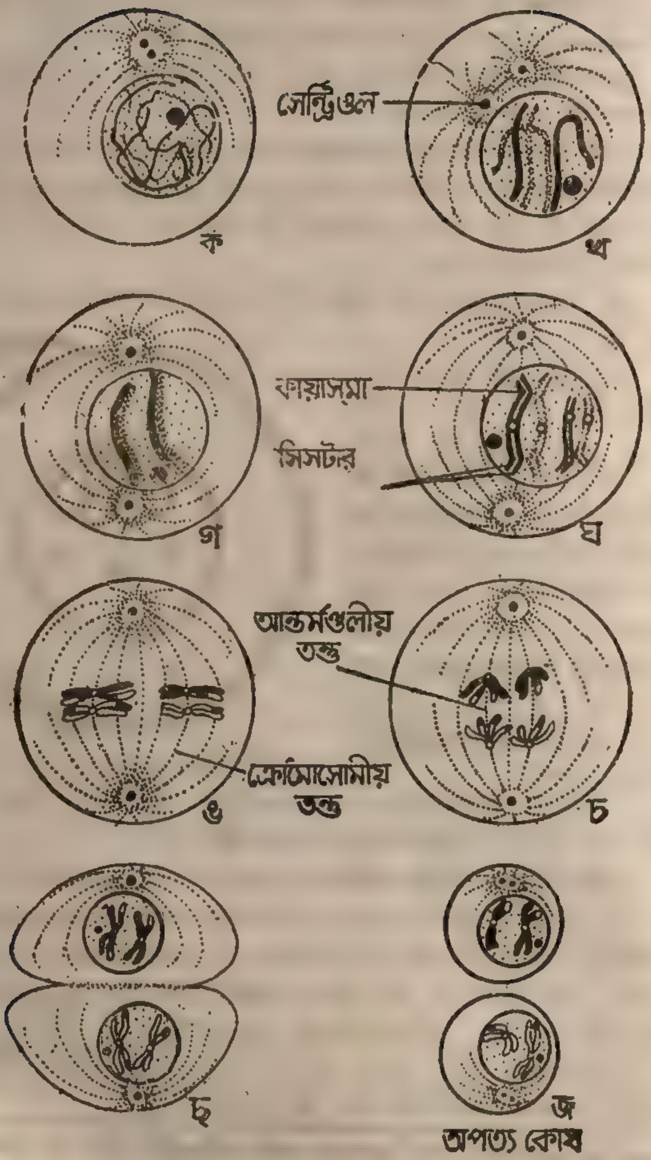

চিত্র 3.16 : প্রথম মায়োটিক বিভাজনের বিভিন্ন দশার নক্‌শাকার চিত্র।
(ক) লেপ্টোটিন, (খ) জাইগোটিন, (গ) প্যাকিটিন, (ঘ) ডিপ্লোটিন, (ঙ) মেটাফেজ, (চ) অ্যানাফেজ, (ছ) টেলোফেজ ও (জ) সাইটোকাইনেসিস।

প্রাণিকোষে প্রথম মায়োটিক বিভাজন

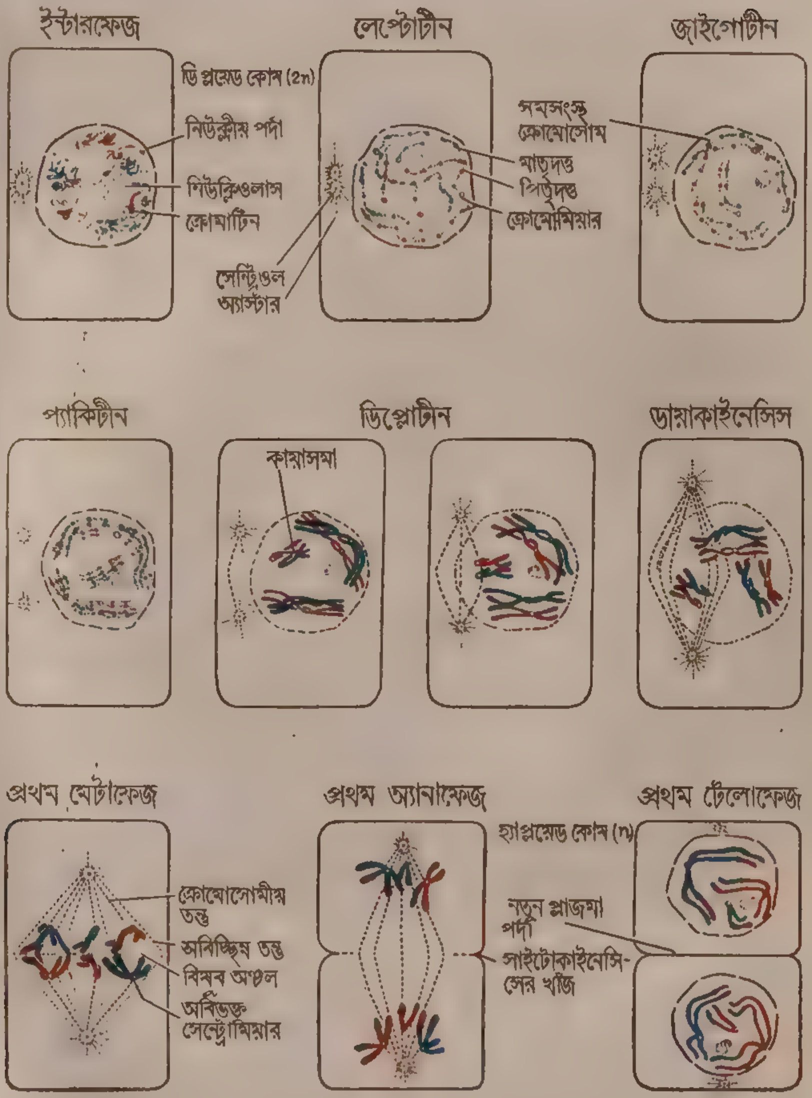

প্রাণিকোষে দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজন

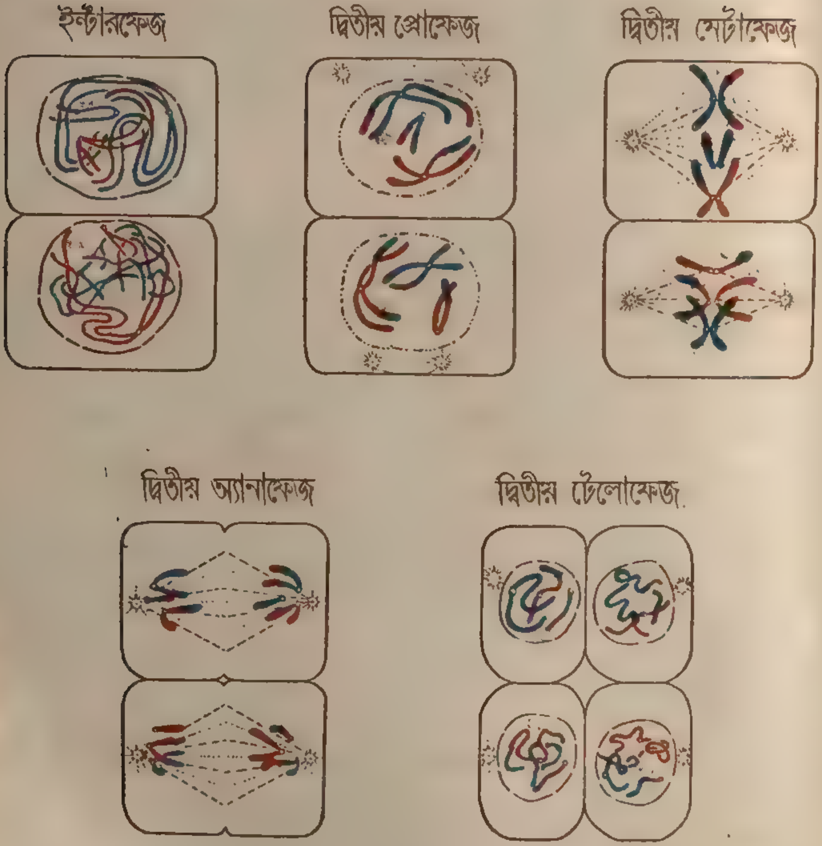

[সাইন্যাপসিস নানাভাবে হতে পারে। এটি ক্রোমোসোমগুলির দুই প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে ক্রমশ সেন্ট্রোমিয়ারের দিকে অগ্রসর হতে পারে, সেক্ষেত্রে একে **প্রোটার্মিনাল সাইন্যাপসিস** (Proterminal synapsis) বলা হয়। অথবা ক্রিয়াটি সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে প্রান্ত-দুটির দিকে অগ্রসর হতে পারে, তখন একে **প্রোসেন্ট্রিক সাইন্যাপসিস** (Procentric synapsis) বলে। আবার, কখনও কখনও ঘটনাটি উক্ত কোন নিয়ম না মেনে এলোমেলো ভাবে ঘটে।]

সাইন্যাপসিসের সময় সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে যায় না—ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা থেকে জানা গেছে তাদের মাঝখানে সাইন্যাপটোনেমাল কমপ্লেক্স* (Synaptonemal complex) নামে একটি নিউক্লীয় বস্তু থাকে। সম্ভবত এই বস্তুটিই সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলির সাইন্যাপসিস বা জোড়বন্ধনে সাহায্য করে।

জোড়বন্ধ প্রতি জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোসোম **বাইভ্যালেন্ট** (Bivalent) নামে পরিচিত। প্রতিটি বাইভ্যালেন্টে চারটি করে ক্রোমাটিড থাকার দরুন তাদের অনেক সময় **টেট্রাড** (Tetrad)-ও বলা হয়।

> **● মায়োটিক প্রোফেজের জাইগোটিন উপদশায় জোড়বন্ধ সমসংস্থ ক্রোমোসোমকে বাইভ্যালেন্ট বা টেট্রাড বলে।**

(ii) লেপ্টোটিন দশায় ক্রোমোসোমদেহে যে প্যাঁচ পড়তে শুরু করে তা এই দশাতেও অব্যাহত থাকে। ফলে ক্রোমোসোমগুলির উল্লেখযোগ্য ঘনীভবন (Condensation) ঘটে।

(iii) এই সময়ে প্রতিটি ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড-দুটি পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে ; শুধু তাই নয় সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলিও পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে।

(iv) নিউক্লিওলাসের বৃদ্ধি এই দশাতেও অব্যাহত থাকে।

C. **প্যাকিটিন বা প্যাকিনিমা** (Pachytene or Pachynema) :

(i) এই দশাতেও ক্রোমোসোমদেহে প্যাঁচ পড়ার ঘটনা চলতে থাকে। ফলে বাইভ্যালেন্টগুলি ক্রমশ ছোট ও মোটা হতে থাকে। এই ঘটনা মেটাফেজ দশা পর্যন্ত চলে। এর পরিণতিস্বরূপ মেটাফেজ দশা পর্যন্ত প্রতি দশাতেই বাইভ্যালেন্টগুলিকে ঠিক তার পূর্ববর্তী দশার তুলনায় ছোট ও মোটা দেখায়।

(ii) এই দশায় প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টের নন্-সিস্টার** ক্রোমাটিডগুলির মধ্যে দেহাংশের বিনিময় ঘটে। এই ঘটনা **ক্রসিং ওভার** (crossing over) নামে পরিচিত (চিত্র 3.17)। ক্রসিং ওভারের ফলে দুটি ক্রোমাটিডের দেহাংশের মধ্যে বিনিময়ের সঙ্গে

---

* এটি 'সাইন্যাপটিনিমাল কমপ্লেক্স' (Synaptinemal complex) নামেও পরিচিত।

** একই ক্রোমোসোমের দুটি ক্রোমাটিডকে 'সিস্টার ক্রোমাটিড' বলা হয়। সমসংস্থ ক্রোমোসোম-জোড়ার দুটি ভিন্ন ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডকে 'নন্-সিস্টার ক্রোমাটিড' বলে।

তাদের জীনেরও বিনিময় ঘটে। এইভাবে জীনের বিনিময় ঘটার ফলে সংশ্লিষ্ট ক্রোমাটিড দুটিতে জীনের নতুন কম্বিনেশন বা সমবায় গঠিত হয়। এই ঘটনার নাম **রিকম্বিনেশন** (Recombination)।

চিত্র 3, 17ঃ ক্রসিং ওভারের দুটি ধাপ।
(ক) একই রঙের ক্রোমাটিডগুলি পরস্পরের সিস্টার ক্রোমাটিড ;
(খ) দুটি নন্-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে দেহাংশের বিনিময় ঘটেছে।

● **মায়োটিক কোষ বিভাজনের সময় সমসংস্থ ক্রোমোসোম-জোড়ার দুটি নন্-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে দেহাংশের বিনিময়ের ঘটনার নাম ক্রসিং ওভার।**

বিভিন্ন গবেষকের গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, এই দশায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে **এন্ডোনিউক্লিয়েজ** (Endonuclease) ও **লাইগেজ** (Ligase) নামে দুটি উৎসেচকের আবির্ভাব ঘটে। তাদের মধ্যে প্রথমোক্তটি দুটি নন্-সিস্টার ক্রোমাটিডকে নির্দিষ্ট স্থানে ভেঙ্গে দেয় এবং শেষোক্ত উৎসেচকটি দুটি ভিন্ন ক্রোমাটিডের অংশকে জুড়ে দেয়। এইভাবে ক্রসিং ওভার ঘটে বলে উক্ত গবেষকরা মনে করেন। এন্ডোনিউক্লিয়েজ ও লাইগেজের উক্ত ক্ষমতা সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু ঠিক কি পদ্ধতিতে উক্ত কাজ দুটি ঘটে তা এখনও পরিষ্কারভাবে জানা যায় নি।

(iii) এই দশা থেকে নিউক্লিওলাস আকারে ছোট হতে থাকে।

D. ডিপ্লোটিন বা ডিপ্লোনিমা (Diplotene or Diplonema) ঃ

(i) এই দশায় প্রতিটি বাইভ্যালেন্টের দুটি সাথীর মধ্যে বিকর্ষণ শুরু হয়। ফলে তারা পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ছাড়াছাড়ি ঘটে না। এক বা একাধিক জায়গায় তাদের পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। এই সংযোগস্থলগুলিকে অনেকটা ইংরেজী বর্ণমালার X-এর মত দেখায়।

(ii) X-এর মত দেখতে উক্ত অংশগুলিকে **কায়াস্মা** (Chiasma)* বলা হয়।

* ইংরেজীতে একবচনে 'কায়াস্মা' এবং বহুবচনে 'কায়াস্মাটা'।

কায়াস্‌মাগুলি ক্রসিং ওভারের বাহ্যিক নিদর্শন। বাইভ্যালেণ্টের দেহে যেখানে কায়াস্‌মা দেখা যায়, বুঝতে হবে সেখানে ক্রসিং ওভার ঘটেছে।

> ● **মায়োটিক কোষ বিভাজনের সময় ক্রসিং ওভারের ফলে প্রতি বাইভ্যালেণ্টের দেহে যে X-সদৃশ অংশ দেখা যায়, তাদের নাম কায়াস্‌মাটা (Chiasmata)।**

প্রত্যেক বাইভ্যালেণ্টে কমপক্ষে একটি কায়াস্‌মা থাকে। বাইভ্যালেণ্টের ক্রোমোসোমগুলির দৈর্ঘ্য যত বেশী হয় তাদের দেহে কায়াস্‌মার সংখ্যাও তত বেশী হতে দেখা যায়।

(iii) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়, এই দশায় কায়াস্‌মা অঞ্চলগুলি ছাড়া বাইভ্যালেণ্টের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সাইন্যাপটোনেমাল কম্‌প্লেক্স অন্তর্হিত হয়েছে। সম্ভবত এই কারণেই বাইভ্যালেণ্টের ক্রোমোসোম-দুটির মধ্যে এই সময়ে বিকর্ষণ শুরু হয়।

(iv) বাইভ্যালেণ্টের সাথী-দুটির মধ্যে বিকর্ষণের ফলে এই দশা থেকে কায়াস্‌মাগুলি বাইভ্যালেণ্টের প্রান্তের দিকে সরে যেতে শুরু করে—এই ঘটনাকে **টার্মিনালাইজেশন** (Terminalization) বলে।

> ● **মায়োসিসের প্রথম প্রোফেজ দশার শেষ দিকে প্রত্যেক বাইভ্যালেণ্টের দুটি ক্রোমোসোমের মধ্যে বিকর্ষণের ফলে কায়াসমাগুলির বাইভ্যালেণ্টের প্রান্তের দিকে সরে যাওয়ার ঘটনার নাম টার্মিনালাইজেশন।**

E. **ডায়াকাইনেসিস** (Diakinesis) :

(i) এই দশায় বাইভ্যালেণ্টগুলি নিউক্লিয়াসের পরিধির দিকে সরে যায়।

(ii) ক্রোমোসোমের ঘনীভবন এই দশাতেও অব্যাহত থাকে, অর্থাৎ তারা আরও ছোট ও মোটা হয়।

(iii) টার্মিনালাইজেশন প্রক্রিয়া চলতে থাকায় কিছু কায়াস্‌মাটা বাইভ্যালেণ্ট-গুলির প্রান্তসীমায় পৌঁছে যায়।

(iv) নিউক্লিওলাসটি ক্রমশ ছোট হতে হতে এই দশার শেষ দিকে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়।

(v) এই দশার শেষে নিউক্লীয় পর্দারও বিলুপ্তি ঘটে।

2. **প্রথম মেটাফেজ** (Metaphase I) :

(i) এই দশায় স্পিণ্ডল বা বেমযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। প্রাণিকোষে দুটি সেণ্ট্রিওল স্পিণ্ডলের দুই মেরুতে অবস্থান করে।

(ii) প্রতিটি ক্রোমোসোমের সেণ্ট্রোমিয়ার স্পিণ্ডল ফাইবারের সঙ্গে যুক্ত হয়। তবে একই বাইভ্যালেণ্টের দুটি সেণ্ট্রোমিয়ার পৃথক স্পিণ্ডল ফাইবারের মাধ্যমে দুটি ভিন্ন মেরুর সঙ্গে যুক্ত হয়।

(iii) এই দশায় বাইভ্যালেন্টগুলি স্পিন্ডলের নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থান করে। কিন্তু তাদের বিন্যাস মাইটোটিক মেটাফেজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হয়। প্রতিটি বাইভ্যালেন্টের সেন্ট্রোমিয়ার-দুটি সঠিক নিরক্ষরেখায় না থেকে ঐ রেখার দুধারে, রেখাটি থেকে সমদূরত্বে অবস্থান করে এবং তাদের বাহুগুলি নিরক্ষরেখার দিকে প্রসারিত থাকে।

(iv) প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোসোম-দুটি প্রান্তীয় কায়াসমা দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

(v) এই দশায় ক্রোমোসোমগুলিকে আকারে সবচেয়ে ছোট ও মোটা দেখায়।

3. প্রথম অ্যানাফেজ (Anaphase I) :

(i) এই দশায় প্রতি বাইভ্যালেন্টের অন্তর্ভুক্ত দুটি ক্রোমোসোম স্পিন্ডলের দুই বিপরীত মেরুর দিকে চলতে শুরু করে। এই বিচলনের (movement) সময় সেন্ট্রোমিয়ারগুলি চলে আগে-আগে এবং বাহুগুলি তাদের পিছনে-পিছনে।

(ii) প্রথম অ্যানাফেজ দশার পরিণাম হচ্ছে, ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হ্রাস অর্থাৎ ডিপ্লয়েড সংখ্যার হ্যাপ্লয়েড সংখ্যায় পরিবর্তন। মাইটোসিসের সঙ্গে প্রথম মায়োটিক বিভাজনের এইটিই হচ্ছে মূল প্রভেদ।

(iii) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, জাইগোটিন দশায় যে ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে সাইন্যাপসিস ঘটে এবং প্রথম অ্যানাফেজ দশার শেষে যে ক্রোমোসোমগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তাদের গঠনে হুবহু মিল থাকে না। কেননা, তারা ইতিমধ্যে 'ক্রসিং ওভার' প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহাংশের বিনিময় করেছে।

4. প্রথম টেলোফেজ (Telophase I) :

(i) যে মুহূর্তে বিযুক্ত ক্রোমোসোমগুলি স্পিন্ডলের দুটি মেরুতে পৌঁছায় সেই মুহূর্ত থেকেই টেলোফেজ দশার শুরু বলে ধরা হয়।

(ii) এই সময়ে ক্রোমোসোমগুলির প্যাঁচ খুলতে থাকার ফলে তাদের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটে।

(iii) এই সময়ে প্রতিটি ক্রোমোসোমগোষ্ঠীকে ঘিরে নতুন নিউক্লীয় পর্দার সৃষ্টি হয় এবং নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে।

প্রথম সাইটোকাইনেসিস : এই পদ্ধতি মাইটোসিসের মত। সাইটোকাইনেসিসের ফলে একটি কোষ দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয়।

ইন্টারফেজ (Interphase) : প্রথম মায়োটিক বিভাজন ও দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনের মধ্যবর্তী কালে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ইন্টারফেজ দশার আবির্ভাব ঘটে। এই দশায় **ক্রোমোসোমের DNA-র দ্বিত্বভবন ঘটে না**। কেননা, এই সময়ে ক্রোমোসোমগুলি ক্রোমাটিডে বিভক্ত অবস্থাতেই থাকে। যে কোন দুটি মাইটোটিক বিভাজনের মধ্যবর্তী ইন্টারফেজ দশার সঙ্গে মায়োসিসের দুটি বিভাজনের মধ্যবর্তী ইন্টারফেজ দশার এটি একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য।

• দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজন •

দ্বিতীয় প্রোফেজ (**Prophase II**) : প্রথম প্রোফেজ দশার তুলনায় দ্বিতীয় প্রোফেজ দশার স্থিতিকাল অনেক কম এবং এই দশার কার্যক্রমও অনেক সরল।

(i) এই দশায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমাটিডে বিভক্ত অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলির পুনরায় আবির্ভাব ঘটে।

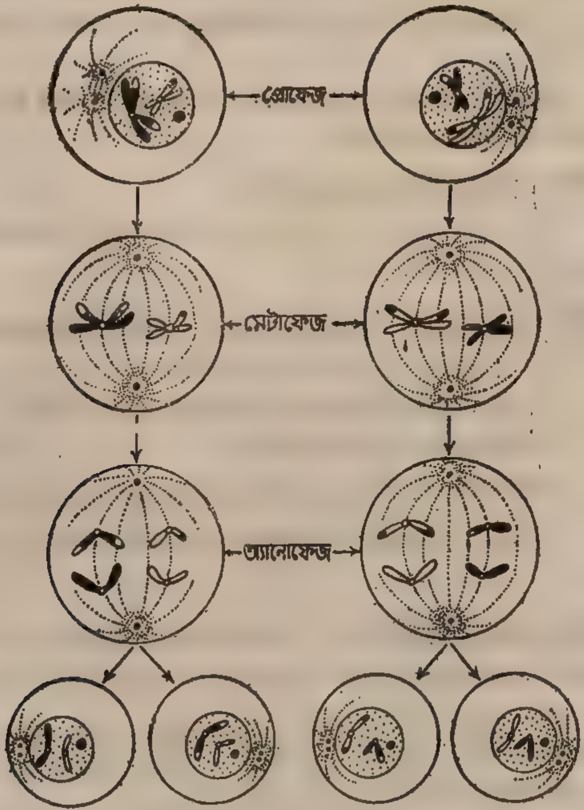

চিত্র 3.14 : দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনের বিভিন্ন দশার নকশাকার চিত্র।

(ii) ক্রোমাটিডগুলি পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে না (চিত্র 3.18)। [ক্রোমাটিডগুলির এই আচরণ মাইটোসিসের প্রোফেজ দশায় তাদের আচরণ থেকে পৃথক]।

(iii) প্রথম মায়োটিক বিভাজনের সময়কার কিছু প্যাঁচ বা কুণ্ডলী ক্রোমোসোমদেহে উপস্থিত থাকে।

(iv) প্রথম টেলোফেজ ও ইণ্টারফেজ দশায় যদি কিছু প্যাঁচ খুলে গিয়ে থাকে, তাহলে এই দশায় পুনরায় প্যাঁচ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সুতরাং, ক্রোমোসোমগুলি আবার আকারে ছোট হতে থাকে।

(v) এই দশার শেষে নিউক্লিওলাস ও নিউক্লীয় পর্দার বিনাশ ঘটে এবং স্পিন্ডলের আবির্ভাব ঘটে।

দ্বিতীয় মেটাফেজ (Metaphase II) : এই দশা খুবই স্বল্পস্থায়ী।

(i) এই দশায় ক্রোমোসোমগুলি তাদের সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল দিয়ে স্পিন্ডল ফাইবারের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং স্পিন্ডলের নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থান করে। তাদের সেন্ট্রোমিয়ারগুলি থাকে প্রকৃত নিরক্ষরেখায় এবং বাহুগুলি দুই মেরুর দিকে প্রসারিত থাকে।

(ii) এই দশার শেষে সেন্ট্রোমিয়ারগুলি বিভাজিত হয়, ফলে প্রতিটি ক্রোমাটিড তার নিজস্ব সেন্ট্রোমিয়ার লাভ করে।

দ্বিতীয় অ্যানাফেজ (Anaphase II) :

এই দশায় অপত্য ক্রোমোসোমগুলি, অর্থাৎ পূর্ববর্তী দশার ক্রোমাটিডগুলি, বিপরীত মেরুর দিকে চলতে শুরু করে।

দ্বিতীয় টেলোফেজ (Telophase II) : অপত্য ক্রোমোসোমগুলি দুই মেরুতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে টেলোফেজ দশার শুরু হয়।

(i) এই দশায় অপত্য ক্রোমোসোমগুলির প্যাঁচ খুলতে থাকে।

(ii) নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে।

(iii) প্রতিটি অপত্য ক্রোমোসোমগোষ্ঠীকে ঘিরে নতুন নিউক্লীয় পর্দা গঠিত হয়।

(iv) নিউক্লিয়াস জল গ্রহণের ফলে অপত্য ক্রোমোসোমগুলি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দ্বিতীয় সাইটোকাইনেসিস : প্রথম সাইটোকাইনেসিসের অনুরূপ।

3.5C. (III) মায়োসিসের তাৎপর্য (Significance of Meiosis)

(1) যৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারের ক্ষমতাসম্পন্ন জীবে হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট বা জননকোষ সৃষ্টির মাধ্যমে মায়োসিস এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে ক্রোমোসোমের সংখ্যাকে নির্দিষ্ট রাখতে সাহায্য করে।

(2) মায়োসিসের সময় ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে পিতৃদত্ত ও মাতৃদত্ত ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে দেহাংশের বিনিময়ের ফলে জীনের নতুন কম্বিনেশন বা সমবায় গঠিত হয়। তাছাড়া, পিতৃদত্ত ও মাতৃদত্ত ক্রোমোসোমগুলির যথেচ্ছ পৃথগ্‌ভবনের (random segregation) জন্য নানারকম জেনেটিক কম্বিনেশনযুক্ত জননকোষের উদ্ভব হয়। মায়োসিসের এইসব ঘটনা নতুন প্রকরণ (variation) সৃষ্টির মাধ্যমে জীবের অভিব্যক্তিতে (Evolution) সাহায্য করে।

(3) মেণ্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত মূল নীতিগুলির কোষতত্ত্বীয় ব্যাখ্যা (Cytological explanation) মায়োটিক চক্র থেকে লাভ করা যায়।

● মাইটোসিস ও মায়োসিসের তুলনা ●

মাইটোসিস	মায়োসিস
1. দেহের সকল অঙ্গে এই প্রকার কোষ বিভাজন দেখা যায়।	1. কেবলমাত্র যৌন জনন-অঙ্গে এই প্রকার কোষ বিভাজন ঘটে।
2. এই প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের একবার মাত্র বিভাজন ঘটে।	2. এই প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের দুবার বিভাজন ঘটে।
3. এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি জন্মদাতা কোষ বা মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়।	3. এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মাতৃকোষ থেকে চারটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়।
4. অপত্য কোষগুলির ক্রোমোসোম-সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম-সংখ্যার সমান থাকে।	4. অপত্য কোষগুলির ক্রোমোসোম-সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম-সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়।
5. অপত্য কোষসমূহে ক্রোমোসোমগুলির জীনের কম্বিনেশন মাতৃকোষের ক্রোমোসোমগুলির অনুরূপ থাকে।	5. ক্রসিং ওভারের ফলে অপত্য কোষসমূহের ক্রোমোসোমগুলিতে জীনের নতুন কম্বিনেশন গঠিত হয়।
প্রোফেজ	**প্রোফেজ**
6. এই দশাটি মায়োসিসের তুল্য দশার তুলনায় স্বল্পস্থায়ী।	6. মায়োসিসের প্রথম প্রোফেজ দশাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়।
7. এই দশার আগমন একবারই ঘটে এবং একে কোন উপদশায় ভাগ করা হয় না।	7. দুবার প্রোফেজ দশার আগমন ঘটে—যথা, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রোফেজ দশা। দীর্ঘস্থায়ী প্রথম প্রোফেজ দশাটিকে পাঁচটি উপদশায় ভাগ করা হয়—যথা, লেপ্টোটিন, জাইগোটিন, প্যাকিটিন, ডিপ্লোটিন ও ডায়াকাইনেসিস।
8. নিউক্লিয়াসের আয়তনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে না।	8. নিউক্লিয়াসের আয়তন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়।
9. সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলির সাইন্যাপসিস ঘটে না। [কেবল মাত্র ড্রসোফিলা নামক পতঙ্গের ক্ষেত্রে সোমাটিক ক্রোমোসোমগুলি জোড়বন্ধভাবে থাকে।]	9. সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলির সাইন্যাপসিস ঘটে।
10. ক্রসিং ওভার ঘটে না; ফলে কায়াসমা-ও সৃষ্টি হয় না।	10. প্যাকিটিন দশায় ক্রসিং ওভার পদ্ধতির দ্বারা সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে ক্রোমাটিড খণ্ডের বিনিময় ঘটে। এই ঘটনার ফলেই কায়াসমা সৃষ্টি হয়।

মাইটোসিস	মায়োসিস
11. ক্রোমোমিয়ার দেখা যায় না।	11. ক্রোমোমিয়ার দেখা যায়।
12. এই দশার অন্তিম লগ্নে নিউক্লিওলাস ও নিউক্লীয় পর্দার অবলুপ্তি ঘটে।	12. মাইটোসিসের মতই।
মেটাফেজ	**মেটাফেজ**
13. একবারই এই দশার আগমন ঘটে।	13. দুবার এই দশার আগমন ঘটে।
14. সেন্ট্রোমিয়ারটি সঠিক নিরক্ষরেখায় অবস্থান করে এবং ক্রোমোসোমের বাহুগুলি মেরুর দিকে প্রসারিত থাকে।	14. প্রথম বারে সেন্ট্রোমিয়ারগুলি সঠিক নিরক্ষরেখায় না থেকে মেরু দুটির দিকে সামান্য এগিয়ে থাকে এবং বাহুগুলি নিরক্ষরেখার দিকে প্রসারিত থাকে। দ্বিতীয় মেটাফেজ দশাটি মাইটোসিসের মেটাফেজ দশার অনুরূপ।
15. এই দশার শেষ দিকে সেন্ট্রোমিয়ার দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়।	15. প্রথম বার সেন্ট্রোমিয়ারের বিভাজন হয় না।
অ্যানাফেজ	**অ্যানাফেজ**
16. মাত্র একবার এই দশার আগমন ঘটে।	16. দুবার এই দশার আগমন ঘটে।
17. মেরুর দিকে ধাবিত ক্রোমোসোমগুলির প্রত্যেকটি এক-একটি মোনাড অর্থাৎ একটিমাত্র ক্রোমাটিড দ্বারা গঠিত।	17. প্রথম অ্যানাফেজ দশার ক্রোমোসোমগুলি ডায়াড অর্থাৎ দুটি করে ক্রোমাটিড দ্বারা গঠিত। দ্বিতীয় অ্যানাফেজ দশার ক্রোমোসোমগুলি মোনাড।
18. পৃথগীভূত ক্রোমোসোমগুলিতে জীনের সজ্জাক্রমে (arrangement) কোন পরিবর্তন হয় না।	18. পৃথগীভূত ক্রোমোসোমগুলিতে জীনের সজ্জাক্রমে পরিবর্তন ঘটে।
টেলোফেজ	**টেলোফেজ**
19. মাত্র একবার এই দশার আগমন ঘটে।	19. দুবার এই দশার আগমন ঘটে।
20. এই দশায় প্রতিটি অপত্য নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের সংখ্যা মূল নিউক্লিয়াসের অনুরূপ থাকে।	20. প্রতিটি অপত্য নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের সংখ্যা মূল নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসোম-সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়।
সাইটোকাইনেসিস	**সাইটোকাইনেসিস**
21. প্রতি বার বিভাজনের শেষে সাইটোকাইনেসিস হয়।	21. প্রথম টেলোফেজ দশার শেষে সাইটোকাইনেসিস নাও হতে পারে।

মায়োটিক প্রোফেজের বিভিন্ন উপদশার মুখ্য বৈশিষ্ট্য :

উপদশা	বৈশিষ্ট্য
1. লেপ্টোটিন	ক্রোমোসোমগুলি লম্বা ও প্যাঁচবিহীন হয় ; কম্পাউন্ড অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তাদের ক্রোমাটিডে বিভক্ত থাকার ঘটনা ধরা পড়ে না।
2. জাইগোটিন	সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলির সাইন্যাপসিস ঘটে, ফলে বাইভ্যালেন্ট সৃষ্টি হয়।
3. প্যাকিটিন	বাইভ্যালেন্টগুলি আকারে ছোট ও মোটা হয় ; ক্রসিং ওভার ঘটে।
4. ডিপ্লোটিন	বিকর্ষণজনিত কারণে বাইভ্যালেন্টগুলির মধ্যে কিছুটা ছাড়াছাড়ি ঘটে, ফলে তাদের দেহে কায়াসমা দৃষ্টিগোচর হয়।
5. ডায়াকাইনেসিস	বাইভ্যালেন্টগুলি নিউক্লিয়াসের পরিধির দিকে সরে যায় ; তারা আরও ছোট ও মোটা হয় ; কিছু কায়াসমাটা বাইভ্যালেন্টের প্রান্তসীমায় পৌঁছায়।

● বিষয় সংক্ষেপ ●

1. নিউক্লিয়াসের ভিতর অবস্থিত এবং নিউক্লিওপ্রোটীন দ্বারা গঠিত যে সুতার মত অংশ বংশগত বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রক জীনকে ধারণ করে এবং বংশপরম্পরায় পরিবাহিত করে, তার নাম ক্রোমোসোম।

   পুরুষ ও স্ত্রী ভেদ আছে এমন সব জীবের দেহকোষের যে দুটি ক্রোমোসোম লিঙ্গ নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, তাদের বলা হয় সেক্স ক্রোমোসোম বা অ্যালোসোম বা হেটেরোক্রোমোসোম বা অ্যাক্সেসরি ক্রোমোসোম ; এদের X ও Y দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। সেক্স ক্রোমোসোম ব্যতীত বাকী ক্রোমোসোমগুলি অটোসোম নামে পরিচিত।
2. যেসব জীবের ও যেসব কোষের ক্রোমোসোমগুলিকে জোড়ায়-জোড়ায় (in pairs) ভাগ করা যায়, তাদের যথাক্রমে ডিপ্লয়েড জীব ও ডিপ্লয়েড কোষ বলে। উদা: সোমাটিক কোষ বা দেহকোষ। যেসব কোষে ক্রোমোসোমগুলি জোড়ায়-জোড়ায় না থেকে (unpaired) একক ভাবে থাকে, তাদের হ্যাপ্লয়েড কোষ বলে। উদা: গ্যামেট বা জননকোষ।
3. সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যার ভিত্তিতে ক্রোমোসোমগুলিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; যথা—আসেণ্ট্রিক (সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন), মনোসেণ্ট্রিক (একটি সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত), ডাইসেণ্ট্রিক (দুটি সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত), পলিসেণ্ট্রিক (দুয়ের অধিক সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত)।
4. ক্রোমোসোমদেহে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোসোম চার রকমের. যথা—মেটাসেণ্ট্রিক (সেন্ট্রোমিয়ার ঠিক মাঝখানে থাকে), অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক (সেন্ট্রোমিয়ার কোন এক প্রান্তের কাছে থাকে), সাবমেটাসেণ্ট্রিক (সেন্ট্রোমিয়ার

মাঝখান থেকে কোন এক প্রান্তের দিকে কিছুটা সরে থাকে), টেলোসেণ্ট্রিক (সেণ্ট্রোমিয়ার কোন এক প্রান্তসীমায় থাকে)।

5. ক্রোমোসোম নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিত—ক্রোমাটিড, ক্রোমোনিমা, ক্রোমোমিয়ার, মুখ্য সংকোচ ও সেণ্ট্রোমিয়ার, গৌণ সংকোচ, স্যাটেলাইট বডি, টেলোমিয়ার।

প্রোফেজ ও মেটাফেজ দশায় প্রতিটি ক্রোমোসোম যে দুটি লম্বালম্বি অর্ধাংশে বিভক্ত থাকে, তাদের প্রতিটির নাম ক্রোমাটিড।

ক্রোমোসোমদেহ যে সরু, লম্বা, প্যাঁচানো সুতার মত অংশ দ্বারা গঠিত, তাদের নাম ক্রোমোনিমা।

মায়োসিসের প্রোফেজ দশায় ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্য বরাবর নির্দিষ্ট দূরত্বে আঁটসাঁট প্যাঁচ পড়ার ফলে পুঁতির মত ছোট-ছোট যেসব দানা দেখা যায়, তাদের নাম ক্রোমোমিয়ার।

ক্রোমোসোমদেহের যে সংকীর্ণ অংশে সেণ্ট্রোমিয়ার থাকে সেই অংশের নাম মুখ্য বা প্রাথমিক সংকোচ। মুখ্য সংকোচ অংশে যে ক্রোমোসোমীয় অংশ কোষ বিভাজনের সময় কাইনেটোকোরের মাধ্যমে বেমতন্তুর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং অ্যানাফেজ দশার শেষে ক্রোমোসোমকে মেরু অঞ্চলের দিকে চলতে সাহায্য করে, তার নাম সেণ্ট্রোমিয়ার।

ক্রোমোসোমের যে সংকীর্ণ স্থানে নিউক্লিওলাস যুক্ত থাকে এবং যে স্থানটি নিউক্লিওলাসের গঠনে সাহায্য করে, সেই স্থানটির নাম গৌণ সংকোচ।

প্রান্তীয় গৌণ সংকোচের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ক্রোমোসোমদেহের ক্ষুদ্র বিন্দুর মত অংশের নাম স্যাটেলাইট বডি।

অভগ্ন ক্রোমোসোমের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণযুক্ত প্রান্তের নাম টেলোমিয়ার।

ক্রোমোসোমদেহে হিস্টোন দ্বারা গঠিত যে ছোট-ছোট গোলক রৈখিক ভাবে (linearly) সজ্জিত থাকে, তাদের নাম নিউক্লিওসোম। DNA অণু সর্পিলাকারে ঐ গোলকগুলিকে আবৃত করে থাকে।

6. ক্রোমোসোমের মুখ্য রাসায়নিক উপাদান হল—নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটীন। দু রকম নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে DNA-র পরিমাণ RNA-র তুলনায় অনেক বেশী—যথাক্রমে 45% ও 1·2-1·4%। ক্রোমোসোমে উপস্থিত প্রোটীনও দু রকমের, যথা—ক্ষারীয় প্রোটীন ও আম্লিক প্রোটীন। ক্ষারীয় প্রোটীনের মধ্যে অধিকাংশ ক্রোমোসোমে পাওয়া যায় হিস্টোন, কিন্তু শুক্রাণুর ক্রোমোসোমে হিস্টোনের পরিবর্তে পাওয়া যায় প্রোটামিন। ক্রোমোসোমে কয়েকটি খনিজ পদার্থও থাকে—তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ক্যালসিয়াম।

7. যে কোন ব্যক্তি বা জীবের যাবতীয় দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রককে জীন বলে। জীনের মাধ্যমেই পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরিবাহিত হয়।

জীন ক্রোমোসোমদেহে রৈখিক সজ্জাক্রমে অবস্থান করে। সকল প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক জীবের এবং অধিকাংশ ভাইরাসের জীন DNA দ্বারা গঠিত। কোন-কোন ভাইরাসের জীন RNA দ্বারা গঠিত।

8. জীবদেহে দু রকমের নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায়—DNA এবং RNA। নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুগুলি খুব দীর্ঘ। এই দীর্ঘ অণুগুলি যে ছোট-ছোট একক দ্বারা গঠিত তাদের বলা হয় নিউক্লিওটাইড। প্রত্যেক নিউক্লিওটাইডে

একটি পেণ্টোজ বা পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করার অণু, একটি ফসফোরিক অ্যাসিডের অণু এবং একটি নাইট্রোজেনযুক্ত বেস বা ক্ষারক থাকে। ক্ষারকগুলি দু শ্রেণীর —পিউরিন ও পিরিমিডিন।

DNA দ্বিতন্ত্রী এবং তার পেণ্টোজ শর্করাটি ডিঅক্সিরাইবোজ। DNA-তে অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন নামে দু রকম পিউরিন বেস এবং থাইমিন ও সাইটোসিন নামে দু রকম পিরিমিডিন বেস থাকে।

RNA একতন্ত্রী এবং তাতে রাইবোজ নামে পেণ্টোজ শর্করা থাকে। RNA-তে DNA-র মতই অ্যাডিনিন, গুয়ানিন ও সাইটোসিন বেস পাওয়া যায়, কিন্তু থাইমিন পাওয়া যায় না—তার পরিবর্তে ইউরাসিল নামে পিরিমিডিন বেস থাকে।

9. জীবজগতে দুটি বিশেষ ধরনের ক্রোমোসোমের কথা জানা গেছে, যথা—ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম ও পলিটিন ক্রোমোসোম।

মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখী প্রভৃতি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের এবং কোন-কোন অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রাইমারী উসাইট কোষে মায়োসিস কোষ বিভাজনের ডিপ্লোটিন উপদশায় খুব বড় এবং লণ্ঠনের চিমনি-ধোয়া ব্রাশের মত দেখতে যে ক্রোমোসোমগুলিকে দেখা যায়, তাদের নাম ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম। প্রতিটি ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম দুটি করে সমসংস্থ ক্রোমোসোম দ্বারা গঠিত এবং তাদের দেহে স্থানে-স্থানে কায়াসমা দেখা যায়। প্রত্যেক সমসংস্থ ক্রোমোসোমে একটি কেন্দ্রীয় অক্ষ এবং বহু-সংখ্যক পার্শ্বীয় ফাঁস থাকে।

ডিপটেরা বর্গের অন্তর্ভুক্ত বহু পতঙ্গের লার্ভার লালাগ্রন্থিতে এবং অন্যান্য কয়েকটি অঙ্গে সাধারণ ক্রোমোসোমের তুলনায় দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনেক গুণ বড় একপ্রকার ক্রোমোসোম দেখা যায়—এদের নাম পলিটিন (বহুসূত্র : Poly=Many, tene=thread) ক্রোমোসোম। দেহকোষে সমসংস্থ ক্রোমোসোমের জোড়-বন্ধন (Somatic pairing) এবং উক্ত জোটবদ্ধ ক্রোমোসোমগুলির বার বার বিভাজনের ফলে এইরূপ ক্রোমোসোম সৃষ্টি হয়। এই প্রকার ক্রোমোসোমে পর্যায়ক্রমে বহু গাঢ় দাগ (ডার্ক ব্যাণ্ড) ও হালকা দাগ (লাইট ব্যাণ্ড) দেখা যায়। এছাড়াও এই প্রকার ক্রোমোসোমে পাফ্ ও বলবিয়ানি রিং থাকে।

10. কোষ বিভাজন তিন প্রকার—অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস ও মায়োসিস বা মিয়োসিস।

অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লীয় পর্দার অবলুপ্তি না ঘটে, নিউক্লিয়াসের মাঝ বরাবর খাঁজ সৃষ্টির দ্বারা নিউক্লিয়াসের সরাসরি বিভাজন ঘটে ; এই প্রকার বিভাজনে স্পিণ্ডল বা বেমযন্ত্র গঠিত হয় না। 'কারা' নামক শৈবাল, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণ-পর্দার কোষ প্রভৃতি অল্প কয়েকপ্রকার জীব-কোষে এই ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়।

মাইটোসিস ও মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লীয় পর্দার অবলুপ্তি ঘটে এবং বেমযন্ত্র গঠিত হয়।

11. উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সোমাটিক কলায় মাইটোসিস ঘটে। মাইটোটিক প্রক্রিয়ার কোষ বিভাজনে একটি কোষ থেকে প্রায় সমান আকারবিশিষ্ট দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় এবং প্রতিটি অপত্য কোষের ক্রোমোসোম-সংখ্যা এবং ক্রোমোসোম-গুলির আকৃতি, প্রকৃতি ও গুণাবলী জন্মদাতা কোষের অনুরূপ হয়।

মাইটোসিসের সময় নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটে সেগুলির বর্ণনা দানের সুবিধার জন্য মাইটোসিসকে প্রোফেজ, প্রোমেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ—এই কয়টি দশায় ভাগ করা হয়।

প্রোফেজ দশায় ক্রোমাটিন সূত্রগুলির দেহে প্যাঁচ পড়ার জন্য তারা সরু-সরু ক্রোমোসোমের আকার ধারণ করে। প্রতিটি ক্রোমোসোম দুটি করে ক্রোমাটিডে বিভক্ত থাকে, যেগুলি পরে অপত্য ক্রোমোসোমে পরিণত হয়। প্রোফেজ দশার শেষ দিকে নিউক্লিওলাস ও নিউক্লীয় পর্দার অবলুপ্তি ঘটে। প্রাণিকোষে এই দশায় সেন্ট্রোসোমের দুটি সেন্ট্রিওল পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়ে ভবিষ্যৎ বেমযন্ত্রের দুই মেরুতে অবস্থান করে। সেন্ট্রিওল-দুটির পৃথগভবনের সময় তাদের মধ্যবর্তী স্থানে বেমতন্তুর সৃষ্টি হতে থাকে—এইসব বেমতন্তু নিয়েই বেমযন্ত্র গঠিত হয়।

প্রোমেটাফেজ দশায় নিউক্লীয় পর্দা না থাকায় ক্রোমোসোমগুলি বেমতন্তুর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং বেমযন্ত্রের নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে যেতে থাকে।

মেটাফেজ দশায় ক্রোমোসোমগুলি বেমযন্ত্রের নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থান করে। এই দশায় দু রকম বেমতন্তু দেখা যায়—অবিচ্ছিন্ন তন্তু ও ক্রোমোসোমীয় তন্তু।

অ্যানাফেজ দশায় অপত্য ক্রোমোসোমগুলি বিপরীত মেরুর দিকে চলতে শুরু করে এবং তাদের মাঝখানে আন্তর্মণ্ডলীয় তন্তু বা ইণ্টারজোনাল ফাইবার নামে তৃতীয় একপ্রকার বেমতন্তুর আবির্ভাব ঘটে।

টেলোফেজ দশায় অপত্য ক্রোমোসোমগুলির প্যাঁচ খুলে তারা দীর্ঘ হয়; নিউক্লীয় পর্দা ও নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে।

সাইটোপ্লাজমের বিভাজন সাইটোকাইনেসিস নামে পরিচিত। প্রাণীদের ক্ষেত্রে কোষের মাঝ বরাবর (নিরক্ষীয় অঞ্চলে) একটি খাঁজ সৃষ্টির মাধ্যমে সাইটোকাইনেসিস ঘটে। উদ্ভিদকোষে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সেল প্লেট বা কোষ পাত গঠনের মাধ্যমে সাইটোকাইনেসিস ঘটে।

12. মাইটোটিক কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে; এককোষী জাইগোট বহুকোষী ভ্রূণে রূপান্তরিত হয়, পরিশেষে পরিণত জীবের আবির্ভাব ঘটে; দেহের ধ্বংসপ্রাপ্ত কোষগুলির পরিবর্তে নতুন কোষ সৃষ্টি হয়।

13. মায়োসিস প্রক্রিয়ার কোষ বিভাজনে একটি ডিপ্লয়েড কোষ থেকে চারটি হ্যাপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার কোষ বিভাজনে একটি কোষের পর-পর দু'বার বিভাজন ঘটে, কিন্তু সেই সময়ে ক্রোমোসোমের বিভাজন ঘটে মাত্র একবার। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জার্মিনাল কলায় মায়োটিক কোষ বিভাজন হয়।

মায়োসিসের প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাজন যথাক্রমে হ্রাসকরণ বিভাজন বা হেটেরোটাইপিক বিভাজন এবং সম-বিভাজন বা হোমিওটাইপিক বিভাজন নামে পরিচিত। প্রথম মায়োটিক বিভাজনের প্রোফেজ দশা বেশ দীর্ঘস্থায়ী এবং এই দশায় সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলির জোড়-বন্ধন ঘটে ও তাদের মধ্যে দেহাংশের বিনিময়ের মাধ্যমে জেনেটিক বস্তুর বিনিময় ঘটে। প্রোফেজ দশাটি লেপ্টোনিমা, জাইগোনিমা, প্যাকিনিমা, ডিপ্লোনিমা ও ডায়াকাইনেসিস নামে পাঁচটি উপদশায় বিভক্ত। সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলির জোড়-বন্ধন ঘটে জাইগোনিমা উপদশায়—

এর ফলে বাইভ্যালেন্ট বা চার ক্রোমাটিডবিশিষ্ট টেট্রাড সৃষ্টি হয়। জোড়বদ্ধ সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলির মাঝখানে সাইন্যাপটোনেমাল কম্‌প্লেক্স নামে একটি নিউক্লীয় বস্তু থাকে। প্যাকিনিমা উপদশায় প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টের নন্‌-সিস্টার ক্রোমাটিডগুলির মধ্যে ক্রসিং ওভার ঘটে। ডিপ্লোনিমা দশায় ক্রসিং ওভারের বাহ্যিক নিদর্শন রূপে কায়াস্‌মা দেখা যায়। এই উপদশায় বাই-ভ্যালেন্টের সাথী-দুটির মধ্যে বিকর্ষণের ফলে কায়াস্‌মাগুলির টার্মিনালাই-জেশন শুরু হয় অর্থাৎ তারা বাইভ্যালেন্টের প্রান্তের দিকে সরে যেতে শুরু করে। ডায়াকাইনেসিস উপদশায় ক্রোমোসোমগুলির ঘনীভবন পূর্বোক্ত উপদশা-গুলির তুলনায় অনেক বেশী হয় ; কিছু কায়াস্‌মাটা বাইভ্যালেন্টের প্রান্তসীমায় পৌঁছে যায় ; নিউক্লিওলাস অদৃশ্য হয় এবং নিউক্লীয় পর্দার বিলুপ্তি ঘটে। মায়োটিক কোষ বিভাজনের পরবর্তী ঘটনাগুলি মাইটোটিক কোষ বিভাজনের মতই।

14. মায়োসিস প্রক্রিয়ার কোষ বিভাজনের দ্বারা যৌন জননে সক্ষম জীবে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। এই প্রকার কোষ বিভাজনে পিতৃদত্ত ও মাতৃদত্ত ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে ক্রসিং ওভারের ফলে জীনের নতুন সমবায় ঘটে। এই ঘটনা এবং পিতৃদত্ত ও মাতৃদত্ত ক্রোমোসোমগুলির যথেচ্ছ পৃথগভবনের জন্য নানা রকম জেনেটিক কম্বিনেশনযুক্ত জননকোষ সৃষ্টি হয়, যা নতুন প্রকরণ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবের অভিব্যক্তিতে সাহায্য করে।

অনুশীলনী

(A) দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Long Answer type questions) :

1. সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোসোমের চিত্রসহ বর্ণনা দাও। [উঃ 3·3 দেখ]
2. চিত্রসহ ক্রোমোসোমের বহির্গঠন বর্ণনা কর। [উঃ 3·4 দেখ]
3. জীন সম্পর্কে যা জান লেখ। [উঃ 3·4B দেখ]
4. নিউক্লিক অ্যাসিডের রাসায়নিক প্রকৃতির বিবরণ দাও। [উঃ 3·4C দেখ]
5. মাইটোটিক কোষ বিভাজন কালে নিউক্লিয়াসের ভিতরকার ঘটনাবলীর বিবরণ দাও। [উঃ 3·5B(II) দেখ]
6. একটি প্রাণিকোষে প্রথম মায়োটিক বিভাজনের বর্ণনা দাও। [উঃ 3·5C(II) দেখ]
7. প্রাণিকোষে মাইটোটিক কোষ বিভাজনের বিভিন্ন দশার চিত্র অঙ্কন কর। [উঃ চিত্র 3·13 দেখ]
8. একটি প্রাণিকোষে প্রথম মায়োটিক বিভাজনের বিভিন্ন দশার চিত্র অঙ্কন কর। [উঃ চিত্র 3·16 দেখ]
9. মাইটোসিস ও মায়োসিসের তুলনা উল্লেখ কর। [উঃ 143 পৃষ্ঠা দেখ]

(B) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer type questions) :

1. ক্রোমোসোম কি? [উঃ 3·1 দেখ]

2. ডিপ্লয়েড কোষ ও হ্যাপ্লয়েড কোষ বলতে কি বোঝ? [উঃ 3·2 দেখ]
3. সেন্ট্রোমিয়ারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ 3·4(iv) দেখ]
4. প্রাথমিক সংকোচ ও গৌণ সংকোচের মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উঃ 115 পৃষ্ঠা দেখ]
5. ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোসোম কোথায় পাওয়া যায়? ঐ ক্রোমোসোমের গঠন বর্ণনা কর। [উঃ 121 পৃষ্ঠা দেখ]
6. পলিটিন ক্রোমোসোম কাকে বলে? ঐ ক্রোমোসোম কোথায় দেখা যায়? [উঃ 121 পৃষ্ঠা দেখ]
7. জননকোষ ও দেহকোষের পার্থক্য লেখ। [উঃ 122 পৃষ্ঠা দেখ]
8. DNA ও RNA-র পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 3·4C-এর শেষাংশ দেখ]
9. অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [উঃ 3·5A দেখ]
10. মাইটোটিক কোষ বিভাজন কাকে বলে? জীবদেহে কোথায় মাইটোসিস হয়? [উঃ 3·5B এবং 3·5B(I) দেখ]
11. ইন্টারফেজ দশা কাকে বলে? এই দশার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ 3·5B(II) দেখ]
12. মাইটোসিসের প্রোফেজ দশার বর্ণনা দাও। [উঃ 3·5B(II) দেখ]
13. প্রাণিকোষ ও উদ্ভিদকোষে সাইটোকাইনেসিস প্রক্রিয়ার পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 129 ও 130 পৃষ্ঠা দেখ]
14. মাইটোসিসের গুরুত্ব উল্লেখ কর। [উঃ 130 পৃষ্ঠা দেখ]
15. অ্যামাইটোসিসকে 'প্রত্যক্ষ' এবং মাইটোসিসকে 'অপ্রত্যক্ষ' কোষ বিভাজন বলা হয় কেন? [উঃ 124 ও 129 পৃষ্ঠা দেখ]
16. মাইটোসিসকে 'ইক্যুয়েশনাল ডিভিশন' এবং মায়োসিসকে 'রিডাকশনাল ডিভিশন' বলা হয় কেন? [উঃ 130 ও 133 পৃষ্ঠা দেখ]
17. অ্যাসট্রাল মাইটোসিস ও অ্যানাস্ট্রাল মাইটোসিস বলতে কি বোঝ? [উঃ 130 পৃষ্ঠা দেখ]
18. বেমতন্তু কয় প্রকার? এদের বিবরণ দাও। [উঃ 128 ও 129 পৃষ্ঠা দেখ]
19. অ্যানাফেজ দশায় অপত্য ক্রোমোসোমের মেরুর দিকে চলন সম্পর্কে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মতবাদ কোন্‌টি? মতবাদটি বিবৃত কর। [উঃ 128-129 পৃষ্ঠা দেখ]
20. মায়োটিক কোষ বিভাজন কোথায় কোথায় হয়? [উঃ 3·5C(I) দেখ]
21. ক্রমানুসারে প্রথম মায়োটিক বিভাজনের বিভিন্ন দশা ও উপদশার নাম লেখ। [উঃ 133 পৃষ্ঠা দেখ]
22. মায়োসিসের তাৎপর্য উল্লেখ কর। [উঃ 3·5C(III) দেখ]
23. টীকা লেখঃ—(i) ক্রোমাটিড (111 পৃষ্ঠা), (ii) ক্রোমোনিমা (111 পৃষ্ঠা), (iii) ক্রোমোমিয়ার (112 পৃষ্ঠা), (iv) মুখ্য সংকোচ (112 পৃষ্ঠা), (v) গৌণ সংকোচ (113 পৃষ্ঠা), (vi) স্যাটেলাইট বডি (114 পৃষ্ঠা),

(vii) টেলোমিয়ার (114 পৃষ্ঠা), (viii) জাইগোটিন (135 পৃষ্ঠা), (ix) সাইন্যাপসিস (135 পৃষ্ঠা), (x) বাইভ্যালেন্ট (137 পৃষ্ঠা), (xi) ক্রসিং ওভার (138 পৃষ্ঠা), (xii) কায়াসমাটা (139 পৃষ্ঠা), (xiii) টার্মিনালাইজেশন (139 পৃষ্ঠা), (xiv) সেক্স ক্রোমোসোম (108 পৃষ্ঠা), (xv) অটোসোম (108 পৃষ্ঠা), (xvi) আসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম (109 পৃষ্ঠা)।

(C) **অতি সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্ট উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন** (Very short or specific Answer type questions) :

1. মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার কোন্ অংশে থাকে? [উঃ 110 পৃষ্ঠা দেখ]
2. অ্যানাফেজ দশায় টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমের আকৃতি কি রকমের হয়? [উঃ 110 পৃষ্ঠা দেখ]
3. ক্রোমোসোমের গৌণ সংকোচের অপর নাম কি? [উঃ 113 পৃষ্ঠা দেখ]
4. স্যাটেলাইট বড়িযুক্ত ক্রোমোসোমকে কি নামে অভিহিত করা হয়? [উঃ 114 পৃষ্ঠা দেখ]
5. গৌণ সংকোচযুক্ত ক্রোমোসোমকে কি নামে অভিহিত করা হয়? [উঃ 113 পৃষ্ঠা দেখ]
6. টেলোমিয়ার কি? [উঃ 114 পৃষ্ঠা দেখ]
7. ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ক্রোমোসোমদেহে পেলিকলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে কি? [উঃ 114 পৃষ্ঠা দেখ]
8. নিউক্লিয়াসের মধ্যে জীন কোথায় থাকে? [উঃ 117 পৃষ্ঠা দেখ]
9. জীন কি দিয়ে গঠিত? [উঃ 118 পৃষ্ঠা দেখ]
10. নিউক্লিওটাইড ও নিউক্লিওসাইড কি? [উঃ 119 পৃষ্ঠা দেখ]
11. DNA-তে প্রাপ্ত পিউরিন বেসগুলির নাম লেখ। [উঃ 120 পৃষ্ঠা দেখ]
12. DNA-র পিরিমিডিন বেসগুলির নাম লেখ। [উঃ 120 পৃষ্ঠা দেখ]
13. RNA-তে 'থাইমিন'-এর পরিবর্তে কি থাকে? [উঃ 120 পৃষ্ঠা দেখ]
14. সোমাটিক ও জার্মিনাল কলায় কি প্রকার কোষ বিভাজন ঘটে? [উঃ 3·5B(I) দেখ]
15. মাইটোসিসের অপর নাম কি? [উঃ 124 পৃষ্ঠা দেখ]
16. ক্রোমোসোমাল ফাইবার কি? [উঃ 128 পৃষ্ঠা দেখ]
17. প্রাণিকোষ ও উদ্ভিদকোষের মাইটোটিক বিভাজনের দুটি পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 130 পৃষ্ঠা দেখ]
18. মায়োটিক প্রোফেজের নিম্নলিখিত উপদশাগুলিকে ক্রমানুসারে সাজাও :— প্যাকিটিন, লেপ্টোটিন, ডায়াকাইনেসিস, জাইগোটিন, ডিপ্লোটিন। [উঃ 134 পৃষ্ঠা দেখ]

19. সাইন্যাপসিস কোন্ উপদশায় ঘটে? [উঃ 137 পৃষ্ঠা দেখ]

20. মায়োসিসের কোন্ ঘটনার ফলে দুটি সমসংস্থ ক্রোমোসোমের মধ্যে জীনের বিনিময় ঘটে? [উঃ 137 ও 138 পৃষ্ঠা দেখ]

21. গ্যামেটিক মায়োসিস ও স্পোরিক মায়োসিস কি? [উঃ 133 পৃষ্ঠা দেখ]

22. **বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া সঠিক শব্দের সাহায্যে শূন্যস্থান পূর্ণ কর:**

A. উচ্চ শ্রেণীর জীবের গ্যামেট——কোষ (ডিপ্লয়েড/হ্যাপ্লয়েড)।

B. ক্রোমোসোমদেহে যে সরু সুতার মত অংশ থাকে তার নাম—— (ক্রোমোনিমা/ক্রোমোমিয়ার)।

C. RNA-তে —— শর্করা থাকে। (রাইবোজ/ডিঅক্সিরাইবোজ)।

D. কোষ বিভাজনের যে দশায় ক্রোমোসোমগুলি স্পিণ্ডলের নিরক্ষীয় অঞ্চলে থাকে, তার নাম——(অ্যানাফেজ/মেটাফেজ)।

E. একবার মায়োসিসের ফলে —— কোষ উৎপন্ন হয় (চারটি/আটটি)।

F. দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনকে —— বিভাজন বলে (হ্রাসকরণ/সম-)।

23. **নিচের বাক্যগুলির সঠিক অংশে '√' চিহ্ন দাও:**

A. অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি মাঝখানে/কোন এক প্রান্তের কাছে থাকে।

B. অভগ্ন ক্রোমোসোমের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণযুক্ত প্রান্তের নাম টেলো-মিয়ার/সেন্ট্রোমিয়ার।

C. DNA-তে ইউরাসিল থাকে/থাকে না।

D. কোষ বিভাজন জীনের/সেন্ট্রিওলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

E. 'ক্রসিং ওভার ঘটার জন্য কায়াস্‌মা সৃষ্টি হয়'/'কায়াস্‌মা সৃষ্টি হওয়ার জন্য ক্রসিং ওভার ঘটে'।

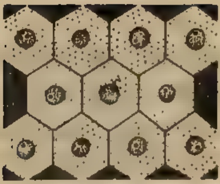

কলা
[TISSUE]

4

Syllabus : Tissue : General idea about tissues in plants and animals—outline only.

(a) Plant tissues—occurrence, functions and classification—meristematic, permanent, simple and complex.

(b) Animal tissues—occurrence, functions and outline idea of epithelial, connective, muscular, nervous and secretory tissue.

Blood as a fluid connective tissue : (mention only) its components—plasma, types of blood cells, haemoglobin and haemocyanin.

4.1. সূচনা (Introduction)

জীবদেহ কোষের সমন্বয়ে গঠিত।

একটিমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের যথাক্রমে **এককোষী উদ্ভিদ** ও **এককোষী প্রাণী** বলে। ঐ একটিমাত্র কোষের দ্বারাই উক্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীরা নিজেদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ—যেমন পুষ্টি, শ্বসন, রেচন, জনন প্রভৃতি সমাধা করে। বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় অন্যরকম ব্যবস্থা। তাদের দেহের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পন্ন করে। তাদের দেহে নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট ধরনের কোষসমূহ দায়ী থাকে। এর ফলেই জীবদেহে বিভিন্ন কোষের মধ্যে কার্যগত শ্রমবিন্যাস সাধিত হয়েছে।

কোষের প্রকারভেদ উন্নততর জীবে খুবই প্রয়োজনীয়। কোষগুলি একত্রিত হয়েই গঠন করে কলা। এই কলা শ্বসন, চলন, পুষ্টি ইত্যাদি জৈবনিক কার্য বিভিন্নরূপে সমাধা করে জীবদের সকল কাজের প্রকাশ ঘটায়। বিশেষ কাজ করার জন্য কোষ যে কোনভাবেই পরিবর্তিত হোক-না-কেন প্রতিটি কোষই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নিজ নিজ স্বাধীন অন্তঃকোষীয় জৈবনিক কাজ বজায় রাখে। নিষিক্ত ডিমের বিভাজনের ফলেই উৎপন্ন হয় সকল কোষ, যদিও প্রতিটি কলা গঠন ও কাজে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

উদ্ভিদ কলা (Plant Tissues)

● কলা কাকে বলে ? (What is a tissue ?)

একই রকম অথবা বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট কোষের সমষ্টিকে বলে **কলা** (**Tissue**)। ল্যাটিন শব্দ **Texo** (=বয়ন করা) হতে **Tissue** শব্দটির উৎপত্তি।

কোষগুলি একই বা বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট হলেও তাদের উৎপত্তি একইভাবে হয়। তারা একসঙ্গে থেকে একই রকমের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সমাধা করে। কলার কোষগুলি ঘন সন্নিবদ্ধভাবে অবস্থান করতে পারে অথবা কোষের মাঝে মাঝে রন্ধ্র

থাকতে পারে। কোষগুলির মধ্যবর্তী উক্ত রন্ধ্রকে বলে **আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র** (intercellular space)। উদ্ভিদদেহে ঐ আন্তঃকোষীয় রন্ধ্রগুলি পরস্পর যুক্ত থেকে গঠন করে রন্ধ্র-জালিকা। এই রন্ধ্র-জালিকার মধ্যে জল, বাতাস অথবা গঁদ, রজন, বান তৈল নামক বিভিন্ন রকমের বর্জ্য পদার্থ সঞ্চিত থাকতে পারে।

> ● **একই উৎপত্তিস্থল থেকে উৎপন্ন একই ধরনের কোষসমষ্টি অথবা মিশ্র ধরনের কোষসমষ্টি সম্ববন্ধ ভাবে যদি একই ধরনের কাজ করে, তবে ঐসব কোষসমষ্টিকে কলা বা টিস্যু বলে।**

4.2. উদ্ভিদ কলার শ্রেণীবিন্যাস (Classification of Plant Tissues)

প্রকৃতি, অবস্থান, উৎপত্তি ও কার্যের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ কলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

(I) **ভাজক কলা** (Meristematic Tissue)

(II) **স্থায়ী কলা** (Permanent Tissue)

4.2.(I) ভাজক কলা (Meristematic Tissue)

সংজ্ঞা (Definition) **:** যে কলা সাধারণত অপরিণত কোষ দ্বারা গঠিত এবং কোষগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে নতুন অপত্য কোষের সৃষ্টি করে, সেই কলাকে **ভাজক কলা** বা **মেরিস্টেম** (meristem) বলে। **গ্রীক শব্দ Meristos** (=to divide=বিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন) হতে মেরিস্টেম শব্দটির উৎপত্তি।

গঠন (Structure) **:** (i) ভাজক কলার কোষগুলি দেখতে অনেকটা গোলাকার, ডিম্বাকার বা বহুভুজাকার (চিত্র 4.1)। (ii) ক্ষুদ্রাকার কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে অবস্থান করে। তাই কোষান্তর রন্ধ্রবিহীন হয়। (iii) কোষগুলি জীবিত এবং ঘন দানাদার সাইটোপ্লাজম পূর্ণ হওয়ায় কোন কোষগহ্বর থাকে না। প্রতিটি কোষে একটি বড় সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে। কোনও অজীবীয় পদার্থ সাইটোপ্লাজমে থাকে না। তবে সাইটোপ্লাজমে প্রোপ্লাস্টিড (Proplastid) থাকে। (iv) কোষপ্রাচীর খুবই পাতলা, সমসত্ব এবং সেলুলোজ দ্বারা গঠিত।

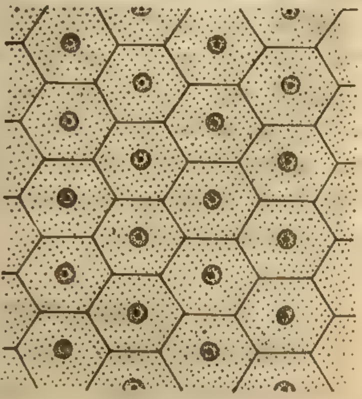

চিত্র 4.1 : আদর্শ ভাজক কলা।

মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে যে ভাজক কলা থাকে, তাকে বলে **আদি ভাজক কলা** বা **প্রোমেরিস্টেম** (Promeristem)।

অবস্থিতি (Location) **:** উদ্ভিদদেহের মূল, কাণ্ড ও পাতার অগ্রভাগে ভাজক কলা থাকে। অনেক সময় ভাজক কলা মূল ও কাণ্ডের ধারের দিকে এবং কখনও কখনও স্থায়ী কলার মাঝখানে নিবেশিত ভাবে অবস্থান করে।

কার্য (Function) **:** ভাজক কলা উদ্ভিদদেহে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, ফলে উদ্ভিদ অঙ্গের সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে।

ভাজক কলার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Meristematic Tissue) **:** উৎপত্তি, অবস্থান ও কার্য অনুসারে ভাজক কলার শ্রেণীবিভাগ করা হয়, যথা—

(a) **উৎপত্তি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ** (Classification according to origin) **:**

1. **প্রাথমিক ভাজক কলা** (Primary Meristematic Tissue) **:** এই ধরনের কলা ভ্রূণ অবস্থা থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত উদ্ভিদদেহের মূল, কাণ্ড, পাতা ইত্যাদির বর্ধিষ্ণু অংশে থাকে। প্রাথমিক ভাজক কলা সব সময় বিভাজন ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। ব্যক্তবীজী এবং দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উদ্ভিদের নালিকা বাণ্ডিলের অন্তর্গত ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম এক ধরনের প্রাথমিক ভাজক কলা।

2. **গৌণ ভাজক কলা** (Secondary Meristem) **:** অনেক সময় স্থায়ী কলা পরিবর্তিত হয়ে ভাজক কলায় পরিণত হয় এবং তাদের কোষগুলি বিভাজনক্ষম হয়। এই ধরনের কলাকেই বলে **গৌণ ভাজক কলা**। এই কলা উদ্ভিদের গৌণবৃদ্ধি ও ক্ষত নিরাময়ের (repair) কাজ করে।

উদাহরণ : ইণ্টার ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম (Inter-fascicular Cambium) এবং ফেলোজেন (Phellogen) বা কর্ক ক্যাম্বিয়াম (Cork Cambium)।

(b) **অবস্থান অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ** (Classification according to position) **:**

অবস্থান অনুযায়ী প্রাথমিক ভাজক কলাকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় (চিত্র 4.2)। যথা—

1. **অগ্রস্থ ভাজক কলা** (Apical Meristem) **:** এই কলা মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে অবস্থিত। এটি আদি বা মূল ভাজক কলা (Promeristem) নামেও অভিহিত হয়। এই কলার কোষগুলি বিভাজিত হয়ে গঠন করে প্রাথমিক স্থায়ী কলা।

কার্য : উদ্ভিদ অঙ্গের দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ঘটায়।

2. **নিবেশিত ভাজক কলা** (Intercalary Meristem) **:** দু খণ্ড স্থায়ী কলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে নিবেশিত ভাজক কলা থাকে। এই কলার উৎপত্তি অগ্রস্থ ভাজক কলা থেকে। একবীজপত্রী ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ **ইকুইজিটাম** (*Equisetum*)-এর পত্রমূলে এবং পর্বমধ্যে এই জাতীয় কলা দেখা যায়। এদের অস্থায়ী ভাজক কলা রূপে গণ্য করা হয় ; কারণ এরা পরে স্থায়ী কলায় পরিণত হয়।

কার্য : সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ অঙ্গের দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ঘটায়।

3. পার্শ্বস্থ ভাজক কলা (Lateral Meristem) **:**

এই ধরনের কলা দ্বিবীজপত্রী ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের পার্শ্বদেশে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। নালিকা বাণ্ডিলের মধ্যস্থিত ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম পার্শ্বস্থ ভাজক কলার উদাহরণ।

কার্য : মূল ও কাণ্ডের পরিধির বৃদ্ধি ঘটায়।

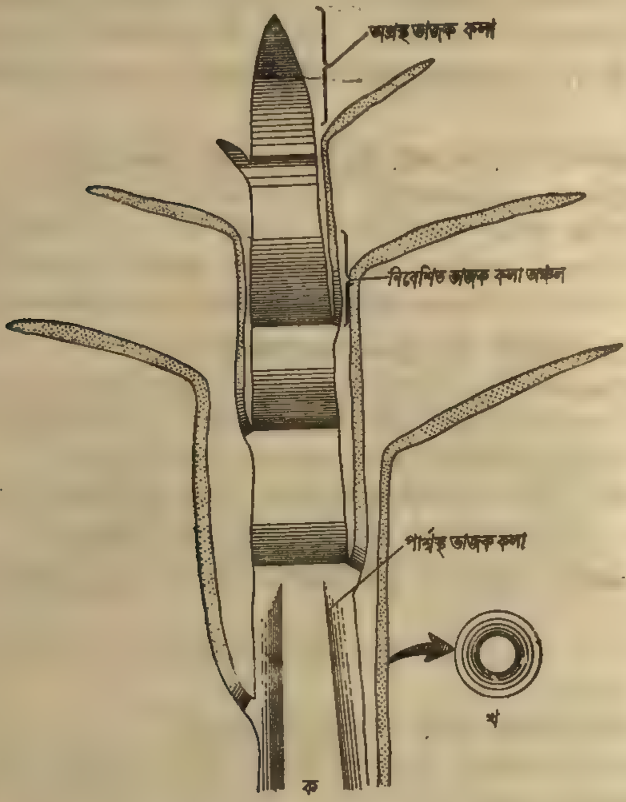

চিত্র 4.2 : অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন ভাজক কলা দেখানো হয়েছে :
(ক) লম্বচ্ছেদের দৃশ্য, (খ) প্রস্থচ্ছেদের দৃশ্য।

(c) **কার্য অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ** (Classification according to function) **:**

1. **প্রোটোডার্ম** (Protoderm) **:** ভাজক কলার সবচেয়ে বাইরের স্তর নিয়ে গঠিত, এই কলার কোষগুলি অরীয়ভাবে (radially) বিভাজিত হয়ে কাণ্ড, মূল ইত্যাদির ত্বক গঠন করে।

2. **প্রোক্যাম্বিয়াম** (Procambium) **:** ভাজক কলার এই স্তর লম্বাটে ও সুচালো কোষ দিয়ে গঠিত। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে আলাদা আলাদা

খণ্ডাংশে আবর্তাকারে অবস্থান করে, কিন্তু একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে খণ্ডাংশগুলি বিক্ষিপ্তভাবে সাজানো থাকে। এক-একটি অংশ পরবর্তী কালে নালিকা বাণ্ডিল গঠন করে।

3. **আদি বা গ্রাউণ্ড মেরিস্টেম** (Fundamental or Ground Meristem) **:** ভাজক কলার প্রোটোডার্ম ও প্রোক্যাম্বিয়াম ব্যতীত বাকী অংশ নিয়ে এই কলার স্তর গঠিত। এই কলাস্তর হতেই গঠিত হয় বহিঃস্তর, মজ্জাংশু ও মজ্জা।

1890 খ্রীষ্টাব্দে **হ্যাবারল্যান্ড** (Haberland) ভাজক কলাকে কার্য অনুযায়ী উপরিউক্ত তিনটি ভাগে ভাগ করেন।

● প্রাথমিক ভাজক কলা থেকে অন্যান্য কলার উৎপত্তি :

তিনটি অঞ্চল নিয়ে প্রাথমিক ভাজক কলা গঠিত (চিত্র 4.3)। বাইরের দিক হতে ভিতরের দিকে অবস্থিত পর পর অঞ্চল তিনটি (চিত্র 4.4) হল :

(i) **ডার্মাটোজেন** (Dermatogen)
(ii) **পেরিব্লেম** (Periblem)
(iii) **প্লিরোম** (Plerome)

(i) **ডার্মাটোজেন :** এটি সবচেয়ে বাইরের অঞ্চল। একসারি কোষ দ্বারা গঠিত এই অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয় উদ্ভিদ-দেহের বহিঃত্বক।

(ii) **পেরিব্লেম :** ডার্মাটোজেনের পরের বহুস্তর কোষ দ্বারা গঠিত অঞ্চল।

চিত্র 4.3 : বিটপের অগ্রাংশের লম্বচ্ছেদ – বিভিন্ন ভাজক কলার উৎপত্তি অনুযায়ী অবস্থান দেখানো হয়েছে।

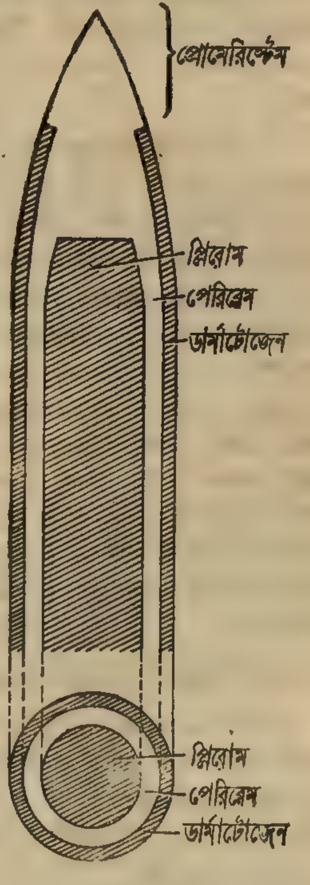

চিত্র 4.4 : বিটপের অগ্রাংশের লম্বচ্ছেদে বিভিন্ন কলা উৎপাদক অঞ্চল বা হিস্টোজেন দেখানো হয়েছে। উপরে লম্বচ্ছেদের দৃশ্য এবং নিচে প্রস্থচ্ছেদের দৃশ্য।

এটি ডার্মাটোজেন ও প্লিরোমের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই অংশ হতে কান্ডের অধঃত্বক, বহিঃস্তর ও অন্তস্ত্বক গঠিত হয়।

(iii) **প্লিরোম** : কান্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এটি প্রাথমিক ভাজক কলার কেন্দ্রীয় অঞ্চল। বহুস্তর কোষ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। প্লিরোম অঞ্চল থেকে শিরাত্মক কলাসমষ্টি ও মজ্জা গঠিত হয়।

(d) **কোষ বিভাজনের তল অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ** (Classification according to plane of cell division) : কোষ বিভাজনের তল অনুযায়ী ভাজক কলাকে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

1. **পুঞ্জীভূত ভাজক কলা** (Mass meristem) : এক্ষেত্রে ভাজক কলার কোষগুলি সব দিকের তলেই বিভাজিত হয়, যার ফলে গঠিত হয় অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত কোষপুঞ্জ। উদাহরণ : কয়েকটি উদ্ভিদের সস্য, অপরিণত মজ্জা, কর্টেক্স প্রভৃতি।

2. **পশুর্কা ভাজক কলা** (Rib meristem) : এক্ষেত্রে ভাজক কলার কোষগুলি শুধুমাত্র একটি তলে বিভাজিত হয়, ফলে অনেক কোষ নিয়ে গঠিত কতিপয় স্তম্ভ বা সারি গঠিত হয়, যার ফলে উদ্ভিদের অঙ্গগুলি দৈর্ঘ্যে বাড়ে। উদাহরণ : অপরিণত মূল ও কান্ডের কর্টেক্স ও মজ্জার পরিস্ফুটন।

3. **চ্যাটাল ভাজক কলা** (Plate meristem) : এক্ষেত্রে ভাজক কলার কোষগুলি দুটি তলে বিভাজিত হয়, ফলে দেখতে চ্যাটাল বা প্লেটের মত হয়। উদাহরণ : একস্তরযুক্ত ত্বকের উৎপত্তি।

মূলের প্রাথমিক ভাজক কলাতেও কান্ডের মত উপরিউক্ত তিনটি অঞ্চল দেখা যায়। কিন্তু মূলের অগ্রস্থ ভাজক কলার সামনে বহু কোষস্তরবিশিষ্ট **মূলত্র** (root cap) অবস্থান করে। এই মূলত্র উৎপন্ন হয় **ক্যালিপট্রোজেন** (Calyptrogen) নামক কলা থেকে। এই ক্যালিপট্রোজেন একস্তরযুক্ত ডার্মাটোজেন ও পেরিব্লেমের সঙ্গে মিশে উৎপন্ন হয়। মূলের ক্ষেত্রে ডার্মাটোজেন থেকে মূলত্বক (epiblema), প্লিরোম থেকে কেন্দ্রস্তম্ভ (stele) এবং পেরিব্লেম থেকে বহিঃস্তর (cortex) সৃষ্টি হয়।

4.2 (II) স্থায়ী কলা (Permanent tissue)

সংজ্ঞা (Definition) : যে কলার কোষগুলি বিভাজিত হয় না সেই কলাকে **স্থায়ী কলা** বলে। ভাজক কলা থেকেই সৃষ্টি হয় স্থায়ী কলা।

গঠন (Structure) : (i) মৃত এবং জীবিত—উভয় প্রকার কোষ দ্বারাই স্থায়ী কলা গঠিত এবং কোষগুলি নির্দিষ্ট আকৃতিবিশিষ্ট হয়। (ii) মৃত কোষগুলি প্রোটোপ্লাজমবিহীন। ভ্যাকুওলবিশিষ্ট জীবিত কোষগুলি আকারে বেশ বড় হয়। (iii) কোষের কোষপ্রাচীর পাতলা বা পুরু হয়। (iv) কোষপ্রাচীর পাতলা হলে সেলুলোজ নামক রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা গঠিত হয়। (v) পাতলা কোষপ্রাচীরের গাত্রে নানা ধরনের কোষপ্রাচীর গঠনকারী বস্তু স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে পাতলা

কোষপ্রাচীরকে স্থূল করে। নানা রকম কারুকার্য স্থূল কোষপ্রাচীরের গাত্রে দেখা যায়।

● ভাজক কলা এবং স্থায়ী কলার মধ্যে পার্থক্য :

ভাজক কলা	স্থায়ী কলা
1. ভাজক কলা উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঞ্চলে যেমন কান্ড ও মূলের অগ্রভাগে অবস্থিত।	1. স্থায়ী কলা উদ্ভিদের কান্ড ও মূলের কেন্দ্রস্তম্ভে ও বহিঃস্তরে অবস্থিত।
2. এই কলার কোষগুলি বিভাজনে সক্ষম।	2. এই কলার কোষগুলি বিভাজনে অক্ষম অর্থাৎ কোষগুলি বিভাজিত হয় না।
3. এই কলা কোষান্তর রন্ধ্রবিহীন।	3. এই কলা সাধারণত কোষান্তর রন্ধ্র-যুক্ত। কিন্তু স্ক্লেরেনকাইমা কলায় কোষান্তর রন্ধ্র থাকে না।
4. ভাজক কলার কোষগুলিতে সাধারণত ভ্যাকুওল থাকে না; সম্পূর্ণ প্রোটোপ্লাস্ট দিয়ে ভর্তি থাকে। কোষগুলি সজীব। কোষের কোষপ্রাচীর পাতলা এবং সেলুলোজ দিয়ে গঠিত।	4. স্থায়ী কলার কোষগুলিতে ভ্যাকুওল থাকে। স্থায়ী কলার কোষগুলি মৃত এবং জীবিত—উভয় প্রকারের হতে পারে। কোষের কোষপ্রাচীর পাতলা বা পুরু দু রকমেরই হতে পারে।
5. অবস্থান অনুযায়ী ভাজক কলা তিন প্রকারের, যথা—অগ্রস্থ ভাজক কলা, পার্শ্বস্থ ভাজক কলা, নিবেশিত ভাজক কলা। কার্য অনুযায়ী ভাজক কলাকে প্রোটোডার্ম, প্রোক্যাম্বিয়াম ও গ্রাউন্ড মেরিস্টেমে ভাগ করা হয়। তাছাড়া, উৎপত্তি অনুযায়ী ভাজক কলা হয় প্রাথমিক এবং গৌণ।	5. স্থায়ী কলাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়, যথা—সরল কলা, জটিল কলা ও বিশেষ কলা। সরল স্থায়ী কলা আবার তিন প্রকারের হয়, যথা—প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা। জাইলেম ও ফ্লোয়েম জটিল কলার উদাহরণ। গ্রন্থিরোম, তরুক্ষীর নালী ইত্যাদি বিশেষ কলার উদাহরণ।
6. এই কলার প্রধান কাজ উদ্ভিদের দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বৃদ্ধি ঘটানো, যার ফলে উদ্ভিদ অঙ্গের সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে। তাছাড়া, স্থায়ী কলা সৃষ্টি করাও এই কলার কাজ।	6. এই কলার কাজ খাদ্য উৎপাদন, জল, খনিজ লবণ ও খাদ্য সংবহন এবং খাদ্য সঞ্চয় ও উদ্ভিদ অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা।

যে স্থায়ী কলা প্রাথমিক ভাজক কলা হতে উৎপন্ন হয়, তাদের **প্রাথমিক স্থায়ী কলা** বলে। আবার গোণ ভাজক কলা হতে উৎপন্ন স্থায়ী কলাকে বলে **গৌণ স্থায়ী কলা**।

শ্রেণীবিভাগ (Classification) **:** স্থায়ী কলাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

(a) **সরল কলা** (Simple tissue)
(b) **জটিল কলা** (Complex tissue)
(c) **বিশেষ কলা** (Special tissue)

(a) **সরল কলা** (Simple tissue) **:** মাত্র একপ্রকার কোষ দ্বারা গঠিত স্থায়ী কলাকে বলে **সরল কলা**। সরল কলা আবার তিন রকমের, যথা—

(i) **প্যারেনকাইমা** (Parenchyma)
(ii) **কোলেনকাইমা** (Collenchyma)
(iii) **স্ক্লেরেনকাইমা** (Sclerenchyma)

(i) **প্যারেনকাইমা** (Parenchyma) **:**

গঠন (Structure) **:** (i) সজীব কোষ দ্বারা এই কলা গঠিত। (ii) কোষগুলি দেখতে গোলাকার, ডিম্বাকার বা বহুভুজাকার (চিত্র 4.5)। (iii) কোষপ্রাচীর সাধারণত খুবই পাতলা এবং সেলুলোজ দিয়ে নির্মিত। কখনও কখনও কোষপ্রাচীর স্থূল হয়। প্রাচীরে প্রাথমিক কূপ ক্ষেত্র (primary pit field) থাকতে পারে। যেমন—ভান্ডার কোষ, জাইলেম প্যারেনকাইমা কোষের কোষপ্রাচীর। (iv) ঘন সাইটোপ্লাজম দ্বারা কোষগুলি পূর্ণ থাকে। (v) কোষগুলি কোষান্তর

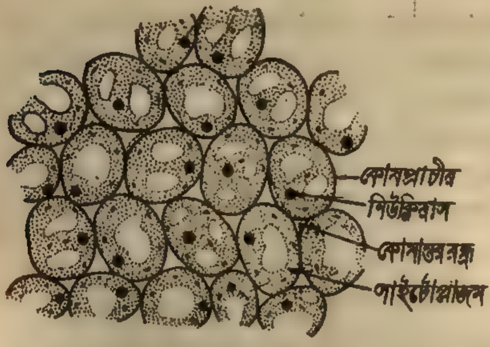

চিত্র 4.5 : স্থায়ী কলা—প্যারেনকাইমা (প্রস্থচ্ছেদ)।

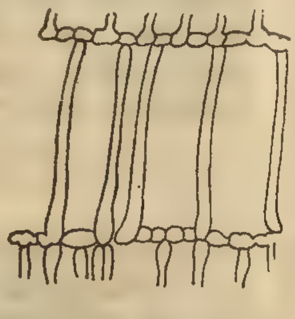
চিত্র 4.6 : এরেনকাইমা।

রন্ধ্রযুক্ত হয়। (vi) উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গের প্যারেনকাইমা কোষে, যথা—পাতা, কান্ড প্রভৃতিতে ক্লোরোপ্লাসটিড থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষকে বলে **ক্লোরেনকাইমা** (Chlorenchyma)। যে সমস্ত প্যারেনকাইমা কোষ ক্লোরেনকাইমা প্রকৃতির—তারা সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে। (vii) অনেক সময় লম্বাটে প্যারেনকাইমা কোষগুলির উভয় প্রান্ত ক্রমশ সরু হয়। এইরূপ ক্রমশ সরু

প্রান্তবিশিষ্ট লম্বাটে প্যারেনকাইমা কোষকে **প্রোজেনকাইমা** (Prosenchyma) বলে। (viii) উদ্ভিদের মূলের প্যারেনকাইমা কোষে এবং ভান্ডার কোষে লিউকোপ্লাস্ট থাকে। আবার কোন কোন প্যারেনকাইমা কোষে তেল, ট্যানিন, কেলাস ইত্যাদি কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ সঞ্চিত থাকতে পারে। তখন এই ধরনের প্যারেনকাইমা কোষকে বলে **ইডিওব্লাস্ট** (Idioblast)। (ix) অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত জলজ উদ্ভিদে, কোষান্তর রন্ধ্র খুব বড় হয়। ঐ রন্ধ্রগুলিতে বায়ু সঞ্চিত থাকায় তাদের **বাতাবকাশ** বলে। বাতাবকাশযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষগুলিকে **এরেনকাইমা** (Aerenchyma) (চিত্র 4.6) বলে। আকৃতিতে এরেনকাইমা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এরেনকাইমা দেখা যায় শালুক, কচু, কলা প্রভৃতি পাতার বৃন্তে।

অবস্থিতি (Distribution) **:** উদ্ভিদদেহের সব জায়গায় প্যারেনকাইমা পাওয়া যায়। কান্ডের ত্বক, বহিঃস্তর, মজ্জা, পরিচক্র, মূল ও পাতার মেসোফিল অংশ, বীজের ভ্রূণ ও সস্য ইত্যাদি প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত।

কার্য (Function) **:**

(i) ক্লোরোফিলযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষ খাদ্য তৈরি করে।
(ii) মূল, ফল, বীজ ইত্যাদির প্যারেনকাইমা কোষ খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে।
(iii) জাইলেম কলার সাহায্যে খাদ্য সংবহন করাও প্যারেনকাইমার কাজ বলে গণ্য হয়।
(iv) ত্বকের প্যারেনকাইমার কাজ উদ্ভিদদেহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করা।
(v) ক্ষতস্থান মেরামত করা, বিনষ্ট অংশের পুনঃসৃষ্টি (regeneration), মুকুল দ্বারা বংশবিস্তার প্রভৃতিতে প্যারেনকাইমা সাহায্য করে।
(vi) এরেনকাইমার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বায়ু সঞ্চিত থাকায় জলজ উদ্ভিদকে জলে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।

(ii) **কোলেনকাইমা** (Collenchyma) **:**

গঠন (Structure) **:** (i) এই কলার কোষগুলি সজীব। (ii) কোষগুলি দেখতে লম্বা ও বেলনাকার। আয়তনে অনেকটা প্যারেনকাইমা কোষের মত। (iii) অনেক

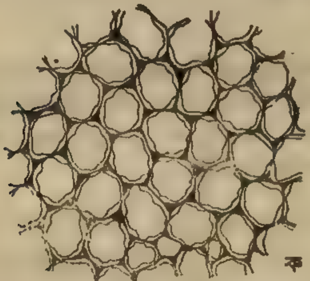

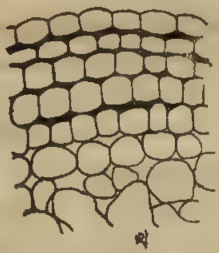

চিত্র 4.7 : স্থায়ী কলা—বিভিন্ন প্রকার কোলেনকাইমা।
(ক) কৌণিক, (খ) স্তরীভূত।

সময় কোলেনকাইমা কোষের অগ্রভাগ স্ক্লেরেনকাইমা কোষের মত সূচালো হয় ও

সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকে। প্রস্থচ্ছেদে কোষগুলিকে বহুভুজাকার দেখায়। (iv) কোষগুলিতে ভ্যাকুওলযুক্ত প্রোটোপ্লাজম বর্তমান। (v) কোলেনকাইমার সাইটোপ্লাজমে ক্লোরোপ্লাসটিড থাকতে পারে। (vi) এই কলায় কোষান্তর রন্ধ্র থাকে এবং কোষপ্রাচীরগুলি অনিয়মিতভাবে স্থূল হয়। (vii) কোষের কোণগুলিতে অতিরিক্ত সেলুলোজ ও পেকটিন সঞ্চিত থাকায় এদের কোণগুলি হয় পুরু। তাই প্রস্থচ্ছেদে এদের বহু কোণবিশিষ্ট দেখায়। (viii) কোষের কোষপ্রাচীর সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ও পেকটিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। কোষ-প্রাচীরে কখনই লিগনিন থাকে না।

চিত্র 4.8 : স্থায়ী কলা—কৌণিক কোলেনকাইমা (অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদ)।

কোলেনকাইমা কলার কোষপ্রাচীরের পাতলা ও স্থূল অংশগুলি অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদে স্পষ্ট দেখা যায় (চিত্র 4.8)। **ইসাও** (Esao) **1965** খ্রীষ্টাব্দে কোলেনকাইমা কলাকে পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট ও দৃঢ়তা প্রদানকারী কাজের জন্য বিশেষভাবে গঠিত এক ধরনের প্যারেনকাইমা কলা হিসেবে ব্যক্ত করেন।

প্রকারভেদ (Types)**:** এই কলার কোষপ্রাচীরে বিচ্ছিন্নভাবে সেলুলোজ ও পেকটিন সঞ্চিত হওয়ার ফলে এরা তিন প্রকারের হয়। যথা—

(a) **কৌণিক কোলেনকাইমা** (Angular collenchyma) **:** এই ধরনের কোলেনকাইমা কোষের কোণগুলিই কেবলমাত্র স্থূল। কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্টভাবে অবস্থান করে, কোন কোষান্তর রন্ধ্র থাকে না (চিত্র 4.7ক)। উদাহরণ : কুমড়া, ধুতুরা ইত্যাদি উদ্ভিদের কান্ড।

(b) **কূপাকৃতি কোলেনকাইমা** (Lacunate collenchyma) **:** এই ধরনের কোলেনকাইমায় কোষান্তর রন্ধ্রগুলি বড় হয়। কোষান্তর রন্ধ্র-সংলগ্ন স্থানের কোষপ্রাচীর অংশে স্থূলীকরণ দেখা যায়। উদাহরণ : আকন্দ, ভুঁইতুলসী ইত্যাদি উদ্ভিদের কান্ড।

(c) **স্তরীভূত কোলেনকাইমা** (Lamellar collenchyma) **:** কোষগুলি খুবই ঘনসন্নিবিষ্টভাবে থাকে এবং কোষান্তর রন্ধ্রবিহীন হয়। কোষপ্রাচীরের স্থূলীভবন পৃষ্ঠপ্রাচীরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে নির্দিষ্ট স্তরে হয় (চিত্র 4.7খ)। উদাহরণ : র‍্যামনাস, গ্যাম্বুকাস ইত্যাদি উদ্ভিদের কান্ড।

অবস্থিতি (Distribution) **:** কোলেনকাইমা কলা কান্ড, পত্রবৃন্ত, পুষ্পবৃন্ত, পাতা ইত্যাদি বর্ধনশীল অঙ্গে বহিঃস্তরের নিচে অবিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছিন্ন স্তররূপে অবস্থান করে ; উক্ত স্তরকে বলে **অধঃত্বক**। সূর্যমুখী কান্ডের অধঃত্বক কোলেন-কাইমা কলা দ্বারা গঠিত। কোলেনকাইমা কলা সাধারণত মূলে এবং একবীজপত্রী উদ্ভিদের কান্ড ও পাতায় থাকে না।

কার্য (Function) : (i) কোলেনকাইমা কলা উদ্ভিদের কোমল অঙ্গসমূহকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করে।

(ii) কোলেনকাইমা কোষগুলিতে ক্লোরোপ্লাসটিড থাকলে সেগুলি খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে।

ক্লোরেনকাইমা ও কোলেনকাইমার মধ্যে পার্থক্য
(Differences between Chlorenchyma and Collenchyma)

ক্লোরেনকাইমা	কোলেনকাইমা
1. এরা ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষ।	1. এই কলার কোষ ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত অথবা ক্লোরোপ্লাস্টবিহীন।
2. এই কোষগুলি অনেকটা গোলাকার।	2. এই কোষগুলি লম্বাটে এবং প্রস্থচ্ছেদে কোণাকৃতি।
3. এই কোষগুলি একত্র সংবদ্ধ নয়।	3. এই কোষগুলি তাদের অনুপ্রস্থ কোষপ্রাচীর দ্বারা একত্র সংবদ্ধ থাকে।
4. কোষপ্রাচীর সর্বত্র সমভাবে পাতলা।	4. কোষপ্রাচীর অসমানভাবে পুরু।
5. কোষপ্রাচীর নমনীয়।	5. কোষপ্রাচীর দৃঢ়।
6. সালোকসংশ্লেষ ও খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা এই কোষগুলির কাজ।	6. খাদ্য সঞ্চয় এবং উদ্ভিদদেহকে দৃঢ়তা প্রদান করা এই কোষগুলির কাজ।

(iii) **স্ক্লেরেনকাইমা** (Sclerenchyma) : (i) স্ক্লেরেনকাইমা কলার কোষগুলির প্রাচীর অত্যন্ত স্থূল ও লিগনিনযুক্ত, তাই খুব কঠিন।

(ii) কোষগুলির প্রোটোপ্লাজম বিনষ্ট হওয়ার ফলে কোষগুলি মৃত।

(iii) কোষগুলি স্বল্প গহ্বরবিশিষ্ট।

(iv) কোষপ্রাচীর সরল ও সপাড় উভয় ধরনের কূপযুক্ত।

(v) স্ক্লেরেনকাইমা কোষগুলির আকার ও আয়তন বিভিন্ন রকমের হয়।

স্ক্লেরেনকাইমা কলার কোষগুলিকে প্রধানত নিম্নলিখিত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :

(1) **স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু** এবং (2) **স্ক্লেরোটিক কোষ বা স্ক্লেরাইড**।

(1) **স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু** (Sclerenchyma fibre) :

গঠন (Structure) : (i) স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুর কোষগুলি খুব লম্বা ও সরু এবং দৈর্ঘ্য প্রায় 50 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। কোষগুলির প্রান্তভাগ সূচালো (চিত্র 4.9গ)। (ii) কোষপ্রাচীর স্থূল, কোষ-মধ্যস্থ গহ্বর খুবই ক্ষুদ্র। কোষপ্রাচীর সরল ও সপাড় কূপযুক্ত। (iii) অপরিণত অবস্থায় স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুর কলার কোষে প্রোটোপ্লাস্ট থাকে, কিন্তু পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রোটোপ্লাস্ট বিনষ্ট হয়।

প্রোটোপ্লাস্টবিহীন কোষগুলি মৃত। (iv) প্রস্থচ্ছেদে কোষগুলিকে ষড়ভুজের মত দেখায় (চিত্র 4.9ক)।

অবস্থিতি (Distribution) : স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু কাণ্ডের অধঃত্বক ও পরিচক্রে থাকে। তাছাড়া, এরা নালিকা বাণ্ডিলের আবরণী বা বাণ্ডিল টুপিও গঠন করে।

কার্য (Function) : উদ্ভিদ অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করে। পাট, শণ প্রভৃতির আঁশ প্রকৃতপক্ষে স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু।

(2) স্ক্লেরোটিক কোষ বা স্ক্লেরাইড (Sclerotic cell or Sclereid) :

গঠন (Structure) : (i) নাশপাতি, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের ত্বকে সমব্যাসযুক্ত (চিত্র 4.9খ), দণ্ডাকার (চিত্র 4.10ক), বৃত্তাকার, তারকার মত অথবা স্তম্ভাকার স্ক্লেরেনকাইমা কোষ থাকে, এদের **স্ক্লেরাইড** বা **স্ক্লেরোটিক কোষ** বলে। (ii) কোষপ্রাচীর লিগনিন, সুবেরিন, কিউটিনযুক্ত হওয়ায় খুব স্থূল ও দৃঢ় হয়। (iii) কোষপ্রাচীরে অসংখ্য সরল কূপ নালিকা থাকে। কূপ নালিকাগুলি শাখাযুক্তও হয়। (iv) কোষগুলি প্রোটোপ্লাস্টবিহীন হওয়ায় মৃত। কোষের গহ্বর খুবই ছোট। (v) কোষপ্রাচীর খুব শক্ত হওয়ায় স্ক্লেরাইডকে **প্রস্তর কোষ** (stone cell)-ও বলে।

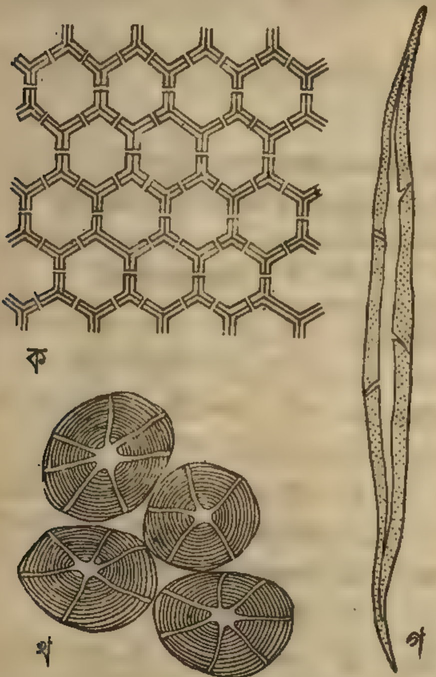

চিত্র 4.9 : স্ক্লেরেনকাইমার গঠন। (ক) কতিপয় স্ক্লেরেনকাইমা কোষের অনুপ্রস্থচ্ছেদ, (খ) প্রস্তর কোষ বা স্ক্লেরাইড, (গ) একটি স্ক্লেরেনকাইমা কোষের অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদ।

চিত্র 4.10 : স্ক্লেরেনকাইমা। (ক) লম্বাটে স্ক্লেরাইডের অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদ, (খ) একটি তন্তুর আংশিক অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদ, (গ) কতিপয় স্ক্লেরাইড বা প্রস্তর কোষ এবং প্যারেনকাইমা কোষ (ব্রাকিস্ক্লেরাইড)।

আকার, আয়তন ও কোষপ্রাচীরের প্রকৃতি অনুযায়ী স্ক্লেরাইডকে নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—

(i) **ব্রাকিস্ক্লেরাইড** (Brachysclereids) : এটি দেখতে গোলাকার বা

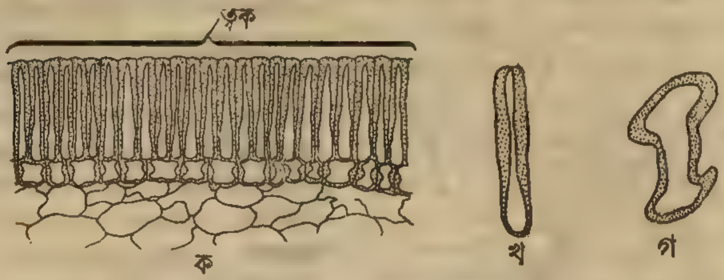

চিত্র 4.11 : বিভিন্ন ধরনের স্ক্লেরাইড। (ক) শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদের (মুগের) বীজত্বকের ম্যাক্রোস্ক্লেরাইড, (খ) মুগের বীজত্বকের ম্যাক্রোস্ক্লেরাইড, (গ) মটরের বীজত্বকের কোষের অস্টিয়োস্ক্লেরাইড।

ডিম্বাকার (চিত্র 4.10(গ)), প্যারেনকাইমা কোষের মত সমব্যাসযুক্ত। উদ্ভিদদেহের কোমল অংশে থাকে। উদাহরণ : পেয়ারা, আপেল ইত্যাদি ফলের শাঁস।

(ii) **ম্যাক্রোস্ক্লেরাইড** (Macrosclereids) : স্তম্ভাকার বা দণ্ডের মত দেখতে। ছোলা, মটর, মুগ ইত্যাদি বীজের বহিঃস্ত্বকে থাকে (চিত্র 4.12 (ক), (খ))।

চিত্র 4.12(ক) : স্তম্ভাকার স্ক্লেরাইড।

(iii) **অস্টিয়োস্ক্লেরাইড** (Osteosclereids) : এটি দেখতে স্তম্ভাকার, কিন্তু দু প্রান্ত স্ফীত। তাই অনেকটা অস্থির মত দেখতে। কতিপয় বিষম-পৃষ্ঠ পাতায় দেখা যায় ; যথা, **হাকিয়া** (*Hakea sp.*) নামক মরুভূমির এক ধরনের উদ্ভিদের পাতা ; এছাড়া মটর বীজের বীজত্বকে থাকে (চিত্র 4.11গ)।

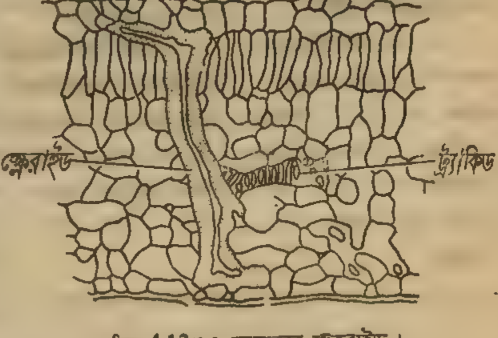

চিত্র 4.12খ : স্তম্ভাকার স্ক্লেরাইড।

(iv) **অ্যাস্ট্রোস্ক্লেরাইড** (Astrosclereids) : এই কোষ তারকা বা মাকড়সার

মত দেখতে, অসমভাবে শাখান্বিত এবং বেশীর ভাগ বিষমপৃষ্ঠ পাতায় থাকে (চিত্র 4.13)।

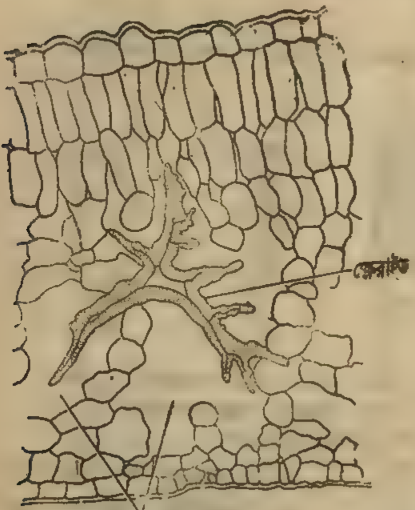

চিত্র 4.13 ঃ অসমভাবে শাখাযুক্ত অর্থাৎ মাকড়সার মত অ্যাস্ট্রোস্ক্লেরাইড।

(v) ট্রাইকোস্ক্লেরাইড (Tricho-sclereids) ঃ এটি দেখতে লম্বাটে, পাতলা প্রাচীরযুক্ত এবং শাখান্বিত। শালুক জাতীয় জলজ উদ্ভিদের পত্রবৃন্তের কোষগুলির কোষান্তর স্থানে বিস্তার লাভ করে অবস্থান করে ট্রাইকোস্ক্লেরাইড। তাছাড়া, জলপাই উদ্ভিদের পাতাতেও দেখা যায়। **উদাহরণ ঃ** শালুক, পদ্ম ইত্যাদি।

অবস্থিতি (Distribution) ঃ স্ক্লেরাইড কোষগুলি ছড়ানো অবস্থায় বা একসঙ্গে নিম্নলিখিত অঙ্গসমূহের মধ্যে থাকে। বহিঃস্তর, মজ্জা, ফ্লোয়েম, ফলের রসাল অংশ, পুরু বীজত্বক ইত্যাদি। তাছাড়া আপেল, পেয়ারা, না শ পা তি ইত্যাদির ফলত্বকেও অবস্থান করে।

কার্য (Function) ঃ উদ্ভিদের নরম অঙ্গগুলিকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা এবং স্ক্লেরেনকাইমা কলার পার্থক্য ঃ

প্যারেনকাইমা	কোলেনকাইমা	স্ক্লেরেনকাইমা
1. সরল সজীব কলা, কারণ প্রোটোপ্লাস্টযুক্ত।	1. সরল সজীব কলা, কারণ প্রোটোপ্লাস্টযুক্ত।	1. সরল মৃত কলা, কারণ প্রোটোপ্লাস্টবিহীন।
2. এই কলা উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঞ্চলে যেমন— কাণ্ড, মূল ও পাতায় অবস্থিত। সাধারণ উদ্ভিদের বহিঃস্তর বা কর্টেক্স এবং মজ্জা এই কলার দ্বারা গঠিত।	2. এই কলা সাধারণত দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের হাইপোডারমিস বা অধঃত্বকে, বিষমপৃষ্ঠ পাতার পত্রফলক ও পত্রবৃন্তে দেখা যায়।	2. এই কলা একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের অধঃত্বকে বা হাইপোডারমিসে, দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের নালিকা বাণ্ডিলের টুপিতে, সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতার পত্রফলকে এবং পেয়ারা, আপেল, নাশপাতি ইত্যাদি ফলে থাকে।

প্যারেনকাইমা	কোলেনকাইমা	স্ক্লেরেনকাইমা
3. প্যারেনকাইমা কলার কোষগুলি আকারে গোলাকার, ডিম্বাকার, বহুভুজাকার হয়।	3. কোলেনকাইমা কলার কোষগুলি প্রস্থচ্ছেদে বহুভুজাকার, কিন্তু লম্বচ্ছেদে আয়তাকার বা লম্বাটে আকারের দেখায়।	3. স্ক্লেরেনকাইমা কলার কোষগুলি প্রস্থচ্ছেদে বহুভুজাকার এবং লম্বচ্ছেদে সরু ও লম্বাটে আকারের হয়।
4. এই কলার মধ্যে কোষান্তর রন্ধ্র দেখা যায়।	4. এই কলার মধ্যে কোষান্তর রন্ধ্র থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। কোষান্তর রন্ধ্রগুলি অনেক সময় অতিরিক্ত সেলুলোজ ও পেকটিন জাতীয় পদার্থে পূর্ণ থাকায় কোষের কোণগুলি হয় পুরু।	4. এই কলার মধ্যে কোষান্তর রন্ধ্র একেবারেই থাকে না।
5. কোষপ্রাচীর পাতলা, কারণ সেলুলোজ দিয়ে গঠিত।	5. কোষপ্রাচীর অপেক্ষাকৃত পুরু, বিশেষ করে কোষের কোণগুলিতে অতিরিক্ত সেলুলোজ ও পেকটিন সঞ্চিত হয়ে কোণগুলি বেশ পুরু হয়।	5. কোষপ্রাচীর অত্যন্ত স্থূল ও কঠিন হয়, কারণ এটি লিগনিনযুক্ত। কোষ-মধ্যস্থ গহ্বর খুব ছোট। কোষপ্রাচীর সরল ও সপাড়—উভয় ধরনের কূপযুক্ত।
6. কোষে ঘন সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস ও ক্ষুদ্রাকার ভ্যাকুওল থাকে।	6. কোষে সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস ও ভ্যাকুওল থাকে।	6. কোষে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস থাকে না।
7. প্যারেনকাইমা বিভিন্ন রকমের হতে পারে, যেমন—ক্লোরেনকাইমা, ইডিওব্লাস্ট, এরেনকাইমা।	7. কোলেনকাইমা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, যেমন—কৌণিক কোলেনকাইমা, কূপাকৃতি কোলেনকাইমা এবং স্তরীভূত কোলেনকাইমা।	7. স্ক্লেরেনকাইমা দুরকমের হয়, যেমন—স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু ও স্ক্লেরাইড।
8. প্যারেনকাইমা কলার কাজ হল খাদ্য তৈরি, খাদ্য সঞ্চয় এবং খাদ্য সংবহন। ত্বকের প্যারেনকাইমার কাজ উদ্ভিদদেহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করা। তাছাড়া ক্ষতস্থান মেরামত করা, বিনষ্ট অংশের পুনঃসৃষ্টি ইত্যাদিও এই কলার কাজ।	8. কোলেনকাইমা কলার কাজ হল উদ্ভিদের কোমল অঙ্গসমূহকে দৃঢ়তা প্রদান করা এবং যদি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে তবে খাদ্য তৈরি করা।	8. স্ক্লেরেনকাইমা কলার প্রধান কাজ উদ্ভিদকে দৃঢ়তা প্রদান করা।

(b) **জটিল কলা (Complex tissue) :** **জটিল কলা** বিভিন্ন আকৃতির কোষ দ্বারা গঠিত। এই কোষগুলি একসঙ্গে থেকে একই রকমের কাজ করে। এই কলার উদাহরণ—(a) **জাইলেম (Xylem)** ও (b) **ফ্লোয়েম (Phloem)**। সংবহনে অংশগ্রহণ করে বলে এই ধরনের কলাকে বলে **সংবহন কলা**। দুই প্রকার সংবহন কলা, জাইলেম ও ফ্লোয়েম, একত্রে নালিকা বান্ডিল (Vascular bundle) গঠন করে।

(a) **জাইলেম (Xylem) :** Xylos (=wood=কাষ্ঠ) হতে জাইলেম শব্দটির উৎপত্তি। পরিণত অবস্থায় জাইলেম কলা নিম্নলিখিত চার প্রকার কোষ নিয়ে গঠিত। যথা—(i) ট্র্যাকীড (Tracheid), (ii) ট্র্যাকীয়া (Trachea) বা বাহিকা (Vessel), (iii) জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem parenchyma) এবং (iv) কাষ্ঠিক তন্তু (Wood fibre) বা জাইলেম তন্তু (Xylem fibre)।

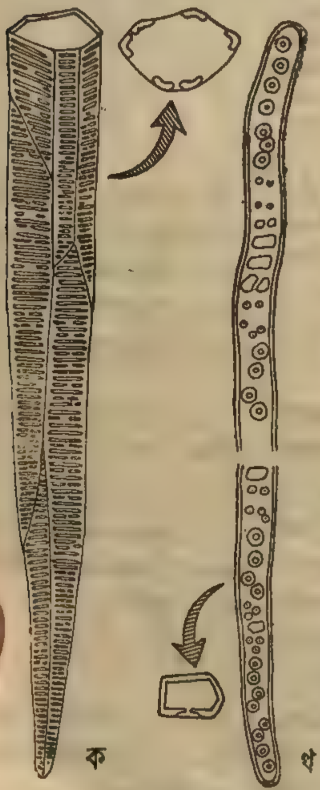

চিত্র 4.14 : ক ও খ—বিভিন্ন উদ্ভিদের ট্র্যাকীড কোষ।

অগ্রস্থ ভাজক কলার প্রোক্যাম্বিয়াম অঞ্চলে প্রাথমিক জাইলেম (Primary Xylem)-এর উৎপত্তি। কিন্তু গৌণ জাইলেম সৃষ্টি হয়—উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধির সময় পার্শ্বস্থ ভাজক কলা (Lateral meristem) বা ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম (Fascicular cambium) থেকে। প্রাথমিক জাইলেমের প্রাথমিক পর্যায়ের কোষগুলির ব্যাস ছোট হয়। এদের **প্রোটোজাইলেম** (Protoxylem) বলে। কিন্তু জাইলেমের পরবর্তী পর্যায়ের কোষগুলির ব্যাস বড় হয়। এদের **মেটাজাইলেম** (Metaxylem) বলে।

কার্য (Function) : (i) জাইলেমের প্রধান কাজ হল মাটি থেকে এককোষী মূলরোম দ্বারা শোষিত জল ও জলীয় রসকে উদ্ভিদদেহের সালোকসংশ্লেষকারী অঙ্গে পৌঁছে দেওয়া। (ii) অপর কাজ হল উদ্ভিদ অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা।

(i) **ট্র্যাকীড (Tracheid) :**

গঠন (Structure) : (i) এই কোষগুলি লম্বাটে এবং এদের উভয় প্রান্ত সরু কিন্তু সুচালো নয় (চিত্র 4.14 ক ও খ)। (ii) কোষগুলি মৃত। (iii) কোষ-মধ্যস্থ গহ্বরটি বেশ বড়। (iv) কোষপ্রাচীর স্থূল এবং লিগনিনযুক্ত

হওয়ায় খুব শক্ত। (v) কোষপ্রাচীরের স্থূলীভবন বলয়াকার, সোপানাকার, সর্পিলাকার, জালিকাকার, অথবা সপাড় কূপযুক্ত হতে পারে। (vi) প্রস্থচ্ছেদে ট্র্যাকীড কোষগুলির আকৃতি বহুভুজাকার দেখায়।

অবস্থিতি (Distribution) **:** গুপ্তবীজী, ব্যক্তবীজী এবং ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের জাইলেম কলায় ট্র্যাকীড দেখা যায়।

কার্য (Function) **:** (i) জল ও অজৈব লবণ সংবহন। (ii) উদ্ভিদকে দৃঢ়তা প্রদান। (iii) অনেক ক্ষেত্রে জলসঞ্চয় করে রাখা।

(ii) ট্র্যাকীয়া (Trachea) বা বাহিকা (Vessel) :

গঠন (Structure) **:** (i) অপরিণত অবস্থায় এই কলার কোষগুলি বেলনাকার হয়। বেলনাকার কোষগুলি একটির উপর একটি সজ্জিত থাকে। পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোষগুলির প্রস্থপ্রাচীর ক্রমশ দ্রবীভূত হয় এবং প্রোটোপ্লাস্ট বিনষ্ট হওয়ার ফলে কোষগুলির মৃত্যু ঘটে, ফলে সৃষ্টি হয় অবিচ্ছিন্ন একটি নল (চিত্র 4.15 ক-চ)। ছোট ব্যাসযুক্ত ট্র্যাকীয়াকে **প্রোটোজাইলেম** (Protoxylem) এবং বড় ব্যাসযুক্ত ট্র্যাকীয়াকে **মেটাজাইলেম** (Metaxylem) বলে। (ii) কোষপ্রাচীর লিগনিনযুক্ত হওয়ায় খুব স্থূল হয়। (iii) কোষপ্রাচীরে বলয়াকার, সর্পিলাকার, সোপানাকার, জালিকাকার ও সপাড় কূপযুক্ত (চিত্র 4.16 ক ও খ) স্থূলীভবন দেখা যায়।

চিত্র 4.15 : জাইলেম বাহিকার উৎপত্তির বিভিন্ন দশার চিত্র।

অবস্থিতি (Distribution) **:** গুপ্তবীজী উদ্ভিদ এবং ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ নিটাম-এর জাইলেমে ট্র্যাকীয়া দেখা যায়।

কার্য (Function) **:** (i) জল ও জলে দ্রবীভূত নানা প্রকার অজৈব লবণ সংবহন। (ii) জল ও খনিজ লবণ সঞ্চয় করে রাখা এবং (iii) উদ্ভিদ অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা।

(iii) জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem parenchyma) :

গঠন (Structure) **:** (i) জাইলেম প্যারেনকাইমা সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ সজীব প্যারেনকাইমা কোষ। (ii) কোষগুলি লম্বাটে ধরনের হয়। (iii) কোষপ্রাচীর

পাতলা বা স্থূল—উভয় রকমের হতে পারে। (iv) পাতলা কোষপ্রাচীর সেলুলোজযুক্ত। কিন্তু স্থূল কোষপ্রাচীর লিগনিনযুক্ত হয়। (v) গৌণ জাইলেমে কোষপ্রাচীর কূপযুক্ত হয়ে থাকে।

অবস্থিতি (Distribution) **:** কয়েকটি ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ ছাড়া (উদাহরণ—পাইনাস) অন্যান্য ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের কলায় দেখা যায়।

কার্য (Function) **:** (i) জল ও জলে দ্রবীভূত নানা প্রকার অজৈব লবণ সংবহন। (ii) স্নেহ ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য এবং বর্জ্য পদার্থ সঞ্চয় করে রাখা। (iii) উদ্ভিদ অঙ্গকে শক্তি দান।

(iv) **কাষ্ঠিক তন্তু** (Wood fibre) বা **জাইলেম তন্তু** (Xylem fibre) **:**

গঠন (Structure) **:** (i) কাষ্ঠিক তন্তু মৃত স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু, কারণ কোষগুলিকে স্ক্লেরেনকাইমার মত দেখতে হয়। জাইলেম কলায় অবস্থান করে বলে এদের **জাইলেম তন্তু** (Xylem fibre)-ও বলে। দেখতে তন্তুর মত। (ii) কোষপ্রাচীর খুবই স্থূল হওয়ায় কোষ-মধ্যস্থ গহ্বর খুবই কম ব্যাসবিশিষ্ট হয়।

অবস্থিতি (Distribution) **:** দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উদ্ভিদের কাষ্ঠল অংশে অবস্থান করে। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদেও দেখা যায়।

কার্য (Function) **:** উদ্ভিদকে দৃঢ়তা প্রদান করা।

চিত্র 4.16 **:** বিভিন্ন ধরনের জাইলেম বাহিকা বা ট্র্যাকীয়া।

(b) **ফ্লোয়েম** (Phloem) **:** ফ্লোয়েম একটি জটিল স্থায়ী কলা। এটি নালিকা বান্ডিলের একটি উপাদান। ফ্লোয়েম কলা চার প্রকার কোষ উপাদানের দ্বারা গঠিত। যথা—(i) সীভ নল (Sieve tube), (ii) সঙ্গীকোষ (Companion cell), (iii) ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা (Phloem parenchyma) এবং (iv) ফ্লোয়েম তন্তু (Phloem fibre) বা বাস্ট তন্তু (Bast fibre)। টেরিডোফাইটা ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে শুধুমাত্র সীভ নল ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে।

(i) **সীভ নল** (Sieve tube) **:**

গঠন (Structure) **:** (i) সীভ নলের গঠন দীর্ঘ নলাকার। (ii) কোষগুলি সজীব এবং একটির উপর একটি সজ্জিত থাকে। (iii) কোষপ্রাচীর পাতলা এবং সেলুলোজ দ্বারা নির্মিত। (iv) কোষপ্রাচীরের ভিতরের পরিধির দিকে অবস্থান করে সাইটোপ্লাজমের স্তর। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে লিউকোপ্লাসটিড এবং স্টার্চের

দানা থাকে। (v) সীভ নলের কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না। (vi) সীভ নলের প্রস্থপ্রাচীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্রবিশিষ্ট হওয়ায় প্রস্থপ্রাচীরকে চালনীর (Sieve) মত দেখায়। রন্ধ্রযুক্ত ঐ প্রস্থপ্রাচীরগুলিকেই বলে **চালনীচ্ছদা** বা **সীভ প্লেট** (Sieve plate)। সীভ নলের প্রতিটি সীভ প্লেটে অবস্থিত ছিদ্রগুলি প্রাচীর দিয়ে ঢাকা থাকায় এক বা একাধিক আলাদা আলাদা দলে বিন্যস্ত থাকতে পারে। প্রাচীর দিয়ে ঢাকা এরূপ প্রতিটি আলাদা আলাদা ছিদ্র দলকে বলে **সীভ ক্ষেত্র** (Sieve area)। (vii) সীভ প্লেটের রন্ধ্রসমূহের মধ্য দিয়ে সূতোর মত সূক্ষ্ম সাইটোপ্লাজম সন্নিহিত সীভ নলগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। (viii) পরিণত কোষের কেন্দ্রে সুস্পষ্ট ভ্যাকুওল থাকে।

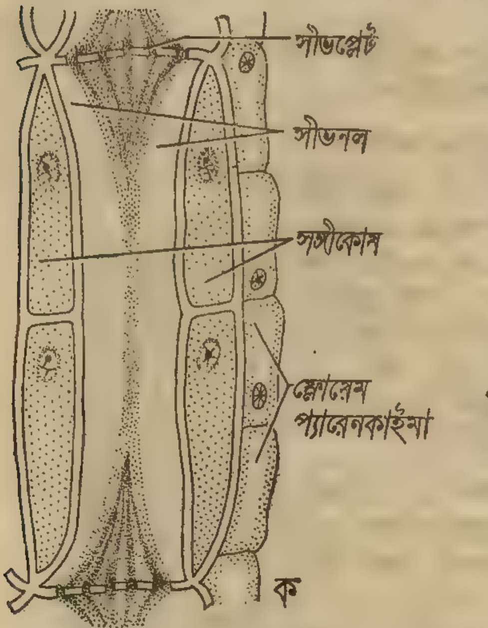

চিত্র 4.17 : ফ্লোয়েমের সীভ উপাদান। (ক) লম্বচ্ছেদে সীভ নল, (খ) প্রস্থচ্ছেদে সীভ নল।

শীতকালে যখন ঋতু উদ্ভিদের পক্ষে প্রতিকূল হয়, তখন বেশীর ভাগ সীভ প্লেটের উপর **ক্যালোজ** (Callose) নামে এক ধরনের উজ্জ্বল বর্ণহীন কেলাসিত অদ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট জাতীয় বস্তু সঞ্চিত হয়ে সীভ প্লেটের ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করে দেয়। সীভ প্লেটের উপর ক্যালোজের আচ্ছাদনকে **ক্যালাস প্যাড** (Callus pad) বলে। আবার বসন্তকালে যখন ঋতু উদ্ভিদের পক্ষে অনুকূল হয়, তখন সীভ প্লেটের উপর সঞ্চিত ক্যালোজ দ্রবীভূত হয়ে ছিদ্রপথগুলিকে উন্মুক্ত করে সন্নিহিত সীভ নলের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করে। পৃথকভাবে বিন্যস্ত কতিপয় স্লাইম দেহ (চিত্র 4.18) সীভ নলের কোষগুলিতে থাকে (কাটার, 1978)। স্লাইম এক-ধরনের পি-প্রোটীন (P-protein) প্রকৃতির প্রোটীন জাতীয় পদার্থ। এটি চালনীচ্ছদার সীভ ক্ষেত্রের ছিদ্রপথগুলির মধ্য দিয়ে নিকটবর্তী কোষগুলিতে চালিত হয়। স্লাইম দেহগুলি গোলাকার বা বেমের মত হয়। সীভ ক্ষেত্রের উপর স্লাইম সঞ্চিত হয়ে

স্লাইম ছিপি (Slime plug) গঠন করে। সীভ প্লেট আবার সরল এবং জটিল হতে পারে।

অবস্থিতি (Distribution) **:** গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলায় সীভ নল থাকে।

কার্য (Function) **:** (i) পাতায় তৈরি খাদ্য উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অঙ্গে পরিবহণ করা। (ii) খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা।

(ii) সঙ্গীকোষ (Companion cell) :

গঠন (Structure) **:** (i) সীভ নলের পাশে অবস্থিত ঘন দানাদার সাইটোপ্লাজম ও সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াসযুক্ত সজীব লম্বাটে কোষ। (ii) কোষ-প্রাচীর পাতলা এবং সেলুলোজ দ্বারা নির্মিত। (iii) সীভ নল থেকে সঙ্গীকোষগুলি সরু হয়। কোষগুলির মধ্যে স্টার্চের দানা থাকে না। (iv) সঙ্গীকোষগুলি প্রস্থচ্ছেদে আয়তাকার, বহুভুজাকার বা ত্রিভুজাকার দেখায়।

অবস্থিতি (Distribution) **:** সমস্ত গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলায় সঙ্গীকোষ থাকে (ব্যতিক্রম : প্রাচীনতর দ্বিবীজপত্রী, ব্যক্তবীজী ও ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ)।

কার্য (Function) **:** সীভ নলের মত সম্ভবত সঙ্গীকোষও খাদ্য পরিবহণে সাহায্য করে।

(iii) ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা (Phloem parenchyma) :

গঠন (Structure) **:** ফ্লোয়েম কলায় সঙ্গীকোষ ছাড়া অপর এক প্রকার আয়তাকার সজীব প্যারেনকাইমা কোষ থাকে। ঐ কোষগুলিকে **ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা** বলে। সাইটোপ্লাজম থাকায় কোষগুলি সজীব। শ্বেতসার, ট্যানিন, রজন, মিউ-সিলেজ প্রভৃতি বর্জ্য পদার্থসমূহ এই কোষে থাকে। কোষপ্রাচীর পাতলা, সেলুলোজ দ্বারা নির্মিত।

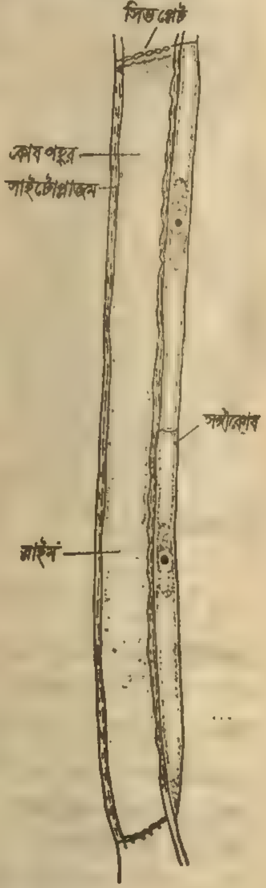

চিত্র 4.18 : সঙ্গীকোষ সহ একটি একক সীভ নলের ছবি।

অবস্থিতি (Distribution) **:** ফ্লোয়েম কলার তন্তুকে বেষ্টন করে আবরণের মত অবস্থান করে।

কার্য (Function) **:** (i) শর্করা ও প্রোটীন জাতীয় খাদ্য পরিবহণ। (ii) খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা।

(iv) **ফ্লোয়েম তন্তু** (Phloem fibre) বা **বাস্ট তন্তু** (Bast fibre) :

গঠন (Structure) : (i) ফ্লোয়েম কলার মধ্যস্থিত লম্বা স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুগুলিকে **ফ্লোয়েম তন্তু** বা **বাস্ট তন্তু** বলে (চিত্র 4.19 ক ও খ)। তন্তুগুলি অনেক সময় সাইটোপ্লাজম দিয়ে পূর্ণ থাকে। (ii) ফ্লোয়েম তন্তুর কোষপ্রাচীর লিগনিন দিয়ে গঠিত হওয়ায় খুব স্থূল হয়।

অবস্থিতি (Distribution) : গুপ্তবীজী উদ্ভিদের প্রাথমিক ও গৌণ ফ্লোয়েম কলায় ফ্লোয়েম তন্তু দেখা যায়।

কার্য (Function) : (i) উদ্ভিদ অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করাই প্রধান কাজ। (ii) তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে খাদ্য পরিবহণেও অংশগ্রহণ করে।

চিত্র 4.19 : ক ও খ—বিভিন্ন ফ্লোয়েম তন্তু অনুপ্রস্থচ্ছেদে ও অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদে।

● পাট তন্তু গৌণ ফ্লোয়েমের বাস্ট তন্তু।

সীভ কোষ (Sieve cell) : ফ্লোয়েম কলায় সীভ নল ব্যতীত অপর এক ধরনের কোষ থাকে। এদের **সীভ কোষ** (Sieve cell) বলে (চিত্র 4.20)। (i) এই কোষগুলি লম্বা, সরু ও **সূচালো প্রান্তযুক্ত** ; (ii) কেন্দ্রস্থ কোষগহ্বরকে পরিবৃত করে প্রোটোপ্লাজম থাকায় সীভ কোষগুলি সজীব হয়। লিউকোপ্লাসটিড এবং শ্বেতসার দানা প্রোটোপ্লাজমে থাকে। (iii) সেলুলোজ দ্বারা গঠিত হওয়ায় কোষপ্রাচীর পাতলা। (iv) কোষপ্রাচীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **সীভ ছিদ্র** (Sieve pore) থাকে। এই ছিদ্রের মাধ্যমে অপর সঙ্গী সীভ কোষগুলির সঙ্গে সাইটোপ্লাজমীয় সংযোগ স্থাপিত হয়। সীভ কোষ ও সীভ নল একত্রে **সীভ উপাদান** (Sieve element) গঠন করে। অতএব সীভ উপাদান (সীভ কোষ এবং সীভ নল), সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা কোষ এবং ফ্লোয়েম তন্তু দিয়ে ফ্লোয়েম কলা গঠিত।

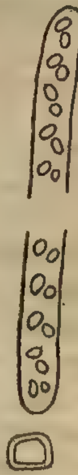

চিত্র 4.20 : একটি সীভ কোষের প্রস্থচ্ছেদ ও লম্বচ্ছেদ।

অবস্থিতি (Distribution) : ব্যক্তবীজী ও ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে সীভ কোষ দেখা যায়।

কার্য (Function) : (i) পাতা থেকে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে জৈব খাদ্যবস্তু সংবহন করাই সীভ কোষগুলির কাজ। (ii) তাছাড়া, তৈরি খাদ্য সঞ্চয় করে রাখাও আরো একটি কাজ।

কাষ্ঠিক তন্তু ও বাস্ট তন্তুর মধ্যে পার্থক্য ঃ

কাষ্ঠিক তন্তু	বাস্ট তন্তু
1. এটি জাইলেম কলায় উপস্থিত স্ক্লেরেনকাইমা কোষ।	1. এটি ফেলায়েম কলায় উপস্থিত স্ক্লেরেনকাইমা কোষ।
2. কোষগুলি সবসময়ই প্রোটোপ্লাস্ট-বিহীন।	2. কোষগুলিতে কখনও কখনও প্রোটোপ্লাস্ট থাকে।
3. কোষের গহ্বর খুব সরু।	3. কোষের গহ্বর অপেক্ষাকৃত চওড়া।
4. কোষগুলি প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত হতে পারে।	4. কোষগুলি কখনও প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত হয় না।
5. কাষ্ঠিক তন্তু দু রকমের হয়—লিব্রিফর্ম তন্তু এবং ট্র্যাকীড তন্তু (fibre tracheids)।	5. বাস্ট তন্তুর কোন প্রকারভেদ নেই।
6. কার্য—দৃঢ়তা প্রদান করা।	6. কার্য—খাদ্য সংবহন ও সঞ্চয় এবং দৃঢ়তা প্রদান করা।

জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যে পার্থক্য ঃ

জাইলেম	ফ্লোয়েম
1. জটিল মৃত স্থায়ী কলা।	1. জটিল সজীব স্থায়ী কলা।
2. জাইলেম নিম্নলিখিত উপাদানগুলি দ্বারা গঠিত— ট্র্যাকীড, ট্র্যাকীয়া, জাইলেম প্যারেনকাইমা এবং কাষ্ঠিক বা জাইলেম তন্তু।	2. ফেলায়েম নিম্নলিখিত উপাদানগুলি দ্বারা গঠিত— সীভ উপাদান (সীভ নল ও সীভ কোষ) সঙ্গীকোষ, ফেলায়েম প্যারেন-কাইমা, বাস্ট বা ফেলায়েম তন্তু।
3. কোষপ্রাচীর লিগনিনযুক্ত হওয়ায় খুব শক্ত ও স্থূল হয়। কোষ-প্রাচীরের উপর নানারকমের স্থূলীভবন দেখা যায়, যেমন—বলয়াকার, সোপানাকার সর্পিলাকার, জালিকাকার, সপাড় কূপযুক্ত ইত্যাদি।	3. কোষপ্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা নির্মিত হওয়ায় পাতলা, তবে ফেলায়েম তন্তুর কোষপ্রাচীর লিগনিন দিয়ে গঠিত হওয়ায় খুব স্থূল হয়।
4. জাইলেমের প্রধান কাজ হল মাটি থেকে এককোষী মূলরোম দ্বারা শোষিত জল ও জলীয় রসকে উদ্ভিদদেহের সালোকসংশ্লেষকারী অঙ্গে পৌঁছে দেওয়া। তাছাড়া, উদ্ভিদ অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করাও অপর একটি কাজ।	4. ফেলায়েমের প্রধান কাজ হল পাতায় তৈরি খাদ্য উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অঙ্গে পরিবহণ করা ও খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা। ফেলায়েম তন্তু উদ্ভিদ অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদানও করে।

সরল কলা ও জটিল কলার মধ্যে পার্থক্য :

সরল কলা	জটিল কলা
1. কোষগুলি একই প্রকারের।	1. কোষগুলি বিভিন্ন প্রকারের।
2. কোষের প্রকার অনুযায়ী কলার নামকরণ করা হয়েছে।	2. কোষের কার্য অনুযায়ী কলার নামকরণ করা হয়েছে।
3. সরল কলা তিন প্রকারের—প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা।	3. জটিল কলা দু প্রকারের—জাইলেম ও ফেন্নায়েম।
4. স্ক্লেরেনকাইমা ব্যতীত বাকী দু প্রকার সরল কলার কোষগুলি সালোকসংশ্লেষে কার্যকর।	4. সালোকসংশ্লেষে কার্যকর নয়।
5. ঊর্ধ্বমুখী সংবহনে কোষগুলি কার্যকর নয়।	5. ঊর্ধ্বমুখী সংবহনে কোষগুলি কার্যকর।
6. কোষগুলির প্রস্থপ্রাচীর ছিদ্রযুক্ত নয়।	6. কোষগুলির প্রস্থপ্রাচীর ছিদ্রযুক্ত।
7. কোষগুলি উদ্ভিদদেহের সর্বত্র বর্তমান থাকে।	7. কোষগুলি শুধুমাত্র নালিকা বান্ডিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

(c) বিশেষ কলা (Special tissue) :

উদ্ভিদদেহে সরল ও জটিল স্থায়ী কলা ব্যতীত কয়েক প্রকার **বিশেষ স্থায়ী কলা** থাকে। উদ্ভিদদেহে বিশেষ বিশেষ কাজ করার জন্য এই কলার সৃষ্টি হয়। সাধারণ কলার সঙ্গে এদের আকৃতি ও গঠনগত কোনও মিল নেই। আবার উৎপত্তি ও আকৃতি এদের একরকমের হয় না। রেচন ও ক্ষরণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করাই এই কলার কাজ। ক্ষরিত কলাসমূহ একসঙ্গে থেকে বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থি সৃষ্টি করে। নিচে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ কলাগুলি আলোচিত হল :

চিত্র 4.21 : (ক) বিছুটির দংশক রোম, (খ) সূর্যশিশির নামক পতঙ্গভুক উদ্ভিদের পরিপাক গ্রন্থি।

(a) গ্রন্থিরোম (Glandular hairs) : এরা সাধারণত বহির্গাত্রীয় হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃন্ত ও দীর্ঘ অঙ্গের দ্বারা গঠিত। একটি বা অনেকগুলি কোষ নিয়ে অক্ষ বা মস্তকটি গঠিত। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থিরোম পতঙ্গভুক উদ্ভিদের পাতায় দেখা যায়। গ্রন্থিগুলির কাজ হল—জল সঞ্চয়, অনুভূতি বহন, মিউসিলেজ ক্ষরণ, পাচিত বস্তুর বিশোষণ ও উৎসেচক ক্ষরণ।

উদাহরণ—সূর্যশিশিরের (*Drosera sp.*) বৃন্তযুক্ত বৃহৎ কর্ষিকা গ্রন্থি (চিত্র 4.21খ), কলস উদ্ভিদের (*Nepenthes sp.*) কলসীর মধ্যস্থিত পরিপাক গ্রন্থি, বিছুটির দংশক রোম (stinging hairs) (চিত্র 4.21 ক) ইত্যাদি।

(b) **মধুগ্রন্থি** (*Nectaries*) **:** পতঙ্গপরাগী উদ্ভিদের ফুলের বিভিন্ন অংশে থাকে। এই গ্রন্থিগুলি থেকে নিঃসৃত হয় শর্করাজাতীয় রস, মধু বা মকরন্দ (**Nectar**)। মধুগ্রন্থির কোষগুলি স্তম্ভাকার হয় এবং ঘন সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে (চিত্র 4.22)। উদাহরণ—লাল পাতা (***Poinsettia sp.***)।

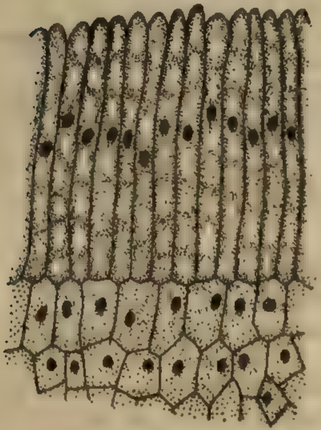

চিত্র **4.22 :** লম্বচ্ছেদে লাল পাতার মধুগ্রন্থি বা নেকটারিস।

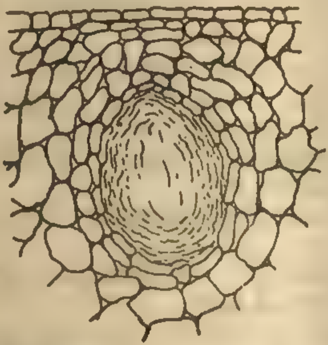

চিত্র **4.23 :** লেবুর তৈল গ্রন্থি।

(c) **রজন নালী** (Resin ducts) **:** রজন নামক বর্জ্য পদার্থ এক বিশেষ ধরনের কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। কতকগুলি বিশিষ্ট নলাকার অংশে ক্ষরিত দ্রব্য জমা থাকে। এদের **রজন নালী** বলে। উদাহরণ—ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ পাইন (***Pinus sp.***)।

(d) **তৈল নালী** (Oil ducts) **:** তৈল নালী লেবুর খোসায় থাকে। তৈল গ্রন্থি নালীর চারদিকে একস্তরযুক্ত আবরণী থাকে (চিত্র 4.23)।

(e) **তরুক্ষীর নালী** (Laticiferous ducts) **:** তরুক্ষীর নালী পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত, লম্বাটে, বহুশাখা বিশিষ্ট নালী ; এরা অনেক নিউক্লিয়াসযুক্ত। দুধের মত সাদা অথবা হলুদ অথবা জলের মত বর্ণহীন

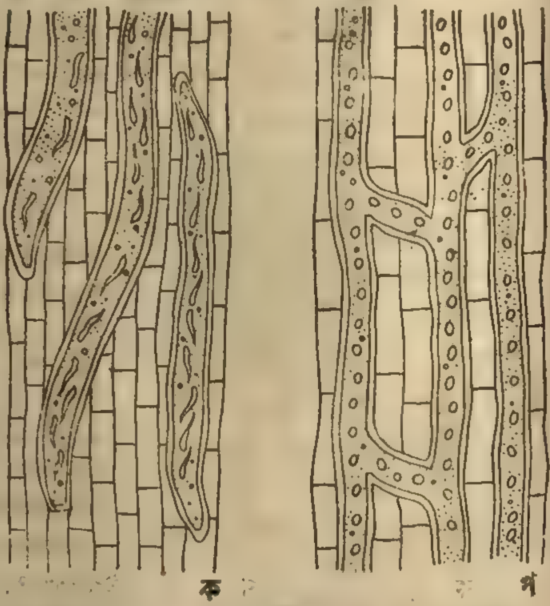

চিত্র **4.24 :** তরুক্ষীর নালী। (ক) ক্ষীর কোষ (লম্বচ্ছেদ) ; (খ) ক্ষীর বাহিকা (লম্বচ্ছেদ)।

উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন কলার ছক

উদ্ভিদ কলা

- **ভাজক কলা**
  - **অবস্থান অনুসারে**
    - (a) অগ্রস্থ
    - (b) পার্শ্বস্থ
    - (c) নিবেশিত
  - **উৎপত্তি অনুসারে**
    - (a) প্রাথমিক
    - (b) গৌণ
  - **কার্য অনুসারে**
    - (a) প্রোটোডার্ম
    - (b) প্রোক্যাম্বিয়াম
    - (c) গ্রাউন্ড মেরিস্টেম
- **স্থায়ী কলা**
  - **সরল**
    - (a) প্যারেনকাইমা
    - (b) কোলেনকাইমা
    - (c) স্ক্লেরেনকাইমা
      - স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু
      - স্ক্লেরাইড
  - **জটিল**
    - **জাইলেম**
      - (a) ট্র্যাকীড
      - (b) ট্র্যাকীয়া
      - (c) জাইলেম প্যারেনকাইমা
      - (d) কাষ্ঠিক তন্তু
    - **ফ্লোয়েম**
      - (a) সীভ নল ও সীভ কোষ
      - (b) সঙ্গীকোষ
      - (c) ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা
      - (d) বাস্ট তন্তু
  - **বিশেষ**
    - (a) গ্রন্থিরোম
    - (b) মধুগ্রন্থি
    - (c) রজন নালী
    - (d) তৈল নালী
    - (e) তরুক্ষীর নালী (ক্ষীর কোষ ও ক্ষীর বাহিকা)
    - (f) হাইডাথোড

রসে নালীগুলি পূর্ণ থাকে। এই রসকেই তরুক্ষীর (Latex) বলে। তরুক্ষীরে সাধারণত জলের সঙ্গে শর্করা, প্রোটীন, উৎসেচক, রবার ইত্যাদি নানা উপাদানের অবদ্রব থাকে। তরুক্ষীর নালী দু প্রকারের হয়। যথা—

(i) **ক্ষীর কোষ** (Latex cell) : দীর্ঘ শাখাবিশিষ্ট এককোষী ক্ষীর নালীকে বলে ক্ষীর কোষ (চিত্র 4.24 ক)। উদাহরণ—করবী (*Nerium*), আকন্দ (*Calotropis*), ফণিমনসা (*Opuntia*) প্রভৃতি।

(ii) **ক্ষীর বাহিকা** (Latex vessel) : বহুকোষবিশিষ্ট, শাখা-প্রশাখাযুক্ত ক্ষীর নালীকে বলে ক্ষীর বাহিকা (চিত্র 4.24 খ)। উদাহরণ—তামাক (*Nicotiana*), রবার (*Hevea*), কলা (*Musa*) প্রভৃতি।

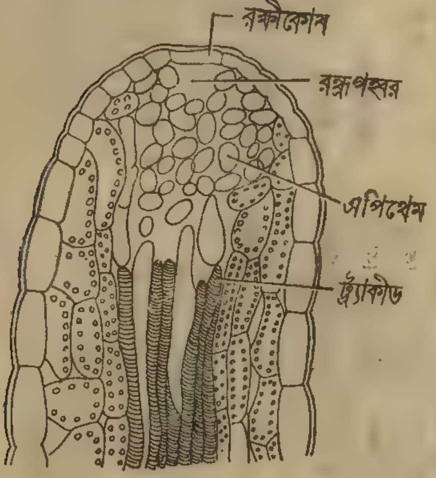

চিত্র 4.25 : হাইডাথোড (লম্বচ্ছেদ)।

(f) **হাইডাথোড** (Hydathode) : কয়েকটি গুপ্তবীজী উদ্ভিদ, যথা—টম্যাটো, কচু, ঘাস, ট্রোপিওলাম প্রভৃতির পাতার কিনারায় জলমোচনকারী এক প্রকার বিশেষ ধরনের কলা থাকে, এদেরকে বলে **হাইডাথোড** (চিত্র 4.25)। জল ও জলে দ্রবীভূত লবণ এদের মাধ্যমে বহিঃক্ষরিত হয় বলে এদের আবার **জলপত্ররন্ধ্র** (water stomata)-ও বলে। প্রতিটি হাইডাথোড পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে গঠিত। কোষগুলি ঘন সাইটোপ্লাজম দ্বারা পূর্ণ থাকে এবং বড় কোষান্তর রন্ধ্রযুক্ত হয়। এই ধরনের প্যারেনকাইমা কলাকেই বলে **এপিথেম** (Epithem)। এপিথেম কোষে ক্লোরোফিল থাকে না। হাইডাথোড কলায় ট্র্যাকীড থাকে। প্রস্বেদন কম হলেও মূলজ চাপ বেড়ে গেলে জল ও জলে দ্রবীভূত লবণ ট্র্যাকীডের মাধ্যমে বাহিত হয়ে এপিথেম কলার কোষান্তর রন্ধ্রে এসে সঞ্চিত হয়। তারপর জলরন্ধ্র দিয়ে শিশিরবিন্দুর মত ঐ তরল পদার্থ বের হয়।

● প্রাণী কলা (Animal Tissues) ●

4.3. কলা কাকে বলে? (What is a tissue?)

এককোষী প্রাণীদের দেহ একটিমাত্র কোষ দিয়ে গঠিত। ঐ একটিমাত্র কোষই উক্ত প্রাণীদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাজ করে।

বহুকোষী প্রাণীদের দেহ অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ বহুকোষী প্রাণীতে দেহের কোষগুলির মধ্যে শ্রম বিভাজন (division of labour) দেখা যায়। এইসব প্রাণীতে কতকগুলি করে কোষ সম্মিলিতভাবে এক-একটি নির্দিষ্ট ধরনের

কাজ করে। একই রকমের কাজ করার জন্য কোষের এইরূপ এক-একটি সংঘবন্ধ দলকে **কলা** (tissue) বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাজ করার জন্য বহুকোষী প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কলার অস্তিত্ব দেখা যায়।

একই কলার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কোষ দেখতে একই রকমের হতে পারে অথবা তারা ভিন্ন ভিন্ন রকমেরও হতে পারে। তাছাড়া, একই কলার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কোষের উৎপত্তি ঘটে একই জায়গা থেকে।

সুতরাং, **একই উৎপত্তিস্থল থেকে উৎপন্ন একই ধরনের কোষসমষ্টি অথবা মিশ্র ধরনের কোষসমষ্টি সম্ঘবন্ধভাবে যদি একই ধরনের কাজ করে, তবে ঐসব কোষসমষ্টিকে কলা বা টিস্যু বলে। অর্থাৎ, সমধর্মী কোষসমষ্টিকে কলা বলে।**

4.4. কলার প্রকারভেদ (Types of tissues)

প্রাণিদেহের কলাগুলিকে গঠন ও কাজের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবন্ধ করা যায়ঃ

I. স্থির কলা (Stationary tissues)ঃ

(A) আবরণী কলা (**Epithelial tissue**), (**B**) যোগকলা (**Connective tissue**), (**C**) পেশী কলা (**Muscular tissue**), (**D**) নার্ভ কলা (**Nervous tissue**), (**E**) ক্ষরণ কলা বা গ্রন্থি কলা (**Secretory tissue**)।

II. তরল কলা (Fluid tissues)ঃ

(A) রক্ত (**Blood**), (**B**) লসিকা (**Lymph**)।

4.4 I. স্থির কলা

যেসব কলার অন্তর্ভুক্ত কোষগুলি প্রতিনিয়ত স্থান বদল করে না, তাদের **স্থির কলা** বলে।

A. আবরণী কলা

প্রাপ্তিস্থল (Occurrence)ঃ প্রাণীদের সমগ্র দেহের বাইরের আবরণ হিসেবে এই কলা দেখা যায়। তাছাড়া, দেহের বিভিন্ন নালীর, যথা—খাদ্যনালী, ধমনী, শিরা, শ্বাসনালী, ডিম্বনালী, শুক্রনালী ইত্যাদির ও থলির আকারবিশিষ্ট অঙ্গের (যথা—ফুসফুসের) অন্তর্গাত্রেও এই কলার আস্তরণ দেখা যায়।

অতএব, **দেহের সমগ্র বহির্ভাগের এবং দেহের ভিতরকার নলাকার** (tubular) **ও থলির আকারবিশিষ্ট অঙ্গসমূহের ভিতর দিকের আবরণ রচনা করে যে কলা**, তার নাম আবরণী কলা। আবরণী কলার আস্তরণ **এপিথেলিয়াম** (epithelium) নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)ঃ (i) আবরণী কলার কোষগুলি গায়ে গায়ে লেগে থাকে। (ii) এই কলায় আন্তঃকোষীয় পদার্থ (**intercellular material**) বা ধাত্র নামমাত্র পরিমাণে থাকে। (iii) কোষগুলি একটি সূক্ষ্ম 'ভিত্তি পর্দার' (**basement membrane**) উপর সাজানো থাকে। (iv) এই কলায় কোন রক্তবাহ (**blood vessels**) থাকে না।

শ্রেণীবিভাগ (Classification)ঃ আবরণী কলা এক বা একাধিক কোষস্তর দ্বারা গঠিত হতে পারে।

স্তর বিন্যাসের ভিত্তিতে আবরণী কলা নিম্নলিখিত কয়েক রকমের হয় :

(i) **সরল আবরণী কলা** (Simple epithelium) : এই প্রকার আবরণী কলায় ভিত্তি পর্দার উপর একটিমাত্র কোষস্তর থাকে (চিত্র 4.26 ক)।

চিত্র 4.26 : (ক) সরল আবরণী কলা ; (খ) স্তরীভূত আবরণী কলা ; (গ) ছদ্মস্তরীভূত আবরণী কলা ; (ঘ) ট্রানজিশনাল আবরণী কলা।

প্রাপ্তিস্থল : কৃমি, কেঁচো ইত্যাদি প্রাণীর বহিঃত্বক (epidermis)।

(ii) **স্তরীভূত আবরণী কলা** (Stratified epithelium) : এই প্রকার আবরণী কলায় একাধিক কোষস্তর থাকে এবং এদের মধ্যে কেবলমাত্র সবচেয়ে নিচের দিকের স্তরটি ভিত্তি পর্দার সঙ্গে লাগানো থাকে (চিত্র 4.26 খ)।

প্রাপ্তিস্থল : স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বহিঃত্বক।

(iii) **ছদ্মস্তরীভূত আবরণী কলা** (Pseudostratified epithelium) : আপাতদৃষ্টিতে এই কলাকে স্তরীভূত বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি একটি মাত্র কোষস্তর দ্বারা গঠিত। এই কারণে একে ছদ্মস্তরীভূত কলা বলা হয়। এই কলার কোষগুলি অসম দৈর্ঘ্যের—কতকগুলি কোষ খর্বাকৃতির এবং কতকগুলি দীর্ঘাকৃতির। খর্বাকৃতির কোষগুলি কলার মুক্ত প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত না হওয়ার জন্য এই প্রকার কলাকে একাধিক স্তরবিশিষ্ট বলে মনে হয়। কিন্তু যন্ত্র সহকারে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, সরল আবরণী কলার মত এই কলার প্রতিটি কোষ ভিত্তি পর্দার সঙ্গে লাগানো—অর্থাৎ কলাটি একটিমাত্র স্তরবিশিষ্ট (চিত্র 4.26 গ)।

প্রাপ্তিস্থল : নাসাবিবর, স্বরযন্ত্র (Voice box), শ্বাসনালী (Trachea), ব্রংকাস (Bronchus) ইত্যাদির অন্তর্গাত্র।

(iv) **ট্রানজিশনাল বা পরিবর্তনীয় আবরণী কলা** (Transitional epithelium) : দেহের যেসব অঙ্গ কখনও শিথিল আবার কখনও স্ফীত হয়, যথা—মূত্রাশয়, গবিনী ইত্যাদি, সেইসব অঙ্গে ট্রানজিশনাল আবরণী কলা দেখা যায়। শিথিল অবস্থায় এই প্রকার কলায় 4-5টি কোষস্তর চোখে পড়ে, কিন্তু স্ফীত অবস্থায় মাত্র দুটি স্তর দেখা যায় (চিত্র 4.26 ঘ)। এই কলায় স্তম্ভাকার, ঘনকাকার, চ্যাপ্টা প্রভৃতি নানা রকমের কোষ থাকে।

প্রাপ্তিস্থল : মূত্রাশয়, গবিনী (ureter) ইত্যাদির অন্তর্গাত্র।

কোষের আকৃতি অনুসারে আবরণী কলাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ (i) স্কোয়ামাস বা শল্কাকার আবরণী কলা, (ii) কিউবিক্যাল বা ঘনকাকার আবরণী কলা ও (iii) কলামনার বা স্তম্ভাকার আবরণী কলা।

(i) **স্কোয়ামাস বা শল্কাকার আবরণী কলা** (Squamous epithelium)ঃ এই কলার কোষগুলি শল্ক বা আঁশের মত **পাতলা ও চ্যাপ্টা**, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের তুলনায় এদের বেধ (thickness) অত্যন্ত কম। কোষগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে লেগে থাকে। কোষগুলি বহুভুজাকার এবং এদের প্রান্তদেশ তরঙ্গায়িত। প্রত্যেক কোষে একটি করে নিউক্লিয়াস থাকে (চিত্র 4.27)।

চিত্র 4.27 ঃ শল্কাকার আবরণী কলা।

স্কোয়ামাস আবরণী কলা **সরল** অথবা **স্তরীভূত** হতে পারে।

(a) **সরল স্কোয়ামাস আবরণী কলা**ঃ এই কলায় কোষগুলি একটিমাত্র স্তরে সাজানো থাকে এবং প্রত্যেকটি কোষ ভিত্তি পর্দার সঙ্গে লেগে থাকে।

প্রাপ্তিস্থলঃ রক্তবাহের ভিতর গাত্রে, পেরিটোনিয়াম, বাওম্যানের ক্যাপসুল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

(b) **স্তরীভূত স্কোয়ামাস আবরণী কলা**ঃ এই কলায় কোষগুলি বহু স্তরে সজ্জিত থাকে। তবে ভিত্তি পর্দা সংলগ্ন কোষগুলি ঘনকাকার, এমনকি স্তম্ভাকারও হতে পারে, কিন্তু বাইরের দিকের অর্থাৎ মুক্ত প্রান্তের দিকের কোষগুলি শল্কাকার হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষত চর্মে, সবচেয়ে বাইরের দিকের স্তরটির কোষগুলি জীবিত থাকে না। এই মৃত কোষগুলি স্বভাবতই নিউক্লিয়াসবিহীন হয় এবং তাদের সাইটোপ্লাজমে **কেরাটিন** (keratin) নামে একপ্রকার প্রোটীন জমা হয়। কিন্তু দেহের ভিতরে অবস্থিত (যথা—মুখবিবর, গ্রাসনালী ইত্যাদির) আবরণী কলার বহির্গাত্রের কোষগুলি কখনও মৃত হয় না।

প্রাপ্তিস্থলঃ চর্ম এবং মুখবিবর, গ্রাসনালী (Oesophagus) ইত্যাদির অন্তর্গাত্র।

(ii) **কিউবিক্যাল বা ঘনকাকার আবরণী কলা** (Cubical or Cuboidal epithelium)ঃ এই কলার কোষগুলি **ঘনক্ষেত্রের** (Cube) **আকৃতিবিশিষ্ট**, অর্থাৎ তাদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ সমান। কোষগুলি সাধারণত বহুভুজাকার (চিত্র 4.28)। প্রত্যেক কোষে সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে।

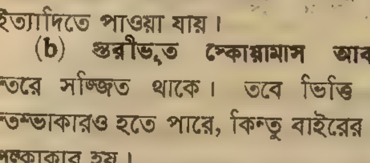

চিত্র 4.28 ঃ ঘনকাকার আবরণী কলা।

প্রাপ্তিস্থলঃ থাইরয়েড গ্রন্থি, লালা গ্রন্থি, রেনাল টিউবিউল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

(iii) কলামনার বা স্তম্ভাকার আবরণী কলা (Columnar epithelium) **:** এই কলার কোষগুলি **লম্বা ও স্তম্ভের** (pillar) **আকৃতিবিশিষ্ট**। প্রত্যেক কোষে সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কোষের মুক্ত প্রান্তে **মাইক্রোভিলাই** থাকে।

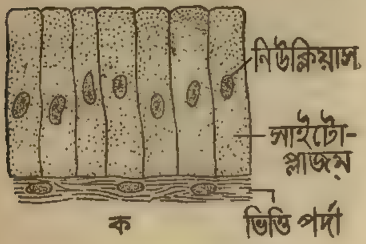

চিত্র 4.29 : সরল স্তম্ভাকার আবরণী কলা।

স্তম্ভাকার আবরণী কলা **সরল** অথবা **স্তরীভূত** হতে পারে।

(a) সরল স্তম্ভাকার আবরণী কলা : এই কলায় কোষগুলি একটিমাত্র স্তরে সজ্জিত থাকে এবং প্রত্যেকটি কোষ ভিত্তি পর্দার সঙ্গে লেগে থাকে। এই প্রকার কলায় স্তম্ভাকার কোষের মাঝে মাঝে ডিম্বাকার কিছু কোষ দেখা যায়, যেগুলিকে **'গব্‌লেট কোষ'** (goblet cells) বলা হয়। এগুলি প্রকৃতপক্ষে এককোষী শৈলষ্মিক গ্রন্থি (mucous glands)। স্তম্ভাকার কোষ রূপান্তরিত হয়ে গব্‌লেট কোষে পরিণত হয় (চিত্র 4.29 ও 4.30)।

প্রাপ্তিস্থল : পাকস্থলী থেকে শুরু করে বৃহদন্ত্র পর্যন্ত খাদ্যনালীর অন্তর্গাত্রে পাওয়া যায়।

(b) স্তরীভূত স্তম্ভাকার আবরণী কলা : এই প্রকার কলায় মুক্ত প্রান্তের দিকের কোষগুলি সাধারণত স্তম্ভাকার হয়—ভিত্তি পর্দার কাছাকাছি অবস্থিত কোষগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ও বহুভুজাকার হয়। এই প্রকার কলা নামমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়।

প্রাপ্তিস্থল : গলনালীর (Pharynx) অন্তর্গাত্র, আলজিভ (Epiglottis) ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

সিলিয়াযুক্ত বা রোমশ আবরণী কলা (Ciliated epithelium) **:** আবরণী কলার কোষগুলিতে **সিলিয়া** থাকলে, তাকে সিলিয়াযুক্ত আবরণী কলা বলে। কেবলমাত্র **ঘনকাকার ও স্তম্ভাকার** আবরণী কলা সিলিয়াযুক্ত হয়। কোষগুলির মুক্ত প্রান্তে সিলিয়া থাকে (চিত্র 4.30)। এক একটি কোষে 20-30টি সিলিয়া থাকতে পারে। প্রত্যেক সিলিয়া কোষের ভিতর অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র কণিকা (বেসাল কণিকা) থেকে উৎপন্ন হয়। স্তরীভূত আবরণী কলার কেবলমাত্র মুক্ত প্রান্তের কোষগুলি সিলিয়াযুক্ত হয়।

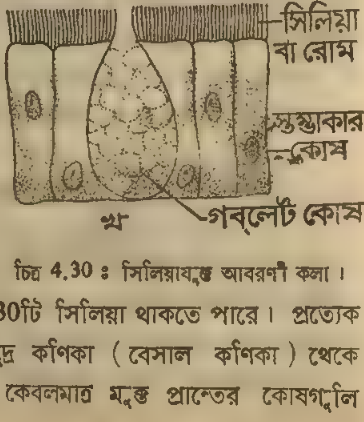

চিত্র 4.30 : সিলিয়াযুক্ত আবরণী কলা।

প্রাপ্তিস্থল : শ্বাসনালী, ব্রংকাস, ফ্যালোপিয়ান নালী, জরায়ু ইত্যাদির অন্তর্গাত্রে এই কলা পাওয়া যায়।

সংজ্ঞাবহ বা সংবেদনশীল আবরণী কলা (Sensory epithelium) **:** সংজ্ঞাবহ আবরণী কলার কোষগুলি **স্তম্ভাকার** হয় এবং তাদের মুক্ত প্রান্তে কয়েকটি সিলিয়া বা সূক্ষ্ম রোমের মত অংশ থাকে। তাছাড়া, কোষগুলি সংজ্ঞাবহ নার্ভতন্তুর সঙ্গে যুক্ত থাকে (চিত্র 4.31)।

প্রাপ্তিস্থল : চর্ম, নাসাবিবর, জিহ্বার স্বাদ-কোরক ইত্যাদিতে এই কলা পাওয়া যায়।

চিত্র 4.31 : সংজ্ঞাবহ আবরণী কলা।

গ্রন্থিময় আবরণী কলা (Glandular epithelium) **:** গ্রন্থি থেকে হরমোন, এনজাইম প্রভৃতি নানাপ্রকার বস্তু ক্ষরিত হয়। আবরণী কলা থেকেই গ্রন্থির উৎপত্তি ঘটে। এ-সম্পর্কে 'ক্ষরণ কলা' বা 'গ্রন্থি কলা' [208 নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য] পৃথক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আবরণী কলার কার্য (Functions of epithelial tissue) **:** (i) প্রাণিদেহকে বাইরের আঘাত ও জীবাণুর আক্রমণ থেকে **রক্ষা** করে (যথা—চর্মের আবরণী কলা)। (ii) শ্বাসনালীর এপিথেলিয়ামের গব্‌লেট কোষ বাতাসের সঙ্গে প্রবিষ্ট ধূলিকণা, ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদিকে আটক করে এবং সিলিয়াযুক্ত কোষ সেগুলিকে বাইরের দিকে তাড়িত করে **রক্ষাকারী** ভূমিকা পালন করে। (iii) পাচিত খাদ্যবস্তুর **শোষণে** সাহায্য করে (যথা—খাদ্যনালীর স্তম্ভাকার আবরণী কলা)। (iv) বিভিন্ন বস্তুর **ক্ষরণে ও রেচনে** সাহায্য করে (যথা—গ্রন্থিময় আবরণী কলা)। (v) বাহ্য **উদ্দীপনা গ্রহণে** সাহায্য করে (যথা—নাসাবিবরে অবস্থিত 'ঘ্রাণ গ্রহণকারী আবরণী কলা' এবং জিহ্বার স্বাদ-কোরকে অবস্থিত 'স্বাদ গ্রহণকারী আবরণী কলা')।

আবরণী কলার প্রকারভেদের ছক

● **গঠনভিত্তিক :**

আবরণী কলা

- সরল
  - (a) শল্কাকার
  - (b) ঘনকাকার
  - (c) স্তম্ভাকার
  - (d) সিলিয়াযুক্ত বা রোমশ
- স্তরীভূত
  - (a) শল্কাকার
  - (b) স্তম্ভাকার
  - (c) সিলিয়াযুক্ত বা রোমশ
- ছদ্মস্তরীভূত
- ট্রানজিশনাল বা পরিবর্তনীয়

● **কর্মভিত্তিক ঃ**

আবরণী কলা
- রক্ষাকারী
- সংজ্ঞাবহ বা সংবেদনশীল
- গ্রন্থিময় বা ক্ষরণকারী

B. যোগকলা

দেহের বিভিন্ন কলার ছোট ছোট অংশকে যুক্ত করার কাজ করে যোগকলা। তাছাড়া দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ রক্ষার এবং দেহের অংশবিশেষের অথবা সমগ্র দেহের ভার বহনের কাজও করে এই কলা। অতএব, **যে কলা বিভিন্ন কলার ছোট ছোট অংশকে যুক্ত করে, দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে এবং দেহের অংশবিশেষের অথবা সমগ্র দেহের ভার বহনের কাজ করে, তাকে যোগকলা বলে।**

বৈশিষ্ট্য (Characteristics) ঃ (i) আবরণী কলার তুলনায় যোগকলায় কোষের সংখ্যা কম থাকে, কিন্তু (ii) আন্তঃকোষীয় পদার্থ বা ধাত্র থাকে প্রচুর পরিমাণে ; (iii) আন্তঃকোষীয় পদার্থের পরিমাণ বেশী হওয়ার জন্য কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে না। (iv) ধাত্রে কোষ ছাড়াও নানাপ্রকার তন্তু (fibres) থাকে। (v) কোন কোন যোগকলায় রক্তবাহ থাকে।

শ্রেণীবিভাগ (Classification) ঃ তন্তুর প্রকার ও তাদের বিন্যাস পদ্ধতির উপর নির্ভর করে এবং ধাত্রের প্রকৃতি বিচার করে যোগকলাকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—(1) প্রকৃত যোগকলা (Connective tissue proper), (2) তরুণাস্থি বা কোমলাস্থি (Cartilage), (3) অস্থি (Bone), (4) রক্তোৎপাদক কলা (Haemopoietic tissue) ও (5) সংবহন কলা (Vascular tissue)।

পরিণত প্রাণীর দেহে প্রাপ্ত উক্ত কয়েক রকমের যোগকলা ছাড়াও ভ্রূণের দেহে আরও দু রকমের বিশেষ ধরনের যোগকলা পাওয়া যায়, যথা—(i) মেসেনকাইম (Mesenchyme) ও (ii) জেলিসদৃশ যোগকলা (Jelly-like connective tissue)।

ভ্রূণজ যোগকলা (Embryonic Connective tissue) ঃ

(i) **মেসেনকাইম ঃ** কেবলমাত্র ভ্রূণের দেহেই এই প্রকার যোগকলা পাওয়া যায়। এই প্রকার যোগকলা থেকেই পরিণত প্রাণীদের সমস্ত প্রকার যোগকলার উৎপত্তি হয়।

(ii) **জেলিসদৃশ যোগকলা ঃ** পরিণত প্রাণীদের শিথিল যোগকলার সঙ্গে এই কলার অনেক মিল আছে। এই কলায় ধাত্রের পরিমাণ খুব বেশী এবং এটি জেলির মত নরম ও থকথকে। কোষগুলি লম্বা-লম্বা প্রবর্ধকযুক্ত এবং তারকার মত আকৃতিবিশিষ্ট। তন্তুগুলি খুব সরু-সরু ও কোলাজেন নির্মিত।

প্রাপ্তিস্থল : ভ্রূণের চর্মের নিচে ও নাভিরজ্জুতে (Umbilical cord) এই কলা থাকে। তাছাড়া, পরিণত প্রাণীদের চোখের 'ভিট্রিয়াস হিউমর'-ও এই কলায় গঠিত।

পরিণত প্রাণীর যোগকলা (Adult Connective tissue) :

(1) **প্রকৃত যোগকলা** (Connective tissue proper) : এই কলার আন্তঃকোষীয় পদার্থ বা ধাত্রটি **নরম**। প্রকৃত যোগকলা প্রধানত তিন রকমের—(a) শিথিল যোগকলা (Loose Connective tissue) বা এরিওলার কলা (Areolar tissue), (b) ঘন যোগকলা (Dense Connective tissue) ও (c) বিশেষ যোগকলা (Special Connective tissue)।

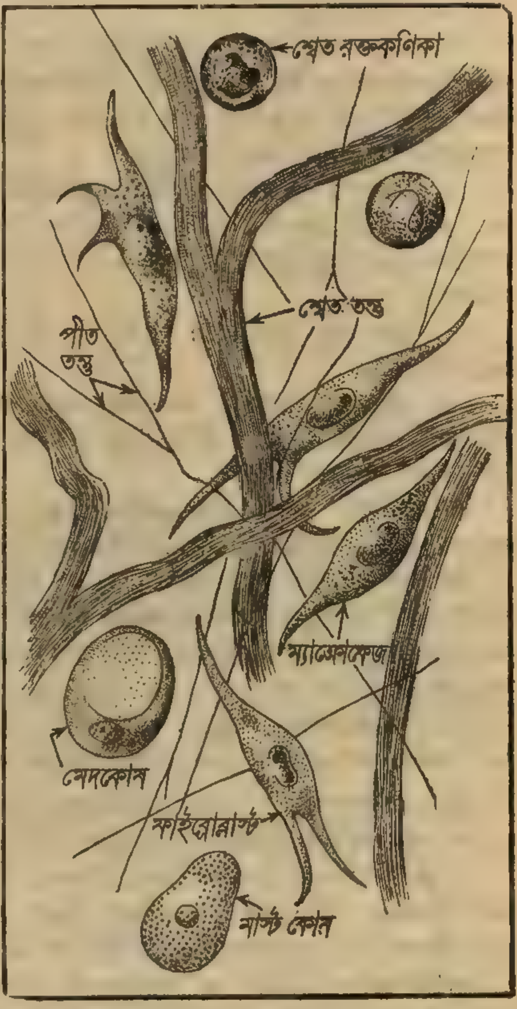

চিত্র 4.32 : শিথিল যোগকলা।

(a) **শিথিল যোগকলা বা এরিওলার কলা :** (i) এই কলার ধাত্র স্বচ্ছ ও অনিয়তাকার (amorphous), অর্থাৎ কোনপ্রকার কেলাসবিহীন। (ii) এই কলায় দু রকমের তন্তু পাওয়া যায়—**শ্বেত তন্তু** (white fibres) ও **পীত তন্তু** (yellow fibres) [চিত্র 4.32]।

শ্বেত তন্তুগুলি অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুর (fibrils) দ্বারা গঠিত এবং তরঙ্গায়িত ভাবে বিন্যস্ত থাকে। এই তন্তুগুলি মোটেই স্থিতিস্থাপক (elastic) নয় এবং কোলাজেন (collagen) নামক রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি।

পীত তন্তুগুলি শ্বেত তন্তুর তুলনায় অনেক সূক্ষ্ম এবং শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে জালের আকার ধারণ করে। এই তন্তুগুলি খুবই স্থিতিস্থাপক এবং ইলাস্টিন

(elastin) নামক রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। (iii) ধাত্র ও তন্তু ছাড়া এই কলায় কয়েক প্রকার কোষও পাওয়া যায়, যদিও কলার সামগ্রিক পরিমাণের তুলনায় কোষের পরিমাণ কম। নিম্নলিখিত কোষগুলি এই কলায় পাওয়া যায়ঃ

(ক) লম্বা প্রবর্ধকযুক্ত এবং কিছুটা মাকুর (spindle) আকৃতিবিশিষ্ট **ফাইব্রোব্লাস্ট** বা **ফাইব্রোসাইট** (Fibroblasts or Fibrocytes)। এই কোষ থেকে তন্তু ও ধাত্র উৎপন্ন হয়।

(খ) মাকুর মত অথবা তারার মত দেখতে **ম্যাক্রোফেজ** বা **হিস্টিওসাইট** (Macrophages or Histiocytes)। ফাইব্রোব্লাস্টের সঙ্গে এদের আকৃতির গভীর মিল থাকায়, এই দুই রকমের কোষকে সহজে পৃথক করা যায় না। মৃত কোষ ও রোগজীবাণুকে এরা আত্মসাৎ করে।

(গ) দানাদার (granular) সাইটোপ্লাজমযুক্ত **মাস্ট কোষ** (Mast cells)। এই কোষ থেকে হেপারিন (heparin) ও হিস্টামিন (histamine) উৎপন্ন হয়। হেপারিন রক্তনালীতে প্রবহমান রক্তের তঞ্চন প্রতিহত করে এবং হিস্টামিন রক্তজালকের ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে।

(ঘ) **মেদ কোষ** (Adipose cells)ঃ এই কোষে মেদ সংশ্লেষিত হয় ও জমা থাকে।

(ঙ) চলন ক্ষমতাবিশিষ্ট **নানাপ্রকার শ্বেত রক্তকণিকা** (যথা—লিম্ফোসাইট, মনোসাইট, ইওসিনোফিল ও নিউট্রোফিল)। এই কোষগুলি দেহে অনুপ্রবিষ্ট রোগজীবাণুদের ধ্বংস করে।

প্রাপ্তিস্থল ঃ চামড়ার নিচে একটি অবিচ্ছিন্ন স্তর (অন্তস্ত্বক) রূপে, পেশী ও রক্তবাহের চারদিকে আচ্ছাদন রূপে এবং সন্ধিস্থলে (joints) এই কলা পাওয়া যায়।

কার্য ঃ এই কলা বিভিন্ন কলার ছোট-ছোট অংশকে যুক্ত করে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, পেশী তন্তুগুলি এই কলা দ্বারা একসঙ্গে বাঁধা থাকে); মেসেনটেরি পর্দারূপে বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রকে স্বস্থানে ধরে রাখে; বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানগুলি ভরাট করার জন্য প্যাকিং বস্তুর কাজ করে; মৃত কোষ ও রোগজীবাণুকে বিনষ্ট করে। তাছাড়া, শিথিল যোগকলা অত্যন্ত নমনীয় হওয়ার জন্য অন্যান্য কলার যেসব ছোট ছোট অংশকে এটি যুক্ত করে তাদের পরস্পরের মধ্যে সঞ্চালন সহজতর হয়।

(b) **ঘন যোগকলা ঃ** শিথিল যোগকলার তুলনায় এই কলায় তন্তুর পরিমাণ অনেক বেশী এবং সেই তুলনায় ধাত্র ও কোষের পরিমাণ অনেক কম থাকে।

তন্তুর বিন্যাস পদ্ধতি অনুযায়ী ঘন যোগকলা দুরকমের—**নিয়মিত** (Regular) এবং **অনিয়মিত** (Irregular)। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে তন্তুগুলি পরস্পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করে এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে তন্তুগুলি এলোমেলোভাবে ছড়ানো থাকে।

প্রাপ্তিস্থল ঃ নিয়মিত ঘন যোগকলার উদাহরণ—টেনডন*, লিগামেন্ট**, কর্নিয়া ইত্যাদি। অনিয়মিত ঘন যোগকলার উদাহরণ—চর্মের আবরণী কলার নিচে অবস্থিত 'ভিত্তি পর্দা', 'পেরিঅস্টিয়াম' (অস্থির বহির্ভাগের আচ্ছাদন) ইত্যাদি।

* এরা পেশীকে অস্থির সঙ্গে যুক্ত করে।

** সন্ধিস্থলে দুটি অস্থিকে যুক্ত করে—ফলে অস্থির স্থানচ্যুতি রোধ হয়।

কার্য ঃ এই কলা নির্দিষ্ট অঙ্গকে সুদৃঢ় করে।

(c) **বিশেষ যোগকলা ঃ** শিথিল ও ঘন যোগকলা ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ ধরনের যোগকলা দেখা যায়, যথা—**মেদকলা** (Adipose tissue), **জালিকাকার যোগকলা** (Reticular Connective tissue) এবং **রঞ্জকযুক্ত যোগকলা** (Pigmented Connective tissue)।

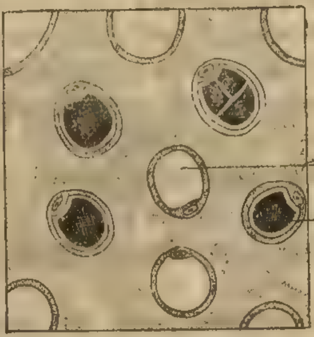

চিত্র 4.33 ঃ মেদকলা।

মেদকলা ঃ (i) এইরূপ যোগকলায় অন্যান্য কোষের তুলনায় মেদ কোষের সংখ্যা অনেক বেশী থাকে।

(ii) মেদ কোষের মাঝখানে মেদকণা জমা হওয়ার ফলে সাইটোপ্লাজমটি নিউক্লিয়াস সহ কোষের পরিধির দিকে সরে যায় এবং সেখানে একটি পাতলা স্তর রূপে বিরাজ করে (চিত্র 4.33)।

(iii) মেদ কোষ ছাড়া এই কলায় শিথিল যোগকলায় প্রাপ্ত অন্যান্য উপাদানও থাকে।

চিত্র 4.34 ঃ প্লীহায় জালিকাকার যোগকলা।

প্রাপ্তিস্থল ঃ দেহের প্রায় সর্বত্রই চর্মের নিচে মেদকলা থাকে। তবে উদর, গ্রীবা, স্তন প্রভৃতি অঞ্চলে এই কলা অনেক বেশী পরিমাণে দেখা যায়।

কার্য ঃ দেহে তাপ সংরক্ষণ এবং দেহকে কোমলতা দান করে।

জালিকাকার যোগকলা ঃ এই কলা অনেকটা শিথিল যোগকলার মতই, তবে এর নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন—(i) কোষগুলি সূক্ষ্ম প্রবর্ধকযুক্ত (projections) এবং সন্নিহিত কোষসমূহের প্রবর্ধকগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে জালের আকার ধারণ করে। (ii) শ্বেত তন্তুর গুচ্ছগুলি অনেক সরু এবং তারা জালের আকারে বিস্তৃত থাকে (চিত্র 4.34)।

প্রাপ্তিস্থল ঃ যকৃৎ, প্লীহা, বিভিন্ন লসিকা গ্রন্থি, অস্থি-মজ্জা (bone marrow) প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

কার্য ঃ নির্দিষ্ট অঙ্গগুলির মূল কাঠামো গঠন করে ; দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

রঙ্গকযুক্ত যোগকলা ঃ এই কলা শিথিল যোগকলার মতই ; তবে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে, এই কলায় **ক্রোমাটোফোর** (Chromatophore) বা রঙ্গকযুক্ত কোষ থাকে। এই কোষগুলি লম্বা শাখাবিশিষ্ট এবং এদের সাইটোপ্লাজমে বহু রঙিন কণিকা থাকে (চিত্র 4.35)।

চিত্র 4.35 ঃ রঙ্গকযুক্ত যোগকলা।

প্রাপ্তিস্থল ঃ চর্ম, চোখের কনীনিকা (iris) ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

কার্য ঃ প্রখর সূর্যালোকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেহের কলাসমূহকে রক্ষা করে।

(2) **তরুণাস্থি বা কোমলাস্থি** (Cartilage) ঃ (i) তরুণাস্থির ধাত্রটি বেশ দৃঢ় কিন্তু নমনীয়, অনেকটা রবারের মত, ফলে তরুণাস্থিকে সহজেই কাটা যায়। (ii) ধাত্রটি প্রধানত **কনড্রোমিউকোপ্রোটীন** (Chondromucoprotein) নামে একটি জৈব রাসায়নিক বস্তু দিয়ে তৈরি। (iii) তরুণাস্থির ধাত্রের মধ্যে **কনড্রোসাইট** (Chondrocytes) বা তরুণাস্থি কোষ ছড়ানো থাকে। (iv) এই কলার পরিধির দিকে কোষের সংখ্যা বেশী এবং কেন্দ্রের দিকে ঐ সংখ্যা কম থাকে।

(v) প্রতিটি কোষ এক-একটি ফাঁকা জায়গা বা **ল্যাকুনা** (Lacuna)-র মধ্যে অবস্থান করে (চিত্র 4.36 ক)। (vi) কোষগুলির বিভাজনের প্রবণতা আছে ; ফলে এক-একটি ল্যাকুনার মধ্যে অনেক সময় দুটি বা চারটি করে কোষও দেখা যায়। (vii) কোষগুলি থেকেই ধাত্রের সৃষ্টি হয়। (viii) তরুণাস্থির মধ্যে নার্ভ ও রক্তবাহ থাকে না। (ix) ঘন যোগকলার একটি আবরণ দিয়ে প্রতিটি তরুণাস্থি চারদিক থেকে ঘেরা থাকে—ঐ আবরণের নাম **পেরিকনড্রিয়াম** (Perichondrium)।

তরুণাস্থি চার রকমের—(a) হায়ালিন (Hyaline) বা কাচিক তরুণাস্থি, (b) ইলাস্টিক (Elastic) বা স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি, (c) ফাইব্রাস (Fibrous) বা তন্তুময় তরুণাস্থি এবং (d) ক্যালসিফায়েড (Calcified) বা ক্যালসিয়াম-ঘটিত তরুণাস্থি।

(a) **হায়ালিন বা কাচিক তরুণাস্থি :** (i) এই প্রকার তরুণাস্থি তাজা অবস্থায় ঘষা কাচের মত কিছুটা স্বচ্ছ দেখায়—তাই এর নাম **কাচিক তরুণাস্থি**। (ii) এই প্রকার তরুণাস্থির ধাত্রটি তন্তুবিহীন বলে মনে হলেও অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম শ্বেত তন্তু সেখানে উপস্থিত থাকে, কিন্তু ঐ তন্তুগুলির প্রতিসরাঙ্ক (refractive index) ধাত্রটির প্রতিসরাঙ্কের সমান হওয়ায় সহজে তাদের দেখা যায় না। (iii) ধাত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তরুণাস্থি কোষ উপস্থিত থাকে।

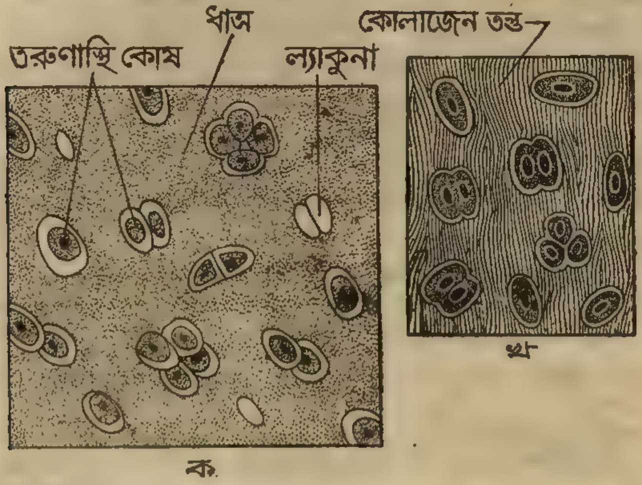

চিত্র 4.36 : (ক) হায়ালিন তরুণাস্থির ছেদ ; (খ) ফাইব্রাস তরুণাস্থির ছেদ।

প্রাপ্তিস্থল : নাসিকার অগ্রভাগে, শ্বাসনালী (Trachea) ও ব্রংকাসে এবং পঞ্জরাস্থির (Ribs) অগ্রপ্রান্তে এই প্রকার তরুণাস্থি আছে।

(b) **ইলাস্টিক বা স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি :** (i) এই প্রকার তরুণাস্থি পীত বর্ণের এবং অস্বচ্ছ। (ii) এদের ধাত্রে অসংখ্য স্থিতিস্থাপক পীত তন্তু উপস্থিত থাকে। ঐ তন্তুগুলি শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে জালের আকারে সমস্ত কলাটিতে অবস্থান করে। ফলে এই প্রকার তরুণাস্থি বেশ স্থিতিস্থাপক। (iii) স্থিতিস্থাপক

তরুণাস্থিতে পীত তন্তু ছাড়াও কাচিক তরুণাস্থির মত শ্বেত তন্তুও থাকে, যদিও তাদের পরিমাণ অনেক কম। (iv) ধাত্রে বৈশিষ্টাপূর্ণ তরুণাস্থি কোষ উপস্থিত থাকে।

প্রাপ্তিস্থল : মানুষের কর্ণছত্র, আলজিভ (Epiglottis), ইউস্টেসিয়ান নালী ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

(c) **ফাইব্রাস বা তন্তুময় তরুণাস্থি :** (i) তরুণাস্থিগুলির মধ্যে তন্তুময় তরুণাস্থি সবচেয়ে দৃঢ় (Resistant)—তার কারণ এই প্রকার তরুণাস্থিতে ধাত্র ও কোষের তুলনায় তন্তুর পরিমাণ অনেক বেশী (চিত্র 4.36 খ)। (ii) তন্তুগুলি শ্বেত তন্তু বা কোলাজেন তন্তু এবং তরঙ্গায়িত গুচ্ছ হিসেবে তাদের দেখা যায়। (iii) ধাত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তরুণাস্থি কোষ থাকে। কখনও কখনও কোষগুলি লম্বা লম্বা সারিতে সাজানো থাকে।

প্রাপ্তিস্থল : আমাদের মেরুদণ্ডের প্রতিজোড়া কশেরুকার মাঝখানে চাকতির আকারে এই প্রকার তরুণাস্থি পাওয়া যায়।

(d) **ক্যালসিফায়েড বা ক্যালসিয়াম-ঘটিত তরুণাস্থি :** কাচিক তরুণাস্থির ধাত্রে ক্যালসিয়াম লবণ জমা হওয়ার ফলে এই প্রকার তরুণাস্থির সৃষ্টি হয়।

প্রাপ্তিস্থল : হাঙর ও অন্যান্য তরুণাস্থিবিশিষ্ট মাছের পূর্ণাঙ্গ দশায় অন্তঃকঙ্কালের বেশীর ভাগ অংশে এই প্রকার তরুণাস্থি পাওয়া যায়।

তরুণাস্থির কার্য : (i) অস্থির সন্ধিস্থলে অবস্থিত তরুণাস্থি (যথা—কশেরুকা-মধ্যবর্তী তরুণাস্থি) ঘর্ষণজনিত ক্ষয় থেকে অস্থিকে রক্ষা করে। (ii) তাছাড়া, সন্ধিস্থলে অবস্থিত তরুণাস্থি ভার বহনের কাজও করে। (iii) শ্বাসনালী, ইউস্টেসিয়ান নালী প্রভৃতিতে উপস্থিত তরুণাস্থি উক্ত অঙ্গগুলির চুপসানো রোধ করে। (iv) অন্যান্য অঙ্গে উপস্থিত তরুণাস্থি নির্দিষ্ট অঙ্গটিকে দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা দান করে। (v) অস্থি গঠনে কাচিক তরুণাস্থি প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। কেননা, এই প্রকার তরুণাস্থির ধাত্রে ক্যালসিয়াম লবণ জমা হওয়ার ফলে অস্থি গঠিত হয়।

কাচিক, স্থিতিস্থাপক ও তন্তুময় তরুণাস্থির পার্থক্য :

কাচিক	স্থিতিস্থাপক	তন্তুময়
1. ঘষা কাচের মত দেখতে।	1. পীত বর্ণের।	1. পীত বর্ণের নয়।
2. তন্তুর তুলনায় ধাত্র ও কোষের আধিক্য দেখা যায়।	2. ধাত্র ও কোষের পরিমাণ মাঝামাঝি ধরনের।	2. ধাত্র ও কোষের তুলনায় তন্তুর পরিমাণ অনেক বেশী।
3. কেবলমাত্র শ্বেত তন্তু বর্তমান।	3. যদিও শ্বেত ও পীত দু প্রকার তন্তুই পাওয়া যায়, তথাপি পীত তন্তু পরিমাণে অনেক বেশী থাকে।	3. কেবলমাত্র শ্বেত তন্তু বর্তমান।
4. কোষগুলি কখনও লম্বা-লম্বা সারিতে সাজানো থাকে না।	4. কোষগুলি কখনও লম্বা-লম্বা সারিতে সাজানো থাকে না।	4. কোষগুলি ক্ষেত্রবিশেষে লম্বা-লম্বা সারিতে সাজানো থাকে।

(3) **অস্থি** (Bone) ঃ (i) অন্যান্য যোগকলার মত অস্থিও কোষ ও ধাত্র দিয়ে তৈরি। (ii) অস্থির ধাত্রে নানাপ্রকার অজৈব লবণ থাকার জন্য ধাত্রটি বেশ শক্ত ও মজবুত। (iii) অজৈব লবণগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে থাকে ক্যালসিয়াম ফসফেট।

একটি পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, অস্থিতে বিভিন্ন অজৈব লবণের শতকরা পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

ক্যালসিয়াম ফসফেট— 85·62%
ক্যালসিয়াম কার্বনেট— 9·06%
ক্যালসিয়াম ফ্লুওরাইড— 3·57%
ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট— 1·75%

(iv) অজৈব বস্তু ছাড়াও ধাত্রে কিছু জৈব বস্তু থাকে। জৈব বস্তুগুলির মধ্যে 95% কোলাজেন নির্মিত তন্তু বা শ্বেত তন্তু। (v) অস্থির ধাত্রে তিন রকমের কোষ দেখা যায়, যথা—

(*a*) **অস্টিওব্লাস্ট** (Osteoblasts) ঃ এই কোষ থেকে ধাত্র উৎপন্ন হয়। অস্থির বর্ধনশীল অংশে এদের দেখা যায়।

(*b*) **অস্টিওসাইট** (Osteocytes) ঃ অস্থির পরিণত অংশে এই প্রকার কোষ দেখা যায়। বস্তুত, এই কোষগুলি ধাত্র পদার্থের মধ্যে আটক পড়া অস্টিওব্লাস্ট। নিজেদের সক্রিয়তায় উৎপন্ন ধাত্রের মধ্যেই এরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর বা ল্যাকুনার মধ্যে এরা থাকে। কোষগুলি লম্বা-লম্বা প্রবর্ধকযুক্ত।

(*c*) **অস্টিওক্লাস্ট** (Osteoclasts) ঃ এরা বহু (20-50টি) নিউক্লিয়াসযুক্ত অতিকায় কোষ। অস্থির অংশবিশেষকে এরা ধ্বংস করে—ফলে অস্থি তার নির্দিষ্ট আকৃতি লাভ করে। কেহ কেহ মনে করেন, অনেকগুলি অস্টিওব্লাস্ট বা অস্টিওসাইট মিলিত হয়ে এক-একটি অস্টিওক্লাস্ট গঠিত হয়। অস্টিওক্লাস্টগুলি সাধারণত তাদের দেহ থেকে নিঃসৃত প্রোটীন বিশ্লিষ্টকারী উৎসেচকের সাহায্যে অস্থিকলাকে ধ্বংস করে—পিনোসাইটোসিস বা ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে নয়।

অস্থির প্রকারভেদ (Types of bones) ঃ কাঠিন্য ও ঘনত্বের (density) ভিত্তিতে অস্থিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—(*a*) ঘনসন্নিবিষ্ট অস্থি (Compact bone) ও (*b*) স্পঞ্জসদৃশ অস্থি (Spongy bone or cancellated bone)।

(*a*) **ঘনসন্নিবিষ্ট অস্থি** ঃ আমাদের লম্বা অস্থিগুলির, যথা—ফিমার, হিউমারাস ইত্যাদির দু প্রান্ত ও মজ্জা (marrow) অংশ ব্যতীত বাকী অংশটি ঘনসন্নিবিষ্ট অস্থি। এই প্রকার অস্থি খুব কঠিন এবং এর ধাত্র খুব ঘনসন্নিবিষ্ট।

(i) এই রকম লম্বা অস্থির মাঝখানে স্পঞ্জসদৃশ অস্থি দ্বারা গঠিত একটি গহ্বর থাকে—যার নাম **মজ্জা-গহ্বর** (marrow cavity)। (ii) অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য নালী, **হ্যাভারসিয়ান নালী** (Haversian canal), অস্থিকলার ভিতর দিয়ে লম্বালম্বি ভাবে

বিস্তৃত থাকে (চিত্র 4.37)। (iii) আড়াআড়ি ও তির্যক ভাবে বিন্যস্ত কতকগুলি নালী হ্যাভারসিয়ান নালীগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে এবং মজ্জা-গহ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে। ঐ নালীগুলির নাম **ভল্কম্যান-বর্ণিত** নালী। হ্যাভারসিয়ান ও ভল্কম্যান-বর্ণিত নালীগুলির ভিতর দিয়ে রক্তবাহ, লসিকাবাহ ও নার্ভ অস্থির সর্বত্র ছড়ানো থাকে। (iv) অস্থির খুব সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি হ্যাভারসিয়ান

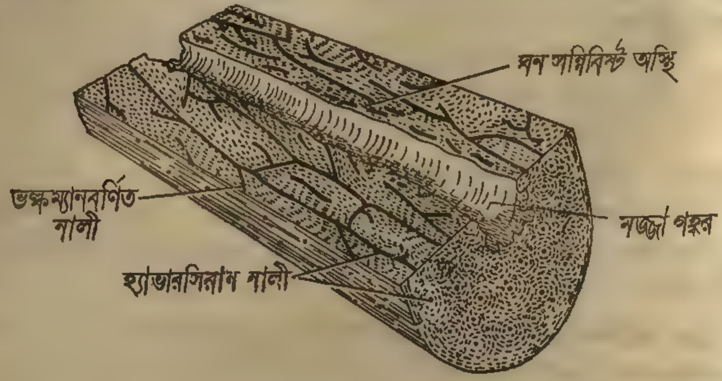

চিত্র 4.37 : কিমার অস্থির লম্বচ্ছেদ।

নালীকে ঘিরে হাড়ের ছোট-ছোট পাতলা অংশ বা **ল্যামেলা** (Lamella) চক্রাকারে সাজানো আছে (চিত্র 4.38)। এই ল্যামেলাগুলিই হল অস্থিকলার খাত্র। এদের মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গহ্বরের মত **ল্যাকুনা** দেখা যায়—যার ভিতর অস্টিওসাইট নামক কোষ অবস্থিত থাকে। (v) ল্যাকুনাগুলি পরস্পরের সঙ্গে এবং হ্যাভারসিয়ান নালীর সঙ্গে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নালিকার (Canaliculi) দ্বারা যুক্ত থাকে। অস্টিওসাইট থেকে সূক্ষ্ম সাইটোপ্লাজমীয় প্রবর্ধক সন্নিহিত নালিকাগুলির মধ্যে প্রসারিত থাকে। (vi) ঘনসন্নিবিষ্ট অস্থির বাইরের দিকে যোগকলা নির্মিত একটি আস্তরণ থাকে—ঐ আস্তরণের নাম **পেরিঅস্টিয়াম** (Periosteum)। পেরিঅস্টিয়াম এক বিশেষ ধরনের যোগকলা দ্বারা নির্মিত—কেননা, এই কলার অস্থি গঠনের ক্ষমতা আছে। (vii) পেরিঅস্টিয়াম অংশে রক্তবাহ, লসিকাবাহ, নার্ভ ইত্যাদি থাকে এবং এই অংশ থেকেই **ভল্কম্যান-বর্ণিত নালীর** উৎপত্তি হয়। (viii) মজ্জা-গহ্বরের অন্তর্গাত্রে এবং হ্যাভারসিয়ান ও ভল্কম্যান-বর্ণিত নালীগুলির অন্তর্গাত্রে **এন্ডোস্টিয়াম** (Endosteum) নামে একটি আবরণী থাকে। পেরিঅস্টিয়ামের মত এন্ডোস্টিয়ামেরও অস্থি গঠনের ক্ষমতা আছে।

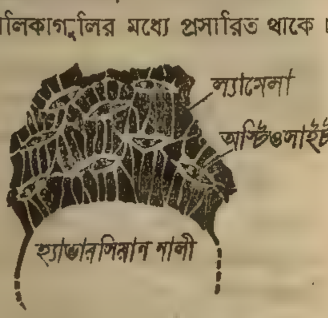

চিত্র 4.38 : অস্থির প্রস্থচ্ছেদ।

(*b*) **স্পঞ্জসদৃশ অস্থি :** চ্যাপ্টা অস্থিগুলির মধ্যভাগ, লম্বা অস্থিগুলির দু প্রান্ত ও মধ্যভাগ, কশেরুকা ইত্যাদি স্পঞ্জসদৃশ অস্থি দ্বারা গঠিত। (i) এই প্রকার

অস্থিকলার কাঠিন্য ঘনসন্নিবিষ্ট অস্থির চেয়ে কম এবং ধাত্র ঘনসন্নিবিষ্ট নয়। (ii) ধাত্রে ক্যালসিয়াম-ঘটিত লবণের পরিমাণ কম থাকে। (iii) এই প্রকার অস্থির অন্তর্ভাগ সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অস্থিকলার ব্যবধায়ক দ্বারা বহুধা বিভক্ত থাকে, ফলে এটি স্পঞ্জের আকৃতি লাভ করে। (iv) ব্যবধায়কগুলির মধ্যবর্তী গহ্বরগুলি অস্থি-মজ্জায় পূর্ণ থাকে এবং গহ্বরগুলির গাত্রে এন্ডোস্টিয়ামের আবরণ থাকে। (v) এই প্রকার অস্থিতে ল্যামেলা থাকে কিন্তু হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র থাকে না।

অস্থিকলার কার্য : (i) অস্থিকলা দেহকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা ও নির্দিষ্ট আকার দান করে। (ii) পেশীর সহযোগিতায় অঙ্গ সঞ্চালনে ও গমনে এটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। (iii) করোটি গহ্বর ও বক্ষ গহ্বরে অবস্থিত অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রগুলিকে ঘিরে একটি শক্ত কাঠামো রচনার দ্বারা যন্ত্রগুলিকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। (iv) দেহে বিভিন্ন খনিজের, বিশেষত ফসফরাস ও ক্যালসিয়ামের সঞ্চয় ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। (v) প্রয়োজনে রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস আয়ন ত্যাগ করে অথবা রক্ত থেকে তা টেনে নিয়ে দেহের আয়নিক ভারসাম্য (electrolyte balance) রক্ষা করে। (vi) রক্ত থেকে আর্সেনিক, সীসা প্রভৃতি ক্ষতিকর পদার্থকে টেনে নিয়ে রক্ত-দুষ্টি রোধ করে। (vii) অস্থিকলার ভিতর অবস্থিত মজ্জা থেকে রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়। (viii) মধ্যকর্ণে অবস্থিত অস্থিগুলি (ear ossicles) শব্দতরঙ্গকে অন্তঃকর্ণে প্রেরণ করে পরোক্ষভাবে শ্রবণে সাহায্য করে।

● তরুণাস্থি ও অস্থির পার্থক্য :

তরুণাস্থি	অস্থি
1. যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক।	1. স্থিতিস্থাপকতা খুব কম।
2. নমনীয়।	2. কঠিন।
3. ধাত্রে অজৈব বস্তু থাকে না।	3. ধাত্রে ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যাল-সিয়াম কার্বনেট প্রভৃতি অজৈব বস্তু থাকে।
4. ধাত্রে শ্বেত ও পীত তন্তু থাকে।	4. ধাত্রে কেবলমাত্র শ্বেত তন্তু থাকে।
5. কোন কোষেই সাইটোপ্লাজমীয় প্রবর্ধক থাকে না।	5. কতকগুলি কোষে (অস্টিওসাইট) সাইটোপ্লাজমীয় প্রবর্ধক থাকে।
6. 2টি বা 4টি কোষ একত্রে এক-একটি ল্যাকুনার মধ্যে থাকতে পারে।	6. কোষগুলি ল্যাকুনার মধ্যে সর্বদাই এককভাবে থাকে।
7. মজ্জা থাকে না।	7. মজ্জা থাকে।
8. হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র থাকে না।	8. হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র থাকে।
9. ভকম্যান-বর্ণিত নালী থাকে না।	9. ভকম্যান-বর্ণিত নালী থাকে।
10. রক্তবাহ থাকে না।	10. রক্তবাহ থাকে।

● আবরণী কলা ও যোগকলার পার্থক্য :

আবরণী কলা	যোগকলা
1. এই কলায় কোষের আধিক্য দেখা যায়।	1. এই কলায় কোষের সংখ্যা কম থাকে।
2. ধাত্র নামমাত্র পরিমাণে থাকে।	2. ধাত্রের পরিমাণ খুব বেশী।
3. কোষগুলি গায়ে-গায়ে লেগে থাকে।	3. কোষগুলি ছাড়া-ছাড়া ভাবে থাকে।
4. কোষগুলি সাধারণত একই রকমের হয়।	4. কোষগুলি নানা রকমের।
5. কোষগুলি একটি ভিত্তি পর্দার সঙ্গে লাগানো থাকে।	5. কোন ভিত্তি পর্দা থাকে না।
6. এই কলায় রক্তবাহ থাকে না।	6. কোন কোন যোগকলায় রক্তবাহ থাকে।
7. রক্ষণ, ক্ষরণ, রেচন, শোষণ, উদ্দীপনা গ্রহণ প্রভৃতি কাজ করে।	7. বিভিন্ন কলার ছোট ছোট অংশের সংযুক্তিকরণ, দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ সাধন, ভারবহন প্রভৃতি কাজ করে।

(4) রক্তোৎপাদক কলা (Haemopoietic tissue) **:** রক্তকণিকা উৎপাদনকারী কলাকে **রক্তোৎপাদক কলা** বলে।

রক্তোৎপাদক কলাকে নিম্নলিখিত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :

(i) **মায়েলয়েড কলা** (Myeloid tissue) ও (ii) **লিম্‌ফ্যাটিক কলা** (Lymphatic tissue)।

(i) **মায়েলয়েড কলা :** 'মায়েলস' (Myelos) শব্দের অর্থ মজ্জা (marrow) ; তাই মায়েলয়েড কলা বলতে অস্থি-মজ্জাকে বোঝায়। এই কলা থেকে **লোহিত রক্তকণিকা, গ্র্যানুলোসাইট ও অণুচক্রিকা** উৎপন্ন হয়।

(ii) **লিম্‌ফ্যাটিক কলা :** প্লীহা (Spleen), টনসিল (Tonsil), থাইমাস (Thymus) ও লসিকা গ্রন্থিতে (Lymph glands) এই কলা পাওয়া যায়। এই কলা থেকে **লিম্‌ফোসাইট** উৎপন্ন হয়।

যোগকলার কার্য (Functions of Connective tissue) **:** (i) বিভিন্ন কলার ছোট-ছোট অংশকে যুক্ত করে ; (ii) বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানগুলি ভরাট করে ; (iii) মৃত কোষ ও রোগজীবাণুকে বিনষ্ট করে ; (iv) দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে (যথা—জালিকাকার যোগকলা) ; (v) দেহে তাপ সংরক্ষণ করে ও দেহকে কোমলতা দান করে (যথা—মেদকলা) ; (vi) প্রখর সূর্যালোকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেহের কলাসমূহকে রক্ষা করে (যথা—রঙ্গকযুক্ত যোগকলা) ; (vii) দেহকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা দান করে এবং দেহের ভার বহনের কাজ করে (যথা—তরুণাস্থি ও অস্থি কলা) ; (viii) রক্তকণিকা উৎপন্ন করে (যথা—রক্তোৎপাদক কলা)।

C. পেশী কলা

পেশী কলার কোষগুলির একটি বিশেষ ধর্ম হচ্ছে, **সংকোচনশীলতা** (Contractility)। উদ্দীপনার প্রভাবে তাদের সঙ্কোচন (Contraction) ঘটে এবং উদ্দীপনা দূর হলে তাদের বিকোচন (Dilation) ঘটে। কোষগুলির এই সঙ্কোচন ও বিকোচনের ফলেই প্রাণীদের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটে এবং তাদের স্থানান্তর গমন ঘটে। অতএব, **যে কলার কোষগুলির সংকোচনশীলতার জন্য প্রাণীদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটে এবং তাদের গমনাগমন সম্ভব হয়, সেই কলাকে পেশী কলা বলে।** পেশী কলার কোষগুলির সঙ্কোচনশীলতার কারণ, তাদের মধ্যে সংকোচনক্ষম অতি সূক্ষ্ম সুতার মত এক প্রকার বস্তু থাকে, যেগুলিকে **মায়োফাইব্রিল** (Myofibril) বলে। পেশী কলার কোষগুলি দীর্ঘাকার হওয়ার জন্য তাদের **পেশী তন্তু** (Muscle fibre) বলা হয়। পেশীকোষের সাইটোপ্লাজম **সার্কোপ্লাজম** (Sarcoplasm) নামে পরিচিত।

গঠন, অবস্থান ও কাজের তারতম্য অনুসারে পেশী কলাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—(1) সরেখ পেশী (Striated muscle), (2) অরেখ বা মসৃণ পেশী (Non-striated or Smooth muscle) ও (3) হৃৎপেশী (Cardiac muscle)।

1. সরেখ পেশী (Striated muscle) **:** (i) সরেখ পেশীর পেশী তন্তুগুলি অর্থাৎ কোষগুলি দন্ড বা বেলনের আকৃতিবিশিষ্ট (Cylindrical)। (ii) প্রতিটি পেশী তন্তুতে অসংখ্য নিউক্লিয়াস থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা শতাধিক হতে পারে। বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত এইরূপ প্রাণিকোষকে **সিনসিটিয়াম** (Syncitium) বলে। (iii) নিউক্লিয়াসগুলি কোষের পরিধির কাছে থাকে। (iv) সারকোপ্লাজমে অনুদৈর্ঘ্য ভাবে অর্থাৎ লম্বালম্বি ভাবে সজ্জিত অসংখ্য সূক্ষ্ম তন্তুর মত **মায়োফাইব্রিল** থাকে। (v) সরেখ পেশীর কোষের ভিতর অনুপ্রস্থ ভাবে বা আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত অসংখ্য রেখা (band) দেখা যায়। এইজন্যই এদের নাম **সরেখ পেশী**। রেখাগুলি পর্যায়ক্রমে হালকা (light) ও গাঢ় (dark) বর্ণের (চিত্র 4.39)। (vi) প্রত্যেক মায়োফাইব্রিলেও পর্যায়ক্রমে হালকা ও গাঢ় দাগ থাকে (চিত্র 4.40) এবং পাশাপাশি অবস্থিত অসংখ্য মায়োফাইব্রিলের হালকা ও গাঢ় দাগের একত্র সমাবেশের ফলেই পেশীকোষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে হালকা ও গাঢ় রেখার সৃষ্টি হয়। (vii) মায়োফাইব্রিলের গাঢ় দাগটিকে **অ্যানাইসোট্রপিক রেখা** বা **A-ব্যান্ড** (A-band) এবং হালকা

চিত্র 4.39 : সরেখ পেশীকোষ।

দাগটিকে **আইসোট্রপিক রেখা** বা **I-ব্যান্ড** বলা হয়। আবার, প্রত্যেকটি I-ব্যান্ডের মাঝখানে একটি সরু গাঢ় রেখা থাকে—ঐ রেখাটির নাম **Z-রেখা** (Z-line)। তেমনই, গাঢ় A-ব্যান্ডের মাঝখানে একটি হালকা অঞ্চল দেখা যায়—ঐ অংশটির নাম **H-ব্যান্ড**।

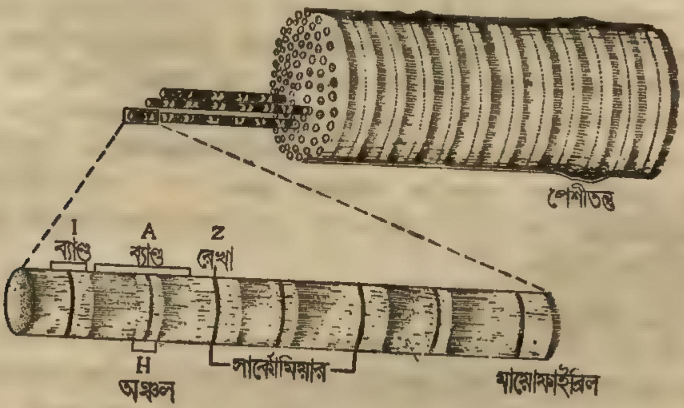

চিত্র 4.40 : সরেখ পেশী তন্তু ও মায়োফাইব্রিল।

H-ব্যান্ডের মাঝখানেও একটি গাঢ় রেখা থাকে—তার নাম **M-রেখা**। (viii) একটি Z-রেখা থেকে আর একটি Z-রেখা পর্যন্ত অংশ **সার্কোমিয়ার** (Sarcomere) নামে পরিচিত। সার্কোমিয়ারগুলি মায়োফাইব্রিলের সঙ্কোচনশীলতার একক (unit)। (ix) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জানা গেছে, প্রত্যেক মায়োফাইব্রিল **অ্যাকটিন** (Actin) ও **মায়োসিন** (Myosin) নামে দু রকম প্রোটীন তন্তু (মায়োফিলামেন্ট) দ্বারা গঠিত। অ্যাকটিন তন্তুর তুলনায় মায়োসিন তন্তু অপেক্ষাকৃত মোটা (চিত্র 4.41 ও 4.42)। (x) সরেখ পেশী কোষের প্লাজমা পর্দার বাইরের দিকে গ্লাইকোপ্রোটীনের একটি স্তর এবং তার বাইরের দিকে খুব সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা নির্মিত একটি জালিকাকার (netlike) আবরণী থাকে। প্লাজমা পর্দা, গ্লাইকোপ্রোটীন স্তর ও তন্তুময় আবরণীটির সামগ্রিক নাম **সারকোলেমা** (Sarcolemma)*।

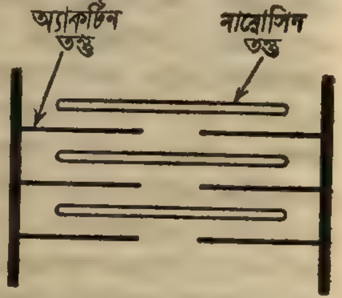

চিত্র 4.41 : পেশীর অ্যাকটিন ও মায়োসিন তন্তুর সজ্জারীতি।

---

* বর্তমানে সারকোলেমা বলতে কেবলমাত্র প্লাজমা পর্দাকে বোঝানো হয়—তন্তুময় অংশকে ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। দ্রষ্টব্য : 'A Text-Book of Histology' : Bloom and Fawcett (10th Asian Edition)।

কতকগুলি করে সরেখ পেশীকোষ একসঙ্গে থেকে এক-একটি কোষগুচ্ছ বা **ফ্যাসিকল** (fascicle) সৃষ্টি করে। অনেকগুলি ফ্যাসিকল নিয়ে এক-একটি পেশী গঠিত হয়। প্রতিটি পেশীকে ঘিরে শিথিল যোগকলার একটি আবরণ থাকে, যার নাম **এপিমাইসিয়াম** (Epimysium)। আবার প্রতিটি ফ্যাসিকলকে ঘিরে, এমনকি

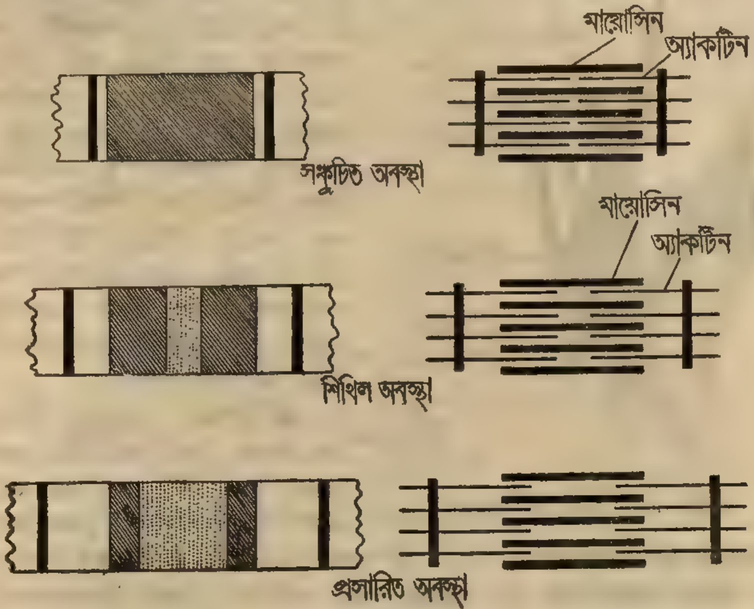

চিত্র 4.42 : পেশীর সংকোচনের বিভিন্ন অবস্থায় মায়োফাইব্রিলের বুকে অনুপ্রস্থ রেখাসমূহের রূপ পরিবর্তন (বামদিকে) এবং সেই সঙ্গে অ্যাকটিন ও মায়োসিন তন্তুর স্থান পরিবর্তনের (ডানদিকে) নকশাকার চিত্র।

প্রতিটি পেশীকোষকে ঘিরেও যোগকলার একটি করে আবরণ দেখা যায়। ফ্যাসিকলকে বেষ্টনকারী আবরণীর নাম **পেরিমাইসিয়াম** (Perimysium) এবং প্রতিটি পেশী-কোষকে বেষ্টনকারী আবরণীর নাম **এন্ডোমাইসিয়াম** (Endomysium)।

প্রাপ্তিস্থল : প্রাণীদের গমনাঙ্গে এই পেশী থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কঙ্কালের (Skeleton) সঙ্গে এই পেশী যুক্ত থাকে ; সেই কারণে এদের **কংকাল পেশী** বা **অস্থি-সংলগ্ন পেশী** (Skeletal muscles) বলা হয়। এই পেশীগুলিকে প্রাণীরা ইচ্ছামত সঙ্কুচিত বা শিথিল করতে পারে বলে এরা **ঐচ্ছিক পেশী** (Voluntary muscles) নামেও পরিচিত।

কার্য : প্রাণীদের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে এই পেশী প্রাণীদের গমনাগমনে ও অঙ্গ সঞ্চালনে সাহায্য করে।

2. **অরেখ বা মসৃণ পেশী** (Non-striated or Smooth muscle) : (i) অরেখ পেশীর কোষগুলি মাকুর (Spindle) আকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ তাদের মাঝখানটা মোটা এবং দু প্রান্ত সরু (চিত্র 4.43)। (ii) প্রত্যেক কোষে মাত্র

একটি করে নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াসের অবস্থান কোষের মাঝখানে। (iii) কোষের লম্ব অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অনেক **মায়োফাইব্রিল** সার্কোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে, কিন্তু তারা আড়াআড়ি ভাবে কোন রেখার সৃষ্টি করে না। এইজন্যই এদের নাম, **অরেখ পেশী**। (iv) মায়োফাইব্রিলে **অ্যাকটিন** ও **মায়োসিন** তন্তু আছে বটে, কিন্তু সরেখ পেশীর তুলনায় মায়োসিন তন্তুর পরিমাণ অনেক কম। তদুপরি, অ্যাকটিন ও মায়োসিন তন্তুর সজ্জারীতিও সরেখ পেশীর মত নিখুঁত নিয়মে বাঁধা নয়। (v) প্লাজমা পর্দার বাইরের দিকে গ্লাইকোপ্রোটীনের একটি আচ্ছাদন থাকে। ঐ আচ্ছাদনটির গঠন আবরণী কলার ভিত্তি পর্দার মত।

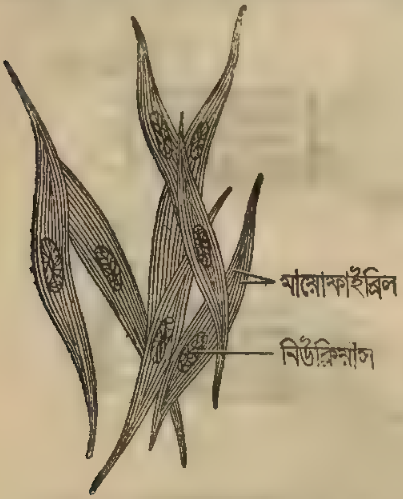

চিত্র 4.43 : অরেখ পেশীকোষ।

প্রাপ্তিস্থল : আমাদের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রে, যথা—পাকস্থলী, অন্ত্র, রক্তবাহ, শ্বাসনালী, গবিনী (ureter), মূত্রস্থলী, শুক্রনালী, ডিম্বনালী ইত্যাদিতে এই পেশী পাওয়া যায়। এই পেশীগুলিকে আমরা ইচ্ছামত সঙ্কুচিত বা শিথিল করতে পারি না—সেইজন্য এদের **অনৈচ্ছিক পেশী** (**Involuntary muscles**) বলা হয়।

কার্য : নির্দিষ্ট অঙ্গের স্বয়ং সঞ্চালন ঘটানো।

3. **হৃৎপেশী** (**Cardiac muscle**) **:** হৃৎপিণ্ডের পেশীকে **হৃৎপেশী** বলা হয়। কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ডেই এই প্রকার পেশী পাওয়া যায়। হৃৎপেশী একপ্রকার অনৈচ্ছিক পেশী। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই পেশী সরেখ ও অরেখ পেশীর মধ্যবর্তী ধরনের। (i) পেশী-কোষগুলি সরেখ পেশীকোষের মত নলাকার বা দণ্ডাকার কিন্তু তাদের চেয়ে আকারে অনেক ছোট এবং **শাখাবিশিষ্ট**। ফলে কোষ-গুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি জালের আকার ধারণ করে (চিত্র 4.44)। (ii) যে কোন দুটি কোষের সংযোগস্থলে সন্নিহিত কোষ দুটির প্লাজমা পর্দা অন্যান্য অংশের তুলনায় পুরু ও ঘনসন্নিবিষ্ট হয় এবং একটি আঁকাবাঁকা রূপ গ্রহণ করে।

চিত্র 4.44 : হৃৎপেশী।

এদের **ইণ্টারক্যালেটেড ডিস্ক** (Intercalated disc) বা **নিবেশিত ফলক** বলে। (iii) প্রতিটি কোষে অরেখ পেশীকোষের মত মাত্র একটি করে নিউক্লিয়াস থাকে এবং এটি কোষের মাঝ বরাবর অবস্থান করে, পরিধির কাছে নয়। (iv) নিউক্লিয়াসটি একটু লম্বাটে ধরনের। (v) হৃৎপেশীর কোষে সরেখ পেশীর মত অনুপ্রস্থ বা আড়াআড়ি রেখা আছে। ঐ রেখাগুলি **মায়োফিলামেণ্টের** (অর্থাৎ অ্যাকটিন ও মায়োসিন তন্তুর) গুচ্ছ দ্বারা গঠিত। আপাতদৃষ্টিতে ঐগুলিকে মায়োফাইব্রিল বলে মনে হয়; কিন্তু মনোযোগ সহকারে পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে যে, হৃৎপেশীতে মায়োফিলামেণ্টগুলি মায়োফাইব্রিল রূপে সংগঠিত (organized) নয়।

প্রাপ্তিস্থল ঃ কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ডে এই পেশী পাওয়া যায়। হৃৎপেশী অনৈচ্ছিক প্রকৃতির।

কার্য ঃ হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ।

● সরেখ, অরেখ ও হৃৎপেশীর পার্থক্য ঃ

সরেখ পেশী	অরেখ পেশী	হৃৎপেশী
1. ঐচ্ছিক প্রকৃতির।	1. অনৈচ্ছিক প্রকৃতির।	1. অনৈচ্ছিক প্রকৃতির।
2. কোষগুলি বেলনাকার।	2. মাকুর আকৃতি বিশিষ্ট কোষ।	2. বেলনাকার কোষ, কিন্তু সরেখ পেশীর তুলনায় আকারে অনেক ছোট।
3. কোষগুলি শাখান্বিত নয়।	3. কোষগুলি শাখান্বিত নয়।	3. কোষগুলি শাখান্বিত।
4. কোষগুলি বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত।	4. এক নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ।	4. এক নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ।
5. নিউক্লিয়াসের অবস্থান কোষের পরিধির কাছে।	5. নিউক্লিয়াসের অবস্থান কোষের কেন্দ্রের কাছে।	5. নিউক্লিয়াসের অবস্থান কোষের কেন্দ্রের কাছে।
6. স্পষ্ট অনুপ্রস্থ রেখা থাকে।	6. অনুপ্রস্থ রেখা থাকে না।	6. অনুপ্রস্থ রেখা থাকে।
7. মায়োফাইব্রিল আছে।	7. মায়োফাইব্রিল আছে।	7. অ্যাকটিন ও মায়োসিন তন্তু মায়োফাইব্রিলে সংগঠিত নয়।*
8. ইণ্টারক্যালেটেড ডিস্ক থাকে না।	8. ইণ্টারক্যালেটেড ডিস্ক থাকে না।	8. ইণ্টারক্যালেটেড ডিস্ক থাকে।

* 'A Text-Book of Histology' : Bloom and Fawcett (10th Asian Edition) দ্রষ্টব্য।

সরেখ পেশী	অরেখ পেশী	হৃৎপেশী
9. সঙ্কোচন স্বতঃস্ফূর্ত ও ছন্দোবদ্ধ নয়।	9. সঙ্কোচন স্বতঃস্ফূর্ত ও ছন্দোবদ্ধ (rhythmic)।	9. সঙ্কোচন স্বতঃস্ফূর্ত ও ছন্দোবদ্ধ।
10. কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের চেষ্টীয় বা আজ্ঞাবহ (Motor) নার্ভের প্রভাবে সঙ্কোচন ঘটে।	10. সঙ্কোচন স্ব-সৃষ্ট।	10. সঙ্কোচন স্ব সৃষ্ট।
11. সহজেই অবসাদ-গ্রস্ত হয়।	11. সহজে অবসাদগ্রস্ত হয় না।	11. সহজে অবসাদগ্রস্ত হয় না।
12. অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে।	12 বিভিন্ন আন্তবযন্ত্রে (যথা—পাকস্থলী, অন্ত্র, রক্তবাহ, শ্বাসনালী, গবিনী, মূত্রস্থলী ইত্যাদিতে) পাওয়া যায়।	12. কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ডে পাওয়া যায়।

পেশীকলার কার্য (Functions of Muscular Tissue) **:** (i) প্রাণীদের গমনাগমনে ও অঙ্গ-সঞ্চালনে সাহায্য করে। (ii) প্রাণীদের নির্দিষ্ট দেহভঙ্গী (যথা—দণ্ডায়মান অবস্থা, শায়িত অবস্থা ইত্যাদি) বজায় রাখতে সাহায্য করে। (iii) শ্বসনজনিত বিচলন ঘটিয়ে শ্বাসকার্যে সাহায্য করে। (iv) নির্দিষ্ট অঙ্গ-সমূহের স্বয়ং সঞ্চালন ঘটিয়ে অঙ্গগুলির সক্রিয়তা বজায় রাখে (যথা—অরেখ পেশী)। (v) হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটিয়ে হৃৎপেশী দেহে রক্ত সংবহন অব্যাহত রাখে।

D. নার্ভকলা

প্রাণীদের নার্ভতন্ত্র যে কলা দিয়ে গঠিত, তার নাম **নার্ভকলা**। উদ্দীপকের (Stimulus) প্রভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (Sense organs) মাধ্যমে প্রাণীদের নার্ভকলা উদ্দীপিত হয় এবং নার্ভকলার মাধ্যমেই ঐ উদ্দীপনাজাত আবেগ দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়ে সংশ্লিষ্ট প্রাণীটির আচরণে তার প্রতিক্রিয়া ঘটায়। অতএব, **যে কলা উদ্দীপকের প্রভাবে উদ্দীপিত হয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে সেই উদ্দীপনাজাত আবেগ প্রেরণ করে এবং সংশ্লিষ্ট প্রাণীটির আচরণে একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাকে নার্ভকলা বলে।** নার্ভকলা কেবল উদ্দীপনাজাত প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে না, **এটি** (কোন কোন ক্ষেত্রে হরমোনের মাধ্যমে) **দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধনও করে।**

(a) **গঠন** (Structure) **:** নিউরোন (Neuron) বা নার্ভকোষ, নিউরোগ্লিয়া (Neuroglia) কোষ ও নার্ভ নিয়ে নার্ভকলা গঠিত।

(I). নিউরোন বা নার্ভকোষ : নার্ভকলার কাজ ও নিউরোনের কাজের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। নার্ভকলা সামগ্রিকভাবে যে কাজ করে—যেমন, উদ্দীপনা গ্রহণ ও তা অন্যত্র প্রেরণ, প্রতিটি নিউরোনও পৃথক পৃথক ভাবে সেই কাজ করতে পারে।

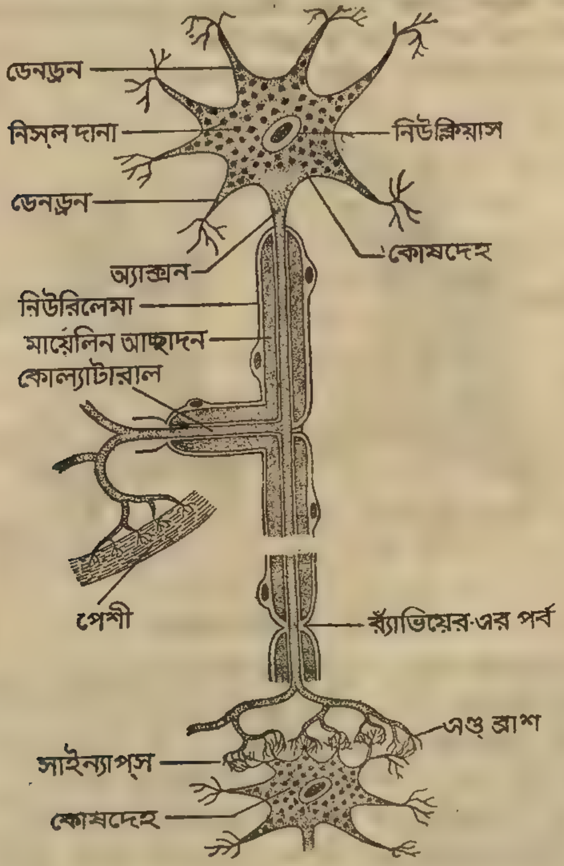

চিত্র 4.45 : একটি নিউরোন।

নিউরোন বা নার্ভকোষে তিনটি অংশ থাকে—(i) কোষদেহ (Cell body) বা পেরিক্যারিয়ন (Perikaryon), (ii) ডেনড্রাইট (Dendrites) বা ডেনড্রন (Dendron) ও (iii) অ্যাক্সন (Axon)।

(i) কোষদেহ বা পেরিক্যারিয়ন : প্রতিটি নিউরোনে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসযুক্ত একটি কোষদেহ থাকে (চিত্র 4.45)। কোষদেহটি তারার মত (Star-shaped), গোল, শাঙ্কব (Conical) প্রভৃতি নানা আকৃতির হতে পারে। নিউক্লিয়াসটি বেশ বড়, গোল অথবা কিছুটা ডিম্বাকৃতির। নিউক্লিয়াসের সংখ্যা সাধারণত একটি, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দুটিও হতে পারে। কোষদেহের সাইটোপ্লাজম

নিউরোপ্লাজম (Neuroplasm) নামে পরিচিত। নিউরোপ্লাজমের মধ্যে অসংখ্য ক্ষারাসক্ত (basophilic) দানা দেখা যায়—ঐগুলির নাম **নিস্‌ল দানা** (Nissls' granules) [চিত্র 4.46]। কোষদেহের যে অংশ থেকে অ্যাক্সনের উৎপত্তি হয়, সেই অংশের নাম **অ্যাক্সন হিলক** (Axon hillock)—ঐ অংশের সাইটোপ্লাজমে কোন নিস্‌ল দানা থাকে না। অ্যাক্সনের মধ্যেও কোন নিস্‌ল দানা থাকে না, তবে ডেনড্রাইটের মধ্যে নিস্‌ল দানা পাওয়া যায়। নিস্‌ল দানার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে

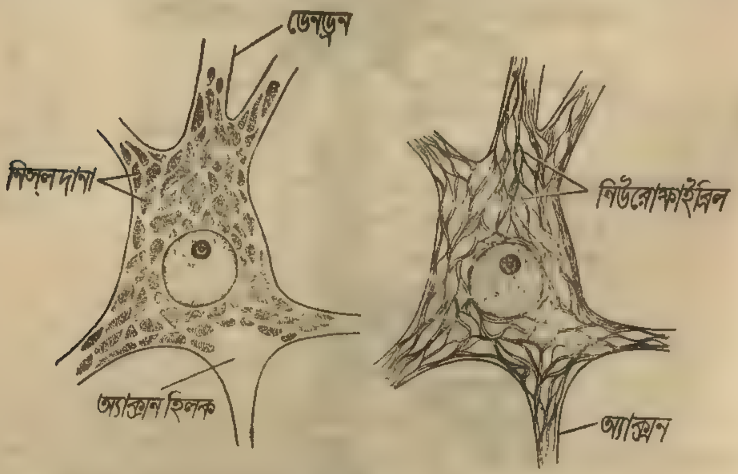

চিত্র 4.46 : নিউরোনের কোষদেহ।

রাইবোনিউক্লিওপ্রোটীন থাকে। প্রকৃতপক্ষে নিস্‌ল দানাগুলি রাইবোসোমসহ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা এবং এদের মধ্যে প্রোটীন সংশ্লেষ ঘটে।

কোষদেহের সাইটোপ্লাজমে, ডেনড্রনের মধ্যে, এমনকি অ্যাক্সনের মধ্যেও অসংখ্য সূক্ষ্ম তন্তুর মত অংশ থাকে—ঐগুলির নাম **নিউরোফাইব্রিল** (Neurofibril)। ঐগুলি ডেনড্রন ও অ্যাক্সনের মধ্যে তাদের লম্ব অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকে।

নিউরোপ্লাজমে মাইটোকনড্রিয়া, গলগি বডি প্রভৃতি কোষীয় অঙ্গাণুও পাওয়া যায়।

দৃশ্যমান আলোকরশ্মি ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরিণত নিউরোনের মধ্যে সেন্ট্রোসোম দেখা না গেলেও, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সেন্ট্রোসোমের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। যেহেতু পরিণত নিউরোনের বিভাজন ঘটে না, তাই এই প্রকার কোষে সেন্ট্রোসোমের ভূমিকা কি তা এখনও জানা যায় নি।*

নিউরোনের কোষদেহ থেকে কতকগুলি প্রলম্বিত অংশের বা শাখার সৃষ্টি হয়। এই প্রলম্বিত অংশগুলি দু রকমের। ডেনড্রাইট বা ডেনড্রন ও অ্যাক্সন।

* সম্প্রতি (1984) নিউইয়র্কের রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **ফার্নান্দো নোটেবম** এবং তাঁর সতীর্থরা প্রমাণ করেছেন, বয়সকালেও নিউরোনের বিভাজন ঘটে।

(ii) **ডেনড্রাইট বা ডেনড্রন ঃ** নিউরোনের কোষদেহ থেকে উৎপন্ন অপেক্ষাকৃত ছোট শাখাগুলির নাম ডেনড্রাইট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডেনড্রাইটগুলি আকারে ছোট এবং কোষদেহ থেকে খুব সামান্য দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, কিন্তু সংজ্ঞাবহ নার্ভের গ্যাংলিয়নে অবস্থিত নিউরোনের ডেনড্রাইট খুব লম্বা হয়। সাধারণত এক-একটি নিউরোনে অনেকগুলি করে ডেনড্রাইট থাকে, কিন্তু প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্রের কোন কোন কোষে মাত্র একটি করে ডেনড্রাইট দেখা যায়। কোষদেহ থেকে ডেনড্রাইটের দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাস কমতে থাকে। ডেনড্রাইটের প্রান্ত বহু শাখান্বিত হয়। ডেনড্রাইটের মধ্যে নিউরোপ্লাজম, নিস্ল দানা, নিউরোফাইব্রিল ও মাইটোকনড্রিয়া থাকে। **ডেনড্রাইটের মাধ্যমে উদ্দীপনাজাত আবেগ (impulse generated by a stimulus) নিউরোনের কোষদেহে প্রবেশ করে।**

(iii) **অ্যাক্সন ঃ** নিউরোনের কোষদেহ থেকে উৎপন্ন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ শাখাটির নাম **অ্যাক্সন** বা **অ্যাক্সিস সিলিন্ডার**। প্রতি নিউরোনে একটি করে অ্যাক্সন থাকে। কোষদেহের 'অ্যাক্সন হিলক' অংশ থেকে অ্যাক্সনের উৎপত্তি হয়। অ্যাক্সনের মধ্যে সাইটোপ্লাজম, নিউরোফাইব্রিল, মাইটোকনড্রিয়া ইত্যাদি পাওয়া যায়, কিন্তু নিস্ল দানা পাওয়া যায় না। অ্যাক্সনের ভিতরকার সাইটোপ্লাজম **অ্যাক্সোপ্লাজম** (Axoplasm) নামে এবং অ্যাক্সনের প্লাজমা পর্দা **অ্যাক্সোলেমা** (Axolemma) নামে পরিচিত।

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অ্যাক্সনগুলিকে ঘিরে **নিউরিলেমা** (Neurilemma) বা **স্বোয়ান শীথ** (Schwann sheath) নামে একটি আবরণী থাকে। প্রকৃতপক্ষে স্বোয়ান কোষ নামে একপ্রকার চ্যাপ্টা কোষ অ্যাক্সনকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরার ফলেই এই আবরণীটি রচিত হয়। স্বোয়ান কোষ ও তার বাইরের দিকে অবস্থিত গ্লাইকোপ্রোটীনের স্তর যুক্তভাবে 'নিউরিলেমা' নামে পরিচিত। নিউরিলেমা বেষ্টিত অ্যাক্সনকে **নার্ভতন্তু** (Nerve fibre) বলে। কোন কোন নার্ভতন্তুতে নিউরিলেমা ও অ্যাক্সোলেমার মধ্যবর্তী স্থলে স্নেহ পদার্থের একটি আচ্ছাদন থাকে—ঐ আচ্ছাদনের নাম **মায়েলিন আচ্ছাদন** (Myelin sheath) বা **মেডালারী আচ্ছাদন** (Medullary sheath)। উক্ত আচ্ছাদনযুক্ত নার্ভতন্তু **মায়েলিনেটেড তন্তু** বা **মেডালেটেড তন্তু** নামে পরিচিত। অপরপক্ষে, মায়েলিন আচ্ছাদনবিহীন তন্তু **নন্-মায়েলিনেটেড** বা **নন্-মেডালেটেড** তন্তু নামে পরিচিত হয়। মায়েলিন আচ্ছাদন থাকার ফলে কোন নার্ভতন্তু থেকে নার্ভীয় আবেগ (Nerve impulse) কাছাকাছি অবস্থিত অন্যান্য নার্ভতন্তুতে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। নার্ভতন্তুর মায়েলিন আচ্ছাদনটি অবিচ্ছিন্ন নয়—উক্ত আচ্ছাদনে মাঝে মাঝে (প্রায় 1 মিলিমিটার অন্তর) ছেদ (discontinuity) দেখা যায়। মায়েলিন আচ্ছাদনবিহীন উক্ত অংশগুলিতে নার্ভতন্তুর দেহে খাঁজের (Constriction) সৃষ্টি হয়। উক্ত খাঁজযুক্ত স্থানগুলি **র্যানভিয়ারের বা র্যাঁভিয়ের-এর পর্ব** (Nodes of Ranvier) নামে পরিচিত। মায়েলিন আচ্ছাদনবিহীন নার্ভতন্তুতে এরূপ পর্ব থাকে না। যে কোন দুটি র্যানভিয়ার পর্বের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি একটিমাত্র স্বোয়ান কোষ দ্বারা ঘেরা থাকে।

খুব দীর্ঘ অ্যাক্সন থেকে অনেক সময় শাখা অ্যাক্সনের সৃষ্টি হয়—ঐ শাখাগুলির

নাম **কোল্যাটারাল** (Collateral)। র‍্যানভিয়ারের পর্ব থেকে উক্ত কোল্যাটারালের উৎপত্তি ঘটে।

অ্যাক্সনের দূরতম প্রান্তে নিউরিলেমা ও মায়েলিন আচ্ছাদনী থাকে না। ঐ অংশটি কতিপয় খুব সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। অ্যাক্সনের এই শাখান্বিত প্রান্তভাগকে **এন্ড্ ব্রাশ** (End brush) বলে। এন্ড্ ব্রাশের প্রত্যেকটি প্রশাখার প্রান্ত সামান্য ফোলা হয়। ঐ ফোলা অংশের নাম **টার্মিনাল বাটন** (Terminal button) বা **প্রান্তীয় গুটিকা**। **ডেনড্রাইটের মাধ্যমে উদ্দীপনাজাত যেসব আবেগ** (impulse generated by a stimulus) **কোষদেহে প্রবেশ করে অ্যাক্সনের মাধ্যমে সেগুলি কোষদেহ থেকে বের হয়ে যায়।** অ্যাক্সনটি পেশী অথবা গ্রন্থিতে প্রবেশ করে। আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে একটি নিউরোনের অ্যাক্সন আর একটি নিউরোনের ডেনড্রাইটের কাছে শেষ হয়। অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের ঐ সংযোগস্থলকে **সাইন্যাপ্‌স** (Synapse) বা **প্রান্তসন্নিকর্ষ** বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যাক্সন ও পেরিক্যারিয়নের (কোষদেহের) মধ্যেও সাইন্যাপ্‌স রচিত হয়। প্রথমোক্ত সাইন্যাপ্‌সকে **অ্যাক্সোডেনড্রাইটিক** (Axodendritic) ও শেষোক্ত সাইন্যাপ্‌সকে **অ্যাক্সোসোমাটিক** (Axosomatic) **সাইন্যাপ্‌স** বলে। সাইন্যাপ্‌স অঞ্চলে দুটি নিউরোনের অংশ-বিশেষের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে না—তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ফাঁক থাকে।

সাইন্যাপ্‌স অঞ্চলে একটি নিউরোন থেকে আর একটি নিউরোনে আবেগ পরিবাহিত হয় এবং এই **আবেগপ্রবাহ একমুখী**। অর্থাৎ, সর্বদাই একটি নিউরোনের অ্যাক্সন থেকে আবেগ পরবর্তী নিউরোনের ডেনড্রাইটে পরিবাহিত হয়, কখনই এর বিপরীত দিকে নয়।

- **নার্ভকলার গঠনগত ও কার্যগত একককে নিউরোন বলে।**
- **নিউরোনের কোষদেহ থেকে উৎপন্ন অপেক্ষাকৃত ছোট-ছোট যেসব শাখার মাধ্যমে কোন উদ্দীপনাজাত আবেগ কোষদেহে প্রবেশ করে, তাদের নাম ডেনড্রাইট।**
- **নিউরোনের কোষদেহ থেকে উৎপন্ন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ যে শাখাটির মাধ্যমে নার্ভীয় আবেগ কোষদেহ থেকে বের হয়ে যায়, তার নাম অ্যাক্সন।**
- **অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অ্যাক্সনগুলিকে ঘিরে শোয়ান কোষ ও তার বাইরের দিকের গ্লাইকোপ্রোটীন স্তর মিলে যে আবরণী রচনা করে, সেই আবরণীর নাম নিউরিলেমা বা শোয়ান শীথ।**
- **কোন কোন নার্ভতন্তুতে নিউরিলেমা ও অ্যাক্সোলেমার মধ্যবর্তী স্থলে স্নেহ পদার্থের যে আচ্ছাদন থাকে, সেই আচ্ছাদনের নাম মায়েলিন আচ্ছাদন বা মায়েলিন শীথ।**
- **মায়েলিন আচ্ছাদনযুক্ত নার্ভতন্তুকে মায়েলিনেটেড তন্তু বা মেডালেটেড তন্তু বলে।**

- মায়েলিন আচ্ছাদনবিহীন নার্ভতন্তুকে নন্-মায়েলিনেটেড বা নন্-মেডালেটেড তন্তু বলে।
- যে স্থান দিয়ে একটি নিউরোন থেকে নার্ভীয় আবেগ পরবর্তী নিউরোনে পরিবাহিত হয়, সেই স্থানের নাম সাইন্যাপ্‌স।

নিউরোনের প্রকারভেদ (Types of Neuron) : কোষদেহ থেকে উৎপন্ন শাখার (ডেনড্রাইট ও অ্যাক্সন) সংখ্যার ভিত্তিতে নিউরোনকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

1. একমেরুবিশিষ্ট নিউরোন (Unipolar neuron) : এই প্রকার নিউরোনে একটিমাত্র শাখা থাকে। শাখাটি একটি অ্যাক্সন—এদের কোন ডেনড্রাইট থাকে না [চিত্র 4.47(A)]। উদাহরণ : মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণদশার প্রথম অবস্থায় প্রাপ্ত নিউরোন।

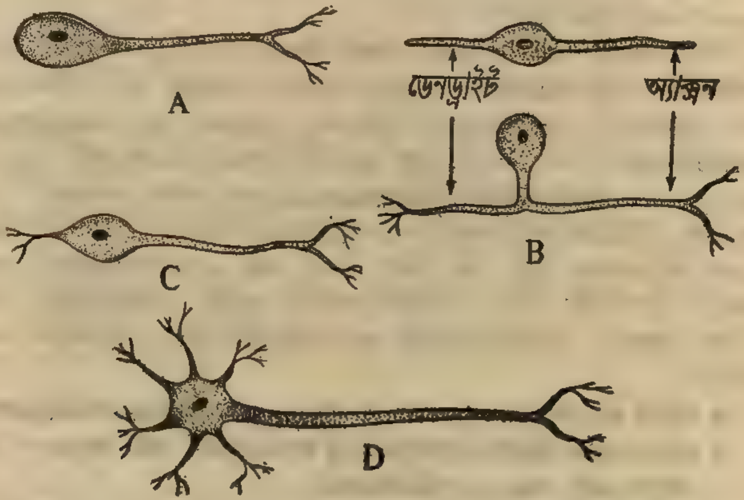

চিত্র 4.47 : (A) একমেরুবিশিষ্ট নিউরোন, (B) ছদ্ম-একমেরুবিশিষ্ট নিউরোন, (C) দ্বিমেরুবিশিষ্ট নিউরোন, (D) বহুমেরুবিশিষ্ট নিউরোন।

2. ছদ্ম-একমেরুবিশিষ্ট নিউরোন (Pseudo-unipolar neuron) : এই প্রকার নিউরোনে প্রথম অবস্থায় একটি ডেনড্রাইট ও একটি অ্যাক্সন থাকে ; পরবর্তী কালে শাখা দুটি যুক্ত হয়ে একটিমাত্র শাখায় পরিণত হয় [চিত্র 4.47(B)]। উদাহরণ : মেরুদণ্ডী প্রাণীদের করোটিক (Cranial) ও সুষুম্না (Spinal) নার্ভের গ্যাংলিয়া।

3. দ্বিমেরুবিশিষ্ট নিউরোন (Bipolar neuron) : এই প্রকার নিউরোনে দুটি শাখা থাকে—একটি ডেনড্রাইট ও অপরটি অ্যাক্সন। এরা কোষের বিপরীত দিক থেকে উৎপন্ন হয় [চিত্র 4.47(C)]। উদাহরণ : রেটিনা বা অক্ষিপটের নিউরোন।

4. বহুমেরুবিশিষ্ট নিউরোন (Multipolar neuron)ঃ এই প্রকার নিউরোনে বহু শাখা থাকে। এদের মধ্যে একটি অ্যাক্সন এবং বাকীগুলি ডেনড্রাইট [চিত্র 4.47(D)]। উদাহরণ ঃ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের নিউরোন।

(II) নিউরোগ্লিয়া কোষ ঃ নার্ভকলার মধ্যে এমন কিছু কোষ পাওয়া যায় যেগুলি আবেগ গ্রহণ বা প্রেরণের কাজ করে না। এই কোষগুলিকেই **নিউরোগ্লিয়া** কোষ বলা হয়। এরা নানা আকৃতির হতে পারে। প্রতিটি নিউরোনকে এরা এমন ভাবে ঘিরে রাখে যে, কেবলমাত্র সাইন্যাপ্‌স অঞ্চল ছাড়া অন্য কোন জায়গা দিয়ে এক নিউরোন থেকে অন্য নিউরোনে আবেগ পরিবাহিত হতে পারে না। তাছাড়া, আঘাত অথবা ব্যাধিতে ক্ষতিগ্রস্ত নিউরোনকে বিনাশ করার ব্যাপারে এবং তার জায়গায় নতুন নিউরোন সৃষ্টির ব্যাপারেও নিউরোগ্লিয়া কোষের ভূমিকা আছে।

(III) নার্ভ ঃ কতকগুলি করে নার্ভতন্তু একসঙ্গে থেকে এক-একটি তন্তুগুচ্ছ বা ফ্যাসিক্‌ল সৃষ্টি করে। এইরূপ কতকগুলি তন্তুগুচ্ছ বা ফ্যাসিক্‌লকে নিয়ে এক-একটি নার্ভ গঠিত হয়।

প্রতিটি নার্ভকে ঘিরে যোগকলার একটি আবরণ থাকে—ঐ আবরণের নাম **এপিনিউরিয়াম** (Epineurium)। আবার, প্রতিটি তন্তুগুচ্ছ বা ফ্যাসিক্‌লকে ঘিরেও যোগকলার একটি আবরণ থাকে—ঐ আবরণের নাম **পেরিনিউরিয়াম** (Perineurium)। ফ্যাসিক্‌লের মধ্যে প্রতিটি নার্ভতন্তু আশপাশের অন্যান্য নার্ভতন্তুর সঙ্গে **এন্ডোনিউরিয়াম** (Endoneurium) নামে শিথিল যোগকলা দিয়ে যুক্ত থাকে। ফলে এক-একটি তন্তুগুচ্ছ বা ফ্যাসিক্‌লের সৃষ্টি হয়। এপিনিউরিয়াম ও পেরিনিউরিয়ামের মধ্যে এবং কোন কোন সময় এন্ডোনিউরিয়ামের মধ্যে রক্তবাহ ও লসিকাবাহ থাকে। নার্ভের সরু-সরু শাখায় এপিনিউরিয়াম থাকে না এবং সেখানে পেরিনিউরিয়ামকে এন্ডোনিউরিয়াম থেকে পৃথকভাবে চেনা যায় না।

- **প্রতিটি নার্ভকে ঘিরে যোগকলার যে আবরণ থাকে, তার নাম এপিনিউরিয়াম।**
- **নার্ভের ভিতর প্রতিটি নার্ভতন্তুগুচ্ছ বা ফ্যাসিক্‌লকে ঘিরে যোগকলার যে আবরণ থাকে, তার নাম পেরিনিউরিয়াম।**
- **প্রতিটি নার্ভতন্তু আশপাশের অন্যান্য নার্ভতন্তুর সঙ্গে যে যোগকলা দিয়ে যুক্ত হয়ে তন্তুগুচ্ছ বা ফ্যাসিক্‌ল সৃষ্টি করে, সেই কলার নাম এন্ডোনিউরিয়াম।**

প্রাপ্তিস্থল ঃ নার্ভতন্ত্রে (মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড ইত্যাদিতে) নার্ভকলা পাওয়া যায়।

নার্ভকলার কার্য ঃ (i) উদ্দীপনা গ্রহণ, দেহের বিভিন্ন স্থানে তা প্রেরণ এবং উদ্দীপনাজাত আবেগে সাড়া দেওয়া। (ii) দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

● ডেনড্রাইট ও অ্যাক্সনের পার্থক্য ঃ

ডেনড্রাইট	অ্যাক্সন
1. প্রতি নিউরোনে সাধারণত একাধিক ডেনড্রাইট থাকে।	1. প্রতি নিউরোনে একটিমাত্র অ্যাক্সন থাকে।
2. অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব।	2. অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।
3. নিউরিলেমা থাকে না।	3. স্বোয়ান কোষ দ্বারা গঠিত নিউরিলেমা আবরণী থাকে।
4. কখনই মায়েলিন শীথ থাকে না।	4. কোন কোন ক্ষেত্রে মায়েলিন শীথ থাকে।
5. পর্ব ও পর্বমধ্যে বিভক্ত নয়।	5. মায়েলিন শীথযুক্ত অ্যাক্সন পর্ব ও পর্বমধ্যে বিভক্ত থাকে।
6. নিস্‌ল দানা থাকে।	6. নিস্‌ল দানা থাকে না।
7. ডেনড্রাইটের দেহের মধ্যভাগ থেকে কখনই শাখার উৎপত্তি হয় না।	7. অতি দীর্ঘ অ্যাক্সনের মধ্যভাগ থেকে কোল্যাটারাল নামক শাখার উৎপত্তি হয়।
8. টার্মিনাল বাটন বা প্রান্তীয় গুটিকা থাকে না।	8. প্রান্তীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাখার টার্মিনাল বাটন থাকে।
9. এদের মাধ্যমে আবেগ কোষদেহে প্রবেশ করে।	9. এদের মাধ্যমে আবেগ কোষদেহ থেকে বের হয়ে যায়।
10. সাইন্যাপ্‌স অঞ্চল ব্যতীত গ্রাহকের (Receptors) সঙ্গে যুক্ত থাকে।	10. সাইন্যাপ্‌স অঞ্চল ব্যতীত পেশী ও গ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত হয়।

● সার্কোলেমা ও নিউরিলেমার পার্থক্য ঃ

সার্কোলেমা	নিউরিলেমা
1. এটি পেশীকোষের আবরণী।	1. এটি স্নায়ুকোষের মায়েলিনযুক্ত অ্যাক্সনের আবরণী।
2. এটি কোষবিহীন।	2. এটি কোষ (স্বোয়ান কোষ)-যুক্ত।
3. এতে গ্লাইকোপ্রোটীন নির্মিত স্তরের বাইরের দিকে সূক্ষ্ম তন্তু নির্মিত একটি জালিকাকার আবরণী থাকে।	3. এতে গ্লাইকোপ্রোটীন নির্মিত আবরণীর বাইরের দিকে অতিরিক্ত কোন আবরণী থাকে না।

● সাইন্যাপ্‌স ও সাইন্যাপসিসের পার্থক্য :

সাইন্যাপ্‌স	সাইন্যাপসিস
1. দুটি নিউরোনের সংযোগস্থলকে সাইন্যাপ্‌স বলে।	1. মিয়োসিস কোষ বিভাজন কালে দুটি সমসংস্থ ক্রোমোসোমের পরস্পরের কাছাকাছি এসে জোটবদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে সাইন্যাপসিস বলে।
2. কেবলমাত্র প্রাণিদেহে থাকে।	2. উদ্ভিদ ও প্রাণী—উভয় প্রকার জীবেই সাইন্যাপ্‌সিস দেখা যায়।
3. এর মাধ্যমে একটি নিউরোন থেকে অপর নিউরোনে আবেগ পরিবাহিত হয়।	3. সাইন্যাপসিসের ফলে সমসংস্থ ক্রোমোসোমের মধ্যে ক্রসিং ওভার সম্ভব হয়।
4. এটি একটি স্থায়ী গঠন।	4. এটি অস্থায়ী ধরনের।

E. ক্ষরণ কলা বা গ্রন্থিকলা

দেহের কতিপয় কোষ ও কোষসমষ্টি থেকে হরমোন, এনজাইম ও অন্যান্য নানা প্রকার বস্তু ক্ষরিত (5নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) হয়। এইসব কোষ ও কোষসমষ্টিকে বলা হয় **গ্রন্থি** বা **ক্ষরণ কলা**। অর্থাৎ, **দেহের যেসব কোষ ও কোষসমষ্টি থেকে নানা প্রকার বস্তু ক্ষরিত হয়, তাদের নাম গ্রন্থি বা ক্ষরণ কলা।**

গ্রন্থিকলার স্বরূপ (Identity of Glandular tissue) **:** অতীতে সমস্ত গ্রন্থিকে আবরণী কলার এক বিশেষ রূপ (form) বলে মনে করা হত। কিন্তু বর্তমানে জানা গেছে, অধিকাংশ গ্রন্থি আবরণী কলার রূপান্তরের ফলে সৃষ্টি হলেও কোন কোন গ্রন্থিরূপী কোষের উৎস আবরণী কলা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফাইব্রোব্লাস্ট (যোগকলার ধাত্র ও তন্তু উৎপাদনকারী কোষ), কনড্রোব্লাস্ট (তরুণাস্থির ধাত্র উৎপাদনকারী কোষ) এবং অস্টিওব্লাস্ট (অস্থিকলার ধাত্র উৎপাদনকারী কোষ) নামক গ্রন্থিরূপী কোষের উৎস 'মেসেনকাইম' কলা (184 নং পৃষ্ঠায় 'ভ্রূণজ যোগকলা' দ্রষ্টব্য)।

● অধিকাংশ গ্রন্থিকলা আবরণী কলা থেকে উৎপন্ন হলেও, সব গ্রন্থিকলার উৎস আবরণী কলা নয়।

গ্রন্থির প্রকারভেদ (Types of Glands)

প্রাণিদেহের গ্রন্থিগুলিকে নিম্নলিখিত দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

1. **এককোষীয় গ্রন্থি** (Unicellular glands) **:** একটিমাত্র কোষ দিয়ে গঠিত। উদাহরণ : গবলেট কোষ।

2. **বহুকোষীয় গ্রন্থি** (Multicellular glands) **:** বহুকোষের সমন্বয়ে গঠিত। উদাহরণ : লালা গ্রন্থি, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি।

ক্ষরণ দ্রব্যের নিঃসরণ পদ্ধতি অনুযায়ী বহুকোষীয় গ্রন্থি আবার দু রকমের ঃ

A. বহিঃস্রাবী বা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine Glands) ঃ এই প্রকার গ্রন্থিতে নালী (duct) থাকে। উক্ত নালীর মাধ্যমে গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পদার্থ গ্রন্থির বাইরে আসে। উদাহরণ ঃ লালা গ্রন্থি, ঘর্ম গ্রন্থি, আন্ত্রিক গ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি।

B. অন্তঃস্রাবী বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine Glands) ঃ এই প্রকার গ্রন্থিতে কোন নালী থাকে না। গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পদার্থ সরাসরি গ্রন্থির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত রক্তস্রোতে পড়ে এবং রক্তের মাধ্যমেই গ্রন্থির বাইরে আসে। নালী না থাকায় এই প্রকার গ্রন্থিকে **অনাল গ্রন্থি** (ductless glands)-ও বলা হয়। উদাহরণ ঃ পিটুইটারি, থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল প্রভৃতি গ্রন্থি। অনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত পদার্থ 'হরমোন' নামে পরিচিত।

আবরণী কলা স্তরে অন্তর্ভাঁজ (invagination) সৃষ্টির মাধ্যমে বহুকোষীয় বহিঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির আবির্ভাব ঘটে। অন্তর্ভাঁজ সৃষ্টির ধরন অনুযায়ী গ্রন্থিগুলি নানা আকৃতি লাভ করে।

আকৃতি অনুসারে **বহুকোষীয় বহিঃস্রাবী** গ্রন্থিগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

(a) **নলাকার (Tubular)** ঃ এই গ্রন্থিগুলি নলের আকৃতিবিশিষ্ট। এরা নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হতে পারে ঃ

(i) **সরল নলাকার** Simple tubular) ঃ এরা একটিমাত্র নলযুক্ত, অর্থাৎ নলটি শাখান্বিত নয় (চিত্র 4.48 ক)। উদাহরণ ঃ ক্ষুদ্রান্ত্রের **লিবেরকুহ্ন-বর্ণিত গ্রন্থি** (Glands of Lieberkuhn)।

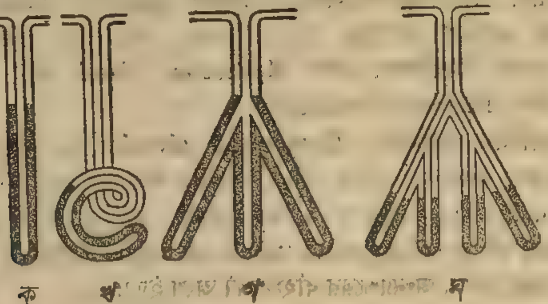

চিত্র 4.48 ঃ বিভিন্ন প্রকার নলাকার গ্রন্থি। (ক) সরল নলাকার ; (খ) সরল প্যাঁচানো নলাকার। (গ) সরল শাখান্বিত নলাকার ; (ঘ) যৌগিক নলাকার।

(ii) **সরল প্যাঁচানো নলাকার** (Simple coiled tubular) ঃ একটিমাত্র নলযুক্ত গ্রন্থি, কিন্তু নলের ভিতর দিকের প্রান্তটি প্যাঁচানো (চিত্র 4.48 খ)। উদাহরণ ঃ অধিকাংশ ঘর্মগ্রন্থি।

(iii) **সরল শাখান্বিত নলাকার** (Simple branched tubular) ঃ নলের

ভিতর দিকের প্রান্তটি দুই বা বহু শাখাযুক্ত (চিত্র 4.48 গ)। উদাহরণ ঃ ডুওডেনামের **ব্রুনার গ্রন্থি** (Glands of Brunner)।

(iv) **যৌগিক নলাকার** (Compound tubular) ঃ সরল শাখান্বিত গ্রন্থির শাখাগুলি যদি পুনরায় শাখান্বিত হয়, অর্থাৎ প্রশাখায় বিভক্ত হয়, তাহলে তাদের যৌগিক নলাকার গ্রন্থি বলে (চিত্র 4.48 ঘ)। উদাহরণ ঃ **মুখবিবরের শ্লেষ্মা গ্রন্থি, কতিপয় ব্রুনার গ্রন্থি**।

(b) **থলিবৎ** (Alveolar) ঃ এই গ্রন্থিগুলি থলির আকৃতিবিশিষ্ট। এরা নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হতে পারে ঃ

(i) **সরল থলিবৎ** (Simple alveolar) ঃ একটিমাত্র থলিযুক্ত (চিত্র 4.49 ক)। উদাহরণ ঃ ব্যাঙের চামড়ার শ্লেষ্মা গ্রন্থি (Mucous gland)।

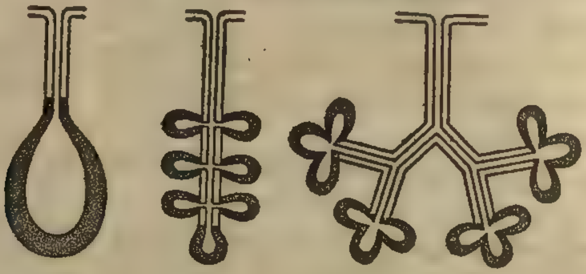

ক খ গ

চিত্র 4.49 ঃ থলিবৎ গ্রন্থি। (ক) সরল থলিবৎ ; (খ) সরল শাখান্বিত থলিবৎ ; (গ) যৌগিক থলিবৎ।

(ii) **সরল শাখান্বিত থলিবৎ** (Simple branched alveolar) ঃ এই ক্ষেত্রে গ্রন্থির একমাত্র নালীকে ঘিরে কতিপয় থলি থাকে (চিত্র 4.49 খ)। উদাহরণ ঃ ত্বকের **সিবেসিয়াস গ্রন্থি** (Sebaceous gland) এবং অক্ষিপল্লবের **মিবোমিয়ান গ্রন্থি** (Meibomian gland)।

(iii) **যৌগিক থলিবৎ** (Compound alveolar) ঃ এইরূপ গ্রন্থিতে কতিপয় নলাকার শাখা থাকে এবং প্রতিটি শাখার সঙ্গে অনেকগুলি করে থলি যুক্ত থাকে (চিত্র 4.49 গ)। এইরূপ গ্রন্থির বিশেষ গঠনের জন্য অনেকে এদের **যৌগিক নলাকার থলিবৎ** (Compound tubulo-alveolar) গ্রন্থিরূপে আখ্যা দেন। উদাহরণ ঃ **লালা গ্রন্থি, অগ্ন্যাশয়ের বহিঃস্রাবী অংশ** ইত্যাদি।

গ্রন্থির কোষ থেকে ক্ষরিত পদার্থ নিঃসরণের পদ্ধতি অনুসারে গ্রন্থিকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ঃ

1. **মেরোক্রাইন গ্রন্থি** (Merocrine glands) ঃ এই প্রকার গ্রন্থিতে ক্ষরণ পদার্থ প্রথমে গ্রন্থিকোষের মুক্ত প্রান্তে জমা হয় এবং পরে উহা প্লাজমা পর্দা ভেদ করে ব্যাপন অথবা এক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষের বাইরে যায়। এই প্রকার ক্ষরণে কোষের সাইটোপ্লাজমের ক্ষয় হয় না (চিত্র 4.50 ক)। উদাহরণ ঃ **সমস্ত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও পরিপাক গ্রন্থি**।

2. **অ্যাপোক্রাইন গ্রন্থি** (Apocrine glands) **:** এই প্রকার গ্রন্থিতে ক্ষরণ পদার্থ প্রথমে গ্রন্থিকোষের মুক্ত প্রান্তে জমা হয় এবং পরে ক্ষরণ পদার্থসহ কিছুটা সাইটোপ্লাজম কোষদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে ক্ষরণকালে

চিত্র 4.50 : (ক) মেরোক্রাইন গ্রন্থি, (খ) অ্যাপোক্রাইন গ্রন্থি, (গ) হলোক্রাইন গ্রন্থি।

কিছুটা সাইটোপ্লাজমের অপচয় ঘটে (চিত্র 4.50 খ)। উদাহরণ : দুগ্ধস্রাবী **স্তন গ্রন্থি ও গবলেট কোষ।**

3. **হলোক্রাইন গ্রন্থি** (Holocrine glands) **:** এই প্রকার গ্রন্থিতে ক্ষরণ পদার্থসহ সম্পূর্ণ কোষটি গ্রন্থি থেকে বিচ্যুত হয়। পরে একটি তরুণ কোষ নষ্ট কোষটির স্থান দখল করে (চিত্র 4.50 গ)। উদাহরণ : স্তন্যপায়ীদের ত্বকের **সিবেসিয়াস গ্রন্থি** (Sebaceous gland) বা **তৈল গ্রন্থি।**

গ্রন্থিকলার কার্য : এই কলার প্রধান কাজ ক্ষরণ।

4.4. (II) তরল কলা (Fluid tissues)

যে কলার অন্তর্ভুক্ত কোষগুলি প্রতিনিয়ত স্থান বদল করে, তাদের **তরল কলা** বলে। প্রাণিদেহে দু রকমের তরল কলা পাওয়া যায়—(A) **রক্ত** ও (B) **লসিকা।**

A. রক্ত (Blood)

রক্ত একপ্রকার **যোগকলা।** অন্যান্য যোগকলার মত রক্তেও **ধাত্র** আছে, যার নাম প্লাজমা। তাছাড়া, অন্যান্য যোগকলার মত রক্তও মেসেনকাইম কলা (184নং পৃষ্ঠায় 'ভ্রূণজ যোগকলা' দ্রষ্টব্য) থেকে উৎপন্ন হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, যে কলার কোষগুলি সর্বদা স্থান বদল করে, তাদের **তরল কলা** বলে। সেইদিক থেকে বিচার করলে রক্ত একপ্রকার **তরল কলা।** আবার, উৎপত্তি ও গঠনের দিক থেকে রক্ত যোগকলার সমগোত্রীয়। অতএব, **রক্ত একপ্রকার তরল যোগকলা** (Fluid Connective tissue)।

প্রাণিদেহে রক্তের পরিমাণ : পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে রক্তের পরিমাণ দেহের ওজনের শতকরা 5-8 ভাগ। শিশুদের ক্ষেত্রে দেহের ওজনের তুলনায় রক্তের শতকরা ভাগ আরও কম। আবার, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের তুলনায় অনুন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে রক্তের আনুপাতিক পরিমাণ আরও কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মাছেদের ক্ষেত্রে রক্তের পরিমাণ দেহের ওজনের শতকরা 2 ভাগ মাত্র।

রক্তের উপাদান (Components of Blood)

রক্ত একটি তরল অংশ এবং কয়েক প্রকার কোষ বা কণিকা (Blood corpuscles) নিয়ে গঠিত। তরল অংশের নাম **রক্তরস** বা **প্লাজমা**। রক্তের কোষ বা কণিকাগুলি এই প্লাজমায় ভাসমান থাকে। এরা তিন প্রকার ; যথা—(1) **লোহিত রক্তকণিকা** (Red Blood Corpuscles বা R. B. C.), (2) **শ্বেত রক্তকণিকা** (White Blood Corpuscles or W. B. C.) ও (3) **থ্রম্বোসাইট** বা **অণুচক্রিকা** (Thrombocytes বা Blood platelets) [4.1 নং তালিকা]। রক্তে প্লাজমা ও কণিকার পরিমাণ রক্তের আয়তনের যথাক্রমে শতকরা 55 ও 45 ভাগ।

রক্তের উপাদানগুলি সম্পর্কে নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল ঃ

(a) **রক্তরস বা প্লাজমা** (Plasma) ঃ রক্তরস বা প্লাজমা ঈষৎ হলুদ বর্ণের (খড় বা বিচালির মত রঙ) এবং ক্ষারধর্মী তরল পদার্থ। এর ঘনত্ব (density) প্রায় সমুদ্রের জলের মত। এর মধ্যে শতকরা প্রায় 90 ভাগ **জল**, 9 ভাগ **জৈব পদার্থ** ও 1 ভাগ **অজৈব লবণ** (Inorganic salts) থাকে।

রক্তরসের মধ্যে যে সকল জৈব পদার্থ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নানা রকমের (ক) **পাচিত খাদ্যবস্তু**, (খ) **রেচন পদার্থ** বা **বর্জ্য পদার্থ**, (গ) **হরমোন**, (ঘ) **উৎসেচক**, (ঙ) **ভিটামিন**, (চ) **অ্যান্টিবডি** ইত্যাদি। তাছাড়া, রক্তরসে **অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন** ও **ফাইব্রিনোজেন** নামে তিন রকম প্রোটীন থাকে। রক্তরসে প্রোটীন অংশই প্রধান। দেহের কোথাও ক্ষতের সৃষ্টি হলে রক্তরসে দ্রবীভূত ফাইব্রিনোজেন 'ফাইব্রিন' তন্তুতে রূপান্তরিত হয়ে রক্তের তঞ্চন (clotting) ঘটায় ও ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ করে। রক্ত তঞ্চিত হওয়ার পর যে হরিদ্রাভ জলীয় রস পড়ে থাকে, তার নাম **সিরাম** (Serum)। সিরাম ও রক্তরসের মধ্যে প্রধান পার্থক্য, সিরামে ফাইব্রিনোজেন থাকে না।

রক্তরসের অজৈব লবণগুলির মধ্যে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, লৌহ, তামা প্রভৃতির লবণই প্রধান। এরা ক্লোরাইড, ফসফেট, বাইকার্বোনেট, সালফেট প্রভৃতি রূপে উপস্থিত থাকে।

রক্তরসে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং স্বল্প পরিমাণে নাইট্রোজেন গ্যাস-ও দ্রবীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে **শ্বাসকণা-ও** (হিমোগ্লোবিন ও হিমোসায়ানিন) রক্তরসে থাকে।

- **রক্তের ঈষৎ হরিদ্রাভ, ক্ষারধর্মী এবং তঞ্চনে সক্ষম তরল অংশের নাম প্লাজমা বা রক্তরস।**
- **ফাইব্রিনোজেনমুক্ত রক্তরসকে সিরাম বলে।**

প্লাজমার কার্য ঃ প্লাজমার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্য নিম্নরূপ ঃ

(i) **রক্তের তঞ্চনে (Clotting) সাহায্য করা** ঃ প্লাজমায় দ্রবীভূত ফাইব্রিনোজেন 'ফাইব্রিন' তন্তুতে রূপান্তরিত হয়ে রক্তের তঞ্চন ঘটায় এবং ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ করে [220নং পৃষ্ঠায় 'রক্তের কার্য' দ্রষ্টব্য]।

(ii) **CO_2 পরিবহণ ঃ** প্লাজমার মাধ্যমে কলা-কোষ থেকে শ্বাস-অঙ্গে CO_2 পরিবাহিত হয়।

(iii) **ক্ষারাম্ল সাম্য (Acid-base balance) ঃ** প্লাজমার (এবং লোহিত রক্তকণিকার) 'বাফার'* নামক বস্তুগুলি বিভিন্ন ক্ষারধর্মী ও অম্লধর্মী বস্তুকে প্রশমিত (Neutralize) করে দেহে ক্ষার ও অম্লের সাম্য বজায় রাখে।

(iv) **রক্তচাপ ও হৃৎস্পন্দন বজায় রাখা ঃ** প্লাজমায় উপস্থিত প্রোটীনগুলির জন্য রক্তের সামান্য সান্দ্রতা (Viscosity) বা আঠাল ভাব থাকে। সান্দ্রতা থেকে সৃষ্টি হয় রক্তচাপের। আবার, স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের জন্য একটি নির্দিষ্ট মাত্রার রক্তচাপ অত্যাবশ্যক।

(v) **বিভিন্ন বস্তুর পরিবহণ ঃ** প্লাজমার মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তু তাদের উৎস থেকে **গন্তব্যস্থলে** যায়।

[অন্ত্র, ফুসফুস, যকৃত প্রভৃতি অঙ্গ উৎস হিসেবে এবং দেহের প্রতিটি কোষ ও ফুসফুস, যকৃত, বৃক্ক, চর্ম প্রভৃতি অঙ্গ গন্তব্যস্থল হিসেবে কাজ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যকৃত প্রয়োজনবোধে (অর্থাৎ দুবার খাদ্যগ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে) গ্লুকোজের 'উৎসস্থল' হিসেবে এবং অন্ত্র থেকে প্রাপ্ত পাচিত খাদ্যবস্তুর 'গন্তব্যস্থল' হিসেবে কাজ করে। ফুসফুস অক্সিজেনের উৎসস্থল এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের গন্তব্যস্থল। দেহের প্রতিটি কোষ বর্জ্য বস্তুর উৎসস্থল এবং খাদ্য, অক্সিজেন ইত্যাদির গন্তব্যস্থল]।

(b) **লোহিত রক্তকণিকা** (**Red Blood Corpuscles** বা **R.B.C.** বা **Erythrocytes**) ঃ ইংরেজীতে লোহিত রক্তকণিকার অপর নাম **এরিথ্রোসাইট**।

গঠন ঃ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পরিণত লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না, কিন্তু অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর লোহিত কণিকা নিউক্লিয়াসযুক্ত (চিত্র 4.51)। তাছাড়া, অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোহিত কণিকা গোল** চাকতির মত এবং দ্বি-অবতল (Biconcave); কিন্তু অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর লোহিত কণিকা ডিম্বাকার ও উভোত্তল (Biconvex)। লোহিত কণিকার মধ্যে **হিমোগ্লোবিন** নামে একপ্রকার রঙ্গক (pigment) থাকে। এটি একটি লৌহঘটিত প্রোটীন। এতে **হিম** (**Heme**) নামে লৌহ-পরফিরিন যৌগ এবং **গ্লোবিন** নামে প্রোটীন থাকে। হিমোগ্লোবিন সহজেই অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। ফলে শ্বাসযন্ত্র থেকে বিভিন্ন কলায় অক্সিজেন পরিবহণের কাজ এর দ্বারা সাধিত হয়।

স্তন্যপায়ীদের লোহিত কণিকা যখন প্রথম উৎপন্ন হয় তখন তাদের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে, কিন্তু হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ খুব কম থাকে। পরিণত অবস্থায় যখন

---

* দুর্বল (weak) অ্যাসিড ও তার শক্তিশালী (strong) ক্ষারীয় লবণের মিশ্রণ অথবা শক্তিশালী অ্যাসিড ও তার দুর্বল অম্লীয় লবণের মিশ্রণকে 'বাফার' বলে। বাফারগুলি (H^+) অথবা $[OH^-]$ আয়নকে গ্রহণ করে দেহের pH-এর পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করে।

** ব্যতিক্রম উট ও লামা (Llama) নামক প্রাণী; এদের লোহিত কণিকা অ-স্তন্যপায়ী (Non-mammalian) প্রাণীদের মত ডিম্বাকার।

লোহিত কণিকাগুলি রক্তস্রোতে আসে তার পূর্ব মুহূর্তে নিউক্লিয়াসটিকে পরিত্যাগ করে, কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের ভিতর হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে যায়। এক-একটি পরিণত লোহিত কণিকায় প্রায় 28 কোটি হিমোগ্লোবিন অণু উপস্থিত থাকে। **প্রতি 100 মিলিমিটার রক্তে প্রায় 15 গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে।**

চিত্র 4.51 : (ক) স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোহিত কণিকা, সম্মুখ ও পার্শ্বদৃশ্য, (খ) ব্যাঙের (উভচর প্রাণী) লোহিত কণিকা, (গ) ব্যাঙের থ্রম্বোসাইট, (ঘ) স্তন্যপায়ীদের অণুচক্রিকা।

আয়তন : স্তন্যপায়ীদের লোহিত কণিকার ব্যাস 7·5μm (মাইক্রোমিটার বা মাইক্রন), কিনারার দিকের বেধ (thickness) 2μm এবং কেন্দ্রের কাছে বেধ 1μm।

পরিমাণ : সব রকমের কণিকার তুলনায় লোহিত কণিকার পরিমাণ রক্তে সবচেয়ে বেশী। একজন বয়স্ক পুরুষের দেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় 50 লক্ষ লোহিত কণিকা থাকে এবং বয়স্ক স্ত্রীলোকের সমপরিমাণ রক্তে ঐ সংখ্যা আনুমানিক 45 লক্ষ।

[নির্দিষ্ট ব্যক্তির স্বাস্থ্য, বাসভূমি ইত্যাদির উপর রক্তে লোহিত কণিকার পরিমাণ নির্ভরশীল। যেমন, পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের রক্তে লোহিত কণিকার পরিমাণ সমতলভূমির মানুষদের তুলনায় বেশী থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 18 হাজার ফুট উচ্চের অধিবাসীদের মধ্যে দেখা গেছে, প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এই সংখ্যা প্রায় 83 লক্ষ]।

উৎপত্তিস্থল : মানুষের ভ্রূণের 5 মাস বয়স অবধি লোহিত কণিকাগুলি **যকৃত** ও **প্লীহায়** (Spleen) উৎপন্ন হয়। তারপর থেকে অবশিষ্ট জীবনে এরা **লোহিত অস্থি মজ্জায়** (Red bone-marrow) [বিশেষত পঞ্জরাস্থি (Ribs), উরঃফলক (Sternum), করোটির অস্থি, কশেরুকা (Vertebrae) ইত্যাদির মধ্যে] উৎপন্ন হয়।

আয়ু (Life span) : মানুষের ক্ষেত্রে লোহিত কণিকার গড় আয়ু 120 দিন। বার্ধক্যে পেঁছানোর পর লোহিত কণিকাগুলি যকৃত ও প্লীহায় অবস্থিত রেটিকিউলো-এণ্ডোথেলিয়াল কোষসমূহ দ্বারা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ধ্বংস হয়।

[প্রতিদিন যে পরিমাণ লোহিত কণিকা ধ্বংস হয়, প্রায় সেই পরিমাণ লোহিত কণিকাই উৎপন্ন হয়। তাই রক্তে তাদের পরিমাণ মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে। সুস্থ লোহিত মজ্জা প্রয়োজনবোধে স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে 4/5 গুণ বেশী লোহিত কণিকা উৎপন্ন করতে পারে। তাই প্রচুর রক্তপাতের পর অথবা কোন ব্যক্তি কর্তৃক রক্তদানের পর রক্তে লোহিত কণিকার পরিমাণ শীঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

কোন কোন অবস্থায় লোহিত কণিকার ধ্বংসের হার তার উৎপাদনের হারের চেয়ে বেশী হয়। এর ফলে রক্তে লোহিত কণিকার পরিমাণ কমে যায় এবং **রক্তাল্পতার** (Anaemia) সৃষ্টি হয়।]

লোহিত রক্তকণিকার কার্য: (i) এদের প্রধান কাজ অক্সিজেন পরিবহণ। (ii) কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডও লোহিত কণিকা কর্তৃক পরিবাহিত হয়। (iii) বিভিন্ন বাফারের (213 নং পৃষ্ঠায় ক্ষারাম্ল সাম্য দ্রষ্টব্য) সাহায্যে এরা দেহে ক্ষার ও অম্লের সাম্য বজায় রাখে।

4.1 নং তালিকা

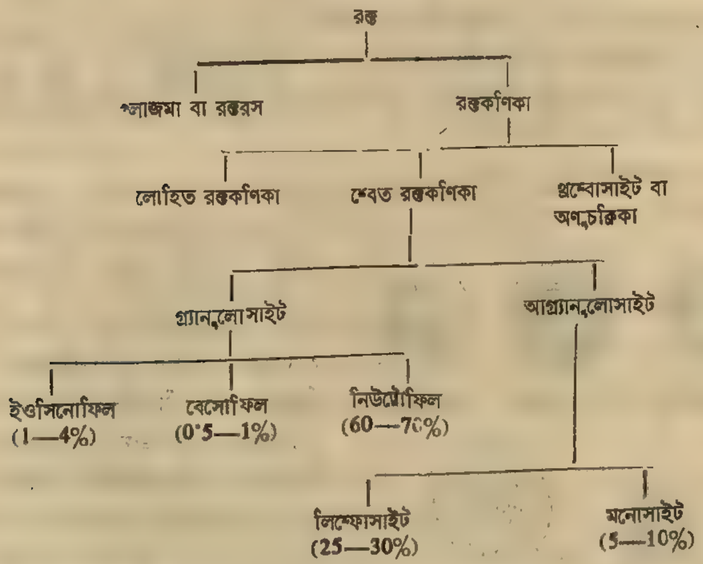

(c) **শ্বেত রক্তকণিকা** (White Blood Corpuscles বা W.B.C. বা Leucocytes): ইংরেজীতে শ্বেত রক্তকণিকার অপর নাম **লিউকোসাইট**। শ্বেত রক্তকণিকা কেবলমাত্র রক্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কেননা, রক্তজালকের প্রাচীর ভেদ করে তারা বেরিয়ে আসতে পারে। তাই লসিকার মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেত কণিকা দেখা যায়। তাছাড়া, শিথিল যোগকলা এবং অন্যান্য কলার মধ্যেও কিছু পরিমাণ শ্বেত কণিকা থাকে।

পরিমাণ: লোহিত কণিকার তুলনায় শ্বেত কণিকার পরিমাণ রক্তে অনেক কম; তাদের অনুপাত 700 : 1। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে 5-9 হাজার শ্বেত কণিকা থাকে।

গঠন: এরা বর্ণহীন। স্তন্যপায়ীসহ সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্বেত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে, তবে এই নিউক্লিয়াস নানা আকারের হতে পারে। রক্তের মধ্যে থাকাকালীন শ্বেত রক্তকণিকার আকৃতি গোল দেখায়, কিন্তু অন্যান্য কলার ভিতরে

থাকার সময় এদের আকৃতি হয় অ্যামিবার মত। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে পাঁচ রকমের শ্বেত কণিকা দেখা যায়। সাইটোপ্লাজমে দানার (granules) উপস্থিতি এবং নিউক্লিয়াসের আকৃতির উপর ভিত্তি করে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যেসব শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে এক বিশেষ প্রকারের দানা থাকে, তাদের নাম **গ্র্যানুলোসাইট** (Granulocyte)। অপরপক্ষে, যেসব শ্বেত কণিকার সাইটোপ্লাজম দানাবিহীন তাদের নাম **অ্যাগ্র্যানুলোসাইট** (Agranulocyte)। গ্র্যানুলোসাইট আবার তিন রকমের, যথা—**নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল** ও **বেসোফিল**। পক্ষান্তরে, অ্যাগ্র্যানুলোসাইট দু রকমের, যথা—**লিম্ফোসাইট** ও **মনোসাইট** [4.1 নং তালিকা এবং চিত্র 4.52।]

গ্র্যানুলোসাইট ঃ এদের সাইটোপ্লাজম দানাদার (granular)। দানাগুলি প্রশমিত (neutral), আম্লিক (acidic) অথবা ক্ষারীয় (basic)—এই তিন প্রকার রঙের মধ্যে যে কোন এক প্রকার রঙ দ্বারা রঞ্জিত হয়। তদনুযায়ী এদের নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ঃ

(i) **নিউট্রোফিল** (Neutrophil) ঃ সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত দানাগুলি প্রশমিত রঙে (যথা—লিশম্যান দ্রবণে) রঞ্জিত হয়। এদের নিউক্লিয়াস 2—7টি খণ্ড যুক্ত। কোষের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে খণ্ডের সংখ্যা বাড়তে থাকে। খণ্ডগুলি পরস্পরের সঙ্গে খুব সূক্ষ্ম নিউক্লীয় অংশ দ্বারা যুক্ত থাকে। বিভিন্ন সময়ে নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন আকৃতির জন্য এদের **পলিমরফোনিউক্লিয়ার লিউকোসাইট** (Polymorphonuclear leucocyte) বলা হয়। সমস্ত শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে এদের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী—শতকরা 60—70 ভাগ।

চিত্র 4 52 ঃ বিভিন্ন প্রকার শ্বেত রক্তকণিকা।
(ক) গ্র্যানুলোসাইট এবং (খ) অ্যাগ্র্যানুলোসাইট।

কার্য ঃ দেহে কোন রোগজীবাণু প্রবেশ করলে নিউট্রোফিল কণিকাগুলি **ফ্যাগোসাইটোসিস** প্রক্রিয়ায় তাদের আত্মসাৎ করে নেয় এবং ধ্বংস করে ফেলে। ফলে দেহ রোগমুক্ত থাকে। ফোড়া বা ক্ষতস্থানে যে পুঁজ (pus) দেখা যায়, তা অসংখ্য মৃত ও মৃতপ্রায় নিউট্রোফিল, মৃত রোগজীবাণু এবং মৃত কলাকোষের সমষ্টি।

আয়ু ঃ 2—4 দিন।

আয়তন ঃ এদের ব্যাস 10—12 μm।

(ii) **ইওসিনোফিল** (Eosinophil) ঃ এদের সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত দানাগুলি বড়-বড় এবং সেগুলি আম্লিক রঙে (যথা—ইওসিনে) রঞ্জিত হয়। নিউক্লিয়াস দুই খণ্ডযুক্ত এবং খণ্ডদুটি সূক্ষ্ম যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে। সমস্ত

শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে ইওসিনোফিলের পরিমাণ শতকরা 1—4 ভাগ। কোন কোন রোগের সময়, বিশেষত কৃমির আক্রমণে এবং কোন বস্তুর প্রতি দেহের অ্যালার্জীজনিত অবস্থায়, রক্তে ইওসিনোফিলের পরিমাণ বেড়ে যায়।

কার্য ঃ নিউট্রোফিলের মত রোগজীবাণুকে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করা এদের স্বাভাবিক ধর্ম নয় ; তবে বিশেষ অবস্থায়, যথা—অ্যাণ্টিবডি দ্বারা নিষ্ক্রিয় রোগজীবাণুকে এরা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করে।

আয়ু ঃ 8—12 দিন।

আয়তন ঃ এদের ব্যাস প্রায় নিউট্রোফিলের মত ; 9—12 μm।

(iii) **বেসোফিল** (Basophil) **ঃ** এদের সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত দানাগুলি ক্ষারীয় রঙে (যথা—টলিউডিন ব্লুতে) রঞ্জিত হয়। লম্বাটে নিউক্লিয়াসটি U অথবা S-এর আকৃতিবিশিষ্ট। শ্বেত রক্তকণিকাগুলির মধ্যে এদের সংখ্যা সবচেয়ে কম—শতকরা 0·5—1 ভাগ।

কার্য ঃ বেসোফিল কোষ **হেপারিন** (Heparin) নিঃসরণ করে, যার ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রবহমান রক্তের তঞ্চন ঘটে না।

আয়ু ঃ 12—15 দিন।

আয়তন ঃ এদের ব্যাস প্রায় নিউট্রোফিলের মত, 10 μm।

আগ্র্যানুলোসাইট ঃ সাইটোপ্লাজম দানাবিহীন। এরা দু রকমের।

(i) **লিম্ফোসাইট** (Lymphocyte) **ঃ** এরা আবার দু রকমের—**ক্ষুদ্র লিম্ফোসাইট ও বৃহৎ লিম্ফোসাইট।**

ক্ষুদ্র লিম্ফোসাইটের আয়তন লোহিত কণিকার মত—ব্যাস 7·5 μm। নিউক্লিয়াসটি অপেক্ষাকৃত বড় ; সেটি কোষের বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে থাকে।

বৃহৎ লিম্ফোসাইটের ব্যাস প্রায় 12 μm। নিউক্লিয়াসটি গোল, ডিম্বাকার অথবা বৃক্কাকৃতির (Kidney-shaped) হতে পারে। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বেশ কিছু পরিমাণ সাইটোপ্লাজম থাকে।

পরিমাণের দিক থেকে বয়স্ক ব্যক্তির রক্তে লিম্ফোসাইটের স্থান দ্বিতীয়—নিউট্রোফিলের পরেই। সমস্ত শ্বেত কণিকার শতকরা 25—30 ভাগ লিম্ফোসাইট। শৈশবে রক্তে লিম্ফোসাইটের পরিমাণ আরও বেশী থাকে, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কমে যায়।

কার্য ঃ অ্যাণ্টিবডি সৃষ্টির মাধ্যমে রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে দেহকে রক্ষা করে।

আয়ু ঃ 1—3 দিন।

(ii) **মনোসাইট** (Monocyte) **ঃ** রক্তকণিকাগুলির মধ্যে মনোসাইট আকারে সবচেয়ে বড়। ব্যাস 16—18 μm। এই প্রকার কোষের তরুণ অবস্থায় নিউক্লিয়াসটি গোল অথবা ডিম্বাকার থাকে, কিন্তু পরিণত অবস্থায় নিউক্লিয়াসটি বৃক্কাকার অথবা

অশ্বক্ষুরাকার হয় এবং কোষের ঠিক কেন্দ্রস্থলে না থেকে এক পাশে সরে থাকে। সমস্ত শ্বেত কণিকার শতকরা 5—10 ভাগ মনোসাইট।

কার্য ঃ এরা 1—1½ দিন রক্তস্রোতে থাকার পর রক্তজালকের প্রাচীর ভেদ করে বিভিন্ন অঙ্গে প্রবেশ করে ও সেখানকার যোগকলার মধ্যে ম্যাক্রোফেজ রূপে মাসাধিককাল বেঁচে থাকে। রক্তের মধ্যে এরা বিশেষ কোন কাজ করে না, কিন্তু ম্যাক্রোফেজ অবস্থায় এরা বিভিন্ন রোগজীবাণুকে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় আত্মসাৎ করে ধ্বংস করে।

শ্বেতকণিকার উৎপত্তিস্থল ঃ সমস্ত গ্র্যানুলোসাইটের এবং সামান্য পরিমাণ আগ্র্যানুলোসাইটের উৎপত্তি হয় **লোহিত অস্থি মজ্জা** থেকে। অপরপক্ষে, বেশীর ভাগ আগ্র্যানুলোসাইটের উৎপত্তিস্থল **প্লীহা** ও **লসিকা গ্রন্থি** (Lymphatic glands)।

(d) **থ্রম্বোসাইট বা অণুচক্রিকা** (Thrombocytes or Blood platelets) ঃ লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকা ছাড়াও রক্তে খুব ছোট ছোট আর একপ্রকার কণিকা দেখা যায়।

গঠন ঃ স্তন্যপায়ী ভিন্ন অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে এই কণিকাগুলি মাকুর আকৃতিবিশিষ্ট ও নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং **থ্রম্বোসাইট** নামে পরিচিত (চিত্র 4.51 গ)। স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে এই কণিকাগুলি প্রকৃত কোষ নয়। তারা একপ্রকার বড় কোষের (মেগাকেরিওসাইট) খন্ডিত অংশ। সেই কারণে স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এদের থ্রম্বোসাইটের পরিবর্তে **অণুচক্রিকা** বলা হয়। প্রতিটি অণুচক্রিকা নিউক্লিয়াসবিহীন এবং উভোত্তল চাকতির মত দেখতে (চিত্র 4.51 ঘ)।

আয়তন ঃ প্রতিটি অণুচক্রিকার ব্যাস 2—4 μm।

পরিমাণ ঃ রক্তে থ্রম্বোসাইট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা লোহিত কণিকার চেয়ে কম, কিন্তু শ্বেত কণিকার চেয়ে বেশী। বয়স্ক মানুষের প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে অণুচক্রিকার পরিমাণ প্রায় 2·5—5 লক্ষ।

উৎপত্তিস্থল ঃ অস্থি-মজ্জায় অবস্থিত বৃহদাকৃতির অ্যামিবাসদৃশ **মেগাকেরিও-সাইট** (Megakaryocyte) কোষের ক্ষণপদ (Pseudopodia) খন্ডিত হয়ে অণুচক্রিকার সৃষ্টি হয়।

আয়ু ঃ অণুচক্রিকার আয়ু 5—9 দিন।

অণুচক্রিকার কার্য ঃ (i) 'থ্রম্বোপ্লাসটিন' নামে একপ্রকার উৎসেচক সৃষ্টি করে এরা **রক্তের তঞ্চনে সাহায্য করে** এবং রক্তপাত বন্ধ করে। (ii) রক্তজালকের সূক্ষ্ম প্রাচীর কোন কারণে ছিন্ন হলে সত্বর তা জুড়ে দেয়। [তাই রক্তে অণুচক্রিকার পরিমাণ কমে গেলে (প্রতি ঘন মিলিমিটারে 50 হাজারের কম হলে)] মেরামতের অভাবে রক্তজালকের ভিতর থেকে রক্তপাত (Capillary bleeding) ঘটে। চামড়ার নিচে কালো কালো দাগ এইরূপ রক্তপাতের জন্যই হয়। এই রোগের নাম **পারপিউরা** (Perpura)]।

4.2 নং তালিকা

(এক নজরে মানুষের বিভিন্ন রক্তকণিকা সম্পর্কে লভ্য ধারণা)

নাম		মাপ (মাইক্রনে প্রকাশিত)	সংখ্যা (প্রতি ঘন মিলিমিটারে)	আয়ু (গড়ে)	প্রধান কার্য
লোহিত রক্তকণিকা		7—8	45—55 লক্ষ	120 দিন	অক্সিজেন পরিবহণ
শ্বেত রক্তকণিকা	নিউট্রোফিল	10—12	3—6 হাজার	2—4 দিন	জীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা
	ইওসিনোফিল	9—12	1·5—4 শত	8—12 দিন	
	বেসোফিল	10	0—1 শত	12—15 দিন	
	লিম্ফোসাইট	7·5—12	15—27 শত	1—3 দিন	
	মনোসাইট	16—18	3·5—8 শত	1—1½ দিন (রক্তে) ; 1 মাস যোগকলায়	
অণুচক্রিকা		2—4	2·5—4·5 লক্ষ	5—9 দিন	রক্তের তঞ্চন

শ্বাসকণা (Respiratory Pigments)

শ্বাসযন্ত্র থেকে দেহের বিভিন্ন কোষে অক্সিজেনকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক প্রাণীর রক্তে একপ্রকার কণা থাকে। এদের **শ্বাসকণা** বলা হয়। প্রাণিরাজ্যে প্রধানত দুই রকমের শ্বাসকণা দেখা যায়, যথা—(i) **হিমোগ্লোবিন** (Haemoglobin) ও (ii) **হিমোসায়ানিন** (Haemocyanin)।

(i) **হিমোগ্লোবিন :** সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর ও কোন কোন অমেরুদণ্ডী প্রাণীর (যেমন—কেঁচো, নেরিস ইত্যাদির) রক্তে আছে হিমোগ্লোবিন। এটি একপ্রকার **লৌহঘটিত প্রোটীন**। অক্সিজেনের সংস্পর্শে এটি উজ্জ্বল লাল রঙ ধারণ করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে থাকে, কিন্তু অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে রক্তরস বা প্লাজমায় থাকে।

(ii) **হিমোসায়ানিন :** এটি কোন কোন অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে (যেমন—চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদিতে ও কোন কোন ঝিনুকজাতীয় প্রাণীতে) পাওয়া যায়, কিন্তু কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীতেই এটি পাওয়া যায় না। এটি রক্তরস বা প্লাজমায় থাকে। এটি একটি **তাম্রঘটিত প্রোটীন**। অক্সিজেনের সংস্পর্শে এটি নীল রঙ ধারণ করে।

শ্বাসযন্ত্রে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন ও হিমোসায়ানিনের সংস্পর্শে এলে যথাক্রমে **অক্সিহিমোগ্লোবিন** ও **অক্সিহিমোসায়ানিন** গঠিত হয়। এগুলি অস্থায়ী যৌগ।

রক্ত কলায় পৌঁছালে অক্সিহিমোগ্লোবিন ও অক্সিহিমোসায়ানিন থেকে অক্সিজেন মুক্ত হয়ে কলাকোষে প্রবেশ করে এবং হিমোগ্লোবিন ও হিমোসায়ানিন পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়।

হিমোগ্লোবিন ও হিমোসায়ানিনের মধ্যে পার্থক্য :

হিমোগ্লোবিন	হিমোসায়ানিন
1. লোহঘটিত প্রোটীন।	1. তাম্রঘটিত প্রোটীন।
2. অক্সিজেনের সংস্পর্শে উজ্জ্বল লাল রঙ ধারণ করে।	2. অক্সিজেনের সংস্পর্শে নীল রঙ ধারণ করে।
3. সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং কয়েকটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে পাওয়া যায়।	3. কয়েকটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে পাওয়া যায়; কিন্তু কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীতেই পাওয়া যায় না।
4. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে এবং অমেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে প্লাজমা বা রক্তরসে থাকে।	4. সব ক্ষেত্রেই রক্তরসে থাকে।

রক্তের কার্য (Functions of Blood)

রক্ত যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে নিচে সেগুলির উল্লেখ করা হল :

(1) **খাদ্য, জল ও ভিটামিন পরিবহণ :** রক্তের মাধ্যমে পাচিত খাদ্য, জল ও ভিটামিন খাদ্যনালী থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছায়।

(2) **গ্যাস পরিবহণ :** রক্তে উপস্থিত শ্বাসকণার মাধ্যমে অক্সিজেন শ্বাসযন্ত্র থেকে দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছায়। সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন প্লাজমার দ্বারাও পরিবাহিত হয়। তাছাড়া, দেহের বিভিন্ন কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রধানত প্লাজমার মাধ্যমে এবং অংশত হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে শ্বাসযন্ত্রে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে দেহের বাইরে যায়।

(3) **রেচন পদার্থ (Metabolic wastes) পরিবহণ :** নাইট্রোজেন-ঘটিত রেচন পদার্থগুলি এবং অতিরিক্ত খনিজ পদার্থ ও জল প্লাজমার মাধ্যমে রেচনযন্ত্রে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে দেহের বাইরে যায়।

(4) **হরমোন পরিবহণ :** রক্ত অনাল গ্রন্থিগুলি (ductless glands) থেকে হরমোনগুলিকে তাদের নির্দিষ্ট কর্মস্থলে নিয়ে যায়।

(5) **রক্তপাত নিবারণ :** ক্ষতস্থান থেকে নিজের অপচয় রোধ এবং পরিণামে দেহের বিনাশ এড়ানো, রক্তের কাজগুলির মধ্যে অন্যতম। রক্ত তঞ্চিত (coagulate) হয়ে অর্থাৎ জমাট বেঁধে ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত রোধ করে।

[রক্তের তঞ্চনক্রিয়ায় প্লাজমায় অবস্থিত তিনটি বস্তু অংশগ্রহণ করে। ঐ তিনটি বস্তু হচ্ছে, প্রোথ্রম্বিন, ক্যালসিয়াম ও ফাইব্রিনোজেন। ঐগুলি নিজে থেকে রক্তের তঞ্চন ঘটাতে পারে না। ঐগুলিকে সক্রিয় করার জন্য 'থ্রম্বোপ্লাসটিন' (বা থ্রম্বোকাইনেজ) নামে একটি উৎসেচকের প্রয়োজন

হয়। রক্তের অণুচক্রিকার মধ্যে ঐ উৎসেচকটি থাকে। ক্ষতস্থানের অমসৃণ তলের (rough surface) সংস্পর্শে আসা মাত্রই অণুচক্রিকাগুলি ফেটে যায় এবং তাদের ভিতর থেকে উক্ত উৎসেচকটি বেরিয়ে এসে প্রোথ্রম্বিন, ক্যালসিয়াম ও ফাইব্রিনোজেনের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটায়। এর ফলে রবারের মত গুণবিশিষ্ট 'ফাইব্রিন' তন্তু তৈরি হয়। অসংখ্য ফাইব্রিন তন্তু জালের আকারে ক্ষতস্থানে অবস্থান করে রক্তপাত বন্ধ করে। তঞ্চনক্রিয়ায় সংঘটিত বিক্রিয়াগুলি নিম্নরূপ :

(A) অণুচক্রিকা থেকে থ্রম্বোপ্লাসটিন নির্গমন, (B) থ্রম্বোপ্লাসটিন+ক্যালসিয়াম+প্রোথ্রম্বিন→থ্রম্বিন, (C) থ্রম্বিন+ফাইব্রিনোজেন→ফাইব্রিন, (D) ফাইব্রিন+রক্তকণিকা→রক্তপিণ্ড (Blood Clot)।]

(6) **দেহের প্রতিরক্ষা** (Protective function) : প্রোটোজোয়া, ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি রোগজীবাণুগুলি দেহে প্রবেশ করলে নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল, মনোসাইট প্রভৃতি শ্বেতকণিকাগুলি তাদের আত্মসাৎ করে ধ্বংস করে। ফলে দেহ রোগাক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। তাছাড়া, লিম্ফোসাইটরূপী শ্বেতকণিকাগুলি 'অ্যান্টিবডি' সৃষ্টির মাধ্যমেও দেহকে রোগজীবাণুর অনিষ্টকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে।

(7) **অনাক্রম্যতা** (Immunity) : প্রত্যেক জীবেরই রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের নিজস্ব ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতাকে **অনাক্রম্যতা** বলে এবং এর মূলে আছে রক্ত। কোন রোগজীবাণু অথবা কোন বিজাতীয় বস্তু (সাপ বা অন্য কোন প্রাণীর বিষ) দেহে প্রবেশ করলে লিম্ফোসাইট থেকে একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়; উক্ত পদার্থকে বলা হয় **অ্যান্টিবডি** (Antibody)। দেহে যার উপস্থিতির জন্য অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়, তাকে (রোগজীবাণু বা অন্য কোন বিজাতীয় বস্তু) বলা হয় **অ্যান্টিজেন** (Antigen)। 'অ্যান্টিবডি' অ্যান্টিজেনকে এবং অ্যান্টিজেন কর্তৃক উৎপন্ন অধিবিষ (toxin)-কে বিনষ্ট করে দেহকে রক্ষা করে। [কিন্তু অ্যান্টিবডির বিনাশ ক্ষমতার তুলনায় অ্যান্টিজেনের পরিমাণ বেশী হলে দেহ রোগাক্রান্ত হয়।]

অ্যান্টিবডি দেহকে অনাক্রম্যতা দান করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অ্যান্টিবডিগুলি দেহে সৃষ্টি হলে তাদের সক্রিয়তা কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ কিছুকাল বজায় থাকে। ফলে দেহ ঐ সময়ে বিশেষ রোগের প্রতি অনাক্রম্যতা অর্জন করে। সব অ্যান্টিবডির আয়ুষ্কাল সমান নয়, যেমন—বসন্ত (Small pox) রোগের অ্যান্টিবডি নিজ থেকে দেহে একবার সৃষ্টি হলে (অর্থাৎ টিকা প্রদানের দ্বারা নয়—রোগাক্রমণের দ্বারা) তা চিরজীবন স্থায়ী হয় এবং টাইফয়েডের অ্যান্টিবডি 5—8 বছর স্থায়ী হয়।

(8 **তাপসাম্য** (Regulation of temperature) : খাদ্যের জারণের ফলে বিভিন্ন কলায় যে তাপ উৎপন্ন হয়, রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে তা দেহের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

(9) **ক্ষারাম্ল সাম্য** : [213 নং পৃষ্ঠায় প্লাজমার কার্য দ্রষ্টব্য]।

(10) **রক্তচাপ ও হৃদ্‌স্পন্দন বজায় রাখা** : [212-213 নং পৃষ্ঠায় প্লাজমার কার্য দ্রষ্টব্য]।

(11) **প্রোটীন সঞ্চয়** (Storage of protein) : প্লাজমায় উপস্থিত প্রোটীনগুলি দেহে প্রোটীনের একটি সঞ্চয়ভাণ্ডার রূপে কাজ করে। উপবাসের সময় এবং খাদ্যে প্রোটীনের পরিমাণ কম থাকার সময় দেহের কলাগুলি উক্ত সঞ্চয়ভাণ্ডার থেকে প্রোটীন টেনে নেয়।

B. লসিকা (Lymph)

কলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্তের কিছুটা অংশ (প্রধানত রক্তরস এবং সামান্য সংখ্যক শ্বেতকণিকা) রক্তজালকের প্রাচীর ভেদ করে কলা-কোষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। রক্তজালকের প্রাচীর ভেদ করে আসা এই তরলকে বলা হয় **কলা রস** (Tissue fluid)। কলার কোষান্তর রন্ধ্রের (intercellular spaces) মধ্য দিয়ে চলার সময় কলা-কোষ থেকে বিপাকজাত বিভিন্ন বস্তু এই রসের সঙ্গে মেশে।

চিত্র 4.53 : কলায় জালক ও লসিকাবহ।

রক্তের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখার জন্য কলা-রসের পুনরায় রক্তে ফিরে আসা প্রয়োজন। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে এই রসকে রক্তে ফিরিয়ে আনার জন্য এক বিশেষ ধরনের নালী আছে—যার নাম **লসিকাবহ** (Lymph vessels) (চিত্র 4.53)। লসিকাবহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরলকে বলা হয় **লসিকা**। এটি স্বচ্ছ, পীতাভ, ঈষৎ ক্ষারধর্মী জলীয় রস।

● **লসিকাবহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত স্বচ্ছ, পীতাভ ও ঈষৎ ক্ষারধর্মী জলীয় রসকে লসিকা বলে।**

লসিকা রক্তের মত একপ্রকার **তরল যোগকলা**। অন্যান্য যোগকলার মত লসিকাতেও ধাত্র আছে। ধাত্রটি রক্তের ধাত্রের মত তরল। শুধুই ধাত্র নয়, অন্যান্য যোগকলার মত লসিকাতেও কিছু পরিমাণ কোষ থাকে। এই কোষগুলি শ্বেত রক্তকণিকা, প্রধানত লিম্ফোসাইট। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক রক্তজালকের প্রাচীর ভেদ করে আসা এবং বাকীটা, বিশেষত লিম্ফোসাইটগুলি, লসিকাবহের সঙ্গে যুক্ত **লসিকা গ্রন্থি** (lymphatic glands) থেকে উৎপন্ন হয়। লসিকায় অণুচক্রিকা ও লোহিত কণিকা থাকে না।

লসিকার কার্য (Functions of Lymph)

(1) **পুষ্টি সরবরাহ ঃ** দেহের যেসব স্থানে রক্ত পেঁছায় না, লসিকা সেখানে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে।

(2) **প্রতিরক্ষা ঃ** লসিকায় উপস্থিত লিম্ফোসাইট ও মনোসাইটগুলি দেহের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করে।

(3) **তরল নিষ্কাশন** (Drainage of fluid) ঃ কলা থেকে অতিরিক্ত কলা-রসকে নিষ্কাশন করে কলা-রসের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখে। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হলে কলাস্থান ফুলে ওঠে, যাকে **শোথ** (Edema) বলা হয়।

(4) **প্রোটীনের পরিবহণ ঃ** লসিকা কলা-রস থেকে প্রোটীনগুলিকে রক্তে ফিরিয়ে আনে।

(5) **স্নেহদ্রব্য শোষণ ঃ** লসিকাবহের মাধ্যমে অন্ত্র থেকে স্নেহদ্রব্য শোষিত হয়।

প্লাজমা, লসিকা ও সিরামের মধ্যে পার্থক্য ঃ

প্লাজমা	লসিকা	সিরাম
1. ফাইব্রিনোজেন থাকে।	1. ফাইব্রিনোজেনের পরিমাণ খুব কম।	1. ফাইব্রিনোজেন সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।
2. প্লাজমায় তিন প্রকার রক্তকণিকা (লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা) ভাসমান থাকে।	2. লসিকায় কেবলমাত্র শ্বেত-কণিকা থাকে ; লোহিত-কণিকা ও অণুচক্রিকা থাকে না।	2. কোন রক্তকণিকা থাকে না।
3. প্লাজমায় সব রকম শ্বেত কণিকাই পাওয়া যায়।	3. লসিকায় প্রধানত লিম্ফো-সাইট থাকে।	3. কোন শ্বেতকণিকাই থাকে না।

বিষয়-সংক্ষেপ

উদ্ভিদ কলা ঃ

1. একই বা বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট কোষের সমষ্টি, যাদের উৎপত্তি এবং শারীরবৃত্তীয় কাজ একই রকম, তাদের কলা বলে।
2. উদ্ভিদ কলা দু ভাগে বিভক্ত—ভাজক কলা ও স্থায়ী কলা।
3. যে কলার কোষগুলি ক্রমান্বয়ে বিভাজনক্ষম তাদের ভাজক কলা বা মেরিস্টেম বলে।
4. যে কলার কোষগুলি বিভাজিত হয় না তাদের স্থায়ী কথা বলে।
5. স্থায়ী কলাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় ; যেমন—সরল কলা, জটিল কলা ও বিশেষ কলা।
6. একই প্রকার গঠন, আকৃতি ও কার্য বিশিষ্ট কোষ দ্বারা গঠিত স্থায়ী কলাকে সরল কলা বলে।

7. সরল কলা তিন প্রকারের ; যেমন—প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা।
8. ক্লোরোফিলযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষকে ক্লোরেনকাইমা এবং বাতাবকাশযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষগুলিকে এরেনকাইমা বলে।
9. প্যারেনকাইমা ও কোলেনকাইমার কোষগুলি সজীব, কিন্তু স্ক্লেরেনকাইমার কোষগুলি প্রোটোপ্লাজমবিহীন অর্থাৎ মৃত।
10. বিভিন্ন আকৃতির কোষ দ্বারা গঠিত কলাকে জটিল কলা বলে।
11. জটিল কলা দু প্রকারের ; যেমন—জাইলেম ও ফ্লোয়েম।
12. জাইলেম চার প্রকার উপাদান নিয়ে গঠিত ; যথা—ট্র্যাকীয়া বা বাহিকা, ট্র্যাকীড, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও কাষ্ঠিক তন্তু।
13. জাইলেম গঠনে অংশগ্রহণকারী তন্তু হল উড ফাইবার বা কাষ্ঠিক তন্তু। জাইলেমকেই প্রকৃতপক্ষে কাষ্ঠ বলে।
14. ফ্লোয়েম চার প্রকার কোষ উপাদানের দ্বারা গঠিত, যথা—সীভ নল, সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও বাস্ট তন্তু।
15. সীভ নল ব্যতীত সীভ কোষও ফ্লোয়েম কলায় থাকে।
16. ফ্লোয়েম গঠনে অংশ গ্রহণকারী তন্তু হল বাস্ট তন্তু। পাটের তন্তু গৌণ ফ্লোয়েমের বাস্ট তন্তু।
17. নিউক্লিয়াসবিহীন দুটি কোষ হল স্ক্লেরেনকাইমা এবং ফ্লোয়েম কলার সীভ নল।
18. জাইলেমের প্রধান কাজ হল জল ও অজৈব লবণ সংবহনে অংশ গ্রহণ করা এবং উদ্ভিদকে দৃঢ়তা প্রদান করা।
19. ফ্লোয়েমের প্রধান কাজ হল পাতায় তৈরি খাদ্য উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহণ করা এবং খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা।
20. ক্যালোজ এক ধরনের উজ্জ্বল বর্ণহীন কেলাসিত অদ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট জাতীয় বস্তু, যা সীভ প্লেটের উপর শীতকালে সঞ্চিত হয়ে তার ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করে দেয়।

সীভ প্লেটের উপর ক্যালোজের আচ্ছাদনকে ক্যালাস প্যাড বলে।

প্রাণী কলা :

1. প্রাণিদেহের কলাগুলিকে 'স্থির কলা' ও 'তরল কলা'—এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

   যেসব কলার কোষ প্রতিনিয়ত স্থান বদল করে না, তারা স্থির কলা। যেসব কলার কোষ প্রতিনিয়ত স্থান বদল করে, তারা তরল কলা ; যথা—রক্ত ও লসিকা।
2. স্থির কলা পাঁচ রকমের, যথা—(i) আবরণী কলা, (ii) যোগকলা, (iii) পেশী কলা, (iv) নার্ভ কলা ও (v) ক্ষরণ কলা বা গ্রন্থি কলা।
3. দেহের সমগ্র বহির্ভাগের এবং দেহের ভিতরকার নলাকার ও থলির আকার বিশিষ্ট অঙ্গসমূহের আবরণ রচনা করে যে কলা, তার নাম আবরণী কলা।
4. স্তর বিন্যাসের ভিত্তিতে আবরণী কলা চার রকমের, যথা—(i) সরল—একটি কোষস্তরবিশিষ্ট ; (ii) স্তরীভূত—একাধিক কোষস্তরবিশিষ্ট ; (iii) ছদ্মস্তরীভূত—কোষগুলির অসম আকৃতির জন্য স্তরীভূত মনে হলেও প্রকৃত-

পক্ষে একটি কোষস্তরবিশিষ্ট ; (iv) পরিবর্তনীয়—স্ফীত ও শিথিল অবস্থায় কোষস্তরের সংখ্যার তারতম্য ঘটে।

5. কোষের আকৃতি অনুসারে আবরণী কলা তিন রকমের—(i) স্কোয়ামাস বা শল্কাকার (কোষগুলি শল্ক বা আঁশের মত পাতলা ও চ্যাপ্টা)—এটি সরল অথবা স্তরীভূত হতে পারে ; (ii) কিউবিক্যাল বা ঘনকাকার (কোষগুলি ঘনক্ষেত্রের আকৃতিবিশিষ্ট ; (iii) কলামনার বা স্তম্ভাকার (কোষগুলি লম্বা স্তম্ভের মত)—এটিও সরল অথবা স্তরীভূত হতে পারে।

6. আবরণী কলার কোষগুলি সিলিয়াযুক্ত হলে তাকে রোমশ আবরণী কলা বলে ; কোষগুলি উদ্দীপনা গ্রহণ করলে তাকে সংবেদনশীল বা সংজ্ঞাবহ আবরণী কলা বলে ; কোষগুলি থেকে বিভিন্ন বস্তু ক্ষরিত হলে তাকে গ্রন্থিময় আবরণী কলা বলে।

7. আবরণী কলার প্রধান কাজ প্রাণিদেহকে আঘাত ও জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা ; এছাড়া আবরণী কলা ক্ষরণ, রেচন, শোষণ, উদ্দীপনা গ্রহণ ইত্যাদি কাজও করে।

8. যে কলা বিভিন্ন কলার ছোট-ছোট অংশকে যুক্ত করে, দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে এবং দেহের অংশবিশেষের অথবা সমগ্র দেহের ভার বহনের কাজ করে, তাকে যোগকলা বলে। আবরণী কলার তুলনায় যোগকলায় কোষের সংখ্যা কম থাকে ; আন্তঃকোষীয় পদার্থ বা ধাত্র থাকে প্রচুর পরিমাণে ; এছাড়া নানা প্রকার তন্তু থাকে।

9. তন্তুর প্রকার ও বিন্যাস পদ্ধতি এবং ধাত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী যোগকলা পাঁচ রকমের, যথা—(i) প্রকৃত যোগকলা (এর ধাত্র নরম)—এই কলা আবার তিন রকমের, যথা—শিথিল যোগকলা, ঘন যোগকলা ও বিশেষ যোগকলা ; (ii) তরুণাস্থি (এর ধাত্র দৃঢ় কিন্তু নমনীয়, অনেকটা রবারের মত)—এই কলা চার রকমের, যথা—হায়ালিন, ইলাস্টিক, ফাইব্রাস ও ক্যালসিফায়েড তরুণাস্থি ; (iii) অস্থি (এর ধাত্র বেশ শক্ত)—কাঠিন্য ও ঘনত্বের ভিত্তিতে অস্থি দু শ্রেণীর, যথা—ঘনসন্নিবিষ্ট অস্থি ও স্পঞ্জ-সদৃশ অস্থি ; (iv) রক্তোৎপাদক কলা—এরা রক্তকণিকা উৎপাদনকারী কলা ; (v) সংবহন কলা (এর ধাত্র তরল—তাই এদের তরল যোগকলা বলা হয়)।

10. যে কলার কোষগুলির সঙ্কোচনশীলতার জন্য প্রাণীদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটে এবং তাদের গমনাগমন সম্ভব হয়, সেই কলাকে পেশী কলা বলে। পেশী কলার কোষে সূক্ষ্ম সুতার মত মায়োফাইব্রিল থাকে। পেশীকোষ পেশী তন্তু নামে পরিচিত।

11. গঠন, অবস্থান ও কাজের তারতম্য অনুসারে পেশী কলা তিন শ্রেণীর, যথা—(i) সরেখ পেশী, (ii) অরেখ বা মসৃণ পেশী ও (iii) হৃৎপেশী।

12. সরেখ পেশীর কোষগুলি দণ্ড বা বেলনের মত ও বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত ; কোষের মধ্যে আড়াআড়িভাবে পর্যায়ক্রমে গাঢ় ও হালকা রেখা দেখা যায়—ঐগুলি যথাক্রমে A-ব্যান্ড ও I-ব্যান্ড। সরেখ পেশী অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে ; এরা ঐচ্ছিক প্রকৃতির পেশী।

13. অরেখ বা মসৃণ পেশীর কোষগুলি মাকুর আকৃতিবিশিষ্ট এবং এক নিউক্লিয়াসযুক্ত ; কোষের মধ্যে আড়াআড়ি রেখা বা A-ব্যান্ড ও I-ব্যান্ড থাকে না। বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রে এই পেশী দেখা যায় ; এরা অনৈচ্ছিক প্রকৃতির পেশী।

14. হৃৎপেশীর কোষগুলি বেলনাকার, তবে সরেখ পেশীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট ; কোষগুলি শাখান্বিত এবং এক নিউক্লিয়াসযুক্ত। এই পেশীতে ইন্টার-ক্যালেটেড ডিস্ক বা নিবেশিত ফলক থাকে। কেবলমাত্র হৃৎপিন্ডে এই পেশী পাওয়া যায়।

15. যে কলা উদ্দীপকের প্রভাবে উদ্দীপিত হয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে সেই উদ্দীপনাজাত আবেগ প্রেরণ করে এবং সংশ্লিষ্ট প্রাণীটির আচরণে একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাকে নার্ভকলা বলে। এছাড়াও নার্ভকলা দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

16. নার্ভকলার গঠনগত ও কার্যগত একককে বলে নিউরোন। নার্ভকলা সামগ্রিকভাবে যে কাজ করে প্রতিটি নিউরোনও পৃথক-পৃথক ভাবে সেই কাজ করতে পারে।

17. নিউরোনের দেহে তিনটি অংশ থাকে—(i) কোষদেহ বা পেরিক্যারিয়ন, (ii) ডেনড্রাইট বা ডেনড্রন ও (iii) অ্যাক্সন। নিউরোনের কোষদেহে নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইটোপ্লাজম, নিস্‌ল দানা, নিউরোফাইব্রিল ইত্যাদি থাকে ; ডেনড্রাইটে সাইটোপ্লাজম, নিস্‌ল দানা ও নিউরোফাইব্রিল থাকে ; অ্যাক্সনে সাইটোপ্লাজম, নিউরোফাইব্রিল ইত্যাদি থাকে কিন্তু নিস্‌ল দানা থাকে না।

18. ডেনড্রাইটের মাধ্যমে উদ্দীপনাজাত আবেগ নিউরোনের কোষদেহে প্রবেশ করে এবং অ্যাক্সনের মাধ্যমে ঐ আবেগ কোষদেহ থেকে বের হয়ে যায়।

19. নিউরিলেমা বা স্বোয়ান শীথ বেষ্টিত দীর্ঘ অ্যাক্সনকে নার্ভতন্তু বলেঘ। স্নেহ পথার্থের আচ্ছাদনযুক্ত ও আচ্ছাদনবিহীন নার্ভতন্তুকে যথাক্রমে মায়েলিনেটেড (বা মেডালেটেড) ও নন্‌-মায়েলিনেটেড (বা নন্‌-মেডালেটেড) তন্তু বলে। মায়েলিনেটেড তন্তুতে র‍্যানভিয়ারের বা র‍্যাঁভিয়েরের পর্ব দেখা যায়।

অ্যাক্সনের শাখান্বিত প্রান্তভাগকে এন্ড্‌ ব্রাশ বলে—এন্ড্‌ ব্রাশের ফোলা অংশের নাম টার্মিনাল বাটন।

20. একটি নিউরোনের অ্যাক্সন ও আর একটি নিউরোনের ডেনড্রন বা কোষদেহের সংযোগস্থলকে সাইন্যাপ্‌স বলে। প্রথমোক্ত প্রকার সাইন্যাপ্‌সকে অ্যাক্সোডেন-ড্রাইটিক এবং শেষোক্ত প্রকার সাইন্যাপ্‌সকে অ্যাক্সোসোমাটিক সাইন্যাপ্‌স বলে।

21. দেহের যেসব কোষ ও কোষসমষ্টি থেকে নানা প্রকার বস্তু ক্ষরিত হয় তাদের নাম গ্রন্থি কলা বা ক্ষরণ কলা।

অধিকাংশ গ্রন্থি কলা আবরণী কলা থেকে উৎপন্ন হলেও, সব গ্রন্থিকলার, যথা—এককোষী গ্রন্থি ফাইব্রোব্লাস্ট, কনড্রোব্লাস্ট, অস্টিওব্লাস্ট ইত্যাদির উৎস আবরণী কলা নয়।

22. কোষের সংখ্যা অনুযায়ী প্রাণীদের গ্রন্থি দু রকমের—(i) এককোষীয়, যথা—গব্‌লেট কোষ ও (ii) বহুকোষীয়, যথা—যকৃত, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি।

23. ক্ষরণ দ্রব্যের নিঃসরণ পদ্ধতি অনুযায়ী বহুকোষীয় গ্রন্থি দু রকমের—(i) বহিঃস্রাবী ও (ii) অন্তঃস্রাবী।

24. আকৃতি অনুসারে বহুকোষীয় বহিঃস্রাবী গ্রন্থি দু রকমের—(i) নলাকার ও (ii) থলিবৎ।

25. গঠন অনুসারে নলাকার গ্রন্থিগুলি চার রকমের—(i) সরল, যথা—লিবের-কুহ্‌ন-বর্ণিত গ্রন্থি, (ii) সরল প্যাঁচানো, যথা—ঘর্মগ্রন্থি, (ii) সরল শাখান্বিত, যথা—ব্রুনার গ্রন্থি এবং (iv) যৌগিক, যথা—মুখবিবরের শ্লেষ্মা গ্রন্থি।

26. গঠন অনুসারে নলাকার গ্রন্থিগুলি তিন রকমের—(i) সরল, যথা—ব্যাঙের চামড়ার শ্লেষ্মা গ্রন্থি, (ii) সরল শাখান্বিত, যথা—ত্বকের সিবেসিয়াস বা তৈল গ্রন্থি, ও (iii) যৌগিক, যথা—লালাগ্রন্থি।

27. গ্রন্থিকোষ থেকে ক্ষরিত পদার্থের নিঃসরণ পদ্ধতি অনুসারে গ্রন্থি তিন রকমের—(i) মেরোক্রাইন, যথা—সমস্ত অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি ও পরিপাক গ্রন্থি, (ii) অ্যাপোক্রাইন, যথা—স্তনগ্রন্থি, (iii) হলোক্রাইন, যথা—ত্বকের তৈলগ্রন্থি। দানাবিশিষ্ট)।

28. রক্ত একপ্রকার তরল যোগকলা।

রক্তে তিন প্রকার কণিকা এবং রক্তরস বা প্লাজমা নামে একটি তরল অংশ থাকে।

29. রক্তের ঈষৎ হরিদ্রাভ, ক্ষারধর্মী এবং তঞ্চনে সক্ষম তরল অংশের নাম প্লাজমা বা রক্তরস।

30. ফাইব্রিনোজেনমুক্ত রক্তরসকে সিরাম বলে।

31. রক্তকণিকা তিন রকমের—(i) লোহিত রক্তকণিকা, (ii) শ্বেত রক্তকণিকা ও (iii) থ্রম্বোসাইট বা অণুচক্রিকা। এদের মধ্যে রক্তে লোহিত কণিকার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী থাকে, তারপর যথাক্রমে থ্রম্বোসাইট বা অণুচক্রিকা এবং শ্বেত কণিকার পরিমাণ।

32. স্তন্যপায়ীদের লোহিত কণিকাগুলি গোল এবং দ্বি-অবতল; পরিণত অবস্থায় তাদের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে না। অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর লোহিত কণিকা ডিম্বাকার ও উভোত্তল; পরিণত অবস্থায় তাদের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে। মেরুদণ্ডীদের লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিন নামে অক্সিজেনবাহী শ্বাসকণা থাকে।

পরিণত মানুষের লোহিত অস্থি মজ্জায় এবং ভ্রূণের যকৃত ও প্লীহায় লোহিত কণিকা উৎপন্ন হয়।

33. সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ভিত্তিতে শ্বেত রক্তকণিকা দু রকমের—(i) গ্র্যানুলোসাইট (দানাযুক্ত) ও (ii) আগ্র্যানুলোসাইট (দানা-বিহীন)।

গ্র্যানুলোসাইট তিন রকমের—(i) নিউট্রোফিল (নিউট্রাল বা প্রশমিত রঙ গ্রহণকারী দানাবিশিষ্ট), (ii) ইওসিনোফিল (আম্লিক রঙ গ্রহণকারী দানা-বিশিষ্ট), (iii) বেসোফিল (ক্ষারীয় রঙ গ্রহণকারী দানাবিশিষ্ট)।

আগ্র্যানুলোসাইট দু রকমের—(i) লিম্ফোসাইট (এরা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ আকারের হতে পারে) ও (ii) মনোসাইট।

শ্বেত কণিকার উৎপত্তিস্থল লোহিত অস্থি মজ্জা, প্লীহা ও লসিকা গ্রন্থি। দেহে প্রবিষ্ট রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করা এদের প্রধান কাজ।

34. তৃতীয় প্রকার রক্তকণিকাগুলি স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে অণুচক্রিকা এবং অন্যান্য মেরুদণ্ডীর ক্ষেত্রে থ্রম্বোসাইট নামে পরিচিত। থ্রম্বোসাইটগুলি মাকুর আকৃতি-বিশিষ্ট এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ। কিন্তু অণুচক্রিকাগুলি মেগাকেরিওসাইট নামে একপ্রকার বৃহৎ কোষের খণ্ডিত অংশ—তাই নিউক্লিয়াসবিহীন।

অস্থি মজ্জা থেকে থ্রম্বোসাইট ও অণুচক্রিকার উৎপত্তি হয়। থ্রম্বোসাইট ও অণুচক্রিকা রক্তের তঞ্চনে সাহায্য করে।

35. রক্তের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাজ হচ্ছে—(i) খাদ্য, জল ও ভিটামিন পরিবহণ,

(ii) গ্যাস পরিবহণ, (iii) রেচন পদার্থ পরিবহণ, (iv) হরমোন পরিবহণ, (v) দেহের প্রতিরক্ষা, (vi) দেহের তাপসাম্য বজায় রাখা, (vii) ক্ষারাম্ল সাম্য রক্ষা, (viii) প্রোটীন সঞ্চয় ইত্যাদি।

36. লসিকাবহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত স্বচ্ছ, পীতাভ ও ঈষৎ ক্ষারধর্মী জলীয় রসকে লসিকা বলে।

37. লসিকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে—(i) পুষ্টি সরবরাহ, (ii) স্নেহদ্রব্য শোষণ, (iii) দেহের প্রতিরক্ষা, (iv) প্রোটীনের পরিবহণ, (v) তরল নিষ্কাশন ইত্যাদি।

অনুশীলনী

(A) দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Long Answer type questions) ঃ

1. কলা কাকে বলে? উদ্ভিদে প্রধানত কয় প্রকার কলা পাওয়া যায়? ভাজক কলা ও স্থায়ী কলার পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 178-179, 154 ও 158 পৃষ্ঠা দেখ]
2. ভাজক কলা কাকে বলে? উৎপত্তি অনুসারে ভাজক কলার শ্রেণীবিভাগ কর ও তাদের বিবরণ দাও। [উঃ 154 ও 155 পৃষ্ঠা দেখ]
3. অবস্থান অনুযায়ী উদ্ভিদের ভাজক কলার শ্রেণীবিভাগ কর এবং চিত্রসহ তাদের বিবরণ দাও। [উঃ 155 পৃষ্ঠা দেখ]
4. উদ্ভিদের প্রাথমিক ভাজক কলার গঠন ও পরিণতির (transformation) বিবরণ দাও। [উঃ 157 ও 158 পৃষ্ঠা দেখ]
5. উদ্ভিদের স্থায়ী কলা কয় রকমের ও কি কি? সরল স্থায়ী কলা কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার সরল স্থায়ী কলার বিবরণ দাও। [উঃ 4·2(II) দেখ]
6. প্রাথমিক স্থায়ী কলা কয় রকমের ও কি কি? জটিল কলা কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার জটিল কলার বিবরণ দাও। [উঃ 160 ও 168-173 পৃষ্ঠা দেখ]
7. ভাজক কলা ও স্থায়ী কলার পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 158 পৃষ্ঠা দেখ]
8. জাইলেম কি ধরনের কলা? এই কলা যেসব উপাদান দিয়ে গঠিত তাদের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। [উঃ 168-170 পৃষ্ঠা দেখ]
9. ফ্লোয়েম কি ধরনের কলা? এই কলা যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত তাদের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। [উঃ 170-173 পৃষ্ঠা দেখ]
10. জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 174 পৃষ্ঠা দেখ]
11. বিশেষ কলা কাকে বলে? উদ্ভিদের যে কোন তিনটি বিশেষ কলার বর্ণনা দাও। [উঃ 175-177 পৃষ্ঠা দেখ]
12. একটি ছকের সাহায্যে আবরণী কলার শ্রেণীবিভাগ কর। বিভিন্ন প্রকার সরল আবরণী কলার উদাহরণসহ বিবরণ দাও। [উঃ 183-184, 181-183 পৃষ্ঠা দেখ]
13. স্তর বিন্যাসের ভিত্তিতে নির্ধারিত বিভিন্ন প্রকার আবরণী কলার উদাহরণসহ বিবরণ দাও। [উঃ 180 পৃষ্ঠা দেখ]
14. কোষের আকৃতি অনুযায়ী নির্ধারিত বিভিন্ন প্রকার আবরণী কলার উদাহরণসহ বিবরণ দাও। [উঃ 181-182 পৃষ্ঠা দেখ]
15. আবরণী কলা কি? এই কলার বৈশিষ্ট্য ও কাজ উল্লেখ কর। [উঃ 179 ও 183 পৃষ্ঠা দেখ]

16. যোগকলা কি? এই কলার বৈশিষ্ট্য ও কাজ উল্লেখ কর।
[উঃ 184 ও 194 পৃষ্ঠা দেখ]
17. প্রকৃত যোগকলা কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার প্রকৃত যোগকলার উদাহরণসহ বিবরণ দাও। [উঃ 185-188 পৃষ্ঠা দেখ]
18. তরুণাস্থি কয় প্রকার? প্রতি প্রকার তরুণাস্থির উদাহরণসহ বিবরণ দাও।
[উঃ 189-190 পৃষ্ঠা দেখ]
19. তরুণাস্থির বৈশিষ্ট্য ও কাজ উল্লেখ কর। [উঃ 188-190 পৃষ্ঠা দেখ]
20. অস্থিকলা কয় প্রকার? প্রতি প্রকার অস্থিকলার উদাহরণসহ বিবরণ দাও।
[উঃ 191-193 পৃষ্ঠা দেখ]
21. পেশী কলা কাকে বলে? এই কলা কয় প্রকার ও কি কি? চিত্রসহ সরেখ পেশীর গঠন বর্ণনা কর। [উঃ 195-196 পৃষ্ঠা দেখ]
22. অরেখ পেশী ও হৃৎপেশীর গঠন বর্ণনা কর। [উঃ 197-199 পৃষ্ঠা দেখ]
23. সরেখ, অরেখ ও হৃৎপেশীর পার্থক্য উল্লেখ কর।
[উঃ 199-200 পৃষ্ঠা দেখ]
24. চিত্রসহ একটি নিউরোনের গঠন বর্ণনা কর। [উঃ 201 পৃষ্ঠা দেখ]
25. ডেনড্রাইট ও অ্যাক্সনের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 207 পৃষ্ঠা দেখ]
26. গ্রন্থিকলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ 208-211 পৃষ্ঠা দেখ]
27. রক্তরস বা প্লাজমা কি? প্লাজমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও এবং এর কাজ উল্লেখ কর। [উঃ 212-213 পৃষ্ঠা দেখ]
28. লোহিত রক্তকণিকা ও থ্রম্বোসাইটের গঠন ও কাজের বিবরণ দাও।
[উঃ 213-215 পৃষ্ঠা দেখ]
29. শ্বেত রক্তকণিকা কয় প্রকার ও কি কি? প্রতি প্রকারের বিবরণ দাও।
[উঃ 215-218 পৃষ্ঠা দেখ]
30. রক্তের কাজ উল্লেখ কর। [উঃ 220-221 পৃষ্ঠা দেখ]
31. লসিকা কি? এর কাজ উল্লেখ কর। [উঃ 222-223 পৃষ্ঠা দেখ]

(B) **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন** (Short Answer type questions) :

1. প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমার কাজ উল্লেখ কর।
[উঃ 161-164 পৃষ্ঠা দেখ]
2. প্যারেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।
[উঃ 166 পৃষ্ঠা দেখ]
3. উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার স্ক্লেরাইডের বিবরণ দাও।
[উঃ 165-166 পৃষ্ঠা দেখ]
4. ট্র্যাকীড ও ট্র্যাকীয়া কোন্ কলায় পাওয়া যায়? উক্ত দু প্রকার উপাদানের গঠন ও কাজ উল্লেখ কর। [উঃ 168-169 পৃষ্ঠা দেখ]
5. **টীকা লেখ** :—(i) সীভ নল (170 পৃষ্ঠা দেখ), (ii) সঙ্গী কোষ (172 পৃষ্ঠা দেখ), (iii) সীভ কোষ (173 পৃষ্ঠা দেখ), (iv) গ্রন্থি রোম (175 পৃষ্ঠা দেখ), (v) মধু গ্রন্থি (176 পৃষ্ঠা দেখ), (vi) রজন নালী (176 পৃষ্ঠা দেখ), (vii) তরুক্ষীর নালী (176 পৃষ্ঠা দেখ), (viii) হাইডাথোড (178 পৃষ্ঠা দেখ)।

6. সিলিয়াযুক্ত আবরণী কলা ও সংজ্ঞাবহ আবরণী কলার বিবরণ দাও।
[উঃ 182-183 পৃষ্ঠা দেখ]
7. কাচিক, স্থিতিস্থাপক ও তন্তুময় তরুণাস্থির পার্থক্য উল্লেখ কর।
[উঃ 190 পৃষ্ঠা দেখ]
8. অস্থি ও তরুণাস্থির পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 193 পৃষ্ঠা দেখ]
9. আবরণী কলা ও যোগকলার পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 194 পৃষ্ঠা দেখ]
10. রক্তোৎপাদক কলা কাকে বলে? এই কলা কয় প্রকার ও কি কি?
[উঃ 194 পৃষ্ঠা দেখ]
11. অস্থি কলার কাজ উল্লেখ কর। [উঃ 193 পৃষ্ঠা দেখ]
12. পেশীকলার কাজ উল্লেখ কর। [উঃ 200 পৃষ্ঠা দেখ]
13. নিউরোন কয় প্রকারের হয়? এদের প্রত্যেকটির চিত্রসহ বিবরণ দাও।
[উঃ 205-206 পৃষ্ঠা দেখ]
14. সার্কোলেমা ও নিউরিলেমার পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 207 পৃষ্ঠা দেখ]
15. সাইন্যাপ্‌স ও সাইন্যাপ্‌সিসের পার্থক্য উল্লেখ কর।
[উঃ 208 পৃষ্ঠা দেখ]
16. আকৃতি অনুসারে বহুকোষীয় বহিঃস্রাবী গ্রন্থির শ্রেণীবিভাগ কর। এদের প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উঃ 209-210 পৃষ্ঠা দেখ]
17. মেরোক্রাইন, অ্যাপোক্রাইন ও হলোক্রাইন গ্রন্থি বলতে কি বোঝ?
[উঃ 210-211 পৃষ্ঠা দেখ]
18. হিমোগ্লোবিন ও হিমোসায়ানিনের পার্থক্য উল্লেখ কর।
[উঃ 220 পৃষ্ঠা দেখ]
19. প্লাজমা, লসিকা ও সিরামের পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ 223 পৃষ্ঠা দেখ]

(C) অতি সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্ট উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short or specific Answer type questions):

1. কলা কি? [উঃ 154 ও 179 পৃষ্ঠা দেখ]
2. ভাজক কলা বা মেরিস্টেম কাকে বলে? [উঃ 154 পৃষ্ঠা দেখ]
3. আদি ভাজক কলা বা প্রোমেরিস্টেম কি? [উঃ 154 পৃষ্ঠা দেখ]
4. নিবেশিত ভাজক কলা কাকে বলে? [উঃ 155 পৃষ্ঠা দেখ]
5. প্রাথমিক ভাজক কলার কোন্ স্তর থেকে শিরাত্মক কলা গঠিত হয়?
[উঃ 158 পৃষ্ঠা দেখ]
6. ক্যালিপ্‌ট্রোজেন কি? [উঃ 158 পৃষ্ঠা দেখ]
7. প্রাথমিক ভাজক কলা কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
[উঃ 155 পৃষ্ঠা দেখ]
8. গৌণ ভাজক কলা বলতে কি বোঝ? উদাহরণ দাও।
[উঃ 155 পৃষ্ঠা দেখ]
9. প্রোজেনকাইমা কি? [উঃ 161 পৃষ্ঠা দেখ]
10. ক্লোরেনকাইমা কি? [উঃ 160 পৃষ্ঠা দেখ]
11. এরেনকাইমা কি? [উঃ 161 পৃষ্ঠা দেখ]
12. ইডিওব্লাস্ট কি? [উঃ 161 পৃষ্ঠা দেখ]
13. পাট কি ধরনের তন্তু? [উঃ 173 পৃষ্ঠা দেখ]

14. স্ক্লেরাইড কি? [উঃ 164 পৃষ্ঠা দেখ]
15. প্রোটোজাইলেম কি? [উঃ 168 পৃষ্ঠা দেখ]
16. মেটাজাইলেম কি? [উঃ 168 পৃষ্ঠা দেখ]
17. কাষ্ঠিক তন্তু বা জাইলেম তন্তু কি? [উঃ 170 পৃষ্ঠা দেখ]
18. সীভ প্লেট কি? [উঃ 171 পৃষ্ঠা দেখ]
19. ক্যালাস প্যাড কি? [উঃ 171 পৃষ্ঠা দেখ]
20. স্কোয়ামাস আবরণী কলা কোথায় পাওয়া যায়? [উঃ 181 পৃষ্ঠা দেখ]
21. কলামনার বা স্তম্ভাকার আবরণী কলা কোথায় পাওয়া যায়? [উঃ 182 পৃষ্ঠা দেখ]
22. ছদ্মস্তরীভূত আবরণী কলা কোথায় পাওয়া যায়? [উঃ 180 পৃষ্ঠা দেখ]
23. মেসেনকাইম কি? [উঃ 184 পৃষ্ঠা দেখ]
24. শ্বেত তন্তু ও পীত তন্তু বলতে কি বোঝ? [উঃ 185-186 পৃষ্ঠা দেখ]
25. হিস্টিওসাইট কি? [উঃ 186 পৃষ্ঠা দেখ]
26. মাস্ট কোষ কি? [ঐ]
27. ক্রোমাটোফোর কি? [উঃ 188 পৃষ্ঠা দেখ]
28. পেরিকনড্রিয়াম কি? [উঃ 189 পৃষ্ঠা দেখ]
29. পেরিঅস্টিয়াম কি? [উঃ 192 পৃষ্ঠা দেখ]
30. অস্টিওব্লাস্ট ও অস্টিওক্লাস্ট কোষ কাদের বলে? [উঃ 191 পৃষ্ঠা দেখ]
31. মায়োফাইব্রিল কি? [উঃ 195 পৃষ্ঠা দেখ]
32. অ্যাকটিন ও মায়োসিন তন্তু কি? [উঃ 196 পৃষ্ঠা দেখ]
33. সার্কোমিয়ার কি? [উঃ 196 পৃষ্ঠা দেখ]
34. এপিমাইসিয়াম, পেরিমাইসিয়াম ও এন্ডোমাইসিয়াম কি? [উঃ 197 পৃষ্ঠা দেখ]
35. ঐচ্ছিক পেশী ও অনৈচ্ছিক পেশী বলতে কি বোঝ? উদাহরণ দাও। [উঃ 197 ও 198 পৃষ্ঠা দেখ]
36. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক কি? [উঃ 198-199 পৃষ্ঠা দেখ]
37. নিউরোন কি? [উঃ 204 পৃষ্ঠা দেখ]
38. নিউরিলেমা বা স্বোয়ান শীথ কি? [উঃ 204 পৃষ্ঠা দেখ]
39. মায়েলিন শীথ কি? [উঃ 204 পৃষ্ঠা দেখ]
40. র‍্যানভিয়ারের পর্ব কি? [উঃ 203 পৃষ্ঠা দেখ]
41. কোল্যাটারাল কি? [উঃ 204 পৃষ্ঠা দেখ]
42. এপিনিউরিয়াম, পেরিনিউরিয়াম ও এন্ডোনিউরিয়াম কি? [উঃ 206 পৃষ্ঠা দেখ]
43. সিরাম কি? [উঃ 212 পৃষ্ঠা দেখ]
44. **বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া শব্দ/শব্দসমষ্টি দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর:**

(ক) ডারমাটোজেন থেকে——গঠিত হয় (অন্তস্ত্বক/বহিঃস্ত্বক)। [উঃ 157 পৃষ্ঠা দেখ]

(খ) পেরিব্লেম থেকে——গঠিত হয় (অন্তস্ত্বক/বহিঃস্ত্বক)। [উঃ 157-158 পৃষ্ঠা দেখ]

(গ) স্ক্লেরেনকাইমা একপ্রকার——কোষ (মৃত/জীবিত)। [উঃ 163 পৃষ্ঠা দেখ]

(ঘ) বাস্ট তন্তু——পাওয়া যায় (জাইলেমে/ফ্লোয়েমে)। [উঃ 170 পৃষ্ঠা দেখ]

(ঙ) রক্ত একপ্রকার——যোগকলা (স্থির/তরল)। [উঃ 211 পৃষ্ঠা দেখ]

(চ) শ্বাসনালীতে——আবরণী কলা পাওয়া যায় (শল্কাকার/ছদ্মস্তরীভূত)। [উঃ 180 পৃষ্ঠা দেখ]

(ছ) ——তন্তু কোলাজেন দিয়ে তৈরি (শ্বেত/পীত)। [উঃ 185 পৃষ্ঠা দেখ]

(জ) মানুষের কর্ণছত্রে——তরুণাস্থি থাকে (হায়ালিন/ইলাস্টিক)। [উঃ 190 পৃষ্ঠা দেখ]

(ঝ) অ্যাক্সন হিলক অংশে নিস্‌ল দানা——(থাকে/থাকে না)। [উঃ 202 পৃষ্ঠা দেখ]

(ঞ) অ্যাক্সন ও পেরিক্যারিয়নের (কোষদেহ) মধ্যে সাইন্যাপ্‌সকে——সাইন্যাপ্‌স বলে (অ্যাক্সোসোমাটিক/অ্যাক্সোডেনড্রাইটিক)। [উঃ 204 পৃষ্ঠা দেখ]

(ট) ঘর্মগ্রন্থি একপ্রকার——গ্রন্থি (নলাকার/থলিবৎ)। [উঃ 209 পৃষ্ঠা দেখ]

(ঠ) লালাগ্রন্থি একপ্রকার——গ্রন্থি (নলাকার/থলিবৎ)। [উঃ 210 পৃষ্ঠা দেখ]

(ড) স্তন্যপায়ীদের পরিণত লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস——(থাকে/থাকে না)। [উঃ 213 পৃষ্ঠা দেখ]

45. **নিম্নলিখিত বাক্যগুলির সঠিক অংশে '✓' চিহ্ন দাওঃ**

(ক) ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম একপ্রকার প্রাথমিক/গৌণ ভাজক কলা। [উঃ 155 পৃষ্ঠা দেখ]

(খ) পার্শ্বস্থ ভাজক কলা কাণ্ডের দৈর্ঘ্যের/পরিধির বৃদ্ধি ঘটায়। [উঃ 156 পৃষ্ঠা দেখ]

(গ) কোলেনকাইমা একপ্রকার জটিল/সরল কলা। [উঃ 160 পৃষ্ঠা দেখ]

(ঘ) সীভ নলে নিউক্লিয়াস থাকে/থাকে না। [উঃ 171 পৃষ্ঠা দেখ]

(ঙ) হায়ালিন বা কাচিক তরুণাস্থিতে পীত তন্তু থাকে/থাকে না। [উঃ 189 পৃষ্ঠা দেখ]

(চ) অস্থি কলার ভিতর লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত নালীগুলির নাম হ্যাভারসিয়ান নালী/ভল্‌ক্‌ম্যান-বর্ণিত নালী। [উঃ 191 পৃষ্ঠা দেখ]

(ছ) পেশীকোষের সাইটোপ্লাজমকে সার্কোপ্লাজম/নিউরোপ্লাজম বলে। [উঃ 195 পৃষ্ঠা দেখ]

(জ) অ্যাক্সনের মধ্যে নিউরোফাইব্রিল থাকে/থাকে না। [উঃ 203 পৃষ্ঠা দেখ]

(ঝ) সাইন্যাপ্‌স অঞ্চলে আবেগপ্রবাহ একমুখী/উভমুখী। [উঃ 204 পৃষ্ঠা দেখ]

জীবের জীবনক্রিয়া সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা 5

[ELEMENTARY IDEA ABOUT LIFE PROCESSES]

Syllabus :

A. Transpiration : Definition, factors (mention only) ; one simple experiment showing transpiration.

B. Photosynthesis : Components—CO_2 and H_2O (with their sources), chlorophyll and sunlight ; mechanism—outline of light and dark reactions ; brief idea of entrapping of solar energy by chloroplasts (names of enzymes not required) ; significance of photosynthesis.

C. Respiration : Fundamental process—external and internal respiration (site of respiration) ; aerobic respiration, anaerobic respiration and fermentation—(outline of the processes, mentioning respective end products) ; Glycolysis [mention—hexose—triose—pyruvic acid– acetyl CoA - Kreb's cycle (mention only CO_2, H_2O and release of energy].

D. Nutrition : (a) Autotropic—definition, sources of raw materials, macro- and micro-nutrients (mention only .

(b) Heterotropic—definition, types and sources of food—Carbohydrate, Protein, Fats and Oils, Vitamins and Minerals. (Details and chemical composition not required). Significance of nutrition.

E. Circulation : Principles of circulation in plants and animals (details not required) ; structures concerned (mention only).

F. Excretion : Principles of excretion in plants and animals—mention excretory products of plants and animals.

G. Growth : Definition, factors controlling growth in plants and animals (mention only) ; difference between growth of plants and animals.

H. Movement : Types of movement.

(a) Movement in plants—
- (i) Tactic :—chemo- and thermo- ;
- (ii) Tropic :—photo-, geo- and hydro- ;
- (iii) Nastic :- scismo- and nycti-

(b) Movement in animals—
- (i) Terrestrial—man (bipedal locomotion only)
- (ii) Aquatic—fish,
- (iii) Aerial—pigeon

[Structure and mechanism not required]

I. Reproduction : Asexual and sexual—differences only ;

units of sexual reproduction ; iso-, aniso- and oo-gamous types ; outline of the process of fertilisation—union of gametes leading to zygote formation. General idea about alternation of generations. (Outline only).

Mention one example in plant and one in animal.

A. বাষ্পমোচন বা প্রস্বেদন (Transpiration)

5.1. সূচনা (Introduction)

স্থলজ উদ্ভিদ বিভিন্ন জৈবনিক কার্য পরিচালনার জন্য এককোষী মূলরোম দিয়ে মাটি থেকে ক্রমাগত জল শোষণ করে। সাধারণত শোষিত জলের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। এই শোষিত জলের কিছু অংশ বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে ব্যবহৃত হয়, আর বাকী অংশ দিনের বেলায় পাতা, কান্ড ও লেন্টিসেলের মধ্য দিয়ে বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল উদ্ভিদদেহ থেকে বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়াকে **বাষ্পমোচন** বলে। বাষ্পমোচন প্রক্রিয়াটিকে আংশিকভাবে প্রোটোপ্লাজম ও সূর্যালোক নিয়ন্ত্রণ করলেও এই প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। অতিরিক্ত বাষ্পমোচন অনেক সময় উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে।

5.2. সংজ্ঞা (Definition)

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় প্রোটোপ্লাজম ও সূর্যালোকের আংশিক প্রভাবে উদ্ভিদদেহের প্রয়োজনাতিরিক্ত জল বায়ব অংশের (পত্ররন্ধ্র, লেন্টিসেল ইত্যাদি) মধ্য দিয়ে বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়, তাকে বাষ্পমোচন বা প্রস্বেদন (Transpiration) বলে।

5.3. বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া (Mechanism of Transpiration)

উদ্ভিদদেহ থেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত জল **বাষ্পীভবন** (Evaporation) ও **বাষ্পমোচন** (Transpiration)—এই দুটি প্রক্রিয়াতেই বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। তবে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়াটি একটি ভৌত প্রক্রিয়া এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা, বায়ুর আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহের হার প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল।

বাষ্পমোচন একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, যা উপরিউক্ত শর্তগুলির উপর আংশিক নির্ভরশীল হলেও, প্রধানত প্রোটোপ্লাজম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

বাষ্পমোচন তিন রকমের—(a) **পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাষ্পমোচন** (Stomatal transpiration), (b) **কিউটিকলের মাধ্যমে বাষ্পমোচন** (Cuticular transpiration) এবং (c) **লেন্টিসেলের মাধ্যমে বাষ্পমোচন** (Lenticular transpiration)।

চিত্র 5.1 : প্রস্থচ্ছেদে পত্ররন্ধ্রের গঠন।

(a) **পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাষ্পমোচন :** এই প্রক্রিয়ায় পাতা এবং কান্ডের বায়ব অংশে বর্তমান পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাষ্পমোচন হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক পরিমাণ (80%—90%) বাষ্পমোচন হয়।

(b) **কিউটিকলের মাধ্যমে বাষ্পমোচন :** এই প্রক্রিয়ায় কান্ড এবং পাতার বহিঃস্ত্বকের বাইরে অবস্থিত কিউটিকলের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ জল (10%—20%) বাষ্পাকারে নির্গত হয়।

(c) **লেণ্টিসেলের মাধ্যমে বাষ্পমোচন** ঃ এই প্রক্রিয়ায় কান্ড এবং ফলের গাত্রে অবস্থিত লেণ্টিসেলের মাধ্যমে সামান্য পরিমাণ জল (5%—10%) বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায় (চিত্র 5.2)।

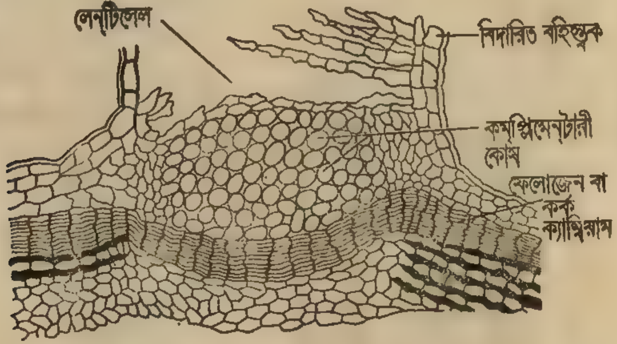

চিত্র 5.2 ঃ প্রস্থচ্ছেদে লেণ্টিসেলের গঠন।

উপরিউক্ত তিন প্রকারের বাষ্পমোচনের মধ্যে পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাষ্পমোচনই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশী পরিমাণ জল উদ্ভিদদেহ থেকে নির্গত হয়।

নিচে পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাষ্পমোচনের বিশদ বিবরণ দেওয়া হল ঃ

পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাষ্পমোচন (Stomatal transpiration) ঃ পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ সবচেয়ে বেশী পরিমাণ জল ত্যাগ করে (চিত্র 5.1)। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাষ্পমোচনের সময় পত্ররন্ধ্র দিয়ে জলীয়

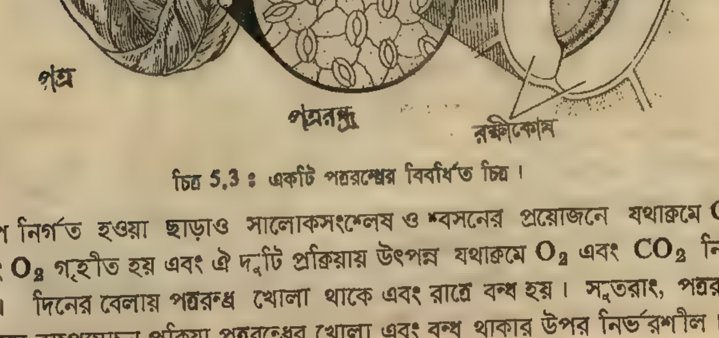

চিত্র 5.3 ঃ একটি পত্ররন্ধ্রের বিবর্ধিত চিত্র।

বাষ্প নির্গত হওয়া ছাড়াও সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের প্রয়োজনে যথাক্রমে CO_2 এবং O_2 গৃহীত হয় এবং ঐ দুটি প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন যথাক্রমে O_2 এবং CO_2 নির্গত হয়। দিনের বেলায় পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে এবং রাত্রে বন্ধ হয়। সুতরাং, পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া পত্ররন্ধ্রের খোলা এবং বন্ধ থাকার উপর নির্ভরশীল।

(i) **পত্ররন্ধ্রের গঠন** (Structure of Stomata)ঃ পত্ররন্ধ্র পাতা এবং কাণ্ডের বহিঃস্ত্বকে অবস্থিত দুটি অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি রক্ষীকোষ (guard cell) দিয়ে বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র (চিত্র 5.3)। রক্ষীকোষ দুটির রন্ধ্র-সংলগ্ন প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পুরু এবং ঐ সজীব কোষ দুটিতে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। পত্ররন্ধ্রকে ঘিরে বহিঃস্ত্বকের অন্যান্য কোষ স্বচ্ছ (চিত্র 5.5)। রক্ষীকোষ দুটি রসস্ফীত হলে এরা প্রসারিত হয়। এই সময় পত্ররন্ধ্র ছিদ্র-সংলগ্ন অংশ কম প্রসারিত হওয়ায় ছিদ্রটি খুলে যায়।

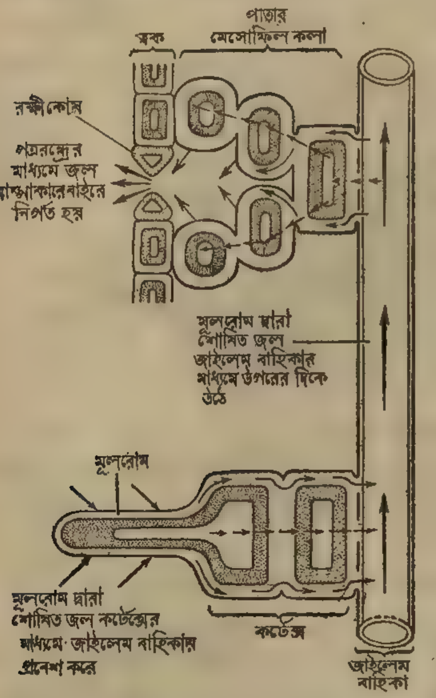

চিত্র 5.4 ঃ বাষ্পমোচনের প্রবাহ দেখানো হয়েছে।

(ii) **পত্ররন্ধ্রের খোলা এবং বন্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া** (Mechanism of opening and closing of stomata)ঃ পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষে শ্বেতসার থাকে। দিনের বেলায় সূর্যালোকের উপস্থিতিতে রক্ষীকোষ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য তা ব্যবহার করে। ফলে রক্ষীকোষের কোষরস প্রশম (pH_7) হয়ে পড়ে।

অধিক তাপমাত্রা এবং প্রশম কোষরসে শ্বেতসার গ্লুকোজ-1-ফসফেটে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়া ফসফোরাইলেজ উৎসেচকের সাহায্যে হয়।

গ্লুকোজ-1-ফসফেট, ফসফোগ্লুকো-মিউটেজ উৎসেচকের সাহায্যে গ্লুকোজ-6-ফসফেটে পরিণত হয়।

গ্লুকোজ-6-ফসফেট, ফসফাটেজ উৎসেচকের সাহায্যে গ্লুকোজ এবং অজৈব ফসফেট (iP) সৃষ্টি করে।

দ্রবণীয় গ্লুকোজ এবং অজৈব ফসফেট রক্ষীকোষের কোষরসের অভিস্রবণ চাপ বাড়িয়ে দেয়। অতিরিক্ত অভিস্রবণ চাপের জন্য রক্ষীকোষ তার পার্শ্ববর্তী কোষ থেকে জল শোষণ করে রসস্ফীত হয়। এর ফলে পত্ররন্ধ্র খুলে যায় এবং বাষ্পমোচন হয়।

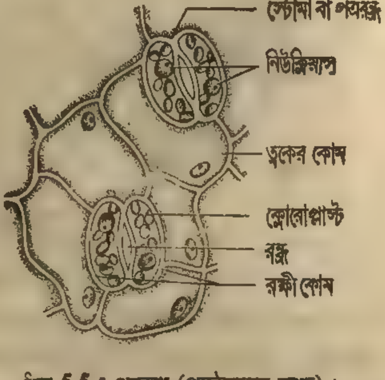

চিত্র 5.5 ঃ পত্ররন্ধ্র (পৃষ্ঠতলের দৃশ্য)।

রাত্রে সালোকসংশ্লেষ বন্ধ থাকে। ঐ সময় শ্বসনের ফলে উৎপন্ন CO_2 কোষরসে সঞ্চিত হয়ে তাকে আম্লিক (pH_5) করে (চিত্র 5.6)।

কম তাপমাত্রায়, অন্ধকারে এবং আম্লিক মাধ্যমে (pH_5) গ্লুকোজ এবং অজৈব ফসফেট, হেক্সোকাইনেজ উৎসেচক এবং ATP-র সাহায্যে গ্লুকোজ-1-ফসফেটে পরিণত হয়। গ্লুকোজ-1-ফসফেট শেষ পর্যায়ে ফসফোরাইলেজ উৎসেচকের সাহায্যে শ্বেতসার (starch)-এ পরিণত হয়।

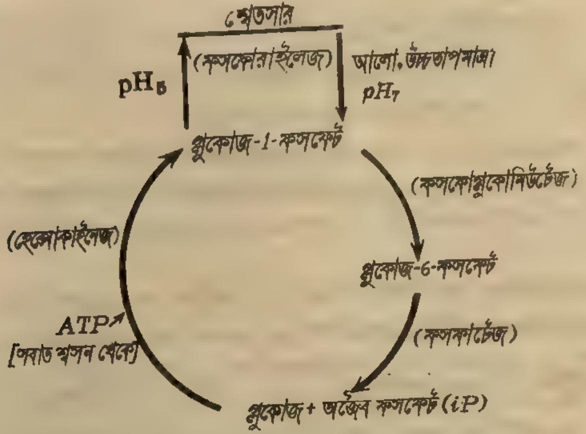

চিত্র 5.6 : পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ার ছক।

শ্বেতসার অদ্রবণীয় বলে রক্ষীকোষের কোষরসের অভিস্রবণ চাপ কমে যায় এবং রক্ষীকোষ রসস্ফীতি হারিয়ে পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে। এই অবস্থায় বাষ্পমোচন বন্ধ থাকে।

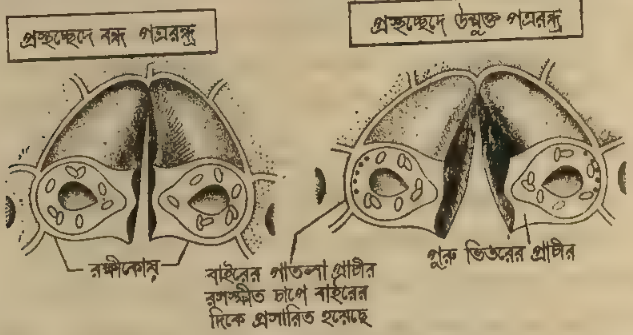

চিত্র 5.7 : প্রস্থচ্ছেদে বন্ধ ও উন্মুক্ত পত্ররন্ধ্র দেখানো হয়েছে।

[পত্ররন্ধ্র উন্মোচনে সক্রিয় প্রোটন চলাচল পদ্ধতি প্রবর্তন করেন বিজ্ঞানী **লেভিট** (Levitt, 1974)। তিনি পত্ররন্ধ্র উন্মোচনে পটাসিয়াম (K^+) আয়নের সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে পত্ররন্ধ্রের উন্মোচন ও বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় রক্ষীকোষে পটাসিয়াম আয়নের (K^+) উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির জন্য।

আলোর উপস্থিতিতে রক্ষীকোষে বেশী ম্যালিক অ্যাসিড (Malic acid) সঞ্চিত হয়, এর ফলে পটাসিয়াম আয়ন শোষণ বৃদ্ধি পায়। আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্ট হতে রক্ষীকোষের সাইটোপ্লাজমে ম্যালিক অ্যাসিড নিঃসৃত হয়, সেজন্য রক্ষীকোষে পটাসিয়াম ক্যাটায়ন ও ম্যালিক অ্যাসিড অ্যানায়নের পরিমাণ বাড়ার ফলে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় রক্ষীকোষের পার্শ্বস্থ কোষ হতে জল ভিতরে প্রবেশ করে। ফলে রক্ষীকোষ স্ফীত হয়ে পত্ররন্ধ্র খুলে দেয় (চিত্র 5.7)।]

(ii) **বাষ্পমোচন** (Transpiration) :

(a) জাইলেম বাহিকা থেকে জল পাতার মেসোফিল কলায় প্রবেশ করে (চিত্র 5.4)।

(b) পত্ররন্ধ্র প্রকোষ্ঠ (Stomatal chamber) সংলগ্ন মেসোফিল কোষ থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে পত্ররন্ধ্র প্রকোষ্ঠে জমা হয়।

(c) পত্ররন্ধ্র প্রকোষ্ঠ থেকে বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সাধারণত কম থাকে। এই অবস্থায় পত্ররন্ধ্র ছিদ্র খোলা থাকলে জলীয় বাষ্প পত্ররন্ধ্র প্রকোষ্ঠ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডলে বেরিয়ে যায় অর্থাৎ বাষ্পমোচন হয়।

● প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন ও বাষ্পীভবনের মধ্যে পার্থক্য (Differences between transpiration and evaporation)

প্রস্বেদন (Transpiration)	**বাষ্পীভবন** (Evaporation)
1. এটি একটি শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি।	1. এটি একটি ভৌত পদ্ধতি।
2. এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন চাপের অস্তিত্ব দেখা যায়।	2. বাষ্পীভবনের সময় কোনও চাপের অস্তিত্ব দেখা যায় না।
3. পাতার পত্ররন্ধ্রের সজীব রক্ষীকোষ দ্বারা প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রিত হয়।	3. বাষ্পীভবন সজীব কোষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, অসম্পৃক্ত বায়ুমণ্ডলে বাষ্পীভবন ঘটে।
4. প্রস্বেদনের পৃষ্ঠ আয়তন (surface area) নিয়ন্ত্রিত হয় রক্ষীকোষ দ্বারা।	4. বাষ্পীভবনের পৃষ্ঠ আয়তন রক্ষীকোষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, এটি সম্পূর্ণ অনাবৃত।

5.4. বাষ্পমোচনের গুরুত্ব (Importance of transpiration)

(i) পাতার মাধ্যমে বাষ্পমোচনের ফলে রসের উৎস্রোত অব্যাহত থাকে।

(ii) রসের উৎস্রোত মূল দ্বারা শোষিত লবণের সংবহনে সাহায্য করে।

(iii) বাষ্পমোচনের সময় জল উদ্ভিদদেহ থেকে বাষ্পাকারে নির্গত হয়। জলের বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় লীন তাপ (Latent heat) উদ্ভিদদেহ থেকে গৃহীত হয়। এর ফলে উদ্ভিদদেহ কিছু তাপ ছেড়ে শীতল হয়।

(iv) বাষ্পমোচন দ্বারা অতিরিক্ত জল উদ্ভিদদেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এর ফলে জলের চাপ অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে উদ্ভিদদেহের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

5.5. বাষ্পমোচন একটি ক্ষতিকর প্রয়োজনীয় পদ্ধতি (Transpiration is a necessary evil)

ক্ষতিকর পদ্ধতি ঃ অতিরিক্ত বাষ্পমোচন ক্ষেত্রবিশেষে উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ার জন্য উদ্ভিদকে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রচুর জল শোষণ করতে হয় এবং এর ফলে প্রচুর শক্তি (ATP) ব্যয় হয়। তাছাড়া, মাটি থেকে সংগৃহীত কষ্টার্জিত জল (hard earned water) এই প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে গেলে শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জলের অভাব হতে পারে। পত্ররন্ধ্রের অবস্থান প্রধানত অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের আদান-প্রদানের জন্য। কিন্তু বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় ঐ পত্ররন্ধ্র-পথে জলীয় বাষ্প নির্গত হয়ে যায়। অনেক উদ্ভিদকে এই বাষ্পমোচন রোধ করার জন্য পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা হ্রাস করতে হয়। ফলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের আদান-প্রদানে প্রভৃত অসুবিধা হয়।

প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ঃ বাষ্পমোচন উদ্ভিদদেহের একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া এবং উদ্ভিদদেহ থেকে শোষিত জল বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাওয়ায় রসের উৎস্রোত অব্যাহত থাকে। এর ফলে মূল দ্বারা খনিজ লবণের শোষণ এবং লবণের সংবহন ত্বরান্বিত হয়। তাছাড়া, বাষ্পমোচনের সময় উদ্ভিদদেহ থেকে অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে নির্গত হওয়ায়, জলের বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় লীন তাপ উদ্ভিদ-দেহ থেকে গৃহীত হয় এবং এর জন্য উদ্ভিদদেহ কিছু তাপ বর্জন করে শীতল হয়। সর্বোপরি বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত জল উদ্ভিদদেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ায়, জলের চাপ অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে দেহের ক্ষতি করতে পারে না।

সুতরাং এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত যে বাষ্পমোচন একটি ক্ষতিকর প্রয়োজনীয় পদ্ধতি।

5.6. বাষ্পমোচনের শর্ত (Factors influencing transpiration)

বাষ্পমোচন প্রক্রিয়াটি কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। নিচে এই শর্তগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

● **বাহ্যশর্ত** (External factors) ঃ

(1) **পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা** (Atmospheric temperature) ঃ পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে বাষ্পমোচনের হারও বেড়ে যায়, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক উষ্ণতার সঙ্গে বাষ্পমোচনের হার সরাসরি নির্ভরশীল।

(2) **বায়ুর আর্দ্রতা** (Humidity of air) ঃ বায়ুর আর্দ্রতা যত কম হবে অর্থাৎ বায়ু যত বেশী শুষ্ক হবে বাষ্পমোচনের হারও তত বৃদ্ধি পাবে। ক্ষেত্রবিশেষে শুষ্ক বায়ুতে জল শোষণ থেকে বাষ্পমোচন এত বেশী হয় যে, উদ্ভিদের পাতা, শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি অবনত হয়ে যায়। একে **অবনমন** বা **উইলটিং** (Wilting) বলে।

(3) **আলোর তীব্রতা** (Intensity of light) ঃ তীব্র আলোকে সালোক-সংশ্লেষের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বেশী পরিমাণে শর্করা উৎপন্ন হয়। উপরন্তু তীব্র আলোকে পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষের (guard cells) শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য অধিক পরিমাণে দ্রবণীয় শর্করায় রূপান্তরিত হয়। ফলে রক্ষীকোষের মধ্যে অভিস্রবণ চাপ

বৃদ্ধি পায় এবং রক্ষীকোষদ্বয় আশে-পাশের সজীব কোষ থেকে জল (দ্রাবক) গ্রহণ করে রসস্ফীত হয়। এই অবস্থায় রক্ষীকোষে রসস্ফীতি চাপ বৃদ্ধি পেলে রন্ধ্রের বিপরীত দিকের প্রাচীর বেশী প্রসারিত হয় এবং পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত হয় ; কেননা রক্ষীকোষের পত্ররন্ধ্র-সংলগ্ন প্রাচীর, রন্ধ্রের বিপরীত দিকের প্রাচীরের চেয়ে বেশী পুরু। পত্ররন্ধ্র ভালভাবে উন্মুক্ত হলে বাষ্পমোচনের হারও বৃদ্ধি পায়।

(4) **বায়ুপ্রবাহ** (Flow of air) ঃ বাষ্পমোচন বায়ুপ্রবাহ তথা বায়ুর বেগের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। প্রবল বায়ুপ্রবাহে বাষ্পমোচনের হার বৃদ্ধি পায়।

(5) **কার্বন ডাই-অক্সাইড** (Carbon di-oxide) ঃ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্বাভাবিক পরিমাণ 0·03%। বায়ুমণ্ডলের এই কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় তবে বাষ্পমোচনের হার হ্রাস পায়। অপরপক্ষে, বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পেলে বাষ্পমোচনের হার বৃদ্ধি পায়। কারণ কার্বন ডাই-অক্সাইডের আপেক্ষিক পরিমাণ পত্ররন্ধ্রের উন্মোচন ও বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

● **অভ্যন্তরীণ শর্ত** (Internal factors) ঃ

(1) **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm) ঃ উদ্ভিদদেহের কোষের প্রোটোপ্লাজমের ঘনত্ব বেশী হলে শোষণ চাপ বেড়ে যায় এবং মূল থেকে ঊর্ধ্বাংশে, বিশেষত পাতার কোষগুলিতে জলপ্রবাহ অব্যাহত থাকে এবং বাষ্পমোচনের হারও বেড়ে যায়। আবার প্রোটোপ্লাজমের ঘনত্ব কমে গেলে, বাষ্পমোচনও কমে যায়।

(2) **জলশোষণ** (Absorption of water) ঃ মৃত্তিকায় যথেষ্ট জল থাকলে, প্রখর সূর্যালোক ও শুষ্ক আবহাওয়ায় মূল অনেক বেশী জল শোষণ করে। ফলে বাষ্পমোচনের হারও বেড়ে যায়।

(3) **পত্ররন্ধ্রের উন্মোচন** (Opening of stomatal aperture) ঃ প্রোটোপ্লাজম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পত্ররন্ধ্রের উন্মোচন যত বেশী হবে, বাষ্পমোচনের হারও তত বেশী হবে। পত্ররন্ধ্র আংশিক উন্মুক্ত হলে বাষ্পমোচনের হার কমে যায়।

(4) **পত্রফলকের গঠন** (Structure of lamina) ঃ পত্রফলকের আকার বড় হলে বাষ্পমোচনের হার বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, পত্রফলকের অন্তর্গঠনে মেসোফিল কলার অন্তর্গত স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা কোষের সংখ্যা বেশী হলে বাষ্পমোচনের হার বৃদ্ধি পায়, কারণ অধিক সংখ্যক কোষান্তর রন্ধ্র বাষ্পমোচনের সহায়ক।

(5) **উদ্বোধক বা হরমোন** (Hormones) ঃ বিভিন্ন উদ্ভিদ হরমোন, যথা—সাইটোকাইনিন, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড প্রভৃতি পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষের ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে, ফলে রক্ষীকোষ দ্রুত রসস্ফীত হয় এবং পত্ররন্ধ্রের উন্মোচনে তথা বাষ্পমোচনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

(6) **সজীবতা** (Vitality) ঃ বাষ্পমোচন একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া এবং যে কোন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াই কোষের সজীবতার উপর নির্ভরশীল। তাই বাষ্পমোচনও উদ্ভিদদেহের সজীবতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

5.7. বাষ্পমোচনের পরীক্ষাসমূহ
(Experiments on transpiration)

১ম পরীক্ষা ঃ বাষ্পমোচনের সাধারণ পরীক্ষা (Simple Experiment on Transpiration)

উপকরণ (Requirements) ঃ টবসহ একটি সতেজ চারাগাছ, কাচের বেলজার, একখন্ড রবারের চাদর, সুতা, ভেস্‌লিন, একটি বড় কাচের টুকরো ও ব্লটিং-পেপার।

পরীক্ষা (Experiment) ঃ গাছ-সহ টবের মাটির উপরিভাগ রবারের চাদর দিয়ে ঢেকে ভাল করে সুতা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল, যাতে টবের মাটির জল বাষ্পাকারে বেরিয়ে না আসে। এর পর টবসহ গাছটিকে কাচের বড় টুকরোটির উপর বসিয়ে বেলজার দিয়ে ঢেকে বেলজারের কিনারা ভাল করে ভেস্‌লিন দিয়ে বায়ু নিরুদ্ধ করা হল। এর পর কিছুক্ষণ ব্যবস্থাপনাটিকে সূর্যালোকে রেখে বেলজারটিকে ভেজা ব্লটিং-পেপার দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল।

চিত্র 5.8 ঃ বাষ্পমোচনের পরীক্ষা (বেলজারের সাহায্যে)।

পর্যবেক্ষণ (Observation) ঃ কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে, বেলজারের ভিতরের তলে কিছু কিছু জলকণা জমেছে।

সিম্ধান্ত (Inference) ঃ গাছটি টবের মাটি থেকে যে প্রয়োজনাতিরিক্ত জল গ্রহণ করেছিল, তা বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় জলীয় বাষ্প হিসেবে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং এই জলীয় বাষ্পই ভেজা ব্লটিং-পেপারের শীতল সংস্পর্শে আসা মাত্রই বিন্দু বিন্দু জলকণায় পরিণত হয়ে বেলজারের ভিতরের তলে জমা হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, টবের উপরিভাগ রবারের চাদর দিয়ে মোড়া থাকায় টবের মাটির উপরের তল থেকে কোন জল বাষ্পাকারে বেরিয়ে আসেনি।

২য় পরীক্ষা ঃ গ্যানং-এর পোটোমিটার দিয়ে বাষ্পমোচনের পরীক্ষা (Experiment on Transpiration by Ganong's Potometer)

উপকরণ (Requirements) ঃ গ্যানং-এর পোটোমিটার, সতেজ উদ্ভিদের একটি পল্লবিত চারা, বিকার, একটি স্ক্যালপেল, ভেস্‌লিন, ড্রপার ও জল।

পরীক্ষা (Experiment) ঃ প্রথমে পোটোমিটারটি জলপূর্ণ করা হল। সতেজ চারাগাছটিকে জলের মধ্যে পাতা সমেত কেটে ছিদ্রযুক্ত একটি ছিপির সাহায্যে তাড়াতাড়ি গ্যানং-এর পোটোমিটারের ঊর্ধ্বমুখী উল্লম্ব বাহুর মুখে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হল। সমস্ত সংযোগস্থল ভেস্‌লিন দিয়ে বায়ুনিরুদ্ধ করে ড্রপারের সাহায্যে

নিম্নমুখী উল্লম্ব বাহু থেকে কয়েক ফোঁটা জল ফেলে বিকারে ডুবিয়ে দেওয়া হল। এতে ঐ নিম্নমুখী উল্লম্ব বাহুর মধ্যে একটি বড় বুদ্‌বুদ্‌ সৃষ্টি হল।

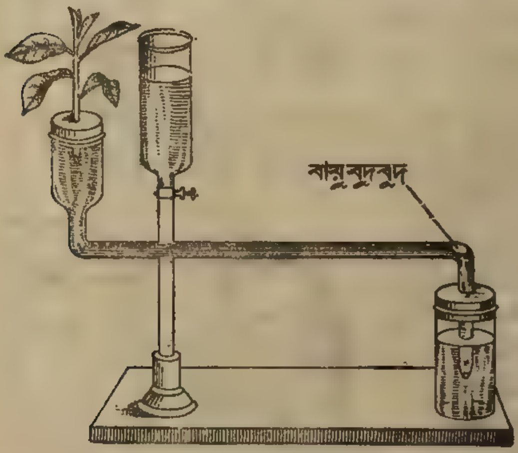

চিত্র 5.9 : বাষ্পমোচনের পরীক্ষা (গ্যানং-এর পোটোমিটারের সাহায্যে)।

পর্যবেক্ষণ (Observation) : কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে বুদ্‌বুদ্‌টি নিম্নমুখী উল্লম্ব বাহু ও অনুভূমিক বাহু বরাবর ঊর্ধ্বমুখী বাহুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত (Inference) : বাষ্পমোচনের ফলে উৎপন্ন শোষণ চাপের জন্য বুদ্‌বুদ্‌টি পাতা সমেত গাছটির দিকে এগিয়ে যায়।

[**গ্যানং-এর পোটোমিটারের বর্ণনা :** গ্যানং-এর পোটোমিটার মূলত বিপরীত দিকে দুবার সমকোণে বাঁকানো কাচের নল দিয়ে তৈরি একটি যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের দুটি বাহু উল্লম্ব এবং একটি বাহু অনুভূমিকভাবে থাকে। অনুভূমিক বাহুটি অংশাঙ্কিত (graduated)। ঊর্ধ্বমুখী উল্লম্ব বাহুটির মুখ একটু বড় এবং ছিদ্রযুক্ত একটি ছিপির সাহায্যে আটকানো যায়। ঊর্ধ্বমুখী উল্লম্ব বাহুর সমান্তরাল একটি জলাধার স্টপ-কক (Stop-cock)-এর মাধ্যমে অনুভূমিক বাহুর সঙ্গে যুক্ত। সমগ্র যন্ত্রটি একটি উল্লম্ব দণ্ডের সাহায্যে খাড়াভাবে কাঠের স্ট্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে।]

৩য় পরীক্ষা : নিজের তৈরি পোটোমিটার দিয়ে বাষ্পমোচনের পরীক্ষা (Experiment on Transpiration by self-made Potometer)

উপকরণ (Requirements) : লম্বা কাচের ফাঁপা নল, পাতা সমেত গাছের সতেজ ডাল, ছিপি, জল, বিকার, ভেসলিন, স্ট্যান্ড ও ক্ল্যাম্প, স্ক্যালপেল, বুনসেন বার্নার।

পরীক্ষা (Experiment) : প্রায় দেড় ফুট মাপের ফাঁপা কাচের নল দিয়ে বুনসেন বার্নার দিয়ে নলটির দু'মুখ বিপরীত দিকে সমকোণে বাঁকানো হল। এর পর পাতা সমেত ডালটিকে জলের মধ্যে রেখে কিছুটা অংশ কেটে ঐ দু'মুখ খোলা নলের একমুখে ছিপি দিয়ে আটকানো হল। নলটি সম্পূর্ণ জল ভর্তি করে সমস্ত সংযোগস্থলে ভালভাবে ভেসলিন লাগিয়ে বায়ুনিরুদ্ধ করা হল। এর পর ক্ল্যাম্পের সাহায্যে ব্যবস্থাপনাটিকে স্ট্যান্ডের সঙ্গে আটকানো হল। পোটোমিটারের অন্য প্রান্ত বিকারের জলে ডুবিয়ে রাখা হল। বিকারে রাখার ঠিক আগে খুব সন্তর্পণে আঙুল

দিয়ে চেপে নলটির মুক্ত প্রান্ত থেকে সামান্য জল বের করে একটি বুদ্‌বুদ্‌ অনুভূমিক নলের মধ্যে ঢুকিয়ে ব্যবস্থাপনাটিকে সূর্যালোকে রাখা হল।

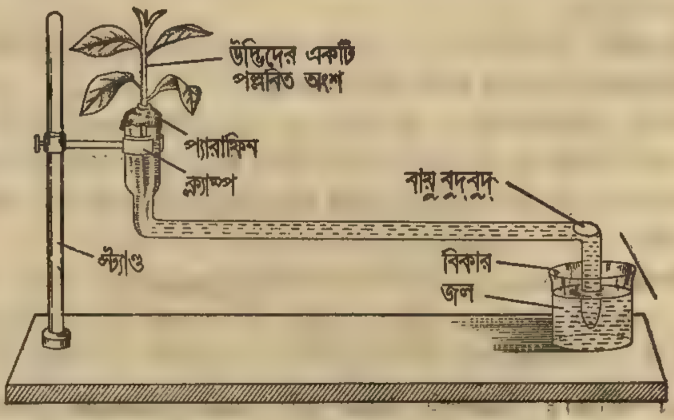

চিত্র 5.10 : বাষ্পমোচনের পরীক্ষা (নিজের তৈরি পোটোমিটারের সাহায্যে)।

পর্যবেক্ষণ (Observation) : কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে বুদ্‌বুদ্‌টি অনুভূমিক নল বরাবর পাতা সমেত ডালটির দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

সিদ্ধান্ত (Inference) : বাষ্পমোচনের ফলে জল বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাওয়ায় জলের স্তম্ভ (water column) বুদ্‌বুদ্‌ সহ পাতা সমেত ডালটির দিকে এগিয়ে গেছে।

৪র্থ পরীক্ষা : ওজন পদ্ধতির মাধ্যমে বাষ্পমোচনের পরীক্ষা (Experiment on Transpiration by weighing method)

উপকরণ (Requirements) : কচুগাছ, শাঙ্কব কুপী বা কনিক্যাল ফ্ল্যাস্ক, জল, তুলো, ছুরি, সরষের তেল, তুলাযন্ত্র ও বাটখারা।

পরীক্ষা (Experiment) : শাঙ্কব কুপীটির অর্ধেকের বেশী জল পূর্ণ করে জলের নিচে রেখে তির্যকভাবে কাটা কচুপাতার বৃন্তটিকে ফলকসহ কুপীর জলে তাড়াতাড়ি ডুবিয়ে দেওয়া হল। এখন কুপীটির জলে কিছুটা সরষের তেল এমনভাবে ঢালা হল যাতে জলের উপর তেলের একটা আস্তরণ গঠন করে। তুলো দিয়ে কচুপাতার বৃন্তটিকে কুপীর মুখে এমনভাবে আটকে দেওয়া হল যাতে বৃন্তের কাটা প্রান্ত কুপীর

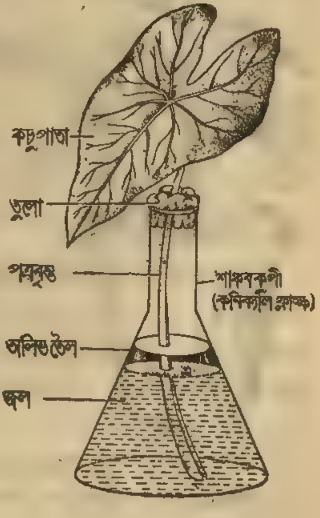

চিত্র 5.11 : বাষ্পমোচনের পরীক্ষা (ওজন পদ্ধতির মাধ্যমে)।

নিম্নতল স্পর্শ না করে। এবার তুলাযন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত ব্যবস্থাপনাটির ওজন নেওয়া হল। কয়েক ঘণ্টা ব্যবস্থাপনাটি সূর্যের আলোয় রেখে দেওয়ার পর আবার ওজন নেওয়া হল।

পর্যবেক্ষণ (Observation)ঃ দেখা গেল জল ও পাতাসহ ব্যবস্থাপনাটির দ্বিতীয় বারের ওজন প্রথম বারের ওজন থেকে কম।

গণনা (Calculation)ঃ ধরা যাক, ব্যবস্থাপনাটির প্রথম বারের ওজন W_1 গ্রাম বা 200 গ্রাম এবং দ্বিতীয় বারের ওজন W_2 গ্রাম বা 198 গ্রাম। তাহলে বাষ্পমোচনের ফলে নির্গত জলের পরিমাণ $W_1 - W_2$ গ্রাম বা 200 গ্রাম $-$ 198 গ্রাম $=2$ গ্রাম।

সিদ্ধান্ত (Inference)ঃ কুপীর জলের উপরের তলে তেলের আস্তরণ থাকায় কুপী থেকে জল বাষ্পীভূত হয়নি। সুতরাং কুপীর জলের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণ হল, পাতার মধ্য দিয়ে বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় জল বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাওয়া।

৫ম পরীক্ষাঃ বিষমপৃষ্ঠ পাতার দুটি তলের তুলনামূলক বাষ্পমোচনের পরীক্ষা (Experiment on relative transpiration of the two surfaces of dorsiventral leaf)

উপকরণ (Requirements)ঃ বিষমপৃষ্ঠ পাতাসহ একটি চারাগাছ, কোবাল্ট ক্লোরাইড কাগজ (নীল রঙের), দুটি কাচের স্লাইড, ভেসলিন এবং ক্লিপ।

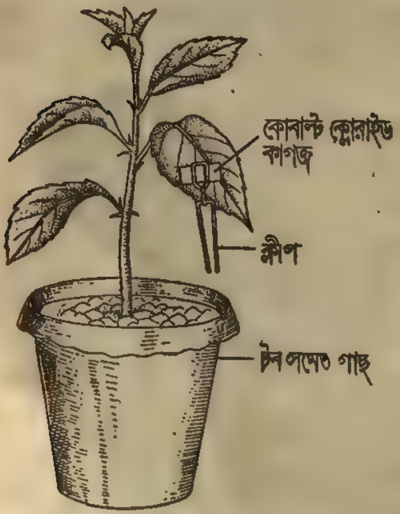

চিত্র 5.12 ঃ বিষমপৃষ্ঠ পাতার দুটি তলের তুলনামূলক বাষ্পমোচনের পরীক্ষা।

পরীক্ষা (Experiment)ঃ দুটি চৌকোনা কোবাল্ট ক্লোরাইড কাগজ চারাগাছটির একটি সুস্থ পাতার দু পাশে ভালভাবে কাচের স্লাইড দিয়ে ঢেকে দিয়ে ক্লিপের সাহায্যে স্লাইড দুটিকে পাতার সঙ্গে আটকে দেওয়া হল। এর পর তাড়াতাড়ি পাতা ও স্লাইডের সংযোগস্থলগুলিতে ভালভাবে ভেসলিন লাগানো হল, যাতে বাইরের জলীয় বাষ্প ক্লোরাইড কাগজের সংস্পর্শে না আসে। এর পর ব্যবস্থাপনাটিকে ঘণ্টাখানেক সূর্যালোকে রাখা হল।

পর্যবেক্ষণ (Observation)ঃ ঘণ্টাখানেক সূর্যালোকে রাখার পর ক্লিপ খুললে দেখা যাবে নিচের তলের ক্লোরাইড কাগজটি ফেকাসে লাল হয়েছে, কিন্তু উপরের তলের ক্লোরাইড কাগজটি আগের মতই নীল রয়েছে।

সিদ্ধান্ত (Inference)ঃ জলীয় বাষ্প বা জলের সংস্পর্শে কোবাল্ট ক্লোরাইড কাগজের রঙ ফেকাসে লাল হয়। স্লাইড ও পাতার সংযোগস্থল ভেস্‌লিন দিয়ে বায়ু নিরুদ্ধ করা হয়েছিল বলে বায়ুর জলীয় বাষ্প ক্লোরাইড কাগজের সংস্পর্শে আসতে পারেনি। বাষ্পমোচনের ফলে নির্গত জলীয় বাষ্পই কোবাল্ট কাগজের রঙ ফেকাসে লাল বর্ণে পরিণত করেছে। পাতার নিচের তলে পত্ররন্ধ্র বা স্টোমাটা থাকায় ঐ তল থেকে বাষ্পমোচন হয়েছে এবং ক্লোরাইড কাগজকে ফেকাসে লাল বর্ণে পরিণত করেছে। কিন্তু পাতার উপরের তলে পত্ররন্ধ্র না থাকায় ঐ তল দিয়ে বাষ্পমোচন হয়নি এবং ক্লোরাইড কাগজের রঙও বদলায় নি।

B. সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis)

5.8. সূচনা (Introduction)

জীবদেহের সমস্ত মৌলিক কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য শক্তির প্রয়োজন। খাদ্যের জারণের ফলে শ্বসনের মাধ্যমে খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তির মুক্তি ঘটে এবং জীবদেহের প্রয়োজনীয় শক্তির সরবরাহ বজায় থাকে। অর্থাৎ খাদ্যই জীবদেহের শক্তির উৎস। সবুজ ক্লোরোফিলযুক্ত জীব এক বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় খাদ্য সৃষ্টির মাধ্যমে সৌরশক্তিকে খাদ্যের মধ্যে স্থৈতিক শক্তিরূপে আবদ্ধ করে। এই বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে **সালোকসংশ্লেষ** (Photosynthesis) বলে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় যে খাদ্য (দ্রাক্ষা শর্করা বা glucose) উৎপন্ন হয় তা উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ায় অন্যান্য জটিল জৈব অণুতে পরিবর্তিত হয় ; প্রয়োজনে এইসব জটিল জৈব অণু বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে আবার দ্রাক্ষা শর্করায় পরিণত হয়।

[1898 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী **বার্নেস** (Barnes), ফোটোসিনথেসিস শব্দটির প্রচলন করেন। দুটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে ফোটোসিনথেসিস শব্দটির সৃষ্টি। যথা—**ফোটোস** (Photos) অর্থাৎ **আলো** এবং **সিন্থেসিস** (Synthesis) অর্থাৎ **সংশ্লেষ**।

অর্থাৎ, আলোর উপস্থিতিতে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈরি করাকেই সালোকসংশ্লেষ বলে। এই পদ্ধতিতে সবুজ উদ্ভিদেরা সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে।]

5.9. সংজ্ঞা (Definition)

যে বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল সবুজ উদ্ভিদের ক্লোরোফিলযুক্ত কোষে ক্লোরোফিল ও আলোকশক্তির সাহায্যে জৈব খাদ্যে পরিণত হয় এবং অক্সিজেন উপজাত পদার্থরূপে পরিবেশে মুক্ত হয়, তাকে সালোকসংশ্লেষ বা ফোটোসিনথেসিস বলে।

5.10. সালোকসংশ্লেষের উপাদান (Components of Photosynthesis)

কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) **এবং জল** (H_2O) (তাদের উৎস সহ), **ক্লোরোফিল** (Chlorophyll) **এবং সূর্যালোক** (Sunlight)।

কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon di-oxide—CO_2)ঃ স্থলজ উদ্ভিদে বায়ু

হতে CO_2 গ্যাস ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রধানত পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে পাতার ভিতরে প্রবেশ করে এবং ক্রমে মেসোফিল কলার আন্তঃকোষীয়স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। পত্ররন্ধ্র ছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে CO_2 গ্যাস বায়ু হতে লেণ্টিসেলের মধ্য দিয়ে, এমন কি কিউটিকলের মধ্য দিয়েও পাতার ভিতর ঢুকতে পারে। CO_2 গ্যাস কিউটিকলের মধ্য দিয়ে ঢোকার সময় প্রথমে কিউটিকুলীয় পদার্থে (**Cuticular substances**) দ্রবীভূত হয় এবং পরে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পাতার ভিতরে প্রবেশ করে। এইবার আন্তঃকোষীয়স্থানে জল এবং CO_2-এর রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি হয়। কার্বনিক অ্যাসিড প্রোটোপ্লাজমের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেইজন্য কার্বনিক অ্যাসিড আন্তঃকোষীয়স্থানে জমা না হয়ে বিয়োজিত হয়ে বাইকার্বনেটে পরিণত হয়। আন্তঃকোষীয়স্থান-সংলগ্ন ক্লোরোফিলযুক্ত কোষের কোষপ্রাচীর এই বাইকার্বনেটে সিক্ত হয়ে ওঠে। সিক্ত কোষপ্রাচীর থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পরিশেষে বাইকার্বনেট ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরে প্রবেশ করে। সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত CO_2-এর অধিকাংশই গাছ বায়ু থেকে সংগ্রহ করে। কিন্তু শ্বসন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বিপাকীয় কাজে যে CO_2 সৃষ্টি হয়, তাও সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত হতে পারে। সাধারণত দিনের বেলায় পত্ররন্ধ্রগুলি খোলা থাকে এবং সেই সময় পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে CO_2 গ্যাস পাতায় প্রবেশ করে। জলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত গাছের [ভ্যালিসনেরিয়া (*Vallisneria*), হাইড্রিলা (*Hydrilla*) ইত্যাদি] ক্ষেত্রে জলে দ্রবীভূত CO_2 সমস্ত দেহ দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দেহের ভিতর প্রবেশ করে।

বায়ুমণ্ডলে শতকরা 0·03-0·04 ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্তমান।

পাতার পত্রফলকের মধ্যস্থিত মেসোফিল কলার কোষে জলের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশে তৈরি করে কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3)। ফলে কোষ-মধ্যবর্তী স্থানের কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব কমে, পুনরায় ব্যাপন পদ্ধতিতে নতুন কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডল হতে পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে পাতার কোষ-মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছায়। সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে এই কার্বনিক অ্যাসিড আবার বিয়োজিত হয়ে জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিবর্তিত হয়। সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে ঐ কার্বন ডাই-অক্সাইড কাজে লাগানো হয়।

জল : সাধারণত উদ্ভিদ তার চারপাশের পরিবেশ থেকে মূলরোমের সাহায্যে যে জল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় শোষণ করে, সেই শোষিত জল নানা প্রক্রিয়ায় পরিশেষে জাইলেম বাহিকায় পৌঁছায়। অতঃপর ঐ জল জাইলেম বাহিকার ভিতর দিয়ে বাহিত হয়ে পাতার শিরা-উপশিরার মাধ্যমে পত্রফলকের মেসোফিল কলার আন্তঃকোষীয়স্থানসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। মেসোফিল কলার কোষের কোষপ্রাচীর আন্তঃকোষীয়স্থান থেকে ঐ জল শোষণ করে ভিজে ওঠে। পরে ভিজে কোষপ্রাচীর থেকে জল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রথমে কোষের ভিতরে এবং পরে এই প্রক্রিয়া দ্বারাই ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরে প্রবেশ করে।

সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত জলের বেশীর ভাগ গাছ তার চারপাশের পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে। তাছাড়া, শ্বসন ইত্যাদি বিপাকীয় কাজে উৎপন্ন যে জল কোষের

প্রোটোপ্লাজমে থেকে যায়, তাও সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত হতে পারে। শোষিত জলের সামান্য অংশই (1 শতাংশের কম) সালোকসংশ্লেষের কাজে লাগে।

সূর্যের আলোকশক্তি শোষিত হয়ে ক্লোরোফিল অণুগুলির দ্বারা রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়। সূর্যালোক ক্লোরোফিল অণুতে প্রবেশ করে ক্লোরোফিল অণুর ইলেকট্রনগুলিকে উত্তেজিত করে। উত্তেজিত ইলেকট্রনগুলি জলের সঙ্গে আন্তঃক্রিয়ার ফলে জলকে হাইড্রোজেন (H^+) ও হাইড্রক্সিল (OH^-) আয়নে বিয়োজিত করে। হাইড্রক্সিল আয়নই পরবর্তী কালে উৎপন্ন করে অক্সিজেন—যে অক্সিজেন গ্যাস সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। ক্লোরোফিলের মাধ্যমে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে জলের উপরিউক্ত আয়নীকরণকেই বলে **ফটোলিসিস** (Photolysis)।

$NADP^+$ (নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট) নামক সহ-উৎসেচক ঐ হাইড্রোজেনকে গ্রহণ করে বিজারিত $NADP^+$ (NADPH)-তে পরিণত হয়।

ক্লোরোফিল (Chlorophyll) ঃ 1818 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী **পেলেসিয়ার** (Palletier) উদ্ভিদকোষের সবুজ রঙের রঞ্জক পদার্থটির নাম দিয়েছিলেন **ক্লোরোফিল**। পাতার মেসোফিল কলার কোষসমূহ ক্লোরোপ্লাস্ট-সমৃদ্ধ। সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়াটি ক্লোরোপ্লাস্টে হয়। উদ্ভিদে প্রধানত দু রকমের রঞ্জক পদার্থ—সবুজ বর্ণের **ক্লোরোফিল** (Chlorophylls) এবং হরিদ্রাভ-লাল বর্ণের **ক্যারোটিনয়েড** (Carotenoids) থাকে। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে ও উদ্ভিজ্জ লবণের ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণকারী এইসব রঞ্জক পদার্থ থাকে। এক্ষেত্রে **ক্লোরোফিল**-a, **ক্লোরোফিল**-b-এর সঙ্গে থাকে। ক্লোরোফিল-a, ক্লোরোফিল-b অপেক্ষা অধিক পরিমাণে থাকে। তাছাড়া, ক্লোরোফিল ক্যারোটিনয়েড থেকে বেশী মাত্রায় থাকে, সেইজন্য ক্লোরোফিলের সবুজ রঙটিই আমাদের চোখে পড়ে। ক্যারোটিনয়েডগুলি আবার দু রকমের—কমলা রঙের **ক্যারোটিন** (Carotene) ও হলুদ রঙের **জ্যান্থোফিল** (Xanthophyll)।

তাছাড়া থাকে c, d এবং e—এই তিন প্রকারের ক্লোরোফিল।

উপরিউক্ত রঞ্জক পদার্থ ছাড়াও নীলাভ-সবুজ শৈবালে ফাইকোসায়ানিন (Phycocyanin) এবং লোহিত শৈবালে ফাইকোএরিথ্রিন (Phycoerythrin) নামক রঞ্জক পদার্থও থাকে, যেগুলি সালোকসংশ্লেষে অংশ গ্রহণ করে। সালোকসংশ্লেষের জন্য ঐরূপ কার্যকর রঞ্জক পদার্থরূপে ক্লোরোফিল-a-কে গণ্য করা হয়। অন্যান্য রঞ্জক পদার্থ সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে সরাসরি কার্যকর নয়। এরা শক্তি শোষণ করে ক্লোরোফিল-a-র কাছে পৌঁছায় এবং তারপর কার্যকর হয় বলে ঐ রঞ্জক পদার্থগুলিকে বলা হয় সহকারী রঞ্জক পদার্থ।

ক্লোরোফিল-a অণুর ও ক্লোরোফিল-b অণুর রাসায়নিক সঙ্কেত মৌল যথাক্রমে $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$ এবং $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$।

ক্লোরোফিলের পরমাণুগুলি চারটি পাইরল বলয় (Pyrrole ring)-এর সাহায্যে

বৃত্তাকারে বিন্যস্ত থাকে। কেন্দ্রে অবস্থান করে একটি মাত্র **Mg** পরমাণু। একটি ফাইটল (**Phytol**) জাতীয় অ্যালকোহল পাইরল বলয়ের সঙ্গে থাকে।

আলোক (**Light**)ঃ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য যে শক্তি প্রয়োজন আলোক সেই শক্তি যোগায়। উদ্ভিদের এই বিপাকীয় কাজটির জন্য শক্তি শুধুমাত্র

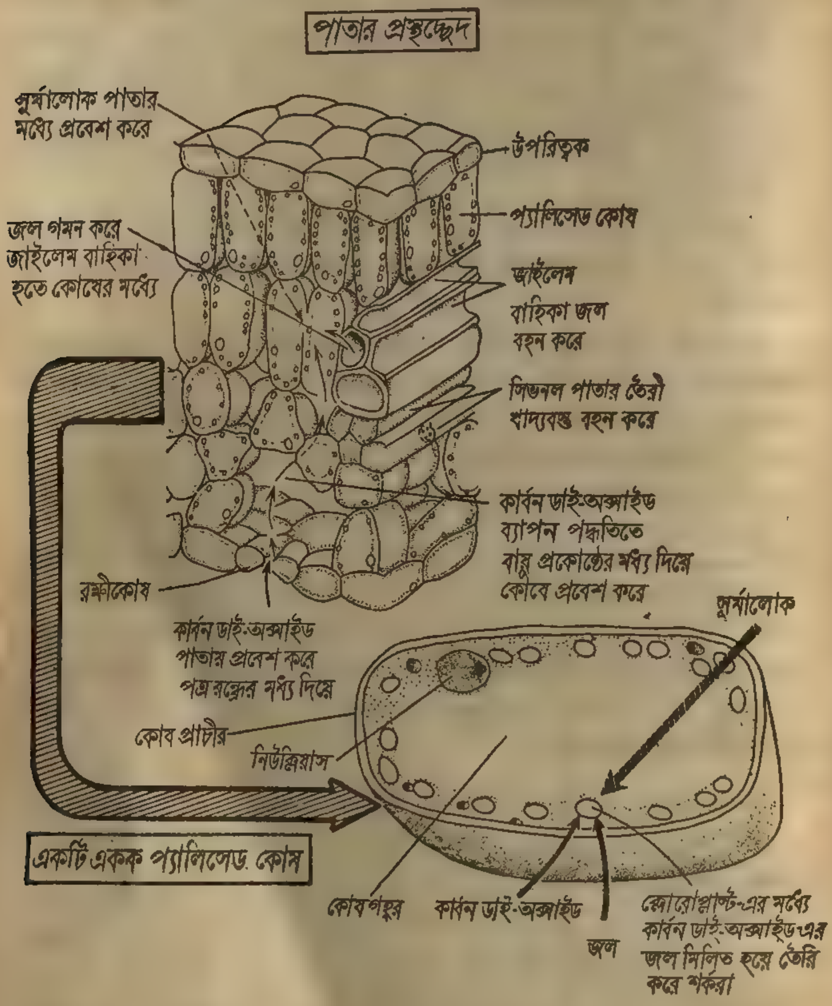

চিত্র 5.13 ঃ সালোকসংশ্লেষের সংঘটনস্থল।

বাইরের উৎস হতেই পাওয়া যায়। উদ্ভিদ সূর্যালোকের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ সমাপন করে। কিন্তু উপযুক্ত মাত্রার বিজলী-আলোকেও এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে পারে। বিজলী-আলোকের শক্তি সূর্যালোকের শক্তি অপেক্ষা কম। স্বাভাবিক

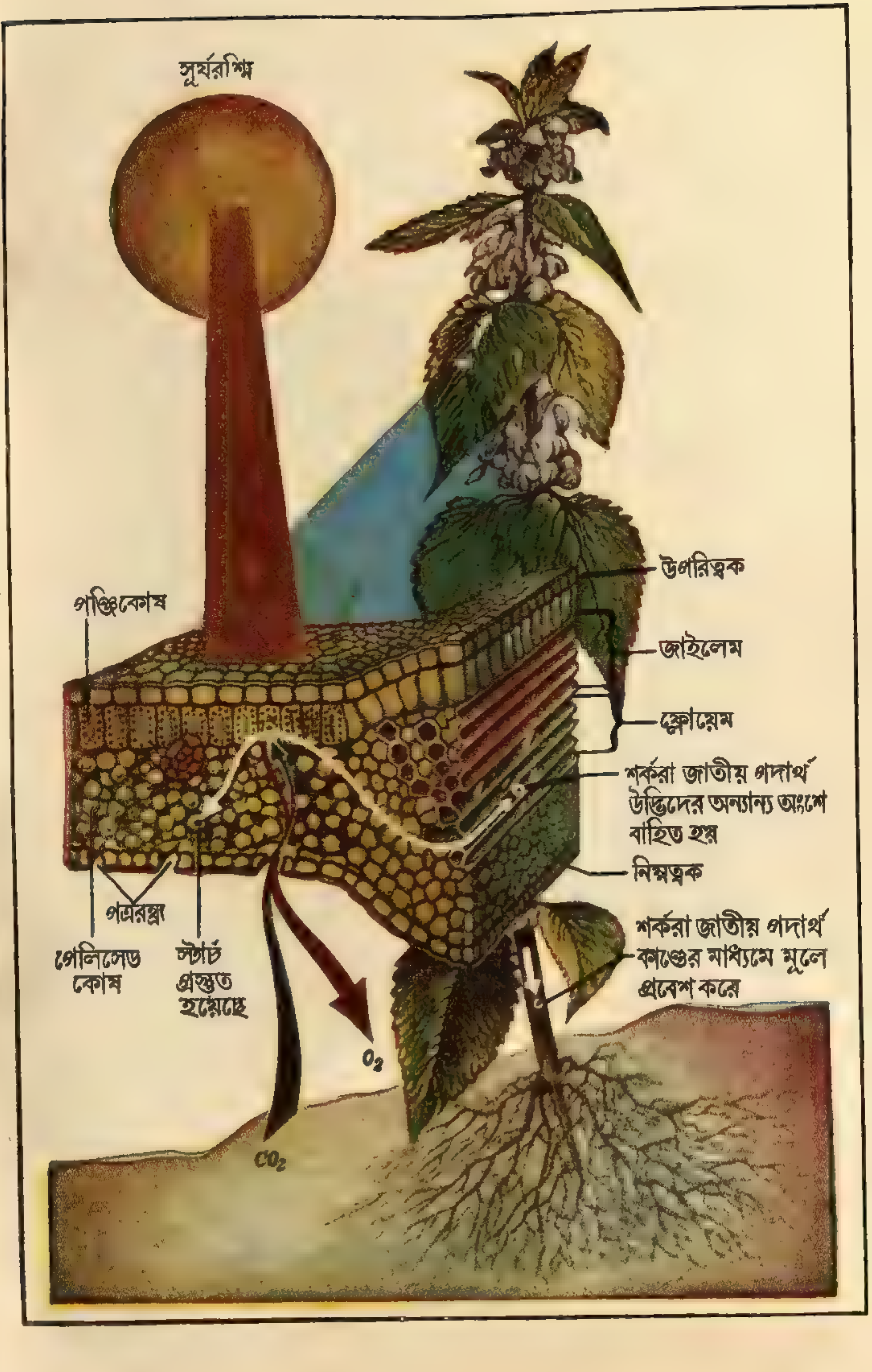
সূর্যরশ্মি
উপরিত্বক
পাণ্ডিকোষ
জাইলেম
ফ্লোয়েম
শর্করা জাতীয় পদার্থ
উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে
বাহিত হয়
নিম্নত্বক
পত্ররন্ধ্র
শর্করা জাতীয় পদার্থ
কাণ্ডের মাধ্যমে মূলে
প্রবেশ করে
পেলিসেড
কোষ
স্টার্চ
প্রস্তুত
হয়েছে
O_2
CO_2

কারণেই রাত্রে সালোকসংশ্লেষ হয় না। পত্ররন্ধ্রও দিনের বেলায় খোলা এবং রাত্রে বন্ধ থাকে। রঞ্জক পদার্থগুলি দৃশ্যমান সাদা আলোকের (Visible white light) সাতটি রঙের মধ্যে নীল, বেগুনী এবং লাল রঙ শোষণ করে। আলোক-বর্ণালীর লাল (610-700 nm) ও নীল (400-500 nm) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অঞ্চলেই সালোক-সংশ্লেষ বেশী হয়। সবকয়টি রঞ্জক পদার্থই আলোক শোষণ করে। কিন্তু শুধুমাত্র ক্লোরোফিল-a প্রত্যক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষের সঙ্গে জড়িত। তাই একে **মুখ্য রঞ্জক পদার্থ** (Primary pigment) বলে।

সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ শক্তির প্রধান উৎস হল সৌরশক্তির আলো। সে আলোর শতকরা 5 ভাগ পাতার মধ্য দিয়ে বাইরে চলে যায়, শতকরা 13 ভাগ প্রতিফলিত হয় এবং বাকি শতকরা 82 ভাগ পাতার দ্বারা শোষিত হয়। 82 ভাগের মধ্যে আবার শুধুমাত্র 4 ভাগ আলো শোষিত হয় ক্লোরোফিল দ্বারা। সূর্যালোকের রশ্মি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণিকা দ্বারা গঠিত, ঐ অদৃশ্য উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণিকাগুলিকে বলে **ফোটন** (photon) বা **কোয়ান্টা** (quanta)।

5.11. সালোকসংশ্লেষ কোথায় হয়? (Where does Photosynthesis take place ?)

সকল ক্লোরোফিলধারী জীব, প্রধানত সবুজ উদ্ভিদ. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করতে পারে। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ যথা, শৈবাল প্রভৃতির সকল দেহকোষে সালোকসংশ্লেষ হয়ে থাকে। উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদের সমস্ত সবুজ অঙ্গে প্রধানত পাতার মেসোফিল কলায় সালোকসংশ্লেষ হয়। মেসোফিল কলার ক্লোরোফিলযুক্ত প্যারেনকাইমা কলা (ক্লোরেনকাইমা) আলোকশক্তি শোষণ করে বলে এই অংশে সালোকসংশ্লেষ হয়ে থাকে।

ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানায় ক্লোরোফিল-সহ অন্যান্য পিগমেন্টের অণুগুলি একস্তরে সজ্জিত থাকে। সালোকসংশ্লেষের প্রথম দশায় সৌরশক্তিকে খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ করতে কয়েক শ' (250—300) ক্লোরোফিল অণু একত্রে একক হিসেবে কাজ করে, এদের **সালোকসংশ্লেষকারী একক** বলে। এই এককগুলি গ্রানায় কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানার মত **কোয়ান্টাসোম** রূপে থাকে। কোয়ান্টাসোমের মধ্যেই থাকে ক্লোরোফিল ও সালোকসংশ্লেষকারী উৎসেচক (চিত্র/2.36, দ্বিতীয় অধ্যায়)। তাই এরা সালোকসংশ্লেষকারী একক রূপে গণ্য হয়। সালোকসংশ্লেষের দ্বিতীয় দশার বিক্রিয়াগুলি ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমা অংশে ঘটে (চিত্র 2.34, দ্বিতীয় অধ্যায়)।

5.12. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া (Mechanism of Photosynthesis)

সালোকসংশ্লেষ একটি অত্যন্ত জটিল জৈবনিক প্রক্রিয়া। এটি পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন অস্থায়ী অন্তর্বর্তী পদার্থ সৃষ্টির মাধ্যমে শেষ পর্যায়ে দ্রাক্ষা শর্করা (glucose) সৃষ্টি করে। এই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি প্রকৃতপক্ষে একটি জারণ-বিজারণ ক্রিয়া, কারণ এই প্রক্রিয়ায় জল জারিত হয়ে অক্সিজেন মুক্ত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারিত হয়ে শর্করা তৈরি করে।

সমগ্র সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটির রাসায়নিক সমীকরণ নিম্নরূপ ঃ

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{আলোক}]{\text{ক্লোরোপ্লাস্ট}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2 \uparrow$$

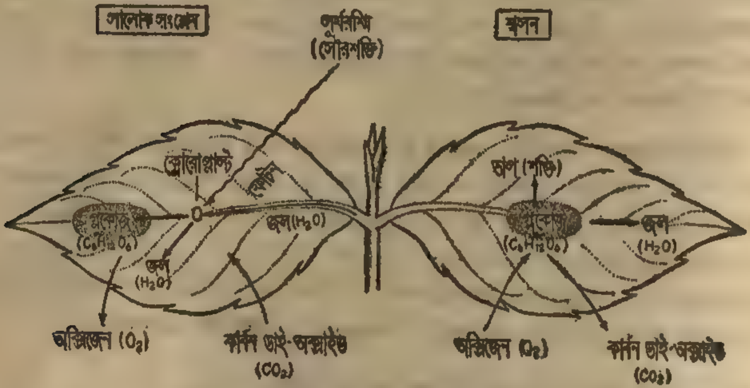

চিত্র 5.14 ঃ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার চিত্ররূপ।

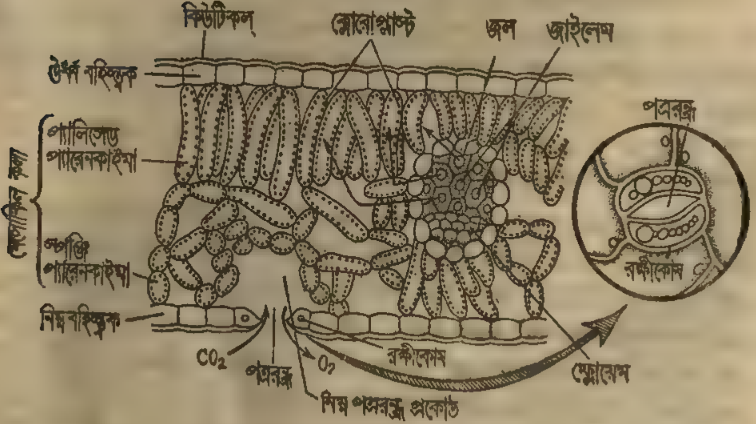

চিত্র 5.15 ঃ পাতার প্রস্থচ্ছেদ ও পাশে পত্ররন্ধ্রের গঠন দেখানো হয়েছে।

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি প্রধানত নিম্নলিখিত দুটি দশায় সম্পন্ন হয় ঃ

(I) **আলোক দশা** বা **বিক্রিয়া** (**Light phase or reaction**)

(II) **অন্ধকার দশা** বা **বিক্রিয়া** (**Dark phase or reaction**)

উপরিউক্ত দুটি দশায় যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তা প্রথম ধারণা করেন বিজ্ঞানী **ব্ল্যাকম্যান** (**Blackman**) **1905** খ্রীষ্টাব্দে।

(I) আলোক দশা (**Light phase**) ঃ সালোকসংশ্লেষের আলোক-নির্ভর যে দশা ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানায় সম্পন্ন হয়, তাকে **আলোক দশা** বলে। এই দশায়

জল, ক্লোরোফিল ও আলোক প্রয়োজন হয় এবং **ATP, $NADPH_2$, H_2O ও O_2** উৎপন্ন হয়। এই দশার প্রধান ঘটনাগুলি নিম্নরূপ :

(i) **ক্লোরোফিলের সক্রিয়তা** (Activation of chlorophyll) : আলোক দশার প্রথমেই ক্লোরোফিল আলোকের ফোটন কণা শোষণ করে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন উত্তেজিত ক্লোরোফিলে পরিণত হয়।

যে সমস্ত রঞ্জক পদার্থ সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে কার্যকর, তারা সৃষ্টি করে দুটি **রঞ্জক তন্ত্র** (Pigment System)। অনেকগুলি ক্লোরোফিল-a অণুর দ্বারা **প্রথম রঞ্জক তন্ত্র** (**Pigment System I** বা **PS I**) গঠিত, যা 700 nm আলোক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দ্বারা সক্রিয় হয়। সংখ্যায় কম ভিন্ন প্রকৃতির ক্লোরোফিল-a, ক্লোরোফিল-b, ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল ইত্যাদি সহকারী রঞ্জক পদার্থ নিয়ে **দ্বিতীয় রঞ্জক তন্ত্র** (**Pigment System II** বা **PS II**) গঠিত। 680 nm আলোক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দ্বারা দ্বিতীয় রঞ্জক তন্ত্র সক্রিয় হয়। বিজারিত **NADPH** সৃষ্টি করাই প্রথম রঞ্জক তন্ত্রের এবং জলকে বিশ্লেষিত করে অক্সিজেন বের করাই দ্বিতীয় রঞ্জক তন্ত্রের কাজ।

(ii) **জলের ফটোলিসিস** (Photolysis of water) : উত্তেজিত ক্লোরোফিলের সংস্পর্শে এসে জল (H_2O) বিশ্লেষিত হয়ে H^+ ও OH^- আয়নে পরিণত হয়।

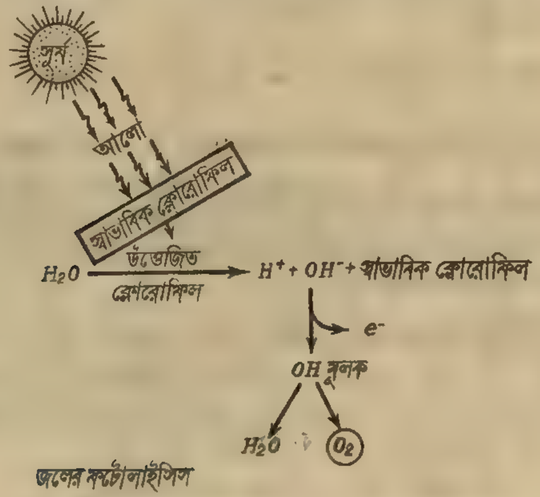

চিত্র 5.16 : জলের ফটোলিসিসের চিত্র।

OH^- আয়ন হতে ইলেকট্রন নির্গত হয়ে উত্তেজিত ক্লোরোফিলকে পুনরায় স্বাভাবিক ক্লোরোফিলে পরিণত করে। OH^- আয়ন হতে ইলেকট্রন নির্গত হবার ফলে তা OH মূলক (radical)-এ পরিণত হয়ে পরিশেষে জল ও অক্সিজেন অণু গঠন করে। আলোকশক্তির সাহায্যে জলের এভাবে বিশ্লিষ্ট হওয়াকে জলের **ফটোলিসিস** বা **আলোক-বিশ্লেষণ** বলে।

সমীকরণটি নিম্নরূপ :

উত্তেজিত ক্লোরোফিল + $H_2O \longrightarrow H^+ + OH^-$ + স্বাভাবিক ক্লোরোফিল।

(iii) **উপজাত পদার্থ হিসেবে O_2-র উৎপত্তি ও পরিবেশে মুক্ত হওয়া (Production and evolution of O_2 as byproduct) :** জলের ফটোলিসিসের

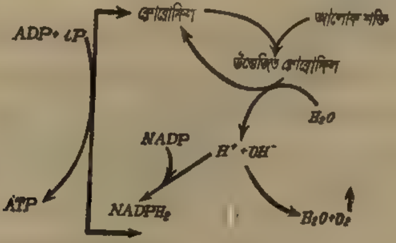

চিত্র 5.17 : আলোক দশার শব্দচিত্র।

(Word Diagram of Light Phase)

ফলে উৎপন্ন OH^- আয়ন পরপর বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে O_2 এবং H_2O গঠন করে এবং এই O_2 পরিবেশে মুক্ত হয়।

$$4[OH^-] \xrightarrow{\uparrow 4e^-} 4[OH] \longrightarrow 2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2\uparrow$$

(iv) **বিজারণ ক্ষমতা প্রস্তুতি (Production of Reduction Power) :** আলোক দশায় উৎপন্ন ATP (অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট) এবং $NADPH_2$ (বিজারিত নিকোটিন্যামাইড অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট) অন্ধকার দশায় CO_2-কে বিজারিত করে কার্বোহাইড্রেটে পরিণত করে। এইজন্য $NADPH_2$ এবং ATP-কে একত্রে **বিজারণ ক্ষমতা** বলে।

(a) **$NADPH_2$ বা বিজারক প্রস্তুতি :** আলোক দশায় প্রকৃতপক্ষে উত্তেজিত ক্লোরোফিল (P-700 nm) থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকট্রন (e^-) নির্গত হয়, এই ইলেকট্রন বিভিন্ন বাহক দ্বারা বাহিত হয়ে শেষে জল বিশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন H^+-এর সহায়তায় NADP-কে বিজারিত করে $NADPH_2$ গঠন করে।

$$NADP + 2e^- + 2H^+ \rightarrow NADPH_2$$

(b) **ATP বা শক্তির উৎস প্রস্তুতি :** আলোক দশায় ক্লোরোফিল থেকে নির্গত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকট্রন বিভিন্ন বাহক দ্বারা বাহিত হওয়ার সময় অতিরিক্ত শক্তি ত্যাগ করে। এই শক্তির সাহায্যে ADP এবং অজৈব ফসফেট (iP) পরস্পর বিক্রিয়া করে ATP প্রস্তুত করে (চিত্র 5.20)। আলোক দশায় আলোকশক্তির সাহায্যে এইভাবে ATP উৎপন্ন হওয়াকে **ফটোফসফোরাইলেশন** (Photophosphorylation) বলে।

অন্তরিত (isolated) ক্লোরোপ্লাস্টে আলোকের প্রভাবে **ADP** ও অজৈব ফসফেটের (iP) উপস্থিতিতে **ATP** অণুর সৃষ্টি লক্ষ্য করেন বিজ্ঞানী **আরনন** (Arnon) ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ (1957)। এটি দু প্রকার—(i) **নন্-সাইক্লিক** বা **অচক্রাকার** (Non-cyclic) এবং (ii) **সাইক্লিক** বা **চক্রাকার** (Cyclic)।

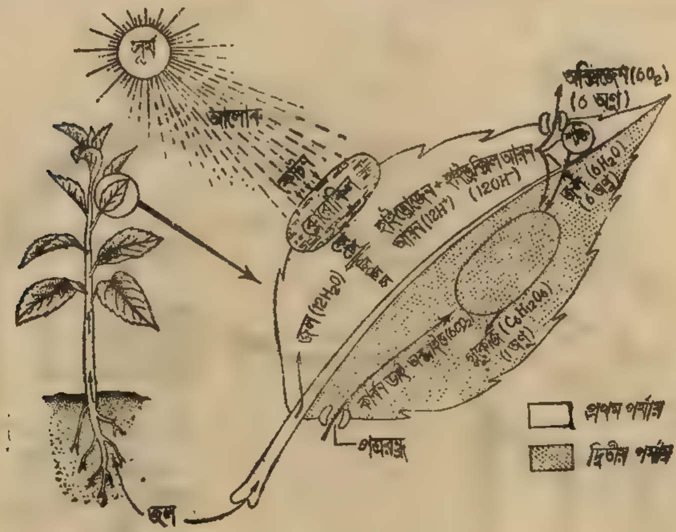

চিত্র 5.18 : আলোক দশা ও অন্ধকার দশার পারস্পরিক সম্পর্ক।

(i) নন্-সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন (Non-cyclic photophosphorylation) : এক্ষেত্রে ক্লোরোফিল (ফটোসিস্টেম-II, P-680) থেকে নির্গত ইলেকট্রন অজানা বাহক—Y, B, প্লাসটোকুইনন, সাইটোক্রোম-b-6, প্লাসটোসায়ানিন ও সাইটোক্রোম-f দ্বারা বাহিত হয়ে ফটোসিস্টেম-I (P-700 nm)-এর ক্লোরোফিলে যুক্ত হয়। ইলেকট্রনের এইরূপ একমুখী ভ্রমণের সময় নির্গত শক্তি ব্যবহৃত হয়ে **ATP** উৎপন্ন করে।

PS II-এর ক্লোরোফিল-b হতে নির্গত ইলেকট্রন PS I-এর ক্লোরোফিল-a-তে প্রবেশ করে তাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। উত্তেজিত ক্লোরোফিল-b অণু ও জল অণুর মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে জল বিশ্লিষ্ট হয়ে H^+ ও OH^- আয়নে পরিণত হয়। H^+ আয়ন PS I-এর ক্লোরোফিল-a হতে বিচ্ছুরিত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন (e^-)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে NADPH গঠন করে। OH^- আয়ন (হাইড্রক্সিল আয়ন) হতে e^- বের হয়ে জারিত ক্লোরোফিল-b-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। OH^- আয়ন তার ফলে OH মূলকে পরিণত হয়। ঐ OH মূলক পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে জল (H_2O) ও অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন করে।

উৎপন্ন ATP অন্ধকার দশায় শক্তির উৎস হিসেবে এবং উৎপন্ন $NADPH_2$ হাইড্রোজেন দাতা (বিজারক) হিসেবে কাজ করে।

এভাবে সবুজ ক্লোরোফিলযুক্ত উদ্ভিদে সূর্যের আলো থেকে গৃহীত সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

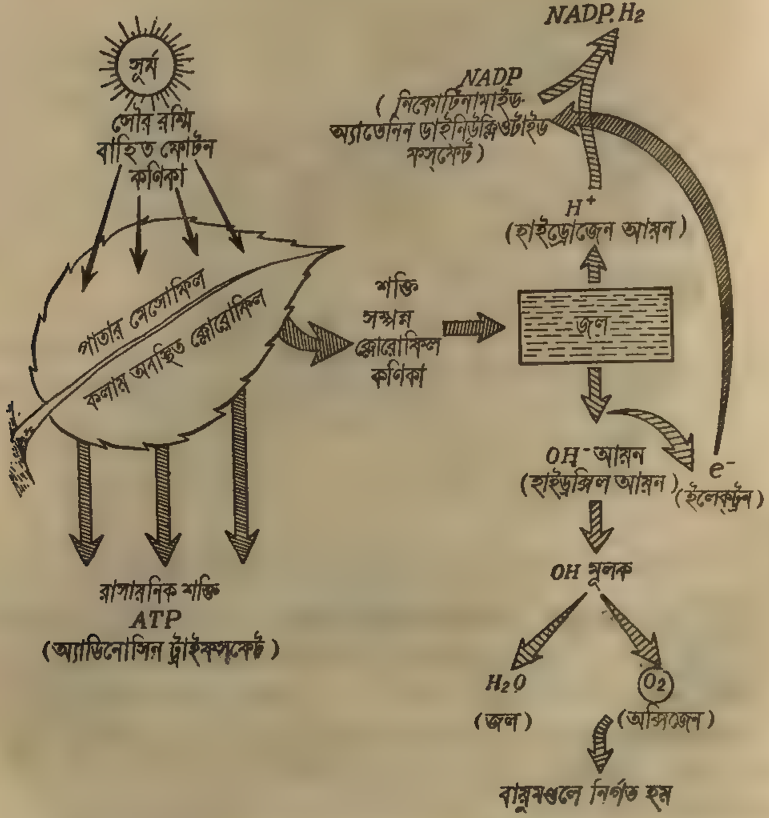

চিত্র 5.19 : সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তির স্থিতিকরণ ও ব্যবহার।

(ii) **সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন** (Cyclic photophosphorylation) : ক্লোরোফিল (ফটোসিস্টেম I, P-700) থেকে নির্গত ইলেকট্রন অজ্ঞাত বাহক X, ফেরেডক্সিন, সাইটোক্রোম-b 563, সাইটোক্রোম-f দ্বারা বাহিত হয়ে চক্রাকারে পুনরায় ক্লোরোফিলে ফিরে আসে। ফলে, আবার মূল ক্লোরোফিল অণু গঠিত হয়। এই সময় ইলেকট্রন থেকে নির্গত শক্তি দ্বারা ফটোফসফোরাইলেশন সম্পন্ন হয়। এইরূপ ফসফোরাইলেশনের সময় উৎপন্ন হয় উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ATP অণু।

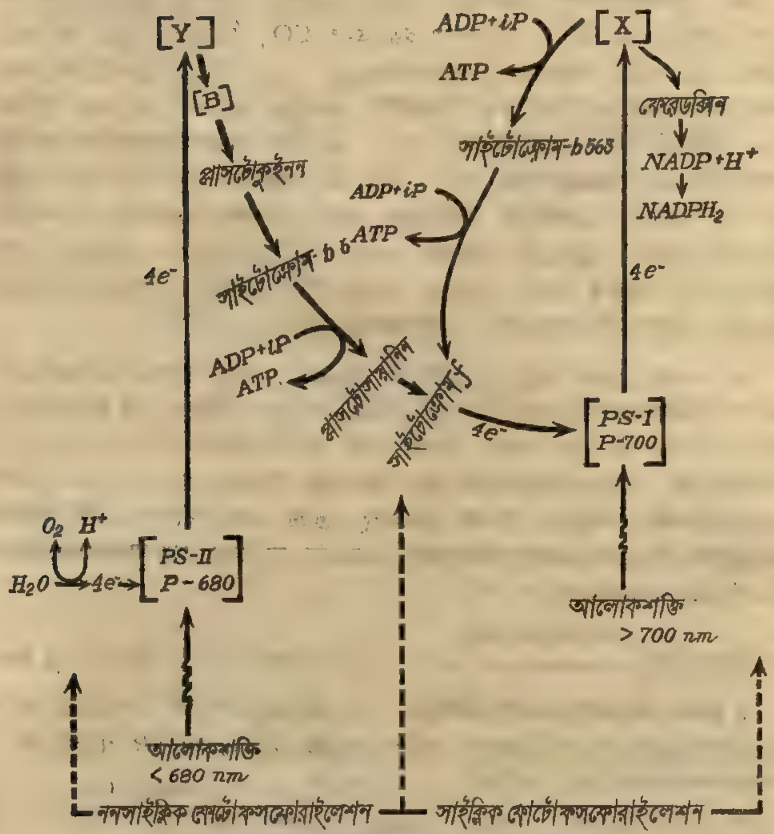

চিত্র 5.20 ঃ নন্-সাইক্লিক ও সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন।

● **ফসফোরাইলেশন কি ?** জীবকোষের মধ্যে ADP এবং অজৈব ফসফেটের (iP) সংযুক্তিতে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ফসফেট যৌগ বা ATP প্রস্তুত হওয়ার ঘটনাকে **ফসফোরাইলেশন** বলে।

● **ফটোসিন্থেটিক ফসফোরাইলেশন ঃ** সালোকসংশ্লেষের সময় আলোকশক্তির প্রভাবে ক্লোরোফিল থেকে ইলেকট্রন বিচ্যুত হয়। উক্ত ইলেকট্রন বিভিন্ন বাহক দ্বারা পরিবাহিত হওয়ার সময় তাদের থেকে নির্গত শক্তির দ্বারা যে ফসফোরাইলেশন ঘটে, তাকে **ফটোসিন্থেটিক ফসফোরাইলেশন** বলে।

● **অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন ঃ** শ্বসনের সময় ইলেকট্রন প্রবাহ (electron transport) কালে ইলেকট্রন থেকে নির্গত শক্তির সাহায্যে যে ফসফোরাইলেশন ঘটে, তাকে **অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন** বলে।

(II) **অন্ধকার দশা** (Dark phase) : সালোকসংশ্লেষের আলোক-নিরপেক্ষ যে দশা ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় সম্পন্ন হয় এবং CO_2 বিজারিত হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়, তাকে **অন্ধকার দশা** বলে। এই দশায় CO_2 এবং আলোক দশায় উৎপন্ন রাসায়নিক শক্তি ATP ও $NADPH_2$ প্রয়োজন হয় এবং গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী **ব্ল্যাকম্যান** (Blackman) সর্বপ্রথম পর্যায়ক্রমে আলো এবং অন্ধকার (Intermittent light) ব্যবহার করে এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছিলেন বলে এই দশাকে **ব্ল্যাকম্যানের বিক্রিয়া**-ও বলে। **বেনসন** (Benson) ও **কেলভিন** (Calvin) 1956 খ্রীষ্টাব্দে তেজস্ক্রিয় কার্বন (C^{14}) সহযোগে গঠিত $C^{14}O_2$ ব্যবহার করে অন্ধকার দশার চক্রাকার বিক্রিয়াগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন বলে, এই দশার চক্রাকার বিক্রিয়াগুলিকে **কেলভিন চক্র** বলে।

এই দশার প্রথমে স্ট্রোমায় উপস্থিত RuDP (রাইবিউলোজ ডাই-ফসফেট) কার্বক্সিডিসমিউটেজ উৎসেচকের সাহায্যে CO_2-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে 6-কার্বনযুক্ত অস্থায়ী অন্তর্বর্তী জৈব যোগ উৎপন্ন করে, যা তৎক্ষণাৎ বিশ্লিষ্ট হয়ে দুটি 3-কার্বনযুক্ত যোগ ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডে (PGA) পরিণত হয়। এটিই সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে উৎপন্ন কার্বনযুক্ত প্রথম জৈব পদার্থ। এই বিক্রিয়ায় পরিবেশের CO_2 কোষ-মধ্যস্থ জৈব যোগে অঙ্গীভূত হয় বলে, একে **অঙ্গার আত্তীকরণ** (Carbon assimilation)-ও বলে।

$$RuDP + CO_2 \xrightarrow{\text{কার্বক্সিডিসমিউটেজ}} [\text{ 6-কার্বন অস্থায়ী যৌথ }] \rightarrow PGA \text{ (দুই অণু)}$$

3-PGA, ফসফোগ্লিসারিক কাইনেজ এবং ট্রায়োজ ফসফেট ডি-হাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের সাহায্যে দুটি ধাপে ATP এবং $NADPH_2$-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে ও ফসফোগ্লিসার্যাল্ডিহাইডে (PGAld) পরিণত হয়।

$$PGA + NADPH_2 + ATP \xrightarrow[\text{কাইনেজ}]{\text{ফসফোগ্লিসারিক}} \xrightarrow[\text{ডি-হাইড্রোজেনেজ}]{\text{ট্রায়োজ ফসফেট}} PGAld + NADP + ADP + iP$$

3-PGAld বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজে পরিণত হয়। পরে প্রতি অণু গ্লুকোজ এক অণু জল ত্যাগ করে এক অণু শ্বেতসার (Starch)-এ পরিণত হয়।

3 PGAld অন্যান্য কয়েকটি চক্রাকার বিক্রিয়ার মাধ্যমে রাইবিউলোজ 5-ফসফেট (RuMP) গঠন করে।

RuMP ফসফোপেণ্টোকাইনেজ উৎসেচকের সাহায্যে পুনরায় RuDP গঠন করে। যে চক্রাকার প্রক্রিয়ায় PGAld থেকে RuDP সংশ্লেষিত হয়, তাকে **কেলভিন চক্র** (Calvin cycle) বলে। এই চক্রে পরিবেশের কার্বন ডাই-অক্সাইডের সংবন্ধন ও বিজারণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক বিক্রিয়া ঘটে।

$$RuMP + ATP \xrightarrow{\text{ফসফোপেণ্টোকাইনেজ}} RuDP + ADP$$

সমগ্র চক্রাকার প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

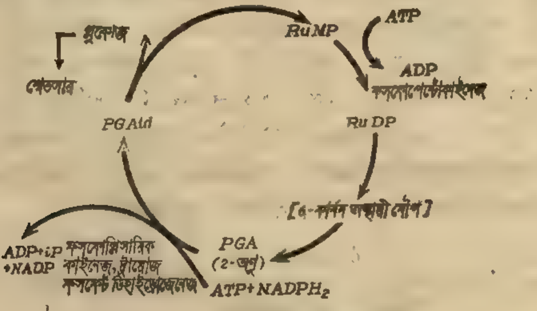

চিত্র 5.21 ঃ অন্ধকার দশার বিভিন্ন ধাপ।

5.13. হিল বিক্রিয়া (Hill reaction)

রবিন হিল (**Robin Hill**) 1937 খ্রীষ্টাব্দে কোষ থেকে সংগৃহীত 'ক্লোরোপ্লাস্ট', হাইড্রোজেন গ্রাহক 'পটাসিয়াম ফেরিক অক্সালেট' (A) এবং 'জলের' মিশ্রণে আলোক প্রয়োগ করে দেখান যে, উক্ত হাইড্রোজেন গ্রাহক বিজারিত হয়ে পটাসিয়াম ফেরাস অক্সালেটে পরিণত হয় এবং O_2 নির্গত হয়।

বিক্রিয়ার সমীকরণ ঃ

$$H_2O + A \xrightarrow[\text{ক্লোরোপ্লাস্ট}]{\text{আলোক}} AH_2 + O_2 \uparrow$$

উপরিউক্ত বিক্রিয়াকে **হিল বিক্রিয়া** (Hill reaction) এবং হাইড্রোজেন গ্রাহক (A)-কে **হিল বিকারক** (Hill reagent) বলে।

পরবর্তী কালে 1952 খ্রীষ্টাব্দে **আরনন ও এমারসন** (Arnon & Emerson) প্রমাণ করেন যে, সবুজ উদ্ভিদের কোষে হাইড্রোজেন গ্রাহক NADP। হিল বিক্রিয়া থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, সালোকসংশ্লেষে উদ্ভূত O_2-এর উৎস H_2O।

1941 খ্রীষ্টাব্দে **স্যামুয়েল রুবেন ও মার্টিন কামেন** (Samuel Ruben & Martin Kamen) তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন (O_2^{18}) সহযোগে গঠিত জলের (H_2O^{18}) সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেন জল থেকে আসে।

● **সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বনযুক্ত প্রথম জৈব যৌগ কোন্‌টি ?**
—ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (PGA)।

● **সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস কি ?**—জল।

5.14. ব্যাকটিরিয়ার সালোকসংশ্লেষ (Bacterial Photosynthesis)

কিছু কিছু পিগমেন্টযুক্ত ব্যাকটিরিয়া এক বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবেশের CO সহযোগে নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে। এই সমস্ত ব্যাকটিরিয়া, যথা—

ক্লোরোবিয়াম (*Chlorobium*), ক্রোমাটিয়াম (*Chromatium*) প্রভৃতি ব্যাকটিরিও-ক্লোরোফিল, ব্যাকটিরিওভিরিডিন, ক্লোরোবিয়াম ক্লোরোফিল প্রভৃতি পিগমেন্টের সাহায্যে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পরিবেশের CO_2 এবং H_2S সহযোগে শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্লুকোজ তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় H_2O ব্যবহৃত না হয়ে H_2S থেকে H_2 মুক্ত হয়ে CO_2-কে বিজারিত করে এবং সালফার (S) অধঃক্ষিপ্ত হয়। তাছাড়া, H_2O ব্যবহৃত হয় না বলে কোন অক্সিজেন (O_2) নির্গত হয় না। সালফার অধঃক্ষিপ্ত হয় বলে এই ব্যাকটিরিয়াদের **সালফার ব্যাকটিরিয়া** বলে। ব্যাকটিরিয়া কর্তৃক খাদ্য তৈরির সময় শক্তি নির্গত হয় অর্থাৎ প্রক্রিয়াটি তাপমোচী।

$$6CO_2 + 12H_2S \xrightarrow[\text{ব্যাকটিরিওক্লোরোফিল অথবা ব্যাকটিরিওভিরিডিন}]{\text{সৌরশক্তি}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 12S + \text{শক্তি}$$

বিভিন্ন বর্ণহীন ব্যাকটিরিয়া আলোর অনুপস্থিতিতেই বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ জারিত করে CO_2 সহযোগে জৈব খাদ্যবস্তু তৈরি করে। রাসায়নিক পদার্থসমূহের জারণের সময় শক্তি নির্গত হয়, যা খাদ্যবস্তু তৈরির সময় ব্যবহৃত হয়। এই প্রক্রিয়াকে **রাসায়নিক সংশ্লেষ** (Chemosynthesis) বলে। যেমন—**লৌহ ব্যাকটিরিয়া** (Iron bacteria) ফেরাস লবণকে ফেরিক লবণে জারিত করে, **হাইড্রোজেন ব্যাকটিরিয়া** (Hydrogen bacteria) হাইড্রোজেনকে জলে জারিত করে।

5.15. সালোকসংশ্লেষের প্রয়োজনীয় শর্ত
(Conditions necessary for Photosynthesis)

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে কয়েকটি শর্ত বাহ্য এবং অন্যগুলি অভ্যন্তরীণ।

(i) **বাহ্যশর্ত (External Conditions) :**

(a) **আলোক (Light) :** সালোকসংশ্লেষের সময় আলোকের ফোটন কণা জলকে H^+ এবং OH^- আয়নে বিশ্লেষিত করে। তাছাড়া, এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন খাদ্যে (গ্লুকোজে) যে শক্তি সঞ্চিত হয়, তা আলোক থেকে সংগৃহীত হয়। অন্যান্য শর্ত অনুকূল থাকলে, আলোর তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সালোকসংশ্লেষের হারও বৃদ্ধি পায়। অবশ্য প্রখর সূর্যালোকে ক্লোরোফিল বিশ্লিষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার ক্ষীণ আলোক বা অন্ধকারে গ্লুকোজ, শ্বেতসারে পরিবর্তিত হতে পারে না। ফলে ঐ সময় সালোকসংশ্লেষের হারও মন্দীভূত হয়।

(b) **কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon di-oxide) :** কার্বন ডাই-অক্সাইড সালোকসংশ্লেষের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত তথা উপাদান। সালোকসংশ্লেষের দ্বিতীয় দশায় অর্থাৎ অন্ধকার দশায় পরিবেশের CO_2, RuDP-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে PGA সৃষ্টি করে। বায়ুতে সাধারণত 0·03% CO_2 থাকে। পরিবেশে CO_2-এর পরিমাণ খুব বেশী হলে সালোকসংশ্লেষ বন্ধ হয়ে যায় এবং উদ্ভিদদেহে বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

(c) **উষ্ণতা** (Temperature) : উষ্ণতা সালোকসংশ্লেষের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। 0°C—45°C পর্যন্ত সব উষ্ণতায় কমবেশী সালোকসংশ্লেষ হয়ে থাকে, তবে 25°C—35°C উষ্ণতাই সালোকসংশ্লেষের পক্ষে উপযোগী। অন্যান্য শর্ত অনুকূল থাকলে উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সালোকসংশ্লেষের হারও বৃদ্ধি পায়।

(d) **জল** (Water) : সালোকসংশ্লেষের জন্য H_2O অপরিহার্য। আলোক দশায় H_2O ফটোলিসিস প্রক্রিয়ায় H^+ এবং OH^- আয়নে বিশ্লিষ্ট হয়। এই হাইড্রোজেন আয়ন অন্ধকার দশায় CO_2-কে বিজারিত করে খাদ্য (গ্লুকোজ) তৈরি করে।

(e) **অক্সিজেন** (Oxygen) : অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী উৎসেচকগুলির কাজে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে সালোকসংশ্লেষের হার কমে যায়।

(ii) **অভ্যন্তরীণ শর্ত** (Internal Conditions) :

(a) **ক্লোরোফিল** (Chlorophyll) : ক্লোরোফিল সালোকসংশ্লেষের একটি প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ শর্ত। মেসোফিল কলার ক্লোরোফিল অণুগুলি আলোর ফোটন কণা শোষণ করে উত্তেজিত হয় এবং উত্তেজিত ক্লোরোফিল H_2O-কে H^+ এবং OH^- আয়নে বিশ্লিষ্ট করে। সুতরাং ক্লোরোফিল ছাড়া সালোকসংশ্লেষ হওয়া সম্ভব নয়।

(b) **পত্ররন্ধ্রের ছিদ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি** (Increase and decrease of stomatal aperture) : পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় CO_2 পাতায় প্রবেশ করে। সুতরাং পত্ররন্ধ্রের ছিদ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর CO_2 প্রবেশের পরিমাণ নির্ভর করে। আলোর তীব্রতা পত্ররন্ধ্রের ছিদ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

(c) **পটাসিয়াম** (Potassium) : সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্লুকোজ, শ্বেতসারে (Starch) পরিণত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। পটাসিয়াম (K), গ্লুকোজকে শ্বেতসারে পরিণত হতে সাহায্য করে। সুতরাং সালোকসংশ্লেষ পটাসিয়ামের উপর পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।

(d) **পাতার গঠন** (Structure of leaf) : পাতার মেসোফিল কলাতন্ত্র, কোষান্তর রন্ধ্র, রক্ষীকোষ প্রভৃতির সামগ্রিক গঠন ও কর্মক্ষমতার উপর সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল।

(e) **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm) : সমস্ত বিপাক ক্রিয়া কোষের প্রোটোপ্লাজমের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং মেসোফিল কলায় প্রোটোপ্লাজমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সালোকসংশ্লেষের হারও বাড়ে।

5.16. সালোকসংশ্লেষের তাৎপর্য
(Significance of Photosynthesis)

(i) **শক্তি সঞ্চয়** (Storage of Energy) : সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সৌরশক্তি খাদ্যের মধ্যে রাসায়নিক শক্তিরূপে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত শক্তি পরবর্তী পর্যায়ে

জীবদেহের বিভিন্ন জৈবনিক কার্যের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং জীবদেহে সজীবতা আনে।

(ii) **খাদ্য সংশ্লেষ** (Synthesis of Food) : সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট প্রাথমিক খাদ্য গ্লুকোজ থেকে অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ এবং প্রোটীন তৈরি হয়। কিন্তু পরভোজী উদ্ভিদ ও সমস্ত প্রাণিকুল নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। তাই খাদ্যের জন্য এদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভর করতে হয়।

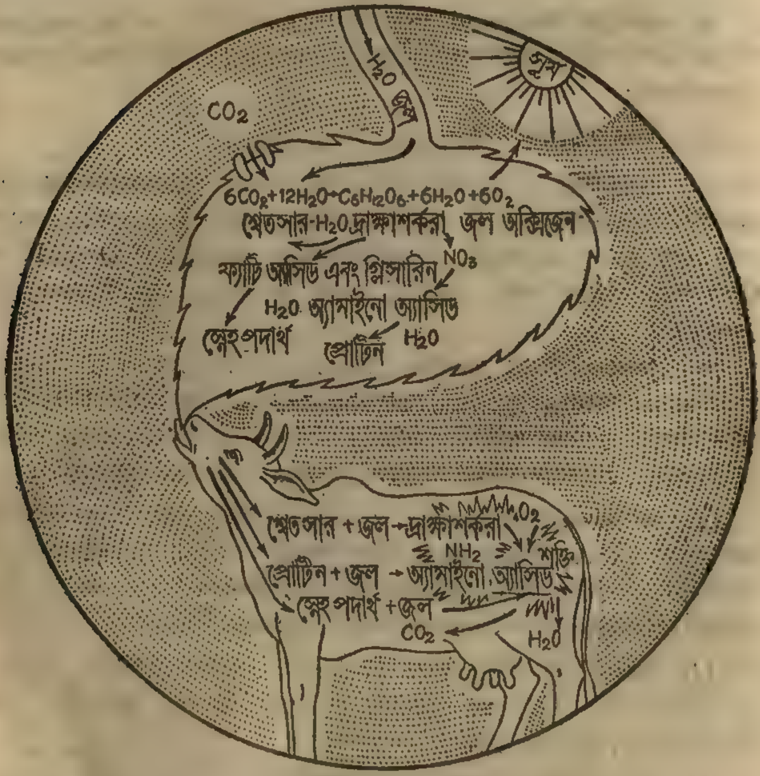

চিত্র 5.22 : সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন খাদ্যের উপর প্রাণী সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

(iii) **অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ** (Maintaining the balance of O_2 and CO_2) : প্রাণিকুল শ্বাসকার্যের জন্য পরিবেশ থেকে O_2 গ্রহণ করে এবং বিনিময়ে CO_2 পরিত্যাগ করে। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে CO_2 গ্রহণ করে পরিবেশকে পরিশোধিত করে এবং পরিবেশের O_2—CO_2-এর ভারসাম্য বজায় রাখে।

(iv) **সালোকসংশ্লেষ ও মানবসভ্যতা** (Photosynthesis and human civilisation) : মানবসভ্যতার মূল চাবিকাঠি হল শিল্প, আর শিল্পের প্রাণশক্তি হল জ্বালানি। কয়লা, পেট্রল প্রভৃতি জ্বালানি অতীতকালের উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। কয়লা অতীতকালের উদ্ভিদের জীবাশ্ম (Fossil) বিশেষ। পেট্রোলিয়াম ও নানাবিধ প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রবিশেষে অতীতকালের উদ্ভিদদেহের পচনের ফলে উৎপন্ন হয়। অতীতকালের উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের সময় যে শক্তি সঞ্চয় করেছিল, জ্বালানীর দহনকালে তা নির্গত হয়। সুতরাং শিল্প তথা মানবসভ্যতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষের উপর নির্ভরশীল।

(v) **নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি** (Necessary commodities for every day life) : পরিধেয় বস্ত্র, কাঠের আসবাবপত্র, রবার, প্লাস্টিক, নাইলন, রেয়ন, কাগজ প্রভৃতি বহুবিধ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত হয় এবং এইসব উপাদান সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শর্করা থেকে বিভিন্ন বিপাক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। সুতরাং, নিত্যব্যবহার্য নানাবিধ দ্রব্যের জন্য আমরা সবুজ উদ্ভিদ তথা সালোকসংশ্লেষের উপর নির্ভরশীল।

C. শ্বসন (Respiration)

5.17. সূচনা (Introduction)

জীবদেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ, যথা—পুষ্টি, বৃদ্ধি, চলন ও গমন, ক্ষয়পূরণ, জনন প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য শক্তি তথা খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য যদিও শক্তির উৎস তথাপি এই খাদ্য সরাসরি শক্তি সরবরাহ করতে পারে না। এই খাদ্য এক বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে, যা জীবের বিভিন্ন **শারীরবৃত্তীয়** কাজে ব্যবহৃত হয়। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন খাদ্যে শক্তি স্থৈতিক শক্তি (Potential energy) হিসেবে আবদ্ধ হয়। খাদ্যের জারণের সময় এই স্থৈতিক শক্তি রাসায়নিক শক্তি (ATP) এবং তাপশক্তি হিসেবে মুক্ত হয়। **খাদ্যের জারণের ফলে খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তির মুক্তিকেই শ্বসন** (Respiration) **বলে**। শ্বসন একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। শ্বসনে জটিল খাদ্যবস্তু ভেঙ্গে সরল উপাদানে পরিণত হয় এবং জীবদেহের শুষ্ক ওজন (Dry weight) কমে যায় বলে শ্বসন একটি অপচিতিমূলক (Catabolic) বিপাক ক্রিয়া।

জীব কোষে খাদ্যের জারণ সাধারণত পরিবেশের অক্সিজেনের প্রভাবেই হয়ে থাকে, তবে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতেও খাদ্য জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন হতে পারে। অক্সিজেনের প্রভাবে খাদ্যবস্তুর পরিপূর্ণ জারণ হয় এবং প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়, কিন্তু অক্সিজেনের অভাবে খাদ্যবস্তুর আংশিক জারণ হয় এবং খুব সামান্য শক্তি উৎপন্ন হয়। স্বভাবতই উচ্চ শ্রেণীর জীবদের শক্তির চাহিদা বেশী থাকায় তারা অক্সিজেনের উপস্থিতিতেই খাদ্যবস্তুর জারণ ঘটায় এবং বিনিময়ে উপজাত বস্তু CO_2 পরিবেশে মুক্ত করে। পরিবেশ থেকে O_2 গ্রহণ এবং বিনিময়ে CO_2 পরিত্যাগ করার এই

প্রক্রিয়াকে **শ্বাসকার্য** (Breathing) বলে। সুতরাং শ্বসন এবং শ্বাসকার্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির প্রক্রিয়া। শ্বসন হল **শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া** (Physiological process) এবং শ্বাসকার্য একটি **ভৌত প্রক্রিয়া** (Physical process)।

5.18. শ্বসন বস্তু ও শক্তি (Respiratory substrates and energy)

সজীব কোষের যে সমস্ত জৈব যৌগ জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাদের **শ্বসন বস্তু** বলে। যদিও বিভিন্ন জৈব যৌগ, যথা—স্নেহ পদার্থ, প্রোটীন, জৈব অম্ল, কার্বোহাইড্রেট শ্বসনের সময় জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে, তথাপি বিভিন্ন ধরনের কার্বোহাইড্রেটই হল প্রধান শ্বসন বস্তু। শ্বসনের শুরুতে এই কার্বোহাইড্রেটগুলি সরল শর্করা গ্লুকোজে পরিণত হয়ে জারিত হয়।

জীবজগতের সকল শক্তির উৎস হল সূর্য। এই সৌরশক্তিকে সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির সময় খাদ্যের মধ্যে স্থৈতিক শক্তি হিসেবে আবদ্ধ করে। বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য জালকের (Food web) মাধ্যমে ঐ শক্তি বিভিন্ন প্রাণীর দেহে প্রবাহিত হয়। এইভাবে বিভিন্ন জীব খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান পেয়ে থাকে।

হিসেব করে দেখা গেছে যে, এক গ্রাম-মোল গ্লুকোজ বা 180 গ্রাম গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6 = 12\times6+1\times12+16\times6 = 72 + 12 + 96 = 180$ গ্রাম) সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে প্রায় 686 K. cal তাপ শক্তি উৎপন্ন করে এবং গ্লুকোজ অণু CO_2 ও H_2O-এ বিশ্লিষ্ট হয়। গ্লুকোজের জারণের ফলে উৎপন্ন শক্তির কিছু পরিমাণ নতুন উচ্চ শক্তিযুক্ত ফসফেট যৌগ ATP গঠনের মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তিরূপে আবদ্ধ থাকে, আর বাকিটা তাপ শক্তিরূপে মুক্ত হয়। শারীরবৃত্তীয় কাজের সময় এই ATP ভেঙ্গে ADP ও iP (অজৈব ফসফেট বা inorganic phosphate)-তে পরিণত হয় এবং ATP মধ্যস্থ রাসায়নিক শক্তি মুক্ত হয়।

5.19. শ্বসন স্থল (Site of respiration)

শ্বসন প্রক্রিয়াটি প্রধানত দুটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হয়। প্রথম পর্যায়ে গ্লুকোজ অণু আংশিক জারিত হয়ে দুই অণু 3-কার্বনযুক্ত পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই পর্যায়ের বিক্রিয়ার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন হয় না; শুধু প্রয়োজনীয় উৎসেচকের প্রভাবেই এই পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলি হয়ে থাকে এবং এই উৎসেচকগুলি সজীব কোষের সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্রে পাওয়া যায়। শ্বসনের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলি অক্সিজেনের উপস্থিতিতে কোষীয় অঙ্গাণু (Cell organelle) মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে ঘটে থাকে। এই পর্যায়ে পাইরুভিক অ্যাসিড সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে CO_2 এবং H_2O সৃষ্টি করে। সুতরাং শ্বসন স্থল হল—প্রথম পর্যায়ের জন্য **সাইটোপ্লাজম** এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য কোষীয় অঙ্গাণু **মাইটোকনড্রিয়া** (ইউক্যারিওটিক কোষে)।

5.20. শ্বসনের সংজ্ঞা (Definition of respiration)

যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় জীবিত কোষ দ্বারা খাদ্যবস্তুর জারণের ফলে খাদ্যের স্থৈতিক শক্তির মুক্তি ঘটে, তাকে শ্বসন (Respiration) বলে।

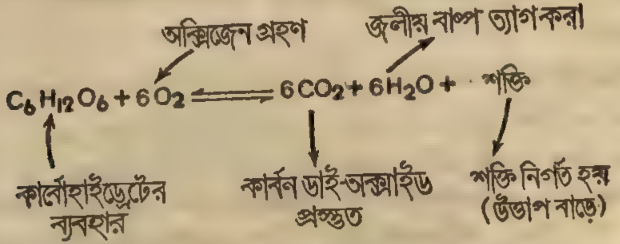

উপরিউক্ত সমীকরণ হতে বোঝা যায় যদি একটি জীব শ্বাসকার্য করে তবে—

(i) কার্বোহাইড্রেট ব্যবহৃত হবে, (ii) অক্সিজেন গ্রহণ করবে, (iii) কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হবে, (iv) জল বা জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করবে, (v) নির্গত হবে শক্তি, বাড়বে উত্তাপ।

5.21. শ্বসনের প্রকারভেদ (Types of respiration)

শ্বসন অর্থাৎ জীব কোষের খাদ্যবস্তুর জারণ দু'ভাবে হতে পারে। নিচে এ-বিষয়ে আলোচনা করা হল ঃ

(I) সবাত শ্বসন (Aerobic respiration),

(II) অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration)।

I. সবাত শ্বসন (Aerobic respiration) **ঃ যে প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের সাহায্যে জীবকোষস্থ খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে শক্তি, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল উৎপন্ন হয়, তাকে সবাত শ্বসন বলে।**

বিক্রিয়া ঃ $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 674\text{-}686$ K. cal শক্তি (আনুমানিক)

II. অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration) **ঃ যে প্রক্রিয়ায় জীব-কোষস্থ খাদ্যবস্তু অক্সিজেন ছাড়াই অসম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে সামান্য শক্তি, ইথাইল অ্যালকোহল এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (উদ্ভিদকোষে) অথবা সামান্য শক্তি ও ল্যাকটিক অ্যাসিড (প্রধানত প্রাণিকোষে) উৎপন্ন হয়, তাকে অবাত শ্বসন বলে।**

বিক্রিয়া ঃ

$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 + 28$ K. cal শক্তি (আনুমানিক)
(ইথাইল অ্যালকোহল)

$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_3H_6O_3 + 28$ K. cal শক্তি (আনুমানিক)
(ল্যাকটিক অ্যাসিড)

ঈস্ট, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি জীবাণু (Microbes) এক বিশেষ অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ অক্সিজেন ছাড়াই কোষ-বহিঃস্থ শর্করার আংশিক জারণ ঘটিয়ে ইথাইল অ্যালকোহল ও CO_2, ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রভৃতি এবং সামান্য শক্তি উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়াকে **কোহল সন্ধান** বলে।

5.22. কোহল সন্ধান (Alcoholic fermentation)

যে প্রক্রিয়ায় জীবাণুরা সাধারণত কোষ-বহিঃস্থ (extracellular) খাদ্যকে অক্সিজেন ছাড়াই অসম্পূর্ণরূপে জারিত করে সামান্য শক্তি, ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড, ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রভৃতি উৎপন্ন করে, তাকে কোহল সন্ধান বলে।

বিক্রিয়া :

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 + 28\ K.cal$$ শক্তি (আনুমানিক)

কোহল সন্ধান পদ্ধতিতে বহু জীবাণু তাদের জৈবনিক ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে। এই জীবাণুদের মধ্যে কিছু কিছু জীবাণু অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশে মরে যায়, এদের **অবলিগেট অ্যানারোব** (Obligate anaerobe) বলে। আবার যে সব জীবাণু অক্সিজেনযুক্ত বা অক্সিজেনবিহীন উভয় পরিবেশেই বাঁচতে পারে, তাদের **ফ্যাকালটেটিভ অ্যানারোব** (Facultative anaerobe) বলে।

5.23. শ্বাস প্রক্রিয়া (Mechanism of respiration)

সবাত অথবা অবাত যে কোন প্রকার শ্বসনে কোষস্থ প্রাথমিক খাদ্য গ্লুকোজ প্রথম পর্যায়ে সাইটোপ্লাজমে অক্সিজেন ছাড়াই উৎসেচকের উপস্থিতিতে আংশিক জারিত হয়ে 3-কার্বনযুক্ত যৌগ পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই পর্যায়টিকে **গ্লাইকোলিসিস** বলে। গ্লাইকোলিসিসে উৎপন্ন পাইরুভিক অ্যাসিডের পরবর্তী পর্যায়ের জারণ ক্রিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

চিত্র 5.23 : শ্বাসপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের সংঘটন স্থল।

অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যেই আংশিক জারিত হয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড বা কোহল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং সামান্য শক্তি উৎপন্ন হয়। যদি কোষে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ থাকে, তবে পাইরুভিক অ্যাসিড কোষীয় অঙ্গাণু মাইটোকনড্রিয়ায় (ইউক্যারিওটিক কোষে) সম্পূর্ণ জারিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়। মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে পাইরুভিক অ্যাসিডের পরবর্তী পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলি একটি চক্রাকার পথে আবর্তিত হয়। এই চক্রাকার বিক্রিয়া পথটিকে **ক্রেবস চক্র** (Krebs cycle) বা **টিসিএ-চক্র** (TCA-Tricarboxylic acid cycle) বা **সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র** (Citric acid cycle) বলে (চিত্র 5.23)।

● গ্লাইকোলিসিস (Glycolysis) বা EMP পথ :

সবাত এবং অবাত শ্বসনের যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির মাধ্যমে অক্সিজেন ছাড়াই কোষস্থ গ্লুকোজ আংশিক জারিত হয়ে পাইরুভিক অ্যাসিড, $NADH_2$ এবং ATP উৎপন্ন হয়, তাকে গ্লাইকোলিসিস বলে। এই প্রক্রিয়াটি সজীব কোষের সাইটোপ্লাজমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। গ্লাইকোলিসিস দশার বিক্রিয়াগুলি সর্বপ্রথম তিনজন বিজ্ঞানী **এম্বডেন, মায়ারহফ ও পার্নস** (Embden, Meyerhof and Parnas) বর্ণনা দিয়েছিলেন বলে গ্লাইকোলিসিসকে, তাঁদের নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে **EMP Pathway**-ও বলে।

গ্লাইকোলিসিসের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া (Biochemical reactions of Glycolysis) :

(i) গ্লাইকোলিসিস বিক্রিয়ার প্রথমে গ্লুকোজ, ATP দ্বারা ফসফোরাইলেশনের ফলে ADP এবং গ্লুকোজ-6-ফসফেটে পরিণত হয়। হেক্সোকাইনেজ উৎসেচক এই বিক্রিয়ায় সাহায্য করে।

$$\text{গ্লুকোজ} + \text{ATP} \xrightarrow{\text{হেক্সোকাইনেজ}} \text{গ্লুকোজ-6-ফসফেট} + \text{ADP}।$$

(ii) আইসোমেরাইজেশন বিক্রিয়ার দ্বারা গ্লুকোজ-6-ফসফেট, ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ উৎসেচকের সাহায্যে ফ্রুক্টোজ-6-ফসফেটে পরিণত হয়।

$$\text{গ্লুকোজ-6-ফসফেট} \xrightarrow[\text{আইসোমারেজ}]{\text{ফসফোগ্লুকো-}} \text{ফ্রুক্টোজ-6-ফসফেট}$$

(iii) ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ উৎসেচকের সাহায্যে ATP দ্বারা ফসফোরাইলেশন বিক্রিয়ায় ফ্রুক্টোজ-6-ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ-1, 6-ডাইফসফেট এবং ATP সৃষ্টি হয়।

$$\text{ফ্রুক্টোজ-6-ফসফেট} + \text{ATP} \xrightarrow[\text{কাইনেজ}]{\text{ফসফোফ্রুক্টো-}} \text{ফ্রুক্টোজ-1, 6-ডাইফসফেট} + \text{ADP}$$

(iv) অ্যালডোলেজ উৎসেচক ফ্রুক্টোজ-1, 6-ডাইফসফেটকে ভেঙ্গে দুটি ট্রায়োজ ফসফেট শর্করা, যথা—ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট এবং গ্লিসার্যালডিহাইড 3-ফসফেট সৃষ্টি করে।

ফ্রুক্টোজ-1, 6-ডাইফসফেট ⇌ (অ্যালডোলেজ) ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট

↑↓ ট্রায়োজ ফসফেট আইসোমারেজ

গ্লিসার্যালডিহাইড-3-ফসফেট

ট্রায়োজ-ফসফেট-আইসোমারেজ উৎসেচকের সাহায্যে আইসোমেরাইজেশন বিক্রিয়ার দ্বারা ট্রায়োজ ফসফেট শর্করাগুলি পরস্পর রূপান্তরিত হতে পারে।

(v) NAD, অজৈব ফসফেট ($iP=H_3PO_4$) এবং গ্লিসার‍্যালডিহাইড-3-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের সাহায্যে গ্লিসার‍্যালডিহাইড-3-ফসফেট জারিত হয়ে 1, 3-ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড এবং $NADH_2$ উৎপন্ন করে।

গ্লিসার‍্যালডিহাইড-3-ফসফেট + H_3PO_4 + NAD $\xrightleftharpoons[\text{3-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ}]{\text{গ্লিসার‍্যালডিহাইড-}}$ 1, 3-ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড + $NADH_2$

(vi) ফসফোগ্লিসারিল-কাইনেজ উৎসেচকের সাহায্যে 1, 3-ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে একটি ফসফেট, ADP-তে স্থানান্তরিত হয়ে 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড এবং ATP উৎপন্ন হয়।

1, 3-ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড + ADP $\xrightleftharpoons[\text{কাইনেজ}]{\text{ফসফোগ্লিসারিল-}}$ 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড + ATP

(vii) ফসফোগ্লিসারিল-মিউটেজ উৎসেচক 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডের ফসফেট গ্রুপটিকে এর 3-কার্বন অবস্থান থেকে 2-কার্বন অবস্থানে স্থানান্তরিত করে 2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে।

3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড $\xrightleftharpoons[\text{মিউটেজ}]{\text{ফসফোগ্লিসারিল-}}$ 2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড।

(viii) 2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড, এনোলেজ উৎসেচকের সাহায্যে এক অণু জল ছেড়ে ফসফোএনোল পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড $\xrightleftharpoons{\text{এনোলেজ}}$ ফসফোএনোল পাইরুভিক অ্যাসিড + H_2O

(ix) শেষ বিক্রিয়ায় পাইরুভিক-কাইনেজ উৎসেচক ফসফোএনোল পাইরুভিক অ্যাসিডের ফসফেটকে ADP-তে স্থানান্তরিত করে ATP এবং পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

ফসফোএনোল পাইরুভিক অ্যাসিড + ADP $\xrightleftharpoons[\text{কাইনেজ}]{\text{পাইরুভিক}}$ পাইরুভিক অ্যাসিড + ATP

পাইরুভিক অ্যাসিডের অবাত জারণ (Anaerobic oxidation of Pyruvic acid): প্রাণীদের পেশী ও অন্যান্য কোষে পাইরুভিক অ্যাসিড, ল্যাকটেট-ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের প্রভাবে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে বিজারিত হয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

পাইরুভিক অ্যাসিড + NADH + H^+ $\xrightleftharpoons[\text{জেনেজ}]{\text{ল্যাকটেট-ডিহাইড্রো-}}$ ল্যাকটিক অ্যাসিড + NAD^+

উদ্ভিদকোষে পাইরুভিক অ্যাসিড, পাইরুভেট ডি-কার্বোক্সিলেজ উৎসেচকের প্রভাবে অক্সিজেন ছাড়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অ্যাসিট্যালডিহাইডে পরিণত হয়।

পাইরুভিক অ্যাসিড $\xrightleftharpoons[\text{ডি-কার্বোক্সিলেজ}]{\text{পাইরুভেট}}$ অ্যাসিট্যালডিহাইড + CO_2

পরে অ্যাসিট্যালডিহাইড, অ্যালকোহল-ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের প্রভাবে বিজারিত হয়ে ইথাইল অ্যালকোহলে পরিণত হয়।

$$\text{অ্যাসিট্যালডিহাইড} + NADH + H^{+} \xrightarrow[\text{ডিহাইড্রোজেনেজ}]{\text{অ্যালকোহল}} \text{ইথাইল অ্যালকোহল} + NAD^{+}$$

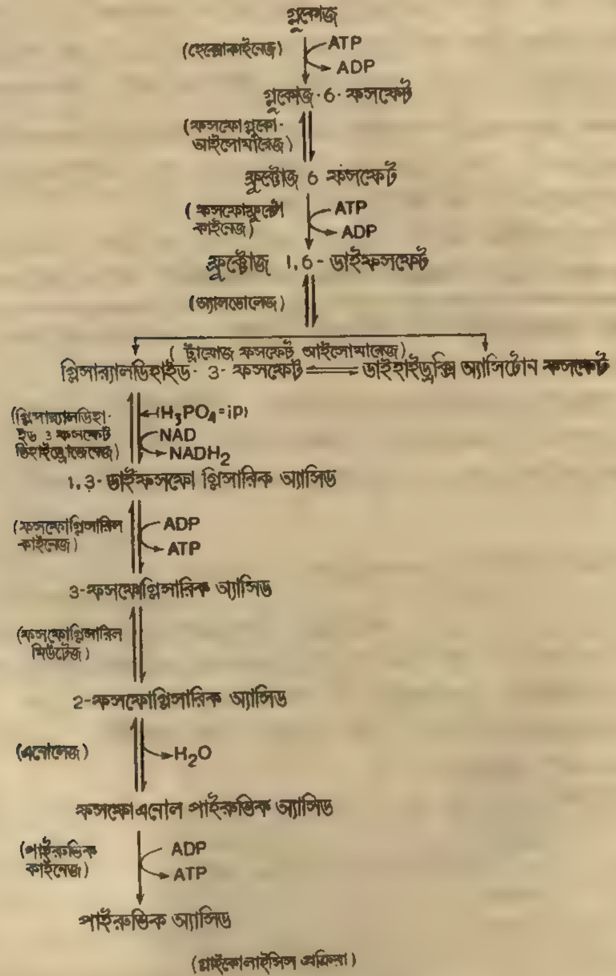

চিত্র 5.24 : গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক ছক।

● **গ্লাইকোলিসিসের ফলে কি কি উৎপন্ন হয়?**—পাইরুভিক অ্যাসিড, ATP এবং $NADH_2$ উৎপন্ন হয়।

5.24. ক্রেবস চক্র বা TCA-চক্র বা সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র (Krebs cycle or TCA cycle or Citric acid cycle)

সবাত শ্বসনের যে দশায় চক্রাকার বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লাইকোলিসিসে উৎপন্ন পাইরুভিক অ্যাসিড অক্সিজেনের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়, তাকে ক্রেবস চক্র বলে। (এই চক্রের আবিষ্কারক Hans Krebs-এর নামানুসারে এই চক্রকে বলে ক্রেবস চক্র। এই চক্রে 2-কার্বনযুক্ত অ্যাসিটাইল-কোএনজাইম-A অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিডের মধ্য দিয়ে জারিত হয়ে উৎপন্ন করে CO_2 এবং জল। ইউক্যারিওটিক কোষে ক্রেবস-এর চক্র মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে সম্পন্ন হয়।)

ক্রেবস চক্রকে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র বা TCA (ট্রাই-কার্বক্সিলিক অ্যাসিড) চক্র বলা হয় কেন ?—ক্রেবস চক্রের প্রথম ধাপে উৎপন্ন বস্তু সাইট্রিক অ্যাসিডের নামানুসারে ক্রেবস চক্রকে **সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র** বলা হয়।

আবার, সাইট্রিক অ্যাসিড অণুতে তিনটি করে কার্বক্সিল (COOH) গ্রুপ থাকার জন্য এই চক্রকে **ট্রাই-কার্বক্সিলিক অ্যাসিড চক্র** বা **TCA চক্রও** বলা হয়।

ক্রেবস চক্রের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া (Biochemical reactions of Krebs cycle) :

(i) পাইরুভিক-ডিহাইড্রোজেনেজ-কমপ্লেক্স উৎসেচকের সাহায্যে কয়েকটি বিক্রিয়ার মাধ্যমে কোএনজাইম-A (coenzyme-A) এবং NAD-এর সহায়তায় পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-A, CO_2 এবং $NADH_2$ উৎপন্ন হয়।

$$\text{পাইরুভিক অ্যাসিড} + \text{কোএনজাইম-A} + NAD \xrightarrow[\text{ডিহাইড্রোজেনেজ-কমপ্লেক্স}]{\text{পাইরুভিক-}} \text{অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-A} + CO_2 + NADH_2$$

এই বিক্রিয়ার ফলে পাইরুভিক অ্যাসিড, ক্রেবস চক্রে প্রবেশের উপযুক্ত হয়।

(ii) অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-A, সাইট্রেট-সিন্থেটেজ উৎসেচকের সাহায্যে অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সাইট্রিক অ্যাসিড এবং কোএনজাইম-A উৎপন্ন করে।

$$\text{অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-A} + \text{অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড} + H_2O \xrightarrow[\text{সিন্থেটেজ}]{\text{সাইট্রেট}} \text{সাইট্রিক অ্যাসিড} + \text{কোএনজাইম-A}$$

(iii) অ্যাকোনাইটেজ উৎসেচকের সাহায্যে আইসোমারিক (isomeric) বিক্রিয়ায় সাইট্রিক অ্যাসিড প্রথমে সিস্-অ্যাকোনাইটিক অ্যাসিড এবং পরে আইসোসাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

$$\text{সাইট্রিক অ্যাসিড} \xrightarrow{\text{অ্যাকোনাইটেজ}} \text{সিস্-অ্যাকোনাইটিক অ্যাসিড} + H_2O$$

$$\text{সিস্-অ্যাকোনাইটিক অ্যাসিড} + H_2O \xrightleftharpoons{\text{অ্যাকোনাইটেজ}} \text{আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড}$$

(iv) NADP দ্বারা আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড, আইসোসাইট্রিক-ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের সাহায্যে জারিত হয়ে অক্সালোসাক্‌সিনিক অ্যাসিড এবং $NADPH_2$ উৎপন্ন করে।

আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড + NADP —(আইসোসাইট্রিক-ডিহাইড্রোজেনেজ)→ অক্সালোসাক্‌সিনিক অ্যাসিড + $NADPH_2$

(v) ডিকার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়ায় কার্বোক্সিলেজ উৎসেচকের সাহায্যে অক্সালোসাক্‌সিনিক অ্যাসিড থেকে আলফাকিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড এবং CO_2 উৎপন্ন হয়।

অক্সালোসাক্‌সিনিক অ্যাসিড —(কার্বোক্সিলেজ)→ আলফাকিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড + CO_2 ↑

(vi) আলফাকিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের সাহায্যে NAD এবং কোএনজাইম-A-র সহায়তায় ডিকার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়ার ফলে আলফাকিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড থেকে সাক্‌সিনাইল কোএনজাইম-A, $NADH_2$ এবং CO_2 উৎপন্ন হয়।

আলফাকিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড + কোএনজাইম-A + NAD

—(আলফাকিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজেনেজ)→ সাক্‌সিনাইল কোএনজাইম-A + $NADH_2$ + CO_2 ↑

(vii) GDP (গুয়ানোসিন ডাইফসফেট), iP এবং সাক্‌সিনিক-থায়োকাইনেজ উৎসেচক সাক্‌সিনাইল কোএনজাইম-A থেকে সাক্‌সিনিক অ্যাসিড, GTP এবং কোএনজাইম-A উৎপন্ন করে।

সাক্‌সিনাইল কোএনজাইম-A + GDP + iP ⇌(সাক্‌সিনিক-থায়োকাইনেজ) সাক্‌সিনিক অ্যাসিড + GTP + কোএনজাইম-A

(viii) সাক্‌সিনিক ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের সাহায্যে FAD (ফ্ল্যাভিন অ্যাডিনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড) সাক্‌সিনিক অ্যাসিড থেকে দুই পরমাণু হাইড্রোজেন গ্রহণ করায় ফিউমারিক অ্যাসিড এবং $FADH_2$ সৃষ্টি হয়।

সাক্‌সিনিক অ্যাসিড + FAD ⇌(সাক্‌সিনিক ডিহাইড্রোজেনেজ) ফিউমারিক অ্যাসিড + $FADH_2$

(ix) ফিউমারেজ উৎসেচকের সহায়তায় ফিউমারিক অ্যাসিডে H_2O সংযোজিত হওয়ায় ম্যালিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

ফিউমারিক অ্যাসিড + H_2O ⇌(ফিউমারেজ) ম্যালিক অ্যাসিড

(x) NAD দ্বারা জারিত হয়ে ম্যালিক অ্যাসিড, ম্যালিক-ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের সাহায্যে অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ায় NAD বিজারিত হয়ে $NADH_2$ উৎপন্ন করে।

$$\text{ম্যালিক অ্যাসিড} + NAD \xrightleftharpoons[\text{জেনেজ}]{\text{ম্যালিক-ডিহাইড্রো-}} \text{অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড} + NADH_2$$

অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিডের পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে ক্রেবস চক্র সম্পূর্ণ হয়।

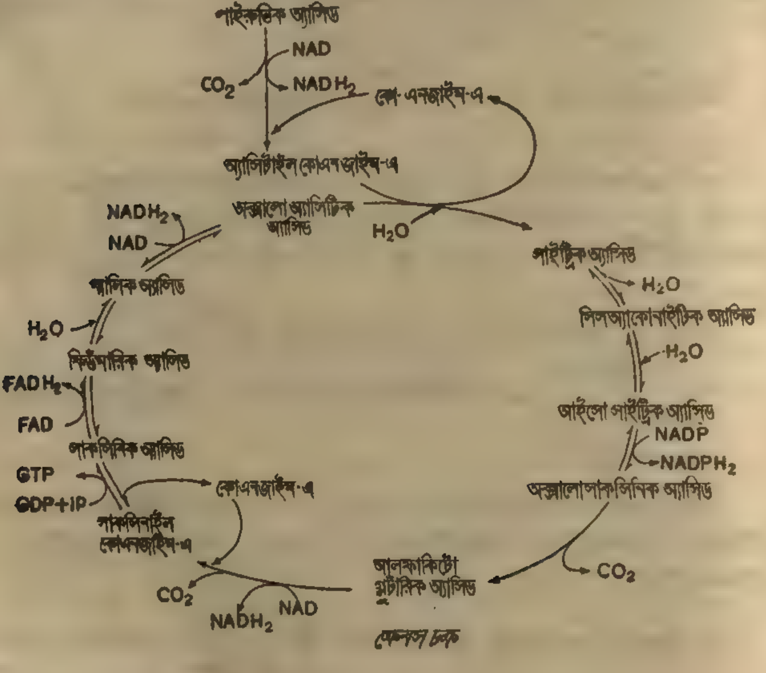

চিত্র 5.25 : ক্রেবস চক্রের ছক।

5.25. প্রান্তীয় শ্বসন বা সাইটোক্রোম পথ
(Terminal respiration or Cytochrome Pathway)

সবাত শ্বসনে অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, তবে ক্রেবস চক্রের জারণ ক্রিয়াগুলির জন্য সরাসরি অক্সিজেন প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন সহ-উৎসেচক (Co-enzyme), যথা—NAD, FAD প্রভৃতি হাইড্রোজেন অণু অপসারিত করে জারণ ক্রিয়া ঘটায় এবং নিজেরা বিজারিত হয়। এই জারণ ক্রিয়ায় প্রধান বাহক NAD^+ ধনাত্মক অবস্থায় থাকে। প্রতিটি পর্যায়ে জারণ ক্রিয়ায় দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর অপসারণ ঘটে NAD^+, NADH এবং $H^+(NADH_2)$-তে পরিণত হয়। শেষ পর্যায়ে এই বিজারিত সহ-উৎসেচকগুলি অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নিজেরা জারিত হয় এবং H_2O উৎপন্ন করে। এই জারিত সহ-উৎসেচকগুলি পুনরায় ক্রেবস চক্রের

বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। তবে বিজারিত সহ-উৎসেচকগুলি সরাসরি অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। এই বিক্রিয়া একটি চক্রপথে হয়ে থাকে, যাকে **সাইটোক্রোম পথ** (Cytochrome pathway) বলে। সবাত শ্বসনের অন্তিমলগ্নে এই জারণ ক্রিয়া হয় বলে, একে **প্রান্তীয় শ্বসন** (Terminal respiration)-ও বলে।

এই চক্রাকার বিক্রিয়ার প্রথম স্তরে বিজারিত NAD ($NADH_2$), FAD-র সংস্পর্শে আসে। FAD হাইড্রোজেন অণু গ্রহণ করে নিজে বিজারিত হয় এবং বিজারিত NAD পুনরায় জারিত হয়।

$$NADH_2 + FAD \longrightarrow NAD + FADH_2$$

এই বিক্রিয়ায় যে শক্তি নির্গত হয় তা ADP এবং অজৈব ফসফেট (iP) সহযোগে এক অণু ATP সংশ্লেষের মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তিরূপে আবদ্ধ হয়।

$$ADP + iP \longrightarrow ATP$$

পরবর্তী পর্যায়ে হাইড্রোজেন অণু আয়নীভবনের মাধ্যমে ইলেকট্রন ($2e^-$) এবং হাইড্রোজেন আয়ন ($2H^+$)-এ পরিণত হয়। এই ইলেকট্রন বিভিন্ন বাহক (সাইটোক্রোম b, সাইটোক্রোম-c, সাইটোক্রোম-a এবং সাইটোক্রোম-a_3)-এর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়নকে পুনরায় হাইড্রোজেন অণুতে পরিণত করলে হাইড্রোজেন অণু অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অণু জল সৃষ্টি করে। সাইটোক্রোম বাহকের মাধ্যমে

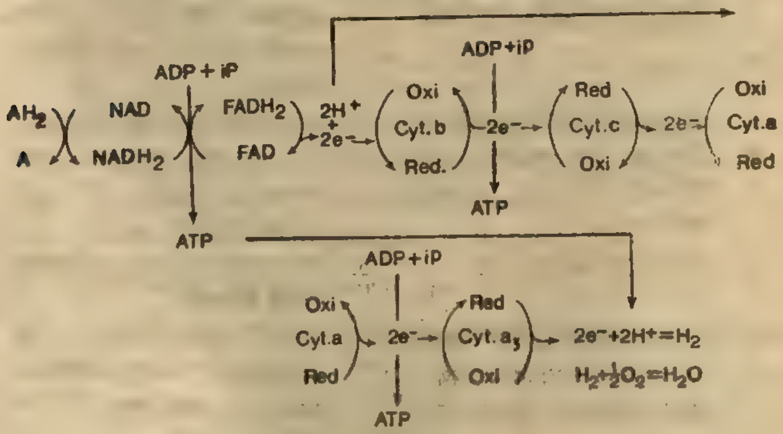

চিত্র 5.26 : সাইটোক্রোম পথ

ইলেকট্রনের এই প্রবাহকে **ইলেকট্রন প্রবাহ** (Electron transport) বলে। ইলেকট্রন প্রবাহের প্রত্যেক দুটি স্তরে ইলেকট্রন থেকে নির্গত শক্তির সাহায্যে ADP ও অজৈব ফসফেট (iP) যুক্ত হয়ে দুই অণু ATP সৃষ্টি করে।

সবাত শ্বসনে ATP অণু উৎপাদনের পরিমাণ :

গ্লাইকোলাইসিস : 1. (2 অণু প্রবেশ করে এবং 4 অণু নির্গত হয়) = 2 অণু ATP

2. সবাত শ্বসনে $NADH_2$ জারিত হয়ে (2 × 3) = 6 অণু ATP

পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে : 3. $NADH_2$ জারিত হয়ে (2 × 3) = 6 অণু ATP

ক্রেবস চক্র : 4. GTP থেকে (2 × 1) = 2 অণু ATP

5. $NADH_2$ জারিত হয়ে (2 × 3 × 3) = 18 অণু ATP

6. $FADH_2$ জারিত হয়ে (1 × 2 × 2) = 4 অণু ATP

মোট 38 অণু ATP

সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসনের পার্থক্য (Differences between aerobic respiration and anaerobic respiration) :

সবাত শ্বসন	অবাত শ্বসন
1. অক্সিজেনের (O_2) প্রয়োজন হয়।	1. অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না।
2. উপজাত বস্তু CO_2 এবং H_2O।	2. উপজাত বস্তু ইথাইল অ্যালকোহল ও CO_2 অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিড।
3. গ্লুকোজের পরিপূর্ণ জারণ হয়।	3. গ্লুকোজের আংশিক জারণ হয়।
4. প্রতি গ্রাম-অণু গ্লুকোজ থেকে 674-686 K. cal তাপশক্তি নির্গত হয়।	4. প্রতি গ্রাম-অণু গ্লুকোজ থেকে কমবেশী 24-28 K. cal তাপশক্তি নির্গত হয়।
5. দেহের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।	5. উচ্চ শ্রেণীর জীবদেহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।
6. সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে। যথা—গ্লাইকোলিসিস, ক্রেবস চক্র ও প্রান্তীয় শ্বসন।	6. সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া একটি মাত্র পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে। যথা—গ্লাইকোলাইসিস।
7. প্রথম পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলি সাইটোপ্লাজমে ঘটে এবং শেষ পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলি কোষীয় অঙ্গাণু মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে ঘটে থাকে।	7. সমস্ত বিক্রিয়া মাইটোকনড্রিয়ার বাইরে কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে।

অবাত শ্বসন ও কোহল সন্ধানের পার্থক্য (Differences between anaerobic respiration and alcoholic fermentation) **:**

অবাত শ্বসন	কোহল সন্ধান
1. উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর অক্সিজেনবিহীন কোষে ঘটে।	1. ঈস্ট, ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য জীবাণুতে ঘটে।
2. অক্সিজেন না পেলে কেবল তখনই এই প্রক্রিয়া হয়।	2. অক্সিজেন নিরপেক্ষ।
3. এটি একটি অন্তঃকোষীয় প্রক্রিয়া।	3. এটি সাধারণত বহিঃকোষীয় প্রক্রিয়া।
4. উপজাত বস্তু (ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিড) শ্বসনকারী কোষের মধ্যে জমতে থাকে।	4. উপজাত বস্তু (ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড, ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রভৃতি) সাধারণত জীবাণু কোষের বাইরে জমতে থাকে।
5. কোষের মধ্যেই শক্তি উৎপন্ন হয়।	5. জীবাণু কোষের বাইরে শক্তি উৎপন্ন হয়।

অবাত শ্বসন ও কোহল সন্ধানের মধ্যে সাদৃশ্য (Similarities between anaerobic respiration and alcoholic fermentation) **:** কোহল সন্ধান এক বিশেষ ধরনের অবাত শ্বসন ; তাই এই দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে যথেষ্ট মিল বা সাদৃশ্য দেখা যায়। সাদৃশ্যগুলি নিচে উল্লেখ করা হল :

(i) দুটি প্রক্রিয়াতেই প্রাথমিক পদার্থরূপে হেক্সোজ শর্করা ব্যবহৃত হয়।
(ii) উভয় প্রক্রিয়ার শেষেই ইথাইল অ্যালকোহল ও CO_2 উৎপন্ন হয়।
(iii) উভয় প্রক্রিয়াই অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে ঘটে।
(iv) উভয় প্রক্রিয়াতেই কার্যকর উৎসেচকগুলি অভিন্ন।

5.26. শ্বাস অঙ্গ (Respiratory organs)

প্রতিটি জীবের বেঁচে থাকার জন্য চাই শক্তি, যা শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাদ্যের জারণের ফলে উৎপন্ন হয়। উন্নত জীব খাদ্যের জারণ ক্রিয়া পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেনের মাধ্যমে ঘটিয়ে থাকে। যে অঙ্গের মাধ্যমে জীব পরিবেশ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং বিনিময়ে খাদ্যের জারণের ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবেশে মুক্ত করে, তাকে **শ্বাস অঙ্গ** (Respiratory organs) বলে।

নিচে বিভিন্ন শ্বাস অঙ্গ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

A. উদ্ভিদের শ্বাস অঙ্গ (Respiratory organs in plants) **:** বাস্তবিকপক্ষে উদ্ভিদের নির্দিষ্ট কোন শ্বাস অঙ্গ নেই। মূলত ব্যাপন ক্রিয়ার ফলেই উদ্ভিদদেহে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের আদান-প্রদান হয়। স্থলজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে এবং জলজ উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত বায়ু থেকে অক্সিজেন ব্যাপন ক্রিয়ার

মাধ্যমে প্রধানত গ্রহণ করে থাকে। একই পথে বিপরীত ক্রিয়ায় CO_2 পরিবেশে মুক্ত হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়ে এই গ্যাসীয় বিনিময় হয়ে থাকে। লেন্টিসেলের ভিতর দিয়েও গ্যাসীয় পদার্থের আদান-প্রদান হতে পারে।

B. প্রাণীদের শ্বাস অঙ্গ (Respiratory organs in animals) : উদ্ভিদের মত সমস্ত এককোষী প্রাণী ও কিছু কিছু বহুকোষী প্রাণী ; যথা—কেঁচো, হাইড্রা, স্পঞ্জ প্রভৃতির নির্দিষ্ট কোন শ্বাস অঙ্গ নেই। এই সমস্ত প্রাণী কোষ পর্দা বা দেহত্বকের মাধ্যমে নিজ নিজ পরিবেশ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং বিনিময়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। তাছাড়া, বেশীর ভাগ প্রাণীরই নির্দিষ্ট শ্বাস অঙ্গ রয়েছে। এই শ্বাস অঙ্গের প্রকৃতি প্রাণী কোন্ পরিবেশে বাস করে তার উপর নির্ভরশীল।

নিচে প্রাণীদের বিভিন্ন শ্বাস অঙ্গ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(i) **কোষ পর্দা বা প্লাজমা পর্দা (Cell membrane or Plasma membrane) :** সমস্ত এককোষী প্রাণী বা আদ্যপ্রাণী কোষ পর্দা বা প্লাজমা পর্দার

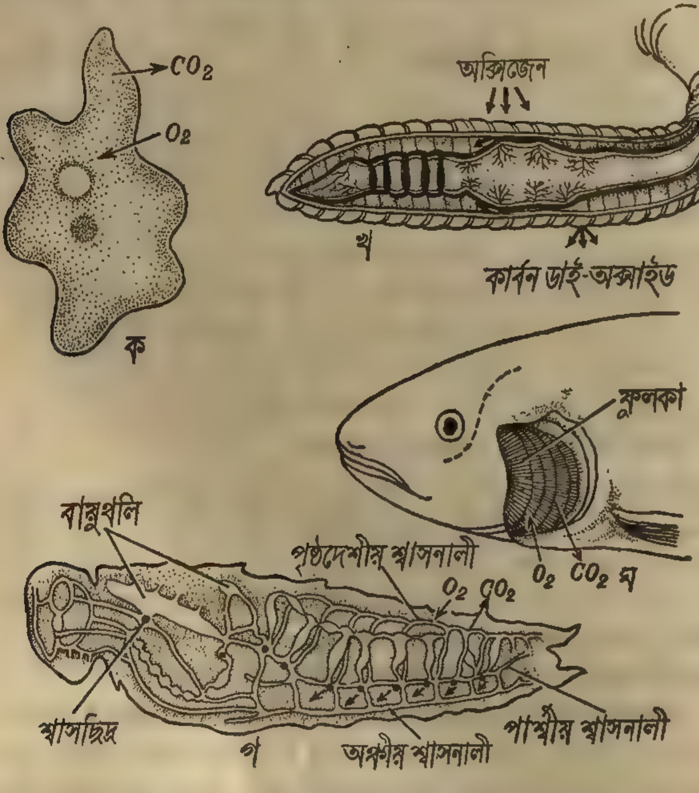

চিত্র 5.27 : কয়েক প্রকার প্রাণীর শ্বসন কৌশল ও শ্বাসযন্ত্র।
(ক) অ্যামিবা, (খ) কেঁচো, (গ) পতঙ্গ, (ঘ) মাছ।

মাধ্যমে ব্যাপন ক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে নিজ নিজ পরিবেশ থেকে অক্সিজেন শোষণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। যেহেতু অধিকাংশ এককোষী প্রাণী জলজ পরিবেশে বাস করে, সেইজন্য এরা পরিবেশ থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেনই গ্রহণ করতে পারে।

(ii) **দেহ-প্রাকার** (**Body wall**) : হাইড্রা, স্পঞ্জ প্রভৃতি জলজ প্রাণীদের দেহের চারদিকে অবস্থিত জল থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন দেহ-প্রাকারের অর্থাৎ পরিধিতে অবস্থিত কোষগুলির মাধ্যমে ব্যাপন ক্রিয়ায় সরাসরি দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। কোষের ভিতরে খাদ্যবস্তুর জারণের ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড একইভাবে জলে পরিত্যক্ত হয়।

(iii) **ত্বক** (**Skin**) : অনেক স্থলজ বহুকোষী প্রাণী, যেমন—কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি ভেজা দেহত্বকের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ব্যাপন ক্রিয়ায় গ্রহণ করে।

চিত্র 5.28 : কেঁচোর শ্বসন কৌশল।

রক্তে উপস্থিত শ্বাসকণা হিমোগ্লোবিন এই অক্সিজেনকে অস্থায়ী অক্সাইড যৌগ হিসেবে দেহের সমস্ত কলা-কোষে পরিবহণ করে। প্রধানত শীতঘুমের সময় ব্যাঙ ভেজা দেহত্বকের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালায়।

(iv) **শ্বাসনালী** (Trachea) : আরশোলা, ফড়িং, মশা, মথ, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গশ্রেণীর প্রাণী শ্বাসনালীর মাধ্যমে শ্বাসকার্য চালায়। শ্বাসনালী দেহের ভিতরে ক্রমাগত শাখা-প্রশাখা নালীতে ভাগ হতে হতে শ্বাসনালীর জালক গঠন করে (চিত্র 5.30)। বড় শ্বাসনালীর মধ্যবর্তী সর্পিলাকার কাইটিন-নির্মিত বলয়কে **ইনটিমা** বলে। এই ইনটিমাগুলি পুরু হয়ে গঠন করে ফিতার মত টিনিডিয়া

চিত্র 5.29 : চিংড়ির শ্বাস অঙ্গ।

(Taenidia) [চিত্র 5.31]। ইনটিমা ও টিনিডিয়া থাকার ফলে শ্বাসনালীগুলি চুপসে

(Collapse) যায় না। শ্বাসনালীগুলি **শ্বাসছিদ্র** (Spiracle)-এর মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। শ্বাসছিদ্র পথে বায়ু সরাসরি দেহের ভিতরে প্রবেশ করে। এই ছিদ্রপথে বায়ুর প্রবেশ ও নির্গমন দেহের পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্বাসনালীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশাখাগুলি কলা-কোষের সংস্পর্শে থাকে। উক্ত প্রশাখাগুলি থেকে অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কলা-কোষে প্রবেশ করে এবং কলা-কোষ থেকে CO_2 একই প্রক্রিয়ায় উক্ত প্রশাখাগুলিতে ফিরে আসে।

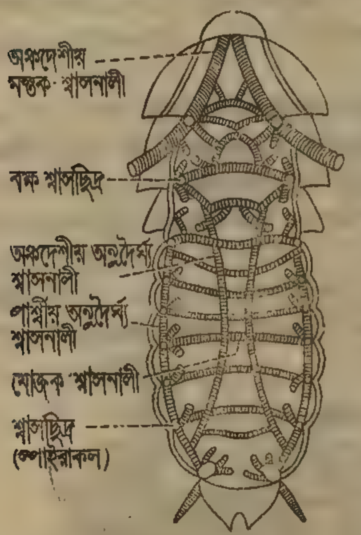

চিত্র 5.30 : আরশোলার শ্বাস অঙ্গ

(v) **ফুলকা** (Gills) : মাছসহ বহু জলজ প্রাণীর শ্বাস অঙ্গ হল ফুলকা। ফুলকায় অসংখ্য রক্তজালক থাকে। এই ফুলকার উপর দিয়ে যখন অক্সিজেনযুক্ত জল প্রবাহিত হয়, তখন ফুলকার মধ্যে অবস্থিত রক্তজালকের রক্তস্থিত শ্বাসকণা

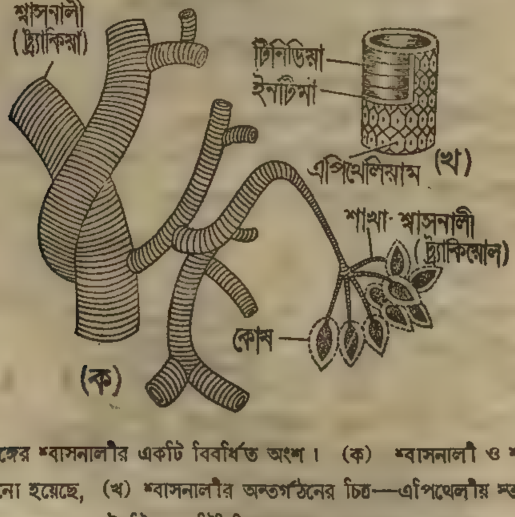

চিত্র 5.31 : পতঙ্গের শ্বাসনালীর একটি বিবর্ধিত অংশ। (ক) শ্বাসনালী ও শাখাশ্বাসনালী দেখানো হয়েছে, (খ) শ্বাসনালীর অন্তর্গঠনের চিত্র—এপিথেলীয় স্তর এবং ইনটিমা ও টিনিডিয়া দেখানো হয়েছে।

(হিমোগ্লোবিন) অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেহের বিভিন্ন কলা-কোষে অক্সিজেন পরিবহণ করে। কই, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি জিওল মাছের ফুলকা ছাড়াও **অতিরিক্ত শ্বাস অঙ্গ থাকে,** যা বায়ু থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করে।

চিংড়ি জাতীয় জলজ সন্ধিপদ প্রাণীদের ফুলকা (চিত্র 5.29) ক্যারাপেস আবরণী দিয়ে আবৃত থাকে। এই ফুলকা, ফুলকা-প্রকোষ্ঠের মধ্যে থাকে। ফুলকা প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে জলের প্রবাহ অব্যাহত থাকে। ফুলকার রক্তজালক এই প্রবহমান জল থেকে

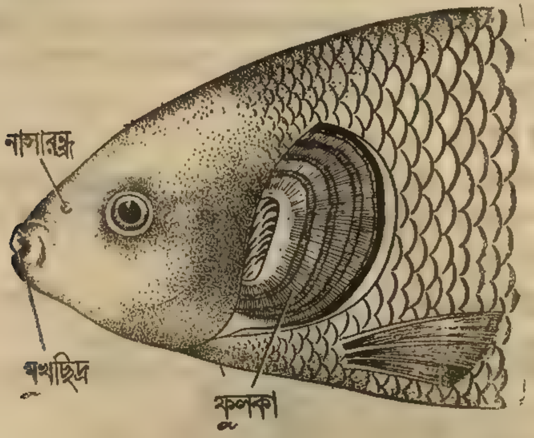

চিত্র 5.32 : মাছের শ্বাস অঙ্গ (ফুলকা)।

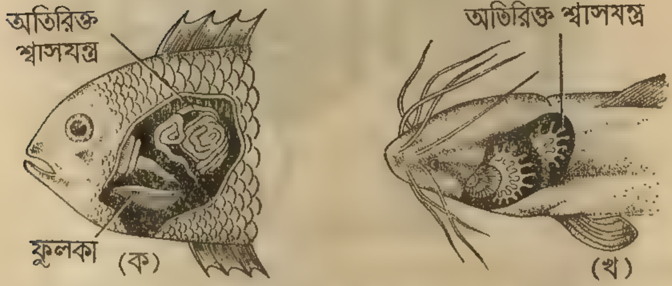

5.33 : জিওল মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র। (ক) কই কাছ, (খ) মাগুর মাছ ।

ব্যাপন ক্রিয়ায় অক্সিজেন শোষণ করে। চিংড়ির শ্বাসকণা হল তাম্র-ঘটিত প্রোটীন যৌগ—হিমোসায়ানিন। চিংড়ির ফুলকা ছাড়াও, কয়েকটি উপাঙ্গে (appendage) অবস্থিত **এপিপোডাইট** নামক উপবৃদ্ধিও শ্বাস অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

গুবরে পোকা, মশা প্রভৃতি পতঙ্গের লার্ভায় শ্বাসনালী-বিশিষ্ট এক বিশেষ ধরনের ফুলকা থাকে, যাকে **শ্বাসনালী ফুলকা** (Tracheal gill) বলে। এই জাতীয় ফুলকা বায়ু থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করে।

(vi) **ফুসফুস** (Lungs) : সমস্ত স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর, যথা—উভচর (পূর্ণাঙ্গ অবস্থায়), সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের শ্বাস অঙ্গ ফুসফুস। এইসব

প্রাণীতে গলবিল-প্রাকার (wall) ভিতরের দিকে বৃদ্ধি পেয়ে থলির মত দুটি ফুসফুসে পরিণত হয়েছে। ফুসফুস বক্ষগহ্বরে অবস্থিত। অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যাপনের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য ফুসফুসের অভ্যন্তরীণ পর্দা অধিক মাত্রায় ভাঁজযুক্ত হয়ে অসংখ্য ছোট ছোট বায়ুস্থলী বা অ্যালভিওলাস (বহুবচন—অ্যালভিওলাই) গঠন করে। এই বায়ুস্থলীগুলির প্রাচীরে অসংখ্য রক্তজালক থাকে। বায়ুস্থলীর বায়ু ও রক্তজালকের রক্তের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যাপন ক্রিয়ায় শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয়।

মানুষের ফুসফুস (Human Lungs) **:**

(i) **অবস্থান :** মানুষের শ্বাস অঙ্গ ফুসফুস বক্ষগহ্বরে অবস্থিত, সংখ্যায় দুটি। ডান ফুসফুস তিনটি খণ্ডে বিভক্ত এবং বাম ফুসফুস দুটি খণ্ডে বিভক্ত।

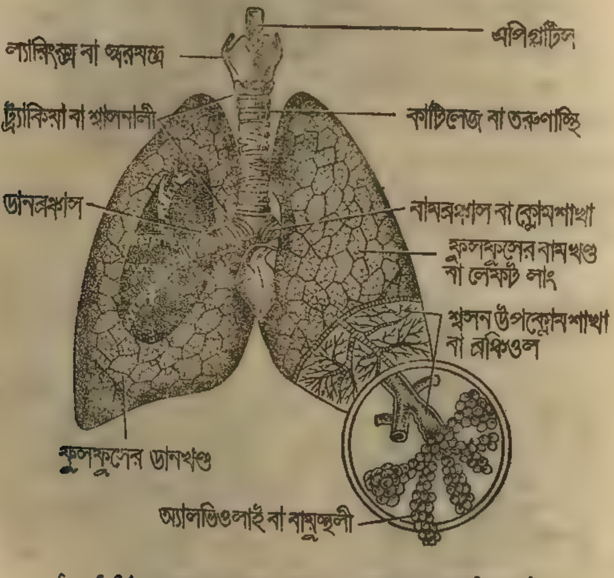

চিত্র 5.34 : মানুষের শ্বাস অঙ্গ—ফুসফুসের অ্যালভিওলাই দেখানো হয়েছে।

ডান ফুসফুসটি আয়তনে বাম ফুসফুস অপেক্ষা বড়। ফুসফুস, প্লুরা (Pleura) নামক একটি দু স্তরবিশিষ্ট আর্দ্র পর্দা দিয়ে আবৃত। প্লুরার ভিতরের স্তরটি ফুসফুসের গাত্রপ্রাচীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে, একে **ভিসেরাল প্লুরা** বলে। আর বাইরের অংশ বক্ষগহ্বরের সঙ্গে লেগে থাকে, একে **প্যারাইটাল প্লুরা** বলে। ভিসেরাল ও প্যারাইটাল প্লুরার মাঝখানের প্লুরাগহ্বর এক রকমের পিচ্ছিল তরল পদার্থের দ্বারা পূর্ণ থাকে।

(ii) **গঠন :** স্বরযন্ত্রের নিচের অংশ প্রসারিত হয়ে **শ্বাসনালী** (Trachea)-তে পরিণত হয় এবং বক্ষগহ্বরে প্রবেশ করে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। এই শাখা

দুটিকে **ক্লোমশাখা বা ব্রংকাই*** (**Bronchi**) বলে। প্রতিটি ক্লোমশাখা ফুসফুসে প্রবেশ করে ছোট ছোট উপশাখায় বিভক্ত হয়, এদের **উপক্লোমশাখা** বা **ব্রংকিওল** (**Bronchiole**) বলে। উপক্লোমশাখাগুলি আবার শাখান্বিত হয়ে **বায়ুস্থলী নালী** (**Alveolar duct**) গঠন করে। বায়ুস্থলী নালীর অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে **অ্যাট্রিয়াম** (**Atrium**) নামক থলির মত আকার ধারণ করে। এক-একটি অ্যাট্রিয়াম বহু **বায়ুস্থলী** (**Alveoli**) পরিবৃত থাকে। প্রতিটি ফুসফুসে অসংখ্য বায়ুস্থলী থাকে। বায়ুস্থলীর গাত্র এক কোষ-স্তরবিশিষ্ট আবরণী কলা দিয়ে তৈরি। বায়ুস্থলীর গাত্রপ্রাচীরে প্রচুর রক্তজালক (**Blood capillaries**) থাকে [চিত্র 5.35]।

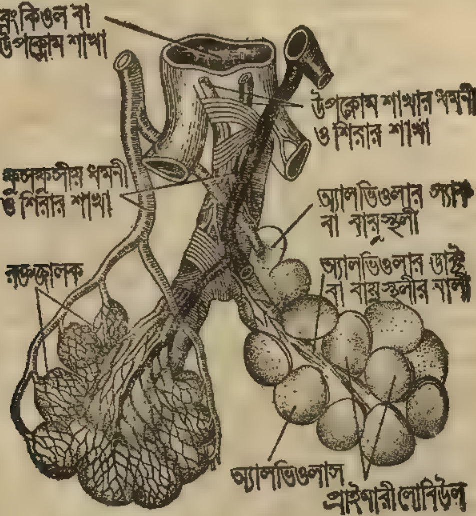

চিত্র 5.35 ঃ মানুষের শ্বাস অঙ্গ—ফুসফুসের অ্যালভিওলাস ও রক্তজালক দেখানো হয়েছে।

(iii) **শ্বাসকার্য ঃ** শ্বাসকার্যের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত শক্তিকে মুক্ত করা। শক্তি ছাড়া কোন কাজ সম্ভব হয় না। শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা এই শক্তির যোগান পাই। এই শক্তি উৎপাদিত হয় আমাদের কোষের মধ্যে। অধিকাংশ প্রাণীতেই অক্সিজেনের সাহায্যে কোষের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্যের দহন ক্রিয়ার ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে-সঙ্গেই কিছুটা পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডও কোষের মধ্যে সৃষ্টি হয়, যেটি আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব দেখা যাচ্ছে, শ্বাসক্রিয়ার জন্য প্রতিটি জীবন্ত কোষে অক্সিজেন পৌঁছানোর এবং সেখান থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণের বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার।

* একবচনে ব্রংকাস (Bronchus)।

বহুকোষী জীবে অধিকাংশ কোষেরই বাইরের পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি যোগ থাকে না। ঐসব কোষে O_2 সরবরাহ এবং সেখান থেকে CO_2-র অপসারণ

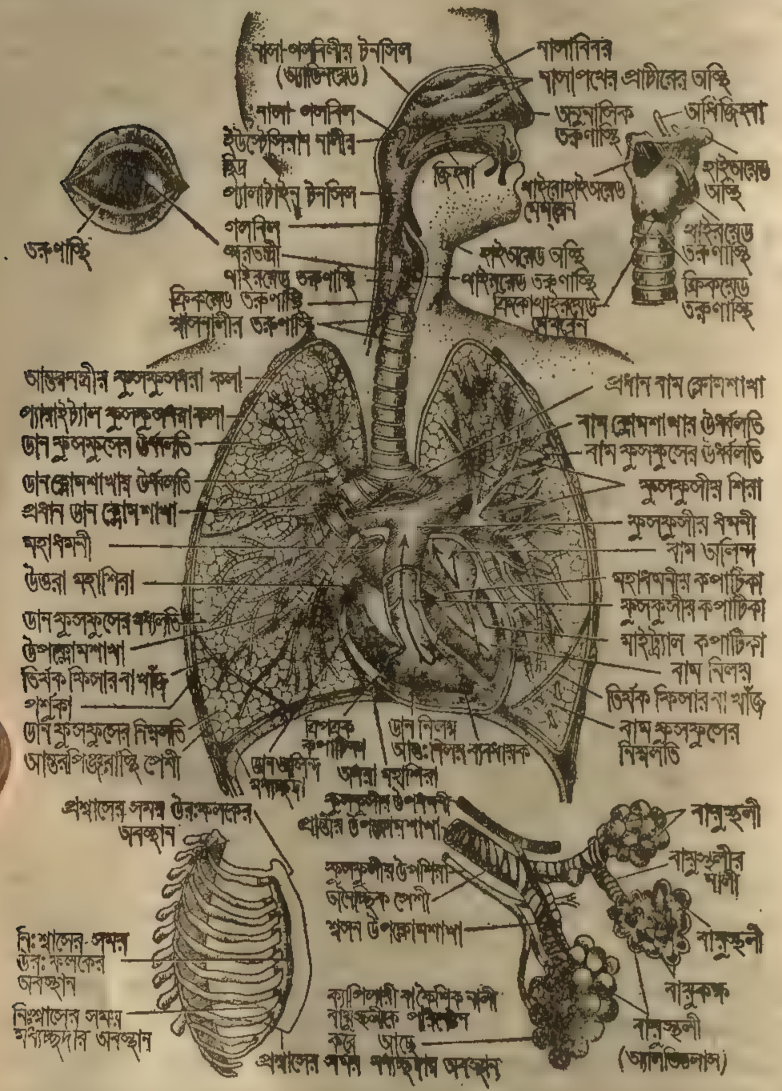

চিত্র 5.36 : মানবদেহের শ্বাস অঙ্গ—ফুসফুসের অবস্থান ও গঠন দেখানো হয়েছে।

শ্বাসতন্ত্র ও রক্ত-সংবহন তন্ত্রের যৌথ ক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। এই ঘটনা দুটি পর্যায়ে ঘটে। উক্ত দুটি পর্যায়কে শারীরবিজ্ঞানীরা **বাহ্য** বা **বহিঃশ্বসন** (External

respiration) এবং **অভ্যন্তরীণ** বা **অন্তঃশ্বসন** (Internal respiration) রূপে আখ্যা দিয়েছেন (চিত্র 5.37)।

বাহ্য বা বহিঃশ্বসন ঃ এই পর্যায়টি ঘটে শ্বাসযন্ত্রে (ফুলকা, ফুসফুস ইত্যাদিতে)। এই পর্যায়ে রক্ত ও বায়ুর মধ্যে O_2 এবং CO_2-র বিনিময় ঘটে—রক্ত বায়ু থেকে O_2 গ্রহণ করে এবং CO_2 ত্যাগ করে।

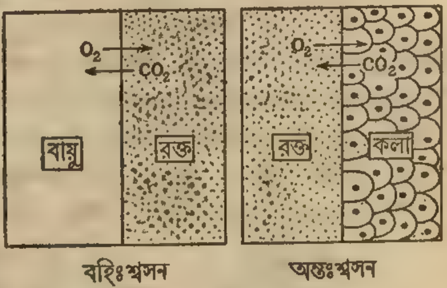

চিত্র 5.37 ঃ বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসনের সময় O_2 এবং CO_2-র বিনিময় দেখানো হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ বা অন্তঃশ্বসন ঃ এই পর্যায়টি ঘটে দেহের বিভিন্ন কলায়। এই পর্যায়ে রক্তজালকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রক্ত ও কলা-কোষের মধ্যে O_2 এবং CO_2-র বিনিময় ঘটে—কোষ রক্ত থেকে O_2 গ্রহণ করে এবং রক্তে CO_2 ত্যাগ করে।

5.27. শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া (Mechanism of Breathing)

বক্ষপেশীর সঞ্চালন দ্বারা বক্ষগহ্বরের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—**প্রশ্বাস** বা **শ্বাসবায়ু গ্রহণ** (Inspiration) এবং **নিঃশ্বাস** বা **শ্বাসবায়ু ত্যাগ** (Expiration)।

প্রশ্বাস ঃ প্রশ্বাসের সময় বক্ষগহ্বরের চারপাশের বিভিন্ন পেশীর সঙ্কোচনের ফলে বক্ষগহ্বরের আয়তন দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর বৃদ্ধি পায়। বক্ষগহ্বরের চারপাশের এই পেশীগুলির মধ্যে **মধ্যচ্ছদা** (Diaphragm), **বহিঃস্থ ইন্টারকস্টাল পেশী** (External intercostal muscle), **অন্তঃস্থ ইন্টারকস্টাল পেশীর অন্তঃতরুণাস্থিময় অংশ** (Inter-cartilaginous portion of internal intercostal muscle), **পশ্চাৎ ক্রকচের উত্তরাপেশী** (Serratus posterior superior muscle), **উত্তোলক পঞ্জরাস্থি প্রান্তপেশী** (Levator costarum) প্রধান।

বক্ষগহ্বর একটি বায়ুরোধক গহ্বর—যার মধ্যে প্রতিটি ফুসফুস প্লুরা (Pleura) নামক একটি পর্দা বা ঝিল্লি দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে ট্র্যাকীয়া বা শ্বাসনালী থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় অবস্থান করে। প্লুরার দুটি স্তর বর্তমান। যে স্তরটি ফুসফুস-সংলগ্ন, তাকে **ভিসেরাল প্লুরা** (Visceral pleura) এবং যে স্তরটি বক্ষগহ্বর-সংলগ্ন, তাকে **প্যারাইটাল প্লুরা** (Parietal pleura) বলে। প্লুরার এই দুটি স্তরের মধ্যে যে অবকাশ (space) বর্তমান, তাকে **প্লুরাল ক্যাভিটি** (Pleural cavity) বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই অবকাশের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। প্লুরার স্তর দুটি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিত এবং প্লুরা কর্তৃক

ক্ষরিত এক পিচ্ছিল তরল পদার্থের পাতলা স্তর দ্বারা এরা পৃথক থাকে। প্লুরার ভিতরের চাপ (Intra-pleural pressure) বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ থেকে কম থাকে বলে ফুসফুস-গাত্র সব সময় বক্ষপ্রাচীর সংলগ্ন থাকে।

বক্ষগহ্বরের প্রাচীর পর্শুকা (Ribs), উরঃফলক (Sternum) এবং মধ্যচ্ছদা দ্বারা গঠিত। এই প্রাচীর উপর-নিচে নড়াচড়া করতে সক্ষম। প্রশ্বাসের সময় উপযুক্ত পেশীর সক্রিয়তায় বক্ষগহ্বর প্রসারিত হয়। মধ্যচ্ছদা হচ্ছে বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বরের মধ্যে অবস্থিত একটি পেশী-নির্মিত পর্দা বা ব্যবধায়ক। স্বাভাবিক অবস্থায় মধ্যচ্ছদা অনেকটা খিলান আকৃতির (arch-shaped)। এর মধ্যে ফ্রেনিক স্নায়ু বিস্তৃত থাকে। নিজস্ব পেশীতন্তুর সঙ্কোচন ঘটিয়ে মধ্যচ্ছদা নিচের দিকে নেমে প্রায় সোজা হয়ে টানটান হয়ে যায়। এতে বক্ষগহ্বর অনুদৈর্ঘ্যে (longitudinally) বৃদ্ধি পায় এবং ফুসফুসের মধ্যে অবস্থিত বায়ুর চাপ কমে যায়। ফুসফুসের মধ্যে অবস্থিত বায়ুর চাপ এভাবে কম হলে বায়ুমণ্ডলের বায়ু শ্বাসনালী, ক্লোমশাখা, উপক্লোম-শাখা, বায়ুস্থলী নালী পথে সজোরে ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে ফুসফুস নিজের স্থিতিস্থাপকতার জন্য প্রসারিত হয় এবং প্রসারিত বক্ষপ্রাচীরকে অনুসরণ করে। মধ্যচ্ছদা টানটান হলে নিচের দিকে নেমে যায় এবং উদরগহ্বরে চাপ দেয়। এই সময় উদরগহ্বরের পেশীগুলি শিথিল হলে উদরগহ্বরের প্রাচীর বাইরের দিকে চালিত হয়। মেরুদণ্ড থেকে পর্শুকাগুলি সামনের দিকে তির্যকভাবে থাকে। ফলে পর্শুকাগুলি বহিঃস্থ ইণ্টারকস্টাল পেশীর সক্রিয় সঙ্কোচনের ফলে উপরের দিকে উঠে এলে উরঃফলক বা স্টারনাম উপরের ও সামনের দিকে চালিত হয় এবং বক্ষগহ্বর অনুপ্রস্থ বরাবর প্রসারিত হয়। পর্শুকাগুলির উত্তোলনে বক্ষগহ্বরের পার্শ্বীয় ব্যাসও বেড়ে যায়। এর প্রধান কারণ হল, যে পর্শুকাগুলি বক্ষগহ্বরের প্রাচীর গঠন করে তাদের আকার সমান নয়, নিচের পর্শুকা থেকে ঠিক তার উপরের পর্শুকাটি অপেক্ষাকৃত বড়। উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য প্রশ্বাসকালে ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাপ সাধারণ বায়ুর চাপ অপেক্ষা কমে যায় বলে বায়ুমণ্ডলের বায়ু সজোরে ফুসফুসে প্রবেশ করে (চিত্র 5.38)।

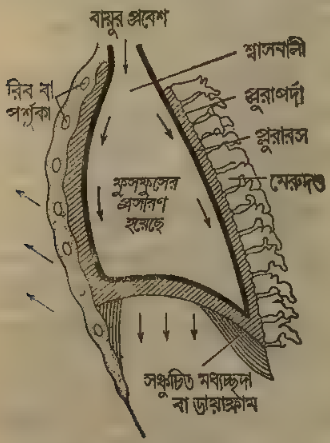

চিত্র 5.38 : প্রশ্বাসকালে ফুসফুসের প্রসারণ।

নিঃশ্বাস : নিঃশ্বাস কার্য নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় দু ধরনেরই হতে পারে। বিশ্রামরত অবস্থায় নিঃশ্বাস কার্যের সময় বক্ষপ্রাচীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনার

জন্য পেশী সঙ্কোচনের প্রয়োজন হয় না। কারণ পশুর্কার তরুণাস্থি, উদর-গহ্বরের প্রাচীর ও ফুসফুসের স্বভাবসিদ্ধ স্থিতিস্থাপকতা এবং এই অঙ্গগুলির ওজন নিঃশ্বাস ঘটানোর জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু কোন কাজ বা পরিশ্রম করার সময় যে নিঃশ্বাস ক্রিয়া হয়, তা একটি সক্রিয় পদ্ধতি এবং এই সময় উদরগহ্বরের **বহিঃস্থ** ও **অন্তঃস্থ অবলিকুয়াস** (External and internal obliquus), **রেক্টাস** (Rectus) এবং **ট্রান্সভারসাস** (Transversus) পেশীগুলি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এই পেশীগুলির সঙ্কোচন উদরগহ্বরের মধ্যে অবস্থিত আন্তর যন্ত্রগুলির উপর চাপ প্রয়োগ করে, ফলে মধ্যচ্ছদা উপরের দিকে উঠে যায়। এছাড়া, **অন্তঃস্থ ইণ্টারকস্টাল পেশী** (Internal intercostal muscle)-গুলির সঙ্কোচনের ফলে পশুর্কাগুলি নিচের দিকে নেমে আসে এবং উরঃফলক বা স্টারনামও নিচের ও ভিতরের দিকে চালিত হয়। বক্ষগহ্বরের আয়তন এভাবে কমে যাওয়ায় প্লুরার অভ্যন্তরীণ চাপ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ফুসফুসের উপর চাপ বৃদ্ধি পায় এবং ফুসফুস থেকে বায়ু নির্গত হয়ে ফুসফুসের আয়তনও কমিয়ে দেয় (চিত্র 5.39)।

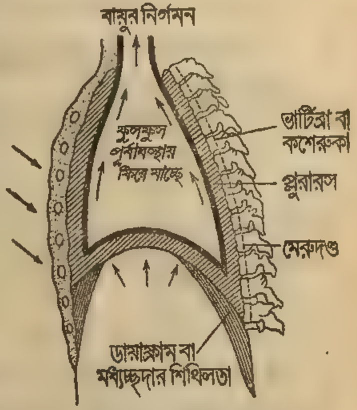

চিত্র 5.39 : নিঃশ্বাসকালে ফুসফুসের সঙ্কোচন।

প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস কার্যের জন্য বক্ষগহ্বরের পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সুষুম্নাশীর্ষক বা মেডুলা অবলংগাটার মধ্যে অবস্থিত প্রশ্বাস কেন্দ্র ও নিঃশ্বাস কেন্দ্র এই কাজে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

বক্ষগহ্বরের পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে ফুসফুসের মধ্যে বায়ুর চাপ যথাক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। বিশ্রামকালীন প্রশ্বাসের সময় ফুসফুসের মধ্যে বায়ুর চাপ 2 থেকে 3 মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের চাপের সমান হ্রাস পায়। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমের সময় এই হ্রাসের পরিমাণ 5 থেকে 10 মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান হয় এবং বলপূর্বক প্রশ্বাসের সময় এই চাপহ্রাস 30 মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান হতে পারে। অনুরূপভাবে, বিশ্রামকালীন নিঃশ্বাসের সময় ফুসফুসের মধ্যে বায়ুর চাপ 2 থেকে 3 মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গ্লটিস (glottis) বন্ধ থাকলে ফুসফুসের মধ্যে বায়ুর চাপ 40 থেকে 100 মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান বৃদ্ধি পেতে পারে।

5.28. সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের পার্থক্য (Differences between photosynthesis and respiration)

সালোকসংশ্লেষ	শ্বসন
1. এটি একটি উপচিতি বা গঠনমূলক বিপাক ক্রিয়া।	1. এটি একটি অপচিতি বা ধ্বংসাত্মক বিপাক ক্রিয়া।
2. কেবল ক্লোরোফিলযুক্ত কোষে সালোকসংশ্লেষ হয়।	2. সমস্ত সজীব কোষে শ্বসন হয়।
3. আলোকের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।	3. আলোক-নিরপেক্ষ।
4. শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়।	4. শর্করাজাতীয় খাদ্য জারিত হয়।
5. শুষ্ক ওজন বৃদ্ধি পায়।	5. শুষ্ক ওজন হ্রাস পায়।
6. আলোকশক্তি শর্করার মধ্যে স্থৈতিক শক্তিরূপে আবদ্ধ হয়।	6. জারণের ফলে খাদ্যের স্থৈতিক শক্তি রাসায়নিক শক্তি ও তাপ শক্তি রূপে মুক্ত হয়।
7. সালোকসংশ্লেষে কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারিত হয়ে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।	7. শ্বসনে গ্লুকোজ জারিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল অথবা কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ইথাইল অ্যালকোহল অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।
8. এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।	8. এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন শোষিত হতেও পারে অথবা নাও হতে পারে।
9. সালোকসংশ্লেষ ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানা ও স্ট্রোমায় হয়ে থাকে।	9. শ্বসন কোষের সাইটোপ্লাজমে শুরু হয় এবং সবাত শ্বসনের শেষ পর্যায় মাইটোকনড্রিয়ায় হয়ে থাকে।
10. সালোকসংশ্লেষে প্রতি গ্রাম-অণু গ্লুকোজের মধ্যে প্রায় 686 K. cal তাপশক্তি সঞ্চিত হয়।	10. সবাত শ্বসনে প্রতি গ্রাম-অণু গ্লুকোজ জারিত হয়ে প্রায় 686 K. cal শক্তি নির্গত হয় এবং অবাত শ্বসনে প্রতি গ্রাম-অণু গ্লুকোজের আংশিক জারণে প্রায় 24-50 K. cal শক্তি নির্গত হয়।

D. পুষ্টি (Nutrition)

5.29. সূচনা (Introduction)

জীবদেহের বিভিন্ন জৈবনিক কার্যকলাপ, যথা—বৃদ্ধি, রেচন, ক্ষয়পূরণ, দেহগঠন প্রভৃতি পরিচালনার জন্য শক্তির প্রয়োজন। জীব খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত স্থৈতিক

শক্তি থেকে এই শক্তির সরবরাহ পেয়ে থাকে। সাধারণত সবুজ উদ্ভিদরা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজেরাই নিজেদের খাদ্য তৈরি করে। প্রাণীরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না, তাই খাদ্যের জন্য তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উদ্ভিদের তৈরি খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ হোক বা প্রাণীই হোক নিজদেহে সংশ্লেষিত বা বাহ্য উৎস থেকে গৃহীত খাদ্যবস্তুকে সরল অবস্থায় কোষের সাইটোপ্লাজমের অংশবিশেষে পরিণত করে, যাকে খাদ্যের **আত্তীকরণ** বলে। খাদ্যবস্তুর সাইটোপ্লাজমের অংশবিশেষে পরিণত করার উদ্দেশ্য হল, এই খাদ্যবস্তুর জারণের মাধ্যমে খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তির মুক্তি ঘটান। এই শক্তিই জীবের জৈবনিক কার্যকলাপে সহায়তা করে। খাদ্যবস্তুর সাইটোপ্লাজমের অংশবিশেষে পরিণত হওয়ার এই প্রক্রিয়াকে **পুষ্টি** বা **পরিপোষণ** বলে।

5.30. পুষ্টির সংজ্ঞা (Definition of nutrition)

● যে পদ্ধতিতে জীব জীবনধারণের জন্য খাদ্যবস্তুকে কোষীয় সাইটোপ্লাজমের অংশবিশেষে পরিণত করে, তাকে পুষ্টি বা পরিপোষণ বলে।

পুষ্টির জন্য যে সমস্ত জৈব ও অজৈব বস্তুর প্রয়োজন হয়, তাদের একত্রে **পোষক** (nutrients) বলে। কার্বোহাইড্রেট বা জল-অঙ্গার, প্রোটীন ও ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থ হল মুখ্য পোষক বা দেহ পরিপোষক। এছাড়া ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল— এগুলি হল দেহ-সংরক্ষক পোষক।

অধিকাংশ উদ্ভিদই যেহেতু নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে—তাই এরা খাদ্যের জন্য স্বনির্ভর, তাই এরা **স্বভোজী** (Autotrophs)। আবার প্রাণীরা সাধারণত খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ বা অন্যান্য প্রাণীর উপর নির্ভরশীল—তাই তারা **পরভোজী** (Heterotrophs)।

5.31. স্বভোজী পুষ্টি (Autotrophic Nutrition)

● অজৈব পোষক থেকে সবুজ উদ্ভিদদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় এবং অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়ার রাসায়নিক সংশ্লেষ (Chemosynthesis) প্রক্রিয়ায় জৈব খাদ্য তৈরি করে পুষ্টি লাভ করার পদ্ধতিকে স্বভোজী পুষ্টি বলে। স্বভোজী পুষ্টির অপর নাম **হলোফাইটিক পুষ্টি** (Holophytic nutrition)।

সবুজ কণা বা ক্লোরোফিলধারী উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জল-অঙ্গার বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন সরল কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য গ্লুকোজ থেকে অন্যান্য শর্করা, শ্বেতসার প্রভৃতি জটিল কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন হয়। আবার কার্বোহাইড্রেট থেকেই বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল তৈরি হয়, যা উৎসেচকের মাধ্যমে স্নেহজাতীয় দ্রব্য ও তৈলে পরিণত হয়। উদ্ভিদ মাটি থেকে মূলের সাহায্যে নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ গ্রহণ করে। এই নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ বিজারিত হয়ে অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়। অ্যামোনিয়া, উৎসেচকের মাধ্যমে, শ্বসনের ফলে উৎপন্ন জৈব অম্ল (organic acid)-এর সঙ্গে

যুক্ত হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড গঠন করে। অনেক অ্যামাইনো অ্যাসিড অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রোটীন তৈরি করে। সংশ্লেষিত কার্বোহাইড্রেট, স্নেহজাতীয় দ্রব্য ও প্রোটীন কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমে মিশে যায় এবং সঞ্চয়কারী অংশে সঞ্চিত থাকে।

সবুজ উদ্ভিদ ছাড়া কিছু সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া রাসায়নিক সংশ্লেষ (Chemo-synthesis) প্রক্রিয়ায় নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে অর্থাৎ তারাও স্বভোজী।

উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য অপরিহার্য মৌলিক উপাদান (Essential elements in Plant Nutrition)ঃ উদ্ভিদ মাটি থেকে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় অজৈব পদার্থ শোষণ করে, যা বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে যুক্ত হয়। পুষ্টির জন্য এই অজৈব পদার্থগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে একত্রে **অপরিহার্য মৌলিক উপাদান** (Essential elements) বলে। এই অপরিহার্য মৌলিক উপাদানগুলি ধাতব অথবা অধাতব হতে পারে। বিভিন্ন ধাতব উপাদান উদ্ভিদ মাটি থেকে খনিজ লবণের আয়ন হিসেবে এবং অধাতব উপাদান কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও নাইট্রেট লবণ হিসেবে পরিবেশ থেকে গ্রহণ করে। এই অপরিহার্য উপাদানগুলির মধ্যে যেগুলি উদ্ভিদ **বেশী পরিমাণে** গ্রহণ করে এবং যাদের অভাবে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, তাদের **অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান বা ম্যাক্রো-এলিমেন্ট** (Macro-elements) বলে। এই ম্যাক্রো-এলিমেন্টগুলি হল—C, H, O, P, S, K, N, Ca, Fe, Mg। অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান বা ম্যাক্রো—এলিমেন্টগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি মৌলিক উপাদান উদ্ভিদদেহে খুব **অল্প পরিমাণে** প্রয়োজন হয়, এদের **মাইক্রো-এলিমেন্ট** বা **ট্রেস এলিমেন্ট** (Micro-elements or Trace elements) বলে। এদের মধ্যে Mn, Zn, Cu, B, Si, Al, Mo প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মাইক্রো-এলিমেন্টগুলি উৎসেচক, ভিটামিন প্রভৃতির আবশ্যকীয় অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

● উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের প্রয়োজনীয়তা ঃ

কার্বন (C)ঃ বিভিন্ন জৈব পদার্থ মাত্রই কার্বন দিয়ে তৈরি। কার্বন ছাড়া জীবকোষ তথা জীবদেহ গঠিত হয় না।

হাইড্রোজেন (H_2)ঃ জৈব পদার্থের আর একটি অপরিহার্য উপাদান হল হাইড্রোজেন। কোষের সাইটোপ্লাজমের প্রধান উপাদান জল, যা হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত।

অক্সিজেন (O_2)ঃ উদ্ভিদের সমস্ত খাদ্যবস্তুই অক্সিজেন দিয়ে তৈরি এবং সবাত শ্বসনে খাদ্যের জারণের জন্যও অক্সিজেন প্রয়োজন।

ফসফরাস (P)ঃ এটি নিউক্লিওপ্রোটীন গঠনে সাহায্য করে। এর অভাবে শ্বসনে বিঘ্ন ঘটে।

সালফার (S)ঃ এটি খাদ্য পরিবহণ ও প্রোটীন সংশ্লেষে সাহায্য করে এবং উদ্ভিদের শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

পটাসিয়াম (K)ঃ এর অভাবে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং এটি কোষের অভিস্রবণ চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

নাইট্রোজেন (N_2) : এটি অ্যামাইনো অ্যাসিড তথা প্রোটীনের অন্যতম প্রধান উপাদান। বিভিন্ন ভিটামিন; উৎসেচক, নিউক্লিওপ্রোটীন প্রভৃতি তৈরিতেও নাইট্রোজেন প্রয়োজন।

ক্যালসিয়াম (Ca) : এটি উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর, মধ্যচ্ছদা ও প্রোটোপ্লাজম গঠনে সহায়তা করে।

লোহ (Fe) : লোহ ক্লোরোফিলের প্রধান উপাদান। তাছাড়া, শ্বসন ও বিভিন্ন খনিজ লবণ শোষণে লোহ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

ম্যাগনেসিয়াম (Mg) : এটিও ক্লোরোফিলের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান।

● উদ্ভিদের স্বভোজী পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির উৎস :

(i) **কার্বন (C) :** বায়ুমণ্ডলের CO_2 অথবা জলে দ্রবীভূত CO_2।

(ii) **হাইড্রোজেন (H_2) :** জল।

(iii) **অক্সিজেন (O_2) :** বায়ু ও জল। মাটিতে উপস্থিত বিভিন্ন অক্সাইড ও লবণ থেকেও অক্সিজেন গৃহীত হয়।

(iv) **ফসফরাস (P) :** মাটিতে উপস্থিত বিভিন্ন ফসফেট।

(v) **সালফার (S) :** মাটিতে উপস্থিত বিভিন্ন সালফেট।

(vi) **নাইট্রোজেন (N_2) :** মাটিতে ও জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়া লবণ।

(vii) **পটাসিয়াম (K), ক্যালসিয়াম (Ca), লোহ (Fe), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), ম্যাঙ্গানিজ (Mn), জিংক (Zn) :** মাটিতে উপস্থিত এইসব খনিজের নিজ-নিজ লবণ।

(viii) **বোরন (B) :** মাটিতে উপস্থিত বোরেট।

বাকী সব উপাদানের উৎসও প্রধানত মাটি।

5.32. পরভোজী পুষ্টি (Heterotrophic Nutrition)

● যে পুষ্টি পদ্ধতিতে বাহ্য কোন উৎস থেকে গৃহীত খাদ্যের মাধ্যমে জীব পুষ্ট হয়, তাকে পরভোজী পুষ্টি বলে।

সবুজকণা বা ক্লোরোফিলবিহীন উদ্ভিদসহ সমস্ত প্রাণিকুল নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না বলে, বাহ্য কোন উৎস থেকে এদের খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। যেহেতু এরা বাহ্য উৎস থেকে গৃহীত খাদ্যে পুষ্ট হয়, তাই এদের পুষ্টি পদ্ধতিকে **পরভোজী পুষ্টি** বলে।

পরভোজী পুষ্টিকে নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় :

(1) **পরজীবীয় পুষ্টি** (Parasitic Nutrition) : পরজীবী জীবেরা অন্য কোন আশ্রয়দাতা জীব বা পোষক (Host)-এর উপর আশ্রয় ও খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল। এ ধরনের পুষ্টি পদ্ধতিতে পরজীবী আশ্রয়দাতার কোন উপকার করে না, বরং আশ্রয়দাতার ক্ষতি করে।

পুষ্টি পদ্ধতি অনুযায়ী পরজীবী দু ধরনের হতে পারে। যেমন—(i) পূর্ণ

পরজীবী (Total parasite) এবং (ii) **আংশিক পরজীবী** (Partial parasite)। স্বর্ণলতা, বেনেবৌ, র‍্যাফেলসিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদ এবং গোলকৃমি, ফিতাকৃমি প্রভৃতি প্রাণী পূর্ণ পরজীবী। আবার ভিসকাম, ক্যাসিথা প্রভৃতি উদ্ভিদ আংশিক পরজীবী। পূর্ণ পরজীবী উদ্ভিদ স্বর্ণলতা এক ধরনের অস্থানিক মূলের সাহায্যে পোষকের নালিকা বাণ্ডিলের, প্রধানত ফ্লোয়েম কলা, থেকে খাদ্য শোষণ করে। এ ধরনের অস্থানিক মূলকে **শোষক বা চোষক মূল** (Haustoria) বলে।

আবার, পোষকের দেহে **বসবাসের স্থান** অনুযায়ী পরজীবী দু ধরনের হতে পারে। যেমন—(i) **বহিঃপরজীবী** (External parasite)—এরা পোষকের দেহের বহির্ভাগে বাস করে। (ii) **অন্তঃপরজীবী** (Internal parasite)—এরা পোষকের দেহের ভিতরে বাস করে। স্বর্ণলতা, উকুন প্রভৃতি বহিঃপরজীবী এবং গোল-আলুর ধ্বসা রোগের পরজীবী ছত্রাক ফাইটোপ্থোরা, ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্লাসমোডিয়াম প্রভৃতি অন্তঃপরজীবীর উদাহরণ।

> ● **কোন জীব কর্তৃক অন্য জীবের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে আশ্রয়দাতার দেহ থেকে একতরফাভাবে খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে পুষ্টি সাধনের পদ্ধতিকে পরজীবীয় পুষ্টি বলে।**

(2) **মৃতজীবীয় পুষ্টি** (Saprozoic or Saprophytic Nutrition): যে সমস্ত জীব মৃত ও গলিত জৈব পদার্থের উপর জন্মায় এবং সেখান থেকে তরল ও সরল খাদ্যোপাদান শোষণ করে নিজেদের পুষ্টি সাধন করে, তাদের **মৃতজীবী** বলে এবং এ ধরনের পুষ্টি পদ্ধতিকে **মৃতজীবীয় পুষ্টি** বলে। প্রাণীর এ ধরনের পুষ্টিকে **স্যাপ্রোজোইক পুষ্টি** (Saprozoic nutrition) এবং উদ্ভিদের এ ধরনের পুষ্টিকে **স্যাপ্রোফাইটিক পুষ্টি** (Saprophytic nutrition) বলে। এ ধরনের পুষ্টি ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ, যেমন—অ্যাগারিকাস (ব্যাঙের ছাতা), ব্যাকটিরিয়া, মোনোসিস্টিস নামক প্রাণীতে দেখা যায়।

> ● **মৃত ও পচনশীল জৈব বস্তুসমূহকে দেহের বাইরে পরিপাক করে এবং পরিপাক হওয়া বস্তুগুলিকে শোষণ করে পুষ্টি লাভ করার পদ্ধতিকে মৃতজীবীয় পুষ্টি বলে।**

(3) **মিথোজীবীয় পুষ্টি** (Symbiotic Nutrition): যখন দুটি জীব পারস্পরিক সাহচর্যে বেঁচে থাকে এবং পুষ্ট হয় তখন সেই ধরনের পুষ্টি পদ্ধতিকে **মিথোজীবীয় পুষ্টি** বলে। পরস্পরের উপর নির্ভরশীল জীব দুটিকে **মিথোজীবী** বা **অন্যোন্যজীবী** (Symbionts) বলে।

লাইকেন নামক এক ধরনের উদ্ভিদ গোষ্ঠী ছত্রাক ও শৈবালের সমন্বয়ে গঠিত। ছত্রাক অংশ লাইকেনকে নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে এবং জল ও খনিজ লবণ শোষণ করে; শৈবাল অংশ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। ঐ খাদ্যে ছত্রাক ও শৈবাল উভয়েই পুষ্ট হয়। উদাহরণ—**উসনিয়া** নামক লাইকেন।

কতকগুলি আদ্যপ্রাণী বা প্রোটোজোয়া* শাকাশী প্রাণীর (গরু) অন্ত্রে মিথোজীবী হিসেবে বাস করে সেলুলোজ পাচনে সাহায্য করে, কারণ ঐ সমস্ত শাকাশী প্রাণীর অন্ত্রে সেলুলেজ নামক উৎসেচক থাকে না। এই সাহায্যের পরিবর্তে শাকাশী প্রাণীরা উক্ত প্রোটোজোয়াদের আশ্রয় ও খাদ্য দেয়।

● যখন দুটি জীব একে অপরের দেহ-সংলগ্ন থেকে পারস্পরিক সাহায্যের বিনিময়ে পুষ্টি লাভ করে তখন সেই পুষ্টি পদ্ধতিকে মিথোজীবীয় পুষ্টি বলে।

(4) **পতঙ্গভুক উদ্ভিদের পুষ্টি** (Nutrition of the Insectivorous Plants) ঃ ঘটপত্রী বা কলসপত্রী উদ্ভিদ (**Pitcher plant**), সূর্যশিশির (**Sundew**), ঝাঁঝি (**Bladder wort**) প্রভৃতি সবুজ উদ্ভিদ মৃত্তিকার নাইট্রোজেন জাতীয় কোন

চিত্র 5.40 ঃ মৃতজীবী, পরজীবী ও পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ।
(ক) স্বর্ণলতা, (খ) অ্যাগারিকাস (ব্যাঙের ছাতা), (গ) ড্রসেরা (সূর্যশিশির),
(ঘ) ইউট্রিকুলারিয়া (ঝাঁঝি), (ঙ) কলসপত্রী, (চ) রাস্না।

পদার্থ গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং সালোকসংশ্লেষের ফলে শর্করা জাতীয় খাদ্য নিজদেহে তৈরি করলেও, নাইট্রোজেনের জন্য কীট-পতঙ্গ জাতীয় ছোট ছোট প্রাণীর

* *Isotricha* নামে সিলিয়োফোরা শ্রেণীভুক্ত প্রাণী।

উপর নির্ভরশীল। ঘটপত্রী উদ্ভিদের পাতার অগ্রভাগ ঘটের মত পরিবর্তিত হয় এবং ঘটের পিচ্ছিল ঢাকনায় কীট-পতঙ্গ বসা মাত্র ঘটের ভিতর পড়ে যায়। সূর্যশিশিরের কর্ষিকাযুক্ত পাতায় পতঙ্গ বসলেই আঠালো কর্ষিকার দ্বারা আবদ্ধ হয়। পাতা ঝাঁঝির থলির মত রূপান্তরিত পাতার ফাঁদ-দুয়ার দিয়ে পতঙ্গ ভিতরে প্রবেশ করলে বাঁধা পড়ে। সব ক্ষেত্রেই ধরা পড়ার পর ফাঁদগুলি থেকে প্রোটীন বিশ্লেষণকারী উৎসেচক নিঃসৃত হয়ে প্রোটীনকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে, যা পরে পত্রতল দিয়ে উদ্ভিদদেহে শোষিত হয়।

(5) **হলোজোয়িক পুষ্টি** (Holozoic Nutrition): পরভোজী জীবেরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। তাই জটিল খাদ্যবস্তু অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ বা দেহাংশ থেকে গ্রহণ করে। এই জটিল খাদ্যোপাদান গ্রহণ করার পর সরাসরি কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমের অংশবিশেষে পরিণত হতে পারে না অর্থাৎ খাদ্যোপাদানের সরাসরি আত্তীকরণ হয় না। তাই এই জটিল খাদ্যবস্তুকে কোষের পক্ষে শোষণ ও গ্রহণযোগ্য সরল অবস্থায় পরিণত করে নিতে হয়। এটি প্রধানত প্রাণীদের পুষ্টি পদ্ধতি। সুতরাং, **যে পুষ্টি পদ্ধতিতে প্রাণীরা অন্য জীবকে অথবা অন্য জীবের দ্বারা সংশ্লেষিত খাদ্যবস্তুকে কঠিন অবস্থায় গ্রহণ করে নিজেদের পুষ্টি সাধন করে, তাকে হলোজোয়িক পুষ্টি বলে।**

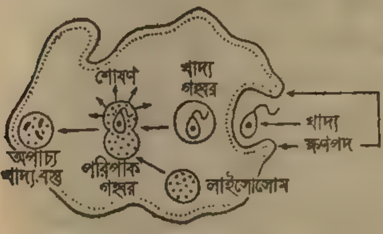

চিত্র 5.41 : অ্যামিবার অন্তঃকোষীয় পরিপাক।

এই পুষ্টি পদ্ধতি কয়েকটি ক্রমিক পর্যায়ে বিভক্ত, যেমন—(i) **খাদ্যগ্রহণ** (Ingestion), (ii) **পরিপাক** (Digestion), (iii) **শোষণ** (Absorption), (iv) **আত্তীকরণ** (Assimilation) এবং (v) **অপাচ্য অংশের বহিষ্করণ** (Egestion)।

(i) **খাদ্যগ্রহণ** (Ingestion): এই পদ্ধতিতে জীব বাহ্য কোন উৎস থেকে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি বিভিন্ন রকম। যেমন, অ্যামিবা নামক এককোষী প্রাণী বা আদ্যপ্রাণী ক্ষণপদের সাহায্যে, প্যারামিসিয়াম নামক এককোষী প্রাণী সিলিয়া বা রোমের সাহায্যে দেহের দিকে জলস্রোত সৃষ্টি করে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। এককোষী বা আদ্যপ্রাণীদের গৃহীত খাদ্যবস্তুকে নিয়ে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে একটি খাদ্য-গহ্বর সৃষ্টি হয়। হাইড্রা নামক জলজ বহুকোষী প্রাণী কর্ষিকার (Tentacle) সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে। কর্ষিকায় অবস্থিত বিভিন্ন রকম নিডোব্লাস্ট (Cnidoblast) কোষ, শিকারকে হিপনোটক্সিন (Hypnotoxin) নামক বিষাক্ত তরল দিয়ে অসাড় করে এবং কর্ষিকার মাধ্যমে মুখছিদ্রের ভিতর প্রবেশ করায়। স্পঞ্জ সরাসরি কতকগুলি ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষ বা **কলার কোষ** (Collar cell)-এর মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করে এবং সেখানে খাদ্য পাচিত হয়। **কিটোপ্টেরা** (*Chaetoptera*) নামক প্রাণী মুখ-নিঃসৃত মিউকাস দিয়ে জলের মধ্যে আঠালো জালকের মত ফাঁদ তৈরি করে শিকার ধরে। কেঁচো গলবিলের

মাংসপেশীর সাহায্যে খাদ্য ভক্ষণ করে। আরশোলা, চিংড়ি প্রভৃতি প্রাণীরা মুখ উপাঙ্গের সাহায্যে খাদ্যকে টুকরো টুকরো করে ভক্ষণ করে। মশা, মৌমাছি, মাছি

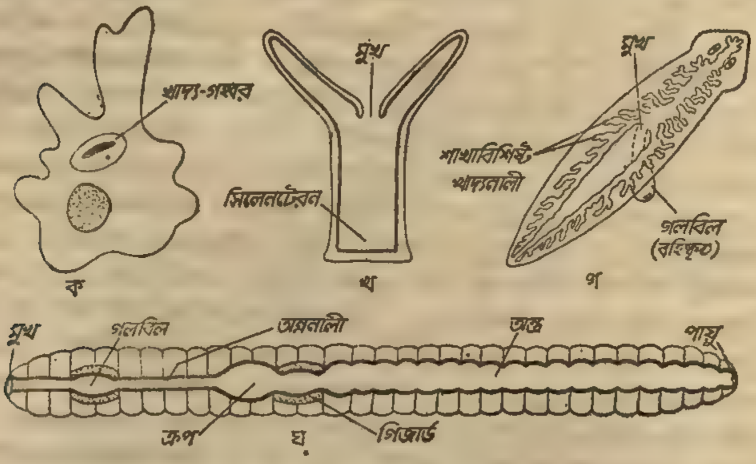

চিত্র 5.42 ঃ কয়েকটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পুষ্টিতে অংশগ্রহণকারী অঙ্গ।
(ক) অ্যামিবা, (খ) হাইড্রা, (গ) চ্যাপ্টা কৃমি, (ঘ) কেঁচো।

প্রভৃতি পতঙ্গ চোষক নলের (proboscis) সাহায্যে খাদ্য শোষণ করে। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে নানা ধরনের খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ব্যাঙ আঠালো জিভের সাহায্যে (চিত্র 5.43), পাখী চঞ্চুর সাহায্যে, মাছ, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি প্রাণীরা সুগঠিত চোয়াল ও ঠোঁটের সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে।

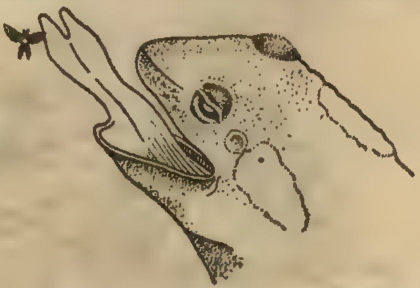

চিত্র 5.43 ঃ জিহ্বার সাহায্যে ব্যাঙের খাদ্যগ্রহণ।

(ii) **পরিপাক** (Digestion) ঃ খাদ্যবস্তুর কোষীয় সাইটোপ্লাজমের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিণত হওয়াকেই **পরিপাক** বা **পাচন** বলে। জীবজগতে দু রকম পরিপাক পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়, যথা—(a) **অন্তঃকোষীয় পরিপাক** (Intracellular digestion) এবং (b) **বহিঃকোষীয় পরিপাক** (Extracellular digestion)।

(a) **অন্তঃকোষীয় পরিপাক** (Intracellular digestion) ঃ কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে জটিল খাদ্যবস্তুর জীর্ণ হওয়াকে **অন্তঃকোষীয় পরিপাক** বলে। অ্যামিবায় খাদ্যবস্তু প্রোটোপ্লাজমের খাদ্য-গহ্বরের (Food vacuole) মধ্যে উৎসেচক দ্বারা পরিপাক হয় (চিত্র 5.41 দ্রষ্টব্য)। অ্যামিবা ছাড়া স্পঞ্জেও পাচন ক্রিয়া কলার

কোষ (Collar cells) নামে একপ্রকার কোষের খাদ্য-গহ্বরের মধ্যে হয়ে থাকে। হাইড্রার দেহের ভিতরে অবস্থিত এবং মুখছিদ্রের সঙ্গে যুক্ত সিলেনটেরন নামক নলের পরিধিতে অবস্থিত কিছু কোষ খাদ্যের কিছু অংশ অন্তঃকোষীয় পরিপাক পদ্ধতিতে পাচিত করে।

(b) **বহিঃকোষীয় পরিপাক** (Extracellular digestion): যে পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু কোষের বাইরে বিশেষ অঙ্গের মধ্যে পাচিত হয়, তাকে **বহিঃকোষীয় পরিপাক** বলে। হাইড্রার খাদ্যবস্তুর কিছু অংশ সিলেনটেরন নামক নালীতে গ্রন্থিকোষ থেকে নিঃসৃত উৎসেচকের সাহায্যে বহিঃকোষীয় পরিপাক পদ্ধতিতে পাচিত হয়। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীতে খাদ্যনালীর বা পৌষ্টিক নালীর মধ্যে বহিঃকোষীয় পরিপাক পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তুর পাচন হয়। খাদ্যনালীর বিভিন্ন অংশ খাদ্যের পরিপাকের জন্য বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। খাদ্যবস্তু পৌষ্টিক নালীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় বিভিন্ন পাচন গ্রন্থির উৎসেচক দ্বারা খাদ্যের পরিপাক হয়। এই খাদ্যনালীর দৈর্ঘ্য বিভিন্ন প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। খাদ্যনালীর ভিতরের দিক একটি **শ্লেষ্মাঝিল্লি** (mucous membrane) দিয়ে আবৃত থাকে। এই আবরণী স্তরে বহু বহিঃক্ষরা গ্রন্থি ও শোষণে সক্ষম কোষ থাকে। এই গ্রন্থিগুলি থেকে বিভিন্ন পাচক রস নির্গত হয়ে খাদ্যের পাচনে সাহায্য করে এবং শোষণে সক্ষম কোষগুলি পাচিত খাদ্যরস শোষণ করে সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে তা দেহের বিভিন্ন কলাকোষে প্রেরণ করে। সেখানে ঐ রসের আত্তীকরণ ঘটে।

নিচে মানবদেহে খাদ্য পরিপাক পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

খাদ্য মুখগহ্বরে প্রবেশ করার পর খাদ্যবস্তু দাঁতের সাহায্যে পিষ্ট হয় এবং মুখবিবরের লালা গ্রন্থি-নিঃসৃত লালার সঙ্গে মিশে নরম ও পিচ্ছিল হয়। লালার মিউসিন খাদ্যকণাকে পিচ্ছিল করে এবং লালার সঙ্গে অবস্থিত উৎসেচক **টায়ালিন** (Ptyalin) খাদ্যের শ্বেতসার অংশকে প্রথমে ডেক্সট্রিন ও পরে মলটোজে (Maltose) পরিণত করে। লালার **লাইসোজাইম** উৎসেচক খাদ্যের ব্যাকটিরিয়াকে ধ্বংস করে।

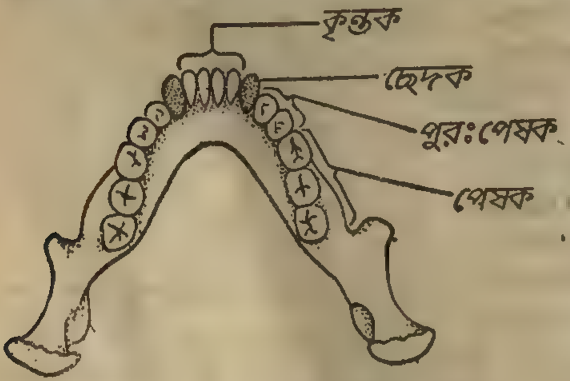

চিত্র 5.44: মানুষের বিভিন্ন প্রকার দাঁত (নিচের চোয়াল দেখানো হয়েছে)।

এর পর খাদ্যবস্তু চর্বিত ও লালামিশ্রিত অবস্থায় গ্রাসনালীর মধ্য দিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। পাকস্থলীর ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যখণ্ড বিশেষভাবে আলোড়িত হয় এবং পাকস্থলীর **পাচক রসের** (Gastric juice) সঙ্গে মিশ্রিত

হয়। পাকস্থলীর শ্লেষ্মাস্তর থেকে নিঃসৃত হরমোন **গ্যাস্ট্রিন** (Gastrin) রক্তে মিশে পাকস্থলীর পাচক রস ক্ষরণে উদ্দীপনা যোগায়। পাকস্থলীর গাত্র-প্রাচীরে অবস্থিত পাচক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পাচক রসে জল, মিউসিন, খনিজ লবণ, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (0·2%) এবং উৎসেচক **পেপসিনোজেন** ও লাইপেজ থাকে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাদ্যের সঙ্গে প্রবিষ্ট জীবাণু নাশ করে এবং প্রোটীন খাদ্যের পরিপাকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অম্লত্বে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত হলে, তা প্রোটীনকে প্রোটিওজ এবং পেপটোনে পরিণত করে। মানুষের পাকস্থলীতে রেনিন নেই বলে পেপসিন দুগ্ধ-প্রোটীন ক্যাসিনোজেনকে কেসিনে পরিণত করে এবং পরে কেসিন প্রোটিওজ, পেপটোন ও পলিপেপটাইডে পরিণত হয়। লাইপেজ কিছু স্নেহ দ্রব্যকে ভেঙ্গে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

পাকস্থলীর অর্ধজীর্ণ খাদ্যবস্তুকে **পাকমণ্ড** (Chyme) বলে, যা পাকস্থলীর পরবর্তী অংশ **গ্রহণী** বা **ডুওডেনাম** (Duodenum)-এ প্রবেশ করে। গ্রহণীতে পাকমণ্ড আসার পর যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি দুটি থেকে নিঃসৃত হয় এবং গ্রহণীতে আম্লিক পাকমণ্ডের সঙ্গে মিশে যায়। যকৃৎ থেকে পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস পাকমণ্ডের সঙ্গে মিশে রাসায়নিক ক্রিয়া শুরু করে। পিত্তে কোন উৎসেচক

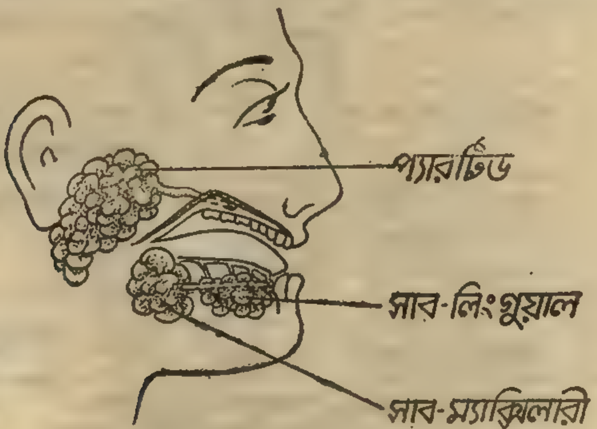

চিত্র 5.45 : মানুষের লালাগ্রন্থি।

থাকে না, কিন্তু পিত্ত তীব্র ক্ষারধর্মী হওয়ায়, পাকমণ্ডের অম্লত্ব নষ্ট হয়ে তা প্রশমিত হয়। অতঃপর অগ্ন্যাশয় রসের উৎসেচকগুলি ক্ষারীয় মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হয়। অগ্ন্যাশয় রসে জল (98·5%), সোডিয়াম বাইকার্বনেট ($NaHCO_3$) এবং উৎসেচক **ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, কার্বক্সিপেপটাইডেজ, ইলাস্টেজ, কোলাজিনেজ, অ্যামাইনো পেপটাইডেজ, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, সুক্রেজ, ল্যাক্টেজ, মলটেজ** ও **নিউক্লিয়েজেস** প্রভৃতি থাকে। ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন অপরিবর্তিত প্রোটীনকে ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিণত করে। কার্বক্সিপেপটাইডেজ পলিপেপটাইডকে

ভেঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। অ্যামাইনো পেপটাইডেজ, কোলাজিনেজ, ইলাস্টেজ ইত্যাদি পেপটাইডকে ভেঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। অ্যামাইলেজ, শ্বেতসারকে ভেঙ্গে মলটোজ ও আইসোমলটোজে পরিণত করে। সুক্রেজ, সুক্রোজকে গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজে পরিণত করে। লাইপেজ স্নেহজাতীয় খাদ্যকে গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত করে। মলটেজ, মলটোজকে ভেঙ্গে গ্লুকোজে পরিণত করে। ল্যাকটেজ, ল্যাকটোজকে গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজে পরিণত করে। নিউক্লিয়েজ নিউক্লিক অ্যাসিডকে নিউক্লিওটাইডে পরিণত করে।

নিচে বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট, প্রোটীন ও স্নেহ পদার্থ পরিপাককারী উৎসেচকের নাম, তাদের উৎস, কোন্ সাবস্ট্রেটের উপর কাজ করে, বিক্রিয়ালব্ধ ফল এবং বিক্রিয়াস্থল ছকের মাধ্যমে দেখানো হল :

কি ধরনের উৎসেচক	উৎসেচকের নাম	উৎস	সাবস্ট্রেটের নাম	বিক্রিয়ালব্ধ ফল	কোথায় বিক্রিয়া ঘটে
কার্বোহাইড্রেট গোষ্ঠী বা অ্যামাইলো-লাইটিক উৎসেচক	টায়ালিন	লালাগ্রন্থি	সিদ্ধ শ্বেতসার	মলটোজ	মুখবিবর
	অ্যামাইলেজ	অগ্ন্যাশয়	শ্বেতসার	মলটোজ	ক্ষুদ্রান্ত্র
	সুক্রেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	সুক্রোজ	গ্লুকোজ ও কটোজ	ক্ষুদ্রান্ত্র
	ল্যাকটেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	ল্যাকটোজ	গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ	ক্ষুদ্রান্ত্র
	মলটেজ	অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক গ্রন্থি	মলটোজ	গ্লুকোজ	ক্ষুদ্রান্ত্র
প্রোটীনেজ গোষ্ঠী বা প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক	পেপসিন	পাকগ্রন্থি	প্রোটীন	পেপটোন	পাকস্থলী
	*রেনিন	পাকগ্রন্থি	দুগ্ধ প্রোটীন	কেসিন	পাকস্থলী
	ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	পেপটোন	পেপটাইড	ক্ষুদ্রান্ত্র
	ইরেপসিন	আন্ত্রিক গ্রন্থি	পেপটাইড	অ্যামাইনো অ্যাসিড	ক্ষুদ্রান্ত্র
লাইপেজ গোষ্ঠী বা লাইপোলাইটিক উৎসেচক	লাইপেজ	অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক গ্রন্থি	ফ্যাট	ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল	ক্ষুদ্রান্ত্র

* রেনিন মানুষের পাকস্থলীতে থাকে না, তবে শিশুদের পাকস্থলীতে এর উপস্থিতি আছে বলে অনুমান করা হয়।

(iii) **শোষণ (Absorption) :** বহিঃকোষীয় পরিপাক পদ্ধতিতে উৎপন্ন সরল খাদ্যোপাদান ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের গাত্র-প্রাচীরের অঙ্গুলীবৎ প্রবর্ধক ভিলাই-এর মাধ্যমে শোষিত হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল ছাড়া বাকী তরল খাদ্যরস

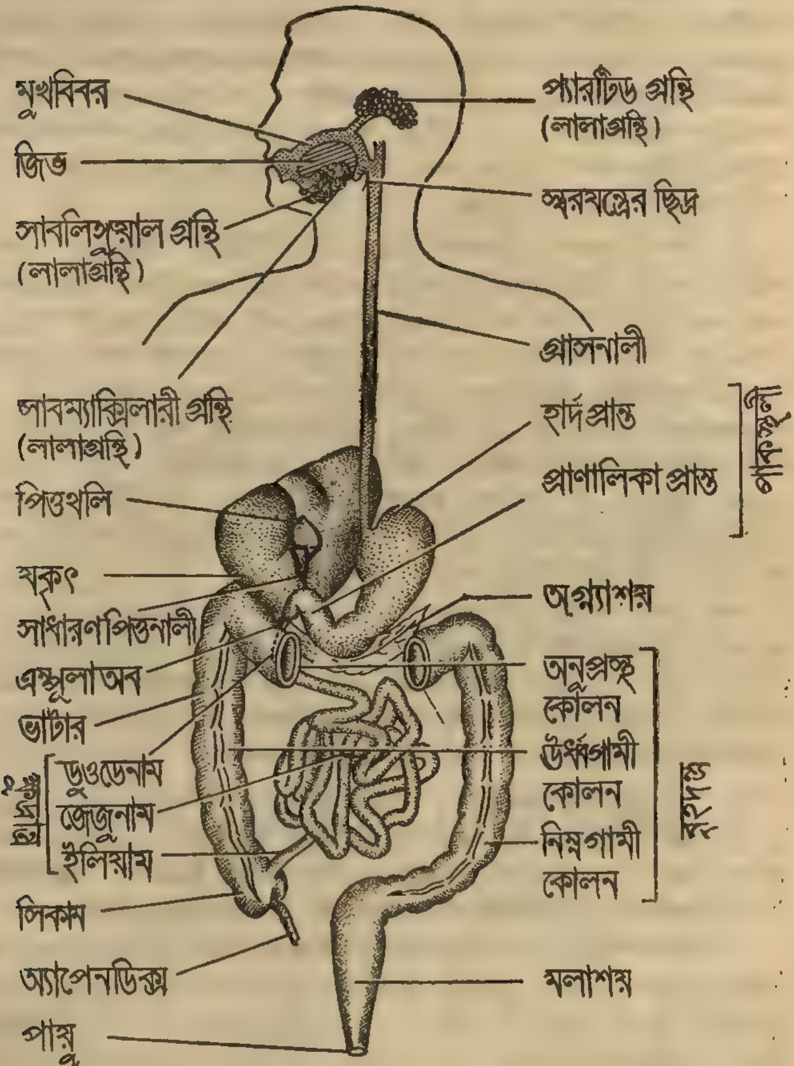

চিত্র 5.46 : মানুষের পৌষ্টিক তন্ত্র।

ভিলাই-এর রক্তজালক (Blood capillary) দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল ভিলাই-এর লসিকা জালক (Lymph capillary) বা পয়স্বিনী বা ল্যাকটিয়েলের (Lacteals) মধ্য দিয়ে শোষিত হয়। রক্তের মাধ্যমে

শোষিত খাদ্যরস যকৃতে পৌঁছায় এবং বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে পুনরায় রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন কলাকোষের সাইটোপ্লাজমে পৌঁছায়।

(iv) **আত্তীকরণ** (Assimilation)ঃ রক্তের মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্যোপাদান কলা-কোষে পৌঁছালে কোষগুলি ঐ খাদ্যোপাদানগুলিকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করে। প্রতিটি কোষের মধ্যে এই সরল খাদ্যোপাদানগুলি বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ায় উৎসেচকের সহায়তায় পুনরায় বিভিন্ন জটিল পদার্থে পরিণত হয়। যেমন—অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি থেকে প্রোটীন, গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন এবং ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে ফ্যাট উৎপন্ন হয়। এই পদার্থগুলি পরে কোষীয় অংশে পরিণত হয়।

(v) **অপাচ্য অংশের বহিষ্করণ** (Egestion)ঃ বিভিন্ন উৎসেচকের ক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তু পাচিত হয়ে সরল খাদ্যোপাদানে পরিণত হলেও খাদ্যের কিছু অংশ অজীর্ণ বা অপাচ্য অবস্থায় থেকে যায়। এই অজীর্ণ খাদ্যাংশ ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে ধীরে ধীরে পৌষ্টিক নালীর ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে বৃহদন্ত্রে (Large intestine) প্রবেশ করে। বৃহদন্ত্র সিকাম (Caecum), মলাশয় (Colon) ও মলভান্ড (Rectum) নিয়ে গঠিত। বৃহদন্ত্র অজীর্ণ খাদ্যাংশ থেকে জল ও লবণ শোষণ করে এবং পরে খাদ্যের অজীর্ণ অংশ ও ব্যাকটিরিয়া কোলন অংশে অবস্থান করে। এই অজীর্ণ খাদ্যাংশ কোলনের মধ্যে ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ায় দুর্গন্ধযুক্ত মলে পরিণত হয়। মল এর পর মলভান্ডে সাময়িকভাবে জমা হয় এবং মলদ্বার বা পায়ুপথে নির্দিষ্ট সময়ান্তর বেরিয়ে যায়।

খাদ্য কি ? (What is Food ?)ঃ যে বস্তু গ্রহণ করলে জীবদেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ হয়, রোগ ও অপুষ্টি থেকে দেহ রক্ষা পায় এবং দেহে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন হয়, তাকে **খাদ্য** (food) বলে। রাসায়নিক গঠনের ভিত্তিতে এবং কার্যকারিতা অনুযায়ী খাদ্য মোট দু ধরনের উপাদান নিয়ে তৈরি। যথা—(A) খাদ্যের মুখ্য উপাদান এবং (B) খাদ্যের সহায়ক উপাদান।

A. খাদ্যের মুখ্য উপাদানঃ খাদ্যের যে উপাদানগুলি বিপাকীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে, তাদের **মুখ্য উপাদান** বা **দেহ-পরিপোষক উপাদান** বলে। খাদ্যের মুখ্য উপাদান আবার তিন ধরনের, যথা—(1) **জল-অঙ্গার** (Carbohydrate), (2) **প্রোটীন** (Protein) এবং (3) **স্নেহ পদার্থ** (Lipids)।

(1) **জল-অঙ্গার** (Carbohydrate)ঃ জল-অঙ্গার বা কার্বোহাইড্রেট কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সহযোগে গঠিত জৈব যৌগ—যার মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, জলের অনুপাতে অর্থাৎ 2 : 1 অনুপাতে থাকে। এদের আণবিক সংকেত $C_n(H_2O)_n$ [যেখানে $n \geqslant 3$], তবে ব্যতিক্রম ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা ($C_5H_{12}O_4$)। প্রত্যেক কার্বোহাইড্রেট অণুতে একাধিক হাইড্রক্সিল মূলক (—OH) এবং একটি কিটোন মূলক (<CO) বা অ্যালডিহাইড মূলক (—CHO) থাকে। যে সমস্ত কার্বোহাইড্রেটে কিটোন মূলক থাকে, তাদের **কিটোজেস** বলে, যথা—ফ্রাকটোজ এবং যে সমস্ত কার্বোহাইড্রেটে অ্যালডিহাইড মূলক থাকে, তাদের

অ্যালডোজেস বলে, যথা—গ্লুকোজ। কার্বোহাইড্রেটে কিটোন বা অ্যালডিহাইড মূলক মুক্ত অবস্থায় থাকলে, তাকে **বিজারণক্ষম শর্করা** (Reducing sugar) বলে। যেমন—গ্লুকোজ, ফ্রাকটোজ ইত্যাদি।

কার্বোহাইড্রেটের একককে **মনোস্যাকারাইড** বা **একক শর্করা** বলে। **শর্করা এককের সংখ্যা অনুসারে কার্বোহাইড্রেটকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,** যথা—(1) **সরল কার্বোহাইড্রেট** (Simple Carbohydrate) এবং (2) **যৌগিক কার্বোহাইড্রেট** (Compound Carbohydrate)।

1. **সরল কার্বোহাইড্রেট ঃ** এর প্রতিটি অণু একটিমাত্র সরল শর্করা একক নিয়ে গঠিত। এজন্য একে **মনোস্যাকারাইড** (Monosaccharide) বলা হয়। যেমন—গ্লুকোজ, ফ্রাকটোজ, গ্যালাকটোজ ইত্যাদি।

2. **যৌগিক কার্বোহাইড্রেট ঃ** এর প্রতিটি অণু একাধিক শর্করা একক নিয়ে গঠিত। যৌগিক কার্বোহাইড্রেট আবার দু ধরনের, যথা—(a) **অলিগোস্যাকারাইড** (Oligosaccharide) এবং (b) **পলিস্যাকারাইড** (Polysaccharide)।

(a) **অলিগোস্যাকারাইড ঃ** যে কার্বোহাইড্রেটের অণু দুই থেকে দশটি শর্করা একক নিয়ে গঠিত, তাকে **অলিগোস্যাকারাইড** বলে। যেমন—ডাইস্যাকারাইড, ট্রাইস্যাকারাইড, টেট্রাস্যাকারাইড ইত্যাদি।

ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide) ঃ যে কার্বোহাইড্রেটের অণু দুটি শর্করা একক দিয়ে গঠিত, তাকে **ডাইস্যাকারাইড** বলে। যেমন—সুক্রোজ (গ্লুকোজ+ফ্রাকটোজ), মলটোজ (গ্লুকোজ+গ্লুকোজ), ল্যাকটোজ (গ্লুকোজ+গ্যালাকটোজ) ইত্যাদি।

ট্রাইস্যাকারাইড (Trisaccharide) ঃ যে কার্বোহাইড্রেটের অণু তিনটি শর্করা একক দিয়ে গঠিত, তাকে **ট্রাইস্যাকারাইড** বলে। যেমন—র‍্যাফিনোজ (Raffinose)।

টেট্রাস্যাকারাইড (Tetrasaccharide) ঃ যে কার্বোহাইড্রেটের অণু চারটি শর্করা একক দিয়ে গঠিত, তাকে **টেট্রাস্যাকারাইড** বলে। যেমন—স্করোডোজ (Scorodose)।

(b) **পলিস্যাকারাইড ঃ** যে কার্বোহাইড্রেটের অণু দশটির বেশী শর্করা একক দিয়ে গঠিত, তাকে **পলিস্যাকারাইড** বলে। যেমন—শ্বেতসার বা স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন, ডেক্সট্রিন ইত্যাদি।

উৎস (Sources) ঃ জল-অঙ্গারের প্রধান উৎস উদ্ভিদ। আঙ্গুর বা যে কোন পাকা ফল থেকে ফ্রাকটোজ (মনোস্যাকারাইড), আখ থেকে সুক্রোজ, দুধ থেকে ল্যাকটোজ (ডাইস্যাকারাইড), চাল, গম, ভুট্টা, আলু প্রভৃতি থেকে শ্বেতসার (পলিস্যাকারাইড) পাওয়া যায়। প্রাণিদেহের গ্লাইকোজেন জল-অঙ্গারের একটি উৎস।

জল-অঙ্গার বা কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা (Role of Carbohydrates) ঃ

(i) দেহের কর্মক্ষমতা ও তাপশক্তি উৎপন্ন করাই জল-অঙ্গার বা কার্বোহাইড্রেটের প্রধান কাজ।

(ii) দেহে শক্তির ভান্ডার হিসেবে এটি সঞ্চিত থাকে।

(iii) প্রাণিদেহে যকৃৎ ও পেশীতে এই জাতীয় খাদ্য গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চিত থাকে।

(iv) যকৃৎ গ্লাইকোজেনেসিস ও গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন উৎপাদন ও গ্লাইকোজেন থেকে পুনরায় গ্লুকোজ উৎপাদন করে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা সমান রাখে।

চিত্র 5.47 : কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য। (ক) ধান, (খ) বীট, (গ) গম, (ঘ) ভুট্টা, (ঙ) আখ, (চ) আঙুর, (ছ) আলু।

(v) উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর গঠন করে কোষের কাঠামো গঠনে সাহায্য করে।

(vi) কার্বোহাইড্রেট জৈব অ্যাসিড ও অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

(vii) শাকসবজির সেলুলোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

(viii) শাকসবজির সেলুলোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে আন্ত্রিক সঞ্চালনে (Peristalsis) মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

(2) **প্রোটীন (Protein) :** প্রোটীন এক প্রকার নাইট্রোজেনঘটিত জৈব যৌগ—যার মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে। তাছাড়া, কিছু কিছু প্রোটীনে (যথা, নিউক্লিওপ্রোটীন) সালফার এবং ফসফরাস-ও বর্তমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রোটীন কতকগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড নামক জৈব অ্যাসিড দ্বারা গঠিত। প্রোটীনকে অম্ল আর্দ্র-বিশ্লেষণ (acid hydrolysis) করলে, অসংখ্য অ্যামাইনো অ্যাসিডে বিশ্লেষিত হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিডই প্রোটীনের সাংগঠনিক একক। প্রত্যেক অ্যামাইনো অ্যাসিডে অন্ততপক্ষে একটি কার্বক্সিল মূলক

(—COOH) এবং একটি অ্যামাইনো মূলক (—NH_2) থাকে। প্রোটীনের মধ্যে প্রধানত 20টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া প্রোটীন-বহির্ভূত আরও প্রায় 150 রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। যেমন—অরনিথিন, বিটা এলানিন ইত্যাদি।

● **রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী প্রোটীন নিম্নলিখিত তিন রকমের হতে পারে :**

(i) **সরল প্রোটীন** (Simple proteins) : এ ধরনের প্রোটীন শুধুমাত্র অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত। যেমন—অ্যালবুমিন (Albumin), গ্লোবিউলিন (Globulin), হিস্টোন (Histone) ইত্যাদি।

(ii) **যুগ্ম প্রোটীন** (Conjugated proteins) : এ ধরনের প্রোটীনে অ্যামাইনো অ্যাসিড ছাড়াও অন্যান্য জৈব বা অজৈব অংশ থাকে, যাকে **প্রস্থেটিক গ্রুপ** (Prosthetic group) বলে। যেমন—নিউক্লিওপ্রোটীন (Nucleoprotein), ক্রোমোপ্রোটীন (Chromoprotein), ফসফোপ্রোটীন (Phosphoprotein), গ্লাইকোপ্রোটীন (Glycoprotein), লাইপোপ্রোটীন (Lipoprotein) ইত্যাদি।

(iii) **ডিরাইভড্ প্রোটীন** (Derived proteins) : এ ধরনের প্রোটীন থেকে বহু সংখ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। যেমন—পলিপেপটাইড (Polypeptide), পেপটোন (Peptone) ইত্যাদি।

প্রোটীনের মূল সাংগঠনিক উপাদান 20 রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে 8টি (আটটি) আমাদের দেহে তৈরি হয় না। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে **অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড** (Essential amino acids) বলে। যেমন—**লিউসিন** (Leucine), **আইসোলিউসিন** (Isoleucine), **ট্রিপটোফান** (Tryptophan), **থ্রিওনিন** (Threonine), **লাইসিন** (Lysine), **ফিনাইল অ্যালানিন** (Phenyl alanine), **মিথিওনিন** (Methionine) ও **ভ্যালিন** (Valine)। এছাড়া শৈশবে **হিস্টিডিন** (Histidine)-ও প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড।

যে সমস্ত প্রোটীনে অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের সবগুলিই থাকে, তাদের **প্রথম শ্রেণীর প্রোটীন** (First class proteins) বলে। যথা—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, কড়াইশুঁটি, সয়াবীন ইত্যাদি। সাধারণত সমস্ত প্রাণিজ প্রোটীনই প্রথম শ্রেণীর প্রোটীন। যে সমস্ত প্রোটীনে একটি বা একাধিক অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড অনুপস্থিত থাকে, তাদের **দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটীন** (Second class proteins) বলে। যেমন—চাল, আটা, শাকসবজি, ভুট্টা প্রভৃতি। সাধারণত সমস্ত উদ্ভিজ্জ প্রোটীনই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটীন।

উৎস (Sources) : প্রোটীনের প্রধান উৎস হল মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি প্রাণিজ পদার্থ (প্রাণিজ প্রোটীন) এবং কড়াইশুঁটি, সয়াবীন প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ (উদ্ভিজ্জ প্রোটীন)। এছাড়াও চাল, গম, আলু প্রভৃতিতে অল্প পরিমাণে প্রোটীন থাকে।

প্রোটীনের ভূমিকা (Role of Proteins) ঃ

(i) দেহ গঠন, দেহের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন প্রোটীনের প্রত্যক্ষ ও প্রধান কাজ।

(ii) আংশিকভাবে দেহের প্রয়োজনীয় তাপশক্তির চাহিদাও প্রোটীন পূরণ করে।

(iii) হরমোন সংশ্লেষে প্রোটীন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

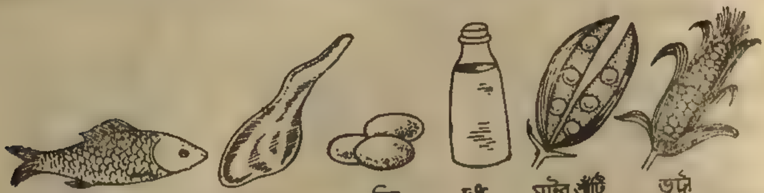

চিত্র 5.48 ঃ প্রোটীনজাতীয় খাদ্য।

(iv) পেপসিন, ট্রিপসিন প্রভৃতি উৎসেচক তৈরিতে প্রোটীন একান্ত প্রয়োজন।

(v) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রোটীন সাহায্য করে।

(vi) ক্ষেত্রবিশেষে প্রোটীন স্নেহ পদার্থ গঠনে সহায়তা করে।

(3) **স্নেহ পদার্থ (Lipids) ঃ** স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত হলেও এতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ অক্সিজেনের তুলনায় অনেক বেশী থাকে। অনেক স্নেহ পদার্থে উপরিউক্ত তিনটি মূল উপাদান ছাড়াও নাইট্রোজেন (N), সালফার (S) এবং ফসফরাস (P) থাকে। স্নেহ পদার্থে কম পরিমাণ অক্সিজেন থাকে বলে জারণের ফলে বেশী শক্তি মুক্ত হয়। স্নেহ পদার্থ উৎসেচকের ক্রিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিড (Fatty acid) ও গ্লিসারলে (Glycerol) বিশ্লেষিত হয়। বাস্তবিকপক্ষে স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট হল, ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের এস্টার* (Ester)-বিশেষ।

স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট জলে অদ্রবণীয় একপ্রকার জৈব পদার্থ, যা পেট্রল, ইথার প্রভৃতিতে দ্রবণীয়। সাধারণ উষ্ণতায় যে সমস্ত স্নেহ পদার্থ তরল থাকে, তাদের তেল বা অয়েল (oil) এবং যে সমস্ত ফ্যাট সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন হয়, তাদের ফ্যাট বা চর্বি (Fat) বলে। সমস্ত স্নেহ পদার্থের মধ্যে একটি গঠন-কাঠামো (bone structure) ও একটি দীর্ঘ হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খল (hydrocarbon chain) থাকে। গঠন-কাঠামোর উপর ভিত্তি করে স্নেহ পদার্থকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—(a) **সরল স্নেহ পদার্থ** (Simple lipids), এবং (b) **জটিল স্নেহ পদার্থ** (Complex lipids)।

(a) **সরল স্নেহ পদার্থ ঃ** এ ধরনের স্নেহ পদার্থে কোন ফ্যাটি অ্যাসিড না থাকায়, এদের ক্ষারীয় আর্দ্র-বিশ্লেষণ (alkaline hydrolysis) করলে কোন সাবানে পরিণত করা যায় না। সরল স্নেহ পদার্থ থেকে ভিটামিন, হরমোন প্রভৃতি তৈরি

---

* জৈব অ্যাসিড এবং জৈব ক্ষারের (alkali) লবণ (salt)-কে এস্টার বলে।

হয়। **টারপিন** (Terpenes), **স্টেরয়েড** (Steroids) প্রভৃতি এ ধরনের স্নেহ পদার্থের উদাহরণ।

(b) **জটিল স্নেহ পদার্থ** : এ ধরনের স্নেহ পদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড ও কোহল দিয়ে তৈরি এক ধরনের এস্টার (Ester), যাদের ক্ষারীয় আর্দ্র-বিশ্লেষণ করলে সাবানে পরিণত হয়। ক্ষারীয় আর্দ্র-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাবান তৈরির এই প্রক্রিয়াকে **স্যাপোনিফিকেশন** (Saponification) বলে। **গ্লাইকোলিপিড** (Glycolipid), **সালফোলিপিড** (Sulpholipid), **ফসফোগ্লিসেরাইড** (Phosphoglyceride), **মোম** (Wax) প্রভৃতি জটিল স্নেহ পদার্থের উদাহরণ।

উৎস (Sources) : দুধ, ঘি, মাখন, বনস্পতি, তেল, নারকেল, বাদাম এবং ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীর ধারণ ঝিল্লির (Mesentery) সঞ্চিত চর্বি প্রভৃতি স্নেহ পদার্থের উৎস।

স্নেহ পদার্থের ভূমিকা (Role of Lipids) :

(i) দেহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাপশক্তি সঞ্চয় করাই স্নেহ পদার্থের প্রধান কাজ। কারণ কার্বোহাইড্রেট বা প্রোটীনের তুলনায় স্নেহ পদার্থের শক্তি উৎপাদন মূল্য অনেক বেশী। এক গ্রাম স্নেহ পদার্থ 9·3 K. cal শক্তি উৎপন্ন করে।

(ii) চর্মের নিচেই সঞ্চিত থেকে স্নেহ পদার্থ দেহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।

(iii) এটি দেহের তাপ সংরক্ষণে সাহায্য করে।

(iv) স্নেহ পদার্থে দ্রাব্য ভিটামিনগুলি এর মাধ্যমে সহজেই পরিবাহিত হয়।

(v) স্নেহ পদার্থ কোষের প্লাজমা পর্দা গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(vi) কোলেস্টেরল নামক এক প্রকার স্নেহ পদার্থ থেকে অ্যাড্রেনোকর্টিকয়েড, ইস্ট্রোজেন, টেস্টোস্টেরন নামক হরমোন, ভিটামিন D প্রভৃতি তৈরি হয়।

(vii) স্নেহ জাতীয় খাদ্যোপাদান মলভাণ্ড ও মলপথ তৈলাক্ত ও পিচ্ছিল করে মল নিঃসরণে সাহায্য করে।

B. **খাদ্যের সহায়ক উপাদান :** খাদ্যের মুখ্য উপাদানগুলি ছাড়াও খাদ্যের আরও কতকগুলি উপাদান আছে, যাদের অভাবে দেহের স্বাভাবিক

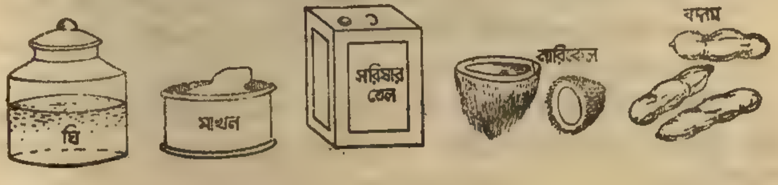

চিত্র 5.49 : তেল ও তেলজাতীয় খাদ্য।

কার্যকলাপ, বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যাহত হয়। এগুলিকে **খাদ্যের সহায়ক উপাদান** বলে। ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জলকে খাদ্যের সহায়ক উপাদান বলা হয়।

ভিটামিন (Vitamin) ঃ যে বিশেষ খাদ্যোপাদান সামান্য পরিমাণে (প্রধানত খাদ্যের সঙ্গে) দেহে প্রবেশ করে কিংবা সংশ্লেষিত হয়ে দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি, বৃদ্ধি বিভিন্ন জৈবনিক কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে এবং যার অভাবে বিভিন্ন রোগের উপসর্গ দেখা দেয়, তাকে **ভিটামিন** বলে (ল্যাটিন শব্দ **Vita** অর্থাৎ জীবন, ইংরেজী শব্দ **Amine**—অর্থাৎ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় একপ্রকার রাসায়নিক মূলক)। ভিটামিন প্রাণিদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান হলেও ভিটামিন থেকে কোন শক্তি উৎপন্ন হয় না। ভিটামিন শুধু জৈব অনুঘটক বা উৎসেচকের মত কাজ করে। **1911** খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী **কাশিমির ফান্‌ক** (**Casimir Funk**) চাউল বিশ্লেষণ করে বেরিবেরি রোগের প্রতিষেধক হিসেবে একপ্রকার উপাদান আবিষ্কার করে, তার নামকরণ করেন **Vitamine**। পরবর্তী-কালে 1920 খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক **জে. সি. ড্রুমণ্ড** (**J. C. Drummond**) ফান্‌ক প্রদত্ত **Vitamine**-এর 'e' বর্ণটি বাদ দিয়ে জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঐ উপাদানটির নামকরণ করেন **Vitamin**।

ভিটামিনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Vitamins) ঃ

দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিনকে নিম্নলিখিত দু ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(i) **ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন** (Fat soluble Vitamins), যেমন—ভিটামিন **A, D, E** এবং **K**।

(ii) **জলে দ্রবণীয় ভিটামিন** (Water soluble Vitamins), যেমন—ভিটামিন **B-Complex, C** এবং **P**।

আমাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের নাম, উৎস, কার্যকারিতা, অভাব-জনিত প্রতিক্রিয়া ও অধিক ভিটামিনজনিত অপক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হল ঃ

A. ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন (Fat soluble Vitamins) ঃ

1. ভিটামিন A বা অ্যান্টিজেরপথ্যালমিক ভিটামিন ঃ

রাসায়নিক নাম (Chemical name) ঃ **রেটিনল** (**Retinol**)।

উৎস (Sources) ঃ

উদ্ভিজ্জ—গাজর, টম্যাটো, বাঁধাকপি, পালংশাক, টাটকা হলুদ বর্ণের ফল ইত্যাদি।

প্রাণিজ—কড্ মাছ, হাঙর ও হ্যালিবাট মাছের যকৃৎ-নিঃসৃত তেল, ডিমের কুসুম, মাছ, দুধ, মাখন ইত্যাদি।

এছাড়া বিভিন্ন হলুদ বর্ণের ফল (কুমড়া, পাকা পেঁপে, আম ইত্যাদি) এবং গাজরে উপস্থিত ক্যারোটিন নামক রঙ্গক থেকে যকৃতে সামান্য পরিমাণে সংশ্লেষিত হয়।

কার্যকারিতা (Functions) ঃ

(i) দেহের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(ii) অস্থি ও দাঁতের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করে।

(iii) গলবিল, শ্বাসনালী, লালাগ্রন্থি প্রভৃতির আবরণী কলার সজীবতা ও সক্রিয়তা বজায় রাখে।

(iv) রাত্রির আবছা অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে।

(v) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) ঃ

(i) **রাতকানা** (Night blindness) বা **নিকটালোপিয়া** (Nyctalopia) ঃ ভিটামিন A-র অভাবে রাতকানা রোগ হয়।

(ii) **জেরপ্থ্যালমিয়া** (Xeropthalmia) ঃ কোষের বিনাশের ফলে কনজাংটিভার ঘোলাটে ভাব ধারণ।

জ্যারক্থ্যালমিয়া (শিশুর)

ক্যারাটোম্যালেশিয়া (বাঁদরের)

(iii) **কেরাটোম্যালাসিয়া** (Keratomalacia) ঃ কর্নিয়া বা অচ্ছোদপটলের বিনাশ এবং পরিণামে অন্ধত্বপ্রাপ্তি।

(iv) **ফ্রিনোডার্মা** (Phrynoderma) ঃ ভিটামিন A-এর অভাবে ব্যাঙের মত চামড়া পুরু, শুষ্ক ও খসখসে হয়ে যায়। এই অবস্থাকে **টোড-স্কিন** (Toad Skin)-ও বলা হয়।

(v) **রেনাল স্টোন** (Renal stone) ঃ ভিটামিন A-এর অভাব হলে বৃক্কের আবরণী কলার ক্ষয় হয় এবং রেনাল স্টোন বা বৃক্কের ভিতর পাথরের সৃষ্টি হয়।

আধিক্যজনিত অপক্রিয়া (Hyper vitaminosis) ঃ

(i) চোখের ক্ষত, ত্বকের ক্ষয়।

(ii) ক্ষুধামান্দ্য, দেহের ওজন হ্রাস ও বমির উদ্রেক।

(iii) প্লাজমা-প্রোথ্রম্বিনের হ্রাস, তথা রক্ত ক্ষরণ।

(iv) হাত-পায়ের লম্বা হাড়ে ব্যথা ও প্ররাইটিক গুটি।

(v) অস্থি-ভঙ্গুরতা।

(vi) কেশপতন ও তন্দ্রাচ্ছন্নতা।

2. ভিটামিন D বা অ্যান্টিরিকেটিক ভিটামিন ঃ

রাসায়নিক নাম (Chemical name) ঃ **ক্যালসিফেরল** (Calciferol)।

উৎস (Sources) ঃ

উদ্ভিজ্জ ঃ উদ্ভিজ্জ পদার্থে ভিটামিন D প্রায় নেই বললেই চলে, তবে বাঁধাকপি ও উদ্ভিজ্জ তেলে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

প্রাণিজ ঃ কড্ মাছ, হাঙর, হ্যালিবাট মাছের যকৃৎ-নিঃসৃত তেল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, দুধ, ডিম, মাখন ইত্যাদি। এছাড়া, মানুষের চামড়ায় সূর্যালোকের প্রভাবে সামান্য ভিটামিন D সংশ্লেষিত হয়।

কার্যকারিতা (Functions) ঃ

(i) ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণে সাহায্য করে।
(ii) অস্থি ও দাঁতের গঠনে সাহায্য করে।
(iii) অস্থির ক্যালসিয়াম সঞ্চয়ে সহায়তা করে।
(iv) শিশুদের রিকেট ও প্রাপ্তবয়স্কদের অস্টিওম্যালেসিয়া রোগ প্রতিরোধ করে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) ঃ

(i) **রিকেট (Rickets) ঃ** ভিটামিন D-এর অভাবে শিশুদের রিকেট রোগ হয়। এই রোগে অস্থিতে ক্যালসিয়াম জমা হয় না বলে, অস্থিগুলি ঠিকমত গঠিত ও দৃঢ় হয় না। ফলে দেহের বড় বড় হাড় বেঁকে যায়।

(ii) **অস্টিওম্যালাসিয়া (Osteomalacia) ঃ** প্রাপ্তবয়স্কদের, প্রধানত গর্ভবতী ও স্তনদানকারী নারীর খাদ্যে ভিটামিন D-এর অভাব হলে অস্থি ভঙ্গুরতা বা অস্টিও-ম্যালাসিয়া রোগ হয়।

(iii) রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা হ্রাস পায়।

(iv) দাঁতের ক্ষয় বা ক্যারিস (caries) দেখা যেতে পারে।

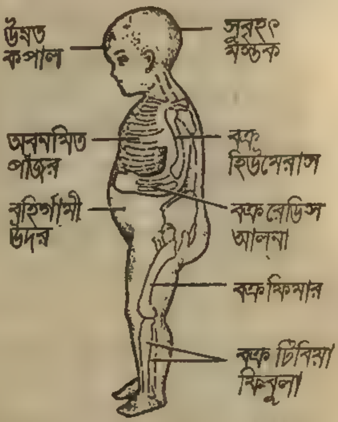

রিকেট

আধিক্যজনিত অপক্রিয়া (Hyper vitaminosis) ঃ

(i) বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড, ধমনী প্রভৃতিতে প্রচুর ক্যালসিয়াম জমা হয় এবং স্থিতিস্থাপকতা ব্যাহত হয়।
(ii) মূত্রত্যাগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
(iii) মাথাধরা, মোহাচ্ছন্নতা, বমির উদ্রেক হয়, ওজন কমে যায়।

3. ভিটামিন E বা অ্যান্টিস্টেরিলিটিক ভিটামিন ঃ

রাসায়নিক নাম (Chemical name) ঃ **টোকোফেরল** (Tocopherol)।

উৎস (Sources) ঃ

উদ্ভিজ্জ—অঙ্কুরিত ছোলা, সয়াবীন, লেটুসশাক, সবুজ শাকসবজি।
প্রাণিজ—দুধ, ডিমের কুসুম।

কার্যকারিতা (Functions) ঃ

(i) যৌনাঙ্গের স্বাভাবিক গঠন ও সন্তান ধারণ ক্ষমতা রক্ষার্থে ভিটামিন E গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।
(ii) বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে ভিটামিন E অপরিহার্য।

(iii) ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
(iv) গর্ভপাত রোধ করে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) ঃ
(i) ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
(ii) প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
(iii) যকৃতের ক্ষয় বা নেক্রোসিস (Necrosis) দেখা দেয়।
(iv) নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর নিষিক্ত ভ্রূণাণু বিনষ্ট হয়।

আধিক্যজনিত অপক্রিয়া (Hyper vitaminosis) ঃ
(i) থাইরয়েড, পিটুইটারি, শুক্রাশয়ের স্বাভাবিক কার্যকারিতা নষ্ট হয়।
(ii) বিপাকজাত বৈকল্য (Metabolic defects) দেখা দেয়।

4. ভিটামিন K বা অ্যান্টিহিমোরেজিক ফ্যাক্টর (Antihaemorrhagic factor) **ঃ**

রাসায়নিক নাম (Chemical name) ঃ **ফাইলোকুইনন** (Phylloquinone) বা **ন্যাপথোকুইনন** (Napthoquinone)।

উৎস (Sources) ঃ
উদ্ভিজ্জ—আলফালফা (Alfalfa), বাঁধাকপি, পালং শাক ইত্যাদি।
প্রাণিজ—গরু ও শূকরের যকৃৎ, মাছ। এছাড়া মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণুরা সামান্য পরিমাণে ভিটামিন K তৈরি করে।

কার্যকারিতা (Functions) ঃ
(i) ভিটামিন K স্বাভাবিক রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করে।
(ii) পিত্ত নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) ঃ
(i) স্বাভাবিক রক্ত তঞ্চন ব্যাহত হয়।
(ii) পিত্ত নিঃসরণ ব্যাহত হয়।
(iii) ATP সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে।

B. জলে দ্রবণীয় ভিটামিন (Water soluble Vitamins) **ঃ**

1. ভিটামিন B-কমপ্লেক্স (Vitamin B-Complex) ঃ প্রায় 12টি ভিটামিন B-এর সমন্বয়ে ভিটামিন B-কমপ্লেক্স গঠিত। এদের মধ্যে কয়েকটি মাত্র আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ভিটামিন B_1 বা অ্যান্টিবেরিবেরি ফ্যাক্টর (Antiberiberi factor) **ঃ**

রাসায়নিক নাম (Chemical name) ঃ **থায়ামিন** (Thiamine)।

উৎস (Sources) ঃ
উদ্ভিজ্জ—বীট, গাজর, বীন, ফুলকপি, লেটুস পাতা, ঈস্ট নামক ছত্রাক, চালের কুঁড়ো, ঢেঁকিছাঁটা চাল প্রভৃতি।
প্রাণিজ—ডিমের কুসুম, প্রাণীদের যকৃৎ (মেটুলি) প্রভৃতি।

কার্যকারিতা (Functions) :

(i) কার্বোক্সিলেজ উৎসেচকের কো-এনজাইম বা সহ-উৎসেচক রূপে কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে অংশগ্রহণ করে।
(ii) স্নায়ুর পুষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে।
(iii) হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কার্য নিয়ন্ত্রণ করে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) ভিটামিন B_1-এর অভাবে **বেরিবেরি** (Beriberi) রোগ হয়। বেরিবেরি চার রকমের—(a) শুষ্ক বেরিবেরি*, (b) আর্দ্র বেরিবেরি**, (c) হার্দ বা কার্ডিয়াক বেরিবেরি†, (d) মিশ্র বেরিবেরি†† ।
(ii) ক্ষুধামান্দ্য বা আহারে অনিচ্ছা।
(iii) অপরিণত বুদ্ধি।

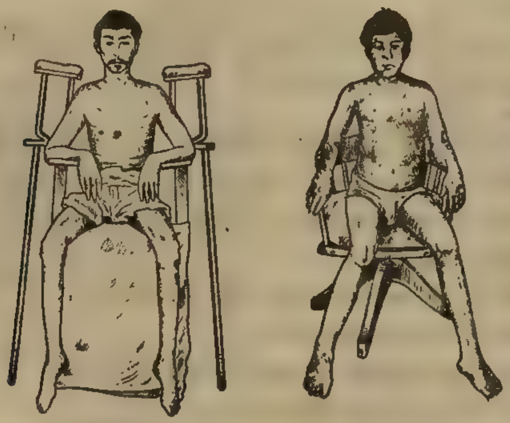

শুষ্ক বেরিবেরি   আর্দ্র বেরিবেরি

(iv) স্নায়ু ও হৃদ্‌যন্ত্রের ক্ষতি।
(v) নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের পলিনিউরাইটিস (Polyneuritis) রোগ, যা মানুষের ভিটামিন B_1-এর অভাবজনিত লক্ষণসমূহের সদৃশ।

ভিটামিন B_2 :

রাসায়নিক নাম (Chemical name) : **রাইবোফ্ল্যাভিন** (Riboflavin) বা **ল্যাকটোফ্ল্যাভিন** (Lactoflavin)।

---

* লক্ষণ : স্নায়ুতন্ত্রের গোলযোগ, হাত-পায়ের পেশীর দুর্বলতা ও পক্ষাঘাত।

** লক্ষণ : হাত-পায়ে শোথ (Oedema), অর্থাৎ অঙ্গগুলির কলায় অধিক কলারস জমা হওয়ার ফলে সেগুলির স্ফীতি।

† লক্ষণ : হৃৎপিণ্ডের গোলযোগ এবং পরিণামে হৃৎপিণ্ডের নিষ্ক্রিয়তা ও মৃত্যু।

†† লক্ষণ : উপরের একাধিক লক্ষণের প্রকাশ।

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ—অঙ্কুরিত গম, সবুজ শাকসবজি, শিম, সয়াবীন, পালং শাক, মটরশুঁটি ইত্যাদি।

প্রাণিজ—ডিমের সাদা অংশ, দুধ, ডিম, মাছ, মাংস প্রভৃতি।

কার্যকারিতা (Functions) :

(i) খাদ্যের বিপাকে অংশগ্রহণ করে।
(ii) কোষীয় শ্বসনে অংশগ্রহণ করে।
(iii) দৈহিক বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য।
(iv) শৈলষ্মিক ঝিল্লি ও চর্মের স্বাভাবিক সুস্থতা বজায় রাখে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) **চিলোসিস** (Cheilosis) : ঠোঁটের কোণে ঘা হয়, ফেটে যায়, ঠোঁট ফুলে যায়।
(ii) **সেবোরিক ডারমাটাইটিস** (Seborrheic dermatitis) : ত্বকে মোমের মত আস্তরণ পড়ে।
(iii) **কেরাটাইটিস** (Keratitis) : কর্নিয়া বা অচ্ছোদপটল স্ফীত ও রক্তাভ হয় এবং আলোর দিকে তাকাতে অক্ষম হয়।
(iv) অকালে চুল উঠে যায়।
(v) ক্ষুধামান্দ্য ও অবসন্নতা দেখা দেয়।

অ্যাংগুলার স্টোমাটাইটিস

গ্লসাইটিস

(vi) **গ্লসাইটিস** (Glossitis) অর্থাৎ জিভের ঘা হয়।

ভিটামিন B_3 :

রাসায়নিক নাম (Chemical name) : **প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড** (Pantothenic acid)।

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ—চাল ও গমের কুঁড়ো, মিষ্টি আলু, মটরশুঁটি, সুজি, ঈস্ট, চিটে গুড় ইত্যাদি।

প্রাণিজ—মাংস, দুধ, ডিম, মেটুলি ইত্যাদি।

কার্যকারিতা (Functions) :

(i) দৈহিক বৃদ্ধি ও পুষ্টি বজায় রাখে।
(ii) পেশীর স্থিতিস্থাপকতা নিয়ন্ত্রণ করে।
(iii) এটি কো-এনজাইমের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) আন্ত্রিক ক্ষত সৃষ্টি হয়।
(ii) দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং অবসাদ দেখা দেয়।

(iii) ডার্মাটাইটিস নামক চর্ম রোগ হয়।
(iv) স্নায়ু ক্ষয় ও পেশীতে টান ধরে।
(v) নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের চর্মরোগ ও স্নায়ু ক্ষয় হয়।

ভিটামিন B_5 বা পেলাগ্রা নিরোধক ভিটামিন (**Pellagra-preventing factor বা P-P factor**) **:**

রাসায়নিক নাম (**Chemical name**) **: নিকোটিনিক অ্যাসিড** (**Nicotinic acid**) **বা নিয়াসিন** (**Niacin**)।

উৎস (**Sources**) **:**

উদ্ভিজ্জ—চালের কুঁড়ো, ডাল, টম্যাটো, বীন, গম, ঈস্ট ইত্যাদি।

প্রাণিজ—দুধ, ডিম, মাংস, মাছের যকৃৎ ইত্যাদি।

কার্যকারিতা (**Functions**) **:**

(i) কোষের জারণ-বিজারণ ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
(ii) সামগ্রিকভাবে দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।
(iii) রক্তোৎপাদক কলার কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে
(iv) পেলাগ্রা প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

পেলেগ্রা

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (**Deficiency symptoms**) **:**

(i) **পেলাগ্রা**—এই ভিটামিনের অভাবে পেলাগ্রা রোগ হয়। এই রোগে দেহের উন্মুক্ত অংশের ত্বকে লালচে দাগ হয়, পরে খসখসে হয়ে যায়। হাতে-পায়ে গুটির মত বের হয়। পাকস্থলী ও অন্ত্রের গোলযোগ হয়। মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়।

(ii) দেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
(iii) ঠোঁটের ভিতরের দিকে পুঁজযুক্ত ফুসকুড়ি হয়।
(iv) এই ভিটামিনের অভাবে কুকুরের জিভ কালো হয়ে যায়।

ভিটামিন B_6 :

রাসায়নিক নাম (Chemical name) : **পাইরিডক্সিন (Pyridoxine)।**

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ—অঙ্কুরিত শস্য, শাকসবজি, ঈস্ট ইত্যাদি।

প্রাণিজ—ডিমের কুসুম, মাংস, বৃক্ক, দুধ ইত্যাদি।

কার্যকারিতা (Functions) :

(i) হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে।
(ii) প্রোটীন ও শ্বেতসার থেকে স্নেহ পদার্থ সংশ্লেষ ও অ্যামাইনো অ্যাসিড বিপাকে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে।
(iii) স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) মানুষের স্নায়ু দৌর্বল্য দেখা দেয়।
(ii) রক্তাল্পতা ও অনিদ্রা রোগ হয়।
(iii) ক্রোধপ্রবণতা ও স্নায়বিক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়।
(iv) ইঁদুর ও কুকুরের **অ্যাক্রোডাইনিয়া** (Acrodynia) নামক এক বিশেষ ধরনের চর্মরোগ দেখা যায়।

ভিটামিন B_{12} :

রাসায়নিক নাম (Chemical name) : **সায়ানোকোবালামিন** (Cyanocobalamin)।

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ—সাধারণত শাকসবজিতে থাকে না। স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিসিয়াস নামক ছত্রাকে পাওয়া যায়।

প্রাণিজ—মাছ, মাংস, যকৃৎ, ডিম, দুধ ইত্যাদি।

কার্যকারিতা (Functions) :

(i) লোহিত রক্তকণিকা গঠন করে।
(ii) নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে।
(iii) দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় রাখে।
(iv) সহ-উৎসেচক (Co-enzyme) রূপে কাজ করে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) **পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া** (Pernicious anaemia) নামক রক্তাল্পতা রোগ হয়।
(ii) স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
(iii) মুখ ও জিভ ফুলে যায় ও জ্বালা করে।

ভিটামিন-M বা ভিটামিন B_c :

রাসায়নিক নাম (Chemical name) : **ফোলিক অ্যাসিড** (Folic acid)।

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ—গম, ঈস্ট, সয়াবীন, শাকসবজি, ব্যাঙের ছাতা ইত্যাদি।

প্রাণিজ—যকৃৎ, বৃক্ক, ডিম। এছাড়া অন্ত্রের মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ায় এই ভিটামিন সামান্য পরিমাণে সংশ্লেষিত হয়।

কার্যকারিতা (Functions) :

(i) DNA গঠনে এই ভিটামিন অপরিহার্য।

(ii) RBC উৎপাদন ও দৈহিক বৃদ্ধিতে ফোলিক অ্যাসিড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(iii) নিউক্লিক অ্যাসিড বিপাকে ফোলিক অ্যাসিড সহ-উৎসেচক বা কো-এনজাইম রূপে কাজ করে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) এই ভিটামিনের অভাবে মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া নামক রক্তাল্পতা রোগ হয়।

(ii) সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

ভিটামিন H :

রাসায়নিক নাম (Chemical name) : বায়োটিন (Biotin)।

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ—দানাশস্য, ঈস্ট, শাকসবজি ইত্যাদি।

প্রাণিজ—ডিম, দুধ, বৃক্ক, যকৃৎ।

কার্যকারিতা (Functions) :

(i) কার্বোহাইড্রেট বিপাকে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(ii) দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

(iii) স্নেহ পদার্থের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) ত্বকের প্রদাহ ঘটে।

(ii) রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(iii) পক্ষাঘাত ঘটে।

(iv) সন্তান ধারণ ক্ষমতা কমে যায়।

(v) ইঁদুর, মুরগীর ডারমাটাইটিস নামক চর্মরোগ হয়, ত্বক পুরু আঁশের মত হয়ে উঠে যায়।

ইনোসিটল (Inositol) :

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ—কমলালেবু, পাতিলেবু, দানাশস্য, ঈস্ট ইত্যাদি।

প্রাণিজ—যকৃৎ, মাংস।

কার্যকারিতা (Functions) :

(i) স্নেহ পদার্থের বিপাকে অংশগ্রহণ করে।

(ii) দৈহিক বৃদ্ধিতে প্রয়োজন।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) যকৃতের কাজ হ্রাস পায়।

(ii) চুল পড়ে যায়।

(iii) স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ত্বকের রোগ ও চোখের দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়।

কোলিন (Choline) :

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ—ডাল জাতীয় শস্য, ফল, শাকসবজি ইত্যাদি।

প্রাণিজ—মাখন, ডিম, যকৃৎ, বৃক্ক।

কার্যকারিতা (Functions) :

(i) বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

(ii) স্নেহ পদার্থের বিপাকে অংশগ্রহণ করে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) বৃক্কের নেক্রোসিস (Necrosis) বা বিনাশ ঘটে।

(ii) স্নেহ পদার্থ ও প্রোটীন পরিপাক ব্যাহত হয়।

(iii) ইঁদুরের রক্ত ক্ষরণ ও লিভার সিরোসিস দেখা যায়।

ভিটামিন C :

রাসায়নিক নাম (Chemical name) :

অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (Ascorbic acid)।

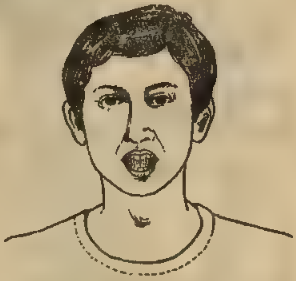

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ—লেবু, আমলকী, টম্যাটো, কাঁচা-লঙ্কা, আনারস, অঙ্কুরিত ছোলা ইত্যাদি।

প্রাণিজ—সাধারণত প্রাণিজ খাদ্যে পাওয়া যায় না, তবে দুধে সামান্য পরিমাণে থাকে।

কার্যকারিতা (Functions) :

(i) দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

(ii) অস্থি, তরুণাস্থি, দাঁত ও ত্বকের স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখে।

স্কার্ভি

(iii) রক্তবাহের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে।

(iv) ক্ষত নিরাময় ও অস্থিকোষের সাংগঠনিক কাজে সাহায্য করে।

(v) RBC-র সুস্থতা রক্ষায় অ্যাসকরবিক অ্যাসিড অপরিহার্য।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) **স্কার্ভি** (Scurvy) : এই ভিটামিনের অভাবে মাড়ি দিয়ে পুঁজ-রক্ত পড়ে, মাড়িতে ঘা ও গ্যাংগ্রিন হয়ে দাঁত পড়ে যায়। এই রোগকে **স্কার্ভি** বলে।

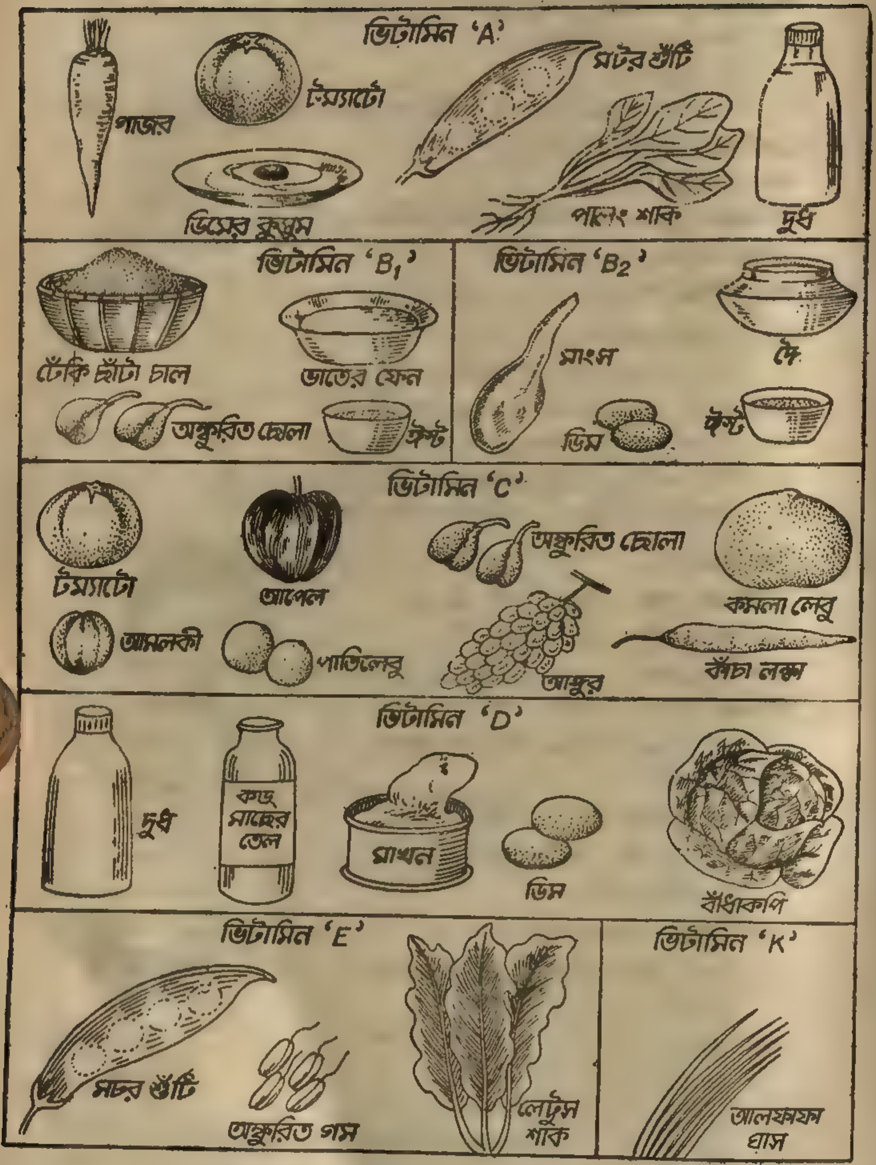

চিত্র 5.50 : বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের নমুনা।

(ii) ক্ষুধামান্দ্য, ক্লান্তি ও ওজন হ্রাস পায়।
(iii) প্রোটীন বিপাক ব্যাহত হয়।
(iv) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং ক্ষত নিরাময় হতে বিলম্ব হয়।
(v) কার্বোহাইড্রেট বিপাক ব্যাহত হয় ও ত্বকে ফুসকুড়ি হয়।
(vi) প্রায়ই সর্দি-কাশি ও অস্থিসন্ধিতে যন্ত্রণা হয়।

ভিটামিন P :

রাসায়নিক নাম (Chemical name) : **সাইট্রিন** (Citrin)।

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ—লেবু, আমলকী, আনারস, টম্যাটো ইত্যাদি।

কার্যকারিতা (Functions) :
সাইট্রিন, ভিটামিন C-এর সহযোগী ভিটামিন হিসেবে কাজ করে এবং দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :
(i) এই ভিটামিনের অভাবে সর্দি-কাশি হয়।
(ii) স্কার্ভি রোগ হয়।
(iii) চর্ম, বৃক্ক ও পাকস্থলীতে রক্তক্ষরণ দেখা যায়।
(iv) সর্বোপরি ভিটামিন C-এর কার্যকারিতা ব্যাহত হয়।

● **অ্যান্টিভিটামিন** (Antivitamins) : যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ ভিটামিনকে নিষ্ক্রিয় বা বিনষ্ট করে ভিটামিনের কার্যকারিতা নষ্ট করে, তাদের **অ্যান্টিভিটামিন** বলে। যেমন—পাইরিথায়ামিন, গ্যালাকটোফ্ল্যাভিন যথাক্রমে ভিটামিন B_1 এবং ভিটামিন B_2-এর কাজে বাধা দেয়।

খনিজ পদার্থ (Minerals) : জীবদেহের স্বাভাবিক গঠন, বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা ও সর্বোপরি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কাজ পরিচালনার জন্য কতকগুলি খনিজ পদার্থ একান্ত প্রয়োজন। এই খনিজ পদার্থগুলি স্বল্প পরিমাণে বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে।

খনিজ পদার্থগুলির উৎস ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হল :

লৌহ (Iron)

প্রয়োজনীয়তা (Importance) :
(i) যদিও লৌহ ক্লোরোফিল অণুর উপাদান নয়, তথাপি উদ্ভিদের ক্লোরোফিল অণুর গঠনে লৌহের বিশেষ ভূমিকা আছে।
(ii) প্রাণীদের রক্তের হিমোগ্লোবিন গঠনের জন্য লৌহের প্রয়োজন।
(iii) উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই সাইটোক্রোম রঙ্গক (যা শ্বসনে প্রয়োজন হয়) গঠনে লৌহ প্রয়োজন। (লৌহ হিমোগ্লোবিন ও সাইটোক্রোমের একটি উপাদান)।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) উদ্ভিদের **ক্লোরোসিস** (Chlorosis) বা **পাণ্ডুরোগ** হয় (অর্থাৎ গাছ হলুদ রঙ ধারণ করে)।

(ii) প্রাণীদের **রক্তাল্পতা** (Anaemia) রোগ দেখা যায়।

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ : কাঁচাকলা, মোচা, পালং শাক, লেটুস শাক, ডুমুর ইত্যাদি।

প্রাণিজ : ডিম, প্রাণীদের যকৃৎ ইত্যাদি।

ক্যালসিয়াম (Calcium)

প্রয়োজনীয়তা (Importance) :

(i) উদ্ভিদের কোষপ্রাচীরের মধ্যচ্ছদা (Middle lamella) গঠনে এবং মূলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম প্রয়োজন।

(ii) প্রাণীদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, অস্থি ও দাঁতের গঠন, রক্তের তঞ্চন বা জমাট বাঁধা, হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন, স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ, মাংসপেশীর সঙ্কোচন ইত্যাদির জন্য ক্যালসিয়াম প্রয়োজন। চিংড়ি ও শামুকের বহিরাবরণ গঠনেও ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়।

(iii) উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্লাজমা পর্দার ভিতর দিয়ে বিশেষ বিশেষ আয়নের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) এর অভাবে চারাগাছ অত্যধিক খর্ব হয়, মূল ও কাণ্ড দুর্বল হয় এবং গাছ থেকে অস্বাভাবিকভাবে শাখাপ্রশাখা বের হয়।

(ii) ক্যালসিয়ামের অভাবে প্রাণীদের রিকেট বা **অস্টিওম্যালাসিয়া** হয়, বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, স্নায়ুর উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়।

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ : বিভিন্ন শাকসবজি, লেবু, মসুর ডাল ইত্যাদি।

প্রাণিজ : দুধ, ডিম, মাংস, বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট মাছ।

ফসফরাস (Phosphorus)

প্রয়োজনীয়তা (Importance) :

(i) উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক তৈরিতে ফসফরাস প্রয়োজন হয়।

(ii) প্রাণীদের অস্থি ও দাঁতের গঠনে ফসফরাস প্রয়োজন।

(iii) উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই প্রোটোপ্লাজম, নিউক্লিক অ্যাসিড, কয়েক প্রকার প্রোটীন, ATP এবং শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক তৈরিতে ফসফরাস প্রয়োজন হয়।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
(ii) প্রাণীদের অস্থি ও দাঁতের গঠন বিকৃত হয় ; স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ : গম, ভুট্টা, ঢেঁকিছাঁটা চাল, সয়াবীন, বাদাম ইত্যাদি।

প্রাণিজ : দুধ, ডিম, মাংস, মাছ ইত্যাদি।

আয়োডিন (Iodine)

প্রয়োজনীয়তা (Importance) :

প্রাণীদের থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন থাইরক্সিন (Thyroxine) সংশ্লেষে আয়োডিন একান্ত প্রয়োজন।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

আয়োডিনের অভাবে প্রাণীদের **গলগন্ড** (Goiter) রোগ হয়।

উদ্ভিজ্জ : পেঁয়াজ, রসুন, বীট, বাঁধাকপি ইত্যাদি।

প্রাণিজ : সামুদ্রিক মাছ, দুধ।

সোডিয়াম (Sodium)

প্রয়োজনীয়তা (Importance) :

(i) সোডিয়াম উদ্ভিদের অভিস্রবণ চাপ (Osmotic pressure) ও কলার স্বাভাবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং উদ্ভিদদেহে অম্লতা প্রশমন করে।
(ii) প্রাণীদের রক্তের ও কলারসের (Tissue fluid) স্বাভাবিক তারল্য বজায় রাখার জন্য, হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দনের জন্য, স্নায়ুর মাধ্যমে উদ্দীপনা চলাচলের জন্য এবং পেশীর সক্রিয়তার জন্য সোডিয়ামের প্রয়োজন।
(iii) এছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্লাজমা পর্দার স্বাভাবিক ভেদ্যতা (Permeability) বজায় রাখার জন্যও সোডিয়াম প্রয়োজন।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) উদ্ভিদকোষের ভেদ্যতা নষ্ট হয়, জলসাম্য (Water balance) বজায় থাকে না এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
(ii) প্রাণীদের রক্তের স্বাভাবিক তারল্য ব্যাহত হয় ; স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয় ও পেশীর ক্লান্তি ঘটে ; দেহের ওজন হ্রাস পায়।

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ : শাকসবজি।

প্রাণিজ : মাখন, পনির (Cheese), দুধ। এছাড়া খাদ্য-লবণের (NaCl) মাধ্যমেও আমরা সোডিয়াম পাই।

পটাসিয়াম (Potassium)

প্রয়োজনীয়তা (Importance) :

(i) উদ্ভিদদেহে উৎসেচকের সক্রিয়তা বজায় রাখতে এবং উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে পটাসিয়াম প্রয়োজন।

(ii) প্রাণীদের হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ, মাংসপেশীর সঙ্কোচন, স্নায়ুর মাধ্যমে উদ্দীপনা চলাচল ও দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পটাসিয়াম প্রয়োজন।

(iii) এছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্লাজমা পর্দার ভিতর দিয়ে আয়নবিশেষের চলাচল পটাসিয়ামের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, পত্র বিবর্ণ হয়ে যায়।

(ii) প্রাণীদের অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন ঘটে, স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়, পেশীর ক্লান্তি ও দৌর্বল্য দেখা দেয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে ; দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ : আখের গুড়, আনারস, কমলালেবু, আলু, বাঁধাকপি, মটরশুঁটি গাজর ইত্যাদি।

প্রাণিজ : মুরগীর মাংস, শূকরের মাংস।

ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium)

প্রয়োজনীয়তা (Importance) :

(i) উদ্ভিদের ক্লোরোফিল গঠনে ম্যাগনেসিয়ামের প্রয়োজন (এটি ক্লোরোফিলের একটি উপাদান)।

(ii) প্রাণীদের অস্থি ও দাঁতের গঠনে ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজন ; পেশীর সঙ্কোচন এবং স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াও ম্যাগনেসিয়ামের উপর নির্ভরশীল।

(iii) এছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই কয়েকটি উৎসেচকের সক্রিয়তা ম্যাগনেসিয়ামের উপর নির্ভরশীল।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

(i) উদ্ভিদে **ক্লোরোসিস** বা **পাণ্ডুরোগ** হয়।

(ii) প্রাণীদের অস্থি ও দাঁতের অপুষ্টি ঘটে ; পেশীর সঙ্কোচন ও স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয় ; হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দন ঘটে।

উৎস (Sources) :

উদ্ভিজ্জ : দানাশস্য (Cereals), বাদাম, মটর, বরবটি, সয়াবীন ইত্যাদি।

সালফার (S)

উৎস (Sources) : শাকসবজি।

প্রয়োজনীয়তা (Importance) :

উদ্ভিদ ও প্রাণীতে নিউক্লিওপ্রোটীন গঠনে এবং উদ্ভিদের মূলের বৃদ্ধি ও শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সালফার অপরিহার্য।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, মূলের শোষণ ক্ষমতা নষ্ট হয়।

তাম্র (Cu)

উৎস (Sources) : শাকসবজি।

প্রয়োজনীয়তা (Importance) :

উদ্ভিদের ক্লোরোফিল গঠন ও উৎসেচক তৈরিতে তাম্র অপরিহার্য। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হিমোগ্লোবিন তৈরিতে, সন্ধিপদী প্রাণীর রক্তের শ্বাসকণা (respiratory pigment) হিমোসায়ানিন গঠনে, উৎসেচক গঠনে তাম্র অপরিহার্য।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

উদ্ভিদের পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়।
প্রাণীদের রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া রোগ হয়।

কোবাল্ট (Co)

উৎস (Sources) : শাকসবজি।

প্রয়োজনীয়তা (Importance) :

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সামান্য পরিমাণ কোবাল্ট প্রয়োজন। প্রাণীদের ভিটামিন B_{12}-এর প্রধান উপাদান হিসেবে এবং রক্ত গঠনে কোবাল্ট বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া (Deficiency symptoms) :

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। প্রাণীদের রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া রোগ হয়।

পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব (Significance of Nutrition) :

(i) পুষ্টির মাধ্যমেই জীবদেহের যথাযথ গঠন, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি ঘটে।
(ii) পুষ্টির মাধ্যমে জীবকোষে খাদ্যের যে সঞ্চয় ভাণ্ডার গড়ে ওঠে, তা থেকে বিভিন্ন জীবনক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পাওয়া যায়।
(iii) পুষ্টির মাধ্যমে সংগৃহীত বিভিন্ন বস্তু থেকেই জীবদেহে নানা প্রকার হরমোন, উৎসেচক ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।
(iv) পুষ্টির ফলেই জীবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়।

ভিটামিনের ছক

ভিটামিনের নাম (তেলে দ্রবণীয়)	উৎস	দৈনিক চাহিদা	কার্যকারিতা	অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া
A (রেটিনল)	উদ্ভিজ্জ—গাজর, মটরশুঁটি প্রাণিজ—কই ও হাঙর মাছের যকৃৎ নিঃসৃত তেল, দুধ।	বয়স্কদের— 4,000—5,000 Iu	দেহের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে, অস্থি ও দাঁতের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশে ; গলবিল, শ্বাসনালী, লালাগ্রন্থি ইত্যাদির আবরণী কলার সজীবতা ও সক্রিয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।	রাতকানা জেরপথ্যালমিয়া রোগ (অন্ধত্ব) অশ্রুগ্রন্থি শুকিয়ে যায় এবং কেরাটোম্যালাসিয়া হয়। চোখে ছানি পড়ে।
D (ক্যালসিফেরল)	উদ্ভিজ্জ—উদ্ভিজ্জ তেল, বাঁধাকপি। প্রাণিজ—মাছের যকৃৎ নিঃসৃত তেল, ডিম।	শিশুদের— 2000—5000 Iu বয়স্কদের—200—500 Iu	ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণে, অস্থি ও দাঁতের গঠনে, অস্থির ক্যালসিয়াম সঞ্চয়ে সাহায্য করে।	শিশুদের রিকেট অস্থিগুলি ঠিকমত গঠিত ও দৃঢ় না হওয়ার ফলে দেহের বড় বড় হাড় বেঁকে যায়। বড়দের অস্টিওম্যালাসিয়া রোগ দেখা দেয়। অস্থি ভঙ্গুর হয়। তাছাড়া, দাঁতের ক্ষয় বা ক্যারিস দেখা যেতে পারে।
E (টোকোফেরল)	উদ্ভিজ্জ—লেটুস শাক, মটরশুঁটি প্রাণিজ—ডিমের কুসুম, দুধ।	বয়স্কদের—25—30 mgm	যৌনাঙ্গের স্বাভাবিক গঠন, সন্তান ধারণ ক্ষমতা রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে অপরিহার্য, ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে কাজ করে। গর্ভপাত রোধ করে।	বন্ধ্যাত্ব (প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়), তাছাড়া পেশী ও জনন অঙ্গের বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে। ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
K (ফাইলোকুইনন) বা (ন্যাপথোকুইনন)	উদ্ভিজ্জ—পালং শাক, বাঁধাকপি। প্রাণিজ—দুধ, মাখন।	গড়ে প্রায় 5 mgm	স্বাভাবিক রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করে। পিত্ত নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে।	রক্তক্ষরণ বা হেমারেজ, স্বাভাবিক রক্ত তঞ্চন ব্যাহত হয়। পিত্ত নিঃসরণ ব্যাহত হয়।

ভিটামিনের ছক

ভিটামিনের নাম (জলে দ্রবণীয়)	উৎস	দৈনিক চাহিদা	কার্যকারিতা	অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া
ভিটামিন B কমপ্লেক্স (Vitamin B Complex) B_1 (Thiamin, থায়ামিন)	ঢেঁকিছাঁটা চাল, ডিমের কুসুম, বাদাম।	শিশুদের 0·5—6·7 mgm বয়স্কদের 1·2—1·4 mgm	কার্বোক্সিলেজ উৎসেচকের কো-এনজাইমরূপে জল-অঙ্গার বিপাকে অংশগ্রহণ করে। স্নায়ুর পুষ্টি এবং হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।	আহারে অনিচ্ছা, অপরিণত বৃদ্ধি, বেরিবেরি রোগ হয়। হাত পা ফোলে। স্নায়ু দুর্বল হয়।
B_2 (রাইবোফ্ল্যাভিন)	অঙ্কুরিত গম, দুধ, ছোলা।	শিশুদের— 0·6—1·0 mgm বয়স্কদের— 1·5—1·8 mgm	খাদ্যের বিপাকে এবং কোষীয় শ্বসনে অংশগ্রহণ করে। দৈহিক বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য। চামড়ার স্বাভাবিক সুস্থতা বজায় রাখে।	চিলোসিস—ঠোঁটের কোণে ঘা হয়, ফেটে যায়, ঠোঁট ফোলে, সেবোরিক ডারমাটাইটিস (ত্বকে মোমের মত আস্তরণ পড়ে)। কেরাটাইটিস—কর্নিয়া বা অচ্ছোদপটল স্ফীত ও রক্তাভ হয়। আলোর দিকে তাকাতে অসুবিধা হয়। অকালে চুল ওঠে।
B_1 (সায়ানোকোবালামিন)	মাছ, মাংস, ডিম, দুধ স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিসিয়াস নামক ছত্রাক।	গড়ে—1·0 mgm	লোহিত রক্তকণিকা গঠন ও নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় রাখে। সহ-উৎসেচক রূপে কাজ করে।	ক্ষুধামান্দ্য ও অবসন্নতা দেখা যায়। পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া রক্তাল্পতা দেখা যায়, স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, আন্ত্রিক শোষণে ব্যাঘাত ঘটে।
B_5 (নিয়াসিন) বা (পেলাগ্রা নিরোধক ভিটামিন)	ডিমের কুসুম, মাংস, মটর ডাল, টম্যাটো, ঈস্ট।	বয়স্কদের–16–12 mgm	কোষের জারণ-বিজারণ ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। সামগ্রিকভাবে দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং রক্তোৎপাদক কলার কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা গ্রহণ করে। পেলাগ্রা প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।	পেলাগ্রা রোগ—দেহের উন্মুক্ত অংশের ত্বকে লালচে দাগ হয়। পরে খসখসে হয়ে যায়। হাতে-পায়ে গুটির মত বের হয়। পাকস্থলী ও অন্ত্রের গোলযোগ হয়। দেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মুখ ও জিভ ফুলে যায় ও জ্বালা করে। ঠোঁটের ভিতরের দিকে পুঁজযুক্ত ফুসকুড়ি হয়।
ভিটামিন C (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড)	টম্যাটো, পেঁপে কাঁচালঙ্কা, মাছ, মাংস, দুধ।	শিশুদের–100–150 mgm বয়স্কদের— 50–75 mgm	দেহের প্রতিরক্ষায় ; রক্ত তৈরি করা, অস্থি, তরুণাস্থি, দাঁত ইত্যাদির স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা, লোহিত রক্তকণিকাকে সুস্থ রাখা ইত্যাদি।	স্কার্ভি রোগ—দাঁতের মাড়ি ফোলে, পুঁজ হয়। রক্ত ক্ষরণ ঘটে। রক্তাল্পতা, অস্থি, দাঁতের গঠন বিকৃত হয়।

বিভিন্ন খনিজ পদার্থের ছক

মৌলিক উপাদানের নাম	উৎস	দৈনিক চাহিদা	প্রয়োজনীয়তা	অভাবজনিত ফল
ক্যালসিয়াম (Ca)	দুধ, চীজ, ডিম, মাখন, লেবু ইত্যাদি।	শিশুদের—1·4 গ্রাম বয়স্কদের—0·8 গ্রাম	কোষ প্রাচীরের মধ্যচ্ছদা বা মিডল্ ল্যামেলা গঠনে, মূলের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন, অস্থি ও দাঁতের গঠন, পেশীর সংকোচন, রক্ত তঞ্চন, স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ।	পত্রবিকৃতি, মূল ও কাণ্ড দুর্বল ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। রিকেট বা অস্টিওম্যালাসিয়া, বৃদ্ধি ব্যাহত ও স্নায়ুর উত্তেজনা দেখা যায়।
ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	শাকসবজি, মাংস।	0·6 গ্রাম	ক্লোরোফিলের অভাবে পাতা হলুদ হয়, অর্থাৎ ক্লোরোসিস হয়। পেশী স্নায়ুর কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন।	বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, স্নায়ু দৌর্বল্য, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন ও অস্থির অপুষ্টি দেখা যায়।
সোডিয়াম (Na)	খাদ্য-লবণ, শাকসবজি, মাছ, ডিম।	5-10 গ্রাম	কোষের অভেদ্যতা রক্ষা, অভিস্রবণ চাপ নিয়ন্ত্রণ, কলার স্বাভাবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ, অম্লতা প্রশমন ইত্যাদি। অভিস্রবণ চাপ নিয়ন্ত্রণ, দেহে জলের ভারসাম্য রক্ষা, রসের স্বাভাবিক তারল্য বজায় রাখা, পেশীর সংকোচন প্রসারণ, বৃক্কের স্বাভাবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ।	কোষের অভেদ্যতা নষ্ট হয়, জলসাম্য বজায় থাকে না, স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ওজন হ্রাস, স্নায়ু বৈকল্য, পেশীর ক্লান্তি, রক্তের স্বাভাবিক তারল্য ব্যাহত হয়।
পটাসিয়াম (K)	শাকসবজি, মাছ, ডিম।	4 গ্রাম	কোষের অভেদ্যতা, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, উৎসেচকের সক্রিয়তা বজায় রাখা, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, রক্ত গঠন, কোষের অভিস্রবণ চাপ নিয়ন্ত্রণ, পেশীর সংকোচন, হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ।	স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত ও পত্র বিবর্ণ হয়। বৃদ্ধি ব্যাহত, স্নায়বিক বৈকল্য, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন, পেশীর ক্লান্তি ও দৌর্বল্য, ক্ষেত্রবিশেষে পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে।
ফসফরাস (P)	দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, দানাশস্য, শাকসবজি ইত্যাদি	শিশুদের—1·5 গ্রাম বয়স্কদের—1·8 গ্রাম	প্রোটোপ্লাজম গঠনে, উৎসেচক তৈরিতে, কোষ বিভাজনে অপরিহার্য, প্রোটোপ্লাজম, রক্ত, অস্থি গঠনে, খাদ্যের বিপাকে, উৎসেচক গঠনে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন।	উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও দেহগঠন ব্যাহত হয়, অস্থি ও দাঁতের গঠন বিকৃত হয়।

বিভিন্ন খনিজ পদার্থের ছক

মৌলিক উপাদানের নাম	উৎস	দৈনিক চাহিদা	প্রয়োজনীয়তা	অভাবজনিত ফল
সালফার (S)	শাকসবজি, বাঁধাকপি, দুধ ইত্যাদি	2–3 মিলিগ্রাম	নিউক্লিওপ্রোটীন গঠনে, মূলের বৃদ্ধি ও শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে অপরিহার্য, নখ, তরুণাস্থি গঠনে কার্যকর।	স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, মূলের শোষণ ক্ষমতা নষ্ট হয়, তাছাড়া শর্করা বিপাকে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।
লৌহ (Fe)	কাঁচাকলা, মোচা, লেটুস শাক, বীট, কচু, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি	12–20 মিলিগ্রাম	ক্লোরোফিল গঠন, সাইটোক্রোম উৎসেচক গঠন, মূলের স্বাভাবিক শোষণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা গ্রহণ করে। রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরিতে ও অক্সিজেন পরিবহণে কার্যকর।	পাতা হলুদ হয়ে যায় অর্থাৎ ক্লোরোসিস হয়। রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে, রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া রোগ দেখা দেয়।
তাম্র (Cu)	শাকসবজি, দুধ ইত্যাদি	2–3 মিলিগ্রাম	ক্লোরোফিল গঠন ও উৎসেচক তৈরিতে অপরিহার্য। মেরুদণ্ডী প্রাণীর হিমোগ্লোবিন তৈরিতে, সন্ধিপদী প্রাণীর রক্তের শ্বাসকণা হিমোসায়ানিন গঠনে, উৎসেচক গঠনে অপরিহার্য।	পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়। রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া রোগ হয়।
আয়োডিন (I)	দুধ, সামুদ্রিক মাছ, বীট, রসুন, পেঁয়াজ, জল ইত্যাদি	0·05–0·1 মিলিগ্রাম	থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন থাইরক্সিন সংশ্লেষে একান্ত প্রয়োজন।	গলগণ্ড রোগ হয়, স্বাভাবিক বিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয়।
কোবাল্ট (Co)	শাকসবজি	0·5 মিলিগ্রাম	উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন। প্রাণীদের ভিটামিন B_{12}-এর প্রধান উপাদান হিসেবে, রক্ত গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।	স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া রোগ হয়।
ক্লোরিন (Cl)	শাকসবজি, সাধারণ লবণ	15–20 গ্রাম	জলসাম্য রক্ষা করা, অম্ল—ক্ষারীয় সমতা বজায় রাখা।	বৃক্কের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়।

E. সংবহন (Circulation)

5.33. ভূমিকা (Introduction)

জীবদেহের বিভিন্ন কার্যকলাপ যথা—গঠন, বৃদ্ধি, শ্বসন, রেচন, ক্ষয়পূরণ প্রভৃতি সম্পাদনের জন্য সরল খাদ্যরস, অক্সিজেন, হরমোন, উৎসেচক, ভিটামিন প্রভৃতি দেহের একস্থান থেকে অন্য স্থানে সরবরাহের প্রয়োজন। আবার বিপাকের ফলে উৎপন্ন অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক পদার্থসমূহ অর্থাৎ রেচন পদার্থসমূহ দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রেচন অঙ্গে যাওয়া দরকার। এই সকল পদার্থ জীবদেহের একস্থান থেকে অন্য স্থানে কোন তরল মাধ্যমের সাহায্যে পরিবাহিত হয়। যে প্রক্রিয়ায় সরল খাদ্যরস, উৎসেচক, হরমোন, অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য রেচন পদার্থ, ক্ষরণ পদার্থ প্রভৃতি কোন তরল মাধ্যমের সাহায্যে জীবদেহের একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করে, সেই প্রক্রিয়াকেই **সংবহন** (Circulation) বলে। উদ্ভিদদেহে সংবহনকে **পরিবহণ** (Conduction or Translocation)-ও বলা হয়।

5.34. সংবহনের সংজ্ঞা (Definition of Circulation)

যে পদ্ধতিতে জীবদেহের সর্বত্র সরল খাদ্যোপাদান, অক্সিজেন, হরমোন, উৎসেচক, খনিজ পদার্থসমূহ পরিবাহিত হয় এবং বিভিন্ন কোষ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড-সহ বিভিন্ন রেচন পদার্থ রেচন অঙ্গসমূহে নীত হয়, তাকে সংবহন (Circulation) বলে।

5.35. সংবহনের মাধ্যম (Medium of Circulation)

বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে সংবহনের মাধ্যম বিভিন্ন। উদ্ভিদ ও নিম্নশ্রেণীর সরল প্রাণিদেহে এই মাধ্যম হল জল। আবার মানুষ-সহ উন্নত শ্রেণীর প্রাণিদেহে সংবহনের মাধ্যম রক্ত ও লসিকা।

(i) **জল** (Water) ঃ জলই হল উদ্ভিদের সংবহনের একমাত্র মাধ্যম। সরল খাদ্যোপাদান, অজৈব লবণ প্রভৃতি জলে দ্রবীভূত হয়ে উদ্ভিদদেহের সর্বত্র পরিবাহিত হয়।

নিম্নশ্রেণীর বহু সরল প্রাণী যথা—হাইড্রা, স্পঞ্জ প্রভৃতির ক্ষেত্রে জলই সংবহনের মাধ্যম।

(ii) **রক্ত** (Blood) ঃ রক্ত হল প্রাণিদেহের এক বিশেষ ধরনের তরল যোগকলা, যা কিছু নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ছাড়া প্রায় সকল প্রাণীরই সংবহনের প্রধান মাধ্যম।

(iii) **লসিকা** (Lymph) ঃ লসিকা হল রক্তেরই মত বর্ণহীন এক বিশেষ তরল যোগকলা, যা বস্তুতপক্ষে রক্ত থেকেই উৎপন্ন হয়। প্রাণিদেহে লসিকা হল সংবহনের একটি বিশেষ মাধ্যম।

5.36. উদ্ভিদের সংবহন (Circulation in plants)

নিম্নশ্রেণীর জলজ উদ্ভিদে সাধারণত অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় সংবহন হয়ে থাকে। সংবহন কলাবিহীন বহুকোষী উদ্ভিদ শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইটা প্রভৃতিতে কোষান্তর অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জলের এবং ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য পদার্থের

সংবহন হয়ে থাকে। আর সংবহন কলাযুক্ত উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদে শিরাত্মক কলার জাইলেম ও ফেলায়েমের মাধ্যমে সংবহন হয়। দেহের যে সমস্ত অংশে সংবহন কলার বিন্যাস নেই, সেখানে অভিস্রবণ ও কোষান্তর অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় সংবহন ক্রিয়া ঘটে। উদ্ভিদের জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ ও জলে দ্রবীভূত খাদ্যবস্তুর সংবহন তন্ত্র পৃথক। জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণের সংবহন জাইলেম কলার মাধ্যমে এবং খাদ্যবস্তুসমূহের সংবহন ফেলায়েম কলার মাধ্যমে ঘটে।

উদ্ভিদদেহের সংবহনকে নিম্নলিখিত দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(1) জল ও অজৈব লবণের দ্রবণের সংবহন (রসের উৎস্রোত)।

(2) খাদ্যবস্তুসমূহের সংবহন।

(1) জল ও অজৈব লবণের দ্রবণের সংবহনঃ সংবহন কলাযুক্ত উদ্ভিদ জল ও জলে দ্রবীভূত অজৈব লবণের দ্রবণ মূল দিয়ে শোষণ করে এবং মূল থেকে তা ঊর্ধ্ব দিকে পাতা পর্যন্ত জাইলেম কলা দিয়ে পরিবাহিত হয়। এই জল ও

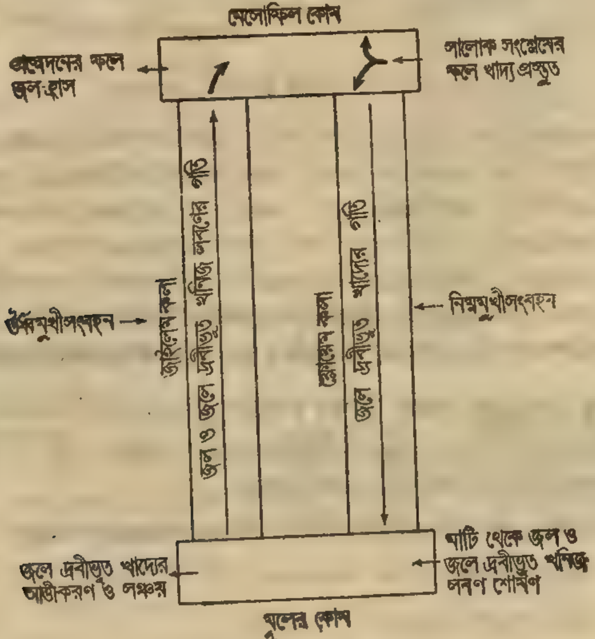

চিত্র 5.51 ঃ নক্‌শা চিত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের জল সংবহন জাইলেম কলার এবং খাদ্য পরিবহণ ফ্লোয়েম কলার মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে।

খনিজ লবণের দ্রবণ ঊর্ধ্বাংশে বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ায় দেহজ বস্তুতে পরিণত হয় এবং অতিরিক্ত জল বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় পরিবেশে মুক্ত হয়। ফলে মূলরোম সব সময় জল শোষণ করতে থাকে এবং অতিরিক্ত জল বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় বাষ্পাকারে

নির্গত হতে থাকে। অবশ্য এই জল শোষণ ও বাষ্পমোচন বিভিন্ন শর্তের উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে জল ও প্রধানত বর্ধনশীল অঞ্চল দ্বারা খনিজ লবণ শোষণ করলে ঐ জল ও খনিজ লবণ কোষান্তর অভিস্রবণ ও ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কর্টেক্সের কোষসমূহের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হতে থাকে। এতে এন্ডোডারমিস-সংলগ্ন কর্টেক্সের কোষগুলি রসস্ফীত হয়ে পড়ে। এই কোষগুলির সম্মিলিত রসস্ফীতি চাপ এন্ডোডারমিসের **পারণ কোষের (Passage cells)** মাধ্যমে

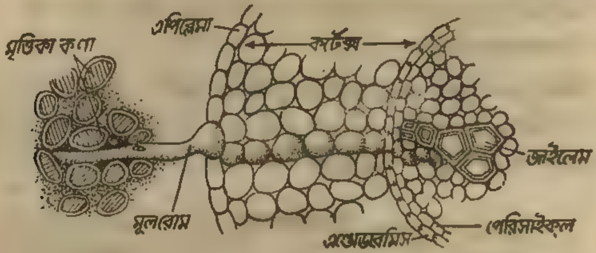

চিত্র 5.52 : মাটি থেকে উদ্ভিদের জল শোষণ।

জলীয় দ্রবণকে জাইলেম বাহিকায় প্রেরণ করে। এই সম্মিলিত চাপকেই **মূলজ চাপ** বা **মূলজ প্রেষ** (root pressure) বলে। জল ও জলে দ্রবীভূত এই অজৈব খনিজ লবণকে একত্রে **রস** বা **স্যাপ** (Sap) বলে। জাইলেম বাহিকায় প্রেরিত হলে এই রস উপরের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে এবং সবশেষে পাতায় পৌঁছায়। রসের এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহকে **রসের উৎস্রোত** (Ascent of sap) বলে। সুতরাং, **মূল দ্বারা শোষিত জল ও খনিজ লবণ যে প্রক্রিয়ায় জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে অভিকর্ষের বিপরীতে উদ্ভিদের ঊর্ধ্বাঙ্গসমূহে পরিবাহিত হয়, তাকে রসের উৎস্রোত বলে।**

রসের উৎস্রোত সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Theories of ascent of sap) : উদ্ভিদদেহে রসের উৎস্রোত সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এই মতবাদগুলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

A. **মূলজ চাপ বা মূলজ প্রেষ মতবাদ** (Root pressure theory)

B. **অধিপ্রাণ মতবাদ** (Vital theories)

C. **ভৌত মতবাদ** (Physical theories)

A. মূলজ চাপ বা **মূলজ প্রেষ মতবাদ :** উদ্ভিদ মূল দিয়ে মাটি থেকে জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করে। মূল দিয়ে শোষিত এই রস প্রধানত কর্টেক্সের (Cortex) কোষসমূহের দ্বারা সম্মিলিতভাবে একপ্রকার অভিস্রবণ-ঘটিত চাপের সৃষ্টি করে জাইলেম বাহিকায় প্রবিষ্ট হয়। এই চাপকে **মূলজ চাপ** বা **মূলজ প্রেষ** বলে। এই চাপের ফলেই রস মূল থেকে কান্ডে এসে পৌঁছায়। মূলজ চাপের ফলে জাইলেম বাহিকার মধ্যে এক ঊর্ধ্বমুখী সংবহন

পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই মূলজ চাপের পরিমাণ 2 বায়ুমণ্ডলীয় চাপের (2 atm. pressure) বেশী নয় বলে বীরুৎ ও গুল্ম ছাড়া সুদীর্ঘ উদ্ভিদে এই প্রক্রিয়ায় জল ঊর্ধ্বাঙ্গসমূহে পরিবাহিত হতে পারে না। ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রাপ্ত দীর্ঘতম উদ্ভিদ **রেডউড** (*Sequadendron gigantia*) নামক ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের উচ্চতা প্রায় 110 মিটার বা 350 ফুট। এইসব উদ্ভিদে রসের উৎস্রোতের ব্যাপারে মূলজ চাপ বা মূলজ প্রেষ মতবাদকে আদৌ সমর্থন করা যায় না।

B. অধিপ্রাণ মতবাদ : এই মতবাদ অনুযায়ী ঊর্ধ্বমুখী সংবহন উদ্ভিদের সজীব কোষগুলির জীবন বিধায়ক প্রক্রিয়ার (vital activity) উপর নির্ভরশীল। এই মতবাদ আবার (i) **রিলে পাম্প থিওরি** (Relay pump theory) এবং (ii) **পালসেটরী মুভমেণ্ট থিওরি** (Pulsatory movement theory)—এই দু ভাগে বিভক্ত।

(i) **রিলে পাম্প থিওরি :** বিজ্ঞানী **গড্‌লিউস্কি** (Godlewski, 1884) এই মতবাদের প্রবক্তা। এই মতবাদ অনুযায়ী ঊর্ধ্বমুখী সংবহন নির্ভর করে জাইলেম কলার চারপাশের সজীব প্যারেনকাইমা কোষগুলির জীবন বিধায়ক প্রক্রিয়ার উপর। এই প্যারেনকাইমা কোষগুলির মধ্যে সবসময় পর্যায়ক্রমে অভিস্রবণ চাপের পরিবর্তন ঘটে। ফলে কোষগুলি ক্রমান্বয়ে জাইলেম বাহিকা থেকে জল নেয় এবং বাহিকার মধ্যে জল প্রেরণ করে। এর ফলেই জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে রসের উৎস্রোত সম্ভব।

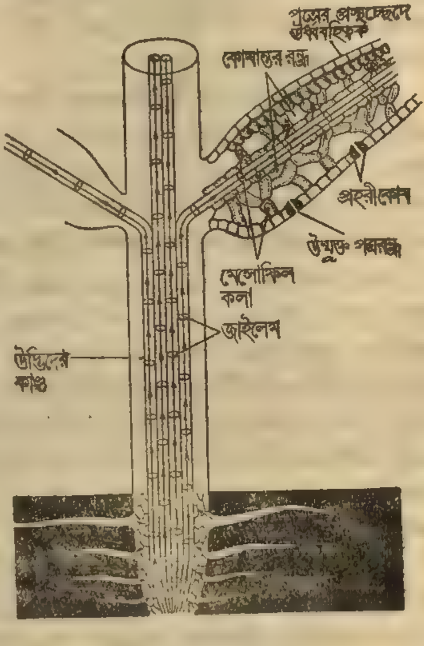

চিত্র 5.53 : জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে উদ্ভিদে রসের উৎস্রোত।

(ii) **পালসেটরী মুভমেণ্ট থিওরি :** বাঙ্গালী বিজ্ঞানী **স্যার জগদীশচন্দ্র বসু** (Sir J. C. Bose, 1923) এই মতবাদের প্রবক্তা। তাঁর মতে কর্টেক্সের ভিতর দিকের কোষসমূহের (Inner cortical layer of cells) পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ (Pulsatory movement) ঘটে। এই সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলেই রসের উৎস্রোত ঘটে। যখন কোষগুলি সঙ্কুচিত হয়, তখন রস (sap) উপরের কোষে প্রবেশ করে এবং স্ফীত হয়। এই স্ফীত কোষ আবার সঙ্কুচিত হলে পরবর্তী কোষে রসের প্রবেশ ঘটে। এইভাবেই রস কোষ থেকে কোষে উপরের দিকে পরিবাহিত হয়।

বর্তমানে অধিপ্রাণ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে জীবিত কোষগুলিকে মেরে ফেললেও রসের উৎস্রোত অব্যাহত থাকে।

C. **ভৌত মতবাদ**ঃ এই মতবাদ অনুযায়ী রসের উৎস্রোতের জন্য কোন জীবিত কোষ দায়ী নয়। বিভিন্ন প্রকার ভৌত প্রক্রিয়া রসের উৎস্রোত ঘটায়।

রসের উৎস্রোত-সংক্রান্ত ভৌত মতবাদগুলি নিচে আলোচনা করা হল ঃ

(i) **বায়ুমণ্ডলীয় চাপ** (Atmospheric pressure)ঃ **টরিসেলির** পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্যারোমিটারের মধ্যে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পারদস্তম্ভকে ধরে রাখে এবং সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ 76 cm পারদস্তম্ভকে ধরে রাখতে পারে। অনুরূপভাবে, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ জলকে জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে উপরে ঠেলে রাখে। তবে সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ফলে জলস্তম্ভ 9 মিটারের বেশী উঁচুতে উঠতে পারে না। তাছাড়া, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কার্যকর হওয়ার জন্য মুক্ততল (Free surface) প্রয়োজন, যা উদ্ভিদমূলের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। সুতরাং এই মতবাদ রসের উৎস্রোতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(ii) **বাষ্পমোচন—সংসক্তি টানবাদ** (Transpiration—Cohesion Tension theory)ঃ বিজ্ঞানী **ডিক্সন** ও **জলি** (Dixon and Jolly, 1895) এই মতবাদের প্রবক্তা। তাঁদের মতে মূল থেকে পাতা পর্যন্ত জলের অণুগুলি নিজেদের মধ্যে সংসক্তি বা সমসংযোগ (Cohesion) এবং জাইলেম বাহিকার সঙ্গে আসঞ্জন বা অসমসংযোগ (Adhesion)-এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন জলস্তম্ভের আকারে থাকে।

জলের সংসক্তি চাপ (Cohesion force) 300 atm. pressure। পাতার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া চলতে থাকায় পাতার জাইলেম বাহিকাগুলির মধ্যে অবস্থিত জলস্তম্ভের উপরের তল থেকে জল বাষ্পাকারে নির্গত হতে থাকে। এই বাষ্পমোচনের ফলে বাহিকার জলস্তম্ভে একটি টানের সৃষ্টি হয়। একে **বাষ্পমোচন টান** বা **ট্রান্সপিরেশন পুল** (Transpiration pull) বলে। এই বাষ্পমোচন টানের জন্যই জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে রসের উৎস্রোত অব্যাহত থাকে। বর্তমানে এই মতবাদই সর্বাধিক স্বীকৃত। তবে বীরুৎ, গুল্ম প্রভৃতির ক্ষেত্রে রসের উৎস্রোতের জন্য অন্যান্য মতবাদও প্রযোজ্য হতে পারে।

(2) **খাদ্যবস্তুসমূহের সংবহন**ঃ উদ্ভিদদেহে জৈব খাদ্যবস্তু সবুজ বা ক্লোরোফিলযুক্ত অঙ্গসমূহে তৈরি হয়। সবুজ অঙ্গে তৈরি সরল দ্রাব্য শর্করা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বর্ধনশীল অঞ্চলে পরিবাহিত হয় এবং প্রয়োজনে ফল, মূল ইত্যাদি অঙ্গে জটিল খাদ্যরূপে সঞ্চিত থাকে। আবার বিভিন্ন বিপাকীয় কাজের সময় ঐ সমস্ত জটিল খাদ্যবস্তু সরল অবস্থায় বিভিন্ন বর্ধনশীল অঙ্গে পরিবাহিত হয়। সুতরাং উদ্ভিদদেহে খাদ্যবস্তু ঊর্ধ্ব ও নিম্ন উভয় দিকেই পরিবাহিত হতে পারে।

সাধারণত উদ্ভিদদেহে জৈব খাদ্যবস্তু জলে দ্রবীভূত অবস্থায় বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয় এবং খাদ্য সঞ্চয়কারী অঙ্গসমূহে ঐগুলি আবার জটিল অদ্রবণীয় অবস্থায় পরিণত হয়। উদ্ভিদদেহে খাদ্যবস্তুর এই সংবহন ফ্লোয়েম কলার সীভনল দিয়েই হয়ে থাকে।

ফেন্নায়েম কলার সীভনলগুলি প্রান্তীয় সীভ প্লেটের প্লাসমোডেসমাটা বা সংযোগ রক্ষাকারী সাইটোপ্লাজমীয় তন্তুর মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত (চিত্র 5.54)। এই সংযোগ মূল থেকে পাতা পর্যন্ত সমস্ত সীভনলের মধ্যে বর্তমান। আবার সীভনলের সাইটোপ্লাজম প্রতিনিয়ত আবর্তিত হতে থাকে। ফলে দ্রবণীয় জৈব খাদ্যবস্তু প্রতিটি সীভনলের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সব সময় উপর থেকে নিচে আবার নিচু থেকে উপরে আবর্তিত অবস্থায় থাকে এবং সীভনলগুলির প্লাসমোডেসমাটার মাধ্যমে সন্নিহিত সীভনলে পরিবাহিত হয়। এইভাবে খাদ্যবস্তু উপরে এবং নিচের দিকে পরিচালিত হয়। সাইটোপ্লাজমীয় আবর্তের দ্বারা খাদ্যবস্তুর ফেন্নায়েম কলার মাধ্যমে সংবহন সম্পর্কে সর্বপ্রথম **হুগো ডি ভ্রিস** (Hugo de Vries, 1885) তাঁর মতবাদ প্রচার করেন।

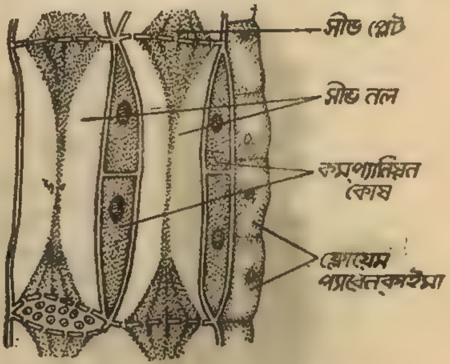

চিত্র 5.54 : লম্বচ্ছেদে ফেন্নায়েম কলা।

প্রাণীর সংবহন (Circulation in animals)

5.37. অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহন (Circulation in Invertebrates)

এককোষী ও বহুকোষী নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সংবহন পদ্ধতি খুবই সরল। অধিকাংশ অমেরুদন্ডী প্রাণীর দেহে প্রকৃত সংবহন তন্ত্র নেই। প্রকৃত সংবহন তন্ত্রে নির্দিষ্ট নালীপথে জলীয় পদার্থের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহের চলাচল ঘটে।

আদ্যপ্রাণী অ্যামিবার কোষস্থ সাইটোপ্লাজমে যে চক্রাকার আবর্তন দেখা যায়,

চিত্র 5.55 : কেঁচোর প্রধান রক্তবাহগুলি দেখানো হয়েছে।

তার মাধ্যমেই সংবহন সম্পন্ন হয়। স্পঞ্জ, হাইড্রা প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সংবহন সম্পন্ন হয়।

প্রাণিরাজ্যে প্রকৃত সংবহন তন্ত্র প্রথম লক্ষ্য করা যায় অ্যানিলিডা বা অঙ্গুরীমাল পর্বে। এই পর্বের প্রাণী কেঁচোর দেহে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত কয়েকটি রক্তবাহের মাধ্যমে রক্ত সারাদেহে প্রবাহিত হয়ে সংবহনের কাজ সম্পন্ন করে। কেঁচোর প্রকৃত হৃৎপিণ্ড নেই। পার্শ্বীয় হৃৎপিণ্ড নামে চারজোড়া মোটা রক্তবাহ হৃৎপিণ্ডের কাজ করে (চিত্র 5.55)। রক্ত সর্বদাই বিভিন্ন রক্তবাহের মধ্য দিয়ে তথাকথিত হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। রক্ত কখনোই দেহ-গহ্বরে মুক্ত হয় না। এ ধরনের সংবহনকে **বদ্ধ সংবহন** (Closed circulation) বলে।

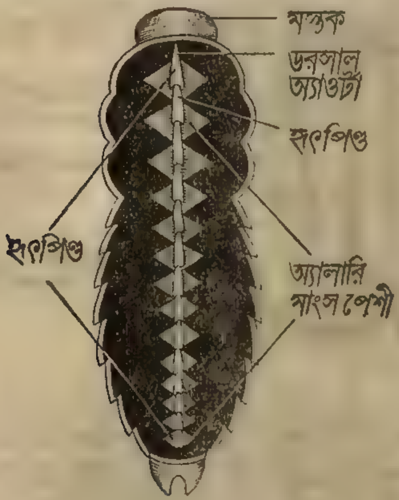

চিত্র 5.56 : আরশোলার হৃৎপিণ্ড।

আরথ্রোপোডা বা সন্ধিপদ পর্বভুক্ত পতঙ্গশ্রেণীর প্রাণী আরশোলার ক্ষেত্রে সংবহন তন্ত্র রক্ত, হৃৎপিণ্ড ও অ্যাওর্টা বা মহাধমনী নিয়ে গঠিত।

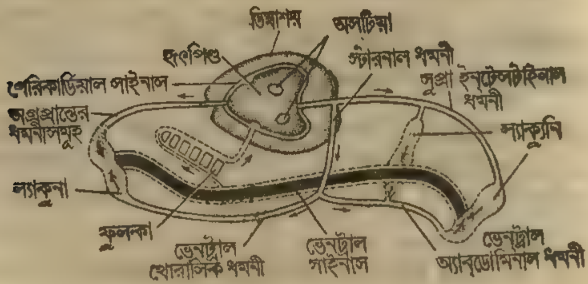

চিত্র 5.57 : চিংড়ির রক্ত সংবহন দেখানো হয়েছে।

এদের দেহে শিরা বা জালক নেই। নলাকৃতি দীর্ঘ হৃৎপিণ্ড পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস নামক থলির মধ্যে অবস্থিত। আরশোলার হৃৎপিণ্ড দীর্ঘ, 13টি প্রকোষ্ঠযুক্ত এবং প্রতিটি প্রকোষ্ঠ একজোড়া ছিদ্র বা অসটিয়া দিয়ে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে উন্মুক্ত হয়। হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত হলে রক্ত মহাধমনী পথে প্রবাহিত হয়ে দেহ-গহ্বরে প্রবেশ করে। এ ধরনের দেহ-গহ্বরকে **হিমোসিল*** (Haemocoel) বলে। পরে অ্যালারি পেশী নামক পেশীর সঙ্কোচনের দ্বারা রক্ত হিমোসিল থেকে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে এসে পৌঁছায় এবং অসটিয়া দিয়ে হৃৎপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। রক্ত দেহ-গহ্বরে উন্মুক্ত হয়। তাই এদের সংবহন মুক্ত (open) প্রকৃতির।

* দেহ-গহ্বরের মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলে, ঐরূপ দেহ-গহ্বরকে হিমোসিল বলা হয়।

কেঁচোর প্রধান রক্তবাহগুলি দেখান হইয়াছে।

মলাস্কা বা কম্বোজ পর্বভুক্ত শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডে দুটি অলিন্দ ও একটি নিলয় আছে। এই সব প্রাণীতে সংবহন তন্ত্র পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরে অবস্থিত হৃৎপিণ্ড, মহাধমনী, শিরা নিয়ে গঠিত। দেহের পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত হলে রক্ত নিলয় থেকে **অগ্র মহাধমনী** (anterior aorta) এবং **পশ্চাৎ মহাধমনী** (posterior aorta) দিয়ে সমগ্র দেহে প্রবাহিত হয়। বেশীর ভাগ

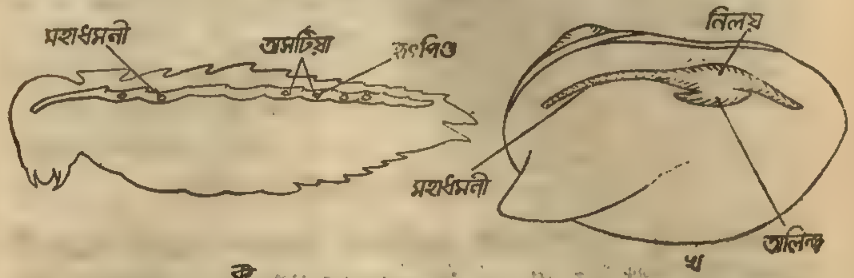

চিত্র 5.58 : দুটি প্রাণীর সংবহন তন্ত্র। (ক) পতঙ্গ, (খ) ঝিনুক।

রক্তই নালীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে শিরাপথে অলিন্দে পৌঁছায়। কিন্তু রক্তের সামান্য অংশ ধমনীর মাধ্যমে দেহ-গহ্বরে উন্মুক্ত হয় এবং পরে দেহ-গহ্বর থেকে রক্ত শিরার মাধ্যমে অলিন্দে পৌঁছায়। এদের রক্ত আবদ্ধ ও মুক্ত দু ভাবেই প্রবাহিত হয় বলে এ ধরনের সংবহনকে **অর্ধবদ্ধ-অর্ধমুক্ত সংবহন** (half closed-half open circulation) বলে।

5.38. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহন
(Circulation in Vertebrates)

মেরুদণ্ডী প্রাণীর সংবহন তন্ত্র হৃৎপিণ্ড, ধমনী, জালক, শিরা ও লসিকাবহ নিয়ে গঠিত এবং সংবহন ক্রিয়া রক্ত ও লসিকা নামক তরল পদার্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীরই সংবহন তন্ত্র **বদ্ধ** প্রকৃতির। মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনীতে প্রবেশ করে এবং সমগ্র দেহে রক্ত বিস্তৃতি লাভ করে। ঐ ধমনী শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে জালক সৃষ্টি করে শিরার মাধ্যমে সমগ্র দেহ থেকে রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের গঠন, আকৃতি এবং রক্তের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন।

বদ্ধ ও মুক্ত সংবহন তন্ত্র (Closed and open circulatory system) : প্রকৃত সংবহন তন্ত্র-বিশিষ্ট প্রাণীদের সংবহন তন্ত্রকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—(i) **বদ্ধ সংবহন তন্ত্র** ও (ii) **মুক্ত সংবহন তন্ত্র**।

(i) **বদ্ধ সংবহন তন্ত্র** (Closed circulatory system) : সংবহন কালে রক্ত যদি সর্বদাই রক্তবাহের (ধমনী, শিরা, জালক ইত্যাদি) মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তবে এই প্রকার সংবহন তন্ত্রকে **বদ্ধ সংবহন তন্ত্র** বলা হয় [চিত্র 5.59 (ক)]। **উদাহরণ**—সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং কেঁচো, সিপিয়া, অকটোপাস প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

(ii) **মুক্ত সংবহন তন্ত্র** (Open circulatory system) : সংবহন কালে রক্ত যদি রক্তবাহ থেকে বের হয়ে বিভিন্ন যন্ত্র ও কলার আশপাশের ফাঁকা জায়গা বা **ল্যাকুনীর*** মধ্য দিয়ে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে পুনরায় রক্তবাহে প্রবেশ করে, অর্থাৎ সংবহন কালে রক্ত যদি সর্বদা রক্তবাহের মধ্যে আবদ্ধ না থাকে, তবে এই প্রকার সংবহন তন্ত্রকে **মুক্ত সংবহন তন্ত্র** বলা হয় [চিত্র 5.59 (খ)]। **উদাহরণ**—চিংড়ি, কাঁকড়া, পতঙ্গ, ঝিনুক ইত্যাদি অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

চিত্র 5.59 : (ক) বদ্ধ সংবহন তন্ত্র, (খ) মুক্ত সংবহন তন্ত্র।

অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহন তন্ত্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য (Some important differences between the circulatory systems of Invertebrates and Vertebrates) :

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
1. মুক্ত ও বদ্ধ দু প্রকার সংবহন তন্ত্রই দেখা যায়।	1. প্রতি ক্ষেত্রেই সংবহন তন্ত্র বদ্ধ প্রকৃতির।
2. যেসব ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের অস্তিত্ব আছে সেরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রেই হৃৎপিণ্ড পৌষ্টিক তন্ত্রের পৃষ্ঠভাগে (dorsal side) থাকে।	2. হৃৎপিণ্ডের অবস্থান সব ক্ষেত্রেই পৌষ্টিক তন্ত্রের অঙ্কভাগে (ventral side)।
3. সব ক্ষেত্রে রক্তে অক্সিজেন-বাহক (oxygen carrier) থাকে না।	3. সব ক্ষেত্রেই রক্তে অক্সিজেন-বাহক আছে।
4. যেসব ক্ষেত্রে রক্তে অক্সিজেন-বাহক পাওয়া যায়, সেরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে অক্সিজেন-বাহক একই রকমের নয়। প্রধানত দু রকমের অক্সিজেন-বাহক অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়, (i) **হিমোগ্লোবিন** ও (ii) **হিমোসায়ানিন**	4. প্রতিটি ক্ষেত্রেই **হিমোগ্লোবিন** অক্সিজেন-বাহকরূপে কাজ করে।

* হিমোসিলের অংশ।

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
5. অক্সিজেন-বাহক **রক্তরস** বা **প্লাজমায়** থাকে—কখনই রক্ত-কণিকার মধ্যে থাকে না।	5. অক্সিজেন-বাহক সর্বদাই **রক্ত-কণিকার** মধ্যে থাকে, কখনই রক্তরস বা প্লাজমায় থাকে না।
6. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের তুলনায় রক্তে কণিকার পরিমাণ কম এবং কণিকাগুলি সবই মেরুদণ্ডীদের শ্বেতকণিকার মত।	6. অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের তুলনায় রক্তে কণিকার পরিমাণ বেশী ; লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা নামে মোট তিন প্রকার রক্তকণিকা আছে।

5.39. রক্ত- (Blood) : [211 নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

5.40. প্রাণিদেহে রক্তের পরিমাণ (Volume of blood in animals) : [211 নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

5.41. রক্তের উপাদান (Components of Blood) : [212 নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

5.42. রক্তের কার্য (Functions of Blood) : [220-221 নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

5.43. রক্ত তঞ্চন (Coagulation of Blood) : [220-221 নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

5.44. রক্তগোষ্ঠী (Blood Groups)

দুর্ঘটনা অথবা অস্ত্রোপচারের ফলে যখন কোন ব্যক্তির দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়, সেই সময় উক্ত ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্য তাকে রক্তদান করা হয়। কিন্তু এই রক্তদানের (blood transfusion) ব্যাপারে যদি দাতা ও গ্রহীতার রক্তে ঠিক-ঠিক মিল না হয় তাহলে গ্রহীতার জীবন বিপন্ন হতে পারে, এমনকি তার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। এর কারণ রক্তে উপস্থিত কয়েক প্রকার প্রোটীন। এদের **প্রোটীন ফ্যাক্টর** (protein factors) বলা হয়।

প্রোটীন ফ্যাক্টরের ভিন্নতা অনুযায়ী আমাদের রক্তকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; যথা—A, B, AB এবং O।

প্রোটীন ফ্যাক্টরগুলি দু প্রকারের—লোহিত কণিকায় উপস্থিত ফ্যাক্টরগুলিকে **অ্যান্টিজেন** (antigen) বা **অ্যাগ্লুটিনোজেন** (agglutinogen) এবং প্লাজমা বা রক্তরসে (plasma) উপস্থিত ফ্যাক্টরগুলিকে **অ্যান্টিবডি** (antibody) বা **অ্যাগ্লুটিনিন** (agglutinin) বলা হয়।

অ্যান্টিজেন দু রকমের—A এবং B ; অ্যান্টিবডি-ও দু রকমের—α (আলফা) ও β (বিটা)।

কোন্ শ্রেণীর রক্তে কি প্রকার অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি থাকে তা নিচের তালিকায় দেখানো হল ঃ

রক্তগোষ্ঠীর নাম	লোহিত কণিকায় উপস্থিত অ্যান্টিজেন	রক্তরসে উপস্থিত অ্যান্টিবডি
A	A	β (বিটা)
B	B	∝ (আলফা)
AB	AB	কোনটিই নেই
O	কোনটিই নেই	∝ (আলফা), β (বিটা)

লোহিত কণিকায় উপস্থিত অ্যান্টিজেন তার প্রতিকূল অ্যান্টিবডির সংস্পর্শে এলে তাদের পরস্পরের বিক্রিয়ায় লোহিত কণিকাগুলি দলা (clump) পাকিয়ে যায় এবং অবশেষে কণিকাগুলির বিনাশ ঘটে। লোহিত কণিকাগুলির এরূপ দলা পাকিয়ে যাওয়াকে বলা হয় **অ্যাগ্লুটিনেশান** (Agglutination)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, অ্যান্টিবডি-∝ (আলফা) A-অ্যান্টিজেনের পক্ষে প্রতিকূল, অ্যান্টিবডি-β (বিটা) B-অ্যান্টিজেনের পক্ষে প্রতিকূল।

এই কারণে, A-রক্তগোষ্ঠীর মানুষের রক্ত B-রক্তগোষ্ঠীর মানুষের দেহে প্রবেশ করালে অথবা B-রক্তগোষ্ঠীর মানুষের রক্ত A-রক্তগোষ্ঠীর মানুষের দেহে প্রবেশ করালে প্রবিষ্ট লোহিত কণিকাগুলি দলা পাকিয়ে যায়। ঐ দলা-পাকানো কণিকাগুলি রক্তজালকে অবরোধ সৃষ্টি করে রক্ত-সংবহনে ব্যাঘাত ঘটায়। এর পরিণতিতে রক্ত-গ্রহীতার মৃত্যু ঘটে।

রক্তদানের ক্ষেত্রে, **দাতার** রক্তে যদি গ্রহীতার রক্তের 'প্রতিকূল অ্যান্টিবডি' থাকে তা হলে কোন ক্ষতি হয় না ; কেননা, গ্রহীতার মোট রক্তের পরিমাণের তুলনায় দাতার রক্তের পরিমাণ কম হওয়ায় প্রতিকূল অ্যান্টিবডি গ্রহীতার দেহে এসে লঘু (dilute) হয়ে যায়। কিন্তু **গ্রহীতার** রক্তে দাতার রক্তের 'প্রতিকূল অ্যান্টিবডি' থাকলে তাতে বিপদ ঘটে ; কেননা, এক্ষেত্রে অ্যান্টিবডির পরিমাণ যথেষ্ট বেশী হয়। O-শ্রেণীর রক্তদাতার রক্তে কোন প্রকার অ্যান্টিজেন না থাকায় তারা সকল রক্তগোষ্ঠীর মানুষকে রক্ত দান করতে পারে। এই কারণে তাদের **সার্বিক রক্তদাতা** (Universal blood donor) বলা হয়। অপরপক্ষে, AB-রক্তগোষ্ঠীর মানুষের রক্তে কোনপ্রকার অ্যান্টিবডি না থাকায় তারা সকল শ্রেণীর রক্ত গ্রহণ করতে পারে। এই কারণে AB-রক্তগোষ্ঠীর মানুষকে বলা হয় **সার্বিক রক্ত গ্রহীতা** (Universal blood recipient)। কোন্ রক্তগোষ্ঠীর মানুষ কি কি প্রকার রক্ত গ্রহণ করতে পারে এবং কোন্ কোন্ রক্তগোষ্ঠীর মানুষকে রক্ত দান করতে পারে পাশের পৃষ্ঠার তালিকায় তার উল্লেখ করা হল।

রক্তগোষ্ঠীর নাম	যে গোষ্ঠীর রক্ত গ্রহণ করতে পারে	যে সকল গোষ্ঠীকে রক্ত দান করতে পারে
O	O	O, A, B, AB
A	A, O	A, AB
B	B, O	B, AB
AB	A, B, AB, O	AB

জাতি বা ধর্মগত ভিন্নতার জন্য কোন বিশেষ রক্তগোষ্ঠীর ব্যক্তিদের রক্তে কোন তারতম্য হয় না। ফলে রক্তগোষ্ঠীর কোন অমিল না থাকলে একটি নির্দিষ্ট জাতি বা ধর্মের মানুষের রক্ত অপর এক জাতির বা ধর্মের মানুষকে দেওয়ার ব্যাপারে কোন শারীরবৃত্তীয় বাধা নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, A-গোষ্ঠীর একজন হিন্দু প্রয়োজনবোধে স্বচ্ছন্দে A-গোষ্ঠীর একজন মুসলমান বা খ্রীষ্টানকে রক্তদান করতে পারেন। অনুরূপ ভাবে, A-গোষ্ঠীর একজন ভারতীয় স্বচ্ছন্দে A-গোষ্ঠীর একজন ইংরেজ বা জাপানীর রক্ত গ্রহণ করতে পারেন।

প্রয়োজনের সময় নির্দিষ্ট শ্রেণীর রক্তদাতা সর্বদা পাওয়া যায় না। সেইজন্য বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে **ব্লাড ব্যাঙ্ক** (Blood bank) গড়ে উঠেছে। এইসব ব্যাঙ্কে সকল শ্রেণীর রক্ত মজুত থাকে। প্রয়োজনে সেখান থেকে রক্ত সংগ্রহ করা যায়।

বর্তমানে রক্তদান (blood transfusion) প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য 'শুষ্ক প্লাজমা' (কণিকাবিহীন) মজুত করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্লাজমাকে মজুত করার উপযুক্ত করে তৈরি করার সময় তার ভিতরকার অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডিকে প্রশমিত (neutralize) করা হয়। ফলে যে-কোন শ্রেণীর প্লাজমা যে-কোন রক্তগোষ্ঠীর গ্রহীতাকে নির্বিঘ্নে দেওয়া যেতে পারে।

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ O এবং A-রক্তগোষ্ঠীভুক্ত। তাদের মোট সংখ্যা জনসংখ্যার প্রায় 80% (শতকরা আশি ভাগ)। সেই তুলনায় B এবং AB-গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তার মধ্যে AB-গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে কম, আনুমানিক 6%। পৃথিবীর ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে বিভিন্ন রক্তগোষ্ঠীর মানুষের শতকরা হারে কিছুটা তারতম্য দেখা যায়।

মানুষরূপী বানরদের (Anthropoid apes) মধ্যেও মানুষের মত রক্তগোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে।

5.45. রক্ত-সংবহন তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ
(Different components of blood circulatory system)

A. হৃৎপিণ্ড (Heart) ঃ বিশেষ প্রকার পেশী (হৃৎপেশী) দিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় রক্ত-সরবরাহক যন্ত্রই হল হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ডের পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলেই অনবরত রক্ত সারা দেহে সঞ্চালিত হয়। মূলত হৃৎপিণ্ড দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। এক অংশ রক্ত গ্রহণ করে এবং অন্য অংশটি রক্ত প্রেরণ করে। রক্ত-গ্রাহক

অংশটি অপেক্ষাকৃত পাতলা প্রাচীরযুক্ত এবং একে **অলিন্দ (Atrium or Auricle)** বলে। রক্ত-প্রেরক অংশটি অপেক্ষাকৃত স্থূল প্রাচীরযুক্ত এবং একে **নিলয় (Ventricle)** বলে। অলিন্দ ও নিলয় পরস্পর কপাটিকা (Valve)-যুক্ত ছিদ্রের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। কপাটিকা রক্ত প্রবাহের দিক নিয়ন্ত্রণ করে। অলিন্দ সঙ্কুচিত হলে রক্ত ছিদ্রপথে নিলয়ে প্রবেশ করে, কিন্তু নিলয় সঙ্কুচিত হলে অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথের কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায় বলে রক্ত নিলয় থেকে অলিন্দে যেতে পারে না।

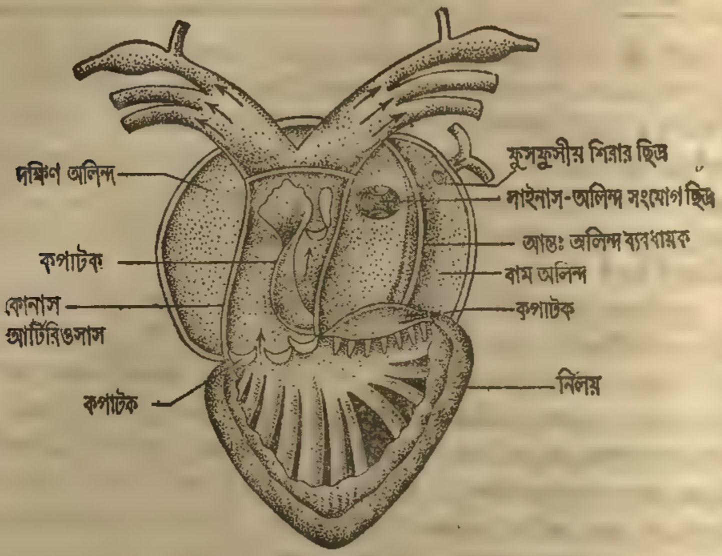

চিত্র 5.60 ঃ ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ [তীর চিহ্নের দ্বারা রক্ত প্রবাহের দিক নির্দেশ করা হয়েছে।]

● **মাছের নলাকৃতি হৃৎপিণ্ড একটি অলিন্দ ও একটি নিলয়** নিয়ে গঠিত। এই দুটি প্রধান প্রকোষ্ঠ ছাড়াও এদের অলিন্দের আগে আর একটি আনুষঙ্গিক প্রকোষ্ঠ থাকে, যাকে **সাইনাস ভেনোসাস** (Sinus venosus) বলে। এই প্রকোষ্ঠগুলি পর পর সাজানো থাকে এবং কপাটিকাযুক্ত ছিদ্রপথে পরস্পর যুক্ত। একটি অলিন্দ ও একটি নিলয় দিয়ে গঠিত বলে মাছের হৃৎপিণ্ডকে **দুই প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ড** বলে। মাছের সমগ্র দেহ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত দূষিত রক্ত সাইনাস ভেনোসাসে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে এই দূষিত রক্ত যথাক্রমে অলিন্দ ও নিলয় হয়ে ফুলকায় বিশুদ্ধিকরণের জন্য প্রেরিত হয়। ফুলকা থেকে অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে না এসে সমগ্র দেহে বিস্তৃতি লাভ করে। হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র একপ্রকার রক্তের (CO_2-যুক্ত) প্রবাহ ঘটে বলে এ ধরনের সংবহনকে **একচক্রী সংবহন** (Single circuit circulation) বলে। যেহেতু মাছের হৃৎপিণ্ডের

মধ্য দিয়ে শুধু দূষিত রক্তই প্রবাহিত হয়, তাই এ ধরনের হৃৎপিণ্ডকে **ভেনাস হৃৎপিণ্ড (Venous heart)** বলে।

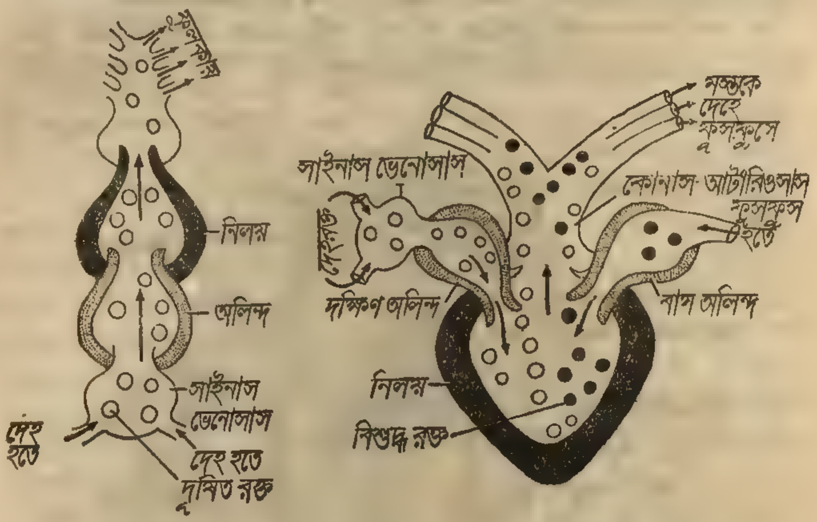

চিত্র 5.61 : বামদিকে মাছের দুই প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ড ; ডানদিকে কুনো ব্যাঙের তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত সংবহন দেখানো হয়েছে।

● উভচর শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড **তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত**। এদের হৃৎপিণ্ডে **দুটি অলিন্দ ও একটি নিলয়** বর্তমান। এই তিনটি প্রধান প্রকোষ্ঠ ছাড়াও এদের হৃৎপিণ্ডে আরও দুটি আনুষঙ্গিক প্রকোষ্ঠ আছে। এই প্রকোষ্ঠ দুটি হল—ডান

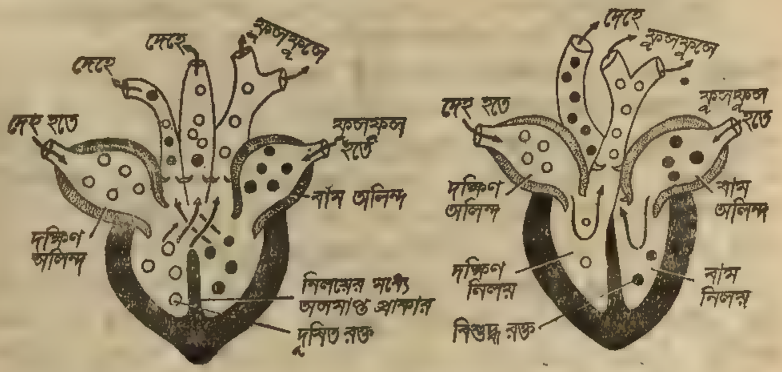

চিত্র 5.62 : বামদিকে সরীসৃপের এবং ডানদিকে পক্ষী অথবা স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত সংবহন দেখানো হয়েছে।

অলিন্দের সঙ্গে যুক্ত **সাইনাস ভেনোসাস** (Sinus venosus) এবং নিলয়ের সঙ্গে যুক্ত **কোনাস আর্টেরিওসাস** (Conus arteriosus)।

● **সরীসৃপ** শ্রেণীভুক্ত অধিকাংশ প্রাণীর হৃৎপিণ্ড **দুটি অলিন্দ ও অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত একটি নিলয়** নিয়ে গঠিত। কিন্তু কুমীরের হৃৎপিণ্ডের নিলয় সম্পূর্ণভাবে দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। **অতএব তাদের হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।**

● **পক্ষী ও স্তন্যপায়ী** প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড **দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয়** নিয়ে গঠিত। এদের হৃৎপিণ্ডে কোন আনুষঙ্গিক প্রকোষ্ঠ নেই। গঠন ও কার্যকারিতার

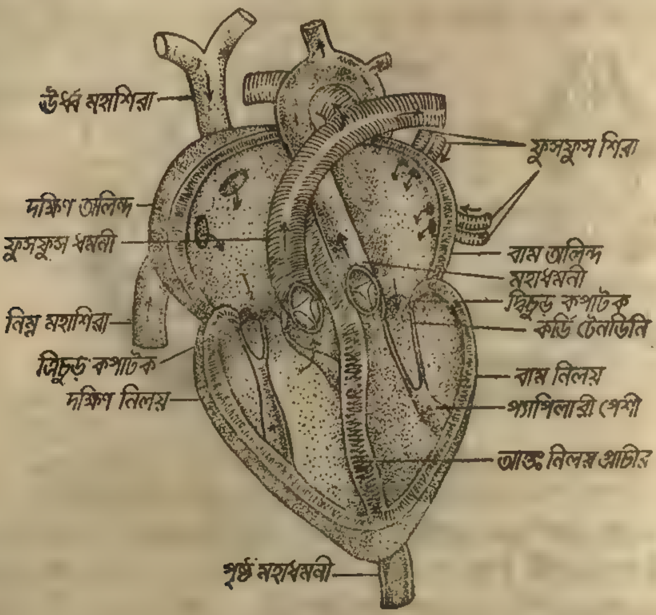

চিত্র 5.63 ঃ দ্বি-হৃৎপিণ্ডের (গিনিপিগের হৃৎপিণ্ড) অন্তর্গঠন দেখানো হয়েছে।
[তীর চিহ্নের দ্বারা রক্তপ্রবাহের দিক নির্দেশ করা হয়েছে]

ভিত্তিতে পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর হৃৎপিণ্ডই সবচেয়ে উন্নত। এদের হৃৎপিণ্ডটি দু ভাগে বিভক্ত—দক্ষিণ হৃৎপিণ্ড ও বাম হৃৎপিণ্ড। এই দুটি অংশের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। প্রতি অংশে আবার দুটি করে প্রকোষ্ঠ—একটি অলিন্দ (Auricle or Atrium) এবং একটি নিলয় (Ventricle) থাকে। এ ধরনের হৃৎপিণ্ডকে **দ্বি-হৃৎপিণ্ড** (double heart) বলে। এই হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দের সঙ্গে বাম নিলয় এবং দক্ষিণ অলিন্দের সঙ্গে দক্ষিণ নিলয় যথাক্রমে বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথ ও ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথে যেমন একমুখী **দ্বিপত্র** বা **দ্বি-শীর্ষ কপাটিকা** (bicuspid valve) বা **মিট্রাল কপাটিকা** (mitral valve) থাকে ; তেমনি ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথে একমুখী **ত্রিপত্র** বা **ত্রি-শীর্ষ কপাটিকা** (tricuspid valve) থাকে।

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনশীলতা (Rhythmicity of heart) ঃ হৃৎপিণ্ড যে পেশীর দ্বারা গঠিত, তার নাম **হৃৎপেশী** (Cardiac muscle)। হৃৎপেশীর ছন্দোবদ্ধ স্পন্দনের (beating) এক সহজাত ক্ষমতা আছে। এই সহজাত স্পন্দন-ক্ষমতার

প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন ব্যাঙ বা অন্য কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডকে তার দেহ থেকে অপসারিত করে শারীরবৃত্তীয় লবণ জলে* (Physiological saline solution) রাখা হয়। এভাবে রাখা হৃৎপিণ্ড, দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বেশ কয়েকদিন তার ছন্দোবদ্ধ স্পন্দন ক্ষমতা বজায় রাখে।

হৃৎপেশীতে দু প্রকার কোষ আছে—(1) **সহজাত স্পন্দন ক্ষমতাবিশিষ্ট কোষ** এবং (2) **সহজাত স্পন্দন ক্ষমতাহীন কোষ**। প্রথমোক্ত কোষগুলির নাম থেকেই বোঝা যায় যে, বাইরের কোন রকম উত্তেজনা ছাড়াই এরা নিজ থেকে স্পন্দিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে হৃৎপিণ্ডের ছন্দোবদ্ধ স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত হয় ঐ কোষগুলির কার্যকারিতার দ্বারা। তবে এই সহজাত স্পন্দন ক্ষমতাবিশিষ্ট কোষগুলির সংখ্যা খুব নগণ্য, অন্য কোষগুলির তুলনায় শতকরা মাত্র 1 ভাগ। এই কোষগুলি দলবদ্ধভাবে হৃৎপিণ্ডের কয়েক স্থানে অবস্থান করে। এক-এক দলের এক-এক নাম, যথা—**সাইনো-এট্রিয়াল পর্ব বা নোড** (Sino-atrial node or S. A. node), **এট্রিও-ভেণ্ট্রিকুলার পর্ব বা নোড** (Atrio-ventricular node or A. V. node), **বাণ্ডল অব হিজ** (Bundle of His) এবং **পারকিঞ্জির তন্তু** (Purkinje's fibres)। [এই পর্বগুলির বিস্তারিত বর্ণনা মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের গঠন অংশ দ্রষ্টব্য]।

হৃৎস্পন্দনের সূত্রপাত ঘটায় সাইনো-এট্রিয়াল নোড (S. A. node), যা দক্ষিণ অলিন্দের প্রাচীরে, ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরার প্রবেশপথের কাছে অবস্থিত (চিত্র 5.64)। এস. এ. নোড হৃৎস্পন্দনের সূত্রপাত ঘটায় বলে একে **পেস-মেকার** (Pace-maker) বা **স্পন্দন উৎপাদক** বলে। এস. এ. নোড থেকে স্পন্দনজাত উত্তেজনা অলিন্দ দুটির পেশীতে বিস্তৃতি লাভ করে তাদের **স্পন্দন** ঘটায়। অতঃপর দুটি অলিন্দের মধ্যবর্তী প্রাচীরের পশ্চাৎ অংশে অবস্থিত এট্রিও-ভেণ্ট্রিকুলার নোড বা এ. ভি. নোডটি উত্তেজিত হয়, যা ঐ উত্তেজনাকে নিলয়ের প্রাচীরে অবস্থিত বাণ্ডল অব হিজে প্রেরণ করে, ফলে নিলয়ের সঙ্কোচন ঘটে। এভাবে এক নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ঘটে। হৃৎপিণ্ডের এই নির্দিষ্ট ছন্দে ও হারে স্পন্দিত হওয়াকে **হৃৎস্পন্দন** (Heart beat) বলে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের হৃৎস্পন্দনের হার গড়ে মিনিটে 72 বার। হৃৎপিণ্ডের এই স্পন্দন স্টেথোস্কোপের সাহায্যে বা কব্জির রেডিয়াল ধমনীতে আঙুলের সাহায্যে অনুভব করে গোনা যায়। হৃৎস্পন্দনের ফলে এর বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল ঘটে এবং সেখান থেকে রক্ত প্রধান রক্তবাহগুলিতে

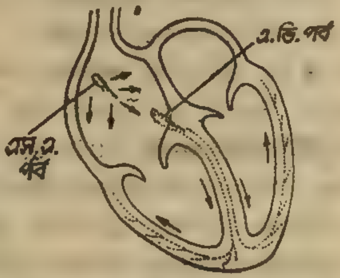

চিত্র 5.64 : হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদে নোড বা পর্বের অবস্থান।

* NaCl, KCl, $CaCl_2$ এবং গ্লুকোজের সংমিশ্রণে তৈরি দ্রবণ অর্থাৎ যা থেকে কোষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ ও খাদ্যবস্তু পাওয়া যায়।

প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্তের চলাচল কতকগুলি কপাটক বা ভাল্‌ভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

হৃৎপিণ্ডের কাজ (Functions of heart) : হৃৎপিণ্ড নিম্নলিখিত দুভাবে কাজ করে—(1) রক্ত সংবহনে কেন্দ্রীয় পাম্পযন্ত্র হিসেবে হৃৎপিণ্ড মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। হৃৎপিণ্ড নিজস্ব ছন্দোবদ্ধ স্পন্দনশীলতার জন্য প্রতিনিয়ত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনকে **সিস্টোল** (Systole) এবং প্রসারণকে **ডায়াস্টোল** (Diastole) বলে। হৃৎপিণ্ডের এই সঙ্কোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে রক্ত সমগ্র দেহে সঞ্চালিত হয়। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের সময় বিভিন্ন ধমনী ও শাখা ধমনীর সাহায্যে রক্ত সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে, আবার প্রসারণের সময় সারা দেহ থেকে রক্ত শাখা-শিরা ও শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে।

(2) হরমোন গ্রন্থি বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবেও হৃৎপিণ্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশিষ্ট ইংরেজ চিকিৎসাবিজ্ঞানী **উইলিয়াম হার্ভে** (William Harvey, 1578—1657) 1628 খ্রীষ্টাব্দে 'Essay on the Motion of the Heart and the Blood in Animals' নামক প্রবন্ধে হৃৎপিণ্ডকে একটি পাম্পের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক বিজ্ঞানীরা হৃৎপিণ্ডের আর একটি স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন। এইসব বিজ্ঞানীর মতে হৃৎপিণ্ড শুধু পাম্প যন্ত্রই নয়, এটি একটি **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিও** (Endocrine gland) বটে। হৃৎপিণ্ড থেকে নিঃসৃত হয় অত্যন্ত সক্রিয় একটি পেপটাইড হরমোন, যার নাম **এট্রিয়াল ন্যাট্রিইউরেটিক ফ্যাক্টর** (Atrial Natriuretic Factor or ANF)। এই হরমোনটি দেহে রক্তের চাপ এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে দেহ থেকে জল, সোডিয়াম, পটাসিয়াম নিঃসরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া রক্তবাহ, বৃক্ক, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি নামক অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি এবং শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলও হরমোনটির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

[1983 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এই হরমোনটি প্রথম বিশুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রহ করেন মনট্রিয়ালের ক্লিনিকাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের হরমোন বিশেষজ্ঞ **মার্ক ক্যানটিন, জ্যাকুয়েস জেনেস্ট** ও তাঁদের সতীর্থরা। 1983 খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মেরক শার্প অ্যান্ড ডহমে রিসার্চ ল্যাবোরেটরীর বিজ্ঞানী **রুথ এফনাট্** এই হরমোনটি সংশ্লেষ করতে সমর্থ হন। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে সংশ্লেষিত হয় **ভ্যাসোপ্রেসিন** হরমোন, যা পিট্যুইটারী গ্রন্থি নামক অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে সঞ্চিত হয়। এই ভ্যাসোপ্রেসিন, রক্তবাহের সঙ্কোচন, রক্তচাপ বৃদ্ধি ও বৃক্কের জল শোষণে সাহায্য করে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ANF ভ্যাসোপ্রেসিন সংশ্লেষণে বাধা সৃষ্টি করে।]

B. **রক্তবাহ** (Blood vessels) : রক্ত যে সমস্ত নালী ও তার শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাকে **রক্তবাহ** (Blood vessels) বলে। আকৃতি ও রক্ত সঞ্চালনের প্রকৃতি অনুযায়ী রক্তবাহগুলি আবার ধমনী, শিরা ও জালক—এই তিন ধরনের হয়ে থাকে।

ধমনী (Arteries) : **যে রক্তবাহের মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, তাকে ধমনী বলে।** হৃৎপিণ্ড-সংলগ্ন ধমনীগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল হয়, এদের **মহাধমনী** বা **অ্যাওর্টা** (Aorta) বলে। এই মহাধমনীগুলি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ধমনী সৃষ্টি করে। ফুসফুসীয় মহাধমনী ছাড়া অন্যান্য ধমনীর মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ অর্থাৎ অক্সিজেনযুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। ধমনীর প্রাচীর স্থিতিস্থাপক, তন্তুময়। এর মধ্যে কোন কপাটিকা থাকে না। ধমনীর প্রাচীর তিন স্তর যুক্ত। এই স্তরগুলি হল :

(i) **বহিঃস্তর বা টিউনিকা অ্যাডভেনটিশিয়া** (Outer layer or Tunica adventitia) : এই স্তরটি পুরু ও তন্তুময় যোগকলা দিয়ে গঠিত।

(ii) **মধ্যস্তর বা টিউনিকা মিডিয়া** (Middle layer or Tunica media) : এই স্তরটি অনেক বেশী পুরু এবং মসৃণ পেশীতন্তু দিয়ে গঠিত। এই স্তরটিই প্রধানত ধমনীর স্থিতিস্থাপকতার জন্য দায়ী।

(iii) **অন্তঃস্তর বা টিউনিকা ইনটিমা** (Inner layer or Tunica intima) এই স্তরটি পাতলা চ্যাপ্টা আবরণী কলা দিয়ে গঠিত এবং অসমৃণ তলযুক্ত।

শিরা (Veins) : **যে রক্তবাহের মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ডে অথবা হৃৎপিণ্ডের দিকে ফিরে আসে, তাকে শিরা বলে।** ফুসফুসীয় শিরা ছাড়া অন্যান্য শিরার মধ্য দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয়। শিরার প্রাচীর, ধমনীর প্রাচীর থেকে পাতলা হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম স্থিতিস্থাপক তন্তু দিয়ে গঠিত। বড়-বড় শিরার গহ্বরে একমুখী কপাটিকা বর্তমান। শিরা কম স্থিতিস্থাপক, তাই রক্তহীন অবস্থায় চুপসে গেলেও এই একমুখী কপাটিকা থাকার জন্য রক্ত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে পারে না। শিরার প্রাচীরও তিন স্তর যুক্ত। তবে টিউনিকা মিডিয়া স্তরটি ধমনীর তুলনায় অনেক পাতলা হয়। শিরার রক্তে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচক বল (force of contraction) অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার জন্য রক্তপ্রবাহও মন্থর হয়। শিরা সাধারণত রক্তজালক থেকে উৎপন্ন হয়ে অপেক্ষাকৃত বড় শিরায় অথবা হৃৎপিণ্ডে মুক্ত হয়। কিন্তু কতকগুলি শিরা রক্তজালক থেকে উৎপন্ন হয়ে অন্য কোন অঙ্গে (বৃক্ক অথবা যকৃতে) পুনরায় জালকে বিভক্ত হয়ে অবশেষে হৃৎপিণ্ডে রক্ত বহন করে। দু প্রান্তে জালকযুক্ত এই ধরনের শিরাগুলিকে **পোর্টাল শিরা** (Portal vein) বলে। অপরপক্ষে, এক প্রান্তে জালকযুক্ত শিরাগুলিকে **সিস্টেমিক শিরা** (Systemic veins) বলে। পোর্টাল শিরা দু ধরনের—**হেপাটিক পোর্টাল শিরা** (Hepatic portal vein) বা **যকৃৎ পোর্টাল শিরা** এবং **রেনাল পোর্টাল শিরা** (Renal portal vein) বা **বৃক্কীয় পোর্টাল শিরা**। হেপাটিক পোর্টাল শিরা সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীতে পাওয়া যায়, কিন্তু রেনাল পোর্টাল শিরা পক্ষী, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি প্রাণীতে দেখা যায় না।

রক্তজালক (Capillaries) : ধমনী শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনিকা বা উপধমনীতে (Arterioles) পরিণত হয়, যা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কলার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত হয়ে পুনরায় মিলিত হয় এবং উপশিরায়

(Venules) পরিণত হয়। এই উপশিরাগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে শিরা গঠন করে। ধমনী ও শিরার সংযোগ স্থলে অতি সূক্ষ্ম প্রাচীরবিশিষ্ট সরু সরু শাখা-প্রশাখাযুক্ত নালিকা পরস্পর যুক্ত হয়ে রক্তবাহের যে জাল গঠন করে, তাকে রক্তজালক (Capillaries) বলে। সংবহন তন্ত্রের বিভিন্ন রক্তবাহ রক্তকে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দিলেও প্রকৃতপক্ষে রক্তজালকের মাধ্যমেই রক্তস্থিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ কলাকোষে পৌঁছায় এবং কলাকোষ থেকে বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থসমূহ রক্তজালকের মাধ্যমেই রক্তপ্রবাহে ফিরে আসে। দেহের যে সমস্ত জায়গায় বিপাকীয় কাজের পরিমাণ বেশী সেই সমস্ত জায়গায় রক্তজালকের সংখ্যাও বেশী এবং যেসব জায়গায় বিপাকীয় কাজের পরিমাণ কম সেই সমস্ত জায়গায় রক্তজালকের সংখ্যা অবশ্যই কম।

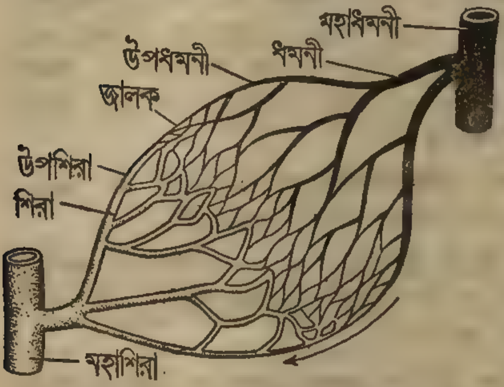

চিত্র 5.65 : রক্তজালক (নকশা চিত্র)।

ধমনী ও শিরার পার্থক্য (Differences between artery and vein) :

ধমনী	শিরা
● গঠনগত পার্থক্য	
1. ধমনীর প্রাচীর পুরু, পেশীবহুল এবং স্থিতিস্থাপক।	1. শিরার প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পাতলা, কম পেশীযুক্ত এবং অস্থিতিস্থাপক।
2. ধমনী রক্তবিহীন অবস্থায় চুপসে যায় না।	2. শিরা রক্তবিহীন অবস্থায় চুপসে যায়।
3. ধমনীর গহ্বরের ব্যাস কম।	3. শিরার গহ্বরের ব্যাস অপেক্ষাকৃত বড়।
4. ধমনী কপাটিকাবিহীন।	4. বড় বড় শিরার মধ্যে একমুখী কপাটিকা বর্তমান।
● অবস্থানগত পার্থক্য	
5. ধমনী প্রধানত দেহের গভীর অংশে বিস্তৃত থাকে।	5. শিরা দেহের পরিধি বরাবর বিস্তৃত থাকে।

ধমনী	শিরা
● কার্যগত পার্থক্য	
6. ধমনী হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশের কোষ, কলা ও অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে।	6. শিরা দেহের বিভিন্ন অংশের কোষ, কলা ও অঙ্গ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে অথবা হৃৎপিণ্ডের দিকে (পোর্টাল শিরা) নিয়ে আসে।
7. ধমনী সাধারণত অপেক্ষাকৃত বেশী অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে। **ব্যতিক্রম—ফুসফুসীয় ধমনী।**	7. শিরা সাধারণত অপেক্ষাকৃত কম অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে। **ব্যতিক্রম—ফুসফুসীয় শিরা।**
8. প্রতি 100 ml. ধমনীর রক্তে প্রায় 19-20 ml. অক্সিজেন থাকে।	8. প্রতি 100 ml. শিরার রক্তে প্রায় 14-15 ml. অক্সিজেন থাকে।
9. অক্সিজেনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী বলে ধমনীর রক্ত টকটকে লাল।	9. অক্সিজেনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম বলে শিরার রক্ত কালচে লাল।
10. ধমনীর মধ্য দিয়ে উচ্চ চাপযুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়।	10. শিরার মধ্য দিয়ে নিম্ন চাপযুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়।
11. ধমনী কেটে গেলে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়।	11. শিরা কেটে গেলে চুইয়ে বা টপ্‌টপ্‌ করে রক্ত পড়ে।

5.46. মানবদেহে সংবহন (Circulation in human beings)

মানবদেহে সংবহনের মাধ্যম হল রক্ত। রক্ত খাদ্যের সারাংশ, হরমোন, ভিটামিন, অক্সিজেন ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত করে এবং দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থসমূহ রেচন অঙ্গে নিয়ে যায়। রক্তের তরল ধাত্রকে **রক্তরস বা প্লাজমা** বলে, যার 91—92% জল। এই রক্তরসে বিভিন্ন কণিকা ভাসমান অবস্থায় থাকে। এই কণিকাগুলি তিন প্রকার—**লোহিত রক্ত কণিকা** বা **এরিথ্রোসাইট** (Red Blood Corpuscles or R. B. C. or Erythrocytes), **শ্বেত রক্ত কণিকা** বা **লিউকোসাইট** (White Blood Corpuscles or W. B. C. or Leucocytes) এবং **অণুচক্রিকা** (Blood platelets)। লোহিত রক্ত কণিকার সাইটোপ্লাজমে লৌহঘটিত প্রোটীন যৌগ **হিমোগ্লোবিন** (Haemoglobin) থাকে, যা ফুসফুসে শ্বাসকার্যের সময় **বায়ু প্রকোষ্ঠ** বা **অ্যালভিওলাই** থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে অস্থায়ী অক্সাইড যৌগ অক্সি-হিমোগ্লোবিন গঠন করে। এই অক্সি-হিমোগ্লোবিনের রঙ লাল, তাই মানবদেহের রক্তের রঙও লাল। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ধমনীর মাধ্যমে সমগ্র দেহে প্রবাহিত হয় এবং জালক হয়ে শিরার মাধ্যমে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। মানবদেহে রক্ত সব সময় রক্তবাহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, কখনোই দেহগহ্বরে মুক্ত হয় না। তাই মানুষের রক্ত সংবহন বদ্ধ প্রকৃতির। **উইলিয়াম হার্ভে** (William Harvey, 1628) সর্বপ্রথম মানবদেহে কিভাবে রক্ত সংবহন হয়, তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন।

5.47. মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের গঠন
(Anatomy of human heart)

রক্ত দেহের সমস্ত কলা কোষে অক্সিজেন ও সরল খাদ্যোপাদান সরবরাহ করে। হৃৎপিন্ড রক্তকে বিভিন্ন রক্ত নালীর মধ্যে চালনা করে রক্ত-সংবহন তন্ত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের হৃৎপিণ্ডটি মোটামুটি ত্রিকোণাকৃতি, তবে কোণগুলি সামান্য ভোঁতা, অনেকটা পানিফলের শাঁসের মত এবং তিন স্তরবিশিষ্ট মাংসল ফাঁপা অঙ্গবিশেষ। এই স্তরগুলি ভিতর থেকে বাইরের দিকে যথাক্রমে **এন্ডোকার্ডিয়াম** (Endocardium), **মায়োকার্ডিয়াম** (Myocardium) এবং **এপিকার্ডিয়াম** (Epicardium)।

এন্ডোকার্ডিয়াম : এটি হৃৎপিন্ডের সবচেয়ে ভিতরের স্তর। হৃৎপিন্ডের ভিতর সর্বত্র এই স্তর বিস্তৃত হলেও, সব জায়গায় এটি সমান পুরু নয়, কোথাও পাতলা আবার কোথাও স্থূল। অলিন্দে এই স্তর সবচেয়ে বেশী পুরু, আবার নিলয়ে খুব পাতলা। এন্ডোকার্ডিয়াম প্রধানত তন্তুময় (fibrous) যোগকলা দিয়ে গঠিত। এটি এন্ডোথেলিয়াম নামে একটি পাতলা আবরণী কলার স্তর দিয়ে হৃৎপিন্ডের ভিতরে অবস্থিত রক্ত থেকে পৃথক থাকে।

মায়োকার্ডিয়াম : এটি এন্ডোকার্ডিয়াম ও এপিকার্ডিয়ামের মাঝখানে অনৈচ্ছিক পেশী দ্বারা গঠিত দৃঢ় স্তর। হৃৎপিন্ডের বিভিন্ন স্থানে এই পেশীস্তরটিও সমান পুরু নয়। অলিন্দে এই স্তরটি পাতলা এবং নিলয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী স্থূল। এন্ডোকার্ডিয়াম থেকে কিছু কিছু তন্তুময় যোগকলা এই পেশীস্তরে বিস্তৃত থাকে, যার মাধ্যমে কিছু রক্তবাহও হৃৎপেশীর মধ্যে প্রবেশ করে।

এপিকার্ডিয়াম : হৃৎপিন্ডের সবচেয়ে বাইরের স্তরকে এপিকার্ডিয়াম বলে। এই ... তন্তুময় যোগকলা দ্বারা গঠিত।

...মানুষের হৃৎপিন্ডটি একটি মাংসল ফাঁপা থলিবিশেষ। এটি একটি তন্তুময় ... দ্বারা আবৃত থাকে। এই পর্দাটিকে **পেরিকার্ডিয়াম** (Pericardium) বলে। পেরিকার্ডিয়াম দু স্তরবিশিষ্ট—বাইরের স্তরটি তন্তুময় বলে একে **তন্তুময় পেরিকার্ডিয়াম** (Fibrous pericardium) বলে। ভিতরের স্তরটি চ্যাপ্টা কোষ দিয়ে গঠিত খুব পাতলা ঝিল্লীবিশেষ, একে **সেরাস পেরিকার্ডিয়াম** (Serus pericardium) বলে। এই সেরাস স্তরটি আবার **ভিসেরাল** (Visceral) ও **প্যারাইটাল** (Parietal) স্তর নামে দুটি অংশে বিভক্ত। ভিসেরাল ও প্যারাইটাল স্তর দুটির মাঝে সামান্য ফাঁক বা অবকাশ থাকে, যা একপ্রকার পিচ্ছিল রস দ্বারা পূর্ণ। এই রসের নাম **পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড**। এই তরল পদার্থটি হৃৎপিন্ডের সাবলীল সঙ্কোচন ও প্রসারণে সাহায্য করে।

মানুষের হৃৎপিন্ডটি চারটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি করে মোট চারটি প্রকোষ্ঠ বর্তমান। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে **অলিন্দ** বা **এট্রিয়াম** (Atrium) বলে। বামদিকের অলিন্দকে **বাম অলিন্দ** এবং ডানদিকের অলিন্দকে **ডান অলিন্দ** বলে। দুটি অলিন্দ যে তন্তুময় প্রাচীর দিয়ে পৃথক থাকে, তাকে **আন্তঃ-অলিন্দ ব্যবধায়ক** (Interatrial septum) বলে। হৃৎপিন্ডের নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে

নিলয় বা **ভেণ্ট্রিকল** (Ventricle) বলে। বামদিকের নিলয়কে **বাম নিলয়** এবং ডানদিকের নিলয়কে **ডান নিলয়** বলে। নিলয় দুটিও **আন্তঃনিলয় ব্যবধায়ক** (Interventricular septum) নামে একটি তন্তুময় পর্দা দিয়ে পরস্পর থেকে পৃথক থাকে। অলিন্দ আবার নিলয় থেকে একটি তন্তুময় প্রাচীর দিয়ে পৃথক থাকে। এই প্রাচীরটিকে **অলিন্দ-নিলয় ব্যবধায়ক** (Atrio-ventricular septum) বলে। ডান অলিন্দের মধ্যে দেহের উর্ধ্বাংশ থেকে **উত্তরা-মহাশিরা** বা **সুপিরিয়র ভেনা কেভা** (Superior vena cava), নিম্নাংশ থেকে **অধরা-মহাশিরা** বা **ইনফিরিয়র ভেনা কেভা** (Inferior vena cava) এবং হৃৎপেশী থেকে **করোনারী শিরা** (Coronary vein) দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত দূষিত রক্ত এসে জমা হয়। বাম অলিন্দের সঙ্গে যুক্ত থাকে **ফুসফুসীয় শিরা** (Pulmonary vein), যা ফুসফুস থেকে অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে নিয়ে আসে। আবার ডান নিলয়ের উপরিভাগ থেকে **ফুসফুসীয় ধমনী** (Pulmonary artery) উৎপন্ন হয়ে ডান নিলয় থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত দূষিত রক্ত বিশুদ্ধিকরণের জন্য ফুসফুসে নিয়ে যায়। বাম নিলয়ের উপরিভাগ থেকে **মহাধমনী** বা **অ্যাওর্টা** (Aorta) উৎপন্ন হয়ে বাম নিলয় থেকে অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহণ করে।

ডান অলিন্দের অন্তর্গঠন : ডান অলিন্দটি দুটি অংশে বিভক্ত। পিছনের মসৃণ অংশটিকে **সাইনাস ভেনারাম** (sinus venarum) বলে। এই অংশে উত্তরা মহাশিরা ও অধরা মহাশিরা ছিদ্রপথে যুক্ত হয়। উত্তরা মহাশিরার ছিদ্রপথে কোন কপাটিকা থাকে না। অধরা মহাশিরার ছিদ্রপথে যে কপাটিকা থাকে, তাকে **ইনফিরিয়র ভেনা কেভার কপাটিকা** বা **ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা** (Eustachian valve) বলে। এই কপাটিকাটি দেখতে অনেকটা অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি এবং রক্তকে কেবলমাত্র ডান অলিন্দের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়। এছাড়া ডান অলিন্দে আরও একটি ছিদ্র দেখা যায়, যাকে **করোনারী সাইনাসের ছিদ্র** (aperture of the coronary sinus) বলে। এই ছিদ্রপথে হৃৎপিণ্ডের গাত্রপ্রাচীর থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত দূষিত রক্ত ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। এই করোনারী সাইনাসের ছিদ্রপথে **থেবেসিয়ান কপাটিকা** (Thebesian valve) নামে একটি কপাটিকা বর্তমান।

ডান অলিন্দের সামনের অমসৃণ অংশটিকে **প্রধান অলিন্দ** (main atrium) বলে। এটি অরিকল (auricle) নামে একটি ছোট মাংসল থলির সঙ্গে যুক্ত।* ডান অলিন্দের এই অংশটি **ক্রিস্টা টার্মিনালিস** (crista terminalis) নামক মাংসল অংশ দ্বারা সাইনাস ভেনারাম থেকে পৃথক থাকে। এই অংশে **মাসকুলি পেকটিনেটি** (musculi pectinati) নামক পেশীবহুল উঁচু অংশ বর্তমান। ডান অলিন্দ, ডান নিলয়ের সঙ্গে ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথে যুক্ত। এই ছিদ্রপথটি **ত্রিপত্রক কপাটিকা** বা **ট্রাইকাসপিড কপাটিকা** (tricuspid valve) দিয়ে আবৃত। এই কপাটিকাটি কেবলমাত্র ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ের দিকে উন্মুক্ত হয় এবং রক্তকে কখনই বিপরীত দিকে, অর্থাৎ ডান নিলয় থেকে ডান অলিন্দে প্রবেশ করতে দেয় না। হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত কোন কপাটিকাই রক্তের উভয়মুখী চলাচল হতে দেয় না।

* তাই অলিন্দকে auricle না বলে atrium বলা হয়।

বাম অলিন্দের অন্তর্গঠন : বাম অলিন্দ, ডান অলিন্দ থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট ও পেশীবহুল। বাম অলিন্দের উপরিভাগে ফুসফুসীয় শিরার ছিদ্রপথ বর্তমান। এই ছিদ্রপথে কোন কপাটিকা থাকে না। এছাড়া, বাম অলিন্দে কতকগুলি ছোট ছোট শিরার ছিদ্রপথ বর্তমান। এই ছিদ্রপথে সামান্য কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত দূষিত রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। বাম অলিন্দের সামনের অংশে **বাম অরিকল** (left auricle) নামে একটি মাংসল থলি বর্তমান। বাম অলিন্দ, বাম নিলয়ের সঙ্গে বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথে যুক্ত। এই ছিদ্রপথটি **দ্বি-পত্রক কপাটিকা** বা **বাইকাসপিড কপাটিকা** (bicuspid valve) বা **মিট্রাল কপাটিকা** (mitral valve) দিয়ে আবৃত। এই কপাটিকাটি কেবলমাত্র বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ের দিকে উন্মুক্ত হয় এবং রক্তকে কখনই বাম নিলয় থেকে বাম অলিন্দে প্রবেশ করতে দেয় না।

ডান নিলয়ের অন্তর্গঠন : হৃৎপিন্ডের এই প্রকোষ্ঠটি **সুপ্রা ভেন্ট্রিকুলার ক্রেস্ট** (supra ventricular crest) নামক মাংসল অংশ দিয়ে দুটি অংশে বিভক্ত। ডান নিলয়ের সামনের অংশ অমসৃণ এবং পিছনের অংশ মসৃণ। ডান নিলয়ের বাম দিকের উপরিভাগে **ইনফান্ডিবুলাম** (infundibulum) নামে একটি থলির মত অংশ থাকে। ডান নিলয়ের উপরের অংশ থেকে ফুসফুসীয় **ধমনী** (pulmonary artery) উৎপন্ন হয়েছে। **ফুসফুসীয় ধমনীর** উৎপত্তিস্থলের ছিদ্রপথে তিনটি **অর্ধ-চন্দ্রাকার কপাটিকা** (semi-lunar valve) বর্তমান। এই কপাটিকাগুলি থাকার দরুন রক্ত কেবলমাত্র ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনীর মধ্যেই প্রেরিত হয়। ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথ দিয়ে ডান নিলয় ডান অলিন্দ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত গ্রহণ করে। ডান নিলয়ের গাত্রপ্রাচীরে **ট্রাবিকিউলি কারনি** (trabeculae carneae) নামে কতকগুলি মাংসল অংশ বর্তমান। এই মাংসল অংশগুলি থেকেই **কর্ডি টেনডিনি** (chordae tendineae) নামে কয়েকটি সূক্ষ্ম তন্তুর মত অংশ উৎপন্ন হয়ে ত্রিপত্রক কপাটিকার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং ঐ কপাটিকাকে অলিন্দের দিকে উন্মুক্ত হতে দেয় না।

বাম নিলয়ের অন্তর্গঠন : হৃৎপিন্ডের এই প্রকোষ্ঠটি ডান নিলয় থেকে অপেক্ষাকৃত বড় এবং পেশীবহুল। বাম নিলয়ের উপরিভাগ থেকে মহাধমনী বা এওর্টা উৎপন্ন হয়েছে। মহাধমনীর ছিদ্রপথেও তিনটি অর্ধ-চন্দ্রাকার কপাটিকা বা সেমিলুনার ভালভ আছে। কপাটিকাগুলি কেবলমাত্র বাম নিলয় থেকে অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্তকে মহাধমনীর মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়। বাম নিলয়, বাম অলিন্দ থেকে বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র দিয়ে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত গ্রহণ করে। বাম নিলয়ের গাত্রপ্রাচীরেও ট্রাবিকিউলি কারনি এবং কর্ডি টেনডিনি বর্তমান।

হৃৎপিন্ড একটি পেশীবহুল মাংসল অঙ্গবিশেষ। হৃৎপেশী প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত ; যথা—**অলিন্দের পেশী তন্তু, নিলয়ের পেশী তন্তু ও সংযোগকারী কলা** (junctional tissue)। এই সংযোগকারী কলা একপ্রকার রূপান্তরিত হৃৎপেশী, যা হৃৎস্পন্দনের (Heart beat) উৎপত্তি ও বিস্তৃতিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। হৃৎপিন্ডের এই সংযোগকারী কলাকে অবস্থান ও কাজ অনুযায়ী নিম্নলিখিত চার

ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা—(i) **সাইনো-এট্রিয়াল নোড,** (ii) **এট্রিও-ভেণ্ট্রিকুলার নোড,** (iii) **বাণ্ডল অব হিজ** এবং (iv) **পারকিঞ্জির তন্তু** (চিত্র 5.64)।

(i) **সাইনো-এট্রিয়াল নোড** (Sino-atrial node or S. A. Node)ঃ এটি ডান অলিন্দের প্রাচীরে এবং উত্তরা মহাশিরা ও ডান অলিন্দের ছিদ্রপথের বা সংযোগস্থলের কাছে অবস্থিত, দেখতে অনেকটা ঘোড়ার খুরের মত। সাইনো-এট্রিয়াল নোড প্রতি মিনিটে 70—80টি হৃৎস্পন্দন প্রবাহ (Cardiac impulse) উৎপন্ন করতে পারে।

(ii) **এট্রিও-ভেণ্ট্রিকুলার নোড** (Atrio-ventricular node or A. V. Node)ঃ এটি এস. এ. নোডের অনতিদূরে, আন্তঃ-অলিন্দ ব্যবধায়কের পশ্চাৎ অংশে করোনারী সাইনাস ছিদ্রপথের কাছে অবস্থিত। এট্রিও-ভেণ্ট্রিকুলার নোড প্রতি মিনিটে 40-60টি হৃৎস্পন্দন প্রবাহ উৎপন্ন করতে পারে।

(iii) **বাণ্ডল অব হিজ** (Bundle of His)ঃ এটি এট্রিও-ভেণ্ট্রিকুলার নোড বা এ. ভি. নোড থেকে উৎপন্ন হয়ে নিলয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং আন্তঃনিলয় ব্যবধায়কের সামান্য উপরে দুভাগে বিভক্ত হয়ে আন্তঃনিলয় ব্যবধায়কের মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

(iv) **পারকিঞ্জির তন্তু** (Purkinje's fibres)ঃ এটি বাণ্ডল অফ হিজের শাখা থেকে উৎপন্ন হয়ে আন্তঃনিলয় ব্যবধায়কের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়ে বহু তন্তুতে বিভক্ত হয় এবং প্যাপিলারি পেশী পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। পারকিঞ্জির তন্তু এণ্ডোকার্ডিয়ামের নিচে সাব-এণ্ডোকার্ডিয়াম জালিকার সৃষ্টি করে নিলয়ের পেশী তন্তুর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

5.48. হৃৎস্পন্দনের উৎপত্তি ও বিস্তার
(Origin and distribution of cardiac impulse)

সাইনো-এট্রিয়াল নোডে হৃৎস্পন্দনের (Cardiac impulse) উৎপত্তি ঘটে। এই স্থান থেকে অলিন্দের পেশী তন্তুতে স্পন্দনজাত উত্তেজনা বিস্তৃত হয়ে অলিন্দের সঙ্কোচন (systole) ঘটায়। অতঃপর এই স্পন্দনজাত উত্তেজনা পেশী তন্তু অতিক্রম করে এট্রিও-ভেণ্ট্রিকুলার নোডে পৌঁছায়। এই নোড থেকে উক্ত উত্তেজনা বাণ্ডল অব হিজের মধ্য দিয়ে নিলয়ে বাহিত হয়। এট্রিও-ভেণ্ট্রিকুলার নোডের পরিবহণের হার মন্থর বলে প্রায় 0·1 সেকেণ্ড বিলম্ব হয়, যাকে **এট্রিও-ভেণ্ট্রিকুলার বিরতি** বলে। এই বিরতি নিলয়ের সঙ্কোচন শুরু হওয়ার আগে অলিন্দকে সঙ্কুচিত হওয়ার যথেষ্ট সময় দেয়। এর ফলে অলিন্দ ও নিলয়ের ছন্দময় সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটে। বাণ্ডল অব হিজের মধ্য দিয়ে হৃৎস্পন্দনের বিস্তৃতি অত্যন্ত দ্রুত হওয়ায় নিলয়ের সমস্ত পেশী তন্তু প্রায় একই সঙ্গে এই স্পন্দন পেয়ে থাকে। ফলে দুটি নিলয় প্রায় একই সময়ে সঙ্কুচিত হয়। যেহেতু সাইনো-এট্রিয়াল নোড হৃৎস্পন্দন শুরু করে, তাই একে **পেস-মেকার** (Pace-maker) বলে। তবে হৃৎপিণ্ডের প্রায় অংশই সামান্য পরিমাণে স্বয়ংক্রিয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এস. এ. নোড, এ. ভি. নোড, বাণ্ডল অব হিজ বা পারকিঞ্জির তন্তুর যে কোনটির হৃৎস্পন্দন

প্রবাহ বন্ধ হতে পারে। এই স্পন্দন প্রবাহ বন্ধ হওয়াকে **হার্ট-অবরোধ** (Heart-block) বলে।

5.49. হৃৎস্পন্দনের হারের উপর প্রভাবকারী কারণ-সমূহ (Different factors controlling heart beat)

বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে হৃৎস্পন্দনের হার বিভিন্ন হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, পূর্ণবয়স্ক পুরুষের হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে 50 থেকে 100 বার হতে পারে। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকের এই হার সামান্য দ্রুততর। পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের মধ্যে হৃৎস্পন্দনের হারের পরিবর্তনের প্রবণতা সামান্য বেশী। যে সমস্ত কারণের জন্য এই হারের পরিবর্তন হয়, সেগুলি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

(i) **বয়স** (Age) ঃ বিভিন্ন বয়সের মানুষের হৃৎস্পন্দনের হার বিভিন্ন। জন্মের পর হৃৎস্পন্দনের হার সাধারণত প্রতি মিনিটে প্রায় 130 থেকে 150 বার হয়ে থাকে। এক বছর থেকে দু বছর বয়সে এই হার প্রায় 120 বার হয়। 10 থেকে 12 বছর বয়সে এই হার প্রায় 90 বার হয় এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে বিশ্রাম কালে এই হার 70 থেকে 72 বার হয়ে থাকে।

(ii) **দেহের আয়তন** (Volume of the body) ঃ দেহের আয়তন হৃৎস্পন্দনকে সরাসরি প্রভাবিত করে। দেহের আয়তন কম হলে হৃৎস্পন্দনের হার বেশী হবে ; আবার দেহের আয়তন বেশী হলে হৃৎস্পন্দনের হার কম হবে। যেমন, একটি শিশুর দেহের আয়তন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহের আয়তন অপেক্ষা কম। সুতরাং শিশুর হৃৎস্পন্দনের হার পূর্ণবয়স্ক মানুষের হৃৎস্পন্দনের হারের চেয়ে বেশী হবে।

(iii) **দেহের অবস্থান** (Position of the body) ঃ হৃৎস্পন্দনের হার দেহের অবস্থানের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল এবং দেহের অবস্থানের তারতম্যের জন্য হৃৎস্পন্দনের হারের পরিবর্তন ঘটে। শয়ন কিংবা হেলান দেওয়া অবস্থায় থাকলে যে হৃৎস্পন্দন হয়, খাড়া অবস্থায় থাকলে তার তুলনায় 5 থেকে 10 বার বেশী হবে।

(iv) **শরীর চর্চা** (Physical exercise) ঃ খেলোয়াড় কিংবা যারা শরীর চর্চা শিক্ষণপ্রাপ্ত বা অভ্যস্ত, তাদের ক্ষেত্রে বিশ্রামরত অবস্থায় হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে প্রায় 50 থেকে 60 বারের মত। শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবানদের হৃৎস্পন্দনের হার স্বাভাবিক থেকে সামান্য কম থাকে।

(v) **অন্যান্য কারণ** (Other factors) ঃ পরিশ্রম, দেহের অধিক তাপমাত্রা (জ্বর), খাদ্য গ্রহণ, গরম পানীয় গ্রহণ, উঁচু জায়গায় আরোহণ, মানসিক উদ্বেগ প্রভৃতির দ্বারা হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পায়।

5.50. হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত সংবহন (Circulation of blood through heart)

হৃৎপিণ্ডটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনকে **সিস্টোল** (systole) এবং প্রসারণকে **ডায়াস্টোল** (diastole) বলে।

সিস্টোল ও ডায়াস্টোলকে একসঙ্গে **হৃৎস্পন্দন** (Heart beat) বলে। ভ্রূণের পাঁচ মাস বয়স থেকে এই হৃৎস্পন্দন শুরু হয়। একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতি মিনিটে গড়ে 72 বার হৃৎস্পন্দন হয়। সুতরাং একবার হৃৎস্পন্দনের জন্য $\frac{60}{72}$ = 0·8 সেকেন্ড (প্রায়) সময় লাগে।

অলিন্দ-দুটি প্রায় একই সময়ে প্রসারিত হয়। অলিন্দ দুটি প্রসারিত হলে বিভিন্ন শিরাপথে রক্ত অলিন্দে প্রবেশ করে। চারটি ফুসফুসীয় শিরাপথে অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে এবং ঊর্ধ্ব মহাশিরা, নিম্ন বা পশ্চাৎ মহাশিরা এবং করোনারী সাইনাস দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত দূষিত রক্ত ডান অলিন্দে প্রবেশ করে।

অলিন্দ-দুটি রক্তপূর্ণ হলে এদের সঙ্কোচন শুরু হয়। বাম অলিন্দ থেকে ডান অলিন্দ সামান্য আগে সঙ্কুচিত হয়। অলিন্দ সঙ্কুচিত হলে অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রের কপাটিকা খুলে যায় এবং রক্ত অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবেশ করে। ডান অলিন্দের দূষিত রক্ত ত্রিপত্রক কপাটিকা ভেদ করে ডান নিলয়ে এবং বাম অলিন্দের বিশুদ্ধ রক্ত দ্বিপত্রক কপাটিকা ভেদ করে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এর ফলে নিলয় দুটি প্রসারিত হয়। প্রসারণের পরই নিলয় দুটি সঙ্কুচিত হয় এবং অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে রক্ত পুনরায় অলিন্দে প্রবেশ করতে পারে না। সঙ্কোচনের সময় বাম নিলয়ের অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত মহাধমনী-পথে শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয় এবং ডান নিলয়ের কার্বন ডাই-অক্সাইড-সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসীয় ধমনী-পথে দুটি ফুসফুসে বিশুদ্ধিকরণের জন্য প্রবাহিত

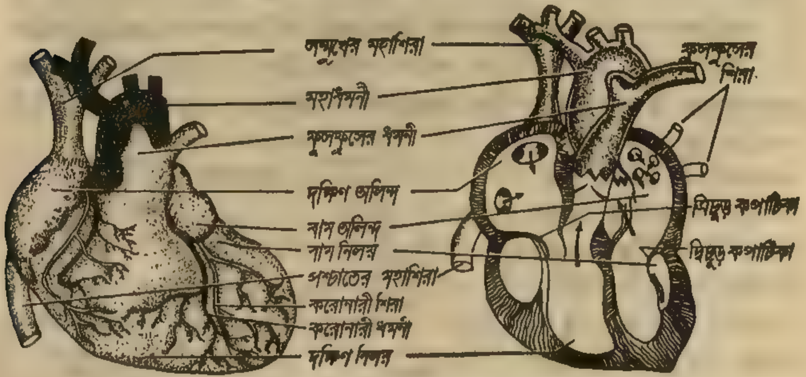

চিত্র 5.66 : বামদিকে মানুষের হৃৎপিণ্ডের বহির্গঠন এবং ডানদিকে লম্বচ্ছেদে রক্ত সংবহন দেখানো হয়েছে।

হয়। এই মহাধমনী ও ফুসফুসীয় ধমনীর ছিদ্রপথে তিনটি করে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি কপাটিকা থাকে, যেগুলি নিলয়ের প্রসারণের সময় মহাধমনী ও ফুসফুসীয় ধমনী থেকে নিলয়ে রক্ত প্রবেশে বাধা দেয়। নিলয় থেকে রক্ত ধমনী-পথে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয়। ধমনী থেকে রক্ত পুনরায় জালক ও শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে (চিত্র 5.66)।

5.51. ফুসফুসীয় সংবহন (Pulmonary circulation)

নিলয়ের সংকোচনের সময় ডান নিলয় থেকে দূষিত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনীর মধ্য দিয়ে দুটি ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং ফুসফুসের প্রতিটি বায়ু প্রকোষ্ঠে বা অ্যালভিওলাসে রক্তজালক সৃষ্টি করে। শ্বাসকার্যের সময় এই রক্তজালক ও বায়ু প্রকোষ্ঠের বায়ুর মধ্যে ব্যাপন ক্রিয়ায় অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিনিময় হয়। রক্তজালকের দূষিত রক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে এবং বিনিময়ে অক্সিজেন গ্রহণ করে। হিমোগ্লোবিন এই অক্সিজেন গ্রহণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ফুসফুসে রক্ত অক্সিজেন-যুক্ত হওয়ার পর ফুসফুসীয় শিরা পথে উক্ত রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের মধ্যে রক্ত সংবহনের এই পথকে **ফুসফুসীয় সংবহন** বলে (চিত্র 5.67)।

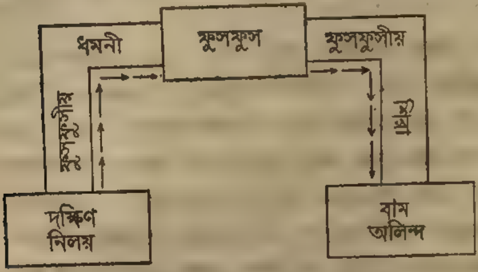

চিত্র 5.67 : ফুসফুসীয় সংবহন।

5.52. সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation)

বাম নিলয়ের সংকোচনের সময় বাম নিলয় থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত মহাধমনীর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয়। বিভিন্ন কলায় অবস্থিত রক্তজালকের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্ত কলা-কোষের সংস্পর্শে আসে। জালকের প্রাচীর পাতলা ও একস্তরবিশিষ্ট বলে রক্ত এবং ঐ সমস্ত কলা-কোষের মধ্যে ব্যাপন ক্রিয়ায় বিভিন্ন বস্তুর আদান-প্রদান ঘটে। অক্সিজেন, খাদ্যবস্তুর সারাংশ প্রভৃতি রক্ত থেকে কলা-কোষে প্রবেশ করে এবং বিনিময়ে রক্তের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থসমূহ প্রবেশ করে। পরে ঐ রক্তজালকসমূহ শিরায় পরিণত হলে, বিভিন্ন শিরার মধ্য দিয়ে দূষিত রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে মহাশিরার মাধ্যমে ডান অলিন্দে পৌঁছায়। হৃৎপিন্ড ও দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই সংবহনকে **সিস্টেমিক সংবহন** বলে (চিত্র 5.68)।

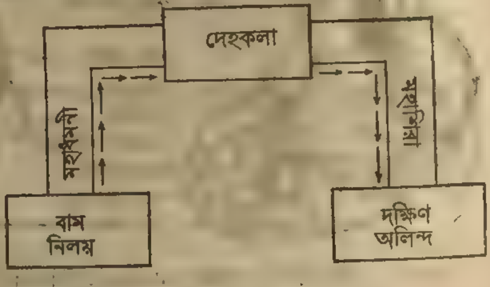

চিত্র 5.68 : সিস্টেমিক সংবহন।

5.53. পোর্টাল সংবহন (Portal circulation)

সাধারণত জালক থেকে শিরা উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডে রক্ত নিয়ে আসে। কিন্তু জালক থেকে উৎপন্ন যে শিরা হৃৎপিণ্ডে মুক্ত না হয়ে যকৃৎ অথবা বৃক্কে প্রবেশ করে পুনরায় জালকে বিভক্ত হয়, তাদের **পোর্টাল শিরা** বলে। মানুষসহ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর বৃক্কীয় পোর্টাল শিরা বা রেনাল পোর্টাল শিরা থাকে না। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের যকৃৎ পোর্টাল শিরা বা হেপাটিক পোর্টাল শিরা (Hepatic portal vein) থাকে। এই শিরা পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্র প্রভৃতি অংশ থেকে রক্তের মাধ্যমে খাদ্যরস বহন করে যকৃতে প্রবেশ করে এবং সেখানে ঐসব খাদ্যবস্তুকে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রাখে। পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যে সংবহন হয়, তাকে **পোর্টাল সংবহন** বলে (চিত্র 5.69)।

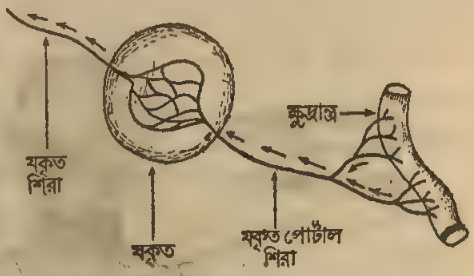

চিত্র 5.69 : যকৃৎ পোর্টাল সংবহন।

5.54. করোনারী সংবহন (Coronary circulation)

বাম নিলয় থেকে উৎপন্ন মহাধমনীর গোড়া থেকে **করোনারী ধমনী** বেরিয়ে হৃৎপিণ্ডের পেশীসমূহে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয় এবং সেখানে রক্ত সরবরাহ করে। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ থেকে দূষিত রক্ত করোনারী শিরার মাধ্যমে করোনারী সাইনাসের ছিদ্রপথে ডান অলিন্দে ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ডের কলাসমূহের মধ্যে রক্তের এই সংবহনকে **করোনারী সংবহন** বলে।

5.55. লসিকা ও লসিকা সংবহন (Lymph and Lymph circulation)

রক্তজালকের ভেদ্য প্রাচীরের মাধ্যমে রক্তের যে তরল অংশ বেরিয়ে কলা-কোষের সরাসরি সংস্পর্শে আসে এবং বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে লসিকাবহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাকে **লসিকা** (Lymph) বলে। লসিকা এক ধরনের পরিবর্তিত কলা-রস (modified tissue fluid)। লসিকা, লসিকাবহ, লসিকা গ্রন্থি ও লসিকা জালকের সমন্বয়ে **লসিকা তন্ত্র** (Lymphatic system) গঠিত।

লসিকাবহ (Lymph vessels) : যে সমস্ত নালীর মধ্য দিয়ে লসিকা প্রবাহিত হয়, তাদের **লসিকাবহ** বলে (চিত্র 4.53)। এই লসিকাবহগুলি লসিকা জালক থেকে উৎপন্ন হয়। লসিকাবহ দু ধরনের—(i) **অন্তর্মুখী লসিকাবহ** (Afferent lymph vessels) এবং (ii) **বহির্মুখী লসিকাবহ** (Efferent lymph vessels)।

(i) **অন্তর্মুখী লসিকাবহ** : যে লসিকাবহগুলি লসিকা গ্রন্থির দিকে লসিকা বহন করে, তাদের **অন্তর্মুখী লসিকাবহ** বলে।

(ii) **বহির্মুখী লসিকাবহ** : যে লসিকাবহগুলি লসিকা গ্রন্থি থেকে লসিকা বহন করে, তাদের **বহির্মুখী লসিকাবহ** বলে।

দেহের সমস্ত লসিকাবহ **দক্ষিণ লসিকাবহ** (Right lymphatic duct) এবং **বক্ষ লসিকাবহ** (Thoracic lymphatic duct) নামে দুটি প্রধান লসিকাবহতে মিলিত হয়।

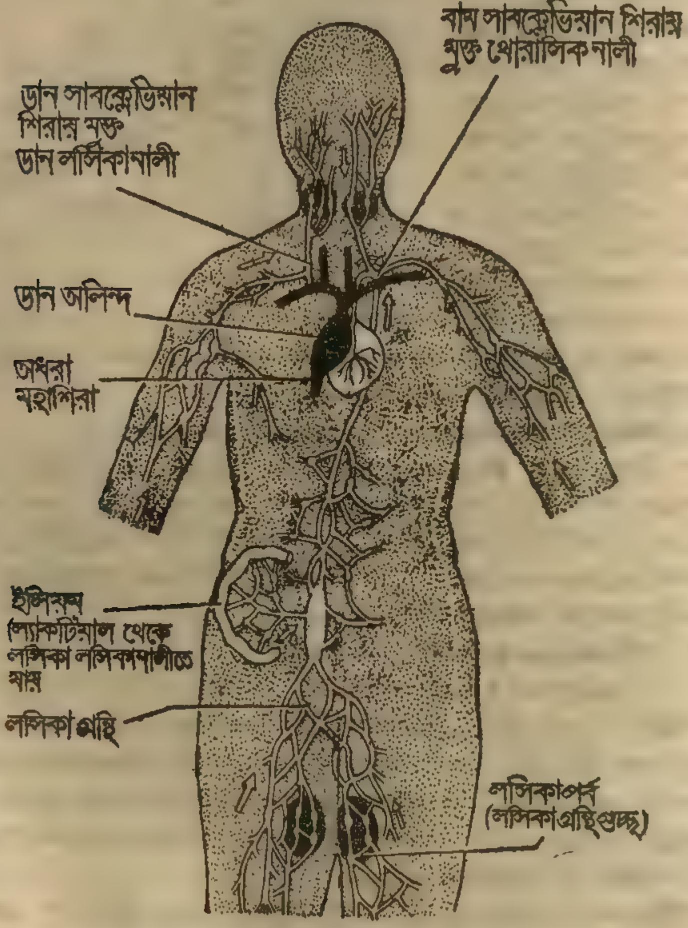

চিত্র 5.70 : মানুষের লসিকা তন্ত্র।

দক্ষিণ লসিকাবহ (Right lymphatic duct) : মাথা ও গলার ডানদিক, ডান হাত, ডান ফুসফুস, হৃৎপিণ্ডের ডানদিক ও যকৃতের ডানদিক থেকে লসিকা বহনকারী নালীকে **দক্ষিণ লসিকাবহ** বলে। এটি দক্ষিণ সাবক্লেভিয়ান শিরা (Right sub-clavian vein) এবং দক্ষিণ ইন্টারনাল জুগুলার শিরার (Right internal jugular vein) সংযোগস্থলে শিরাতন্ত্রের সঙ্গে মিলিত হয়।

বক্ষ লসিকাবহ (Thoracic lymphatic duct) ঃ এটি দেহের নিম্নাঙ্গের কিছু লসিকাবহের সমন্বয়ে গঠিত এবং বাম সাবক্লেভিয়ান শিরা (Left subclavian vein) ও বাম ইণ্টারনাল জুগুলার শিরার (Left internal jugular vein) সংযোগ স্থলে শিরাতন্ত্রের সঙ্গে মিলিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাসে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লসিকাবহকে **পয়ঃস্বিনী** বা **ল্যাকটিয়েলস** (Lacteals) বলে। এই পয়ঃস্বিনীগুলি ফ্যাটের পরিপাকের পর ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল শোষণ করে।

লসিকা গ্রন্থি (Lymph gland or Lymph node) ঃ লসিকাবহগুলির স্থানে স্থানে স্ফীত অংশ দেখা যায়, এদের **লসিকা গ্রন্থি** বলে। জীবাণু অপসারণ, অ্যান্টিবডি উৎপাদন, লিম্ফোসাইট উৎপাদন প্রভৃতি লসিকা গ্রন্থির উল্লেখযোগ্য কাজ।

লসিকা সংবহন (Lymph circulation) ঃ রক্ত সরাসরি ধমনীর মাধ্যমে কলা কোষে পৌঁছাতে পারে না। ধমনী ক্রমাগত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে জালক (Capillary) গঠন করে। এই জালক পুনরায় পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উপশিরা, শাখাশিরা এবং প্রধান শিরায় পরিণত হয়। রক্ত জালকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় আংশিক রক্ত-চাপ ও আংশিক ব্যাপন চাপের প্রভাবে রক্তরসের কিছু অংশ জালকের বাইরে বেরিয়ে এসে কোষান্তর স্থানে জমা হয় এবং এক ধরনের পরিবর্তিত কলা-রসে পরিণত হয়। এই পরিবর্তিত কলা-রসই হল **লসিকা**। লসিকা ও কোষের মধ্যে ব্যাপন ক্রিয়ায় লসিকা থেকে অক্সিজেন, খাদ্যবস্তুর সারাংশ কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কোষ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থসমূহ লসিকায় মুক্ত হয়। লসিকার কিছু অংশ জালকের শিরা প্রান্তে রক্ত-প্রবাহে প্রত্যাবর্তন করে। লসিকা বহনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লসিকা পরস্পর মিলিত হয়ে লসিকা জালক গঠন করে। এই লসিকা জালকগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে **লসিকা নালী** বা **লসিকাবহতে** (Lymph vessel) পরিণত হয়। অন্তর্মুখী লসিকাবহ লসিকা গ্রন্থিতে মুক্ত হয় এবং পুনঃপুনঃ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বহির্মুখী লসিকাবহতে পরিণত হয়। সবশেষে লসিকাবহ শিরার সঙ্গে যুক্ত হয়। লসিকাবহগুলি সংযুক্তভাবে লসিকা তন্ত্র গঠন করে। লসিকার মাধ্যমে সম্পন্ন সংবহনকে **লসিকা সংবহন** (Lymph circulation) বলে। লসিকা তন্ত্র ধমনী ও শিরার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে।

F. রেচন (Excretion)

5.56. ভূমিকা (Introduction)

বিভিন্ন বিপাকীয় কাজের ফলে জীবদেহের প্রতিটি সজীব কোষে কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় অথবা ক্ষতিকারক পদার্থ উপজাত (by-product) হিসেবে উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পদার্থগুলি জীবের কোন প্রয়োজনে লাগে না, উপরন্তু এগুলি ক্ষেত্রবিশেষে দেহের মধ্যে নানা রকম ক্ষতিকর বিক্রিয়া ঘটায়। বিপাকজাত এই অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলিকে **রেচন পদার্থ** (Excretory materials) বলে এবং জীবনের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য এই রেচন পদার্থগুলি জীবদেহ থেকে নিয়মিত নিষ্কাশিত হওয়া প্রয়োজন।

যে পদ্ধতিতে রেচন পদার্থগুলি প্রতিনিয়ত জীবদেহ থেকে দূরীভূত হয়, তাকে রেচন (Excretion) বলে।

5.57. রেচনের সংজ্ঞা (Definition of excretion)

যে প্রক্রিয়ায় বিপাকীয় কাজের ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় অথবা ক্ষতিকারক পদার্থ জীবদেহ থেকে প্রতিনিয়ত দূরীভূত হয়, তাকে রেচন বলে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জীবদেহের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন রস যেমন, লালাগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন লালারস, যকৃৎ থেকে উৎপন্ন পিত্ত, অগ্ন্যাশয় থেকে উৎপন্ন অগ্ন্যাশয় রস প্রভৃতি রেচন পদার্থ নয়। কেননা, এগুলি দেহের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর নয়, বরং এই পদার্থগুলি দেহের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেহে সংশ্লেষিত এইসব প্রয়োজনীয় পদার্থ ক্ষরিত পদার্থ (Secretory materials)। ক্ষরিত পদার্থ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াকে **ক্ষরণ** (Secretion) বলে। আবার, প্রাণিদেহের মলও রেচন পদার্থ নয়। কারণ মল উৎপন্ন হয় খাদ্যের অজীর্ণ অংশ থেকে খাদ্যনালীর মধ্যে। মল কখনই কোষের সাইটোপ্লাজমে বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় না বা কোষের মধ্যে কখনই এগুলির অনুপ্রবেশ ঘটে না। যেহেতু বিপাক ক্রিয়া জীবকোষের মধ্যে ঘটে, তাই রেচন পদার্থের সৃষ্টি কেবলমাত্র কোষের মধ্যেই হওয়া সম্ভব। সুতরাং মল কখনই রেচন পদার্থ নয়, বর্জ্য পদার্থ (waste product) মাত্র।

5.58. উদ্ভিদের রেচন (Excretion in Plants)

উদ্ভিদকোষে নানা ধরনের বিপাকীয় কাজের ফলে বিভিন্ন পদার্থ উপজাত হিসেবে উৎপন্ন হয়। এইসব উপজাত পদার্থের মধ্যে উদ্ভিদের অপ্রয়োজনীয় নানা রকমের রাসায়নিক পদার্থ থাকে। সাধারণত এইসব পদার্থ ক্ষতিকারক হয়। তাই উদ্ভিদ এইসব পদার্থ বর্জন করে। এই বর্জ্য পদার্থগুলি এক প্রকার রেচন পদার্থ। উদ্ভিদদেহে রেচন পদার্থ দূরীকরণের জন্য নির্দিষ্ট কোন অঙ্গ নেই। তাই উদ্ভিদ মূল, কান্ড, পাতা, ফুল, ফল, বীজ প্রভৃতি অঙ্গের বিভিন্ন কোষে এইসব পদার্থ সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে সঞ্চয় করে রাখে।

উদ্ভিদদেহে বিপাক ক্রিয়ার হার প্রাণিদেহের বিপাক ক্রিয়ার হার থেকে অনেক কম, তাই রেচন পদার্থ-ও কম তৈরি হয়। আবার বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন অনেক পদার্থ উদ্ভিদদেহে অন্যান্য বিপাকীয় ক্রিয়ায় পুনরায় ব্যবহৃত হয়। যেমন, শ্বাসকার্যে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের কিছুটা সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত হয় এবং সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন উপজাত অক্সিজেনের কিছু অংশ শ্বসনে ব্যবহৃত হয়। এই হিসেবে শ্বসনের ফলে উৎপন্ন CO_2 ও H_2O এবং সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন উপজাত O_2-কে রেচন পদার্থ বলা যায় না। এছাড়া উদ্ভিদের বিপাকীয় ক্রিয়াগুলি প্রধানত কার্বোহাইড্রেট-নির্ভর, সেইজন্য প্রাণীর মত নাইট্রোজেন-ঘটিত রেচন পদার্থ বিশেষ উৎপন্ন হয় না, আর হলেও তার পরিমাণ কম। নাইট্রোজেন-বিহীন রেচন পদার্থগুলি তেমন ক্ষতিকারক না হওয়ায় উদ্ভিদ এইসব রেচন পদার্থ বিশেষ বিশেষ অঙ্গে সঞ্চয় করে রাখে। তাছাড়া, উদ্ভিদদেহে প্রোটীন ও

নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগ ভেঙ্গে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়, যা আবার বিভিন্ন যৌগ গঠনে অংশগ্রহণ করে। রেচন পদার্থ হিসেবে কয়েক ধরনের লবণ কেলাসিত অবস্থায় উদ্ভিদকোষে সঞ্চিত থাকে। এইসব পদার্থ কোষ-রসে দ্রবীভূত না হলে উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর হয় না। সুতরাং একথা বলা যুক্তিসঙ্গত যে, **উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলি প্রাণীদের রেচন পদার্থ থেকে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক।**

5.59. উদ্ভিদের রেচন প্রক্রিয়া

(Mechanism of excretion in Plants)

উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলি বিভিন্ন উপায়ে দেহ থেকে অপসারিত হয় অথবা দেহের ভিতরেই বিশেষ বিশেষ কোষে সাময়িক অথবা স্থায়ীভাবে জমা থাকে।

স্থলজ উদ্ভিদ মাটি থেকে মূলরোমের সাহায্যে যে জল শোষণ করে এবং বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে যে জল উপজাত পদার্থ হিসেবে উৎপন্ন হয় তার অংশবিশেষ পত্ররন্ধ্র, লেন্টিসেল ও কিউটিকলের মধ্য দিয়ে বাষ্পমোচন (Transpiration) প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয়। তাছাড়া, শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন উপজাত পদার্থ CO_2 ও O_2 গ্যাসের অংশবিশেষও ঐসব রন্ধ্রপথে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়।

পর্ণমোচী উদ্ভিদ শীতকালে **পত্রমোচনের** মাধ্যমে পাতায় সঞ্চিত বর্জ্য পদার্থ অপসারিত করে। আবার কোন কোন উদ্ভিদ **বল্কল ত্যাগ** করে রেচন কাজ সম্পন্ন করে। কিছু কিছু উদ্ভিদ **ফলের খোসা, বীজ** প্রভৃতি অঙ্গের **মোচনের** মাধ্যমে রেচন কাজ করে থাকে। কিন্তু মূল ও কাণ্ডে সঞ্চিত বর্জ্য পদার্থসমূহ উদ্ভিদ ত্যাগ করতে পারে না এবং এগুলি উদ্ভিদদেহে স্থায়ীভাবে সঞ্চিত থেকে যায়। জলজ উদ্ভিদের দেহ থেকে গ্যাসীয় ও তরল বর্জ্য পদার্থ প্রধানত ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে জলে মিশে যায়।

● **উদ্ভিদের বিভিন্ন রেচন প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হল ঃ**

(i) **পত্রমোচন ঃ** পর্ণমোচী উদ্ভিদ, যেমন—নিম, আমড়া, অশ্বত্থ, শিমুল প্রভৃতি নির্দিষ্ট ঋতুতে পত্রমোচন প্রক্রিয়ায় এবং চিরহরিৎ উদ্ভিদ সব সময়েই অল্পবিস্তর পাতা ঝরিয়ে রেচন ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

(ii) **বল্কল ত্যাগ ঃ** অর্জুন, পেয়ারা প্রভৃতি উদ্ভিদ বল্কল ত্যাগের মাধ্যমে ত্বকে সঞ্চিত রেচন পদার্থ ত্যাগ করে থাকে।

(iii) **ফলমোচন ঃ** বিভিন্ন উদ্ভিদ ফলের খোসা, বীজ প্রভৃতি অঙ্গের মধ্যে রেচন পদার্থ সঞ্চিত রাখে এবং ঐ সমস্ত অঙ্গের মোচনের মাধ্যমে রেচন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; যেমন—বিভিন্ন লেবু, আপেল ইত্যাদি ফলের ত্বকে বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাসিড রেচন পদার্থরূপে সঞ্চিত থাকে।

(iv) **জল নিঃসরণ ঃ** বিপাকীয় কাজে উৎপন্ন অতিরিক্ত জলের অংশবিশেষ বাষ্পমোচন এবং জল-রন্ধ্রের (hydathode) মাধ্যমে নিঃস্রাবণ (guttation) প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহ থেকে পরিত্যক্ত হয়।

নিচে উদ্ভিদকোষে সঞ্চিত কয়েকটি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বর্জ্য পদার্থের বিবরণ দেওয়া হল ঃ

(i) **উপক্ষার** (Alkaloids) ঃ উপক্ষার কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন-ঘটিত এবং জলে অদ্রবণীয় এক ধরনের তিক্ত পদার্থ। উদ্ভিদদেহে

বিভিন্ন প্রকার উপক্ষার থাকে, যেমন সিঙ্কোনা গাছের (Cinchona) বল্কলে **কুইনাইন** (Quinine)—এটি ম্যালেরিয়া রোগের ঔষধ ; তামাক পাতায় উপস্থিত **নিকোটিন** (Nicotine) স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে এবং অবসাদ দূর করে ; কফি গাছের বীজে উপস্থিত **কেফিন** (Caffeine) স্নায়ু উত্তেজক ; সর্পগন্ধা (*Rauwolfia*) গাছের মূলে উপস্থিত **রেসারপিন** (Reserpine) রক্তচাপ ও উন্মাদনা প্রশমনে ব্যবহৃত হয় ; কুচিলার বীজে উপস্থিত **স্ট্রীকনিন** (Strychnine) বলবর্ধক ও উত্তেজক ; আফিম গাছের ফলে উপস্থিত **মরফিন** (Morphine) যন্ত্রণা উপশমে ব্যবহৃত হয় ; বেলেডোনা গাছের পাতা ও মূলে উপস্থিত **অ্যাট্রোপিন** (Atropine) সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে ; চা পাতায় উপস্থিত **থেইন** (Thein) স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে এবং অবসাদ দূর করে। অনেক উপক্ষার বিষাক্ত এবং অধিক মাত্রায় সেবনে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

(ii) **ট্যানিন** (Tannins) : এটি নাইট্রোজেন-ঘটিত ও জলে দ্রবণীয় এক ধরনের তিক্ত পদার্থ। চা পাতা, হরীতকী ফল প্রভৃতির কোষপ্রাচীরে প্রচুর পরিমাণে ট্যানিন থাকে। খয়ের-ও এক ধরনের ট্যানিন।

(iii) **তরুক্ষীর** বা **ল্যাটেক্স** (Latex) : কতকগুলি বিশেষ উদ্ভিদ কলায় তরুক্ষীর নামক জলের মত বর্ণহীন, দুধের মত সাদা অথবা হলুদ বর্ণের বিশেষ আঠাল পদার্থ উৎপন্ন হয়। তরুক্ষীর ক্ষীরকলা বা ল্যাটিসিফেরাস টিস্যু (laticiferous tissue) নামে এক বিশেষ কলার ভিতরে থাকে। তামাক ইত্যাদি উদ্ভিদে **ক্ষীর নালী** বা **ল্যাটেক্স ভেসেল** এবং করবী, আকন্দ প্রভৃতি উদ্ভিদে **ক্ষীর কোষ** (laticiferous cells) থাকে। তরুক্ষীরে শর্করা, শ্বেতসার, প্রোটীন, উপক্ষার ইত্যাদি জলে দ্রবীভূত বা অবদ্রব (emulsion) অবস্থায় থাকে। পেঁপের তরুক্ষীরে **প্যাপেইন** (papain) নামে এক প্রোটীন বিশ্লেষকারী উৎসেচক থাকে। ব্রোসিমাম গ্যালাকটোডেনড্রন (*Brosimum galactodendron*) নামক উদ্ভিদের তরুক্ষীর ভেনেজুয়েলার অধিবাসীরা দুধের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে। ক্ষেত্রবিশেষে তরুক্ষীর বিষাক্ত হয়।

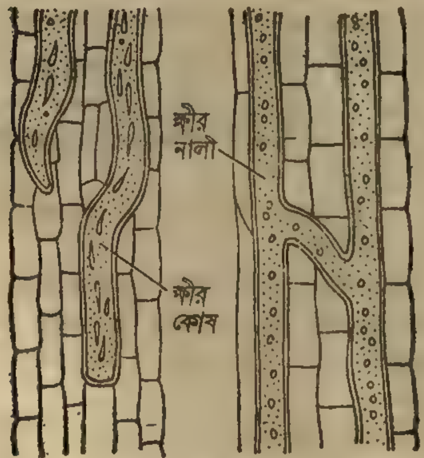

চিত্র 5.71 : উদ্ভিদের ক্ষীর নালী ও ক্ষীর কোষ।

(iv) **বান তেল বা উদ্বায়ী তেল** (Essential oils or Volatile oils) : কতকগুলি উদ্ভিদের তৈলগ্রন্থি থেকে জলে মোটামুটি দ্রবণীয় যেসব গন্ধযুক্ত ও উদ্বায়ী তেল পাওয়া যায়, তাদের **বান তেল** বা **উদ্বায়ী তেল** বলে। সাধারণ তেলের

সঙ্গে রাসায়নিক গঠনে এদের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। বিভিন্ন ধরনের লেবু, তুলসী, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতির পাতায়, যুঁই, বেল প্রভৃতি সুগন্ধি ফুলের পাপড়িতে এবং লেবুজাতীয় উদ্ভিদের ফলের খোসাতে প্রচুর বান তেল থাকে। আতর, সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি তৈরি করতে বান তেল প্রয়োজন হয়।

(v) **রজন** (Resins): রজন এক প্রকার জটিল জৈব যৌগ। বাতাসের সংস্পর্শে এলে রজন শক্ত হয়ে যায়। এটি হালকা হলুদ রঙের এবং জলে অদ্রাব্য—কিন্তু ইথার, অ্যালকোহল প্রভৃতি জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়। পাইন গাছের পাতা ও কাণ্ডের বিশেষ ধরনের নালীতে রজন পাওয়া যায়। উদাহরণ—চাঁচ-গালা (Shellac), লাক্ষা-বার্নিস (Lacquer) ইত্যাদি। এটি পালিশ ও রঙ করতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অয়েল ক্লথ, লিনোলিয়াম, ঔষধ, প্লাস্টিক, সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শিল্পে রজন ব্যবহৃত হয়। হিং এক ধরনের রজন, যা গঁদের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। ঐ ধরনের রজনকে **গঁদ রজন** (Gum resins) বলে। তার্পিন তেল, ক্যানাডা-বালসাম প্রভৃতি বান তেলের সঙ্গে মেশানো এক প্রকার রজন। এ ধরনের রজনকে **ওলিও রজন** (Oleo resins) বলে।

(vi) **গঁদ** (Gums): গঁদ এক ধরনের জটিল কার্বোহাইড্রেট। উদ্ভিদকোষের কোষপ্রাচীরের সেলুলোজ জারিত ও বিশ্লিষ্ট হয়ে গঁদ উৎপন্ন হয়। বাতাসের সংস্পর্শে এলে গঁদ শক্ত হয়ে যায় এবং জলের সংস্পর্শে এলে জল শোষণ করে গঁদ ফুলে ওঠে। বাবলা, জিওল, সজনে প্রভৃতি গাছের কাণ্ডে গঁদ জমা থাকে। গাছের কাণ্ডের ছালের কাটা অংশ দিয়ে গঁদ বেরিয়ে আসে। গঁদ থেকে ভাল আঠা তৈরি হয়।

(vii) **খনিজ কেলাস** (Crystals): অনেক সময় উদ্ভিদকোষে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ কেলাসিত অবস্থায় থাকে।

চিত্র 5.72 : সিস্টোলিথ।

বট, রবার প্রভৃতি গাছের পাতায় ঊর্ধ্ববহিঃস্ত্বক (upper epidermis)-এর কতকগুলি কোষ বেশ স্ফীত হয়। প্রতিটি স্ফীত কোষের শূন্যগর্ভে কেলাসিত **ক্যালসিয়াম কার্বোনেট** একটি সেলুলোজ নির্মিত বৃন্তের চারদিকে পুঞ্জীভূত হয়ে আঙুরের থোকার মত কোষপ্রাচীর থেকে ঝুলতে থাকে। এই পুঞ্জীভূত ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের কেলাসকে **সিস্টোলিথ** (Cystolith) বলে এবং যে কোষে সিস্টোলিথ অবস্থান করে সেই কোষকে **লিথোসিস্ট** (Lithocyst) বলে।

অনেক উদ্ভিদকোষে **ক্যালসিয়াম অক্সালেটের** কেলাস থাকে। কচু, ওল প্রভৃতির ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডে (underground stem) এবং কচু ও কচুরিপানার বৃন্তে ক্যালসিয়াম অক্সালেট কেলাসিত হয়ে সূচের মত আকারের হয়। একে **অ্যাসিকিউলার**

র‍্যাফাইড (Acicular raphide) বলে। আবার কচুরিপানার বৃন্তে ও বড় পানার (*Pistia*) পত্রমূলে ক্যালসিয়াম অক্সালেটের কেলাস তারকার আকারে কোষে জমা থাকে। এ ধরনের তারকাকৃতি কেলাসকে **স্ফিরর‍্যাফাইড** (Sphaeraphide) বলে। পেঁয়াজের শুষ্ক শল্কপত্রে (dry scale leaf) প্রিজম, বহুভুজ প্রভৃতি আকৃতিবিশিষ্ট ক্যালসিয়াম অক্সালেটের কেলাসগুলি এককভাবে থাকে। এদের **একক কেলাস** (Solitary crystal) বলে (চিত্র 5.73)।

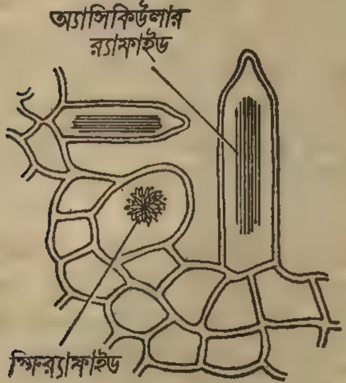

চিত্র ঃ 5.73 অ্যাসিকিউলার র‍্যাফাইড ও স্ফিরর‍্যাফাইড।

চিত্র 5.74 ঃ উদ্ভিদকোষে সিলিকা কেলাস।

সিলিকা (Silica) বা **বালি** কোষের ভিতরে অথবা কোষপ্রাচীরের গাত্রে পাতলা আস্তরণের মত জমা থাকতে পারে। বেলেডোনা (*Atropa belladona*) উদ্ভিদের কোষে বালির কেলাস একত্রিত হয়ে জমা থাকে। **ইকুইজিটাম** (*Equisetum*) নামক উদ্ভিদের ত্বকে, ঘাসজাতীয় গাছের পত্রফলকের ত্বক-কোষের বাইরের দিকের প্রাচীর গাত্রে সিলিকা আস্তরণের মত জমা থাকে (চিত্র 5.74)।

(viii) **গ্লাইকোসাইড** (Glycosides) ঃ এটি কার্বোহাইড্রেট পচনের ফলে উৎপন্ন এক ধরনের কার্বনযুক্ত রেচন পদার্থ। গ্লাইকোসাইড আপাতদৃষ্টিতে উপক্ষারের মত হলেও রাসায়নিক গঠনে উপক্ষার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। **ডিজিটক্সিন** (Digitoxin), **ডিজিটালিস** (Digitalis) প্রভৃতি গ্লাইকোসাইডের উদাহরণ। কিছু কিছু গ্লাইকোসাইড ঔষধ তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।

কখনো কখনো মূল দিয়ে খনিজ পদার্থ, ইথিলিন গ্যাস, অ্যামাইনো অ্যাসিড ইত্যাদি বর্জ্য পদার্থরূপে উদ্ভিদদেহ থেকে দূরীভূত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধান গাছের মূল দিয়ে কতকগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড—বর্জ্য পদার্থরূপে নির্গত হয়।

উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার উপক্ষার, তাদের উৎস ও গুরুত্ব ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল :

উপক্ষারের নাম	উৎস	গুরুত্ব
কুইনাইন	সিঙ্কোনা গাছের বল্কল।	ম্যালেরিয়া রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
নিকোটিন	তামাক গাছের পাতা।	স্নায়ুতন্ত্রের উদ্দীপক ও অবসাদ দূর করে।
কেফিন	কফি গাছের বীজ।	স্নায়ু উত্তেজক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
রেসারপিন	সর্পগন্ধা গাছের মূল।	রক্তচাপ ও উন্মাদনা প্রশমনে ব্যবহৃত হয়।
স্ট্রীকনিন	কুঁচিলার বীজ।	বলবর্ধক ও উত্তেজক।
মরফিন	আফিম গাছের কাঁচা ফলত্বক।	যন্ত্রণা উপশমে ব্যবহৃত হয়।
অ্যাট্রোপিন	বেলেডোনা গাছের পাতা ও মূল।	সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে এবং চোখের তারারন্ধ্র প্রসারণ ও রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।
ডাটুরিন	ধুতুরা গাছের পাতা ও ফল।	হাঁপানির ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
থেইন (Thein)	চা পাতা।	স্নায়ু উদ্দীপক ও অবসাদ দূর করে।

5.60. প্রাণীদের রেচন (Excretion in animals)

প্রাণীর রেচন পদার্থ বলতে শ্বসনের ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জল এবং প্রোটীনের বিপাকের ফলে উৎপন্ন নাইট্রোজেন-ঘটিত কয়েকটি বর্জ্য পদার্থকে বোঝায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রাণীদের নির্দিষ্ট শ্বাস অঙ্গের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়। অপরপক্ষে, নাইট্রোজেন-ঘটিত বর্জ্য পদার্থগুলি নির্দিষ্ট প্রাণীর নির্দিষ্ট রেচন যন্ত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে অপসারিত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে ত্বকে অবস্থিত ঘর্মগ্রন্থির মাধ্যমেও কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন-ঘটিত বর্জ্য পদার্থ দূরীভূত হয়। প্রাণীদের রেচন যন্ত্রগুলি যে তন্ত্র গঠন করে, তাকে **রেচনতন্ত্র** (Excretory system) বলে।

প্রাণীরা যে সব খাদ্য গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্য অতিরিক্ত হলে দেহে সঞ্চিত থাকতে পারে কিন্তু অতিরিক্ত প্রোটীন খাদ্য দেহে সঞ্চিত থাকতে পারে না। প্রোটীন পরিপাকের ফলে উৎপন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের অতিরিক্ত অংশ যকৃতের মাধ্যমে প্রথমে অ্যামোনিয়ায় এবং তা থেকে বহু পতঙ্গ, উভচর ও

সিলিয়াগুলি ক্রমাগত আন্দোলিত হতে থাকে। ফলে কোষের গহ্বরে স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং দেহের বিভিন্ন কোষ থেকে সংগৃহীত অতিরিক্ত জল ও বর্জ্য পদার্থসমূহ এই কোষের সঙ্গে যুক্ত সূক্ষ্ম নালীর মধ্যে প্রবেশ করে। সূক্ষ্ম নালীগুলি দুটি বৃহৎ **অনুদৈর্ঘ্য রেচন নালীর** (Longitudinal Excretory canal) মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয় এবং ঐ পথে রেচন পদার্থ ত্যাগ করে।

নিমাট্‌হেলমিন্‌থিস্‌ (গোলকৃমি) পর্বভুক্ত প্রাণীর দেহেও রেচন নালী আছে, কিন্তু ফ্লেম কোষ নেই। রেচন নালী-সংলগ্ন কয়েকটি বৃহদাকার কোষ সমগ্র দেহ থেকে রেচন পদার্থ সংগ্রহ করে রেচন নালীতে প্রেরণ করে এবং এই রেচন নালী থেকেই রেচন পদার্থ পরিত্যক্ত হয়।

অ্যানিলিডা বা অঙ্গুরীমাল পর্বভুক্ত প্রাণী, যথা—কেঁচো, জোঁক প্রভৃতিতে **নেফ্রিডিয়া** (একবচন= নেফ্রিডিয়াম) নামে এক প্রকার অঙ্গ রেচন যন্ত্র হিসেবে কাজ করে। দেহের প্রতি খণ্ডে অনেকগুলি করে নেফ্রিডিয়া থাকে। প্রতিটি নেফ্রিডিয়াম দেখতে লম্বা প্যাঁচানো নলের মত এবং উভয় প্রান্তই মুক্ত। আদর্শ নেফ্রিডিয়ামের একটি প্রান্ত সিলিয়াযুক্ত চোঙ বা ফানেলের মত। ঐ প্রান্তের নাম **নেফ্রোস্টোম** (Nephrostome)। নেফ্রোস্টোম দেহের ভিতরে থাকে। নেফ্রিডিয়ামের অপর প্রান্ত একটি ছিদ্র দিয়ে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়। ঐ ছিদ্রের নাম **নেফ্রিডিওপোর** (Nephridiopore)। নেফ্রিডিয়ামগুলি রক্ত থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রেচন পদার্থ সংগ্রহ করে নেফ্রিডিওপোরের মাধ্যমে দেহের বাইরে নিক্ষেপ করে (চিত্র 5.76)।

চিত্র 5.76 : কেঁচোর রেচন যন্ত্র। [নিচের চিত্রে একটি নেফ্রিডিয়ামকে বড় করে দেখানো হয়েছে।]

আরথ্রোপোডা বা সন্ধিপদ পর্বভুক্ত পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণী, যথা—আরশোলা, গঙ্গাফড়িং প্রভৃতির রেচন অঙ্গের নাম **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** (Malpighian tubules)। এগুলি চুলের মত সরু সরু নালীবিশেষ। পৌষ্টিক নালীর মেসেনটেরন (মধ্যান্ত্র) ও ইলিয়ামের (পশ্চাৎ অন্ত্রের) সংযোগস্থলে এগুলি যুক্ত থাকে। এদের একটি প্রান্ত

বন্ধ এবং অপর প্রান্তটি ইলিয়ামে মুক্ত হয়। দেহরস থেকে সংগৃহীত রেচন পদার্থ ঐ ম্যালপিজিয়ান নালিকার মাধ্যমে ইলিয়ামে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে মলের সঙ্গে দেহের বাইরে যায় (চিত্র 5.77)।

সন্ধিপদ পর্বের ক্রাসটেসিয়া শ্রেণীর প্রাণী, যথা—চিংড়ির দ্বিতীয় জোড়া শৃঙ্গের প্রত্যেকটিতে হালকা সবুজ রঙের একটি করে মোট এক-জোড়া **সবুজ গ্রন্থি** (Green glands) বা **শৃঙ্গ গ্রন্থি** (Antennal glands) আছে। ঐগুলি এদের রেচন অঙ্গ। **এন্ড্ স্যাক, ল্যাবাইরিন্থ** ও **মূত্রস্থলী** নিয়ে প্রতিটি সবুজ গ্রন্থি গঠিত। ল্যাবাইরিন্থ ও মূত্রস্থলীর মধ্যে অবস্থিত এন্ড্ স্যাকে একটি করে রক্তবাহ থাকে। ল্যাবাইরিন্থের রেচন নালিকাগুলি পাতলা প্রাচীরযুক্ত এবং মূত্রস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতিটি মূত্রস্থলী ইউরেটার নামক সরু নালীতে পরিণত হয়ে দ্বিতীয় শৃঙ্গের গোড়ায় রেচন ছিদ্রে উন্মুক্ত হয়। চিংড়ির সবুজ গ্রন্থি দুটি পার্শ্বনালী দিয়ে ক্যারাপেসের* ঠিক নিচে পাকস্থলীর পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট রেচন থলির সঙ্গে যুক্ত। মূত্রস্থলী থেকে রেচন পদার্থ পার্শ্বনালী দিয়ে সাময়িকভাবে রেচন থলির মধ্যে জমা থাকে। পরে ঐ সঞ্চিত রেচন পদার্থ রেচন থলি থেকে পুনরায় মূত্রস্থলীতে ফিরে যায় এবং রেচন ছিদ্রপথে দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়। এছাড়া, চিংড়ির কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন-ঘটিত বর্জ্য পদার্থ বহিঃকঙ্কালের (Exoskeleton) মধ্যে জমা হয়। **নির্মোচন বা খোলস ত্যাগের** (Moulting) সময় সেগুলি দেহ থেকে দূরীভূত হয় (চিত্র 5.78)।

চিত্র 5.77 আরশোলার রেচন যন্ত্র।

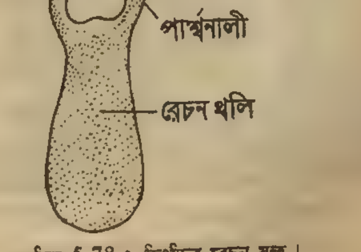

চিত্র 5.78 : চিংড়ির রেচন যন্ত্র।

* শিরোবক্ষের (Cephalothorax) শক্ত আবরণীর নাম ক্যারাপেস (Carapace)।

মলাস্কা বা কম্বোজ পর্বভুক্ত প্রাণীর রেচনতন্ত্র থলির মত একজোড়া বা দুজোড়া বৃক্ক। এই বৃক্ক অন্তঃস্থভাবে সিলোমের মধ্যে এবং বহিঃস্থভাবে ম্যান্টল্ গহ্বরে মুক্ত হয়। রক্ত থেকে রেচন পদার্থ বৃক্কে এলে সেখান থেকে রেচন পদার্থ ম্যান্টল্ গহ্বরে এসে পড়ে। ম্যান্টল্ গহ্বর থেকে বর্জ্য পদার্থ জলস্রোতের মাধ্যমে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

5.62. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেচনতন্ত্র (Excretory systems of Vertebrates)

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেচন অঙ্গ হল **বৃক্ক**। প্রত্যেক মেরুদণ্ডী প্রাণীরই উদর গহ্বরের পৃষ্ঠ-প্রাচীরে মেরুদণ্ডের প্রতি পাশে একটি করে মোট দুটি বৃক্ক থাকে। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৃক্ক মূলত একই ধরনের কাজ করলেও গঠনের উপর ভিত্তি করে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৃক্ককে **প্রোনেফ্রোস, মেসোনেফ্রোস** এবং **মেটানেফ্রোস**—এই তিনভাগে ভাগ করা যায়।

বৃক্কের গঠন (Structure of Kidney): প্রোনেফ্রোস, মেসোনেফ্রোস ও মেটানেফ্রোস—এই তিন ধরনের বৃক্কই **নেফ্রন** (Nephron) নামক অসংখ্য সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম নালিকা নিয়ে তৈরি। এই **নেফ্রনই হল বৃক্কের গঠন ও কার্যগত একক** (Structural and functional unit of kidney)। কেননা, একদিকে যেমন অসংখ্য নেফ্রন নিয়ে এক-একটি বৃক্ক গঠিত, অন্যদিকে তেমনি প্রতিটি নেফ্রন যে কাজ করে, তাই হল সামগ্রিকভাবে একটি বৃক্কের কাজ।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছেদের বৃক্ক অপেক্ষাকৃত লম্বা—উদর গহ্বরের সামনের দিক থেকে পিছনের দিক পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীতে বৃক্কের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট। ব্যাঙের বৃক্ক গাছের পাতার মত চ্যাপ্টা। মানুষসহ সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর বৃক্কের আকৃতি অনেকটা শিমের (bean) দানার মত।

● **মানবদেহের বৃক্কের গঠন** (Structure of Human Kidney):

(a) **অবস্থান** (Position): মানবদেহের প্রধান রেচন অঙ্গ হল বৃক্ক। উদর গহ্বরের পৃষ্ঠ প্রাচীরে মেরুদণ্ডের প্রতি পাশে একটি করে মোট দুটি বৃক্ক থাকে। বৃক্ক দুটি মেরুদণ্ডের দ্বাদশ বক্ষদেশীয় কশেরুকা থেকে তৃতীয় কটিদেশীয় কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত। ডান বৃক্ক, বাম বৃক্কের চেয়ে সামান্য অগ্রভাগে অবস্থিত।

(b) **আকার ও আকৃতি** (Shape and size): মানুষের বৃক্ক দুটি দেখতে অনেকটা শিমের (bean) দানার মত। প্রতিটি বৃক্ক প্রায় 10 সেমি. লম্বা, 5 সেমি. চওড়া, 3 সেমি. পুরু এবং ওজনে প্রায় 150 গ্রামের মত।

(c) **শারীরস্থান** (Anatomy): মানুষের বৃক্ক দুটি মোটামুটিভাবে নিরেট লালচে-বাদামী বর্ণের। দুটি বৃক্কই একটি স্বচ্ছ তন্তুময় ঝিল্লি দ্বারা আবৃত, যাকে **ক্যাপসুল** (Capsule) বলে। প্রতিটি বৃক্কের যে তলটি মেরুদণ্ডের দিকে অবস্থিত তার মাঝামাঝি অংশে একটা খাঁজ দেখা যায়, একে **বৃক্কীয় নাভি** বা **হাইলাম** (Hilum) বলে। বৃক্কের বাইরের দিকের তলটি উত্তল। বৃক্কের হাইলামে বৃক্কীয় ধমনী বা রেনাল ধমনী (Renal artery), বৃক্কীয় শিরা বা রেনাল শিরা (Renal vein) ও

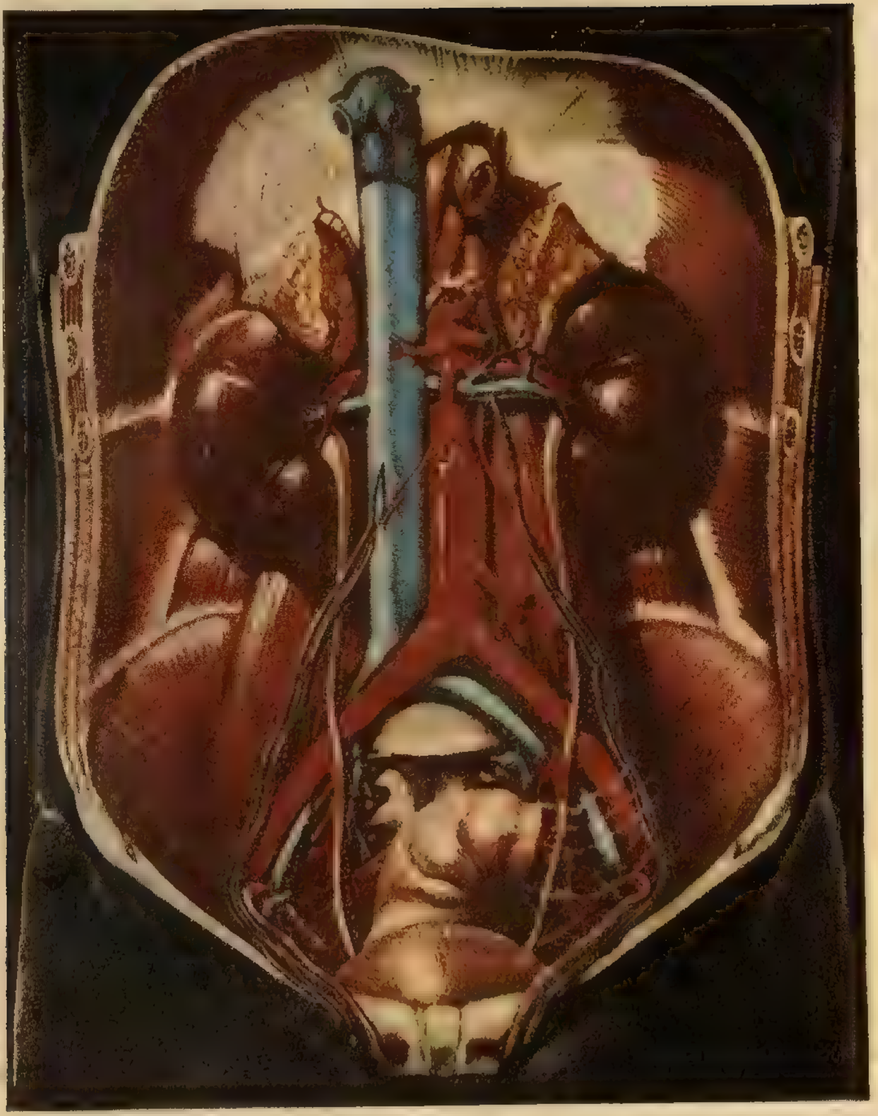

মানবদেহে রেচন তন্ত্রের অবস্থান।

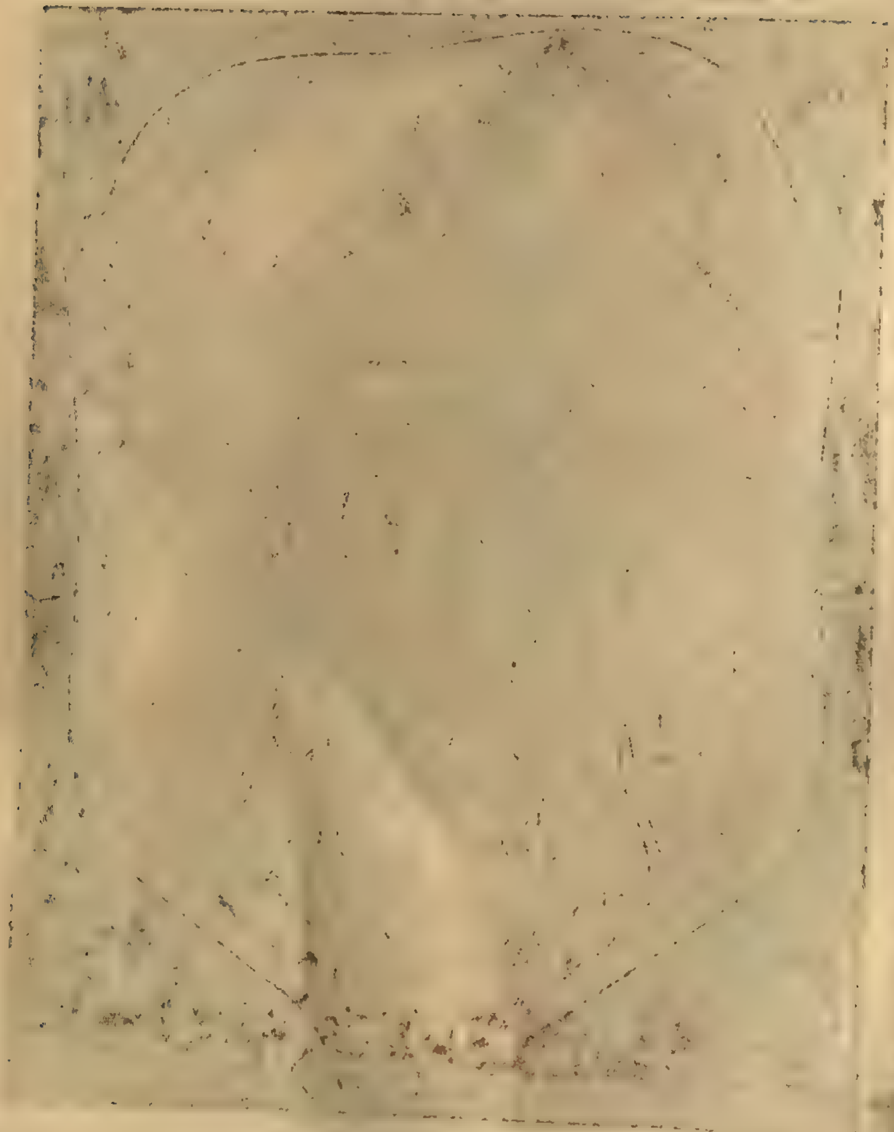

গবিনী (Ureter) বৃক্কের সঙ্গে যুক্ত থাকে। মহাধমনীর শাখা হিসেবে রেনাল ধমনী অপেক্ষাকৃত বেশী অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বৃক্কের মধ্যে নিয়ে আসে এবং রেনাল শিরা অপেক্ষাকৃত কম অক্সিজেনযুক্ত রক্ত গ্রহণ করে মহাশিরার দিকে পরিচালিত হয়। আর গবিনী বৃক্ক থেকে বেরিয়ে মূত্রস্থলীর নিম্নদেশে বা মূলদেশে প্রবেশ করে। এই মূত্রস্থলী উদর গহ্বরের নিচের দিকে অবস্থিত।

বৃক্ককে লম্বালম্বি দ্বিখণ্ডিত করলে পরিধি বরাবর যে গাঢ় লাল বর্ণের অংশ দেখা যায়, তাকে **বহিঃস্তর** বা **কর্টেক্স** (Cortex) এবং ভিতরের অপেক্ষাকৃত ফেকাসে লাল বর্ণের অংশটিকে **অন্তঃস্তর** বা **মেডুলা** (Medulla) বলে। বৃক্কের ভিতরের যে অংশ থেকে গবিনী সৃষ্টি হয়, তাকে **পেলভিস** (Pelvis) বলে। লম্বচ্ছেদে বৃক্কীয়

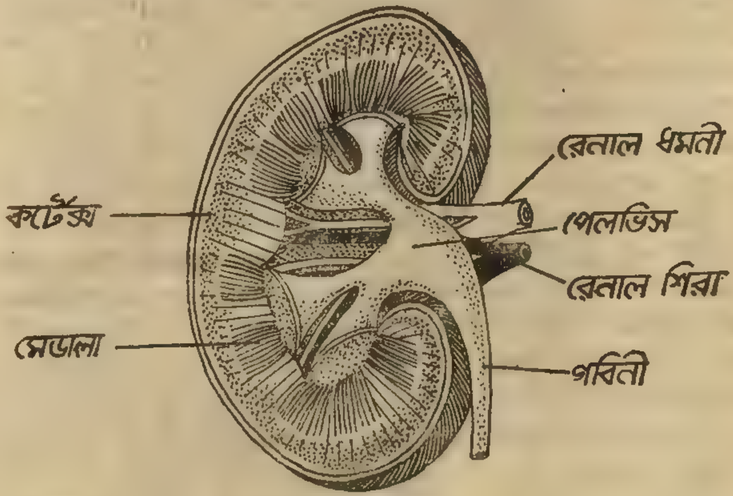

চিত্র 5.79 : বৃক্কের লম্বচ্ছেদ।

নাভির বা হাইলামের কাছে বৃক্কের ভিতর দিকে একটি গহ্বর দেখা যায়, একে **বৃক্কীয় সাইনাস** বা **রেনাল সাইনাস** (Renal sinus) বলে। বাস্তবিক পক্ষে গবিনীর স্ফীতাকার ঊর্ধ্বাংশই হল রেনাল সাইনাস। রেনাল সাইনাস বৃক্কের মধ্যে প্রবেশ করে 2—3টি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এদের **প্রধান বৃতি** বা **মেজর ক্যালিক্স** (Major calyx) বলে। প্রতিটি প্রধান বৃতি আবার 7—10টি শাখায় বিভক্ত হয়। এই শাখাগুলিকে **শাখাবৃতি** বা **মাইনর ক্যালিক্স** (Minor calyx) বলে।

বৃক্কের ভিতরের দিকে কর্টেক্সের কিছু অংশ মেডুলাতে প্রবেশ করে স্তম্ভাকৃতি ধারণ করে। এদের **বার্টিনির স্তম্ভ** (Column of Bertini) বা **বৃক্কীয় স্তম্ভ** বা **রেনাল স্তম্ভ** (Renal column) বলে। বৃক্কের মেডুলা অঞ্চলটি কয়েকটি শঙ্কুর মত পিরামিডে বিভক্ত। দুটি বা তিনটি পিরামিডের শীর্ষ পরস্পর যুক্ত হয়ে এক-একটি **পীড়কা** বা **প্যাপিলা** (Papilla) গঠন করে। প্রতিটি প্যাপিলার প্রান্তে

10—25টি ছিদ্র থাকে। অনেকগুলি সংগ্রাহক নালী (Collecting tubule) পরস্পর যুক্ত হয়ে যে **বেলিনির নালী** (Duct of Belini) গঠন করে, তা এই ছিদ্রের মাধ্যমে **শাখাবৃতি** বা **মাইনর ক্যালিক্সের** সঙ্গে যুক্ত হয়।

নেফ্রন (Nephron) ঃ প্রতিটি বৃক্কই **নেফ্রন** (Nephron) নামক অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালিকা দিয়ে তৈরি। এই **নেফ্রনই হল বৃক্কের গঠন ও কার্যগত একক** (Structural and functional unit of kidney)। কেননা, একদিকে যেমন অসংখ্য নেফ্রন নিয়ে এক-একটি বৃক্ক গঠিত, অন্যদিকে তেমনি প্রতিটি নেফ্রন যে কাজ করে, তাই হল সামগ্রিকভাবে বৃক্কের কাজ।

প্রতিটি বৃক্কে নেফ্রনের সংখ্যা প্রায় 10 লক্ষের মত। এক-একটি নেফ্রনের গড় দৈর্ঘ্য প্রায় 5 সেমি. এবং বৃক্কের সমস্ত নেফ্রনের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় 110 কিলোমিটার। বৃক্কের বহিঃস্তর বা কর্টেক্সে মোট নেফ্রনের 85% থাকে। এদের **বহিঃস্তরীয় নেফ্রন** বা **সুপারফিসিয়াল নেফ্রন** (Superficial nephron) বলে। আবার মোট নেফ্রনের প্রায় 15% বৃক্কের ভিতরের অংশ মেডুলার ঠিক উপরে থাকে। এদের **অন্তঃস্তরীয় নেফ্রন** বা **জাক্স্টামেডুলারি নেফ্রন** (Juxtamedullary nephron) বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় জাক্স্টামেডুলারি নেফ্রনগুলি সাধারণত কোন কাজ করে না। তবে দেহের কোন বিশেষ অবস্থা বা জরুরী অবস্থায় এরা কাজ করে থাকে।

প্রতিটি নেফ্রনের দুটি অংশ থাকে, যথা—**ম্যালপিজিয়ান করপাসল্** (Malpighian corpuscle) বা **রেনাল করপাসল্** (Renal corpuscle) এবং **রেনাল টিউবিউল** (Renal tubule)। রেনাল টিউবিউলের শেষাংশ সংগ্রাহক নালীতে যুক্ত হয়। নেফ্রন (ম্যালপিজিয়ান করপাসল্ ও রেনাল টিউবিউল) এবং সংগ্রাহক নালীকে একত্রে **ইউরিনিফেরাস টিউবিউল** (uriniferous tubule) বলে।

আণুবীক্ষণিক গঠন (Microscopic structure) ঃ নেফ্রনের দুটি অংশ ম্যালপিজিয়ান করপাসল্ ও রেনাল টিউবিউলের গঠন সম্পূর্ণ পৃথক।

ম্যালপিজিয়ান করপাসল্ ও রেনাল টিউবিউলের গঠন সম্পর্কে সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হল ঃ

A. ম্যালপিজিয়ান করপাসল্ ঃ সুপারফিসিয়াল নেফ্রনের ম্যালপিজিয়ান করপাসল্গুলি, জাক্স্টামেডুলারি নেফ্রনের ম্যালপিজিয়ান করপাসল্ থেকে ছোট। সুপারফিসিয়াল নেফ্রনের ক্ষেত্রে এর গড় ব্যাস প্রায় 200 মাইক্রা। প্রত্যেক ম্যালপিজিয়ান করপাসল্ আবার একটি **বোম্যানস্ ক্যাপসিউল** (Bowman's capsule) ও একটি **গ্লোমেরিউলাস** (Glomerulus) নিয়ে গঠিত।

বোম্যানস্ ক্যাপসিউল ঃ বোম্যানস্ ক্যাপসিউলটি দুই প্রাচীরবিশিষ্ট (double-walled) একটি পেয়ালা বা কাপের মত। এটি ম্যালপিজিয়ান করপাসলের অপর অংশ গ্লোমেরিউলাসকে আবৃত করে রাখে। এটি নেফ্রনের বন্ধ ও স্ফীত প্রান্ত। বোম্যানস্ ক্যাপসিউলের দু স্তরবিশিষ্ট প্রাচীরের গ্লোমেরিউলাস সংলগ্ন স্তরকে **ভিসেরাল স্তর** (Visceral layer) এবং রেনাল টিউবিউলের সঙ্গে যুক্ত স্তরকে **প্যারাইটাল স্তর** (Parietal layer) বলে। ভিসেরাল স্তরটি একসারি

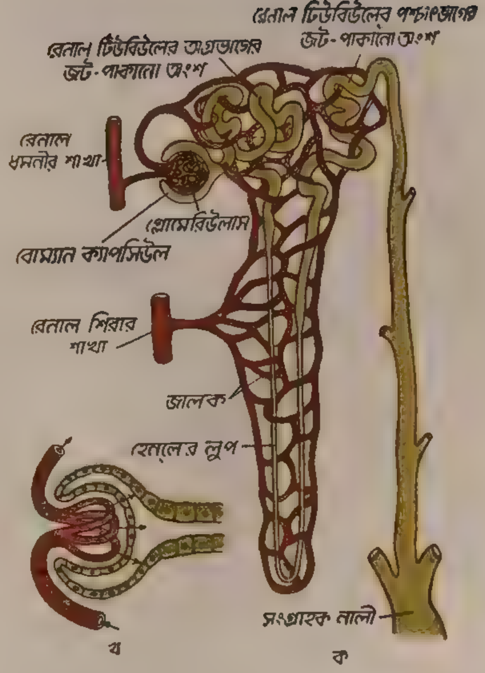

(ক) একটি নেফ্রন ও তাহার সহিত সংশিষ্ট গঠনসমূহ।
(খ) একটি রেনাল কর্‌পাসল ও সংশিষ্ট টিউবিউল।

অসম্পূর্ণ বহিঃরেখাযুক্ত চ্যাপ্টাকৃতি কোষ দিয়ে গঠিত। কোষগুলি দেখতে অনেকটা অ্যামিবার মত, এদের **পোডোসাইট (Podocytes)** বলে। এই পোডোসাইটগুলি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট ভিত্তিঝিল্লির উপর পর পর সাজানো থাকে। এই ভিত্তিঝিল্লিটি গ্লোমেরিউলাসের রক্তজালকের এন্ডোথেলিয়ামের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বোম্যানস্ ক্যাপসিউলের প্যারাইটাল স্তরটি কতকগুলি চ্যাপ্টাকৃতি কোষ দ্বারা গঠিত। এদের কোষ-বহিঃরেখা স্পষ্ট এবং পরে রেনাল টিউবিউলের আবরণী কলার সঙ্গে মিশে যায়।

গ্লোমেরিউলাস ঃ এটি বোম্যানস্ ক্যাপসিউলের ভিতরের দিকে অবস্থিত একটি রক্তজালিকার কুণ্ডলীবিশেষ। পেশীযুক্ত একটি অন্তর্মুখী (Afferent) রক্তনালী রেনাল ধমনী থেকে উৎপন্ন হয়ে বোম্যানস্ ক্যাপসিউলের মধ্যে প্রায় 0·5 মিলিমিটার দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট 30—50টি রক্ত-নালিকায় বিভক্ত হয়ে জালিকা কুণ্ডলীর সৃষ্টি করে। রক্ত-জালিকার ছোট ছোট নালিকা পুনরায় মিলিত হয়ে একটি বহির্মুখী (Efferent) রক্তনালী তৈরি করে। অন্তর্মুখী রক্তনালী, বহির্মুখী রক্তনালী থেকে অধিক ব্যাসযুক্ত অর্থাৎ মোটা। রক্তনালীর এরূপ গঠন পরিস্রাবণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

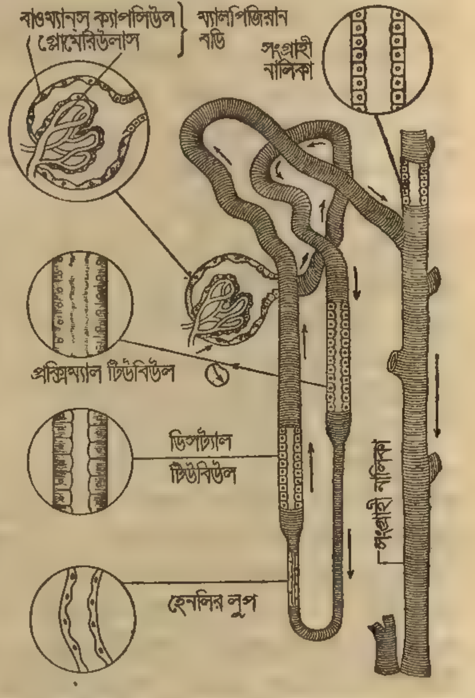

চিত্র 5.80 ঃ নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের আণুবীক্ষণিক গঠন।

ম্যালপিজিয়ান করপাসলের কাজ (Functions of Malpighian corpuscle) ঃ ম্যালপিজিয়ান করপাসলের প্রধান কাজ হল **রক্তের পরিস্রাবণ।** রক্ত যখন অন্তর্মুখী রক্তনালী পথে জালিকা কুণ্ডলীর বা গ্লোমেরিউলাসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন রক্তস্থিত কোষ, প্রোটীন ও অন্যান্য কিছু কিছু বৃহদাকৃতি পদার্থ ছাড়া রক্তের সমস্ত কিছুই পরিস্রুত হয়ে বোম্যানস্ ক্যাপসিউলের গহ্বরে জমা হয়। পরিস্রাবণ ঝিল্লিটি রক্ত-নালিকার এন্ডোথেলিয়াম, ভিত্তিঝিল্লি ও ভিসেরাল স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতি মিনিটে বৃক্কের মধ্য দিয়ে 1,200—1,300 মিলিলিটার রক্ত প্রবাহিত হয় এবং রক্তের এই মোট পরিমাণ থেকে প্রায় 120—125 মিলিলিটার

পরিস্রুত তরল বোম্যানস্ ক্যাপসিউলের গহ্বরে সঞ্চিত হয়। প্রতি 24 ঘণ্টায় এই পরিস্রুত তরলের মোট পরিমাণ প্রায় 170—180 লিটারের মত।

B. রেনাল টিউবিউল: বোম্যানস্ ক্যাপসিউল ও গ্লোমেরুলাসকে সমষ্টিগতভাবে **ম্যালপিজিয়ান বডি** (Malpighian body) বলে। ম্যালপিজিয়ান বডি সরু প্যাঁচানো রেনাল টিউবিউলের সঙ্গে যুক্ত। রেনাল টিউবিউলের কোন কোন অংশ জট পাকানো (convoluted), আবার কোন কোন অংশ সোজা। মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিটি রেনাল টিউবিউলের দৈর্ঘ্য প্রায় 3 সেমি. ও গড় ব্যাস 20—60 মাইক্রা। রেনাল টিউবিউলকে 3টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। রেনাল টিউবিউলের জট পাকানো প্রথমাংশকে **নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা** (Proximal convoluted tubule), মাঝখানের অংশটি ইংরেজী 'U' অক্ষরের মত, এই অংশটিকে **হেন্‌লের লুপ** (Loop of Henle) এবং জট পাকানো শেষাংশকে **দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা** (Distal convoluted tubule) বলে।

নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা: রেনাল টিউবিউলের এই অংশটি ম্যালপিজিয়ান বডির ঠিক নিচে শুরু হয়। এর দৈর্ঘ্য প্রায় 14 মিলিমিটার ও ব্যাস প্রায় 55 মাইক্রা। নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা অংশটি বৃক্কে কর্টেক্স অংশে অবস্থিত। রেনাল টিউবিউলের এই অংশটি একস্তরবিশিষ্ট ঘনতলাকৃতি কোষ দ্বারা আবৃত। কোষসমূহের মুক্তপ্রান্তে বহু শোষণোপযোগী মাইক্রোভিলাইয়ের* উপস্থিতির জন্য একে বুরুশের মত দেখায়। এই অংশটি পরে সরু হয়ে রেনাল টিউবিউলের দ্বিতীয় অংশ হেন্‌লের লুপের সঙ্গে যুক্ত হয়।

হেন্‌লের লুপ: রেনাল টিউবিউলের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ হেন্‌লের লুপ অংশটি দেখতে অনেকটা ইংরেজী 'U' অক্ষরের মত। এর দুটি বাহু আছে—নিম্নগামী বাহু এবং ঊর্ধ্বগামী বাহু। হেন্‌লের লুপটি গঠন অনুযায়ী চারটি অংশে বিভক্ত। অংশগুলি যথাক্রমে—(i) পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট নিম্নগামী বাহু, যা নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকার সঙ্গে যুক্ত, (ii) পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট নিম্নগামী বাহু, (iii) পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট ঊর্ধ্বগামী বাহু এবং (iv) পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট ঊর্ধ্বগামী বাহু, যা দূরবর্তী সংবর্ত নালিকার সঙ্গে যুক্ত। উপরিউক্ত অংশগুলির মধ্যে প্রথম অংশের (অর্থাৎ পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট নিম্নগামী বাহুর) গাত্রপ্রাচীর নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকার মত ঘনকাকার কোষ দ্বারা গঠিত, তবে এই কোষে মাইক্রোভিলাইয়ের সংখ্যা অনেক কম থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের (অর্থাৎ পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট নিম্নগামী ও ঊর্ধ্বগামী বাহুর) গাত্রপ্রাচীর চ্যাপ্টা কোষ দ্বারা গঠিত এবং গড় ব্যাস প্রায় 15 মাইক্রা। হেন্‌লের লুপের শেষাংশের (অর্থাৎ পুরু প্রাচীর-বিশিষ্ট ঊর্ধ্বগামী অংশের) গাত্রপ্রাচীর মাইক্রোভিলাসবিহীন ঘনকাকার কোষ দ্বারা গঠিত—এই অংশের গড় ব্যাস প্রায় 30 মাইক্রা।

দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা: রেনাল টিউবিউলের শেষাংশ দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা অংশটিও বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থিত। এই অংশটি নিকটবর্তী সংবর্ত

* একবচন—মাইক্রোভিলাস; বহুবচন—মাইক্রোভিলাই।

নালিকার তুলনায় কম জট পাকানো। এর দৈর্ঘ্য প্রায় 5 মিলিমিটার ও ব্যাস প্রায় 50 মাইক্রার মত। দূরবর্তী সংবর্ত নালিকার গাত্রপ্রাচীর একস্তরবিশিষ্ট ঘনকাকার কোষ দ্বারা গঠিত। কোষগুলি ভিত্তিঝিল্লির উপর পর পর সাজানো এবং অল্প সংখ্যক ক্ষুদ্রাকার মাইক্রোভিলাইযুক্ত। দূরবর্তী সংবর্ত নালিকার প্রথমাংশ গ্লোমেরুলাস ও অন্তর্মুখী রক্তনালীর সংস্পর্শে এলে দূরবর্তী সংবর্ত নালিকার ও অন্তর্মুখী রক্তনালীর গাত্রস্থিত কোষসমূহ বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়ে **ম্যাকুলা ডেনসা** (Macula densa) ও **জাক্স্টাগ্লোমেরুলার কোষ** (Juxtaglomerular cell) গঠন করে। ম্যাকুলা ডেনসা, জাক্স্টাগ্লোমেরুলার কোষ ও লেসীস কোষ (Lacis cell) একত্রে **জাক্স্টাগ্লোমেরুলার যন্ত্র** (Juxtaglomerular apparatus) গঠন করে।

রেনাল টিউবিউলের কাজ (Functions of Renal tubule)**ঃ** রেনাল টিউবিউলের প্রধান কাজ **পুনঃশোষণ ও ক্ষরণ**। এই পুনঃশোষণ আবার সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় দু ধরনেরই হতে পারে। যে সমস্ত পদার্থ পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে রেনাল টিউবিউলে প্রবেশ করে তার প্রায় সবটাই সক্রিয় পদ্ধতিতে পুনঃশোষিত হয়ে সংবহন তন্ত্রে ফিরে যায়। গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন-সি, সালফেট, ফসফেট, সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি সক্রিয় পদ্ধতিতে পুনঃশোষিত হয়ে সংবহন তন্ত্রে ফিরে আসে। সাধারণ অবস্থায় বৃক্কে প্রোটীন অণুর পরিস্রাবণ হয় না। তবে কোন কারণে পরিস্রুত তরলে প্রোটীনের উপস্থিতি হলে, তা পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিশোষিত হয়। জল, ক্লোরাইড আয়ন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে পুনঃশোষিত হয়ে সংবহন তন্ত্রে ফিরে যায়। পরিস্রুত জলের বেশীর ভাগই নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকায় পুনঃশোষিত হয়। হেনলের লুপের নিচের অংশও কিছু পরিমাণ জল পুনঃশোষণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। দূরবর্তী সংবর্ত নালিকায় কিছু পরিমাণ জল অ্যান্টি-ডাইউরেটিক হরমোনের (ADH) প্রভাবে পুনঃশোষিত হয়। সুতরাং, এই হরমোনের অভাব হলে জলের পুনঃশোষণ কমে যায়, ফলে মূত্রাধিক্য তথা মূত্রত্যাগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থাকে **ডায়াবিটিস ইনসিপিডাস** (Diabetes insipidus) বলে। এছাড়া, রেনাল টিউবিউলের গাত্রপ্রাচীরের কোষসমূহ সক্রিয় **ক্ষরণ** পদ্ধতিতে হিপ্পুরিক অ্যাসিড, ফেনোল রেড, ক্রিয়েটিনিন, স্টেরয়েড, অজৈব ফসফেট যৌগ, পটাসিয়াম প্রভৃতি দেহ থেকে রেনাল টিউবিউলের মাধ্যমে নির্গত করে। অ্যামোনিয়া রেনাল টিউবিউলের কোষের মধ্যে সংশ্লেষিত হয়ে ক্ষরিত হয়।

সংগ্রাহক নালিকা (Collecting tubule)**ঃ** কতকগুলি রেনাল টিউবিউল পরস্পর যুক্ত হয়ে এক-একটি সংগ্রাহক নালিকা গঠন করে। সংগ্রাহক নালিকার প্রথমাংশ বৃক্কের কর্টেক্সে এবং শেষাংশ মেডুলাতে অবস্থান করে। সংগ্রাহক নালিকাগুলি মেডুলায় পরস্পর মিলিত হয়ে **বেলিনির নালী** (Duct of Belini) গঠন করে। প্রতিটি বেলিনির নালী পরিশেষে প্যাপিলার প্রান্তে অবস্থিত ছিদ্র পথে রেনাল সাইনাসে মুক্ত হয়। মেডুলার বহির্ভাগে অবস্থিত সংগ্রাহক নালিকার গড় ব্যাস 40 মাইক্রা, কিন্তু বেলিনির নালীর গড় ব্যাস প্রায় 200 মাইক্রা।

সংগ্রাহক নালিকার গাত্রপ্রাচীর একস্তরবিশিষ্ট ঘনকাকার কোষ দিয়ে গঠিত কিন্তু বেলিনির নালীর গাত্রপ্রাচীর একস্তরবিশিষ্ট স্তম্ভাকৃতি বা কলামনার কোষ দিয়ে গঠিত।

নেফ্রনের মধ্যে পরিস্রাবণ, পুনঃশোষণ, ক্ষরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূত্র উৎপন্ন হয়ে সংগ্রাহক নালিকার মধ্য দিয়ে বেলিনির নালী হয়ে রেনাল প্যাপিলার প্রান্তে অবস্থিত ছিদ্রপথে রেনাল সাইনাসে মুক্ত হয় এবং সেখান থেকে গবিনী পথে মূত্রস্থলীতে সাময়িক জমা পড়ে।

মূত্র সৃষ্টি (Formation of Urine)ঃ নেফ্রনের মাধ্যমে মূত্র সৃষ্টি দুটি ধাপে ঘটে ; যেমন—(i) গ্লোমেরুলাসের মধ্যে **চাপজনিত পরিস্রাবণ** (Pressure filtration) ও (ii) রেনাল টিউবিউলের মধ্যে **পরিস্রুতের পুনঃশোষণ** (Reabsorption of the filtrate)।

(i) **গ্লোমেরুলাসের মধ্যে চাপজনিত পরিস্রাবণঃ** গ্লোমেরুলাসের অন্তর্মুখী শাখাটির তুলনায় বহির্মুখী শাখাটি সরু হওয়ায় গ্লোমেরুলাসের মধ্যে রক্তের চাপ খুব বেশী হয়। এই চাপের প্রভাবে রক্তের তরল অংশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বোম্যানস্ ক্যাপসিউলের গহ্বরে চলে আসে। এই তরল অংশের মধ্যে জল এবং রক্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায় বর্তমান ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, গ্লুকোজ, অজৈব লবণ ইত্যাদি থাকে ; কেবল কোন প্রোটীন থাকে না। এই তরলকে **গ্লোমেরুলাসের পরিস্রুত তরল** (Glomerular filtrate) বলে। সাধারণ অবস্থায় গ্লোমেরুলাসে রক্তচাপ 70 মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান। রক্তের প্রোটীন যেহেতু পরিস্রুত হয় না, সেইহেতু এই প্রোটীনের অভিস্রবণ চাপ এবং পরিস্রাবিত তরলের উদস্থৈতিক চাপ (Hydrostatic pressure) গ্লোমেরুলাসের মধ্যে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়। সুতরাং গ্লোমেরুলাসের রক্তের চাপ থেকে এই অভিস্রবণ চাপ ও উদস্থৈতিক চাপের সমষ্টি বাদ দিলে গ্লোমেরুলাসের **কার্যকর পরিস্রাবণ চাপের** (Effective filtration pressure) মান পাওয়া যায়। এই কার্যকর পরিস্রাবণ চাপের জন্য প্রতি 24 ঘণ্টায় গ্লোমেরুলাসের গহ্বরে প্রায় 170—180 লিটার পরিস্রুত তরল জমা হয়।

(ii) **রেনাল টিউবিউলের মধ্যে পরিস্রুতের পুনঃশোষণ ঃ** মূত্র সৃষ্টির দ্বিতীয় ধাপে রেনাল টিউবিউলের ভিতর দিয়ে পরিস্রুত যাওয়ার সময় টিউবিউল-সংলগ্ন জালকের মধ্যে পরিস্রুত থেকে অনেক পদার্থ পুনঃশোষিত হয়। এই পুনঃশোষণ প্রক্রিয়াটি পছন্দমাফিক (Selective)। পুনঃশোষিত পদার্থগুলির মধ্যে জল, গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড, ফসফেট, বাই-কার্বনেট ইত্যাদি প্রধান ; কিন্তু ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি মোটেই শোষিত হয় না। সাধারণ অবস্থায় গ্লোমেরুলাসে প্রোটীন অণুর পরিস্রাবণ আদৌ হয় না, তবে কোন কারণে এই পরিস্রুত তরলে প্রোটীন অণুর উপস্থিতি ঘটলে, তা পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিশোষিত হয়। এই পুনঃশোষণ প্রক্রিয়াটির মাত্রা বিভিন্ন শর্তের উপর নির্ভরশীল। যেমন, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা 180 মিলিগ্রাম/100 মিলিলিটারের বেশী হলে পরিস্রুত গ্লুকোজের পুনঃশোষণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং মূত্রে গ্লুকোজের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পরিস্রুতের দুই-তৃতীয়াংশ

জলীয় উপাদানের পুনঃশোষণ নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকায় সংঘটিত হয়। বাকী এক-তৃতীয়াংশ জলীয় উপাদানের পুনঃশোষণ দূরবর্তী সংবর্ত নালিকায় হয়ে থাকে। তবে ADH-এর প্রভাব এই বিশোষণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ADH-এর অভাব বা ঘাটতি হলে রেনাল টিউবিউলের এই অংশে জলের পুনঃশোষণ হয় না এবং **ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস** নামক মূত্রাধিক্য রোগ দেখা দেয়।

উপরিউক্ত দুটি ধাপের পর যে তরল সংগ্রাহক নালীর মাধ্যমে গবিনীতে আসে তার মধ্যে অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে প্রধানত জল, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি থাকে। এই তরল পদার্থই হল **মূত্র** (Urine)। **সুতরাং মানুষসহ সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর নাইট্রোজেন-ঘটিত তরল বর্জ্য পদার্থই হল মূত্র।**

একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক মানুষের দুটি বৃক্কে প্রতি 24 ঘণ্টায় 150—170 লিটার তরলের পরিস্রাবণ ঘটে, কিন্তু ঐ সময়কালে মূত্রাশয় থেকে মাত্র 1·5 লিটার (গড়ে) মূত্র দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়। অর্থাৎ, পরিস্রুত তরলের মাত্র 1% মূত্র হিসেবে নির্গত হয়, বাকী 99% পুনঃশোষিত হয়।

● **মূত্রের ভৌত প্রকৃতি** (Physical Nature of Urine) ঃ

(i) **পরিমাণ ঃ** গড়ে 1·5 লিটার/24 ঘণ্টা।

(ii) **আপেক্ষিক গুরুত্ব ঃ** 1·002—1·035।

(iii) pH (Hydrogen ion concentration) ঃ 5·0—7·5 (গড়—pH 6·0), অম্লধর্মী।

(iv) **বর্ণ ঃ** ঈষৎ হরিদ্রাভ (বর্ণহীন পরিষ্কার কাচপাত্রে সংগ্রহ করলে এর বর্ণ ধরা পড়ে)।

(v) **গন্ধ ঃ** উগ্র গন্ধযুক্ত।

মূত্র ত্যাগ (Excretion of Urine) ঃ বৃক্ক থেকে বিরামহীন সুনির্দিষ্ট মাত্রায় মূত্র মূত্রাশয়ে জমা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মিনিটে মূত্র সঞ্চয়ের পরিমাণ 1 ml.। পূর্ণবয়স্ক মানুষের মূত্রাশয়ে প্রায় 800 ml. মূত্র সঞ্চিত হতে পারে, তবে 300 ml. সঞ্চিত হলে মূত্র ত্যাগের প্রবণতা জাগে। মূত্রাশয়ের সঙ্কোচন ও সেই সঙ্গে মূত্রনালীর মূত্রাশয়-সংলগ্ন ছিদ্রপথের স্ফিংটার পেশী শিথিল হলে মূত্র মূত্রনালীর মাধ্যমে পরিত্যক্ত হয়।

বৃক্কের কাজ (Functions of Kidney) ঃ নিচে বৃক্কের প্রধান প্রধান কাজ উল্লেখ করা হল ঃ

(i) প্রধানত নাইট্রোজেন-ঘটিত দূষিত বর্জ্য পদার্থগুলি রক্ত থেকে পরিস্রাবণের মাধ্যমে পৃথক করে মূত্ররূপে দেহ থেকে বহিষ্কৃত করা।

(ii) রক্তের তথা দেহের জলসাম্য বজায় রাখা।

(iii) রক্ত তথা প্লাজমার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

(iv) রক্তের বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

(v) প্রয়োজনে এরিথ্রোপোয়েটিন (Erythropoietin) নামক হরমোন, হিপ্পুরিক অ্যাসিড (Hippuric acid), বেনজয়িক অ্যাসিড (Benzoic acid) এবং অজৈব ফসফেট যৌগ উৎপন্ন করা।

(vi) জরুরী অবস্থায় রক্তের চাপ ও এরিথ্রোপোয়েটিন ক্ষরণ করে লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

(vii) সালফারযুক্ত পদার্থ, নানা ধরনের ঔষধ, বিভিন্ন ক্ষতিকারক অপ্রয়োজনীয় পদার্থকে দেহ থেকে নিষ্কাশিত করে দেহকে সুস্থ রাখা।

(viii) অ্যামোনিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষারাম্লের সাম্যতা (Acid-base equilibrium) রক্ষা করা।

মূত্রের স্বাভাবিক উপাদান (প্রতি 24 ঘণ্টায়) **ও অস্বাভাবিক উপাদান ঃ**

স্বাভাবিক উপাদান	পরিমাণ	অস্বাভাবিক উপাদান
A. জৈব উপাদান ঃ		
1. নাইট্রোজেন (মোট পরিমাণ)	25-30 গ্রাম	1. প্রোটীন
2. ইউরিয়া	25-30 গ্রাম	(a) অ্যালবুমিন
3. ক্রিয়েটিনিন	1·2-1·7 গ্রাম	(b) গ্লোবিউলিন
4. ক্রিয়েটিন	60-150 গ্রাম	2. শর্করা
5. অ্যামোনিয়া	0·7 গ্রাম	(a) গ্লুকোজ
6. ইউরিক অ্যাসিড	0·7 গ্রাম	(b) ফ্রাক্টোজ
7. হিপ্পুরিক অ্যাসিড	0·1-1·0 গ্রাম	(c) গ্যালাকটোজ
8. অক্সালেট	10-30 মি. গ্রাম	(d) ল্যাকটোজ
9. অ্যামাইনো অ্যাসিড	150-200 মি. গ্রাম	(e) পেনটোজ
10. অ্যালানটয়েন	যৎসামান্য	3. কিটোন বস্তু।
11. ভিটামিন, হরমোন ও উৎসেচক	যৎসামান্য	4. ইনডিক্যান।
. অজৈব উপাদান ঃ		5. রক্ত।
1. ক্লোরাইড	6-9 গ্রাম	6. রঞ্জক পদার্থ
2. সোডিয়াম ক্লোরাইড	10-15 গ্রাম	(a) ইউরোক্রোমোজেন
3. ফসফেট	0·8-1·3 গ্রাম	(b) বিলিরুবিন
4. সালফেট	0·8-1·4 গ্রাম	(c) পরফাইরিন
5. পটাসিয়াম	2·5-3·0 গ্রাম	(d) মেলানিন
6. সোডিয়াম	4-5 গ্রাম	7. পুঁজ।
7. ক্যালসিয়াম	0·1-0·3 গ্রাম	8. হরমোন।
8. ম্যাগনেসিয়াম	0·1-0·2 গ্রাম	
9. আয়োডিন	50-250 মাইক্রোগ্রাম	
10. আরসেনিক	50 মাইক্রোগ্রাম	
11. সীসা	50 মাইক্রোগ্রাম	

5.63. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্যান্য রেচন অঙ্গ
(Other excretory organs of vertebrates)

বৃক্ক ছাড়া মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির মাধ্যমেও রেচনক্রিয়া সম্পন্ন হয় ঃ

(i) **ত্বক (Skin) ঃ** মেরুদণ্ডী প্রাণীর ত্বকের ডারমিসে ধমনী, শিরা, জালক ও স্নায়ুর সঙ্গে অসংখ্য সরু সরু নলের মত স্বেদগ্রন্থি বা ঘর্মগ্রন্থি (Sweat glands) বর্তমান। এই সমস্ত গ্রন্থি ছিদ্রপথে ত্বকের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়। ঐ ছিদ্রপথে অতিরিক্ত জলের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার অজৈব লবণ ও কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন-ঘটিত বর্জ্য পদার্থ ঘর্মের আকারে বাইরে পরিত্যক্ত হয়। মানুষের ত্বকে কুড়ি লক্ষের মত স্বেদ-গ্রন্থি আছে।

চিত্র 5.81 ঃ মানুষের ত্বকের অন্তর্গঠন।
['স্বেদগ্রন্থি' স্থলে 'তৈলগ্রন্থি' পড়তে হবে।]

(ii) **যকৃৎ (Liver) ঃ** মেরুদণ্ডী প্রাণীদের যকৃৎ প্রত্যক্ষভাবে রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ না করলেও পরোক্ষভাবে রেচনে সাহায্য করে। যকৃতের মধ্যে প্রোটীনের বিপাকের ফলে ইউরিয়া তৈরি হয়, পরে এই ইউরিয়া বৃক্কের মাধ্যমে পরিস্রুত হয়ে মূত্রের সঙ্গে নির্গত হয়। যকৃৎ মৃত লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনকে বিশ্লিষ্ট করে তা থেকে **পিত্ত রঞ্জক (Bile pigment)** তৈরি করে। পরে এই রঞ্জক পিত্তরসের সঙ্গে ডুওডেনাম বা গ্রহণীর মধ্য দিয়ে অন্ত্রে প্রবেশ করে এবং মলের সঙ্গে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

(iii) **ফুলকা (Gill) ঃ** সাধারণত ফুলকাযুক্ত মেরুদণ্ডী জলজ প্রাণীরা ফুলকার মাধ্যমে রক্তের কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যাপন প্রক্রিয়ায় জলে পরিত্যাগ করে। কিছু কিছু সামুদ্রিক মাছ ফুলকার মাধ্যমে অজৈব লবণ-ও ব্যাপন প্রক্রিয়ায় জলে পরিত্যাগ করে।

(iv) **ফুসফুস** (Lung): স্থলজ মেরুদণ্ডী প্রাণীরা ফুসফুসের মাধ্যমে রক্তের কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে নির্গত করে। এই ফুসফুসের মধ্য দিয়ে সামান্য পরিমাণ বিপাকীয় জল-ও বাষ্পাকারে নির্গত হয়।

(v) **অন্ত্র** (Intestine): অন্ত্রের অন্তরাবরণীর কোষসমূহে কিছু পরিমাণ লৌহ ও ক্যালসিয়াম-ঘটিত লবণ রেচন পদার্থ হিসেবে উৎপন্ন হয়। এইসব অজৈব লবণ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অন্ত্রের গহ্বরে মুক্ত হলে মলের সঙ্গে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

5.64. উদ্ভিদ ও প্রাণীর রেচন ক্রিয়ার পার্থক্য
(Differences between excretion of plants and animals)

উদ্ভিদ	প্রাণী
1. উদ্ভিদের কোন সুনির্দিষ্ট রেচন অঙ্গ নেই।	1. প্রাণীদের সুনির্দিষ্ট রেচন অঙ্গ বর্তমান।
2. উদ্ভিদের রেচন পদার্থসমূহ ক্ষতিকারক নয়।	2. প্রাণীদের রেচন পদার্থসমূহ প্রাণিদেহের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকারক।
3. উদ্ভিদের রেচনক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল।	3. প্রাণীদের রেচনক্রিয়া উদ্ভিদের তুলনায় জটিল।
4. উৎপন্ন রেচন পদার্থ বিভিন্নরূপে উদ্ভিদের নির্দিষ্ট অঙ্গে সাময়িক বা স্থায়ী ভাবে সঞ্চিত থাকে।	4. উৎপন্ন রেচন পদার্থ প্রাণীরা দেহের কোথাও জমা করে রাখতে পারে না।
5. উদ্ভিদের রেচন পদার্থ দেহ থেকে অপসারিত না হলেও শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের বিশেষ ক্ষতি হয় না।	5. প্রাণীদের রেচন পদার্থ দেহ থেকে অপসারিত না হলে শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের প্রভূত ক্ষতি হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
6. উদ্ভিদের অনেক রেচন পদার্থ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে পুনরায় ব্যবহৃত হয়। যেমন, শ্বসনের ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড সালোকসংশ্লেষে পুনঃ-ব্যবহার হয়।	6. প্রাণীদের কোন রেচন পদার্থ পুনঃব্যবহৃত হয় না।
7. সর্বোপরি উদ্ভিদদেহে রেচনক্রিয়ার হার প্রাণীদের তুলনায় অনেক কম।	7. প্রাণিদেহে রেচনক্রিয়ার হার উদ্ভিদের তুলনায় অনেক বেশী।

G. বৃদ্ধি (Growth)

5.65. ভূমিকা (Introduction)

বৃদ্ধি জীবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিপাক ক্রিয়ায় যখন **অপচিতি** (Catabolism) থেকে **উপচিতির** (Anabolism) হার বেশী হয়, তখন জীবদেহে নতুন নতুন বস্তুসমূহের সংযোজন হয় এবং এর ফলে জীবদেহের আকার, আয়তন ও শুষ্ক ওজনের পরিমাণ বাড়ে অর্থাৎ জীবের বৃদ্ধি হয়। এককোষী জীবের

ক্ষেত্রে বিপাকীয় কাজের ফলে নতুন প্রোটোপ্লাজমের সৃষ্টি হয় এবং কোষ আয়তনে বাড়ে। এদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি কোষের আয়তন বাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বহুকোষী জীবের ক্ষেত্রে কোষের আয়তন বড় হওয়া ছাড়াও কোষ বিভাজনের মাধ্যমে নতুন নতুন কোষ সৃষ্টি হয়ে জীবদেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে। ক্রমে এই নতুন কোষগুলি **বিভেদন** (differentiation) প্রক্রিয়ায় নতুন কলা সৃষ্টি করে।

5.66. সংজ্ঞা (Definition)

যে প্রক্রিয়ায় জীবদেহের আকার, আয়তন ও শুষ্ক ওজনের স্থায়ী ঊর্ধ্বমুখী পরিবর্তন হয়, তাকে বৃদ্ধি (Growth) বলে।

জড় পদার্থেরও বৃদ্ধি হয়, কিন্তু জড় পদার্থের বৃদ্ধি জীবদেহের বৃদ্ধির মত নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, একখন্ড কপার সালফেটের কেলাস কপার সালফেটের সম্পৃক্ত দ্রবণে (Saturated solution) রাখলে ধীরে ধীরে কেলাসটির আয়তন বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে কেলাসটির পরিধি তলে (outer surface) কপার বা তামার অণুর সংযোজনের ফলেই কেলাসটি আয়তনে বাড়ে। এটি একটি বিশুদ্ধ ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া। কিন্তু জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে দেহের অভ্যন্তরে, পরিধি তলে নয়। তাছাড়া, জীবদেহের বৃদ্ধি বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের জৈব ও অজৈব পদার্থের অণুর সংযোজনের ফলেই হয়ে থাকে। তাছাড়াও জীবদেহের বৃদ্ধি কোষ ও কলার বিভেদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ায় বৃদ্ধির ফলে জীবদেহের আকার, আয়তন ও শুষ্ক ওজন স্থায়ীভাবে বাড়ে।

প্রাণিদেহের বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই সময়সীমা বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন। কিন্তু সাধারণত উদ্ভিদের বৃদ্ধি তার জীবনকালের সব সময়েই কমবেশী হয়ে থাকে। পরিণত হওয়ার পর প্রাণিদেহের অপচিতি (Catabolism) ও উপচিতির (Anabolism) হার প্রায় সমান হয়। এর ফলে তাদের দেহের শুষ্ক ওজনের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে উপচিতির হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে এবং অপচিতির হার স্বাভাবিক থাকে অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে অপচিতির হার বেড়ে যায়। যদি দেহের ক্ষয় পূরণ যথাযথভাবে না হয় এবং এই অবস্থা বেশীদিন ধরে চলে, তাহলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

সাধারণত অনুকূল পরিবেশে ও শর্ত সাপেক্ষে প্রত্যেক জীব অথবা তার কোন অঙ্গের বৃদ্ধিকে মোট তিনটি দশায় ভাগ করা যায়। প্রথম অবস্থায় বৃদ্ধির হার অত্যন্ত কম থাকে, একে **ল্যাগ দশা** (Lag phase) বা **বিলম্বিত দশা** বলে। এর পর বৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত হয়, একে **লগ দশা** (Log phase) বলে। লগ দশার পর বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমতে থাকে এবং সবশেষে বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। শেষের এই দশাকে **স্থায়ী দশা** বা **স্থিতিশীল দশা** (Stationary phase) বলে। জীবের বৃদ্ধির এই দশাগুলিকে সময় ও বৃদ্ধির হারের পরিপ্রেক্ষিতে ছক কাগজে (graph paper) প্রতিস্থাপন করলে যে লেখচিত্র (graph) পাওয়া যায়, সেটি অনেকটা ইংরেজী অক্ষর 'S' আকৃতির মত হয়। বৃদ্ধির এই লেখচিত্রটিকে **সিগময়েড কার্ভ** (Sigmoid curve) বলে (চিত্র 5.82)।

বৃদ্ধির সিগময়েড কার্ভটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, যে সমস্ত জীবের ল্যাগ দশার স্থায়িত্ব বেশী তাদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিতে বাধাদানকারী পদার্থের উপস্থিতি বা আধিক্যের জন্যই বৃদ্ধি শুরু হতে সময় বেশী লাগে। ঐ সমস্ত বাধাদানকারী পদার্থ বিনষ্ট বা দেহ থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বৃদ্ধি শুরু হওয়া সম্ভব নয়। লগ দশায় বৃদ্ধির হার বিভিন্ন হরমোন বা উদ্বোধক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জীবের বৃদ্ধি যদিও তার জীনগত সংযুতির (genetic constituent) উপর নির্ভরশীল, তথাপি পারিপার্শ্বিক প্রভাবও বৃদ্ধিকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে।

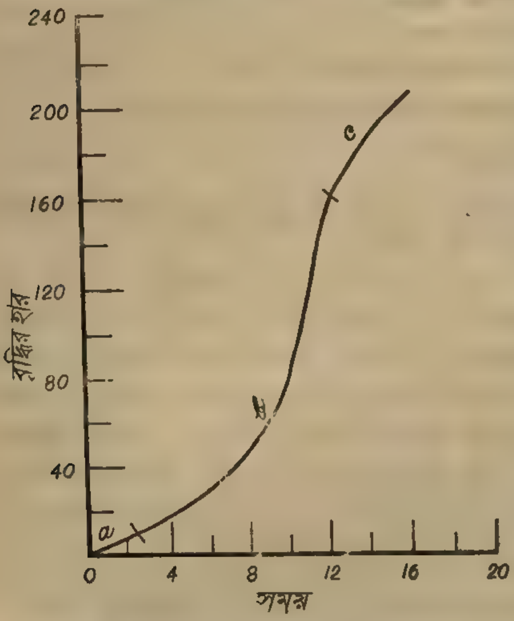

চিত্র 5.82 : বৃদ্ধির সিগময়েড কার্ভ। a=ল্যাগ দশা, b=লগ দশা, c=স্থায়ী দশা বা স্থিতিশীল দশা।

5.67. উদ্ভিদের বৃদ্ধি (Growth in plants)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি আজীবন ঘটে। এই বৃদ্ধি সাধারণত উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে সীমাবদ্ধ। এ ধরনের বৃদ্ধিকে **অগ্রস্থ বৃদ্ধি** (Apical growth) বলে। **অগ্রস্থ ভাজক কলা** (Apical meristematic tissue) বার বার বিভাজিত হয়ে নতুন নতুন কোষ সৃষ্টি করে। এই নতুন কোষগুলির প্রতিটির নিজস্ব বৃদ্ধিও ঘটে। প্রথম অবস্থায় এই কোষগুলির কোষপ্রাচীর পাতলা থাকে এবং কোষগুলি গহ্বরবিহীন ঘন সাইটোপ্লাজম দ্বারা পূর্ণ থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে কোষগুলি যখন আকারে বড় হতে থাকে তখন কোষপ্রাচীরের উপর নতুন নতুন পদার্থ জমা হয়ে কোষপ্রাচীর পুরু হয় এবং কোষগুলি যে হারে বৃদ্ধি পায়, কোষের প্রোটোপ্লাজম সেই হারে বৃদ্ধি পায় না। ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোষে গহ্বরের আবির্ভাব ঘটে।

অগ্রস্থ ভাজক কলা ও **নিবেশিত ভাজক কলার** (Intercalary meristematic tissue) জন্য উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ড দৈর্ঘ্যে বাড়ে, কিন্তু উদ্ভিদদেহ পরিধি বরাবর বৃদ্ধি পায় মূল ও কাণ্ডের **পার্শ্বস্থ ভাজক কলার** (Lateral meristematic tissue) বিভাজনের দরুন। প্রতিটি কোষের বৃদ্ধির সময় নির্দিষ্ট, কিন্তু বৃদ্ধির

হার বা গতি সমান নয়। বৃদ্ধির হার শুরুতে খুব কম থাকে (অর্থাৎ ল্যাগ দশা), ক্রমে বৃদ্ধির হার বাড়তে থাকে এবং এক সময় এটি সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায় (অর্থাৎ লগ দশা), এর পর বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমতে থাকে অর্থাৎ স্থিতিশীল দশা বা স্টেশনারী দশায় পৌঁছায়। **বৃদ্ধির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন বৃদ্ধি হয় সেই সময়কালকে মুখ্য বৃদ্ধি কাল** (Grand period of growth) **বলে**।

উদ্ভিদের বৃদ্ধির বিশেষত্ব এই যে, তাদের অঙ্গহানিতে যে ক্ষতি হয় তা উদ্ভিদ নিজ চেষ্টা দ্বারাই পূরণ করতে পারে। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ, যেমন—শৈবাল, মস ইত্যাদির দেহ টুকরো টুকরো হয়ে গেলে অনুকূল পরিবেশ ও শর্তসাপেক্ষে প্রতিটি টুকরো বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের অঙ্গহানি পূরণের জন্য তাদের দেহের অন্যত্র একই রকমের অঙ্গের সৃষ্টি হয়। মেহেদি, রঙ্গন প্রভৃতি গাছের কাণ্ডের অগ্রভাগ ছেঁটে দিলে নিচের অংশের কাক্ষিক মুকুল বিকশিত হয়ে হৃত অঙ্গের ক্ষতি পূরণ করে।

উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়ঃ

(i) নিষেকের পর ভ্রূণের বৃদ্ধি, (ii) অনুকূল পরিবেশে বীজের অঙ্কুরোদ্গম এবং (iii) শিশু উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি। নিষেকের পর জাইগোট বা ভ্রূণাণু সৃষ্টি হয়, যা ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে **ভ্রূণ** (Embryo) গঠন করে। বীজের ভিতরে ভ্রূণ (Embryo), **বীজপত্র** (Cotyledons) অথবা **সস্য** (Endosperm) থেকে সঞ্চিত খাদ্য আহরণ করে পুষ্টিলাভ করে।

ভ্রূণ পরিণত হওয়ার সময় বীজের ভিতরে নানা পরিবর্তন ঘটে। এই সময় বীজের ভিতরে হরমোন জিব্বারেল্লিনের পরিমাণ খুব বাড়ে এবং ক্রমে যথাসময়ে বীজের সুপ্ত দশা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল পরিবেশে বীজের ভিতর থেকে ভ্রূণ বেরিয়ে আসে। এই ঘটনাকে **অঙ্কুরোদ্গম** (Germination) বলে। এই সময় **ভ্রূণমূল** (Radicle) এবং **ভ্রূণমুকুল** (Plumule) বীজের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। ভ্রূণমূল মাটির মধ্যে ঢুকে মূলে পরিণত হয় এবং ভ্রূণমুকুল অভিকর্ষের বিপরীত দিকে এবং আলোর উৎসের অনুকূলে মাটির উপর ঊর্ধ্বমুখে বেড়ে বিটপে পরিণত হয়। এর পর মূল দিয়ে শোষিত জল ও অজৈব লবণ এবং সবুজ অঙ্গে তৈরি খাদ্যে পুষ্ট হয়ে চারাগাছ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদ্ভিদের এই পর্যায়ের বৃদ্ধিকে **প্রাথমিক বৃদ্ধি** (Primary growth) বলে।

5.68. বৃদ্ধির দশা (Phases of growth)

উদ্ভিদের প্রাথমিক বৃদ্ধি নিম্নলিখিত তিনটি দশার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হয়ঃ

(i) **কোষ বিভাজন দশা** বা **গঠন দশা** (Phase of cell division or Phase of formation)ঃ এই দশায় উদ্ভিদের ভাজক কলার কোষগুলি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে নতুন নতুন কোষের সৃষ্টি করে।

(ii) **দীর্ঘীভবন দশা** (Phase of elongation)ঃ এই দশায় নতুন কোষগুলিতে ভ্যাকুওল ও কোষরসের আবির্ভাব ঘটে। কোষগুলি অভিস্রবণ

প্রক্রিয়ায় জল গ্রহণ করে রসস্ফীত হয়ে ওঠে, ফলে কোষগুলি প্রসারিত হতে থাকে।

(iii) **পরিণতি দশা** (Phase of maturation) : এই দশায় কোষগুলি সর্বাধিক প্রসারিত অবস্থায় থাকে এবং কোষগুলি তাদের নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। কিছু কিছু কোষে কোষপ্রাচীরের স্থূলীকরণ হয়। এইসব কোষের পরিণত অবস্থায় আর কোন রকম পরিবর্তন হয় না।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে প্রাথমিক বৃদ্ধির পর কিছু কিছু পরিণত কলা, যেমন **ক্যাম্বিয়াম কলা** (Cambium tissue) পুনর্বিভাজন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে বিভাজিত হয়। ফলে উদ্ভিদ পরিধি বা প্রস্থ বরাবর বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের বৃদ্ধিকে **গৌণ বৃদ্ধি** (Secondary growth) বলে। একবীজপত্রী উদ্ভিদে সাধারণত গৌণ বৃদ্ধি হয় না।

প্রাথমিক ও গৌণ বৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদের **অঙ্গজ বৃদ্ধি** (Vegetative growth) ঘটে। অঙ্গজ বৃদ্ধির পরিপূর্ণতার পর উদ্ভিদদেহে **জননগত বৃদ্ধি** (Reproductive growth) শুরু হয়। প্রাথমিক বৃদ্ধির শেষে উদ্ভিদে পুষ্পমুকুল সৃষ্টির সূচনা হয়। এই পুষ্পমুকুল ক্রমে ফুল ও ফলে পরিণতি লাভ করে।

- **উদ্ভিদদেহে জনন অঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গের বৃদ্ধিকে অঙ্গজ বৃদ্ধি (Vegetative growth) বলে।**
- **উদ্ভিদদেহে পুষ্পমুকুল সৃষ্টি এবং সেই মুকুলের ক্রমে ফুল ও ফলে পরিণত হওয়ার সময় যে বৃদ্ধি হয়, তাকে জননগত বৃদ্ধি (Reproductive growth) বলে।**

উদ্ভিদের জীবদ্দশায় কোন অঙ্গের ক্ষতি হলে বা অঙ্গহানি হলে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে তা পুনর্গঠিত হয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, শুধু মূল সজীব থাকলে অনুকূল পরিবেশে উদ্ভিদের ঊর্ধ্বাংশ পুনর্গঠিত হয়। এধরনের বৃদ্ধিকে **ক্ষয়পূরণজাত বৃদ্ধি** (Regenerative growth) বলে।

5.69. উদ্ভিদের বৃদ্ধির পরিমাপ (Measurement of plant growth)

উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের বৃদ্ধি সহজেই পরিমাপ করা যায়।

1. **স্কেলের সাহায্যে** (By Scale) : যে কোন অঙ্কুরিত বীজ থেকে উৎপন্ন মূল ও কান্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি সাধারণ স্কেলের সাহায্যে সহজেই পরিমাপ করা যায়।

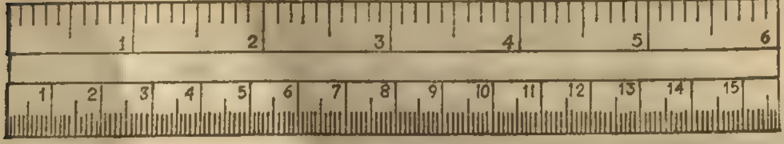

চিত্র 5.83 : সাধারণ স্কেল।

2. হরাইজণ্ট্যাল মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে (By Horizontal Microscope) ঃ অংশাঙ্কিত খাড়া-দণ্ডের উপর উঠানামায় সক্ষম হরাইজণ্ট্যাল মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে উদ্ভিদের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাপ করা হয় (চিত্র 5.84)।

চিত্র 5.84 ঃ হরাইজণ্ট্যাল মাইক্রোস্কোপ।

3. আর্ক ইণ্ডিকেটরের সাহায্যে (By Arc indicator) ঃ আর্ক ইণ্ডিকেটর নামে এক যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাপ করা যায়।

যন্ত্রের বর্ণনা (Description of the apparatus) ঃ একটি বৃত্তের এক-চতুর্থাংশের মত দেখতে একটি চাকতি এই যন্ত্রের প্রধান অংশ বা আর্কটি গঠন করে। এই আর্কটি অংশাঙ্কিত এবং এর কেন্দ্রে একটি কপিকল (Pulley) লাগানো থাকে। একটি নির্দেশক কাঁটা (Indicator) ঐ কপিকল থেকে আর্কটির পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কপিকলটি ঘুরতে থাকলে নির্দেশক কাঁটাটি আর্কটির অংশাঙ্কন বরাবর অবাধে ঘুরতে থাকে, অনেকটা ঘড়ির কাঁটার মত (চিত্র 5.85)।

চিত্র 5.85 ঃ আর্ক ইণ্ডিকেটর।

উপকরণ (Requirements) ঃ আর্ক ইণ্ডিকেটর, টবসহ সতেজ চারাগাছ, একটি উপযুক্ত ওজনের বাটখারা, টোন সুতা।

পরীক্ষা পদ্ধতি (Experimental procedure) ঃ একটি টোন সুতা আর্ক ইণ্ডিকেটরের কপিকলের মধ্য দিয়ে দু পাশে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সুতার একপ্রান্ত টবের চারাগাছের ডগায় সাবধানে বেঁধে অন্য প্রান্তটি উপযুক্ত ওজনের বাটখারার সঙ্গে এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে সুতাটি টান-টান থাকে এবং চারাগাছটির ডগা ছিঁড়ে না যায়। আর্কটির গায়ে নির্দেশকের অবস্থান লক্ষ্য করে, এই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা রেখে দেওয়া হল।

পর্যবেক্ষণ (Observation) ঃ কয়েক ঘণ্টা পর দেখা গেল, নির্দেশকটি পূর্বের অবস্থান পরিবর্তন করে কিছুটা নিচে নেমে গেছে।

সিদ্ধান্ত (Inference) ঃ চারাগাছটির ডগার বৃদ্ধির ফলে সুতাটি বাটখারার দিকে কপিকল বরাবর ধীরে ধীরে নামতে থাকে এবং নির্দেশকটি আর্কটির গা বরাবর নামতে থাকে। নির্দেশকের প্রাথমিক এবং অন্তিম অবস্থানের পার্থক্য থেকে এই চারাগাছটির কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব।

4. অক্সানোমিটারের সাহায্যে (By Auxanometer) ঃ অক্সানোমিটার নামক যন্ত্রটি আর্ক ইণ্ডিকেটরের উন্নত ও পরিবর্তিত রূপ। এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে উদ্ভিদের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি সহজেই পরিমাপ করা যায়।

অক্সানোমিটার যন্ত্রটি দুটি ভিন্ন আকৃতির চাকা ও একটি ড্রাম নিয়ে গঠিত। ছোট চাকাটির মধ্য দিয়ে একটি টোন সুতার একপ্রান্তে উপযুক্ত একটি ছোট বাটখারা বাঁধা থাকে। সুতার অপর প্রান্তটি উদ্ভিদের ডগার সঙ্গে সাবধানে বাঁধা থাকে। ছোট চাকাটি বড় চাকাটির কেন্দ্রে যুক্ত থাকে। বড় চাকাটির মধ্য দিয়ে একটি সুতা দু প্রান্তে দুটি সমান ওজনের বাটখারা দিয়ে ঝোলান থাকে। ড্রামটির গায়ে ভুসাকালি মাখানো একটি কাগজ জড়ানো থাকে। বড় চাকার একপ্রান্তের সুতার সঙ্গে একটি নির্দেশক কাঁটা (Indicator) অনুভূমিক-ভাবে ড্রামের কালো কাগজের গায়ে লেগে থাকে। ড্রামটি বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে উল্লম্ব অক্ষের (Vertical axis) চার-দিকে ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে (চিত্র 5.86)।

চিত্র 5.86 ঃ অক্সানোমিটার।

উদ্ভিদের কাণ্ডের অগ্রভাগের বৃদ্ধির ফলে ছোট চাকাটি ঘুরতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বড় চাকাটিও ঘুরতে থাকে। এর ফলে নির্দেশক কাঁটাটির অগ্রভাগে অবস্থিত ভুসাকালি মাখানো কাগজে দাগ পড়ে। ড্রামটি ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে বলে ড্রামটির সঙ্গে লাগানো কালো কাগজে দাগটি ঘোরানো সিঁড়ির মত দেখায়। বৃদ্ধির কত গুণ হারে কালো কাগজে দাগ পড়ে তা জানা থাকলে, অক্সানোমিটারের সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে উদ্ভিদের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায়।

5. স্পেস মার্কারের সাহায্যে (By space marker) ঃ স্পেস মার্কার যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের মূলের বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

যন্ত্রের বর্ণনা (Description of the apparatus) ঃ স্পেস মার্কার যন্ত্রটি অনেকটা কাঁচির মত। এর হাতল দুটির বিপরীত প্রান্তে দুটি চাকতি বা ডিস্ক থাকে। ঐ চাকতি দুটির মধ্যে ছোট ছোট বর্গাকার উঁচু দাগ কাটা থাকে, অনেকটা গ্রাফ কাগজের মত। চাকতির উপর কালো চাইনিজ কালি মাখিয়ে, হাতলে সামান্য চাপ দিয়ে মূলের মধ্যে দাগ কাটা যায়।

উপকরণ (Requirements) ঃ বড় মুখযুক্ত একটি বোতল, ছিদ্রযুক্ত একটি রবারের ছিপি, অঙ্কুরিত ছোলা বা বীন-বীজ, দুমুখ খোলা সরু কাচের নল, জল, আলপিন, চাইনিজ কালি এবং স্পেস মার্কার যন্ত্র।

পরীক্ষা পদ্ধতি (Experimental procedure) ঃ অঙ্কুরিত বীজটির মূলের অগ্রভাগের সামান্য পিছনে চাইনিজ কালি দিয়ে স্পেস মার্কারের সাহায্যে দাগ দেওয়া হল। এর পর বীজটিকে একটি আলপিনের সাহায্যে ছিপির নিচের দিকে আটকে দেওয়া হল। বোতলের মধ্যে সামান্য জল নিয়ে এবং ছিপির ছিদ্রের মধ্যে ছোট

দুমুখ খোলা কাচের নলটি ঢুকিয়ে বীজসহ ছিপিটির সাহায্যে বোতলটি ভালভাবে বন্ধ করা হল। ফলে বীজটি বোতলের মধ্যে ছিপির ঠিক নিচে ঝুলতে থাকে। দুমুখ খোলা কাচের নলটির মাধ্যমে বোতলের মধ্যে বায়ু চলাচল অব্যাহত থাকে। এ অবস্থায় কয়েকদিন ব্যবস্থাপনাটি রেখে দেওয়া হল।

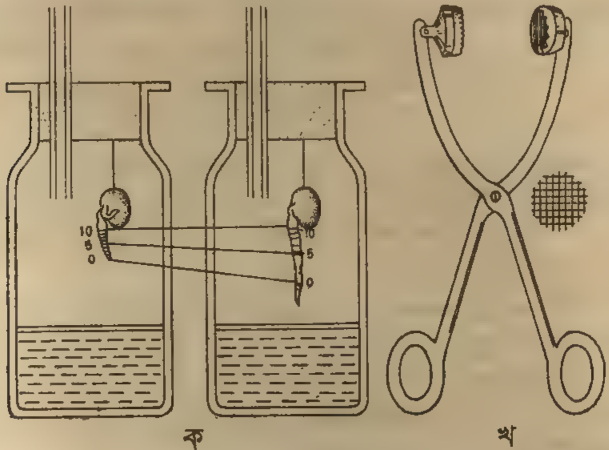

চিত্র 5.87 : (ক) স্পেস মার্কার দ্বারা চিহ্নিত মূলের দাগগুলি পরস্পর থেকে দূরে সরে গেছে। (খ) স্পেস মার্কারের চিত্র।

পর্যবেক্ষণ (Observations) : কয়েকদিন পর দেখা যাবে, মূলের দাগগুলি পরস্পর থেকে দূরে সরে গেছে এবং এই দাগগুলির দূরত্ব সমান নয়। অগ্রভাগের দাগগুলির দূরত্ব অন্যান্য দাগ থেকে অনেক বেশী এবং পিছনের দাগগুলির দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম এবং সবচেয়ে পিছনের দাগগুলি মোটামুটি সমান দূরত্বে রয়েছে।

সিদ্ধান্ত (Inference) : মূলের মূলত্রের ঠিক পিছনেই বর্ধনশীল অঞ্চল বর্তমান। সেজন্য ঐ অঞ্চলের বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায়, ঐ অঞ্চলের দাগগুলির দূরত্ব সবচেয়ে বেশী হয়েছে। কিন্তু পিছনের স্থায়ী অঞ্চলে কোষ বিভাজনের হার খুব কম বলে, ঐ অঞ্চলের দাগগুলির দূরত্ব মোটামুটি সমান রয়েছে।

5.70. বৃদ্ধির শর্ত (Factors controlling growth)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। এই শর্তগুলির কোন একটির পরিবর্তনে উদ্ভিদের বৃদ্ধির তারতম্য ঘটে। শর্তগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—অভ্যন্তরীণ শর্তাবলী (Internal factors) এবং বাহ্য শর্তাবলী (External factors)।

● **অভ্যন্তরীণ শর্তাবলী** (Internal Factors) :

(i) **পুষ্টি** (Nutrition) : বৃদ্ধির একটি প্রধান অভ্যন্তরীণ শর্ত হচ্ছে পুষ্টি। উপযুক্ত পুষ্টি ঘটলে যাবতীয় বিপাকীয় কাজ স্বাভাবিকভাবে হয় এবং বিভিন্ন ধরনের উপচিতি প্রক্রিয়া (anabolic activity) দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়। ফলে কোষীয় বস্তু প্রোটোপ্লাজম তৈরি হয় এবং বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়

হরমোন বা উদ্বোধক সৃষ্টিও স্বাভাবিক হয়। পুষ্টির অভাব বা ঘাটতি হলে প্রোটোপ্লাজম তৈরি হয় না তথা নতুন কোষ বা কলা গঠনও বিঘ্নিত হয় অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

(ii) **জল** (Water) : জল প্রোটোপ্লাজমের একটি প্রধান উপাদান। বৃদ্ধির সময় জলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, কারণ জলের উপস্থিতির ফলে কোষের রসস্ফীতি হয়, যা বৃদ্ধির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। তাছাড়া, বর্ধনশীল অঞ্চলে জল ছাড়া খাদ্য পরিবহণ সম্ভব নয়। সর্বোপরি সমস্ত বিপাকীয় কাজের জন্য জলের প্রয়োজন হয়।

(iii) **উৎসেচক** (Enzyme) : উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে উৎসেচকের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই, তবে বৃদ্ধির সময় এটি ভাজক কলার কোষের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং বৃদ্ধির সময় নানা ধরনের বিপাকীয় ক্রিয়ার জন্য উৎসেচকের উপস্থিতি এবং কার্যকারিতা একান্ত প্রয়োজন।

(iv) **উদ্বোধক** (Hormone) : উদ্বোধক একপ্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যা বিভিন্ন ধরনের শারীরবৃত্তীয় কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন কোষপুঞ্জ থেকে উৎপন্ন প্রধান উদ্বোধকগুলি হল—**অক্সিন** (Auxin), **জিব্বারেল্লিন** (Gibberellins) এবং **সাইটোকাইনিন** (Cytokinin)। এই উদ্বোধকগুলি প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

● **বাহ্য শর্তাবলী** (**External Factors**) :

(i) **আলোক** (Light) : উদ্ভিদের বৃদ্ধি আলোক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রধানত সূর্যালোক উদ্ভিদদেহে খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে। আলোকের নানা তীব্রতায় বিভিন্ন উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আলোকের প্রয়োজনীয়তাও সব উদ্ভিদে সমান নয়।

আলোকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে উদ্ভিদকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—(a) **আলোক বিলাসী** (Photophilic) উদ্ভিদ, (b) **আলোক বিমুখী** (Photophobic) উদ্ভিদ এবং (c) **আলোক নিরপেক্ষ** (Photoneutral) উদ্ভিদ।

(a) **আলোক বিলাসী উদ্ভিদ** : এ ধরনের উদ্ভিদগুলি প্রত্যক্ষ সূর্যালোক ছাড়া বৃদ্ধি পায় না, যেমন—সূর্যমুখী।

(b) **আলোক বিমুখী উদ্ভিদ** : এই শ্রেণীর উদ্ভিদগুলি প্রত্যক্ষ সূর্যালোক ব্যতীতই ভালভাবে বৃদ্ধি পায়, যেমন—মস, ফার্ণ প্রভৃতি।

(c) **আলোক নিরপেক্ষ** : এদের বৃদ্ধি আলোকের তীব্রতার উপর নির্ভরশীল নয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সূর্যালোক বা ছায়াঘন স্থানে সমানভাবে বৃদ্ধি পায়। যেমন—গোলাপ।

এছাড়া আলোক তিনভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন—(a) **আলোকের তীব্রতা** (Intensity of light), (b) **আলোকের প্রকারভেদ** (Quality of light) অর্থাৎ বৃদ্ধির উপর বিভিন্ন বর্ণের আলোর প্রভাব বিভিন্ন এবং (c) **আলোর স্থায়িত্ব** (Duration of light)।

(ii) **তাপমাত্রা (Temperature)** ঃ অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কাজের মত স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যও পরিমিত তাপমাত্রা প্রয়োজন। সাধারণত 0° সেলসিয়াস থেকে 45° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কমবেশী বৃদ্ধি হয়ে থাকে, তবে 25° সেলসিয়াস থেকে 35° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।

(iii) **কার্বন ডাই-অক্সাইড** (Carbon di-oxide) ঃ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরির জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড একান্ত প্রয়োজন, অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষ তথা কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধিকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরির হার কম হলে বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ কম হবে, অর্থাৎ বৃদ্ধির হারও কমে যাবে।

(iv) **অক্সিজেন (Oxygen)** ঃ অক্সিজেন বৃদ্ধির একটি প্রয়োজনীয় বাহ্য শর্ত। অক্সিজেন খাদ্যকে জারিত করে খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তিকে মুক্ত করে এবং বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়।

(v) **ক্ষত** (Wound) ঃ উদ্ভিদের কোন অংশে ক্ষত সৃষ্টি হলে ঐ অংশে দ্রুত বৃদ্ধি হয়। তবে এই বৃদ্ধি মূলত আঞ্চলিক।

(vi) **মৃত্তিকা (Soil)** ঃ মৃত্তিকার প্রকৃতির উপর উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ভরশীল। কারণ উদ্ভিদ তার শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জল এবং মৌলিক উপাদানগুলির বেশীর ভাগই মৃত্তিকা থেকে সংগ্রহ করে।

5.71. প্রাণীর বৃদ্ধি (Growth in animals)

উদ্ভিদের মত প্রাণীদের বৃদ্ধিতেও কোষ বিভাজন, কোষের আয়তন বৃদ্ধি ও পরিণতি লাভ—এই তিনটি পর্যায় দেখা যায়। প্রাণীদের বৃদ্ধির এই পর্যায়গুলিকে একত্রে **পরিস্ফুরণ** (Development) বলা হয়।

ভ্রূণের পরিস্ফুরণ (Development of embryo) ঃ এককোষী উদ্ভিদের মত এককোষী প্রাণীদের বৃদ্ধিও বিপাকীয় কাজের ফলে নতুন প্রোটোপ্লাজম সৃষ্টির মাধ্যমে কেবলমাত্র কোষের আয়তন বৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বহুকোষী প্রাণীতে নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোট (zygote) বার বার বিভাজিত হয়ে একটি ফাঁপা একস্তরবিশিষ্ট **গোলক** বা **ব্লাস্টুলায়** (Blastula) এবং পরে ঐ ব্লাস্টুলা দ্বিস্তরবিশিষ্ট **গ্যাস্ট্রুলায়** (Gastrula) পরিণত হয়। ছিদ্রাল প্রাণী ও একনালীদেহী প্রাণী এই গ্যাস্ট্রুলা থেকে ক্রমে পরিস্ফুরণ পদ্ধতিতে পূর্ণতা লাভ করে। অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর বহুকোষী প্রাণীতে এই দ্বিস্তরবিশিষ্ট গ্যাস্ট্রুলা তিন স্তরবিশিষ্ট (এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম) হয় এবং ক্রমে পরিস্ফুরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কলা, অঙ্গ ও তন্ত্র গঠন করে। হাইড্রা, তারামাছ, মাছ ইত্যাদি জলজ প্রাণীর ভ্রূণের পরিস্ফুরণ ঘটে জলে। ব্যাঙ, স্যালামান্ডার প্রভৃতি উভচর প্রাণীদের ভ্রূণও জলেই বৃদ্ধি পায়। সরীসৃপ, পাখী ইত্যাদির ভ্রূণ খোলকযুক্ত ডিমের ভিতরে বৃদ্ধি পায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণ মায়ের জরায়ুর (uterus) ভিতর বৃদ্ধি পায়।

ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুরণ (Post-embryonic development) ঃ ভ্রূণের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হলে সরীসৃপ, পাখী ইত্যাদির ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জরায়ু থেকে সন্তান প্রসব হয়। সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ীদের বাচ্চা

আকারে ছোট হলেও তারা দেখতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মত হয় এবং ভ্রূণ থেকে সরাসরি বাচ্চার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পরিস্ফুরণকে **প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ** (**Direct development**) বলে। প্রায় বেশীর ভাগ অমেরুদণ্ডী জলজ প্রাণীতে (কাঁকড়া, ঝিনুক, তারামাছ), অনেক মেরুদণ্ডী জলজ প্রাণীতে (ব্যাঙ, স্যালামাণ্ডার) এবং মশা, মাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি পতঙ্গে ভ্রূণ থেকে যে বাচ্চার সৃষ্টি হয়, তা আকৃতিতে

চিত্র 5.88 ঃ ব্যাঙে পরোক্ষ পরিস্ফুরণ। (ক) নিষিক্ত ডিম্বাণু, (খ) ব্যাঙাচি, (গ) পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ।

পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মত নয়, কিন্তু স্বাবলম্বী হয়। এই ধরনের স্বাবলম্বী অথচ পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সঙ্গে আকৃতিগত অমিলবিশিষ্ট বাচ্চাদের **লার্ভা** (Larva) বলে। ব্যাঙের লার্ভা **ব্যাঙাচি** (Tadpole) এবং প্রজাপতির লার্ভা **শুঁয়াপোকা** (Caterpillar) নামে পরিচিত। নানা ধরনের আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে লার্ভা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হওয়ার জন্য লার্ভার যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে লার্ভার **রূপান্তর** (Metamorphosis) বলে। রূপান্তরের মাধ্যমে যে পরিস্ফুরণ হয়, তাকে **পরোক্ষ পরিস্ফুরণ** (Indirect development) বলে (চিত্র 5.88)।

কিছু কিছু নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর, যথা—স্পঞ্জ, হাইড্রা, প্ল্যানেরিয়া প্রভৃতির দেহের কোন অংশ বিনষ্ট হলে বা দেহ খণ্ড-খণ্ড হলে দ্রুত কোষ বিভাজনের মাধ্যমে সেই বিনষ্ট অংশ পুনরায় সৃষ্টি হয় বা খণ্ডিত অংশগুলি থেকে অপত্য প্রাণীর সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াকে **পুনরুৎপাদন** (Regeneration) বলে।

সুতরাং, **দেহের কোন অংশের ক্ষয়ক্ষতি হলে দ্রুত কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধির মাধ্যমে সেই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার প্রক্রিয়াকে পুনরুৎপাদন (Regeneration) বলে।** কেঁচোর ক্লাইটেলাম অংশের সম্মুখভাগ দুভাগে বিভক্ত হলে দুটি অপত্য কেঁচোর সৃষ্টি হয়। টিকটিকির লেজ খসে গেলে পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে তা পুনরায় সৃষ্টি হয়। পাখী ও স্তন্যপায়ীর কোন কোন কলা-কোষের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা আছে।

মানুষের বৃদ্ধি (**Growth in human beings**) ঃ মানুষের ভ্রূণাবস্থায় বৃদ্ধি মায়ের জরায়ুর মধ্যে হয়ে থাকে। জন্মের পর শিশুর বৃদ্ধির হার অত্যন্ত

দ্রুত হয়। মানবদেহে এই বৃদ্ধি গড়ে 22 বছর পর্যন্ত হয়। জন্মের পর প্রথম 3 বছর শিশু উচ্চতায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তারপর সাময়িক ভাবে উচ্চতা বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় ; তখন দেহ প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে দেহের আবার

চিত্র 5.89 : বিভিন্ন বয়সে মানুষের বৃদ্ধির তুলনামূলক হার।

দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। বয়ঃসন্ধিকাল পার হয়ে গেলে বৃদ্ধির হার কমে যায় এবং 25 বছর বয়সের পর উচ্চতা বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু দেহের প্রস্থে বৃদ্ধি ঘটতে পারে। পরিণতি প্রাপ্তির পর সাধারণ বৃদ্ধি বন্ধ হলেও ক্ষয়পূরণ-জনিত বৃদ্ধি আজীবন ঘটতে পারে (চিত্র 5.89)।

5.72. প্রাণীর বৃদ্ধির শর্ত (Factors controlling growth in animals)

উদ্ভিদের মত প্রাণীর বৃদ্ধিও কয়েকটি অভ্যন্তরীণ (Internal) ও বাহ্য (External) শর্তের উপর নির্ভরশীল। এই শর্তগুলির মধ্যে **পুষ্টি, জল, উৎসেচক, উদ্বোধক বা হরমোন, খনিজ পদার্থ, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন, অক্সিজেন, তাপমাত্রা** এবং পরোক্ষভাবে **আলো** প্রধান।

● **অভ্যন্তরীণ শর্তাবলী (Internal Factors) :**

(i) **খাদ্য (Food) :** খাদ্য আত্তীকরণের পর প্রোটোপ্লাজমের বৃদ্ধি ঘটে এবং প্রোটোপ্লাজমের বৃদ্ধির ফলে কোষের সামগ্রিক বৃদ্ধি হয়। প্রাণীরা ভ্রূণ অবস্থায় জাইগোটের কুসুম থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণ অমরার (Placenta) সাহায্যে মাতৃদেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তী কালে প্রাণীরা বাইরের পরিবেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। প্রাণীদের সুষম বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটীন, স্নেহ ও তৈল জাতীয় পদার্থ, ভিটামিন (প্রধানত A, D ও B-কমপ্লেক্স), বিভিন্ন রকমের খনিজ পদার্থ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।

প্রাণীদের ক্ষেত্রে খাদ্যকে প্রথম অবস্থায় অভ্যন্তরীণ শর্ত এবং পরে বাহ্য শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়।

(ii) **হরমোন** (Hormones) ঃ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৃদ্ধি প্রধানত পিট্যুইটারি নামক অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত সোমাটোট্রপিক হরমোন (Somatotropic hormone) এবং থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত থাইরক্সিন (Thyroxin) হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হয়। গোনাড থেকে উৎপন্ন 'যৌন হরমোন'-ও বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। এইসব প্রাণীর শৈশবকালে বৃদ্ধির প্রথমাবস্থায় সোমাটোট্রপিক হরমোন ও থাইরক্সিন বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে। পতঙ্গদের বৃদ্ধি ও রূপান্তর এক্‌ডাইসোন (Ecdysone) নামক হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

(iii) **উৎসেচক** (Enzymes) ঃ নানাপ্রকার উৎসেচক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে পরোক্ষভাবে বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

● **বাহ্য শর্তাবলী** (External Factors) ঃ

(i) **জল** (Water) ঃ জল প্রোটোপ্লাজমকে নির্দিষ্ট মাত্রায় তরল রাখে। কোষ বিভাজনের আগে জল কোষের রসস্ফীতি চাপের বৃদ্ধি ঘটায়—যার ফলে কোষ আয়তনে বাড়ে। তাছাড়া, জল জীবদেহে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকার বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে—বৃদ্ধির জন্য ঐসব বিপাকীয় কাজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রাণীদের রক্তরস ও লসিকার মূল উপাদান হল জল। এই রক্তরস ও লসিকার মাধ্যমে, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে জলের মাধ্যমেই, খাদ্যবস্তু ভিটামিন হরমোন প্রভৃতি কোষে-কোষে পরিবাহিত হয়ে বৃদ্ধি ঘটায়। প্রাণীরা খাদ্যের সঙ্গে জল গ্রহণ করে।

(ii) **খনিজ পদার্থ** (Minerals) ঃ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের খাদ্যে আয়োডিনের অভাব হলে থাইরক্সিন হরমোন সৃষ্টি হয় না এবং মৌল বিপাক হার কমে যায় ; ফলে সামগ্রিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(iii) **অক্সিজেন** ঃ অক্সিজেন বৃদ্ধির একটি প্রয়োজনীয় বাহ্য শর্ত। এটি খাদ্যকে জারিত করে বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়।

(iv) **আলোক** (Light) ঃ মানুষের ত্বকে আলোর প্রভাবে বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রক ভিটামিন D সামান্য পরিমাণে তৈরি হয়। ফলে আলোক পরোক্ষভাবে মানুষের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে।

(v) **উষ্ণতা বা তাপমাত্রা** (Temperature) ঃ বৃদ্ধির পক্ষে 25°C—35°C উষ্ণতা সবচেয়ে উপযুক্ত। সাধারণত 4°C-এর কম এবং 50°C-এর বেশী উষ্ণতায় বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। 50°C-এর বেশী উষ্ণতায় সাধারণত প্রোটোপ্লাজমের জলীয় অংশটি বিনষ্ট হয় এবং সেই কারণে প্রোটোপ্লাজমের মৃত্যু ঘটে। উষ্ণশোণিত প্রাণীদের (যেমন—স্তন্যপায়ী ও পাখীদের) দেহের উষ্ণতা পরিবেশের উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয় না, কিন্তু অনুষ্ণশোণিত প্রাণীদের (যেমন—মাছ, উভচর ও সরীসৃপদের) দেহের উষ্ণতার পরিবর্তন পরিবেশের উষ্ণতার পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেইজন্য শীতকালে পরিবেশের উষ্ণতা কমলে এইসব প্রাণীর বৃদ্ধি বন্ধ থাকে এবং উষ্ণ ঋতুতে বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

5.73. উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির পার্থক্য (Differences between growth in plants and animals)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি	প্রাণীর বৃদ্ধি
1. উদ্ভিদের আজীবন বৃদ্ধি ঘটে।	1. প্রাণীর বৃদ্ধি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত হয়, অর্থাৎ বৃদ্ধি সারাজীবন ঘটে না।
2. উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্দিষ্ট অঙ্গে সীমাবদ্ধ।	2. প্রাণীর বৃদ্ধি সর্বাঙ্গ জুড়ে হয়।
3. উদ্ভিদের বৃদ্ধি সুষম নয়।	3. প্রাণীর বৃদ্ধি সুষম।
4. উদ্ভিদে ভাজক কলার কোষ বিভাজনের ফলে বৃদ্ধি হয় এবং ভাজক কলার বিভাজন ক্ষমতা লোপ পেলে স্থায়ী কলায় পরিণত হয়।	4. প্রাণিদেহের কলাকে এরকম ভাজক কলা ও স্থায়ী কলায় ভাগ করা যায় না। প্রাণিদেহের সমস্ত কলার কোষগুলিই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

H. চলন (Movement)

5.74. ভূমিকা (Introduction)

জীবের প্রোটোপ্লাজম খুব স্পর্শকাতর এবং অনুভূতিসম্পন্ন (Sensitive)। উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া এর অন্যতম প্রধান ধর্ম। প্রোটোপ্লাজমের এই বৈশিষ্ট্যকে **উত্তেজিতা** (Irritability) বলে। এই উত্তেজনার উৎস **বাহ্যিক** (External) বা **অভ্যন্তরীণ** (Internal) হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনায় জীবমাত্রেই সমগ্র দেহ বা দেহের অংশবিশেষ সঞ্চালিত বা আন্দোলিত করে। একে **চলন** (Movement) বলে। সাধারণত বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্যই জীবদেহের **উত্তেজনাশীল** (Irritable) প্রোটোপ্লাজম উত্তেজিত হয় এবং সেইমত সাড়া দেয় অর্থাৎ চলন হয়। চলন সমস্ত জীবের বৈশিষ্ট্য।

- **উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার জন্য জীবের সম্পূর্ণ দেহ বা দেহাংশের যে সঞ্চালন বা আন্দোলন হয়, তাকে চলন (Movement) বলে।**
- **চলনের মাধ্যমে অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে জীবদেহের সামগ্রিকভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়াকে গমন (Locomotion) বলে।**

কয়েক ধরনের অনড় প্রাণী (যেমন—স্পঞ্জ, প্রবাল ইত্যাদি) ছাড়া প্রায় সব প্রাণীর ক্ষেত্রেই গমন দেখা যায়। আবার কয়েক ধরনের নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ (যেমন—ক্ল্যামাইডোমোনাস, ভলভক্স ইত্যাদি) ছাড়া আর কোন উদ্ভিদে গমন দেখা যায় না। অধিকাংশ উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে মাটির কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থায়ীভাবে আবদ্ধ থাকে, তাই এদের ক্ষেত্রে কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনেই চলন সীমাবদ্ধ থাকে। অনড় প্রাণীরাও এইসব উদ্ভিদের মত স্থান পরিবর্তন না করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করতে পারে। যে **অঙ্গ** (Organ) বা **উপাঙ্গ** (Organelle) চালনা করে জীব এক

স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে, তাকে যথাক্রমে **গমন অঙ্গ** (Locomotory organ) বা **গমন উপাঙ্গ** (Locomotory organelle) বলে।

5.75. গমনের উদ্দেশ্য (Purpose of locomotion)

জীবের গমন অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে চলনের উদ্দেশ্যগুলি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

(i) প্রাণীরা প্রধানত পরভোজী হওয়ায় খাদ্য অন্বেষণের জন্য স্থান পরিবর্তন অর্থাৎ গমন করে।

(ii) নিরাপদ আশ্রয় তথা উপযুক্ত পরিবেশের সন্ধানে জীবের গমন হতে পারে।

(iii) শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং পরিবেশের প্রতিকূলতার জন্য জীব স্থান পরিবর্তন তথা গমন করে।

(iv) জননের সঙ্গী অন্বেষণের জন্যও জীবের গমন হয়।

(v) সর্বোপরি বিভিন্ন জৈবনিক চাহিদা পূরণের জন্য জীব গমনে আগ্রহী হতে পারে।

5.76. উদ্ভিদে চলন (Movement in Plants)

অধিকাংশ উদ্ভিদ মাটির সঙ্গে আবদ্ধ থাকে এবং জীবন ধারণের সমস্ত উপাদান ঐ স্থানে আবদ্ধ থেকে সংগ্রহ করে বলে, উদ্ভিদের স্থানান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। শুধু নিম্ন শ্রেণীর কয়েক ধরনের উদ্ভিদ স্থানান্তরে যেতে পারে। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদেরা স্থানান্তরিত হতে না পারলেও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত বা আন্দোলিত করে বাইরের উদ্দীপনায় সাড়া দেয়।

উদ্ভিদের চলন প্রক্রিয়াকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায় ঃ

A. সামগ্রিকভাবে চলন বা গমন (Movement of locomotion)

B. অংশিকভাবে চলন বা বক্র চলন (Movement of curvature)

A. **সামগ্রিকভাবে চলন** (Movement of locomotion) **ঃ** এ ধরনের চলনে সমগ্র উদ্ভিদটি সামগ্রিকভাবে স্থানান্তরে গমন করে। ভলভক্স, ক্ল্যামাইডোমোনাস প্রভৃতি এককোষী শৈবাল, ছত্রাক, মসের শুক্রাণু, নগ্ন প্রোটোপ্লাজমযুক্ত উদ্ভিদ প্রভৃতি স্থানান্তরে গমন করে। এই ধরনের চলন আবার দুরকম—(a) **স্বতঃস্ফূর্ত গমন** (Spontaneous movement or Autonomic movement) এবং (b) **প্রবৃত্ত গমন বা আবিষ্ট গমন** (Induced movement or Paratonic movement or Tactic movement)।

(a) **স্বতঃস্ফূর্ত গমন ঃ** বাহ্য শর্তের উপর নির্ভর না করে উদ্ভিদ যখন সামগ্রিকভাবে স্থানান্তরিত হয়, তখন তাকে **স্বতঃস্ফূর্ত গমন** বলে। এ ধরনের চলন আবার দু রকম—(i) **শুঙ্গের সাহায্যে চলন** (Ciliary movement)—যেমন এককোষী শৈবাল ক্ল্যামাইডোমোনাসের শুঙ্গের সাহায্যে স্থানান্তরে গমন এবং (ii) **ক্ষণপদের সাহায্যে চলন** (Amoeboid movement)—যেমন নগ্ন প্রোটোপ্লাজমযুক্ত উদ্ভিদ মিক্সোমাইসিটিসের ক্ষণপদের সাহায্যে স্থানান্তরে গমন।

(b) **প্রবৃত্ত গমন বা আবিষ্ট গমন**ঃ বাহ্য উদ্দীপকের প্রভাবে উদ্ভিদের সামগ্রিক স্থানান্তরণ হলে, তাকে **প্রবৃত্ত গমন** বা **আবিষ্ট গমন** বলে। এ ধরনের গমনকে **ট্যাকটিক গমন** বা **ট্যাক্সিজম্‌ও** বলে। উদ্দীপকের প্রকারভেদ অনুসারে এ ধরনের গমন আবার কয়েক রকমের হতে পারে।

(i) **ফটোট্যাক্সিস** (Phototaxis)ঃ আলোক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উদাহরণঃ অধিকাংশ এককোষী শৈবালের স্বল্পালোকের দিকে চলন।

(ii) **কেমোট্যাক্সিস** (Chemotaxis)ঃ রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উদাহরণঃ ফার্ণের শুক্রাণুর ম্যালিক অ্যাসিড এবং মসের শুক্রাণুর ইক্ষু শর্করার প্রভাবে স্ত্রী-ধানীর দিকে চলন।

(iii) **থারমোট্যাক্সিস** (Thermotaxis)ঃ উষ্ণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উদাহরণঃ এককোষী শৈবালের কম উষ্ণতার স্থান থেকে অধিকতর উষ্ণ স্থানে চলন।

(iv) **হাইড্রোট্যাক্সিস** (Hydrotaxis)ঃ জল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উদাহরণঃ শৈবালের জলের দিকে চলন।

(v) **গ্যালভানোট্যাক্সিস** (Galvanotaxis)ঃ তড়িৎ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উদাহরণঃ শৈবালের তড়িতের প্রভাবে চলন।

B. আংশিকভাবে চলন বা বক্রচলন (Movement of curvature)ঃ এ ধরনের চলনে উদ্ভিদের কোন অঙ্গ বাহ্য কিংবা অভ্যন্তরীণ শর্ত সাপেক্ষে কোন নির্দিষ্ট দিকে চালিত হয়। বক্রচলন আবার দু ধরনের—(a) **স্বতঃস্ফূর্ত বক্রচলন** (Spontaneous movement of curvature or Autonomic movement of curvature) এবং (b) **প্রবৃত্ত বক্রচলন** (Induced movement of curvature or Paratonic movement of curvature)।

(a) **স্বতঃস্ফূর্ত বক্রচলন**ঃ যখন কোনও বাহ্য উদ্দীপকের প্রভাব ছাড়া অভ্যন্তরীণ শর্তের প্রভাবে উদ্ভিদ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত করে অর্থাৎ বক্রচলন সম্পন্ন হয়, তখন তাকে **স্বতঃস্ফূর্ত বক্রচলন** বলে। এ ধরনের বক্রচলন আবার দু রকম—(i) **প্রকারণ চলন** (Movement of variation) এবং (ii) **বৃদ্ধিজ চলন** (Movement of growth)।

চিত্র 5.90 ঃ বনচাঁড়ালের পার্শ্ব পত্রকদ্বয়ের প্রকারণ চলন।

(i) **প্রকারণ চলন**ঃ কোষের রসস্ফীতি চাপের তারতম্যের জন্য অনেক উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়। এ ধরনের বক্রচলনকে **প্রকারণ চলন** বলে। **ভারতীয় টেলিগ্রাফ গাছ** (Indian Telegraph plant) বা **বনচাঁড়াল** (*Desmodium gyrans*) উদ্ভিদের ত্রিফলক পত্রের পার্শ্বীয় পত্রক দুটির পত্রমূলের কোষের মধ্যে রসস্ফীতি চাপের হ্রাসবৃদ্ধির জন্য পার্শ্বপত্রক দুটি ওঠানামা করে। এটি প্রকারণ চলনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ (চিত্র 5.90)।

(ii) **বৃদ্ধিজ চলন** : কোন উদ্ভিদ অঙ্গের অসমান বৃদ্ধির জন্য অঙ্গটি অসমানভাবে বাড়লে যে বক্রচলন হয়, তাকে **বৃদ্ধিজ চলন** বলে। এ ধরনের চলন আবার তিন ধরনের। যথা—

1. **বলন** বা **ন্যুটেশান** (Nutation) : বল্লীজাতীয় উদ্ভিদের (Twiner) কাণ্ডের দুদিকে পর্যায়ক্রমে অসমানভাবে বৃদ্ধি ঘটলে কাণ্ডটি এঁকে-বেঁকে বাড়তে থাকে। এ ধরনের বক্রচলনকে **বলন** বা **ন্যুটেশান** বলে।

2. **পরিবলন** বা **সারকামন্যুটেশান** (Circumnutation) : উদ্ভিদের কোন অঙ্গ একই দিকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে, বর্ধনশীল অঙ্গটি পেঁচিয়ে যায়। একে **পরিবলন** বা **সারকামন্যুটেশান** বলে। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি বল্লীজাতীয় উদ্ভিদের আকর্ষে এ ধরনের বক্রচলন পরিলক্ষিত হয়।

3. **হাইপোন্যাস্টি ও এপিন্যাস্টি** (Hyponasty and Epinasty) : কলা, কচু প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতার নিম্নপৃষ্ঠের কোষগুলি প্রথম অবস্থায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত বৃদ্ধি পায় বলে প্রাথমিক পর্যায়ে পাতাগুলি গুটিয়ে থাকে। এই ধরনের বৃদ্ধিজনিত বক্রচলনকে **হাইপোন্যাস্টি** বলে। শেষ পর্যায়ে পাতার ঊর্ধ্বপৃষ্ঠের কোষগুলি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। ফলে গুটিয়ে থাকা পাতা টান-টান হয়ে যায়। এই ধরনের বক্রচলনকে **এপিন্যাস্টি** বলে।

(b) **প্রবৃত্ত বক্রচলন** : বাহ্য উদ্দীপকের প্রভাবে উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হলে অর্থাৎ বক্রচলন হলে, তাকে **প্রবৃত্ত বক্রচলন** বলে। আলোক, জল, উষ্ণতা, অভিকর্ষ, স্পর্শ, রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি বাহ্য উদ্দীপকের দ্বারা প্রবৃত্ত বক্রচলন প্রভাবিত হয়। প্রবৃত্ত বক্রচলন আবার দু রকম—(i) **দিগ্‌নির্ণীত চলন** বা **ট্রপিক চলন** (Tropic movement) এবং (ii) **ব্যাপ্তি চলন** বা **ন্যাস্টিক চলন** (Nastic movement)।

(i) **দিগ্‌নির্ণীত চলন বা ট্রপিক চলন** : যে প্রবৃত্ত বক্রচলনে উদ্দীপকের উৎস, উদ্ভিদ অঙ্গের বক্রচলনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে **দিগ্‌নির্ণীত বক্রচলন** বা **ট্রপিক চলন** বলে।

উদ্দীপকের তারতম্য অনুসারে ট্রপিক চলন আবার নিম্নলিখিত কয়েক ধরনের হতে পারে :

1. **আলোকবৃত্তি** বা **ফটোট্রপিজম** (Phototropism) : উদ্ভিদ অঙ্গের বক্রচলন আলোকের উৎসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে, তাকে **আলোকবৃত্তি** বা **ফটোট্রপিজম** বলে।

আলোকবৃত্তিতে সাধারণত সূর্যালোকই উদ্দীপকরূপে কাজ করে বলে একে **সূর্যালোকবৃত্তি** বা **হেলিওট্রপিজম** (Heleotropism)-ও বলে। উদ্ভিদের বিটপ সাধারণত আলোকের উৎসের দিকে সঞ্চালিত হয়। তাই বিটপকে **আলোক অনুকূলবর্তী** (Positively phototropic) বলে। বিষমপৃষ্ঠ পত্র আলোকের উৎসের সঙ্গে লম্বভাবে থাকে বলে একে **আলোক তির্যকবর্তী** (Transversely phototropic) বা **ডায়াফটোট্রপিক** (Diaphototropic) বলে। আবার উদ্ভিদের

মূল আলোকের উৎসের বিপরীত দিকে ধাবিত হয় বলে মূলকে **আলোক প্রতিকূলবর্তী** (Negatively phototropic) বলে (চিত্র 5.91)।

উদ্ভিদের আলোকবৃত্তি অক্সিন নামক হরমোনের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। বিটপের ক্ষেত্রে অক্সিন আলোর বিপরীত দিকে সঞ্চিত হয় এবং ঐ অংশে অক্সিনের পরিমাণ বেশী হওয়ায় আলোর বিপরীত দিকের কোষ বিভাজন দ্রুত হয়, ফলে বিটপ আলোকের দিকে বর্ধিত হয়।

মূলের ক্ষেত্রে মূলাগ্রের অক্সিন আলোর বিপরীত দিকে বেশী মাত্রায় জমা হয় বলে মূলাগ্র আলোর বিপরীতে বৃদ্ধি পায়।

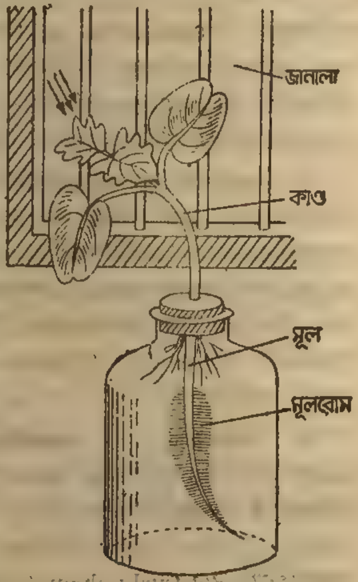

চিত্র 5.91 : বিটপের আলোক অনুকূলবর্তী চলন।

2. **জলবৃত্তি** বা **হাইড্রোট্রপিজম** **(Hydrotropism) :** উদ্ভিদ অঙ্গের বক্রচলন জলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে, তাকে **জলবৃত্তি** বা **হাইড্রোট্রপিজম** বলে। উদ্ভিদের মূল সাধারণত **জল অনুকূলবর্তী** (Positively hydrotropic), অর্থাৎ মূল জলের দিকে চালিত হয় এবং বিটপ সাধারণত **জল প্রতিকূলবর্তী** (Negatively hydrotropic) অর্থাৎ জলের উৎসের বিপরীত দিকে চালিত হয়।

3. **অভিকর্ষবৃত্তি** বা **জিওট্রপিজম** (Geotropism) : অভিকর্ষের দ্বারা

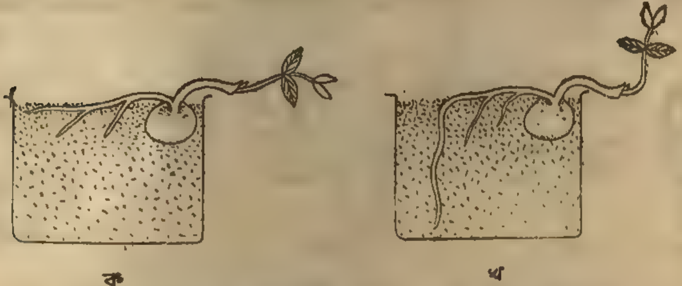

চিত্র 5.92 : কাণ্ড ও মূলে অভিকর্ষের প্রভাব। (ক) প্রাথমিক অবস্থা ; (খ) অভিকর্ষের প্রভাবে কাণ্ড ও মূলের দিক পরিবর্তন।

নিয়ন্ত্রিত উদ্ভিদ অঙ্গের বক্রচলনকে **অভিকর্ষবৃত্তি** বা **জিওট্রপিজম** বলে। উদ্ভিদের মূল সাধারণত অভিকর্ষ বলের দিকে ধাবিত হয় বলে একে **অনুকূল অভিকর্ষী**

(Positively geotropic), বিটপ অভিকর্ষের বিপরীত দিকে চালিত হয় বলে একে **প্রতিকূল অভিকর্ষী** (Negatively geotropic) এবং উদ্ভিদের পত্র, পার্শ্বীয় মূল ও শাখামূল সাধারণত অভিকর্ষের সঙ্গে সমকোণে বৃদ্ধি পায় বলে এদের **তির্যক অভিকর্ষী** (Transversely geotropic) বা **ডায়াজিওট্রপিক** (Diageotropic) বলে। কান্ডের শাখা-প্রশাখা অভিকর্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয় না বলে এদের **নিরপেক্ষ অভিকর্ষী** (Neutral geotropic) বা **অ্যাপোজিওট্রপিক** (Apogeotropic) বলে। এ ধরনের বক্রচলনও অক্সিনের উপর নির্ভরশীল।

4. **স্পর্শবৃত্তি** বা **থিগমোট্রপিজম** (Thigmotropism): উদ্ভিদ অঙ্গের বক্রচলন যখন কোন বস্তুর স্পর্শের অনুকূলে বা প্রতিকূলে হয়, তখন তাকে **স্পর্শবৃত্তি** বা **থিগমোট্রপিজম** বলে। বল্লীজাতীয় উদ্ভিদ ও আকর্ষ স্পর্শতলের অনুকূলে বৃদ্ধি পায় বলে এদের **অনুকূল স্পর্শবর্তী** (Positively thigmotropic) এবং উদ্ভিদের মূল স্পর্শতলের বিপরীত দিকে ধাবিত হয় বলে একে **প্রতিকূল স্পর্শবর্তী** (Negatively thigmotropic) বলে। এ ধরনের বক্রচলনও অক্সিনের প্রভাবে সংঘটিত হয়।

5. **রসায়নবৃত্তি** বা **কেমোট্রপিজম** (Chemotropism): উদ্ভিদ অঙ্গের বক্রচলন যখন কোন রাসায়নিক পদার্থের অভিমুখ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন তাকে **রসায়নবৃত্তি** বা **কেমোট্রপিজম** বলে। ডিম্বক-নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ পরাগ-নালীকে (Pollen tube) ডিম্বকের অভিমুখে চালিত করে। একে **অনুকূল রসায়নবর্তী** (Positively chemotropic) বলে।

(ii) **ব্যাপ্তি চলন বা ন্যাস্টিক চলন**: যে প্রবৃত্ত বক্রচলন উদ্দীপকের উৎসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে উদ্দীপকের তীব্রতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে **ব্যাপ্তি চলন** বা **ন্যাস্টিক চলন** বলে। উদ্দীপকের তারতম্য অনুসারে ন্যাস্টিক চলন আবার কয়েক ধরনের হতে পারে।

1. **আলোকব্যাপ্তি** বা **ফটোন্যাস্টি** (Photonasty): আলোকের তীব্রতার তারতম্যে উদ্ভিদ অঙ্গে যে ব্যাপ্তি চলন বা ন্যাস্টিক চলন হয়, তাকে **আলোকব্যাপ্তি**

চিত্র 5.93: (ক) ও (খ) পদ্মফুলের থার্মোন্যাস্টি চলন,
(গ) ও (ঘ) আমরুল পাতার নিকটিন্যাস্টি চলন।

বা **ফটোন্যাস্টি** বলে। সূর্যমুখী, পদ্ম প্রভৃতি ফুল দিনের আলোয় ফোটে এবং সূর্যাস্তের পর বন্ধ হয়ে যায়। আবার বেল, সন্ধ্যামালতী প্রভৃতি ফুল সূর্যাস্তের

পর ফোটে। কৃষ্ণচূড়া, আমরুল প্রভৃতি গাছের পাতা দিনের আলোর প্রভাবে খুলে যায় এবং সূর্যাস্তের পর বুজে যায়। পত্ররন্ধ্রের **প্রহরীকোষ** (Guard cells)-ও সাধারণত দিনের বেলায় খোলে এবং রাত্রে বন্ধ হয়।

2. **তাপব্যাপ্তি** বা **থারমোন্যাস্টি** (**Thermonasty**)ঃ উষ্ণতার তীব্রতার তারতম্যে উদ্ভিদ অঙ্গে যে ব্যাপ্তি চলন দেখা যায়, তাকে **তাপব্যাপ্তি** বা **থারমোন্যাস্টি** বলে। পদ্ম, শালুক ইত্যাদি ফুল উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফোটে এবং উষ্ণতা কমে গেলে বুজে যায়। শিম্ব-উপগোত্রীয় উদ্ভিদের পাতা বেশী উষ্ণতায় মুড়ে যায়।

3. **তাপ-আলোকব্যাপ্তি** বা **নিক্‌টিন্যাস্টি** (**Nyctinasty**)ঃ উদ্ভিদ অঙ্গের ব্যাপ্তি চলন যখন তাপমাত্রা ও আলোক উভয়ের মিলিত তীব্রতার প্রভাবে হয়ে থাকে, তখন তাকে **তাপ-আলোকব্যাপ্তি** বা **নিকটিন্যাস্টি** বলে। তামাক, ক্যাকটাস প্রভৃতি ফুল দিনের বেলায় তাপমাত্রা ও আলোক উভয়ের তীব্রতায় ফোটে এবং রাত্রে মুড়ে যায়। তেঁতুল, বাবলা, আমরুল, সূর্যান প্রভৃতির পাতা দিনের বেলায় তাপমাত্রা ও আলোক উভয়ের মিলিত তীব্রতায় খুলে যায় এবং সূর্যাস্তের পর মুড়ে যায়। এদের পাতাগুলি দিনের বেলায় খোলা থাকে এবং রাত্রে মুড়ে যায় বলে এ ধরনের চলনকে সাধারণভাবে **Sleeping movement**-ও বলে।

4. **রসায়নব্যাপ্তি** বা **কেমোন্যাস্টি** (**Chemonasty**)ঃ রাসায়নিক পদার্থের তীব্রতার প্রভাবে উদ্ভিদ অঙ্গে যে ব্যাপ্তি চলন হয়, তাকে **রসায়নব্যাপ্তি** বা **কেমোন্যাস্টি** বলে। পতঙ্গভুক্‌ উদ্ভিদ সূর্যশিশির (*Drosera*)-এর পাতায় পতঙ্গ বসলে প্রোটীনের সংস্পর্শে কর্ষিকাগুলি সঞ্চালিত হয় এবং পতঙ্গকে আবদ্ধ করে।

5. **স্পর্শব্যাপ্তি** বা **সিস্‌মোন্যাস্টি** (**Seismonasty**)ঃ স্পর্শ বা আঘাত প্রভৃতি যান্ত্রিক উদ্দীপকের তীব্রতার প্রভাবে উদ্ভিদ অঙ্গে যে ব্যাপ্তি চলন হয়, তাকে **স্পর্শব্যাপ্তি** বা **সিস্‌মোন্যাস্টি** বলে। লজ্জাবতী লতার (*Mimosa sp.*) পাতা ছুঁলেই পাতাগুলি মুড়ে যায়। এটি সিস্‌মোন্যাস্টির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চিত্র 5.94 ঃ লজ্জাবতী পাতার সিস্‌মোন্যাস্টি চলন।

উদ্ভিদ অঙ্গের সবরকম ব্যাপ্তি চলনই ঐ নির্দিষ্ট অঙ্গের কোষের রসস্ফীতি চাপের তারতম্যের জন্য ঘটে। বিভিন্ন উদ্দীপক নির্দিষ্ট অঙ্গের কোষের রসস্ফীতি চাপের তারতম্যকে প্রভাবিত করে। এইজন্য এ ধরনের বক্রচলনকে **রসস্ফীতি চলন** (**Turgor movement**)-ও বলে।

উদ্ভিদের চলন (Movement in Plants)

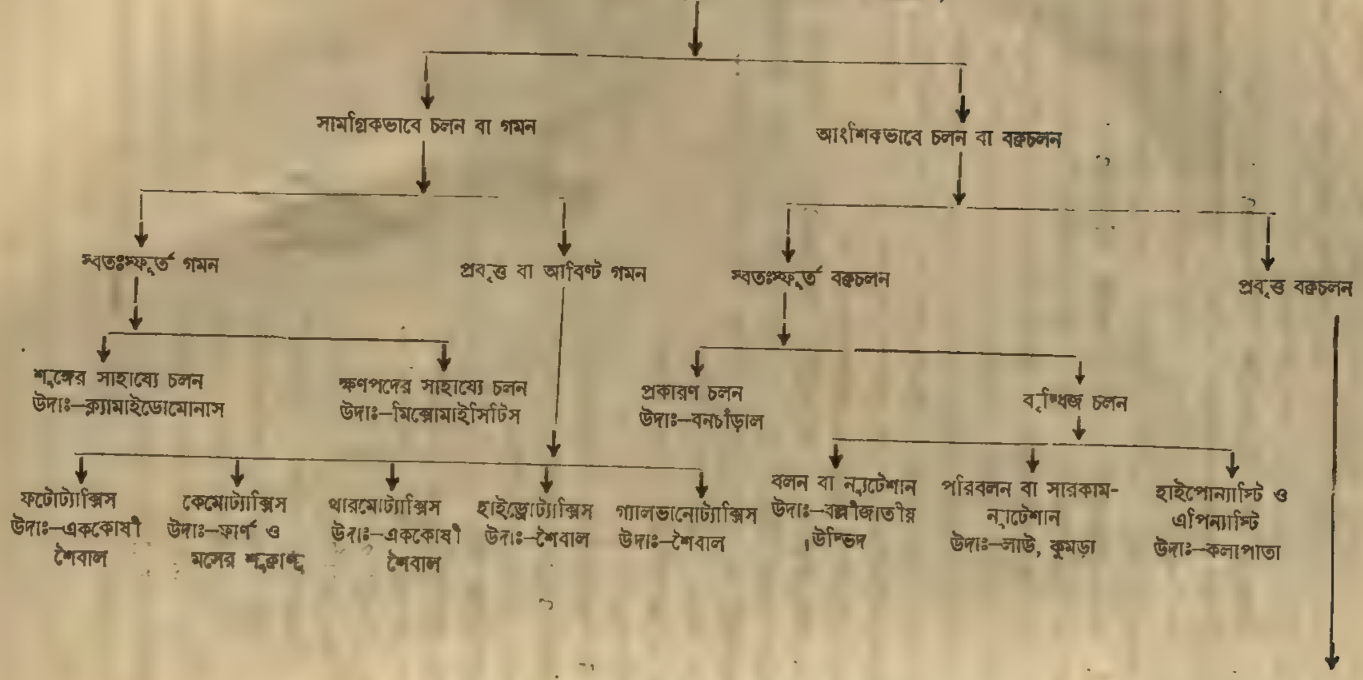

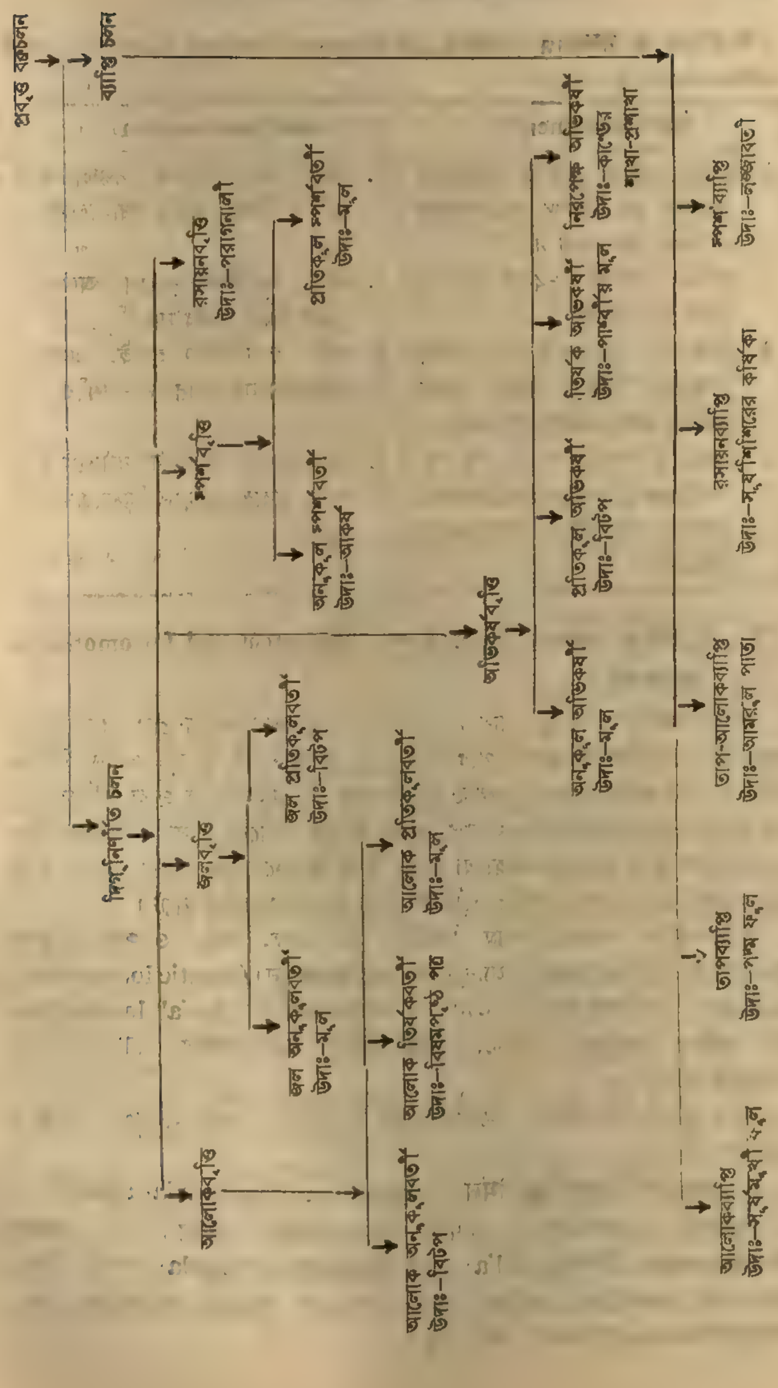

প্রবৃত্ত বক্রচলন
ব্যাপ্তি চলন
দিক্‌নির্ণীত চলন
আলোকবৃত্তি
জলবৃত্তি
স্পর্শবৃত্তি
রসায়নবৃত্তি উদাঃ—পরাগনালী
অভিকর্ষবৃত্তি
আলোক অনুকূলবর্তী উদাঃ—বিটপ
আলোক তির্যকবর্তী উদাঃ—বিষমপৃষ্ঠ পত্র
আলোক প্রতিকূলবর্তী উদাঃ—মূল
জল অনুকূলবর্তী উদাঃ—মূল
জল প্রতিকূলবর্তী উদাঃ—বিটপ
অনুকূল স্পর্শবর্তী উদাঃ—আকর্ষ
প্রতিকূল স্পর্শবর্তী উদাঃ—মূল
অনুকূল অভিকর্ষী উদাঃ—মূল
প্রতিকূল অভিকর্ষী উদাঃ—বিটপ
তির্যক অভিকর্ষী উদাঃ—পার্শ্বীয় মূল
নিরপেক্ষ অভিকর্ষী উদাঃ—কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা
আলোকব্যাপ্তি উদাঃ—সূর্যমুখী ফুল
তাপব্যাপ্তি উদাঃ—পদ্ম ফুল
তাপ-আলোকব্যাপ্তি উদাঃ—আমরুল পাতা
রসায়নব্যাপ্তি উদাঃ—সূর্যশিশিরের কর্ষিকা
স্পর্শব্যাপ্তি উদাঃ—লজ্জাবতী

● চলন ও গমনের পার্থক্য (Differences between Movement and Locomotion) :

চলন (Movement)	গমন (Locomotion)
1. চলনে সম্পূর্ণ দেহ বা দেহাংশের সঞ্চালন হয়, কিন্তু স্থানান্তরণ বা স্থান ত্যাগ ঘটে না।	1. গমনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের মাধ্যমে সমগ্র দেহের স্থানান্তরণ ঘটে।
2. কোন নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থেকে চলন সম্ভব।	2. কোন নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থেকে গমন সম্ভব নয়।
3. চলন হলে গমন হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই অর্থাৎ চলন গমনের উপর নির্ভরশীল নয়।	3. গমন হলে চলন হবেই, অর্থাৎ গমন চলনের উপর নির্ভরশীল।
4. চলন উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (ব্যতিক্রম : ক্ল্যামাইডোমোনাস, ভলভক্স প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ)।	4. গমন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য (ব্যতিক্রম : স্পঞ্জ, প্রবাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণী)।

5.77. প্রাণীর চলন ও গমন (Movement and Locomotion in Animals)

কিছুসংখ্যক প্রাণী ছাড়া প্রায় সব প্রাণীই প্রয়োজনে স্থানান্তরে গমন করে। এককোষী আণুবীক্ষণিক প্রাণী থেকে শুরু করে স্তন্যপায়ী মানুষ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাণীর গমনের মাধ্যম ও গমন পদ্ধতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। যেমন, মাছ জলে সাঁতার দেয়, সাপ মাটির উপর বুকে ভর দিয়ে চলে, পাখী ডানার সাহায্যে বায়ুতে স্বচ্ছন্দে উড়ে বেড়ায়, বাঁদর হাত ও পায়ের সাহায্যে মাটির উপর লাফিয়ে চলে কিংবা গাছের উপর চড়ে, আবার মানুষ তার সুগঠিত দুটি পা দিয়ে স্বাভাবিকভাবে হাঁটে।

প্রাণিজগতের গমনের মাধ্যম তিনটি, যথা—জল, বায়ু ও স্থল। জলে বসবাসকারী প্রাণীদের গমনকে **অ্যাকুয়াটিক লোকোমোশান** (Aquatic locomotion), বায়ুমণ্ডলে প্রাণীদের গমনকে **এরিয়াল লোকোমোশান** (Aerial locomotion) এবং স্থলচর প্রাণীদের গমনকে **টেরেস্ট্রিয়াল লোকোমোশান** (Terrestrial locomotion) বলে।

নিচে এই তিনটি মাধ্যমে কয়েকটি প্রাণীর চলন ও গমন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

A. এককোষী প্রাণীর গমন (Locomotion of unicellular animals) :

এককোষী স্বাধীনজীবী প্রাণীরা প্রায় সকলেই জলচর। এরা **ক্ষণপদ** (Pseudopodia), **সিলিয়া** (Cilia) এবং **ফ্ল্যাজেলার** (Flagella) সাহায্যে গমন করে। এই অঙ্গগুলির সাহায্যে গমন পদ্ধতিকে যথাক্রমে **অ্যামিবয়েড গমন**, **সিলিয়ারী গমন** ও **ফ্ল্যাজেলারী গমন** বলে।

অ্যামিবয়েড গমন (Amoeboid movement) ঃ এই ধরনের গমন পদ্ধতি এককোষী প্রাণী অ্যামিবার বৈশিষ্ট্য। এই পদ্ধতিতে অ্যামিবা **ক্ষণপদ** (Pseudopodia) সৃষ্টি করে স্থানান্তরে যায়। অ্যামিবার দেহের যে কোন দিক থেকে কোষ আবরণী ও প্রোটোপ্লাজম একদিকে বর্ধিত হয়ে যে অস্থায়ী আকৃতির আঙ্গুলের মত অংশ গঠন করে, তাকে **ক্ষণপদ** বলে। অ্যামিবার দেহ থেকে এ ধরনের

চিত্র 5.95 ঃ অ্যামিবার গমন [তীর চিহ্ন গমনের দিক নির্দেশ করছে]।

একাধিক ক্ষণপদ সৃষ্টি হতে পারে, তবে সবচেয়ে বড় ক্ষণপদটি চলনকাজে ব্যবহৃত হয়। দেহের যে অংশে ক্ষণপদ সৃষ্টি হয়, ক্ষণপদ সৃষ্টির পূর্বে সেই অংশ থেকে একপ্রকার আঠাল রস বের হয়ে দেহটিকে কোন কঠিন বস্তুর সঙ্গে আটকিয়ে নেয়। ক্ষণপদ সৃষ্টি হলে দেহের বিপরীত দিকের প্রোটোপ্লাজম ও কোষ আবরণী—সেই ক্ষণপদের দিকে এগিয়ে যায়। ক্ষণপদ সৃষ্টি করে গমনের এই বিশেষ পদ্ধতিকে **অ্যামিবয়েড গমন** বলা হয়।

অ্যামিবা অত্যন্ত মন্থরগতিসম্পন্ন প্রাণী। স্বাভাবিক অবস্থায় এরা সেকেণ্ডে 0·5—5 মাইক্রা অতিক্রম করতে পারে। অ্যামিবার গমনের হার বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক শর্তের উপর নির্ভরশীল। এই শর্তগুলির মধ্যে উষ্ণতা প্রধান। 0°C থেকে 30°C পর্যন্ত উষ্ণতায় এরা স্বাভাবিকভাবে চলাচল করে। অন্যান্য বাহ্য শর্তের মধ্যে পরিবেশের অম্লত্ব, ক্ষারকত্ব, দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ অ্যামিবার চলনকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

অ্যামিবার ক্ষণপদ সৃষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে বর্তমানে **সান্দ্রতার পরিবর্তন মতবাদ** (Theory of change of viscosity) বা **সল-জেল মতবাদ** (Sol-gel theory) সর্বজন স্বীকৃত। বিজ্ঞানী **ম্যাস্‌ট** (Mast—1923, 1926, 1933) দীর্ঘকাল গবেষণা করে ক্ষণপদ সৃষ্টি সম্পর্কিত এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ কোন কারণে কলয়েডীয় সাইটোপ্লাজমের সান্দ্রতার পরিবর্তনই ক্ষণপদ সৃষ্টির কারণ। অ্যামিবার এণ্ডোপ্লাজম দুস্তরে বিভক্ত—এক্টোপ্লাজম-সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত বেশী সান্দ্র **প্লাজমাজেল** (Plasmagel) এবং ভিতরের দিকে কম সান্দ্র **প্লাজমাসল** (Plasmasol)। ক্ষণপদ সৃষ্টির সময় অ্যামিবার দেহ কোন কঠিন বস্তুর সঙ্গে আটকে গেলে গতিপথ সংলগ্ন দিকে প্লাজমাজেল প্লাসমাসলে পরিণত হয়ে সামনের দিকে প্রবাহিত হয় এবং ক্ষণপদ সৃষ্টি করে।

ক্ষণপদের বিপরীত দিকেও প্লাসমাজেল প্লাসমাসলে পরিণত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসে। ক্ষণপদ সৃষ্টি সম্পর্কিত এই মতবাদ ব্যাখ্যায় **শ্রীমতী হাইম্যান** (Mrs. Hyman, 1917) বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন।

সিলিয়ারী গমন (Ciliary movement) : প্যারামিসিয়াম, ভর্টিসেলা প্রভৃতি এককোষী প্রাণীদের সারা দেহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোম বা সিলিয়া দ্বারা আবৃত। এই সিলিয়াগুলি সামগ্রিকভাবে সঞ্চালিত হলে এদের স্থানান্তরণ ঘটে। সিলিয়ার সাহায্যে গমন হয় বলে এদের গমন পদ্ধতিকে **সিলিয়ারী গমন** বলে [চিত্র 5.96(ক)]।

ফ্ল্যাজেলারী গমন (Flagellary movement) : ইউগ্লিনা, নকটিলিউকা, ট্রাইপানোসোমা প্রভৃতি এককোষী প্রাণীর দেহে চাবুকের মত অপেক্ষাকৃত লম্বা একটি বা দুটি ফ্ল্যাজেলা নামক গমন অঙ্গ থাকে। এই ফ্ল্যাজেলার মুক্ত সঞ্চালনের ফলে এরা গমন করে বলে এ ধরনের গমন পদ্ধতিকে **ফ্ল্যাজেলারী গমন** বলে [চিত্র 5.96(খ)]।

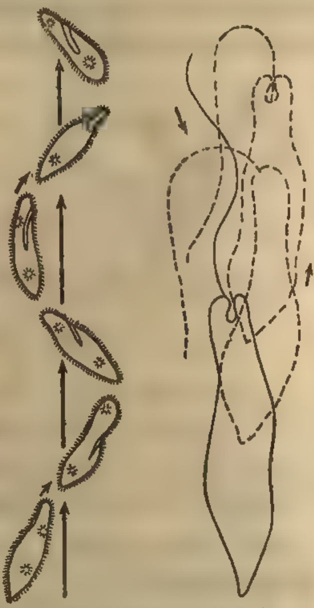

চিত্র 5.96 : (ক)—প্যারামিসিয়ামের গমন পদ্ধতি, (খ)—ইউগ্লিনার গমন পদ্ধতি।

উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতি ছাড়া এককোষী পরজীবী প্রাণী—মনোসিস্টিস, অন্তঃপ্লাজম ও বহিঃপ্লাজমের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুর মত সঙ্কোচনশীল **মায়োনিম অনুসূত্রের** (Myoneme fibrils) পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণের সাহায্যে সামান্য নড়া-চড়া করতে পারে।

B. বহুকোষী জলচর প্রাণীর চলন ও গমন (Movement and Locomotion of multicellular aquatic animals) :

হাইড্রার গমন (Locomotion of Hydra) : হাইড্রার দেহ-প্রাচীরের এক্টোডার্মে অবস্থিত এপিথেলিওমাসকুলার কোষের ভিতরের প্রান্ত সরু, অনুদৈর্ঘ্য ভাবে প্রলম্বিত (longitudinally elongated) এবং পেশী তন্তুর মত সঙ্কোচনশীল। তন্তুগুলি সঙ্কুচিত হলে দেহ দৈর্ঘ্যে কমে এবং তন্তুগুলি প্রসারিত হলে দেহ দৈর্ঘ্যে বাড়ে। এই তন্তুগুলির সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটিয়ে হাইড্রা এক জায়গায় আবদ্ধ থেকে দেহকে বাঁকাতে পারে।

দেহের অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত কর্ষিকা এবং উক্ত কোষের সম্মিলিত ক্রিয়ায় হাইড্রা একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে।

হাইড্রার গমন পদ্ধতিগুলি হল ঃ

(i) **লুপিং ঃ** এই পদ্ধতিতে হাইড্রা এপিথেলিওমাসকুলার কোষের সাহায্যে দেহকে বাঁকিয়ে কর্ষিকাগুলিকে দূরবর্তী কোন নতুন স্থানে আবদ্ধ করে। এর পর **বেসাল ডিস্ক** (Basal disc) বা পাদচক্রকে তুলে এনে কর্ষিকার কাছে কিন্তু তার পিছন দিকে স্থাপন করে এবং সোজা হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে হাইড্রা পুনরায় নিজের দেহকে বাঁকিয়ে কর্ষিকাগুলিকে দূরে আবদ্ধ করে এবং এগিয়ে চলে।

(ii) **সমারসল্টিং ঃ** এই পদ্ধতিতে হাইড্রা কর্ষিকাগুলিকে দূরে স্থাপন করার পর বেসাল ডিস্ককে উপরে তুলে ধরে এবং কর্ষিকার উপর উল্টে দাঁড়ায়। পরে বেসাল ডিস্ককে কর্ষিকার সামনের দিকে সংলগ্ন করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ডিগবাজি দিয়ে এগিয়ে চলে।

(iii) **কর্ষিকার সাহায্যে হাঁটা ঃ** হাইড্রা উলটানো অবস্থায় কর্ষিকার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে কর্ষিকাগুলিকে পা হিসেবে ব্যবহার করে এগিয়ে যেতে পারে।

(iv) **গ্লাইডিং ঃ** হাইড্রার বেসাল ডিস্কের অ্যামিবয়েড কোষ থেকে ক্ষণপদ সৃষ্টি হয়, যার সাহায্যে হাইড্রা হড়কে কিছুদূর যেতে পারে।

(v) **ক্লাইম্বিং ঃ** কর্ষিকার সাহায্যে হাইড্রা জলের মধ্যে কোন ডালপালা বা অন্য কোন অবলম্বনকে জড়িয়ে ধরে কিছুটা উপরদিকে উঠতে পারে (চিত্র 5.97)।

(vi) **সাঁতার ঃ** হাইড্রা কর্ষিকাগুলিকে জলের মধ্যে চাবুকের মত আঘাত করে সন্তরণ প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যেতে পারে।

(vii) **ফ্লোটিং ঃ** হাইড্রা বেসাল ডিস্কের নিচে গ্যাসীয় বুদ্‌বুদ্‌ সৃষ্টি করে ঐ বুদ্‌বুদের সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ করে ভাসমান অবস্থায় স্থানান্তরে গমন করে।

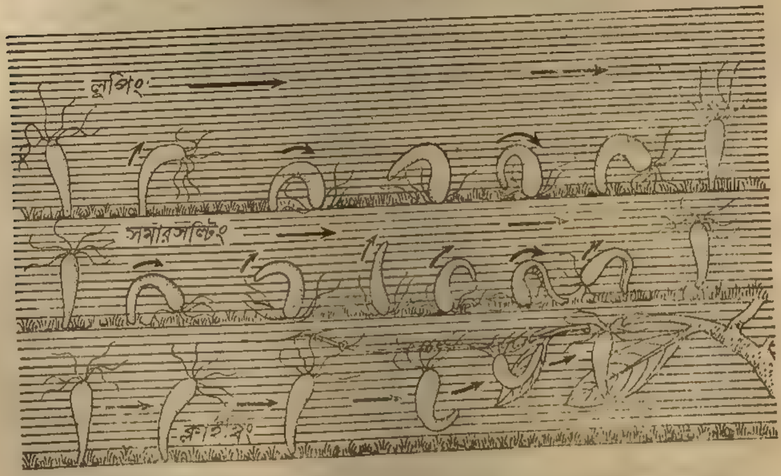

চিত্র 5.97 ঃ হাইড্রার বিভিন্ন গমন কৌশল।

মাছের গমন (Locomotion in Fish) ঃ মাছ প্রাথমিক জলচর মেরুদণ্ডী প্রাণী। জলের মধ্যে সাঁতার কেটে এরা চলাফেরা করে। দেহের পেশী ও

পাখনার (Fins) সাহায্যে এরা সাঁতার কাটে। জলের মধ্যে চলাফেরার সময় ঘর্ষণজনিত বাধা যথাসম্ভব কমানোর জন্য মাছেদের দেহটি মাকুর মত (Streamlined) হয়েছে অর্থাৎ দুদিক সরু ও মাঝখানটি চওড়া। সাঁতার কাটার সময়

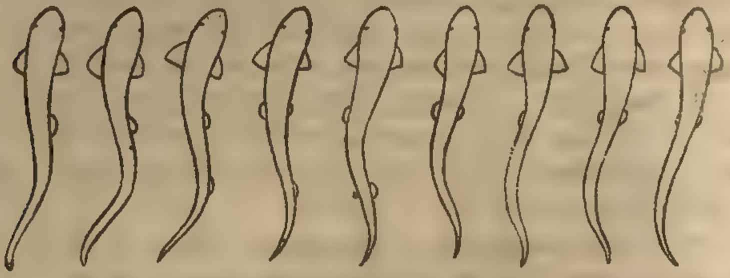

চিত্র 5.98 ঃ মাছের গমন পদ্ধতি।

পেশীর সক্রিয়তায় এদের দেহটি, বিশেষ করে দেহের পিছন দিকটি, পর্যায়ক্রমে একবার ডানদিকে ও একবার বামদিকে আন্দোলিত হতে থাকে। এর ফলে দেহটি জল কেটে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। লেজের পাখনাটি এই এগিয়ে চলার কাজে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে। **জোড় পাখনাগুলি** (Paired fins) জলের মধ্যে দেহটিকে আড়াআড়িভাবে (horizontally) রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া বক্ষ-পাখনা দুটি মাছকে জলের নিচের দিকে যেতে ও চলার দিক পরিবর্তন করতে এবং শ্রোণী-পাখনা দুটি মাছকে জলের উপর দিকে উঠতে সাহায্য করে। অস্থিবিশিষ্ট মাছেদের দেহে যে পটকা বা বায়ুস্থলী (swim bladder) আছে, তাও মাছকে জলের নিচের দিকে যেতে ও ভেসে উঠতে সাহায্য করে। এই পটকায় গ্যাসের পরিমাণ প্রয়োজন মত বাড়িয়ে মাছেরা দেহকে হালকা করে জলের উপর দিকে ভেসে ওঠে, আবার গ্যাসের পরিমাণ কমিয়ে জলের নিচের দিকে নেমে যায়।

C. পাখীর গমন (Locomotion of birds) ঃ পাখী আকাশে উড়ে বেড়ায়, আবার গাছের ডালে ও মাটিতেও চলাফেরা করে। কোন কোন পাখী জলে সাঁতার কেটেও বেড়ায়।

ডানার সাহায্যে পাখী আকাশে বিচরণ করে। পাখীর ডানা হল অগ্রপদের রূপান্তর। ডানা দুটি **হিউমারাস, রেডিয়াস** ও **আলনা**, দুটি ক্ষুদ্র **কারপাল**, দুটি লম্বা **কারপো-মেটাকারপাল** অস্থি নিয়ে গঠিত। লম্বা-লম্বা পালক এই অস্থিগুলিতে সাজানো থাকে। পালক হল পাখীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এদের সারা দেহই পালক দিয়ে ঢাকা থাকে। ডানার বড় পালকগুলিকে **রেমিজেস** (Remiges) এবং লেজের বড় পালকগুলিকে **রেকট্রিসেস** (Rectrices) বলে। পাখীর পালকসজ্জিত ডানা বিশ্রামকালে ভাঁজ হয়ে ইংরেজী 'Z' আকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং উড়ন্ত অবস্থায় ডানা প্রসারিত থাকে। প্রসারিত ডানার ছন্দোবদ্ধ সঞ্চালনের মাধ্যমে পাখী বাতাস কেটে বিভিন্ন গতিতে উড়ে বেড়াতে পারে। **পেক্টোরালিস মেজর, পেক্টোরালিস মাইনর** ও **কোরাকোব্রাকিয়ালিস** নামে তিনপ্রকার শক্তিশালী পেশীর দ্বারা ডানা সঞ্চালিত

হয় এবং পাখী আকাশে স্বচ্ছন্দে উড়তে পারে। পেশীগুলিকে ধারণ করার জন্য পাখীর **উরঃফলক** (Sternum) ও **উরশ্চক্র** (Pectoral girdle) খুবই সুদৃঢ় হয়। পাখীর লেজ বায়বীয় হাল বা রাডারের কাজ করে অর্থাৎ উড়ন্ত অবস্থায় লেজের পালকের ছন্দোবদ্ধ সঞ্চালনে পাখী সহজেই দিক পরিবর্তন ও ওঠা-নামা করতে পারে। গাছের ডাল বা দাঁড়ে বসা অবস্থায় লেজই দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে।

ঈগল, চিল প্রভৃতি পাখী উড়ন্ত অবস্থায় ডানা বিস্তৃত করে বায়ুতরঙ্গের সাহায্যে আকাশে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অনেকক্ষণ ভেসে থাকতে পারে, একে **সোরিং** (Soaring) বলে।

পেশীবহুল পশ্চাৎপদের উপর ভর দিয়ে পাখীরা ডাঙ্গায় চলা-ফেরা করে। প্রত্যেক পশ্চাৎপদে বাঁকানো নখরযুক্ত চারটি আঙ্গুল থাকে। এই আঙ্গুলগুলির তিনটি সামনের দিকে ও একটি পিছন দিকে বিস্তৃত থাকে। আঙ্গুলগুলি টেনডন দিয়ে শ্রোণীচক্রের সঙ্গে যুক্ত। এই আঙ্গুলগুলি মুড়ে এরা কোন গাছের ডালকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে।

জলে সন্তরণশীল পাখী, যেমন—হাঁসের পশ্চাৎপদের সামনের দিকে বিস্তৃত আঙ্গুলগুলি পাতলা পর্দা দিয়ে যুক্ত হয়ে **লিপ্তপদে** (Webbed foot) পরিণত হয়েছে। এই লিপ্তপদের সাহায্যে জলচর পাখী জল কেটে সাঁতার দেয়।

D. মানুষের গমন (Locomotion in Man)ঃ প্রাণিজগতে মানুষের মধ্যে এক আশ্চর্য গমন পদ্ধতি দেখা যায়। অন্যান্য চতুষ্পদী প্রাণী চলার কাজে চারটি পা ব্যবহার করে, কিন্তু মানুষ **দ্বি-পদী** (Bipedal) অর্থাৎ মানুষ চলার জন্য শুধু পশ্চাৎপদ দুটিকে ব্যবহার করে।

শৈশবকালে হামাগুড়ি দিয়ে চলার সময় অনেকটা চতুষ্পদ স্থলচর স্তন্যপায়ীর মত এদের বাহু ও পা দেহের ভার বহন করে। হামাগুড়ি দিয়ে চলার সময় একদিকের বাহু যখন ভূমি ত্যাগ করে সামনে এগিয়ে যায়, তখন অপর বাহু ও পায়ের হাঁটুর উপর দেহের ভারসাম্য এসে পড়ে। তারপর প্রসারিত বাহুটি ভূমি স্পর্শ করলে বিপরীত দিকের পা-টি অগ্রসর হয়। পর্যায়ক্রমে এরকম হতে থাকে ও শিশুটি এগিয়ে যায়।

চিত্র 5.99 ঃ গরিলা ও মানুষের কংকালের তুলনামূলক চিত্র।

গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাঙ-ওটাঙ প্রভৃতি প্রাণীরা দুপায়ে চলতে পারলেও মাঝে মাঝে এরা অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীর মত চারটি পা-কেই চলার কাজে ব্যবহার করে। কিন্তু

মানুষ শৈশবে হাঁটতে শেখার পর থেকে, অসুস্থতা ছাড়া, দু'পায়েই চলাফেরা করে। চলাফেরার কাজে ব্যবহৃত এই পা-দুটি মানুষের পশ্চাৎপদ। মানুষের পা-দুটি তার হাতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী লম্বা। এ ব্যাপারে গরিলা, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতির সঙ্গে মানুষের পার্থক্য আছে। উরু (Thigh) ও জঙ্ঘা (Shin) লম্বা হওয়ার ফলে গরিলা, শিম্পাঞ্জীর তুলনায় মানুষের পদক্ষেপ (Stride) দীর্ঘ হয়েছে অর্থাৎ একবার পদক্ষেপে মানুষ এদের তুলনায় বেশী পথ অতিক্রম করতে পারে। তাছাড়া, পায়ের তলাটি খিলানের (Arch) মত কিছুটা বাঁকা হওয়ায়, পায়ের তলা মাটির সঙ্গে ঘর্ষণজনিত বাধা রোধ করতে সক্ষম। দু'পায়ে চলার জন্য মানুষ খাড়াভাবে দাঁড়াতে পারে। গমন পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের মাথাটি কঙ্কালের উপর এমনভাবে অবস্থিত যাতে চলার সময় সোজাসুজি দৃষ্টিপাত করা সম্ভব হয়।

চলার সময় মানুষ এক পায়ের উপর দেহের ভার রেখে অপর পা-কে মাটি থেকে তুলে সামনের দিকে নতুন জায়গায় স্থাপন করে। পরে একইভাবে পিছনের পা-কে এগিয়ে আনে। পর্যায়ক্রমে এরূপ ঘটনা ঘটার ফলে গমন সম্ভব হয়। গমনের সময় যে পা-টিকে সামনের দিকে বাড়ানো হয়, তার গোড়ালি অংশ প্রথমে মাটি স্পর্শ করে—বাকী অংশ পরে মাটির সংস্পর্শে আসে। **চলার সময় পায়ের সঞ্চালনের সঙ্গে হাতেরও সঞ্চালন ঘটে—এতে দেহের ভারসাম্য বজায় থাকে।**

চলা ও দৌড়ানোর কৌশল প্রায় একই। তবে দৌড়ানোর সময় গোড়ালি অংশ মাটি স্পর্শ করে না এবং সামনের পা মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনের পা মাটি ত্যাগ করে এগিয়ে যায়।

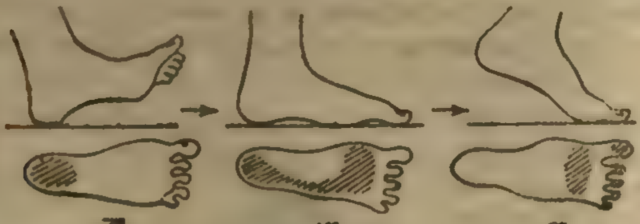

চিত্র 5.100 : মানুষের চলনকালে মাটিতে পায়ের অবস্থান দেখানো হয়েছে। পদক্ষেপের সময় যখন যেখানে চাপ পড়ে পদচিহ্নের ছবিতে তা দাগ দিয়ে দেখানো হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, মানুষের গমনে বিশেষভাবে সাহায্য করে **পেশী-কঙ্কালতন্ত্র** (Musculo-skeletal system)। কঙ্কাল ও কঙ্কাল-সংলগ্ন পেশীগুলি একত্রে পেশী-কঙ্কালতন্ত্র গঠন করে। কঙ্কাল-সংলগ্ন পেশীর (Skeletal muscles or Voluntary muscles) সঙ্কোচন (contraction) ও শ্লথনের (relaxation) ফলে অস্থিগুলির সঞ্চালন (movement) ঘটে। আবার অস্থিগুলির সঞ্চালন সম্ভব হয় বিভিন্ন অস্থির সংযোগস্থলে **সচল অস্থিসন্ধি** (Movable Bone-joints) থাকার ফলে। মানুষের নিতম্ব অঞ্চলে উরুর অস্থি এবং

এবং শ্রোণীচক্রের (Pelvic girdle) অস্থিগুলির মধ্যে এই রকম সচল সন্ধি আছে; আবার হাঁটুতে উরুর ও জঙ্ঘার অস্থিগুলির মধ্যেও সচল সন্ধি সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের গমনের সময় গমন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটে ঐ সব অঙ্গের সঙ্গে যুক্ত কতিপয় পেশীর সঙ্কোচন ও কতিপয় পেশীর প্রসারণের ফলে। যে পেশীগুলির সঙ্কোচনে একই অঙ্গের দুটি অস্থির মধ্যে দূরত্ব কমে অঙ্গটি ভাঁজ হয়, তাদের ফ্লেক্সর পেশী (Flexor muscle) বলে; যথা—উরুর পিছন দিকে অবস্থিত বাইসেপস ফেমোরিস (Biceps femoris) পেশী এবং জঙ্ঘার পিছন দিকে অবস্থিত গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস (Gastrocnemius) পেশী। এই পেশীগুলির সঙ্কোচনে হাঁটুটি ভাঁজ হয়। অপরপক্ষে, যে পেশীগুলির সঙ্কোচনে দুটি অস্থির মধ্যে দূরত্ব বেড়ে অঙ্গটি সোজা হয়, তাদের **এক্সটেনসর পেশী** (Extensor muscle) বলে; যথা—উরুর সামনের দিকে অবস্থিত রেক্টাস ফেমোরিস (Rectus femoris) পেশী। এই পেশীর সঙ্কোচনে ভাঁজ হওয়া হাঁটু সোজা হয়।

● মানুষের দ্বিপদ গমন পদ্ধতি দেখা যায়।

মানুষের গমন অঙ্গ বা পায়ের পেশীগুলির এবং শ্রোণীচক্রের সঙ্গে যুক্ত পেশীগুলির সুসমঞ্জস সঙ্কোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে পায়ের অস্থিগুলির সঞ্চালন ঘটার ফলে গমন সম্ভব হয়।

কতিপয় প্রাণীর গমন অঙ্গের নাম ও গমন কৌশল :

প্রাণীর নাম	গমন অঙ্গ	গমন কৌশল
অ্যামিবা	ক্ষণপদ	অ্যামিবয়েড গমন।
প্যারামিসিয়াম	সিলিয়া	সিলিয়ারী গমন।
হাইড্রা	কর্ষিকা	লুপিং, সমারসল্টিং, সন্তরণ, হামাগুড়ি দিয়ে চলা, আরোহণ ইত্যাদি।
কেঁচো	সিটা	ক্রিপিং গমন।
আরশোলা	পদ ও ডানা	হাঁটা ও উড্ডয়ন।
চিংড়ি	পদ ও উদর উপাঙ্গ	হাঁটা ও সন্তরণ।
তারামাছ	নালিকা পদ বা টিউব ফুট	মন্থর গতিতে গমন।
জলচর শামুক	মাংসল পদ	গ্লাইডিং চলন।
রুই মাছ	রশ্মিযুক্ত পাখনা (2টি যুগ্ম এবং 3টি অযুগ্ম)	সন্তরণ।
কুনো ব্যাঙ	পদ	লাফিয়ে চলা।
পায়রা	ডানা ও পদ	উড্ডয়ন ও হাঁটা।
মানুষ	পদ ও হাত	হাঁটা, দৌড়ান ইত্যাদি।

I. জনন (Reproduction)

5.78. ভূমিকা (Introduction)

প্রতিটি জীবেরই একটি নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল আছে, যারপর তার মৃত্যু হয়। নির্দিষ্ট জীবের এই আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট। কিন্তু মৃত্যুর আগে পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় পৌঁছে প্রত্যেক জীব তার নিজের দেহ বা দেহাংশ থেকে নতুন জীবের অর্থাৎ বংশধরের সৃষ্টি করে। কোন জীবের দেহ বা দেহাংশ থেকে নতুন জীব সৃষ্টির এই ঘটনাকে **জনন** বলে। জননের ফলে সৃষ্ট নতুন জীবকে **অপত্য জীব** (Offspring) এবং যে জীবদেহ থেকে অপত্য জীব উৎপন্ন হয়, তাকে **জনিতৃ জীব** (Parent) বলে। জননের মাধ্যমে জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য (Genetic character) তার বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং এর ফলে প্রকরণ (Variation) সৃষ্টি হতে পারে, যা জীব বিবর্তনের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

সংজ্ঞা (Definition)

যে পদ্ধতিতে জীব নিজের দেহ বা দেহাংশ থেকে আপন সদৃশ অপত্য জীব সৃষ্টি করে, তাকে জনন (Reproduction) বলে।

5.79. জননের গুরুত্ব (Importance of reproduction)

পুষ্টি, শ্বসন, রেচন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজগুলি প্রতিটি জীবের বেঁচে থাকার জন্য যেমন প্রয়োজন, জনন ক্রিয়া তেমন নয়। জননতন্ত্র (Reproductive system) ব্যতীত কোন একটি জীব বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু কোন একটি প্রজাতির সকল জীবের জননতন্ত্র একসঙ্গে অকেজো হয়ে গেলে, ঐ প্রজাতির অবলুপ্তি কোনভাবেই রোধ করা যাবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নিজের প্রয়োজনে নয়, প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার বৃহত্তর প্রয়োজনে উদ্ভব হয়েছে জননক্রিয়ার। জননক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি জীবের প্রজাতি পৃথিবীর বুকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়।

5.80. জননের প্রকারভেদ (Types of reproduction)

জীবজগতে জনন পদ্ধতি প্রধানত দু প্রকার—(i) **অযৌন জনন** (Asexual reproduction) এবং (ii) **যৌন জনন** (Sexual reproduction)।

(i) **অযৌন জনন ঃ** এই পদ্ধতিতে জীবের দেহের যে কোন অংশ থেকেই নতুন জীবের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও অনেক নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে এ ধরনের জনন লক্ষ্য করা যায়।

(ii) **যৌন জনন ঃ** এই পদ্ধতিতে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির জননকোষ বা গ্যামেটের মিলনের ফলে জীনগত পুনঃসংযোগের (genetic recombination) মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত অপত্য জীবের সৃষ্টি হয়। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীরা এই পদ্ধতিতে জননক্রিয়া সম্পন্ন করে।

এছাড়া উদ্ভিদের **অঙ্গজ জনন** (Vegetative reproduction), উদ্ভিদ ও প্রাণীদের **অপুংজনি** (Parthenogenesis) প্রভৃতি ধরনের জনন ক্রিয়ার মাধ্যমেও জীবের বংশবিস্তার হয়।

5.81. অযৌন ও যৌন জননের মধ্যে পার্থক্য (Differences between asexual and sexual reproduction)

অযৌন জনন	যৌন জনন
1. গ্যামেট বা জননকোষের অংশগ্রহণ ব্যতীত জনন সম্পন্ন হলে, তাকে অযৌন জনন বলে।	1. দুটি গ্যামেটের মিলনের দ্বারা অথবা একটিমাত্র গ্যামেটের (স্ত্রী-গ্যামেট) সক্রিয়তার ফলে যে জনন সম্পন্ন হয়, তাকে যৌন জনন বলে। শেষোক্ত ক্ষেত্রের যৌন জননের নাম অপুংজনি। অর্থাৎ গ্যামেটের অংশগ্রহণ ব্যতীত যৌন জনন হয় না।
2. অযৌন জনন নিম্নশ্রেণীর জীবের বৈশিষ্ট্য।	2. যৌন জনন উচ্চশ্রেণীর জীবের বৈশিষ্ট্য। কিছু কিছু নিম্নশ্রেণীর জীবেও যৌন জননের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তবে তা খুবই সরল প্রকৃতির।
3. অযৌন জনন সরল প্রক্রিয়া।	3. যৌন জনন জটিল প্রক্রিয়া।
4. অপত্য জীবের সংখ্যা যৌন জননের তুলনায় বেশী হয়।	4. অপত্য জীবের সংখ্যা অযৌন জননের তুলনায় কম হয়।
5. এই প্রক্রিয়ায় একটিমাত্র জীবের প্রয়োজন।	5. এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত ভিন্ন যৌনস্বের দুটি জীবের প্রয়োজন। তবে উভলিঙ্গ জীবের ক্ষেত্রে একই জীবদেহে ভিন্ন যৌনস্বের জনন-কোষ বা গ্যামেট উৎপন্ন হয় বলে, কোন কোন ক্ষেত্রে, দুটি জীবের প্রয়োজন হয় না।
6. অযৌন জননের মাধ্যমে সৃষ্ট অপত্য জীবের জীনগত সংযুতির কোন পরিবর্তন হয় না।	6. যৌন জননের মাধ্যমে সৃষ্ট অপত্য জীবে জীনগত পুনঃসংযোগ ঘটে, ফলে অপত্য জীব নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে থাকে।
7. অযৌন জনন জৈব অভিব্যক্তির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে না।	7. যৌন জনন জৈব অভিব্যক্তির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।
8. এই প্রক্রিয়ায় দ্রুত ও অপেক্ষাকৃত বেশী সাফল্যের সঙ্গে বংশবিস্তার সম্ভব।	8. এই প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তারে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে। তদুপরি এর সাফল্যও সুনিশ্চিত নয়।

অযৌন জনন	যৌন জনন
9. পারিপার্শ্বিক অবস্থার হঠাৎ কোন বড় রকমের পরিবর্তন হলে, অযৌন জননকারী জীব ঐ পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না, ফলে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়।	9. এই প্রক্রিয়ায় জীনগত পুনঃসংযোগের মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীব সৃষ্টি হয় বলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হলেও যৌন জননকারী জীব ঐ পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। ফলে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়।

5.82. উদ্ভিদের জনন (Reproduction in Plants)

উদ্ভিদের জনন প্রক্রিয়া তিন প্রকার, যথা—(A) **অঙ্গজ জনন** (Vegetative reproduction), (B) **অযৌন জনন** (Asexual reproduction) এবং (C) **যৌন জনন** (Sexual reproduction)।

A. **অঙ্গজ জনন :** যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহের কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অপত্য উদ্ভিদ সৃষ্টি করে, তাকে **অঙ্গজ জনন** বলে। অঙ্গজ জননকে প্রধানত (a) **প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন** (Natural vegetative reproduction) এবং (b) **কৃত্রিম অঙ্গজ জনন** (Artificial vegetative reproduction)—এই দুভাগে ভাগ করা হয়।

(a) **প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন :** প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন আবার বিভিন্ন রকমের হতে পারে, যেমন—

(i) **কোরোকোদ্গম** (Budding) : অনুকূল পরিবেশে ঈস্ট নামক এককোষী ছত্রাকের দেহের কোন একটি অংশ স্ফীত হয়ে ওঠে এবং ঐ স্ফীত অংশে সাইটোপ্লাজম-সহ নিউক্লিয়াসের একটি খণ্ড প্রবেশ করে। স্ফীত অংশটি বড় হলে, তাকে **কোরক** (Bud) বলে। কোরক পরে জনিতৃ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে। এই প্রক্রিয়াকে **কোরোকোদ্গম** বলে।

(ii) **খণ্ডীভবন** (Fragmentation) : কোন কোন অনুসূত্রাকার শৈবাল, যেমন—স্পাইরোগাইরা, অনুসূত্রাকার ছত্রাক, যেমন—মিউকর প্রভৃতির দেহ একাধিক খণ্ডে পরিণত হলে প্রতিটি খণ্ড কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়ে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। মস ও ফার্ণ বর্গের উদ্ভিদেও এই ধরনের জনন দেখা যায়।

(iii) **বিভাজন** (Fission) : ব্যাকটিরিয়া, ঈস্ট প্রভৃতি এককোষী উদ্ভিদে জনিতৃ কোষের নিউক্লিয়াসটি প্রথমে মাইটোসিস পদ্ধতিতে দু ভাগে ভাগ হয় ; পরে উক্ত কোষের সাইটোপ্লাজম দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে একটি করে অপত্য নিউক্লিয়াস-সহ দুটি আলাদা কোষে পরিণত হয়। পূর্ণতা প্রাপ্তির পর উক্ত কোষ-দুটি দুটি অপত্য উদ্ভিদে পরিণত হয়।

(iv) **বুলবিল** (Bulbil) : চুপড়ি আলু, খামআলু প্রভৃতি গাছের কাক্ষিক মুকুল রূপান্তরিত হয়ে গোল স্ফীত বুলবিলে পরিণত হয়। গাছ থেকে মাটিতে

খসে পড়লে বুলবিল থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়। রসুন গাছের পুষ্পমুকুলও বুলবিলে রূপান্তরিত হয় এবং মাটির সংস্পর্শে এসে নতুন গাছের জন্ম দেয়।

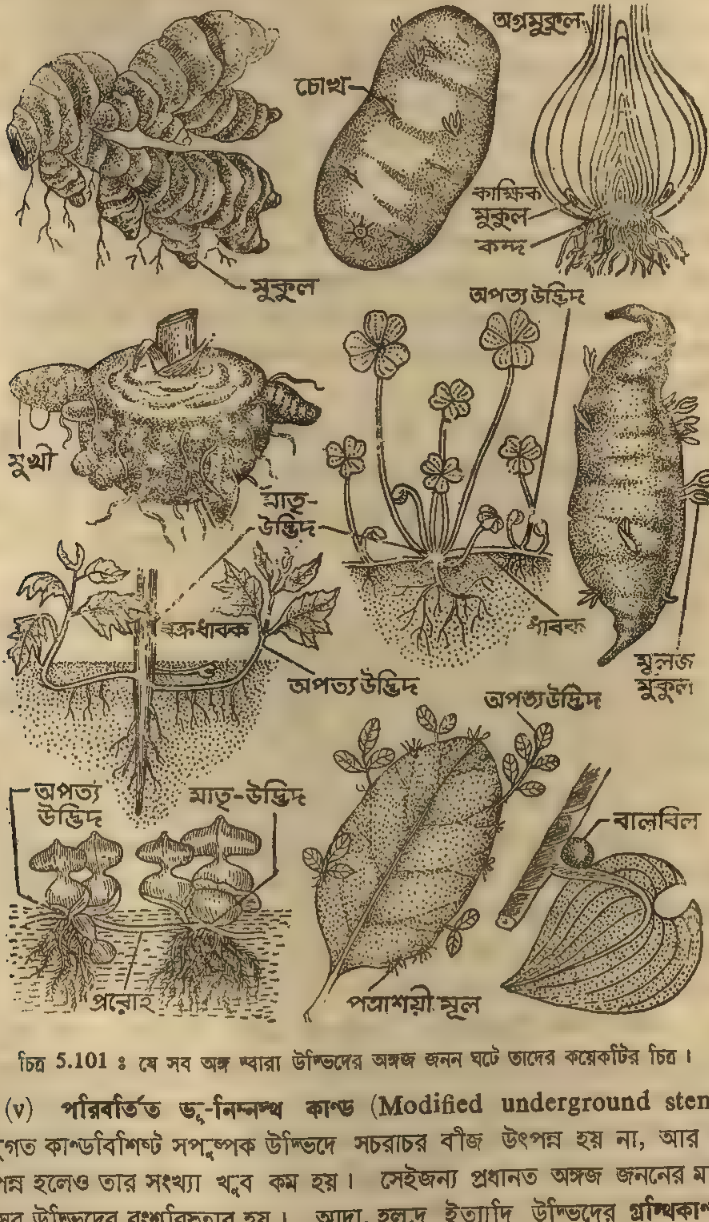

চিত্র 5.101 ঃ যে সব অঙ্গ দ্বারা উদ্ভিদের অঙ্গজ জনন ঘটে তাদের কয়েকটির চিত্র।

(v) **পরিবর্তিত ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড** (Modified underground stems) ঃ মৃদ্গত কাণ্ডবিশিষ্ট সপুষ্পক উদ্ভিদে সচরাচর বীজ উৎপন্ন হয় না, আর বীজ উৎপন্ন হলেও তার সংখ্যা খুব কম হয়। সেইজন্য প্রধানত অঙ্গজ জননের মাধ্যমে এইসব উদ্ভিদের বংশবিস্তার হয়। আদা, হলুদ ইত্যাদি উদ্ভিদের **গ্রন্থিকাণ্ড** বা

রাইজোম (Rhizome), পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি উদ্ভিদের **কন্দ** বা **বাল্ব** (Bulb), আলু উদ্ভিদের **স্ফীতকন্দ** বা **টিউবার** (Tuber) এবং ওল উদ্ভিদের **গুঁড়িকন্দ** বা **করম** (Corm) নামক ভূ-নিম্নস্থ পরিবর্তিত কাণ্ডের মাধ্যমে অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার ঘটে।

(vi) **পরিবর্তিত অর্ধ-বায়ব কাণ্ড** (Modified sub-aerial stems)ঃ অনেক উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের কাণ্ডকে **অর্ধ-বায়ব কাণ্ড** বলে। এইসব পরিবর্তিত কাণ্ডের পর্ব থেকে অস্থানিক মূল বের হয়ে মাটিতে প্রবেশ করে এবং এদের কাক্ষিক মুকুল বৃদ্ধি পেলে পর্বমধ্য বিনষ্ট হয়। পর্বস্থিত মুকুল থেকে নতুন শাখা-প্রশাখা সম্বলিত গাছ উৎপন্ন হয়। আমরুল, থানকুনি, দূর্বাঘাস প্রভৃতি **ধাবক** বা **রানার** (Runner), স্ট্রবেরি, কচু, মেন্থা প্রভৃতি উদ্ভিদ **তোরণধাবক** বা **বক্রধাবক** বা **স্টোলন** (Stolon), কচুরিপানা **প্ররোহ** বা **হ্রস্বধাবক** বা **অফসেট** (Offset) এবং চন্দ্রমল্লিকা উদ্ভিদ **বক্রধাবক** বা **ঊর্ধ্বধাবক** বা **সাকার** (Sucker) নামক পরিবর্তিত অর্ধ-বায়ব কাণ্ডের মাধ্যমে অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে।

(vii) **অস্থানিক মুকুল বা কুঁড়ি** (Adventitious buds)ঃ পাথরকুচি গাছের পাতা গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিজা মাটির সংস্পর্শে এলে পাতার কিনারার প্রতিটি খাঁজ থেকে অস্থানিক মুকুল তৈরি হয়। এই মুকুলগুলি বৃদ্ধি পেয়ে নতুন গাছ উৎপন্ন হয় এবং পাতাটি বিনষ্ট হলে প্রতিটি চারাগাছ স্বাধীনভাবে বৃদ্ধি পায়।

পটল, ইপিকাক প্রভৃতি গাছের মূলে উৎপন্ন অস্থানিক মুকুল এবং আনারসের পুষ্পমঞ্জরীর গোড়ায় উৎপন্ন মুকুল থেকে নতুন গাছ জন্মায়।

(viii) **মূল** (Roots)ঃ রাঙা আলু, ডালিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদের **কন্দাল মূল** (Tuberous root) থেকে অস্থানিক মুকুল সৃষ্টি হয়। এই মুকুলগুলিকে **মূলজ মুকুল** বলে। এই মুকুলগুলির নিচের দিক থেকে অস্থানিক মূল বের হয়। এই মুকুলগুলি থেকে উপযুক্ত পরিবেশে নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

(b) **কৃত্রিম অঙ্গজ জনন**ঃ কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদের কোন অঙ্গকে বিশেষ পদ্ধতিতে উদ্ভিদদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ঐ বিচ্ছিন্ন অঙ্গ থেকে অপত্য উদ্ভিদের সৃষ্টি করা যায়। কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদ অঙ্গের সাহায্যে বংশবিস্তার ঘটানোর এই পদ্ধতিকে **কলম** (Cutting) উৎপাদন বলে। নিচে বিভিন্ন ধরনের কলম উৎপাদন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

(i) **শাখা কলম** (Cutting)ঃ গোলাপ, জবা, স্থলপদ্ম, সজনে প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ড বা শাখার উপযুক্ত অংশ কেটে ভিজা মাটিতে (সাধারণত বর্ষাকালে) রোপণ করলে কিছুদিন পর কাণ্ডের মাটি সংলগ্ন পর্ব থেকে অস্থানিক মূল বের হয়ে কাণ্ডটি নতুন উদ্ভিদে পরিণত হয়। প্রয়োজন বোধে কাণ্ডের কাটা অংশে অক্সিন প্রয়োগ করলে অস্থানিক মূল সৃষ্টি তরান্বিত হয়। উদ্ভিদের শাখা থেকে এই পদ্ধতিতে তৈরি কলমকে **শাখা কলম** বলে।

(ii) **দাবা কলম** (Layering) : যে সব গাছে সাধারণত শাখা কলম হয় না সে সব গাছের কোন শাখাকে মাটির নিচে দাবিয়ে শাখাটির একটি পর্ব সার-মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় এবং মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে ঐ স্থানের মাটি ভিজা রাখা হয়। কিছুদিন পর ঐ পর্ব থেকে অস্থানিক মূল বের হলে, শাখাটিকে মূলসহ জনিতৃ গাছ থেকে সাবধানে কেটে মাটিতে রোপণ করলে অপত্য গাছের সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতিতে তৈরি কলমকে **দাবা কলম** বলে।

(iii) **গুটি কলম** (Gootee) : পেয়ারা, আম, লেবু, তেজপাতা প্রভৃতি গাছের কোন উপযুক্ত শাখার কিছু পরিমাণ অংশের বল্কল বা ছাল তুলে ঐ জায়গায় সার-মাটি দিয়ে ঢেকে বেঁধে রাখতে হয়। কোন মাটির পাত্রের তলায় ছোট ফুটো করে ফোঁটা ফোঁটা জল দিয়ে সার-মাটিকে সব সময় ভিজা রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। দু-এক মাসের মধ্যে ঐ ছাল ছাড়ানো অংশ থেকে অস্থানিক মূল বের হয়। মূলসহ ঐ শাখাটিকে জনিতৃ উদ্ভিদ থেকে সাবধানে কেটে মাটিতে রোপণ করলে ঐ অংশটি অপত্য উদ্ভিদে পরিণত হয়। এই পদ্ধতিতে তৈরি কলমকে **গুটি কলম** বলে।

(iv) **জোড় কলম** (Grafting) : এই পদ্ধতিতে কলম তৈরি করতে দুটি জনিতৃ উদ্ভিদের প্রয়োজন। উপযুক্ত গাছের কোন একটি ছোট শাখা সমগোত্রীয় অন্য কোন গাছের মূলসহ কাণ্ডের সঙ্গে তির্যকভাবে কেটে বিশেষ উপায়ে জুড়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে দুটি অংশেরই পরিধি একই মাপের হলে ভাল হয়। যে অংশটি

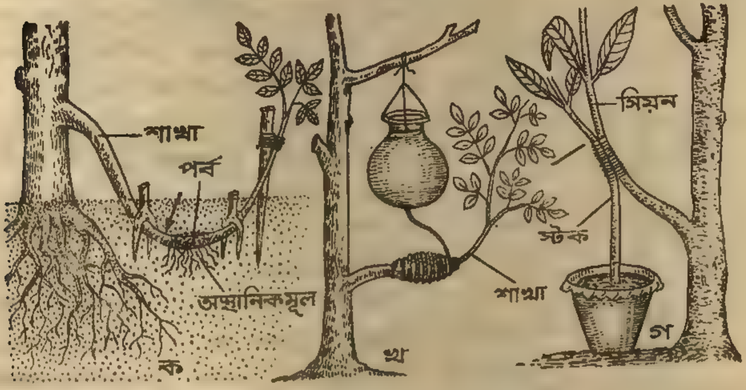

চিত্র 5.102 : উদ্ভিদের কলম করার পদ্ধতি।
(ক) দাবা কলম, (খ) গুটি কলম, (গ) জোড় কলম।

জোড়া হয়, তাকে **সিয়ন** (Scion) এবং যে অংশের সঙ্গে জোড়া হয়, তাকে **স্টক** (Stock) বলে। **স্টক ও সিয়ন**—এই দুটি অংশকে এমনভাবে জোড়া দিতে হয়, যাতে উভয়ের ভাজক কলা পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। কিছুদিন পর স্টক ও সিয়ন জুড়ে গিয়ে নতুন অপত্য উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। সিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে নতুন উদ্ভিদে পরিণত হয় বলে অপত্য উদ্ভিদে সিয়নের বৈশিষ্ট্যগুলিই প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন জাতের

আম, লেবু, লিচু প্রভৃতি গাছে জোড় কলমের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে অঙ্গজ জনন ঘটানো হয়।

B. অযৌন জনন ঃ জননকোষ বা গ্যামেটের মিলন ছাড়া কোন জনন হলে, তাকে **অযৌন জনন** বলে। অযৌন জননে একটিমাত্র জনিতৃ জীব অংশগ্রহণ করে। অঙ্গজ জনন অযৌন জননের অন্তর্গত, তবে অঙ্গজ জননে দেহের অংশবিশেষ সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু অযৌন জননে বিশেষ পদ্ধতিতে **রেণু** (Spore) উৎপন্ন হয়ে অথবা কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বংশবিস্তার হয়। রেণু অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন জীবের সৃষ্টি হয়। সুতরাং **অযৌন জননের একক হল রেণু** (Spore)। রেণু বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং অযৌন জননও বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে।

(i) **দ্বি-বিভাজন** (Binary fission) ঃ ঈস্ট (ছত্রাক), ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর এককোষী উদ্ভিদে এই পদ্ধতিতে জনন ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় জনিতৃ কোষের নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস পদ্ধতিতে দুভাগে বিভক্ত হয় এবং পরে কোষের সাইটোপ্লাজম দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক কোষের সৃষ্টি হয়। উৎপন্ন কোষ দুটি বৃদ্ধির ফলে পরিপূর্ণতা লাভ করে ; ফলে দুটি স্বনির্ভর জীবের সৃষ্টি হয়।

চিত্র 5.103 ঃ ছত্রাকের রেণুস্থলী থেকে চলরেণুর নির্গমন।

(ii) **বহু-বিভাজন** (Multiple fission) এবং **স্পোর উৎপাদন** (Spore formation) ঃ প্রতিকূল পরিবেশে এককোষী উদ্ভিদে জনিতৃ কোষের নিউক্লিয়াসটি বার বার বিভাজিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে এবং এই নিউক্লিয়াসের খন্ডগুলি কিছু পরিমাণ সাইটোপ্লাজম গ্রহণ করে অসংখ্য ছোট ছোট কোষ উৎপন্ন করে। এই কোষগুলিকে **রেণু** বা **স্পোর** (Spore) বলে। অনুকূল পরিবেশে রেণুগুলি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন নতুন অপত্য জীবের সৃষ্টি করে। উদাহরণ—ঈস্ট, ক্ল্যামাইডোমোনাস, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি।

রেণু যে থলির মত অংশে উৎপন্ন হয়, তাকে **রেণুস্থলী** (Sporangium) বলে। রেণু সাধারণত এককোষী, নগ্ন অথবা প্রাচীরযুক্ত হয়। অনেক ছত্রাক এবং জলজ শৈবালের রেণুতে এক বা একাধিক **সিলিয়া** থাকে (একবচন=সিলিয়াম) এবং এরা সিলিয়ার সাহায্যে জলে চলাফেরা করতে পারে। এইসব রেণুকে **চলরেণু** বা **জুস্পোর** (Zoospore) বলে। চলরেণুতে কোন কোষপ্রাচীর থাকে না। চলরেণু যে থলির ভিতর উৎপন্ন হয়, তাকে **চলরেণুস্থলী** বা **জুস্পোরেনজিয়াম** (Zoosporangium) বলে। রেণুতে যখন কোন সিলিয়াম থাকে না, তখন তাকে **অচলরেণু** বলে। অচলরেণুকে **অ্যাপ্লানোস্পোর** (Aplanospore) বলে। কিছু কিছু শৈবাল,

ছত্রাক, মস, ফার্ণ প্রভৃতিতে অচলরেণু উৎপন্ন হয়। শৈবাল, ছত্রাক প্রভৃতি উদ্ভিদে রেণু সৃষ্টি হয় 'লিঙ্গধর উদ্ভিদে' (Gametophyte) এবং মস, ফার্ণ প্রভৃতি উদ্ভিদে রেণু সৃষ্টি হয় 'রেণুধর উদ্ভিদে' (Sporophyte)। উদ্ভিদের রেণুস্থলীতে একই ধরনের রেণু সৃষ্টি হলে, রেণুগুলিকে **সমরেণু** (Homospore) এবং দু ধরনের রেণু সৃষ্টি হলে, রেণুগুলিকে **অসমরেণু** (Heterospore) বলে। যে সব উদ্ভিদে সমরেণু উৎপন্ন হয়, তাদের **সমরেণুপ্রসূ** (Homosporous) উদ্ভিদ এবং যে সব উদ্ভিদে অসমরেণু উৎপন্ন হয়, তাদের **অসমরেণুপ্রসূ** (Heterosporous) উদ্ভিদ বলে। অসমরেণুর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় রেণুগুলিকে **ম্যাক্রোস্পোর** (Macrospore) এবং অপেক্ষাকৃত ছোট রেণুগুলিকে **মাইক্রোস্পোর** (Microspore) বলে। এই রেণুগুলি অঙ্কুরিত হলে অপত্য উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

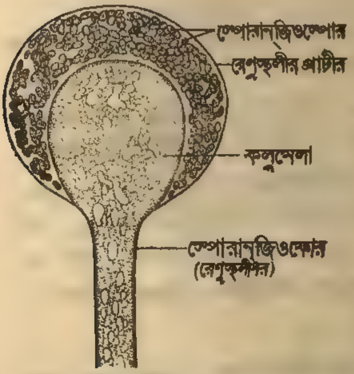

চিত্র 5.104 : মিউকরের কলুমেলা ও স্পোরানজিওফোর সহ রেণুস্থলী।

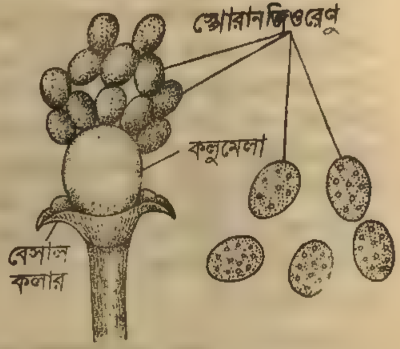

চিত্র 5.105 : মিউকরের স্পোরানজিওরেণুর (অচলরেণু) নির্গমন।

(C) **যৌন জনন :** যে জনন পদ্ধতিতে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির নিউক্লিয়াস বা জননকোষের মিলন ঘটে এবং জীনগত পুনঃসংযোগের মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্টযুক্ত অপত্য সৃষ্টি হয়, তাকে **যৌন জনন** বলে। জননকোষ বা গ্যামেট হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোমবিশিষ্ট (n) হয়। যৌন জননে অংশগ্রহণকারী বিপরীত প্রকৃতির গ্যামেট-দুটির মধ্যে একটিকে **পুং-গ্যামেট** এবং অপরটিকে **স্ত্রী-গ্যামেট** বলে। নিম্নশ্রেণীর কিছু সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ, যেমন—মিউকরের ক্ষেত্রে যৌন জননে অংশগ্রহণকারী গ্যামেট দুটিকে বাহ্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথক করা যায় না, অর্থাৎ পুং বা স্ত্রী গ্যামেট আলাদা করে চেনা যায় না, অথচ শারীরবৃত্তীয় আচরণে তারা পরস্পর বিপরীত প্রকৃতির। এক্ষেত্রে গ্যামেট দুটিকে পুং বা স্ত্রী না বলে যথাক্রমে '−' এবং '+' চিহ্ন (Strain) দিয়ে বোঝানো হয়। দুটি ভিন্ন যৌন প্রকৃতির গ্যামেট পরস্পর মিলিত হয়ে যে কোষের সৃষ্টি করে, তাকে **ভ্রূণাণু** বা **জাইগোট** (Zygote) বলে। জাইগোট ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোমবিশিষ্ট (2n)। এই জাইগোট সৃষ্টির মাধ্যমেই **ডিপ্লয়েড জনু** (Diploid generation) বা

স্পোরোফাইটীয় জনুর (Sporophytic generation) সূচনা হয়। ব্যাকটিরিয়ার যৌন জননে দাতার আংশিক জীনগত প্রজনন বস্তু (Genetic material) গ্রহীতার প্রজনন বস্তুর সঙ্গে মিলিত হয়ে আংশিক ডিপ্লয়েড (Partial diploid) কোষ উৎপন্ন হয় বলে, ব্যাকটিরিয়ার যৌন জননকে **জীনগত প্রজনন বস্তুর পুনঃসংযোগ** (Genetic recombination) বলাই শ্রেয়। পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদটি হ্যাপ্লয়েড বা লিঙ্গধর হলে ডিপ্লয়েড জাইগোট নিউক্লিয়াসটি মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে হ্যাপ্লয়েড রেণু উৎপন্ন করে। ঐ রেণু অনুকূল পরিবেশে জাইগোট প্রাচীর বিদীর্ণ করে বাইরে নির্গত হয় এবং ক্রমে অঙ্কুরিত হয়ে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদে পরিণত হয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদটি ডিপ্লয়েড বা রেণুধর হলে, জাইগোট নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় পুনঃ পুনঃ বিভাজিত হয়ে প্রথমে **ভ্রূণে** (Embryo) এবং পরে ভ্রূণ অনুকূল পরিবেশে **পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে** পরিণত হয়।

যৌন জনন প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার একটি কৌশল মাত্র। এই প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জীবন চক্রকে দীর্ঘতর করে। পরিণত রেণুধর উদ্ভিদের জনন-অঙ্গে ডিপ্লয়েড রেণু-মাতৃকোষ মায়োসিস প্রক্রিয়ায় হ্যাপ্লয়েড রেণু উৎপন্ন করে। উদ্ভিদে রেণু সৃষ্টি থেকেই **লিঙ্গধর জনু** বা **গ্যামেটোফাইটিক জনু** (Gametophytic generation) শুরু হয়। এভাবে উদ্ভিদের জীবন চক্র (Life cycle) লিঙ্গধর জনু থেকে রেণুধর জনু এবং পুনরায় রেণুধর জনু থেকে লিঙ্গধর জনুতে আবর্তিত হয়। উদ্ভিদের জীবন চক্রে এই দুটি জনুর পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে উদ্ভিদের **জনুক্রম** (Alternation of generations) বলে।

জননকোষ উদ্ভিদের **জননকোষস্থলী** বা **গ্যামেটানজিয়াম** (Gametangium) থেকে উৎপন্ন হয় এবং এই জননকোষের অধিকাংশেরই কোষপ্রাচীর থাকে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কোষপ্রাচীর থাকে না। এরা ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট বা ফ্ল্যাজেলাবিহীন হতে পারে। ফ্ল্যাজেলাযুক্ত জননকোষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচল করতে পারে, এদের **সচল জননকোষ** বা **প্ল্যানোগ্যামেট** (Planogamete) বলে। ফ্ল্যাজেলাবিহীন জননকোষ চলাচল করতে পারে না, এদের **অচল জননকোষ** বা **অ্যাপ্ল্যানোগ্যামেট** (Aplanogamete) বলে।

উদ্ভিদদেহের যে স্থলীবৎ অংশে পুং-জননকোষ বা শুক্রাণু (Antherozoids or Spermatozoids) উৎপন্ন হয়, তাকে **পুংধানী** বা **অ্যান্থেরিডিয়াম** (Antheridium) (বহুবচন=অ্যান্থেরিডিয়া) এবং যে স্থলীবৎ অংশে স্ত্রী-জননকোষ বা **ডিম্বাণু** (Egg or ovum) উৎপন্ন হয়, তাকে **স্ত্রীধানী** বা **উগোনিয়াম** (Oogonium) (বহুবচন=উগোনিয়া) বলে। যে সব উদ্ভিদে পুং ও স্ত্রী উভয় প্রকার জনন-অঙ্গ থাকে, তাদের **সহবাসী** বা **উভলিঙ্গ** (Monoecious or Bisexual) উদ্ভিদ বলে, আর যে সব উদ্ভিদে পুং ও স্ত্রী যে কোন একপ্রকার জনন-অঙ্গ থাকে, তাদের **ভিন্নবাসী** বা **একলিঙ্গ** (Dioecious) উদ্ভিদ বলে। আম, জাম প্রভৃতি উভলিঙ্গ উদ্ভিদ এবং তাল, পেঁপে প্রভৃতি একলিঙ্গ উদ্ভিদের উদাহরণ।

যৌন জনন নিম্নলিখিত কয়েক ধরনের হতে পারে ঃ

(i) **সংশ্লেষ** বা **কনজ্যুগেশান** (Conjugation), (ii) **সিনগ্যামী** (Syngamy) এবং (iii) **নিষেক** বা **ফার্টিলাইজেশান** (Fertilization)।

I. সংশ্লেষ বা কনজুগেশান ঃ সম-জননকোষ বা গ্যামেটের মিলনের ফলে জনন সম্পন্ন হলে, তাকে **সংশ্লেষ** বা **কনজ্যুগেশান** বলে এবং এদের মিলনের ফলে যে কোষটি উৎপন্ন হয়, তাকে **জাইগোস্পোর** (Zygospore) বলে। যে দুটি জীব সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে, তাদের **কনজ্যুগ্যান্ট** (Conjugant) বলে। মিউকর, স্পাইরোগাইরা প্রভৃতি উদ্ভিদ এই প্রক্রিয়ায় যৌন জনন সম্পন্ন করে।

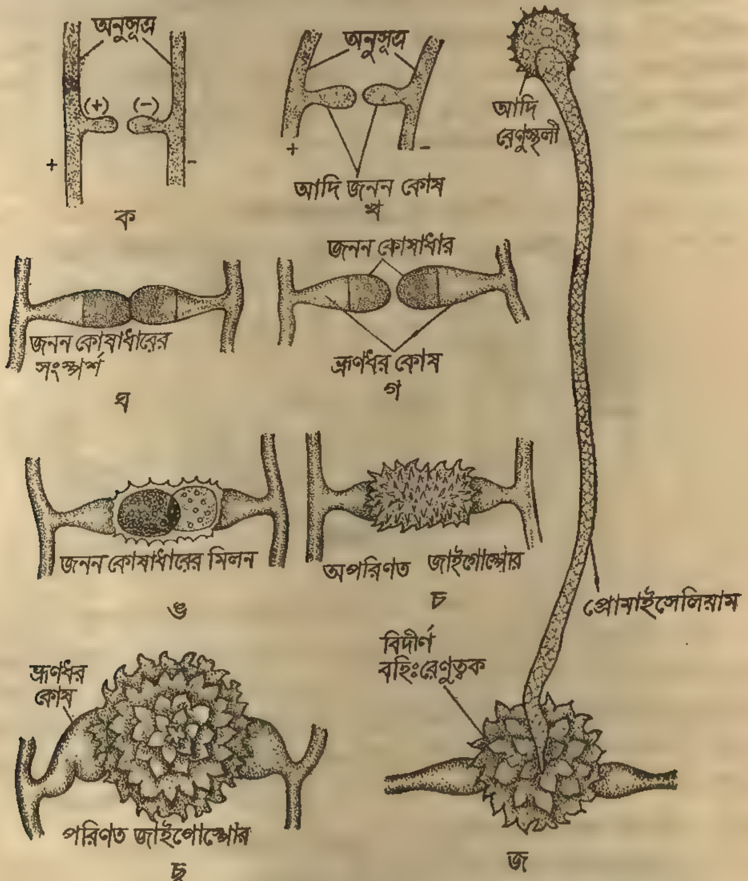

চিত্র 5.106 ঃ ক-চ—মিউকরের যৌন জনন পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়।

II. সিনগ্যামী ঃ সাধারণত বহুকোষী জীবে এই প্রক্রিয়ায় জনন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এটি প্রধানত তিন প্রকার হতে পারে—

(a) **আইসোগ্যামী** (Isogamy) ঃ দুটি জননকোষ বা গ্যামেট যখন আকৃতিতে

একই রকমের হয়, তখন তাদের **আইসোগ্যামেট** (Isogamete) বা **সম-জননকোষ** বলে এবং দুটি বিপরীত প্রকৃতির আইসোগ্যামেটের মিলনকে **আইসোগ্যামী** বলে। ইউলোথ্রিক্স নামক শৈবালে আইসোগ্যামী পরিলক্ষিত হয়।

(b) **অ্যানাইসোগ্যামী** (Anisogamy) ঃ জননকোষ বা গ্যামেটগুলি আকৃতিতে পৃথক এবং উভয়েই সচল হলে তাদের **অ্যানাইসোগ্যামেট** (Anisogamete) বা **অসম-জননকোষ** বলে এবং এদের মিলনকে **অ্যানাইসোগ্যামী** বলে। ক্ল্যামাইডোমোনাস নামক শৈবালে এ ধরনের যৌন জনন দেখা যায়।

(c) **উগ্যামী** (Oogamy) ঃ এ ধরনের যৌন জনন সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরনের যৌন জনন প্রক্রিয়া। যৌন জননে অংশগ্রহণকারী দুটি জননকোষ বা গ্যামেটের মধ্যে একটি ছোট (শুক্রাণু) ও সচল হলে এবং অন্যটি বড় (ডিম্বাণু) ও গমনে অক্ষম হলে তাদের মিলনে যে যৌন জনন ঘটে, তাকে **উগ্যামী** বলে। ক্ল্যামাইডোমোনাস, ভলভক্স ইউডোগোনিয়াম প্রভৃতি শৈবালে এবং ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা ও সপুষ্পক উদ্ভিদে এই প্রক্রিয়ায় যৌন জনন সম্পন্ন হয়।

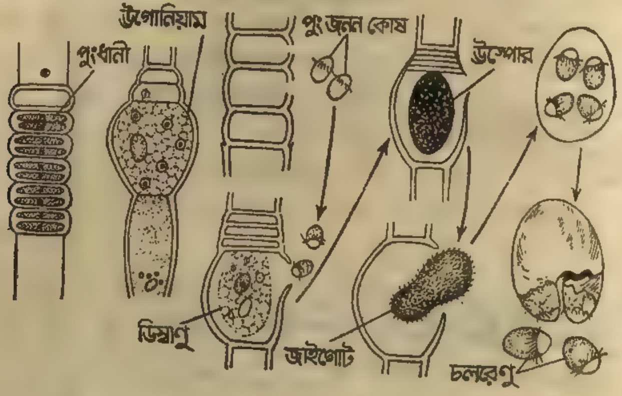

চিত্র 5.107 ঃ একটি শৈবালে উগ্যামী দেখানো হয়েছে।

III. নিষেক বা ফার্টিলাইজেশান ঃ আকৃতি ও প্রকৃতিতে ভিন্ন পুং এবং স্ত্রী জননকোষ বা গ্যামেট-দুটি স্ব-বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে মিলিত হলে সেই মিলন পদ্ধতিকে **নিষেক** বা **ফার্টিলাইজেশান** বলে এবং জননকোষ দুটির মিলনের ফলে উৎপন্ন ডিপ্লয়েড কোষটিকে **ভ্রূণাণু** বা **উস্পোর** (Oospore) বলে। নিষেকও এক ধরনের উগ্যামী। সমস্ত সপুষ্পক উদ্ভিদে এ ধরনের জনন ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

5.83. সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদে নিষেক পদ্ধতি (Fertilization in angiospermic plants)

সপুষ্পক উদ্ভিদে ফুল হল প্রধান জনন-অঙ্গ। ফুলের পুংকেশরকে **পুং-জনন অঙ্গ** (Male reproductive organ) এবং গর্ভকেশরকে **স্ত্রী-জনন অঙ্গ** (Female reproductive organ) বলে।

আকৃতি ও প্রকৃতিতে ভিন্ন দুটি জননকোষের মিলনকে **নিষেক** বা **গর্ভাধান** বলে।

সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদ ডিপ্লয়েড, স্পোরোফাইট। হ্যাপ্লয়েড রেণুগুলি ডিপ্লয়েড রেণু-মাতৃকোষ থেকে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। পুংরেণু, পরাগধানী বা পুং-রেণুস্থলীর ভিতর এবং স্ত্রীরেণু বা ডিম্বক, স্ত্রী-রেণুস্থলীর ভিতর উৎপন্ন হয়। পুংরেণু, পুং-গ্যামেটোফাইট ও স্ত্রীরেণু, স্ত্রী-গ্যামেটোফাইট গঠন করে।

পরাগযোগ বা পলিনেশানের ঠিক আগে বা ঠিক পরেই পরাগরেণুর নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়ে দুটি নিউক্লিয়াস গঠন করে।

স্ত্রীরেণু, স্ত্রী-গ্যামেটোফাইটের প্রথম কোষ। এর নিউক্লিয়াসটি আবার মুক্ত নিউক্লিও বিভাজনের (**free nuclear division**) মাধ্যমে পর পর তিনবার বিভাজিত হয়ে ভ্রূণস্থলীতে মোট আটটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস গঠন করে। এই অপত্য নিউক্লিয়াসগুলির মাঝে কোন প্রাচীর তৈরি হয় না।

সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদে নিষেকের পূর্বে পরাগরেণু (**Pollen grain**) গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত রেণু প্রাথমিক অবস্থায় দুটি নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট থাকে। এদের মধ্যে বড় নিউক্লিয়াসটিকে **নালিকা নিউক্লিয়াস** (**Tube nucleus**) এবং ছোটটিকে **জনন নিউক্লিয়াস** (**Generative nucleus**) বলে। পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়ে গর্ভমুণ্ড থেকে নিঃসৃত রস শোষণ করে

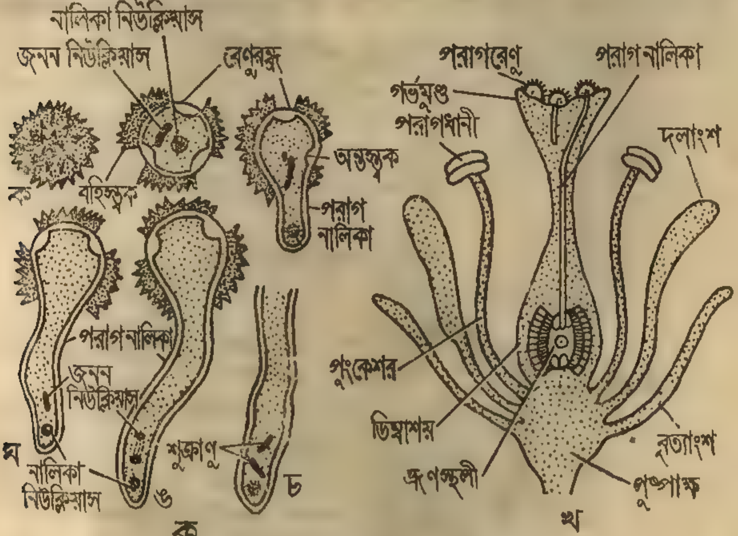

চিত্র 5.108 : (ক) পরাগরেণু ও তার পরিস্ফুরণ দেখানো হয়েছে, (খ) লম্বচ্ছেদে সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের পুংধানী ও স্ত্রীধানীর অবস্থান ও গঠন দেখানো হয়েছে।

স্ফীত হয়। এর ফলে পরাগরেণুর **অন্তঃস্ত্বক** (**Intine**) প্রসারিত হয় এবং তা **জার্মপোর** (**Germpore**) বা রেণুরন্ধ্র পথে একটি নালিকার আকারে বেরিয়ে আসে। এই নালিকাকে **পরাগ নালিকা** (**Pollen tube**) বলে। পরাগ নালিকা গর্ভদণ্ড ভেদ করে ডিম্বাশয়ের (**Ovary**) ডিম্বকের (**Ovule**) ভ্রূণস্থলীর (**Embryo sac**) দিকে

যেতে থাকে। পরাগ নালিকার সম্মুখভাগে থাকে নালিকা নিউক্লিয়াস এবং এর কিছু পিছনে থাকে জনন নিউক্লিয়াস। পরাগ নালিকাটি ডিম্বকের ডিম্বক রন্ধ্রে পৌঁছালে নালিকা নিউক্লিয়াসটি নষ্ট হয়ে যায় এবং জনন নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি **পুং-জননকোষ** (male gamete) বা শুক্রাণু উৎপন্ন করে।

নিষেকের আগে ডিম্বকের ভিতরের ভ্রূণস্থলীতে সৃষ্ট আটটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস নির্দিষ্ট রীতিতে সজ্জিত হয়। ডিম্বক রন্ধ্রের দিকের তিনটি নিউক্লিয়াসকে একত্রে **গর্ভযন্ত্র** (Egg apparatus) বলে। এই গর্ভযন্ত্রের মাঝখানের বড় নিউক্লিয়াসটিকে **ডিম্বাণু** (Egg) এবং এর দুপাশের অপেক্ষাকৃত ছোট নিউক্লিয়াস দুটিকে **সহকারী কোষ** (Synergids) বলে। ডিম্বাণুই হল প্রকৃত স্ত্রী-জননকোষ। ডিম্বকের গোড়ার দিকে সজ্জিত তিনটি নিউক্লিয়াসকে একত্রে **প্রতিপাদ কোষ** (Antipodal cells) বলে। এছাড়া ভ্রূণস্থলীর কেন্দ্রে, কিছু সময়, বাকী দুটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস পাশাপাশি থাকে, এদের **পোলার নিউক্লিয়াস** (Polar nucleus) বলে। ডিম্বক পরিণত হওয়ার সময় পোলার নিউক্লিয়াস দুটি সম্পূর্ণ ভাবে মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড **নির্ণীত নিউক্লিয়াস** (Definitive nucleus) বা **গৌণ নিউক্লিয়াস** (Secondary nucleus) বা **ফিউশান নিউক্লিয়াসে** (Fusion nucleus) পরিণত হয়। এটি হল **প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস** (Primary endosperm nucleus)।

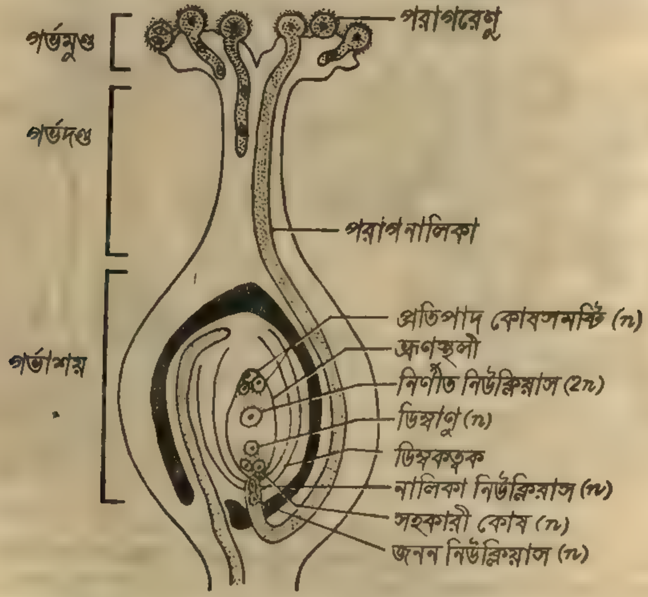

চিত্র 5.109 : সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের দ্বি-নিষেক প্রক্রিয়া।

দুটি পুং-জনন নিউক্লিয়াস সহ পরাগ নালিকা ডিম্বাশয়ের ভিতরে ডিম্বকে ঢুকে ভ্রূণস্থলীর গর্ভযন্ত্রের কাছে পৌঁছায়। এ অবস্থায় পরাগ নালিকার অগ্রভাগ সহকারী কোষ থেকে রস শোষণ করে ফুলে ওঠে এবং পরে ফেটে যায়। ফলে

পুং-জনন নিউক্লিয়াস দুটি ভ্রূণস্থলীর গহ্বরে মুক্ত হয়। একটি পুং-জনন নিউক্লিয়াস ডিম্বাণুর সঙ্গে এবং অন্যটি নির্ণীত নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয়—দুটি পুং-জনন নিউক্লিয়াস ভ্রূণস্থলীর দুটি নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয় বলে এই প্রক্রিয়াকে **দ্বি-নিষেক** বা **দ্বি-গর্ভাধান** (Double fertilization) বলে। এই দ্বি-নিষেক সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। একটি পুং-জনন নিউক্লিয়াস ও ডিম্বাণুর মিলনে তৈরি হয় **ভ্রূণাণু** (Oospore) এবং অন্য পুং-জনন নিউক্লিয়াসটি ডিপ্লয়েড নির্ণীত নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয়ে গঠন করে ট্রিপ্লয়েড (3n) **সস্য নিউক্লিয়াস** (Endosperm nucleus)। ভ্রূণাণু ক্রমে **ভ্রূণে** (Embryo), সস্য নিউক্লিয়াস **সস্যে** (Endosperm), ডিম্বক **বীজে** (Seed) এবং গর্ভাশয় **ফলে** (Fruit) পরিণত হয়।

অপুংজনি (Parthenogenesis) **:** বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিষেক ব্যতীতই স্ত্রী-জননকোষ থেকে অপত্য জীবের সৃষ্টি হয়। অপত্য সৃষ্টির এই বিশেষ প্রক্রিয়াকে **অপুংজনি** বলে। মিউকর, স্পাইরোগাইরা প্রভৃতি উদ্ভিদে অপুংজনি পরিলক্ষিত হয়।

5.84. প্রাণীর জনন (Reproduction in animals)

প্রাণিজগতে প্রধানত দু ধরনের জননক্রিয়া দেখা যায়, যথা—(a) **অযৌন জনন** (Asexual reproduction) এবং (b) **যৌন জনন** (Sexual reproduction)।

(a) **প্রাণীর অযৌন জনন :** প্রাণীদের মধ্যে নিচে উল্লেখিত কয়েকটি প্রক্রিয়ায় অযৌন জনন হয় :

(i) **দ্বি-বিভাজন** (Binary fission) **:** অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম প্রভৃতি অধিকাংশ এককোষী প্রাণীতে দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়া উদ্ভিদকোষের দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ার অনুরূপ।

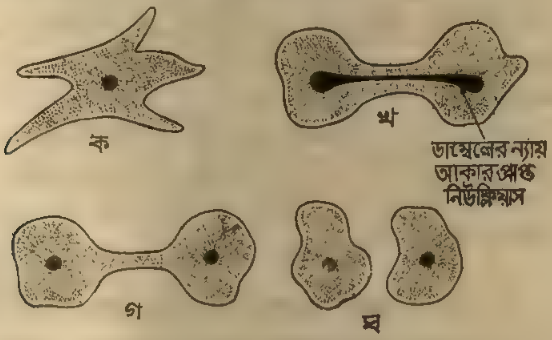

চিত্র 5.110 : অ্যামিবার দ্বি-বিভাজন পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে দেখানো হয়েছে।

(ii) **বহু বিভাজন** (Multiple fission) **:** অ্যামিবা, প্লাসমোডিয়াম প্রভৃতি এককোষী প্রাণী বার বার তাদের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের বিভাজনের মাধ্যমে বহু সংখ্যক অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। প্রথমে নিউক্লিয়াসটি অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে অসংখ্য অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। পরে সাইটোপ্লাজমের এক-একটি

ছোট খণ্ড এক-একটি অপত্য নিউক্লিয়াসকে ঘিরে নতুন এক-একটি অপত্য কোষ তৈরি করে। অবশেষে জনিতৃ কোষের আবরণী ছিন্ন করে অপত্য কোষগুলি বেরিয়ে আসে এবং এক-একটি নতুন প্রাণীতে পরিণত হয়।

(iii) **কোরকোদ্গম** (Budding) ঃ এই জনন প্রক্রিয়ায় জনিতৃ প্রাণীর দেহের বহির্ভাগে এক বা একাধিক উপবৃদ্ধির (outgrowth) সৃষ্টি হয়। ঐ উপবৃদ্ধিকে **মুকুল** বা **কুঁড়ি** (bud) বলে। উপযুক্ত বৃদ্ধির পর নির্দিষ্ট সময়ে মুকুলটি জনিতৃ প্রাণীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন অপত্য প্রাণীর সৃষ্টি করে।

একনালীদেহী প্রাণী হাইড্রার পাদমূলের (Basal disc) কাছ থেকে কোরক উৎপন্ন হয়। কোরকটিতে জনিতৃ হাইড্রার মত মুখ, কর্ষিকা ইত্যাদি সৃষ্টি হলে এটি জনিতৃর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রবাল (Corals) ও অন্যান্য কয়েক ধরনের একনালীদেহী প্রাণীতে কোরকটি জনিতৃ প্রাণীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। এসব ক্ষেত্রে জনিতৃ প্রাণীর দেহে এ ধরনের একাধিক কোরক সৃষ্টি হয়ে উক্ত প্রাণীদের একটি **উপনিবেশ** বা **'কলোনী'** (colony) গঠিত হয়। মিষ্টি জলের স্পঞ্জের ক্ষেত্রে দেহের ভিতরে কোরক উৎপন্ন হয়। এ ধরনের কোরককে **গেমিউল** (Gemmule) বলে।

(iv) **পুনরুৎপাদন** (Regeneration) ঃ কোন কোন প্রাণীর দেহের একটি ক্ষুদ্র অংশ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় কোন বিনষ্ট বা হৃত অংশকে প্রতিস্থাপিত করে একটি সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত করলে, সেই বিশেষ জনন প্রক্রিয়াকে **পুনরুৎপাদন** বলে। হাইড্রা, প্ল্যানেরিয়া (এরা একপ্রকার স্বাধীনজীবী চ্যাপ্টা

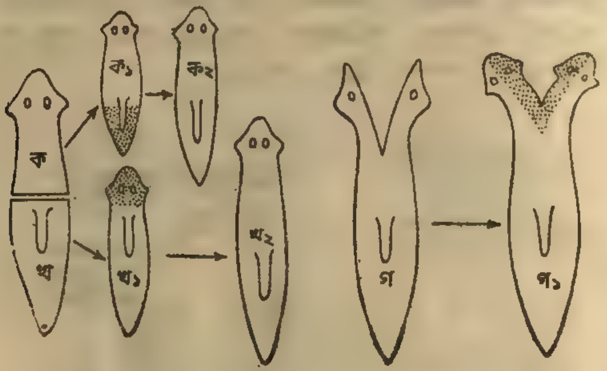

চিত্র 5.111 ঃ প্ল্যানেরিয়া নামক চ্যাপ্টা কৃমিতে পুনরুৎপাদন।

কৃমি) প্রভৃতি প্রাণীকে ছোট ছোট কয়েকটি অংশে কেটে ফেললে প্রত্যেক অংশ থেকে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন এক-একটি অপত্য প্রাণীর সৃষ্টি হয়।

(b) **প্রাণীর যৌন জনন** ঃ এই ধরনের জননে দুটি ভিন্ন জননকোষের বা গ্যামেটের মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় **ভ্রূণাণু** বা **জাইগোট** (Zygote), যা নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়। প্রাণিজগতে প্রধানত দু ধরনের যৌন জনন লক্ষ্য করা যায়—(i) **সংশ্লেষ** (Conjugation) এবং (ii) **নিষেক**

(Fertilization)। এই দুই ধরনের জনন প্রক্রিয়া ছাড়া আর এক বিশেষ ধরনের জনন প্রক্রিয়া কোন কোন প্রাণীতে দেখা যায়, তাকে **অপুংজনি** (Parthenogenesis) বলে।

(i) **সংশ্লেষ** : একই প্রজাতিভুক্ত দুটি প্রাণীর দেহ থেকে উৎপন্ন দুটি **নিউক্লিয়াসের** মিলনের ফলে (যেমন, এককোষী প্রাণী প্যারামিসিয়ামে) অথবা দুটি **সদৃশ গ্যামেটের** বা সম-জননকোষের মিলনের ফলে যে জনন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে **সংশ্লেষ** বলে। সংশ্লেষ আদিম প্রকৃতির যৌন জনন।

(ii) **নিষেক** : প্রাণিদেহের বিশেষ অঙ্গ ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়ে উৎপন্ন দুটি **বিসদৃশ গ্যামেটের** বা অসম-জননকোষের মিলনের ফলে যে যৌন জনন সম্পন্ন হয়, তাকে **নিষেক** বলে। জননকোষ বা গ্যামেট উৎপাদনকারী অঙ্গকে একত্রে **গোনাড** (Gonad) বলে। পুং-জনন অঙ্গকে **শুক্রাশয়** (Testis) এবং স্ত্রী-জনন অঙ্গকে **ডিম্বাশয়** (Ovary) বলে। শুক্রাশয়ের মধ্যে পুং-জননকোষ বা **শুক্রাণু** (Sperm or Spermatozoa) এবং ডিম্বাশয়ের মধ্যে স্ত্রী-জননকোষ বা **ডিম্বাণু** (Egg) উৎপন্ন হয়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদনের পূর্বে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের মধ্যে জনন-মাতৃকোষ মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজনের ফলে হ্যাপ্লয়েড (n) জননকোষ সৃষ্টি হয়। হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিষেকের ফলে ডিপ্লয়েড (2n) ভ্রূণাণু সৃষ্টি হয়। এই ভ্রূণাণু থেকে ক্রমে অপত্য প্রাণীর জন্ম হয়। শুক্রাণু উৎপাদক প্রাণীকে পুরুষ প্রাণী এবং ডিম্বাণু উৎপাদক প্রাণীকে স্ত্রী প্রাণী বলে। যদি কোন একটি প্রাণীতে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় উভয়ই থাকে, তবে তাকে **উভলিঙ্গ** (Bisexual or Hermaphrodite) **প্রাণী** বলে। কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি উভলিঙ্গ প্রাণী। অপরপক্ষে, কোন প্রাণীর দেহে শুক্রাশয় অথবা ডিম্বাশয়ের যে কোন একটি উপস্থিত থাকলে, তাকে **একলিঙ্গ** (Unisexual) **প্রাণী** বলে। গোলকৃমি, সন্ধিপদ প্রাণীরা এবং সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী একলিঙ্গ।

(c) **অপুংজনি** (Parthenogenesis) : শুক্রাণুর সঙ্গে মিলন ছাড়াই কোন কোন ক্ষেত্রে ডিম্বাণুটি অপত্য প্রাণীতে পরিণত হয়। **অনিষিক্ত** (Unfertilized) **ডিম্বাণু থেকে অপত্য প্রাণীর জন্ম লাভ অপুংজনি নামে পরিচিত**। মৌমাছি, বোলতা ও পিঁপড়াদের ক্ষেত্রে পুরুষরা এই প্রক্রিয়ায় জন্মলাভ করে। এইসব প্রাণীর রানী ও শ্রমিকরা কিন্তু জন্ম লাভ করে নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে। অন্যান্য আর যেসব অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে অপুংজনি ঘটে তাদের মধ্যে রটিফার ও এফিড (Aphids) উল্লেখযোগ্য। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে স্বাভাবিক অপুংজনির (Natural parthenogenesis) ঘটনা বিরল (rare)।

তবে কৃত্রিম উপায়ে, বাইরের উদ্দীপকের প্রভাবে (যথা—উষ্ণতা, এক্স্-রশ্মি, রাসায়নিক পদার্থ, যান্ত্রিক পদ্ধতি ইত্যাদি দ্বারা), মেরুদণ্ডীসহ কয়েক প্রকার প্রাণীতে অপুংজনি ঘটানো যায়। এইরূপ অপুংজনিকে **কৃত্রিম অপুংজনি** (Artificial parthenogenesis) বলে।

(d) **নিওটেনি ও পিডোজেনেসিস** (Neoteny and Paedogenesis) : সাধারণত প্রাণীরা পূর্ণাঙ্গ দশায় পৌঁছানোর পর তবেই যৌন জননে সক্ষম হয়। কোন কোন প্রাণীতে পরিবেশের প্রভাবে লার্ভা দশার রূপান্তর স্থগিত থাকে। স্বাভাবিক

সময়ের চেয়েও বেশী সময় অথবা স্থায়ীভাবে লার্ভা দশার বৈশিষ্ট্য প্রাণিদেহে থেকে যাওয়ার এই ঘটনাকে **নিওটেনি** বলে। এইসব প্রাণীর গোনাড বা জননাঙ্গ লার্ভা দশাতেই পূর্ণতা লাভ করে। ফলে লার্ভা অবস্থাতেই তারা যৌন জননে সক্ষম হয়। লার্ভা অবস্থায় যৌন জনন সম্পন্ন করার ঘটনাকে **পিডোজেনেসিস** বলে। উদাহরণ : আমেরিকার মেক্সিকোতে প্রাপ্ত অ্যাক্সলোট্ল (Axolotl) লার্ভা। এরা *Ambystoma tigrinum* নামে একপ্রকার স্যালামান্ডারের (উভচর) লার্ভা। জলে আয়োডিন কম থাকার জন্যই এই লার্ভাদের রূপান্তর ঘটে না ; ফলে লার্ভা দশাতেই তারা যৌন জনন সম্পন্ন করে।

শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর গঠন (Structure of sperm and egg) : শুক্রাশয়ের **স্পার্মাটোগোনিয়া** (Spermatogonia) নামক ডিপ্লয়েড কোষ **স্পার্মাটোসাইটে** (Spermatocyte) রূপান্তরিত হলে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় চারটি হ্যাপ্লয়েড **স্পার্মাটিড** (Spermatid) কোষে পরিণত হয়। এই স্পার্মাটিড রূপান্তরিত হয়ে **শুক্রাণু** (Spermatozoa) গঠন করে। বিভিন্ন প্রাণীর শুক্রাণুর গঠন ও আকৃতি বিভিন্ন, তবে প্রায় সমস্ত প্রাণীর শুক্রাণুর দেহই **মস্তক, মধ্যভাগ** বা **দেহ** ও **লেজ** নিয়ে গঠিত (চিত্র 5.117) ; মস্তকের মধ্যে নিউক্লিয়াস এবং মস্তকের অগ্রপ্রান্তে ক্যাপ বা টুপি থাকে। শুক্রাণু চলাচল করতে পারে। ডিম্বাণু সৃষ্টির সময় ডিম্বাশয়ের জার্মিনাল এপিথেলিয়াল টিস্যু থেকে প্রথমে অপরিণত এবং পরে **পরিণত ডিম্বস্থলী** বা **গ্রাফিয়ান ফলিক্ল** (Graafian follicle) গঠিত হয়। এই গ্রাফিয়ান ফলিক্লের কেন্দ্রস্থ কোষটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়—এই কোষটিই হল **উগোনিয়াম** (Oogonium) বা **আদি-ডিম্বাণু**। আদি-ডিম্বাণু ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে **প্রাইমারী উসাইট** (Primary Oocyte)-এ পরিণত হয়। প্রাইমারী উসাইট প্রথম মায়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে একটি হ্যাপ্লয়েড **সেকেন্ডারী উসাইট** (Secondary Oocyte) এবং একটি হ্যাপ্লয়েড **ফার্স্ট পোলার বডি** (First polar body) বা প্রথম মেরুডিম্ব গঠন করে। পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিতীয় মায়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে সেকেন্ডারী উসাইট এবং ফার্স্ট পোলার বডি থেকে মোট চারটি হ্যাপ্লয়েড কোষ গঠিত হয় এবং এদের মধ্যে সেকেন্ডারী উসাইট থেকে উৎপন্ন সবচেয়ে বড় কোষটি প্রকৃত **পরিণত ডিম্বাণু** বা **ওভাম** (Mature ovum) রূপে রূপান্তরিত হয়। প্রতিটি ডিম্বাণুর ভিতর একটি নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম ও কুসুম (Yolk) নামক পদার্থ থাকে (চিত্র 5.117)। কুসুমে সঞ্চিত খাদ্য দ্বারাই নিষিক্ত ডিম্বাণু পুষ্ট হয়।

স্পার্মাটোগোনিয়া (2n) ↓ **প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইট** (2n) ↓ **সেকেন্ডারী স্পার্মাটোসাইট** (n) ↓ **স্পার্মাটিড** (n) ↓ **শুক্রাণু** (n) (শুক্রাণু উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়)	**প্রাইমারী উসাইট** (2n) ↓ **সেকেন্ডারী উসাইট** (n) → **পরিণত ডিম্বাণু** (n) **ফার্স্ট পোলার বডি** (n) → **দ্বিতীয় পোলার বডি** (n) (ডিম্বাণু উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়)

নিষেক (Fertilization)ঃ পুরুষদেহ থেকে হাজার হাজার আণুবীক্ষণিক শুক্রাণু বের হয়ে ডিম্বাণুর চারদিকে এসে উপস্থিত হয়। এদের মধ্যে একটি শুক্রাণু লেজটি ত্যাগ করে ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে। সেখানে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের মিলনের ফলে ভ্রূণাণু বা জাইগোট উৎপন্ন হয়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর

চিত্র 5.112 ঃ অণ্ডজ—ক (মাছ), খ—(পাখী), গ—(সাপ) ;
অণ্ড-জরায়ুজ—ঘ (হাঙর) ; জরায়ুজ—ঙ (স্তন্যপায়ী ঃ ঘোড়া)।

মিলনকে **নিষেক** বলে। জাইগোট ক্রমাগত মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে অপত্য প্রাণীতে পরিণত হয়। নিষেক বা গর্ভাধান দুভাবে হতে পারে—

(i) **বহিঃনিষেক** (External Fertilization)ঃ অর্থাৎ নিষেক ক্রিয়া দেহের বাইরে হয়ে থাকে। যেমন—মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণীতে।

(ii) **অন্তঃনিষেক** (Internal Fertilization)ঃ অর্থাৎ নিষেক ক্রিয়া স্ত্রী প্রাণীর দেহের ভিতরে সম্পন্ন হয়। যেমন—মানুষ সহ সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীতে।

একই জীবদেহে উৎপন্ন শুক্রাণু দ্বারা সেই দেহে উৎপন্ন ডিম্বাণু নিষিক্ত হলে,

তাকে **স্ব-নিষেক** (Self-fertilization) বলে। কিন্তু একই প্রজাতিভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহ থেকে উৎপন্ন শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে নিষেক ঘটলে, তাকে **পরনিষেক** (Cross fertilization) বলে। সমস্ত একলিঙ্গ প্রাণীর ক্ষেত্রে পরনিষেক ঘটে, উভলিঙ্গ প্রাণী হাইড্রায় স্ব-নিষেক ও পরনিষেক দুই-ই দেখা যায়। কেঁচো উভলিঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও এদের ক্ষেত্রে স্ব-নিষেক হয় না।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সন্তান উৎপাদন পদ্ধতির বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—(i) **অণ্ডজ** (Oviparous), (ii) **অণ্ড-জরায়ুজ** (Ovoviviparous) এবং (iii) **জরায়ুজ** (Viviparous) প্রাণী।

(i) **অণ্ডজ :** যে সব প্রাণী নিষিক্ত বা অনিষিক্ত ডিম্ব পাড়ার পর মাতার দেহের বাইরে সেই ডিম্ব থেকে অপত্য প্রাণী জন্মায়, তাদের **অণ্ডজ প্রাণী** বলে। যেমন—মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখী ইত্যাদি।

(ii) **অণ্ড-জরায়ুজ :** যে সব প্রাণীর নিষিক্ত ডিম্ব মাতার দেহে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু মাতার দেহ থেকে শিশু প্রাণী পুষ্টি গ্রহণ করে না, তাদের **অণ্ড-জরায়ুজ** প্রাণী বলে। যেমন—তরুণাস্থিবিশিষ্ট মাছ হাঙর।

(iii) **জরায়ুজ :** যে সব প্রাণীর নিষিক্ত ডিম্বাণু নির্দিষ্ট সময় ধরে মাতৃদেহে অবস্থান করে মাতার দেহের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থেকে পুষ্ট হয় এবং নির্দিষ্ট সময় পর পরিণত শিশু প্রাণী জন্মায়, তাদের **জরায়ুজ প্রাণী** বলে। যেমন—সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী জরায়ুজ (ব্যতিক্রম—হংসচঞ্চু। হংসচঞ্চু স্তন্যপায়ী হওয়া সত্ত্বেও ডিম্ব পাড়ে। এরা সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর অন্তর্বর্তী প্রাণী।)

5.85 কয়েকটি প্রাণীর জনন তন্ত্র

(Reproductive system of a few animals)

*(A) **কেঁচো** (Earthworm) : কেঁচো **উভলিঙ্গ** বা **হার্মাফ্রোডাইট** (Hermaphrodite) প্রাণী। কেঁচোর জনন অঙ্গগুলি দেহের সামনের দিকে অবস্থিত।

● **পুং-জনন তন্ত্র (Male reproductive system) :**

(i) **শুক্রাশয়** (Testis) : ১০ম ও ১১শ দেহখণ্ডকে অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জুর দুপাশে মোট দুজোড়া শুক্রাশয় বর্তমান। প্রতিটি শুক্রাশয় ৫টি থেকে ৯টি সূক্ষ্ম আঙুলের মত সাদা অংশ দিয়ে গঠিত। প্রত্যেক জোড়া শুক্রাশয় দু খণ্ডযুক্ত **শুক্রথলির** মধ্যে থাকে।

(ii) **শুক্রথলি** (Seminal vesicles) : ১১শ ও ১২শ দেহখণ্ডকে একজোড়া করে দুজোড়া শুক্রথলি আছে। শুক্রথলি **সেমিনাল রস** (Seminal fluid) দিয়ে পূর্ণ থাকে।

---

* পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেবলমাত্র অনুসন্ধিৎসু ছাত্রছাত্রীদের জন্য দেওয়া হল।

(iii) **শুক্রচুঙ্গি** (Seminal funnels) : শুক্রথলির মধ্যে প্রতিটি শুক্রাশয়ের কাছে একটি করে মোট চারটি সিলিয়াযুক্ত শুক্রচুঙ্গি থাকে। এর মধ্য দিয়ে শুক্রাণু শুক্রনালীতে প্রবেশ করে।

(iv) **শুক্রনালী** (Vas deferens) : প্রতিটি শুক্রচুঙ্গি পিছন দিকে সরু শুক্রনালীতে পরিণত হয়ে ১৮শ দেহখণ্ডকে পুং-জনন ছিদ্রের দিকে অগ্রসর হয়।

(v) **প্রস্টেট গ্রন্থি** (Prostate gland): ১৬শ অথবা ১৭শ দেহখণ্ডক থেকে ২০শ অথবা ২১শ দেহখণ্ডকের দুপাশে, সাদা ও অসমান পরিধি তলবিশিষ্ট, দুটি প্রস্টেট গ্রন্থি থাকে।

(vi) **পুং-জনন ছিদ্র** (Male genital aperture) : ১৮শ দেহখণ্ডকে শুক্রনালী ও প্রস্টেট গ্রন্থির নালী মিলিতভাবে দেহের অঙ্কদেশে দুটি পুং-জনন ছিদ্রে মুক্ত হয়।

(vii) **জনন-পিড়কা** (Genital papilla) : ১৭শ এবং ১৯শ দেহখণ্ডকের অঙ্কীয় দিকে মধ্যরেখার দুপাশে মোট চারটি বৃত্তাকার উঁচু জনন-পিড়কা থাকে। এগুলি যৌন মিলনে সাহায্য করে।

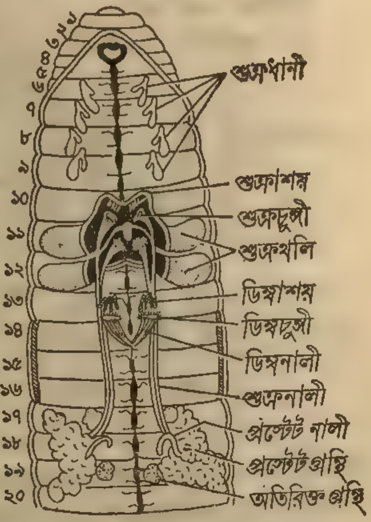

চিত্র 5.113 : কেঁচোর জনন তন্ত্র।

● **স্ত্রী-জনন তন্ত্র** (Female reproductive system) :

(i) **ডিম্বাশয়** (Ovary) : ১২শ ও ১৩শ দেহখণ্ডকে অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জুর দুপাশে একটি করে মোট একজোড়া ডিম্বাশয় থাকে।

(ii) **ডিম্বচুঙ্গি** (Oviducal funnel) : ১৩শ দেহখণ্ডকে প্রতি ডিম্বাশয়ের পিছনে মোট দুটি সিলিয়াযুক্ত ফানেলের মত ডিম্বচুঙ্গি থাকে।

(iii) **ডিম্বনালী** (Oviducts) : ডিম্বচুঙ্গি ক্রমশ সরু হয়ে ১৩শ ও ১৪শ দেহখণ্ডকের বিভেদপ্রাচীর ভেদ করে ডিম্বনালীরূপে ১৪শ দেহখণ্ডকে একসঙ্গে মিলিত হয়।

(iv) **স্ত্রী-জনন ছিদ্র** (Female genital aperture) : ডিম্বনালী দুটি মিলিত হয়ে ১৪শ দেহখণ্ডকের অঙ্কদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি স্ত্রী-জনন ছিদ্রে মুক্ত হয়।

● **আনুষঙ্গিক জনন অঙ্গ** (Accessory reproductive organ) :

শুক্রধানী (Spermatheca) : ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম দেহখণ্ডকে একজোড়া করে মোট চারজোড়া কুপীর মত শুক্রধানী থাকে। শুক্রধানীতে সাময়িকভাবে শুক্রাণু জমা থাকে।

*(B) **আরশোলা** (Cockroach) : আরশোলা একলিঙ্গ প্রাণী। আরশোলার জনন তন্ত্রের অঙ্গগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—(a) **অন্তঃস্থ জনন অঙ্গ** (Internal reproductive organs) এবং (b) **বহিঃস্থ জনন অঙ্গ** (External reproductive organs)।

পুং-জনন তন্ত্র (Male reproductive system) :

অন্তঃস্থ জনন অঙ্গ :

(i) **শুক্রাশয়** (Testis) : ৩য় উদরখণ্ডক থেকে ৬ষ্ঠ উদরখণ্ডকের দুপাশে মোট দুটি লম্বাটে শুক্রাশয় থাকে। প্রতিটি শুক্রাশয় তিনটি অথবা চারটি খণ্ডকে বিভক্ত থাকে।

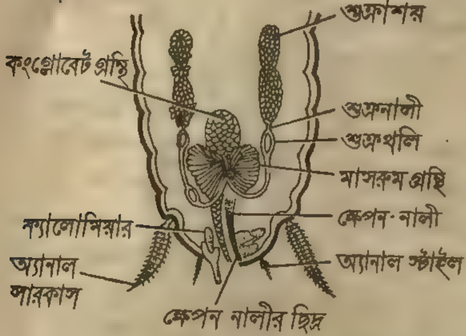

চিত্র 5.114 : আরশোলার পুং-জনন তন্ত্র।

(ii) **শুক্রনালী** (vasa deferentia) : প্রত্যেক শুক্রাশয় থেকে একটি করে সরু শুক্রনালী বের হয়।

(iii) **মাসরুম গ্রন্থি** (Mushroom gland) : শুক্রনালী ও ক্ষেপণ নালীর সংযোগস্থলে, ক্ষেপণ নালীর অগ্রপ্রান্তের চার পাশ থেকে একমুখ বন্ধ অসংখ্য থলি সম্মিলিতভাবে ব্যাঙের ছাতার মত আকার ধারণ করে। একে **মাসরুম গ্রন্থি** বলে।

(iv) **ক্ষেপণ নালী** (Ejaculatory duct) : শুক্রনালী-দুটি পেশীবহুল একটি নালীতে মুক্ত হয়, একে **ক্ষেপণ নালী** বলে।

(v) **পুং-জনন ছিদ্র** (Male gonopore) : ক্ষেপণ নালীটি পুং-জনন ছিদ্র নামে একটি ছিদ্রপথে উদরের ৯ম খণ্ডকে অবস্থিত জনন থলিতে মুক্ত হয়। পুং-জনন ছিদ্রপথে স্পারমাটোফোর নির্গত হয়।

(vi) **কংগ্লোবেট গ্রন্থি** (Conglobate gland) : মাসরুম গ্রন্থি ও ক্ষেপণ নালীর অঙ্কদেশে অবস্থিত লম্বাটে থলির মত গ্রন্থিটির নাম কংগ্লোবেট গ্রন্থি। একে **ফেলিক গ্রন্থি** (Phallic gland)-ও বলে।

বহিঃস্থ জনন অঙ্গ : পুরুষ আরশোলার ৯ম উদরখণ্ডকে অবস্থিত জনন থলি (Genital chamber) এবং এর মধ্যে অবস্থিত কৃত্তিকা নির্মিত (cuticular) তিনটি বিভিন্ন আকৃতির **গোনাপোফাইসেস** (Gonapophyses) বা **ফ্যালোমিয়ার** (Phallomeres) নিয়ে বহিঃস্থ জনন অঙ্গ গঠিত।

স্ত্রী-জনন তন্ত্র (Female reproductive system) :

অন্তঃস্থ জনন অঙ্গ :

(i) **ডিম্বাশয়** (Ovary) : ২য় থেকে ৬ষ্ঠ উদরখণ্ডকে পৌষ্টিক নালীর

* পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

দু পাশে হালকা হলুদ রঙের দুটি ডিম্বাশয় থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয় আটটি লম্বাটে **ডিম্বাশয় নালিকা** বা **ওভারিওল** (Ovarioles) নিয়ে গঠিত।

(ii) **ডিম্বনালী** (Oviduct): প্রতিটি ডিম্বাশয়ের ওভারিওলের বৃন্ত অংশগুলি পৃথকভাবে পেশীবহুল ডিম্বনালীতে যুক্ত হয়।

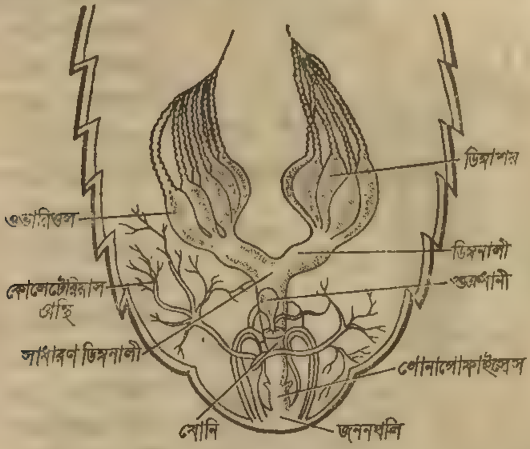

চিত্র 5.115 : আরশোলার স্ত্রী-জনন তন্ত্র।

(iii) **সাধারণ ডিম্বনালী** (Common oviduct): ৭ম উদরখণ্ডকে ডিম্বনালী দুটি মিলিত হয়ে একটি চওড়া, পেশীবহুল সাধারণ ডিম্বনালী গঠন করে। একে **জরায়ু** (Uterus)-ও বলে। জরায়ু পিছন দিকে অবস্থিত **যোনি** (Vagina)-তে যুক্ত হয়।

(iv) **স্ত্রী-জনন ছিদ্র** (Female gonopore): যোনি ৭ম উদরখণ্ডকে অবস্থিত জননথলির পৃষ্ঠদেশে স্ত্রী-জনন ছিদ্রপথে যুক্ত হয়। স্ত্রী-জনন ছিদ্রকে **ভালভা** (Vulva)-ও বলে।

(v) **শুক্রধানী** (Spermatheca): দুটি শুক্রধানীর বাম দিকেরটি পুষ্ট ও ডান দিকের শুক্রধানীটি ক্ষয়প্রাপ্ত। বাম দিকেরটি ছোট থলির মত এবং ডান দিকেরটি প্যাঁচানো নালীর মত। শুক্রধানী দুটি একসঙ্গে সাধারণ ছিদ্রপথে ৮ম উদরখণ্ডকে জনন থলির পৃষ্ঠদেশে যুক্ত হয়।

(vi) **কোলেটেরিয়াল গ্রন্থি** (Colleterial gland): ৭ম থেকে ১০ম উদর খণ্ডকে অবস্থিত ফ্যাট বডি দিয়ে আবৃত শাখা-প্রশাখাযুক্ত দুটি অসমান কোলেটেরিয়াল গ্রন্থি থাকে। এরা আনুষঙ্গিক যৌন গ্রন্থি।

বহিঃস্থ জনন অঙ্গ: স্ত্রী আরশোলার ৭ম, ৮ম ও ৯ম উদরখণ্ডকে অবস্থিত **জনন থলি** (Genital chamber) এবং এর মধ্যে অবস্থিত তিন জোড়া **গোনাপোফাইসেস** (Gonapophyses) নিয়ে বহিঃস্থ জনন অঙ্গ গঠিত।

(C) **কুনো ব্যাঙ (Toad)**: কুনো ব্যাঙ **একলিঙ্গ** প্রাণী। গোনাড এবং তৎসংলগ্ন নালী ও অঙ্গ নিয়ে এদের জনন তন্ত্র গঠিত।

● **পুং-জনন তন্ত্র** (Male reproductive system): পুং-জনন তন্ত্র প্রধানত একজোড়া **শুক্রাশয়**, একজোড়া **রেচন-জনন নালী**, **মেদপুঞ্জ** ও একটি **অবসারণী** নিয়ে গঠিত। দুটি পুং-গোনাড বা **শুক্রাশয়** (Testis) দুটি বৃক্কের অঙ্কদেশে একটি করে পাতলা পর্দা দ্বারা যুক্ত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিটি শুক্রাশয় একাধিক ছোট ছোট খণ্ড দ্বারা গঠিত হতে পারে। শুক্রাশয় থেকে পুং-জননকোষ বা শুক্রাণু (Spermatozoa) উৎপন্ন হয়। শুক্রাণু একটি বিশেষ ধরনের কোষ; একটি লম্বাটে মস্তক (Head), একটি ছোট গ্রীবা (Neck) বা মধ্যাঞ্চল (Middle piece) ও একটি লম্বা তরঙ্গায়িত (wavy) লেজ (Tail) নিয়ে এদের দেহ গঠিত [চিত্র 5.117(খ)]। লেজটি সাইটোপ্লাজম দিয়ে তৈরি; এর সঞ্চালনের দ্বারা শুক্রাণু জলে সাঁতার দিতে পারে। মস্তক অংশে নিউক্লিয়াসটি ও গ্রীবা অংশে সেন্ট্রোসোমটি থাকে। শুক্রাশয় থেকে উৎপন্ন **ভাসা এফারেন্সিয়া** (vasa efferentia) নামক অসংখ্য সূক্ষ্ম নালী বৃক্কের সংগ্রাহক নালীর (Collecting tube) সঙ্গে যুক্ত থাকে। বৃক্কের সমস্ত সংগ্রাহক নালী যুক্ত হয়ে **রেচন-জনন নালী*** (Urino-genital duct) গঠিত হয়। এটি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট সাদা ও সরু নলবিশেষ। দুটি বৃক্ক থেকে উৎপন্ন দুটি **রেচন-জনন নালী** দেহের পিছন দিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে **সাধারণ রেচন-জনন নালী** (Common urino-genital duct) গঠন করে। এই সাধারণ রেচন-জনন নালীটি অবসারণীর (Cloaca) পৃষ্ঠপ্রাচীর ভেদ করে তার ভিতর উন্মুক্ত হয়। শুক্রাশয় থেকে উৎপন্ন শুক্রাণু ভাসা এফারেন্সিয়া, সংগ্রাহক নালী, রেচন-জনন

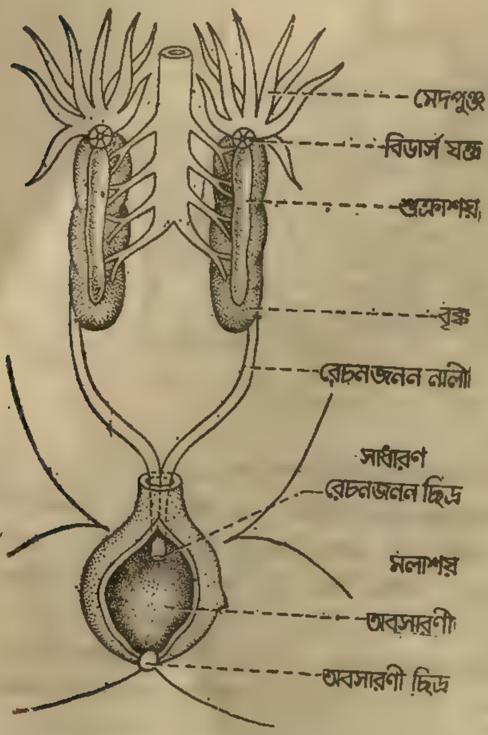

চিত্র 5.116 : কুনো ব্যাঙের পুং-জনন তন্ত্র।

* পুরুষ ব্যাঙে এই নালীর মধ্য দিয়ে মূত্র ও জননকোষ (শুক্রাণু)—এই দু প্রকার বস্তুই বাহিত হয় বলে এর নাম 'রেচন-জনন নালী'।

নালী ও সাধারণ রেচন-জনন নালী দিয়ে **অবসারণীতে** (Cloaca) পৌঁছায়। সেখান থেকে **অবসারণী ছিদ্র** দিয়ে এরা দেহের বাইরে যায়। প্রতিটি বৃক্কের সামনের দিকে একটি গোলাকার অঙ্গ যুক্ত থাকে—এর নাম **বিডার্স যন্ত্র** (Bidder's organ)। এটি অপরিণত স্ত্রী গোনাড। স্বাভাবিক পুরুষে এর কোন কাজ নেই। কিন্তু কোন পুরুষ ব্যাঙের শুক্রাশয়গুলি অপসারণ করলে বিডার্স যন্ত্রগুলি ডিম্বাশয়ে পরিণত হয় এবং পুরুষ ব্যাঙটি স্ত্রী ব্যাঙে রূপান্তরিত হয়।

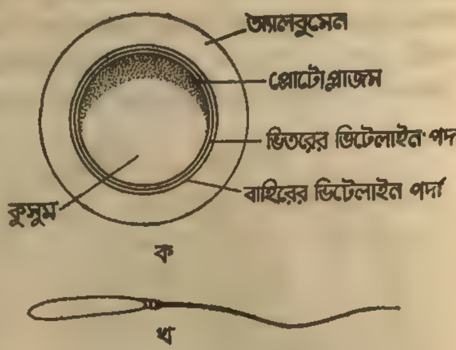

চিত্র 5.117 : কুনো ব্যাঙের জননকোষ। (ক) ডিম্বাণু ; (খ) শুক্রাণু।

পুরুষ ও স্ত্রী উভয় প্রকার ব্যাঙের বৃক্কের সম্মুখ প্রান্তে লম্বাটে ধরনের কতকগুলি হরিদ্রাভ অঙ্গ দেখা যায়—এদের নাম **ফ্যাট বডি** বা **মেদপুঞ্জ**। এদের মধ্যে সঞ্চিত মেদ জননকোষ সৃষ্টির সময় কাজে লাগে। তাছাড়া, ব্যাঙের শীতকালীন নিদ্রার সময়, যখন এরা খাদ্য গ্রহণ করে না, তখন ঐ মেদ পুষ্টি যোগায়।

● **স্ত্রী-জনন তন্ত্র** (Female reproductive system) **:** স্ত্রী-জনন তন্ত্র একজোড়া **স্ত্রী-গোনাড** বা **ডিম্বাশয়** (Ovary), একজোড়া **ডিম্বনালী** (Oviduct), একজোড়া **জরায়ু** (Uterus), **মেদপুঞ্জ** (Fat bodies) ও একটি **অবসারণী** নিয়ে গঠিত। প্রতিটি ডিম্বাশয় অনিয়মিত (irregular) আকৃতিবিশিষ্ট থলির মত এবং বৃক্কের অঙ্কীয় দিকে এটি যুক্ত থাকে। অপরিণত ব্যাঙে ডিম্বাশয়গুলি আকারে ছোট এবং বাদামী রঙের হয়। পরিণত স্ত্রী ব্যাঙে, বিশেষ করে প্রজনন ঋতুতে (Breeding season) এরা কালচে রঙের এবং বৃহৎ আকৃতির হয়। ডিম্বাশয় থেকে **ডিম্বাণু** (Ova*) উৎপন্ন হয়। প্রতিটি ডিম্বাণু গোলাকার। এর একটি প্রান্ত কালো রঙের—ঐ অংশে প্রোটোপ্লাজম থাকে [চিত্র 5.117(ক)]। সাদা রঙের অপর প্রান্তটিতে থাকে কুসুম (yolk)। পাতলা **ভিটেলাইন পর্দা** (Vitelline membrane) দ্বারা ডিম্বাণুটি আবৃত থাকে। ডিম্বাণুকে দেহের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেহ-গহ্বরের দুধারে আছে দুটি **ডিম্বনালী** (Oviduct)। ডিম্বনালীগুলি খুব প্যাঁচানো নলবিশেষ। ডিম্বাশয়ের সঙ্গে ডিম্বনালীর প্রত্যক্ষ যোগ নেই। দেহ-গহ্বরের সামনের দিকে ফুসফুসের কাছাকাছি প্রতিটি ডিম্বনালীর চুঙ্গির (Funnel) মত মুখটি অবস্থিত। ডিম্বনালীর মধ্যভাগটি সরু, খুব প্যাঁচানো এবং অপেক্ষাকৃত পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট, কিন্তু এর পশ্চাৎভাগটি বেশ প্রশস্ত ও পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট—এই অংশের নাম **জরায়ু** (Uterus)। দু দিকের দুটি জরায়ু

* একবচনে—Ovum।

পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সাধারণ নালী গঠন করে এবং সেটি অবসারণীর পৃষ্ঠপ্রাচীর ভেদ করে অবসারণীতে উন্মুক্ত হয়। ডিম্বাণু পরিণত হলে ডিম্বাশয়ের প্রাচীর বিদীর্ণ করে দেহ-গহ্বরে ঝরে পড়ে। সেখান থেকে এটি ডিম্বনালীর চুঙ্গির মত মুখ দিয়ে ডিম্বনালীতে প্রবেশ করে। ডিম্বনালীর প্যাঁচানো অংশ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিটি ডিম্বাণুকে ঘিরে অ্যালবুমেন (Albumen)-এর একটি আবরণ রচিত হয়। ডিম্বাণুগুলি জরায়ুতে সাময়িকভাবে জমা থাকে। প্রজনকালে (during mating) অবসারণী ছিদ্র দিয়ে এরা দেহের বাইরে যায়।

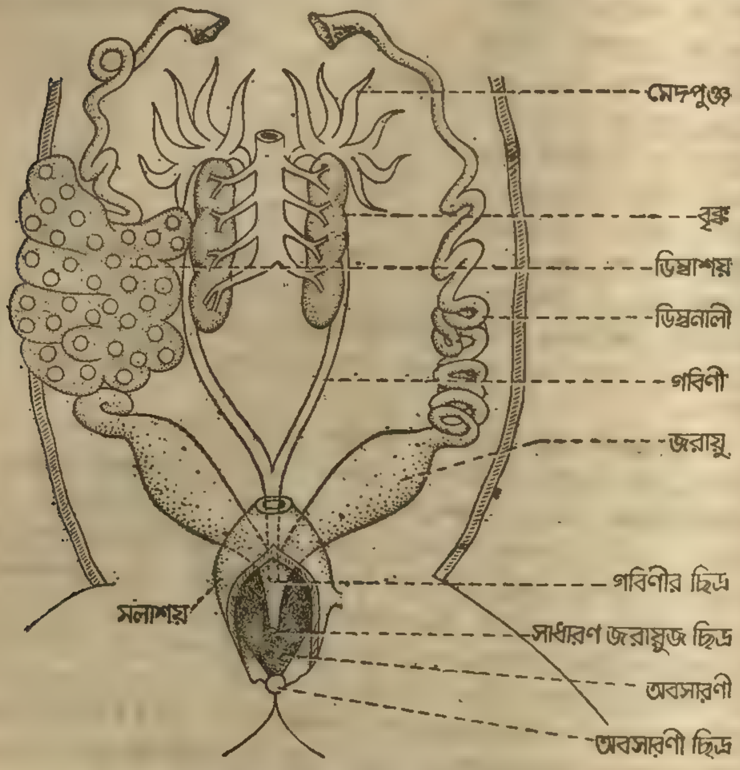

চিত্র 5.118 : কুনো ব্যাঙের স্ত্রী-জনন তন্ত্র
[কেবলমাত্র একদিকের ডিম্বাশয় দেখানো হয়েছে]

বর্ষাকাল কুনো ব্যাঙের প্রজন ঋতু। এই সময় পুকুর, ডোবা ইত্যাদির ধারে পুরুষ ও স্ত্রী ব্যাঙের সমাবেশ ঘটে। স্ত্রী ব্যাঙ জলে ডিম্বাণু ছাড়ে—ঐ সময়ে পুরুষ ব্যাঙও জলের মধ্যে শুক্রাণু ত্যাগ করে। শুক্রাণুগুলি তাদের লেজের সাহায্যে সাঁতার কেটে ডিম্বাণুগুলির কাছে পৌঁছায়। ডিম্বাণুর সংস্পর্শে এসে শুক্রাণু তার লেজটি ত্যাগ করে এবং বাকী অংশ ডিম্বাণুর ভিতর প্রবেশ করে। সেখানে শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস মিলিত হয়ে একটিমাত্র নিউক্লিয়াস গঠিত

হয়। এই অবস্থায় ডিম্বাণুটিকে **জাইগোট** বা **ভ্রূণাণু** বা **নিষিক্ত ডিম্বাণু** বলা হয়। পুরুষ ব্যাঙ কর্তৃক শুক্রাণু উৎপাদনের হার স্ত্রী ব্যাঙ কর্তৃক ডিম্বাণু উৎপাদনের হারের চেয়ে অনেক বেশী। ফলে ডিম্বাণু-পিছু একাধিক শুক্রাণু জড় হয়। তথাপি একটি ডিম্বাণু একটিমাত্র শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়। ডিম্বাণুর ভিতর একটি শুক্রাণুর প্রবেশ ঘটলে এর (ডিম্বাণুর) এমন কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যার ফলে অপর কোন শুক্রাণু আর এর ভিতর প্রবেশ করতে পারে না।

ব্যাঙের দেহের বাইরে (জলের মধ্যে) ডিম্বাণুর নিষেক ঘটে বলে এরূপ নিষেককে **বাহ্য নিষেক** (External fertilization) বলা হয়।

নিষেকের ফলে উৎপন্ন জাইগোটটি নানাপ্রকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রায় দু সপ্তাহ পরে একটি লার্ভায় পরিণত হয়। ঐ লার্ভার নাম **ব্যাঙাচি (Tadpole)**। ব্যাঙাচি রূপান্তরের (Metamorphosis) মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়। জাইগোট বা ভ্রূণাণুর ব্যাঙে পরিণত হতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে।

*(D) **মানুষ** (Human being) ঃ মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী।

পুং-জনন তন্ত্র (Male reproductive system) ঃ পুরুষের একজোড়া ডিম্বাকৃতি শুক্রাশয় জননাঙ্গের দুপাশে দুটি থলিতে অবস্থিত। এই থলি দুটিকে

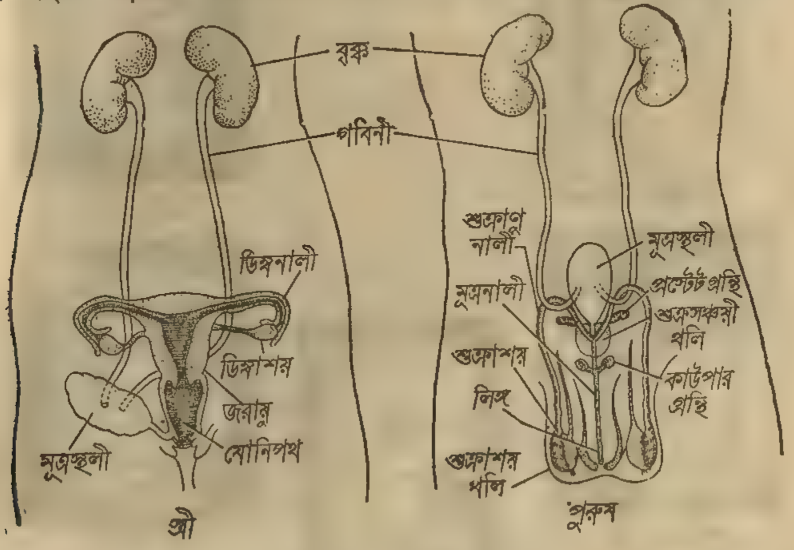

চিত্র 5.119 ঃ মানুষের জনন তন্ত্র।

শুক্রাশয় থলি বা **স্ক্রোটাম** (Scrotum) বলে। শুক্রাশয়ের মধ্যে অসংখ্য প্যাঁচানো **শুক্রনালী** বা **সেমিনিফেরাস নালিকার** (Seminiferous tubules) মধ্যে শুক্রাণু (Sperm) উৎপন্ন হয়। শুক্রাণু কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালী বা **ভাস ইফারেন্স** (Vas efferens)-এর মধ্য দিয়ে **এপিডিডাইমিস** (Epididymis)

* উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

নালিকায় জমা হয়। এপিডিডাইমিস শুক্রনালীর (Vas deferens) সঙ্গে যুক্ত হয়। শুক্রনালী মূত্রস্থলীর **ইউরেথ্রা** (Urethra) নামক নালীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে **শুক্রথলি** (Seminal vesicle) ও **প্রস্টেট গ্রন্থি** (Prostate gland) থেকে

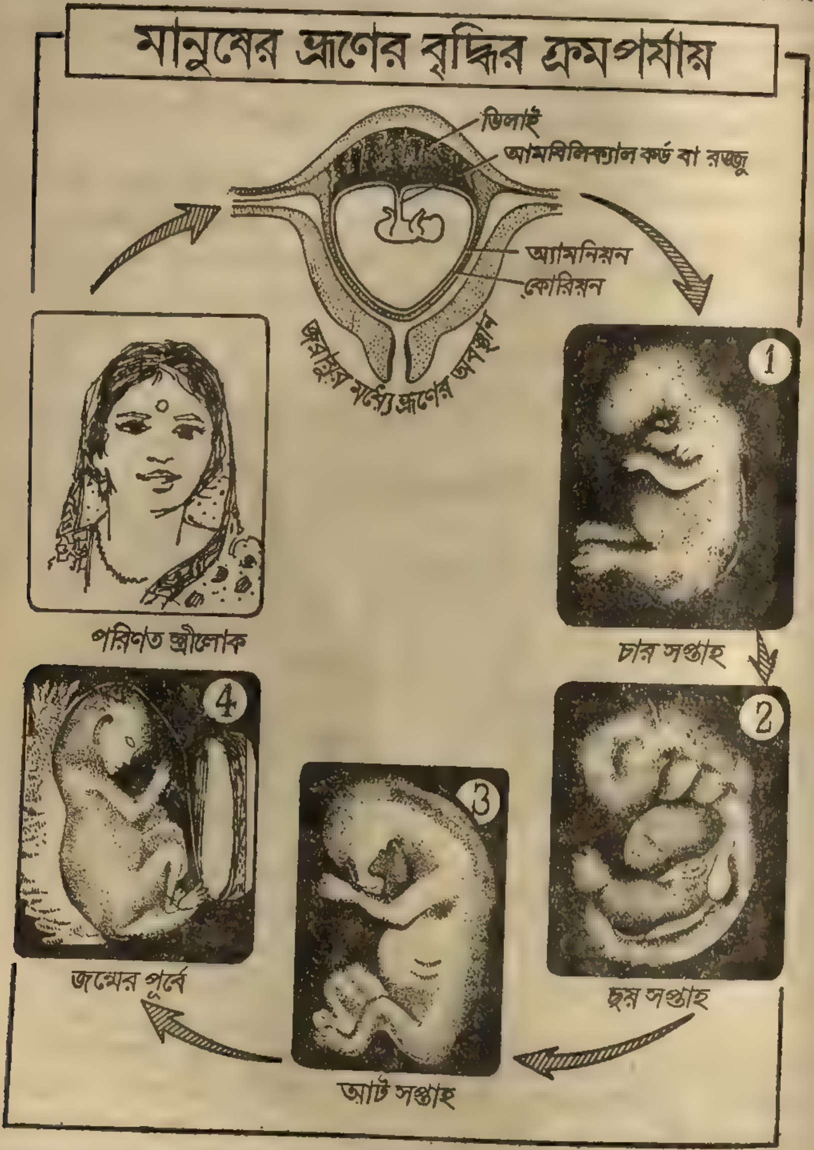

চিত্র 5.120 : মানুষের ভ্রূণের অবস্থা ও বৃদ্ধির ক্রমপর্যায়।

নির্গত নালীর সঙ্গে যুক্ত হয়। এর পর **কাউপার গ্রন্থি** (Cowper's gland) ইউরেথ্রাতে মুক্ত হয়। **ইউরেথ্রা** পুরুষাঙ্গের (Penis) মধ্য দিয়ে বাইরে মুক্ত হয়।

স্ত্রী-জনন তন্ত্র (Female reproductive system) :

স্ত্রী-জনন তন্ত্র একজোড়া **ডিম্বাশয়** (Ovary), একজোড়া **ডিম্বনালী** বা **ফ্যালোপিয়ান নালী**, একটি **জরায়ু**, **যোনি** ও **জননছিদ্র** নিয়ে গঠিত। প্রতি ডিম্বাশয়ের খুব কাছে ডিম্বনালীর ফানেলের মত মুখটি অবস্থিত। দেহের দু পাশের দুটি ডিম্বনালী মূত্রস্থলীর পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত ত্রিকোণাকৃতি জরায়ুর উপরের দিকের দুটি কোণের সঙ্গে যুক্ত। জরায়ুর তৃতীয় কোণটি লম্বা নালিকার মত যোনি সৃষ্টি করেছে। যোনি, জননছিদ্রপথে বাইরে মুক্ত হয়। জননছিদ্রটি অঙ্কদেশে পায়ুর সম্মুখ প্রান্তে একটি ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়েছে। এই ছিদ্রটিকে **ভালভা** (Vulva) বলে। ভালভার উপরের দিকে **ক্লাইটরিস** (Clitoris) নামক একটি ছোট মাংসপিন্ড বর্তমান। এই ক্লাইটরিসের নিচেই থাকে মূত্রছিদ্র। ডিম্বাশয়ে সৃষ্ট ডিম্বাণু ডিম্বনালীর ফানেল অংশ দিয়ে ডিম্বনালীতে প্রবেশ করে। এই ডিম্বনালীতেই নিষেক ঘটে। নিষিক্ত ডিম্বাণু ডিম্বনালীপথে জরায়ুতে এসে পৌঁছালে, জরায়ু গাত্রে প্রোথিত (implanted) হয়। তারপর দ্রুত কোষ বিভাজনের দ্বারা **ভ্রূণে** (Embryo) পরিণত হয়। ইতিমধ্যে **অমরা** (Placenta) নামে একটি কলা গঠিত হয়ে ভ্রূণ ও মাতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। ভ্রূণ অবস্থা থেকে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণত 280 দিন সময় লাগে।

5.86. জনুক্রম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা
(General idea about alternation of generations)

কোন কোন উদ্ভিদের (যথা—মস, ফার্ণ ইত্যাদির) ও কোন কোন প্রাণীর (যথা—ওবেলিয়া, জেলি-ফিশ ইত্যাদির) জীবন চক্রে (Life cycle) পর্যায়ক্রমে দু রকম জনন দশা দেখা যায়—অযৌন জনন দশা ও যৌন জনন দশা। এইরূপ ক্ষেত্রে অযৌন জননে অংশগ্রহণকারী উদ্ভিদদেহকে **রেণুধর উদ্ভিদ** (Sporophyte) বা **রেণুধর জনু** (Sporophytic generation) এবং যৌন জননে অংশগ্রহণকারী উদ্ভিদদেহকে **লিঙ্গধর উদ্ভিদ** (Gametophyte) বা **লিঙ্গধর জনু** (Gametophytic generation) বলে। ওবেলিয়া, জেলি-ফিশ প্রভৃতির ক্ষেত্রে অযৌন জননে অংশগ্রহণকারী রূপকে **পলিপ** (Polyp) বা **অযৌন জনু** এবং যৌন জননে অংশগ্রহণকারী রূপকে **মেডুসা** (Medusa) বা **যৌন জনু** বলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন চক্রে পর্যায়ক্রমে এইরূপ দুরকম জনন দশার (Reproductive phase) বা জনুর (generation) আবির্ভাবকে **জনুক্রম** বলে।

অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর অযৌন ও যৌন দশার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। তাছাড়া, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে রেণুধর ও লিঙ্গধর উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যাও ভিন্ন—রেণুধর উদ্ভিদ ডিপ্লয়েড (2n) এবং লিঙ্গধর উদ্ভিদ হ্যাপ্লয়েড (n)। প্রাণীদের ক্ষেত্রে অবশ্য অযৌন ও যৌন দশার মধ্যে ক্রোমোসোম-সংখ্যার প্রভেদ থাকে না।

> ● **উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জীবন চক্রে পর্যায়ক্রমে অযৌন ও যৌন দশার আবির্ভাবকে জনুক্রম বলে।**

5.87. জনুক্রমের উদাহরণ (Examples of alternation of generations)

(A) উদ্ভিদে : বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীতে জনুক্রম দেখা যায়; উদাহরণ হিসেবে এখানে ড্রায়োপটেরিস নামক ফার্ণ উদ্ভিদে জনুক্রমের বিবরণ দেওয়া হল।

ড্রায়োপটেরিস উদ্ভিদে সুস্পষ্ট জনুক্রম দেখা যায়। মূল, কান্ড ও পাতায় বিভেদিত উদ্ভিদদেহটি **রেণুধর জনু** (2n)। এদের পাতার নিচের পিঠে রেণুস্থলীর মধ্যে অসংখ্য রেণু (Spores) উৎপন্ন হয়। ঐ রেণুর সাহায্যে এরা **অযৌন জনন** সম্পন্ন করে। রেণু-মাতৃকোষ মায়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে রেণু উৎপন্ন করে—তাই রেণুগুলি হ্যাপ্লয়েড (n)।

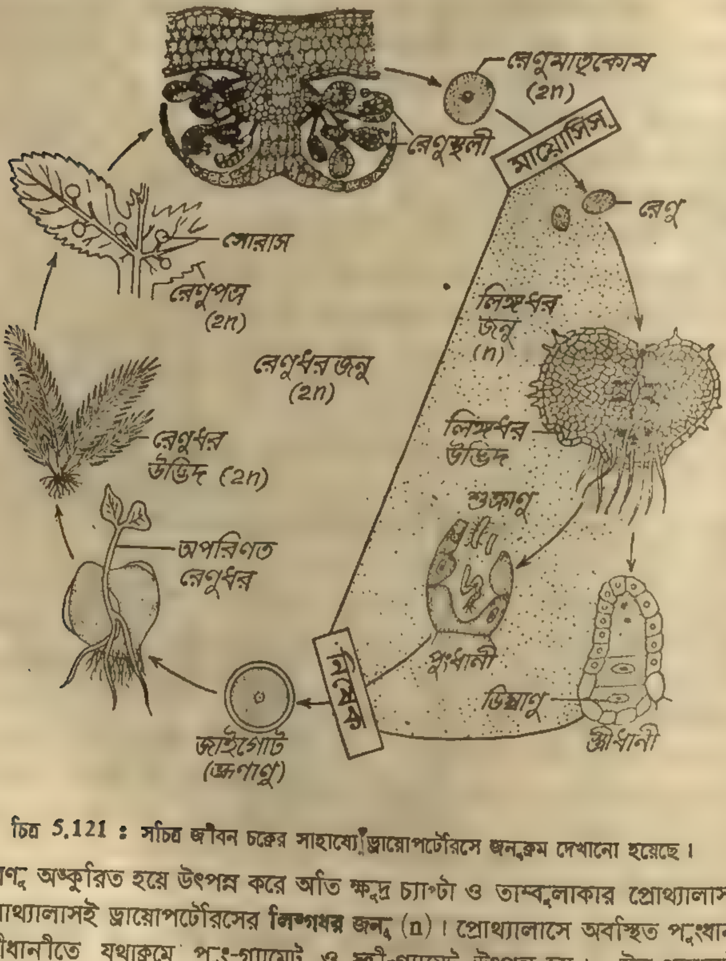

চিত্র 5.121 : সচিত্র জীবন চক্রের সাহায্যে ড্রায়োপটেরিসে জনুক্রম দেখানো হয়েছে।

রেণু অঙ্কুরিত হয়ে উৎপন্ন করে অতি ক্ষুদ্র চ্যাপ্টা ও তাম্বুলাকার প্রোথ্যালাস। এই প্রোথ্যালাসই ড্রায়োপটেরিসের **লিঙ্গধর জনু** (n)। প্রোথ্যালাসে অবস্থিত পুংধানী ও স্ত্রীধানীতে যথাক্রমে পুং-গ্যামেট ও স্ত্রী-গ্যামেট উৎপন্ন হয়। উক্ত গ্যামেটের সাহায্যে প্রোথ্যালাস যৌন জনন সম্পন্ন করে। পুং-গ্যামেট (n) ও স্ত্রী-গ্যামেট (n)

মিলিত হয়ে গঠন করে ডিপ্লয়েড (2n) ভ্রূণাণু। এই ভ্রূণাণু থেকেই ধীরে ধীরে মূল, কান্ড ও পাতায় বিভেদিত রেণুধর জনুর উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে। এইভাবে ড্রায়োপটেরিসের ক্ষেত্রে রেণুধর জনু (2n) ও লিঙ্গধর জনু (n) পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়।

(B) **প্রাণীতে** ঃ ওবেলিয়া (**Obelia**) নামে নিডেরিয়া পর্বভুক্ত সামুদ্রিক প্রাণীতে জনুক্রম দেখা যায়।

ওবেলিয়ায় ভ্রূণাণু (**Zygote**) থেকে লার্ভা সৃষ্টি হয়। উক্ত লার্ভা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে শাখা-প্রশাখা সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ ওবেলিয়া কলনির বা **পলিপ দশার** সৃষ্টি করে। এই পলিপ দশা 'অযৌন জনন' ক্ষমতাযুক্ত। এর পর পলিপের কোন কোন অংশ থেকে **মেডুসা** নামে একপ্রকার কোরকের উৎপত্তি হয়। মেডুসা নামক এই কোরক উৎপাদন একপ্রকার 'অযৌন জনন' প্রক্রিয়া।

চিত্র 5.122 ঃ ওবেলিয়ার জনুক্রম।

ছাতার মত দেখতে মেডুসাগুলি পলিপ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়। মেডুসাগুলি 'যৌন জনন' ক্ষমতাযুক্ত। এদের কোনটি পুরুষ ও কোনটি স্ত্রী। তাদের থেকে উৎপন্ন শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে অর্থাৎ যৌন প্রক্রিয়ায় আবার একটি পলিপের সৃষ্টি হয়।

অতএব ওবেলিয়ার জীবন চক্রে দুরকম পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে—চলচ্ছক্তিহীন ও **অযৌন জনন ক্ষমতাযুক্ত** পলিপ দশা এবং চলচ্ছক্তিসম্পন্ন ও **যৌন জনন ক্ষমতাযুক্ত** মেডুসা দশা। পর্যায়ক্রমে এই দুটি দশার আবির্ভাব ঘটে।

● বিষয়-সংক্ষেপ ●

● বাষ্পমোচন বা প্রস্বেদন ঃ

1. যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় প্রোটোপ্লাজম ও সূর্যালোকের আংশিক প্রভাবে উদ্ভিদদেহের প্রয়োজনাতিরিক্ত জল বায়ব অংশের মধ্য দিয়ে বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়, তাকে বাষ্পমোচন বা প্রস্বেদন বলে।
2. উদ্ভিদদেহ থেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত জল বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচন এই দুটি

প্রক্রিয়াতেই বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়, তবে বাষ্পীভবন হল ভৌত প্রক্রিয়া এবং বাষ্পমোচন হল শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া।

3. বাষ্পমোচন তিন প্রকার—(a) পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাষ্পমোচন, (b) কিউটিক্‌লের মাধ্যমে বাষ্পমোচন এবং (c) লেন্টিসেলের মাধ্যমে বাষ্পমোচন।

4. বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ জল উদ্ভিদদেহ থেকে নির্গত হয় তার মধ্যে 80%-90% পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাষ্পমোচনের ফলে, 10%-20% কিউটিকলের মাধ্যমে বাষ্পমোচনের ফলে এবং 5%-10% লেন্টিসেলের মাধ্যমে বাষ্পমোচনের ফলে নির্গত হয়।

5. পত্ররন্ধ্র হল পাতা এবং কান্ডের বহিঃস্ত্বকে অবস্থিত দুটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি রক্ষীকোষ দিয়ে বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশেষ।

6. পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষে শ্বেতসার থাকে। দিনের বেলায় সূর্যালোকের উপস্থিতিতে রক্ষীকোষ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য তা ব্যবহার করে। ফলে রক্ষীকোষের কোষরস প্রশমিত হয়ে পড়ে। অধিক তাপমাত্রা ও প্রশমিত কোষরসে শ্বেতসার বিভিন্ন অন্তর্বর্তী বিক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রবণীয় গ্লুকোজে পরিণত হয়। দ্রবণীয় গ্লুকোজ ও অজৈব ফসফেট রক্ষীকোষের কোষরসের অভিস্রবণ চাপ বাড়িয়ে দেয়। ফলে রক্ষীকোষ তার পার্শ্ববর্তী কোষ থেকে জল শোষণ করে রসস্ফীত হয়। এই অবস্থায় পত্ররন্ধ্র খুলে যায় এবং বাষ্পমোচন হয়।

7. রাতের অন্ধকারে, কম তাপমাত্রায় ও আম্লিক মাধ্যমে রক্ষীকোষের গ্লুকোজ ও অজৈব ফসফেট বিভিন্ন অন্তর্বর্তী বিক্রিয়ায় অদ্রবণীয় শ্বেতসারে পরিণত হয়। ফলে রক্ষীকোষের কোষরসের অভিস্রবণ চাপ কমে যায় এবং রক্ষীকোষ রসস্ফীতি হারিয়ে ফেলে এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে গেলে বাষ্পমোচনও বন্ধ হয়ে যায়।

8. পত্ররন্ধ্র উন্মোচনে সক্রিয় প্রোটন চলাচল পদ্ধতি প্রবর্তন করেন বিজ্ঞানী লেভিট (Levitt, 1974)। তিনি পত্ররন্ধ্র উন্মোচনে পটাসিয়াম আয়ন (K^+)-এর সক্রিয় ভূমিকার কথা বলেন। তাঁর মতে পত্ররন্ধ্রের খোলা বা বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রিত হয় পটাসিয়াম আয়ন দ্বারা। দিনের বেলা আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে রক্ষীকোষের সাইটোপ্লাজমে ম্যালিক অ্যাসিড সঞ্চিত হয়, এর ফলে পটাসিয়াম আয়ন শোষণ বৃদ্ধি পায়। এই পটাসিয়াম ক্যাটায়ন ও ম্যালিক অ্যাসিড অ্যানায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় রক্ষীকোষ পার্শ্বস্থ কোষ থেকে জল শোষণ করে। ফলে রক্ষীকোষ রসস্ফীত হয় এবং পত্ররন্ধ্র খুলে যায়।

9. বাষ্পমোচন ও বাষ্পীভবনের প্রধান পার্থক্যগুলি হল—
   (a) বাষ্পমোচন একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, কিন্তু বাষ্পীভবন একটি ভৌত প্রক্রিয়া।
   (b) বাষ্পমোচনে বিভিন্ন চাপের অস্তিত্ব দেখা যায়, কিন্তু বাষ্পীভবনে কোন চাপের অস্তিত্ব দেখা যায় না।
   (c) বাষ্পমোচন সজীব কোষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অপরপক্ষে বাষ্পীভবন কোন সজীব কোষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।
   (d) বাষ্পমোচনের পৃষ্ঠ-আয়তন (surface area) নিয়ন্ত্রিত হয় রক্ষীকোষ দ্বারা, অথচ বাষ্পীভবনের পৃষ্ঠ-আয়তন সম্পূর্ণ অনাবৃত।

10. বাষ্পমোচনের গুরুত্বগুলি হল—
   (a) রসের উৎস্রোত অব্যাহত থাকে।
   (b) শোষিত লবণের সংবহন তরান্বিত হয়।
   (c) বাষ্পমোচনের জন্য প্রয়োজনীয় লীন তাপ উদ্ভিদদেহ থেকে গৃহীত হয় বলে উদ্ভিদদেহ শীতল হয়।
   (d) জলের চাপ অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে উদ্ভিদদেহের কোন ক্ষতি করতে পারে না।
11. বাষ্পমোচন একটি ক্ষতিকর প্রয়োজনীয় পদ্ধতি, কারণ—
   ক্ষতিকর:
   (a) বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ার জন্য উদ্ভিদকে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রচুর জল শোষণ করতে হয়, ফলে প্রচুর ATP ব্যয় হয়।
   (b) মাটি থেকে সংগৃহীত কষ্টার্জিত জলের অপচয় হয়।
   (c) অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের আদান-প্রদান ব্যাহত হয়।
   (d) অনেক উদ্ভিদে অতিরিক্ত বাষ্পমোচন রোধ করার জন্য পাতার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল হ্রাস করতে হয়, ফলে সালোকসংশ্লেষ ও শ্বাসকার্য ব্যাহত হয়।
   প্রয়োজনীয়:
   (a) বাষ্পমোচনের ফলে রসের উৎস্রোত অব্যাহত থাকে।
   (b) দ্রবীভূত লবণের শোষণ ও সংবহন ত্বরান্বিত হয়।
   (c) উদ্ভিদদেহ থেকে প্রয়োজনীয় লীন তাপ গৃহীত হয় বলে উদ্ভিদদেহ শীতল হয়।
   (d) এই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত জল উদ্ভিদদেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ায়, কলা-কোষে জলের চাপের সাম্য বজায় থাকে। ফলে অতিরিক্ত জলের চাপ উদ্ভিদদেহের কোন ক্ষতি করতে পারে না।
12. বাষ্পমোচন কয়েকটি বাহ্য শর্ত ও কয়েকটি অভ্যন্তরীণ শর্তের উপর নির্ভরশীল। যথা—
   বাহ্য শর্ত: (i) পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা, (ii) বায়ুর আর্দ্রতা, (iii) আলোর তীব্রতা, (iv) বায়ুপ্রবাহ।
   অভ্যন্তরীণ শর্ত: (i) প্রোটোপ্লাজমের ঘনত্ব, (ii) জল শোষণের পরিমাণ, (iii) পত্ররন্ধ্রের উন্মোচন।

● **সালোকসংশ্লেষ:**

13. বিজ্ঞানী বার্নেস (Barnes) সর্বপ্রথম সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis) শব্দটি প্রবর্তন করেন।
14. যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল সবুজ উদ্ভিদের ক্লোরোফিলযুক্ত কোষে ক্লোরোফিল ও আলোকশক্তির সাহায্যে জৈব খাদ্যে পরিণত হয় এবং গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমপরিমাণ অক্সিজেন উপজাত বস্তুরূপে উৎপন্ন হয়, তাকে সালোকসংশ্লেষ বা ফটোসিন্থেসিস বলে।
15. সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হল—কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল, ক্লোরোফিল ও আলোক।
16. উদ্ভিদদেহে প্রধানত দু' ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে—সবুজ বর্ণের ক্লোরোফিল এবং হরিদ্রাভ লাল বর্ণের ক্যারোটিনয়েড। ক্লোরোফিল প্রধানত—ক্লোরোফিল-a

ক্লোরোফিল-b এই দু রকমের হয়। তাছাড়া c, d এবং e—এই কয়েক প্রকার ক্লোরোফিলও উদ্ভিদদেহে কমবেশী থাকে। ক্যারোটিনয়েড আবার দু' ধরনের—কমলা রঙের ক্যারোটিন ও হলুদ রঙের জ্যান্থোফিল।

17. ক্লোরোফিল-a ও ক্লোরোফিল-b-এর রাসায়নিক সংকেত যথাক্রমে

$$C_{55}H_{72}O_5N_4Mg \text{ এবং } C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$$

18. ক্লোরোফিল-এর পরমাণুগুলি চারটি পাইরল বলয়ের সাহায্যে বৃত্তাকারে বিন্যস্ত থাকে। কেন্দ্রে অবস্থান করে একটি ম্যাগনেসিয়াম পরমাণু (Mg)। একটি ফাইটল জাতীয় অ্যালকোহল পাইরল বলয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

19. অন্যান্য রঞ্জক পদার্থ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করলেও ক্লোরোফিল-a এই কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে একে মুখ্য রঞ্জক পদার্থ বলে।

20. নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ যথা, শৈবাল প্রভৃতির সকল দেহকোষেই সালোকসংশ্লেষ হয়ে থাকে। তবে উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদের সমস্ত সবুজ অংশে প্রধানত পাতার মেসোফিল কলায় সালোকসংশ্লেষ হয়।

21. সালোকসংশ্লেষের প্রথম দশায় অর্থাৎ আলোক দশায় সৌরশক্তিকে খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ করতে কয়েক শত ক্লোরোফিল অণু একত্রে একক হিসেবে কাজ করে। এই এককগুলি ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানায় কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানার মত **কোয়াণ্টাসোম** রূপে থাকে। কোয়াণ্টাসোমের মধ্যেই থাকে ক্লোরোফিল ও সালোকসংশ্লেষকারী উৎসেচক। তাই কোয়াণ্টাসোমগুলিকে সালোকসংশ্লেষ-**কারী একক** রূপে গণ্য করা হয়।

22. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটির রাসায়নিক সমীকরণ হল—

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{আলোক}]{\text{ক্লোরোপ্লাস্ট}} \underset{\text{(গ্লুকোজ)}}{C_6H_{12}O_6} + 6H_2O + 6O_2 \uparrow$$

23. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি দুটি দশার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়, যথা—(a) আলোকদশা এবং (b) অন্ধকার দশা।

24. সালোকসংশ্লেষের আলোক-নির্ভর যে দশা ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানায় সম্পন্ন হয় তাকে **আলোক দশা** বলে।

25. যে সমস্ত রঞ্জক পদার্থ সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে কার্যকর, তারা দুটি রঞ্জক তন্ত্র গঠন করে। অনেকগুলি ক্লোরোফিল-a অণুর দ্বারা **প্রথম রঞ্জক তন্ত্র** গঠিত হয়। আবার সংখ্যায় কম ভিন্ন প্রকৃতির ক্লোরোফিল-a, ক্লোরোফিল-b, ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল ইত্যাদি সহকারী রঞ্জক পদার্থ নিয়ে **দ্বিতীয় রঞ্জক তন্ত্র** গঠিত।

26. বিজারিত NADPH সৃষ্টি করাই প্রথম রঞ্জক তন্ত্রের কাজ এবং জলকে বিশ্লেষিত করে অক্সিজেন নির্গত করাই দ্বিতীয় রঞ্জক তন্ত্রের কাজ।

27. যে প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তির সাহায্যে জল, হাইড্রোজেন আয়ন (OH^+) ও হাইড্রক্সিল আয়নে (OH^-) বিশ্লিষ্ট হয়, তাকে জলের **ফটোলিসিস** বলে।

28. জলের ফটোলিসিসের ফলে উৎপন্ন হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^-)' পরস্পর বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে O_2 এবং H_2O গঠন করে এবং এই O_2 পরিবেশে মুক্ত হয়। সুতরাং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন O_2-এর উৎস হল জল।

29. আলোক দশায় উৎপন্ন ATP এবং $NADPH_2$ অন্ধকার দশায় CO_2কে

বিজারিত করে কার্বোহাইড্রেটে পরিণত করে। এজন্য ATP ও $NADPH_2$কে একত্রে **বিজারণ ক্ষমতা** বলে।

30. সালোকসংশ্লেষের আলোক দশায় আলোক শক্তির সাহায্যে উচ্চ শক্তিযুক্ত ফসফেট যৌগ ATP উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে **ফটোফসফোরাইলেশন** বলে।

31. ফটোফসফোরাইলেশন দু প্রকার—(i) নন-সাইক্লিক (Non-cyclic) বা অচক্রাকার এবং (ii) সাইক্লিক (Cyclic) বা চক্রাকার।

32. সালোকসংশ্লেষের আলোক নিরপেক্ষ যে দশা ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় সম্পন্ন হয় এবং যে দশায় CO_2 বিজারিত হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়, তাকে **অন্ধকার দশা** বলে।

33. বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ব্ল্যাকম্যান (Blackman) সর্বপ্রথম পর্যায়ক্রমে আলো এবং অন্ধকার (Intermittent light) ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষের অন্ধকার দশার পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়াগুলি আবিষ্কার করেছিলেন। তাই অন্ধকার দশাকে **ব্ল্যাকম্যানের বিক্রিয়াও** বলে।

34. বেনসন (Benson) ও কেলভিন (Calvin) 1956 খ্রীষ্টাব্দে তেজস্ক্রিয় কার্বন (C^{14}) সহযোগে গঠিত $C^{14}O_2$ ব্যবহার করে অন্ধকার দশার চক্রাকার বিক্রিয়াগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাই অন্ধকার দশার চক্রাকার বিক্রিয়াগুলিকে **কেলভিন চক্র** বলে।

35. যে প্রক্রিয়ায় পরিবেশের CO_2 জীবদেহে জৈব যৌগের অঙ্গীভূত হয়, তাকে **অঙ্গার-আত্তীকরণ** বলে।

36. রবিন হিল (Robin Hill) 1937 খ্রীষ্টাব্দে কোষ থেকে সংগৃহীত ক্লোরোপ্লাস্ট, হাইড্রোজেন-গ্রাহক পটাসিয়াম ফেরিক অক্সালেট এবং জলের মিশ্রণে আলোক প্রয়োগ করে দেখান যে, হাইড্রোজেন-গ্রাহক বিজারিত হয়ে পটাসিয়াম ফেরাস অক্সালেটে পরিণত হয় এবং O_2 নির্গত হয়। এই বিক্রিয়াটিকে **হিলের বিক্রিয়া** বলে।

37. 1941 খ্রীষ্টাব্দে স্যামুয়েল রুবেন ও মার্টিন ক্যামেন (Samuel Ruben & Martin Kamen) তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন (O_2^{18}) সহযোগে গঠিত জলের (H_2O^{18}) সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, **সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস হল জল।**

38. কিছু কিছু রঞ্জক কণাযুক্ত ব্যাকটিরিয়া এক বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবেশের CO_2 সহযোগে নিজেদের খাদ্য তৈরি করে।

39. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি কিছু বাহ্য এবং কিছু অভ্যন্তরীণ শর্তের উপর নির্ভরশীল। শর্তগুলি হল—আলোক, কার্বন ডাই-অক্সাইড, উষ্ণতা, জল, অক্সিজেন প্রভৃতি বাহ্য শর্ত এবং ক্লোরোফিল, পত্ররন্ধ্রের ছিদ্রের হ্রাসবৃদ্ধি, পটাসিয়াম, পাতার গঠন, প্রোটোপ্লাজম প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ শর্ত।

40. সালোকসংশ্লেষের তাৎপর্যগুলি হল—(i) শক্তি সঞ্চয়, (ii) খাদ্য সংশ্লেষ, (iii) অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ, (iv) মানব-সভ্যতা এবং (v) নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি।

● **শ্বসন**ঃ

41. খাদ্যের জারণের ফলে খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তির মুক্তিকে শ্বসন (Respiration) বলে।

42. জীব যে প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে O_2 গ্রহণ করে এবং বিনিময়ে CO_2 পরিত্যাগ করে, তাকে শ্বাসকার্য (Breathing) বলে।

43. শ্বসন একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, কিন্তু শ্বাসকার্য হল একপ্রকার ভৌত প্রক্রিয়া।

44. এক গ্রাম মোল গ্লুকোজ বা এক গ্রাম অণু গ্লুকোজের পরিপূর্ণ জারণে প্রায় 686 K.cal. তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়।

45. শ্বসন প্রক্রিয়াটি দুটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হয়। প্রথম পর্যায়টি বিভিন্ন উৎসেচকের প্রভাবে সজীব কোষের সাইটোপ্লাজমে হয়। এই পর্যায়টিকে গ্লাইকোলিসিস বলে এবং এই পর্যায়ে এক অণু গ্লুকোজ আংশিক জারিত হয়ে দু অণু পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। শ্বসনের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলি অক্সিজেনের উপস্থিতিতে কোষীয় অঙ্গাণু মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে ঘটে থাকে। এই পর্যায়ে পাইরুভিক অ্যাসিড সম্পূর্ণ রূপে জারিত হয়ে CO_2 এবং H_2O সৃষ্টি করে।

46. শ্বসন দু প্রকার, যথা—(i) সবাত শ্বসন ও (ii) অবাত শ্বসন।
সবাত শ্বসনঃ যে প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের সাহায্যে জীবকোষস্থ খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে শক্তি, CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে তাকে সবাত শ্বসন বলে।
অবাত শ্বসনঃ যে প্রক্রিয়ায় জীবকোষস্থ খাদ্যবস্তু অক্সিজেন ছাড়াই অসম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে সামান্য শক্তি, ইথাইল অ্যালকোহল এবং CO_2 অথবা সামান্য শক্তি ও ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে, তাকে অবাত শ্বসন বলে।

47. ঈস্ট, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি জীবাণু এক বিশেষ অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ অক্সিজেন ছাড়াই কোষবহিঃস্থ শর্করার আংশিক জারণ ঘটিয়ে ইথাইল অ্যালকোহল ও CO_2, ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রভৃতি এবং সামান্য শক্তি উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়াকে **কোহল সন্ধান** বলে।

48. সবাত এবং অবাত শ্বসনের যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির মাধ্যমে অক্সিজেন ছাড়াই জীবকোষস্থ গ্লুকোজ আংশিক জারিত হয়ে পাইরুভিক অ্যাসিড, $NADH_2$ এবং ATP উৎপন্ন করে তাকে **গ্লাইকোলিসিস** বলে।

49. গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়াটি সজীব কোষের সাইটোপ্লাজমে হয়ে থাকে।

50. গ্লাইকোলিসিস দশার বিক্রিয়াগুলি সর্বপ্রথম তিনজন বিজ্ঞানী এম্বডেন, মায়ারহফ্ ও পারনস বর্ণনা দিয়েছিলেন। তাই গ্লাইকোলিসিসকে EMP-পথ বলে।

51. গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ থেকে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড এবং আট অণু ATP উৎপন্ন হয়।

52. সবাত শ্বসনের যে দশায় চক্রাকার বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লাইকোলিসিসে উৎপন্ন পাইরুভিক অ্যাসিড অক্সিজেনের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়, তাকে **ক্রেবসের অম্লচক্র** বলে।

53. ক্রেবসের অম্লচক্রে উৎপন্ন প্রথম জৈব যৌগ সাইট্রিক অ্যাসিডে তিনটি কার্বক্সিল মূলক বর্তমান। তাই ক্রেবস চক্রকে **সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র** (Citric acid cycle) বা **ট্রাই-কার্বক্সিলিক অ্যাসিড চক্র** (TCA-cycle) বলে।

54. সবাত শ্বসনের অন্তিমলগ্নে যে প্রক্রিয়ায় বিজারিত হাইড্রোজেন-বাহক উৎসেচক-

গুলি অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জারিত হয় এবং উপজাত বস্তুরূপে জল উৎপন্ন করে, তাকে **প্রান্তীয় শ্বসন** বলে।

55. সবাত শ্বসনের পর্যায়গুলি হল—গ্লাইকোলাইসিস ; ক্রেবসের অম্লচক্র ও প্রান্তীয় শ্বসন।

56. সবাত শ্বসনে ATP অণু উৎপাদনের পরিমাণ হল—

গ্লাইকোলাইসিস থেকে— 8 অণু
ক্রেবস-এর অম্লচক্র থেকে—30 অণু

মোট —38 অণু ATP

57. বিভিন্ন প্রাণীর শ্বাস অঙ্গের নাম—কোষ পর্দা বা প্লাজমা পর্দা (অ্যামিবা), দেহপ্রাকার (হাইড্রা, স্পঞ্জ), ত্বক (কেঁচো, জোঁক), শ্বাসনালী (আরশোলা, ফড়িং), লাঙ্গ-বুক (মাকড়সা), ফুলকা (রুই, কাতলা), এবং অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র-সহ ফুলকা (কই, শিঙ্গি) ফুসফুস (গরু, ছাগল) এবং বায়ুথলি-সহ ফুসফুস (পায়রা) প্রভৃতি।

58. পরিবেশের বায়ু যে প্রক্রিয়ায় শ্বাস অঙ্গে প্রবেশ করে তাকে প্রশ্বাস (inspiration) এবং শ্বাস অঙ্গের বায়ু যে প্রক্রিয়ায় পরিবেশে মুক্ত হয় তাকে নিঃশ্বাস (expiration) বলে।

59. যে প্রক্রিয়ায় শ্বাস অঙ্গে O_2 এবং CO_2-এর (ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে) বিনিময় ঘটে তাকে **বহিঃশ্বসন** (external respiration) এবং দেহের অভ্যন্তরস্থ কলাকোষে যে প্রক্রিয়ায় O_2 ও CO_2-এর বিনিময় ঘটে অর্থাৎ O_2 কলাকোষের সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে এবং CO_2 কলাকোষ থেকে বেরিয়ে আসে, তাকে **অন্তঃশ্বসন** (internal respiration) বলে।

● **পুষ্টি :**

60. যে পদ্ধতিতে জীব জীবনধারণের জন্য খাদ্যবস্তুকে কোষীয় সাইটোপ্লাজমের অংশবিশেষে পরিণত করে, তাকে **পুষ্টি** বা **পরিপোষণ** বলে।

61. যে পদ্ধতিতে জীব জীবদেহে তৈরি খাদ্যোপাদানের মাধ্যমে পুষ্ট হয়, তাকে **স্বভোজী পুষ্টি** বলে।

62. যে পদ্ধতিতে জীব বাহ্য উৎস থেকে গৃহীত খাদ্যোপাদানের মাধ্যমে পুষ্ট হয় তাকে **পরভোজী পুষ্টি** বলে।

63. বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের মধ্যে যেগুলি উদ্ভিদ বেশী পরিমাণে গ্রহণ করে এবং যাদের অভাবে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, তাদের অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান বা ম্যাক্রো-এলিমেন্ট বলে ; যেমন—C, H, O, P, S, K, N, Ca, Fe, Mg। এই ম্যাক্রো-এলিমেন্টগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি মৌলিক উপাদান উদ্ভিদদেহে খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন, এদের মাইক্রো-এলিমেন্ট বা ট্রেস-এলিমেন্ট বলে ; যেমন—Mn, Zn, Cu, B, Si, Al, Mo প্রভৃতি।

64. যে পুষ্টি পদ্ধতিতে জীব জটিল খাদ্যোপাদান গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কোষস্থ সাইটোপ্লাজমের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিণত করে নিজেদের পুষ্টি সাধন করে, তাকে **হলোজোয়িক** পুষ্টি বলে।

65. খাদ্যগ্রহণ, গৃহীত, খাদ্যের পরিপাক, পাচিত খাদ্যাংশের শোষণ, শোষিত খাদ্যাংশের কোষস্থ সাইটোপ্লাজমের অংশবিশেষে পরিণত করা অর্থাৎ আত্তীকরণ এবং অপাচ্য খাদ্যাংশের বহিষ্করণ—এই পাঁচটি হল হলোজোয়িক পুষ্টির পর্যায়।

66. খাদ্যবস্তুর কোষীয় সাইটোপ্লাজমের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিণত হওয়াকেই **পরিপাক** বা **পাচন** বলে।

67. জীবজগতে দু রকম পরিপাক পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়—
(a) অন্তঃকোষীয় পরিপাক এবং (b) বহিঃকোষীয় পরিপাক।
(a) **অন্তঃকোষীয় পরিপাক**—যে পদ্ধতিতে কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে জটিল খাদ্যবস্তু জীর্ণ হয়, তাকে অন্তঃকোষীয় পরিপাক বলে। উদাঃ— অ্যামিবা।
(b) **বহিঃকোষীয় পরিপাক**—যে পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু কোষের বাইরে বিশেষ অঙ্গের মধ্যে জীর্ণ হয়, তাকে বহিঃকোষীয় পরিপাক বলে। উদাঃ—মানুষ।

68. হাইড্রা নামক একনালীদেহী প্রাণীতে অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় উভয় প্রকার পরিপাক পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়।

69. যে বস্তু গ্রহণ করলে দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ, দেহ সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন হয়, তাকে খাদ্য বলে।

70. রাসায়নিক সংগঠন ও কার্যকারিতার ভিত্তিতে খাদ্য মোট দু'ধরনের উপাদান নিয়ে তৈরি। যথা—(a) খাদ্যের মুখ্য উপাদান এবং (b) খাদ্যের সহায়ক উপাদান।

71. খাদ্যের যে উপাদানগুলি বিপাকীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে, তাদের মুখ্য উপাদান বলে। খাদ্যের মুখ্য উপাদান আবার তিন ধরনের, যথা— (1) কার্বোহাইড্রেট, (2) প্রোটীন এবং (3) স্নেহ পদার্থ।

72. খাদ্যের যে উপাদানগুলি বিপাকীয় কাজের জন্য শক্তি সরবরাহ করে না কিন্তু যাদের অভাবে জীবদেহের স্বাভাবিক কার্যকলাপ, বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যাহত হয়, তাদের সহায়ক উপাদান বলে। সহায়ক উপাদান আবার তিন ধরনের, যথা— **ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল।**

73. যে বিশেষ খাদ্যোপাদান সামান্য পরিমাণে প্রধানত খাদ্যের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে কিংবা সংশ্লেষিত হয়ে দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি, বৃদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন জৈবনিক কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে এবং যার অভাবে বিভিন্ন রোগের উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়, তাকে ভিটামিন (Vitamin) বলে।

74. ভিটামিন দু' শ্রেণীর। যথা—(i) স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন এবং (ii) জলে দ্রবণীয় ভিটামিন। ভিটামিন A, D, E এবং K হল স্নেহে দ্রবণীয় এবং ভিটামিন B-Complex, C এবং P হল জলে দ্রবণীয় ভিটামিন।

75. বিভিন্ন ভিটামিনের রাসায়নিক নাম হল—
ভিটামিন A=রেটিনল, ভিটামিন D=ক্যালসিফেরল, ভিটামিন E=টোকোফেরল, ভিটামিন K=ফাইলোকুইনোন বা ন্যাপথোকুইনোন, ভিটামিন B_1= থায়ামিন (বা থিয়ামিন), ভিটামিন B_2=রাইবোফ্লাভিন বা ল্যাকটোফ্লাভিন, ভিটামিন B_3=প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, ভিটামিন B_5=নিকোটিনিক অ্যাসিড বা নিয়াসিন (P—P factor), ভিটামিন B_6=পাইরিডক্সিন, ভিটামিন B_{12}= সায়ানোকোবালামিন, ভিটামিন M=ফোলিক অ্যাসিড, ভিটামিন H= বায়োটিন, ভিটামিন C=অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, ভিটামিন P=সাইট্রিন।

76. যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ ভিটামিনকে নিষ্ক্রিয় বা বিনষ্ট করে ভিটামিনের কার্যকারিতা নষ্ট করে তাদের **অ্যান্টিভিটামিন** (Antivitamin) বলে। যেমন—

পাইরিথায়ামিন ভিটামিন B_1-এর কাজে বাধা দেয়। সুতরাং পাইরিথায়ামিন একটি অ্যান্টিভিটামিন।

● **সংবহন:**

77. যে পদ্ধতিতে জীবদেহের সর্বত্র সরল খাদ্যোপাদান, অক্সিজেন, হরমোন, উৎসেচক, খনিজ পদার্থসমূহ পরিবাহিত হয় এবং বিভিন্ন কোষ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ বিশেষ অঙ্গসমূহে পরিবাহিত হয়, তাকে সংবহন বলে।
78. বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে সংবহনের মাধ্যমগুলি হল—জল, রক্ত ও লসিকা।
79. উদ্ভিদের মূল দ্বারা শোষিত জল ও খনিজ লবণ যে প্রক্রিয়ায় জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে অভিকর্ষের বিপরীত উদ্ভিদের ঊর্ধাঙ্গসমূহে পরিবাহিত হয়, তাকে রসের উৎস্রোত (Ascent of sap) বলে।
80. রসের উৎস্রোত সংক্রান্ত মতবাদগুলি হল—(i) মূলজ চাপ বা মূলজ প্রেষ মতবাদ (Root Pressure theory), (ii) অধিপ্রাণ মতবাদ বা জীবন বিধায়ক মতবাদ (Vital theory) এবং (iii) ভৌত মতবাদ (Physical theory)।
81. রক্ত সংবহনে রক্ত কখনোই দেহগহ্বরে মুক্ত না হলে তাকে বদ্ধ সংবহন (closed circulation) বলে; যেমন—অমেরুদণ্ডী প্রাণী অঙ্গুরীমাল পর্বভুক্ত কেঁচো সহ সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীতে বদ্ধ সংবহন দেখা যায়। রক্ত সংবহনে রক্ত দেহগহ্বরে মুক্ত হলে তাকে মুক্ত সংবহন (open circulation) বলে; যেমন—অমেরুদণ্ডী প্রাণী সন্ধিপদ পর্বভুক্ত পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীতে মুক্ত সংবহন দেখা যায়। আবার অমেরুদণ্ডী প্রাণী কম্বোজ পর্বভুক্ত শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ রক্তই রক্তবাহের মধ্যে আবদ্ধ থেকে শিরাপথে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়, কিন্তু সামান্য রক্ত দেহগহ্বরে মুক্ত হয়। এ ধরনের রক্ত সংবহনকে অর্ধবদ্ধ—অর্ধমুক্ত সংবহন (Half closed—half open circulation) বলে।
82. মুক্ত সংবহনযুক্ত প্রাণীদের দেহগহ্বরে রক্ত মুক্ত হয় বলে এ ধরনের দেহগহ্বরকে হিমোসিল (Haemocoel) বলে; যেমন—আরশোলা।
83. কোন অঙ্গে পৌঁছানোর আগে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র একবার রক্তের আবর্তন ঘটলে তাকে একচক্রী সংবহন (Single circuit circulation) বলে; যেমন—মৎস্য শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের; কোন অঙ্গে পৌঁছানোর আগে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্তের দু'বার আবর্তন ঘটলে তাকে দ্বিচক্রী সংবহন (Double circuit circulation) বলে; যেমন—উভচর শ্রেণীভুক্ত প্রাণী থেকে স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের রক্ত সংবহন।
84. যে রক্তবাহের মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, তাকে ধমনী বলে। আবার যে রক্তবাহের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ডে অথবা হৃৎপিণ্ডের দিকে ফিরে আসে, তাকে শিরা বলে।
85. কতকগুলি শিরা রক্তজালক থেকে উৎপন্ন হয়ে অন্য কোন অঙ্গে (বৃক্কে অথবা যকৃতে) পুনরায় জালকে বিভক্ত হয়ে অবশেষে হৃৎপিণ্ডে রক্ত বহন করে। দুই প্রান্তে জালকযুক্ত এ ধরনের শিরাগুলিকে পোর্টাল শিরা (Portal vein) বলে। পোর্টাল শিরা দু'ধরনের—হেপাটিক পোর্টাল শিরা ও রেনাল পোর্টাল শিরা।

86. রক্ত হল প্রাণিদেহের একপ্রকার বিশেষ গন্ধযুক্ত তরল যোগকলা।

87. রক্তের তরল ধাত্রকে রক্তরস বা প্লাজমা বলে, যার 91-92% জল। এই রক্তরসে বিভিন্ন কণিকা ভাসমান অবস্থায় থাকে। এই কণিকাগুলি তিন ধরনের—লোহিত রক্ত কণিকা বা এরিথ্রোসাইট (R.B.C), শ্বেত রক্ত কণিকা বা লিউকোসাইট (W.B.C.) এবং অণুচক্রিকা (Blood platelets) বা থ্রম্বোসাইট (Thrombocytes)।

88. ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভে (William Harvey) 1628 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মানবদেহে কিভাবে রক্ত সংবহন হয়, তার বিশদ বর্ণনা দেন।

89. হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর তিনস্তরবিশিষ্ট। এই স্তরগুলি হল—(i) এণ্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium)—সবচেয়ে ভিতরের স্তর, (ii) মায়োকার্ডিয়াম (Myocardium)—মধ্যস্তর এবং (iii) এপিকার্ডিয়াম (Epicardiam)—সবচেয়ে বাইরের স্তর।

90. চার প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথে যে একমুখী দ্বিপত্র কপাটিকা থাকে তাকে মিট্রাল কপাটিকা (Mitral Valve) বলে।

91. পশ্চাৎ মহাশিরার ছিদ্রপথে ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা (Eustachian Valve), করোনারী সাইনাসের ছিদ্রপথে থেবেসিয়ান কপাটিকা (Thebesian Valve), মহাধমনী ও ফুসফুসীয় ধমনীর ছিদ্রপথে তিনটি করে অর্ধ-চন্দ্রাকার কপাটিকা (Semilunar Valve) থাকে।

92. রক্তজালকের ভেদ্য প্রাচীরের মাধ্যমে রক্তের যে তরল অংশ বেরিয়ে কলা-কোষের সরাসরি সংস্পর্শে আসে এবং বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে লসিকাবহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাকে লসিকা (Lymph) বলে। লসিকা এক ধরনের পরিবর্তিত কলারস (modified tissue fluid)।

- **রেচন:**

93. যে প্রক্রিয়ায় বিপাকীয় কাজের ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় অথবা ক্ষতিকারক পদার্থসমূহ জীবদেহ থেকে প্রতিনিয়ত নিষ্কাশিত হয়, তাকে রেচন (Excretion) বলে।

94. উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলি প্রাণীদের রেচন পদার্থ থেকে অপেক্ষাকৃত কম-ক্ষতিকারক। এর প্রধান কারণ হল—(i) উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন অনেক পদার্থ অন্যান্য বিপাক ক্রিয়ায় পুনরায় ব্যবহৃত হয়। (ii) উদ্ভিদদেহে উৎপন্ন রেচন পদার্থগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই নাইট্রোজেন-বিহীন, এবং ঐ নাইট্রোজেনবিহীন রেচন পদার্থগুলি তেমন ক্ষতিকারক নয়। (iii) উদ্ভিদদেহে প্রোটীন ও নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ ভেঙে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়, যা আবার বিভিন্ন যৌগ গঠনে অংশ গ্রহণ করে। (iv) রেচন পদার্থ হিসেবে উৎপন্ন কয়েক ধরনের লবণ কেলাসিত অবস্থায় উদ্ভিদকোষে সঞ্চিত থাকে। এই সব পদার্থ কোষরসে দ্রবীভূত না হলে উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর হয় না।

95. উদ্ভিদের রেচন প্রক্রিয়াগুলি হল—(i) পর্ণমোচী উদ্ভিদের পত্রমোচন, (ii) বল্কল ত্যাগ, (iii) ফলের খোসা, বীজ প্রভৃতি অঙ্গের মোচন, (iv) জলজ উদ্ভিদের দেহ থেকে গ্যাসীয় ও তরল বর্জ্য পদার্থ—ব্যাপন প্রক্রিয়ায় নির্গত হয়ে জলে মিশে যায়।

96. উদ্ভিদের বিভিন্ন উপক্ষার ও তাদের উৎস—
কুইনাইন=সিঙ্কোনা গাছের ছাল ; নিকোটিন=তামাক পাতা, থেইন=চা পাতা, কেফিন=কফি বীজ, রেসারপিন=সর্পগন্ধা গাছের মূল, স্ট্রীকনিন=কুঁচিলার বীজ, মরফিন=আফিম গাছের ফল, অ্যাট্রোপিন=বেলেডোনা গাছের পাতা ও মূল।

97. গ্লাইকোসাইড হল—কার্বোহাইড্রেট পচনের ফলে উৎপন্ন একপ্রকার কার্বনযুক্ত উদ্ভিদ রেচন পদার্থ। ডিজিটক্সিন (Digitoxin), ডিজিটালিস (Digitalis) প্রভৃতি গ্লাইকোসাইডের দৃষ্টান্ত।

98. মেরুদন্ডী প্রাণীদের প্রধান রেচন অঙ্গ হল একজোড়া বৃক্ক। বৃক্ক তিন প্রকার, যথা—(i) প্রোনেফ্রোস, (ii) মেসোনেফ্রোস এবং (iii) মেটানেফ্রোস।

99. নেফ্রন হল বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত একক। কেননা, একদিকে যেমন অসংখ্য নেফ্রন নিয়ে এক-একটি বৃক্ক গঠিত, অন্য দিকে তেমনি প্রতিটি নেফ্রন যে কাজ করে, তাই হল সামগ্রিকভাবে বৃক্কের কাজ।

100. প্রতিটি নেফ্রনের দুটি অংশ—(i) ম্যালপিজিয়ান করপাসল্ (Malpighian corpuscle) বা রেনাল করপাসল্ (Renal corpuscle) এবং (ii) রেনাল টিউবিউল (Renal tubule)। প্রতিটি ম্যালপিজিয়ান করপাসল্ আবার একটি বোম্যান ক্যাপসিউল (Bowman capsule) ও একটি গ্লোমেরিউলাস (Glomerulus) নিয়ে গঠিত।

101. মেরুদন্ডী প্রাণীদের নাইট্রোজেন ঘটিত তরল বর্জ্য পদার্থকে মূত্র বলে।

102. একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক মানুষের দুটি বৃক্কে প্রতি 24 ঘণ্টায় 135-150 লিটার তরলের পরিস্রাবণ ঘটে, কিন্তু 24 ঘণ্টায় মূত্রাশয় থেকে মাত্র 1·5 লিটার (গড়ে) মূত্র নিষ্কাশিত হয়। অর্থাৎ পরিস্রুত তরলের মাত্র 1% মূত্র হিসেবে পরিত্যক্ত হয়, বাকী 99% পুনঃশোষিত হয়।

103. বৃক্কের প্রধান কাজ হল—
(i) রক্ত থেকে N_2 ঘটিত বর্জ্য পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত করে, (ii) রক্তের জল-সাম্য বজায় রাখে, (iii) রক্তের দ্রবীভূত অজৈব লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, (iv) প্রয়োজনে এরিথ্রোপোয়েটিন (Erythropoietin) নামক হরমোন, হিপ্পুরিক অ্যাসিড (Hippuric acid), বেনজয়িক অ্যাসিড (Benzoic acid) এবং অজৈব ফসফেট (iP) যৌগ উৎপন্ন করে। (v) ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন ঔষধ দেহ থেকে নিষ্কাশিত করে।

104. বৃক্ক ছাড়া মেরুদন্ডী প্রাণীদের অন্যান্য রেচন অঙ্গ হল—
(i) ত্বক, (ii) যকৃৎ, (iii) ফুলকা, (iv) ফুসফুস, (v) অন্ত্র।

● **বৃদ্ধিঃ**

105. যে প্রক্রিয়ায় জীবদেহের আকার, আয়তন ও শুষ্ক ওজনের স্থায়ী ঊর্ধ্বমুখী পরিবর্তন হয়, তাকে বৃদ্ধি (Growth) বলে।

106. বৃদ্ধির বিভিন্ন দশা হল—
বৃদ্ধির হারের উপর ভিত্তি করে—(i) ল্যাগ দশা (Lag phase) বা বিলম্বিত দশা, (ii) লগ দশা (Log phase) এবং (iii) স্থায়ী দশা বা স্থিতিশীল দশা (Stationary phase)। কোষ বিভাজনের উপর ভিত্তি করে—(i) কোষ বিভাজন দশা (Phase of cell division), (ii) দীর্ঘীভবন দশা (Phase of elongation) এবং (iii) পরিণতির দশা (Phase of maturation)।

107. ল্যাগ দশা, লগ দশা ও স্থিতিশীল দশাগুলিকে সময় ও বৃদ্ধির হারের পরিপ্রেক্ষিতে ছক কাগজে (graph paper) প্রতিস্থাপন করলে যে লেখচিত্র (graph) পাওয়া যায়, সেটি অনেকটা ইংরেজী বর্ণ 'S' আকৃতির মত হয়। বৃদ্ধির এই লেখচিত্রটিকে সিগ্‌ময়েড কার্ভ অব গ্রোথ (Sigmoid curve of growth) বলে।

108. বৃদ্ধির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন বৃদ্ধি হয় সেই সময়কালকে মুখ্য বৃদ্ধিকাল (Grand period of growth) বলে।

109. উদ্ভিদদেহে জনন অঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গের বৃদ্ধিকে অঙ্গজ বৃদ্ধি (Vegetative growth) বলে। আবার উদ্ভিদদেহে পুষ্পমুকুল সৃষ্টি এবং সেই মুকুলের ক্রমে ফুল ও ফলে পরিণত হওয়ার সময় যে বৃদ্ধি হয় তাকে জননগত বৃদ্ধি (Reproductive growth) বলে।

110. উদ্ভিদের বৃদ্ধি কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। এই শর্তগুলিকে দু ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—অভ্যন্তরীণ শর্তাবলী এবং বাহ্য শর্তাবলী।
অভ্যন্তরীণ শর্তাবলী—(i) পুষ্টি, (ii) জল, (iii) উৎসেচক এবং (iv) উদ্বোধক বা হরমোন।
বাহ্য শর্তাবলী—(i) আলোক, (ii) তাপমাত্রা, (iii) কার্বন ডাই-অক্সাইড, (iv) অক্সিজেন, (v) ক্ষত এবং (vi) মৃত্তিকা।

111. প্রাণিদেহের কোন অংশের ক্ষয়-ক্ষতি হলে দ্রুত কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধির মাধ্যমে সেই ক্ষয়-ক্ষতিপূরণ করার প্রক্রিয়াকে পুনরুৎপাদন (Regeneration) বলে।

112. পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হওয়ার সময় লার্ভার যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে, তাকে লার্ভার রূপান্তর (Metamorphosis) বলে। রূপান্তরের মাধ্যমে প্রাণিদেহের যে পরিস্ফুরণ হয় তাকে পরোক্ষ পরিস্ফুরণ (Indirect development) বলে। আবার অপত্য প্রাণি আকার-আয়তনে ছোট হলেও যখন পূর্ণাঙ্গ প্রাণির মত দেখতে হয় এবং ভ্রূণ থেকে সরাসরি অপত্য প্রাণি সৃষ্টি হয় তখন সেই প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ (Direct development) বলে।

● **চলন:**

113. উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার জন্য জীবের সম্পূর্ণ দেহ বা দেহাংশের যে সঞ্চালন বা আন্দোলন হয় তাকে চলন (Movement) বলে।

114. চলনের মাধ্যমে অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে জীবদেহের সামগ্রিক-ভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়াকে গমন (Locomotion) বলে।

115. যে অঙ্গ বা উপাঙ্গ চালনা করে জীব একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে, তাকে যথাক্রমে গমন অঙ্গ (Locomotory organ) বা গমন উপাঙ্গ (Locomotory organelle) বলে।

116. গমনের উদ্দেশ্যগুলি হল—(i) প্রাণীরা প্রধানত পরভোজী হওয়ায় খাদ্য অন্বেষণের জন্য গমন করে, (ii) নিরাপদ আশ্রয় অর্থাৎ উপযুক্ত পরিবেশের সন্ধানে জীব গমন করে, (iii) শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতে জীবের গমন হয়, (iv) পরিবেশের প্রতিকূলতার জন্য জীব স্থান পরিবর্তন তথা গমন করে, (v) জননের সঙ্গী অন্বেষণও গমনের একটি উদ্দেশ্য, (vi) জৈবনিক চাহিদা পূরণের জন্য জীব গমনে আগ্রহী হতে পারে।

117. উদ্ভিদের চলন প্রক্রিয়াকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(i) সামগ্রিক

চলন বা গমন (Movement of locomotion) এবং (ii) আংশিক চলন বা বক্র চলন (Movement of curvature)।

সামগ্রিক চলন আবার দু' রকমের—(a) স্বতঃস্ফূর্ত গমন (Spontaneous movement or Autonomic movement) এবং (b) প্রবৃত্ত বা আবিষ্ট গমন (Induced movement or Paratonic movement or Tactic movement)।

আংশিক চলন বা বক্রচলনও দু রকমের—(a) স্বতঃস্ফূর্ত বক্রচলন (Spontaneous movement of curvature or Autonomic movement of curvature) এবং (b) প্রবৃত্ত বক্রচলন (Induced movement of curvature or Paratonic movement of curvature)।

118. যে প্রবৃত্ত বক্রচলনে বাহ্য উদ্দীপকের গতিপথ, উদ্ভিদ অংশের বক্রচলনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে দিগ্‌নির্ণীত বক্রচলন বা ট্রপিক চলন বলে।

যে প্রবৃত্ত বক্রচলনে উদ্ভিদ অঙ্গ বাহ্য উদ্দীপকের গতিপথ দ্বারা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে উদ্দীপকের তীব্রতা তথা তীক্ষ্ণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে ব্যাপ্তি চলন বা ন্যাস্টিক চলন বলে।

119. এককোষী প্রাণীদের গমন অঙ্গগুলি হল—(i) ক্ষণপদ—অ্যামিবা, (ii) সিলিয়া—প্যারামিসিয়াম, (iii) ফ্ল্যাজেলা—ইউগ্লিনা, (iv) মায়োনিম অনুসূত্র—মনোসিস্‌টিস।

120. যে পেশীগুলির সংকোচনে একই অঙ্গের দুটি অস্থির মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে অঙ্গটি ভাঁজ হয়, তাদের ফ্লেক্সর পেশী (Flexor muscles) বলে। অপরপক্ষে যে পেশীগুলির সংকোচনে দুটি অস্থির মধ্যে দূরত্ব বেড়ে অঙ্গটি সোজা হয়, তাদের এক্সটেনসর পেশী (Extensor muscles) বলে।

● **জনন ঃ**

121. কোন জীবের দেহ বা দেহাংশ থেকে নতুন জীব সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে জনন বলে। জননের ফলে সৃষ্ট নতুন জীবকে অপত্য জীব এবং যে জীবদেহ থেকে অপত্য জীব উৎপন্ন হয়, তাকে জনিতৃ জীব বলে। অপত্য জীব দেখতে হুবহু জনিতৃ জীবের মত হয়।

122. জীবজগতে জনন পদ্ধতি প্রধানত দু রকমের—(i) অযৌন জনন (Asexual reproduction) এবং (ii) যৌন জনন (Sexual reproduction)। এছাড়া উদ্ভিদের অংগজ জনন (Vegetative reproduction) এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অপুংজনি (Parthenogenesis) প্রক্রিয়ায়ও বংশবিস্তার হয়।

123. সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের নিষেক ক্রিয়ার সময় ভ্রূণস্থলীর মধ্যে একটি পুংজনন নিউক্লিয়াস ডিম্বাণুর সঙ্গে এবং অপর একটি পুংজনন নিউক্লিয়াস ভ্রূণ-নির্ণীত নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয়। দুটি পুংজনন নিউক্লিয়াস ভ্রূণস্থলীর দুটি নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয় বলে এই প্রক্রিয়াকে দ্বি-নিষেক বা দ্বি-গর্ভাধান (Double fertilization) বলে।

124. যখন দুটি ভিন্ন জননকোষের বা গ্যামেটের মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় ভ্রূণাণু বা জাইগোট (Zygote), যা নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়, তাকে যৌন জনন বলে।

অনুশীলনী

বাষ্পমোচন

(A) দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Long Answer type questions) :

1. বাষ্পমোচন কাকে বলে? বাষ্পমোচন কত প্রকার ও কি কি? বিভিন্ন প্রকার বাষ্পমোচনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উঃ 234-235 পৃঃ দেখ]
2. কোন্ প্রকার বাষ্পমোচনে উদ্ভিদ সবচেয়ে বেশী পরিমাণ জল ত্যাগ করে? এই প্রকার বাষ্পমোচনে পত্রের কোন্ বিশেষ অঙ্গ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে? ঐ বিশেষ অঙ্গের উন্মোচন ও বন্ধ হওয়ার শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক বর্ণনা দাও। [উঃ 234-238 পৃঃ দেখ]
3. বাষ্পমোচন কোন্ কোন্ শর্তের উপর নির্ভরশীল? ঐ শর্তগুলির বর্ণনা দাও। [উঃ 239-240 পৃঃ দেখ]
4. উদ্ভিদ বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনাতিরিক্ত জল ত্যাগ করে—এই উক্তিটি প্রমাণ করার জন্য একটি সহজ পরীক্ষা পদ্ধতির বর্ণনা দাও। [উত্তর : 5·7 দেখ]
5. নিজের তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের বাষ্পমোচনের একটি সহজ পরীক্ষার বর্ণনা দাও। [উত্তর : 242 পৃঃ দেখ]
6. বিষমপৃষ্ঠ পাতার দুই তলের বাষ্পমোচনের হার অসমান—এই উক্তির সপক্ষে একটি পরীক্ষার বর্ণনা দাও। [উত্তর : 244 পৃঃ দেখ]

(B) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer type questions) :

7. একটি শারীরবৃত্তীয় ও একটি ভৌত প্রক্রিয়ার উল্লেখ কর, যার মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রয়োজনাতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে নির্গত করে। [উত্তর : 5·3 দেখ]
8. বাষ্পমোচন কোন্ কোন্ পারিপার্শ্বিক শর্তের উপর নির্ভরশীল? [উত্তর : 5·6 দেখ]
9. বাষ্পমোচন কত প্রকার ও কি কি? কোন্ প্রকার বাষ্পমোচনে শতকরা কত ভাগ জল বাষ্পাকারে পরিত্যক্ত হয়? [উত্তর : 5·3 দেখ]
10. পত্ররন্ধ্রের গঠন বর্ণনা কর। [উত্তর : 236 পৃঃ দেখ]
11. পত্ররন্ধ্রের উন্মোচনে বিজ্ঞানী লেভিট প্রবর্তিত প্রোটন চলাচল পদ্ধতির বর্ণনা দাও। [উত্তর : 237-238 পৃঃ দেখ]
12. শুধু ছকের মাধ্যমে পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াটি উল্লেখ কর। [উত্তর : 237 পৃঃ দেখ]
13. প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচনের সংগে বাষ্পীভবনের পার্থক্য কি? [উত্তর : 238 পৃঃ দেখ]
14. বাষ্পমোচন কাকে বলে? উদ্ভিদদেহে বাষ্পমোচনের গুরুত্ব উল্লেখ কর। [উত্তর : 5·2 এবং 238 পৃঃ দেখ]
15. বাষ্পমোচন উদ্ভিদের একটি ক্ষতিকর প্রয়োজনীয় পদ্ধতি—বুঝিয়ে দাও। [উত্তর : 239 পৃঃ দেখ]
16. চিত্রসহ গ্যানং-এর পোটোমিটারের বর্ণনা দাও। [উঃ 5·7-এর ২য় পরীক্ষা]

(C) **অতি সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্ট উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন** (Very short or specific Answer type questions):

17. কোন্ প্রকার বাষ্পমোচনে উদ্ভিদ সব থেকে বেশী জল পরিত্যাগ করে? [উত্তরঃ 5·3 (a) দেখ]
18. বাষ্পমোচন ছাড়া আর কোন্ কোন্ প্রয়োজনে পত্ররন্ধ্র ব্যবহৃত হয়? [উত্তরঃ 235 পৃঃ দেখ]
19. পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষ দুটি রসস্ফীত হলে রন্ধ্রপথ খুলে যায় কেন? [উত্তরঃ 236 পৃঃ (i) দেখ]
20. রাত্রে পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষের গ্লুকোজ কেন এবং কিভাবে শ্বেতসারে পরিণত হয়? [উত্তরঃ 236 পৃঃ (ii) দেখ]
21. আলোর তীব্রতা কিভাবে বাষ্পমোচনকে প্রভাবিত করে? [উত্তরঃ 5·6 (3) দেখ]
22. অবনমন বা উইল্টিং কি? [উত্তরঃ 5·6 (2) দেখ]
23. বিষমপৃষ্ঠ পাতার নিচের তলের কোবাল্ট ক্লোরাইড কাগজের বর্ণ নীল থেকে লাল হয়ে যায় কেন? [উত্তরঃ 245 পৃঃ দেখ]

সালোকসংশ্লেষ

(A) **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন** (Long Answer type questions):

1. সালোকসংশ্লেষ কাকে বলে? সালোকসংশ্লেষের বিভিন্ন উপাদান কি কি? সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ঐ উপাদানগুলির ভূমিকা উল্লেখ কর। [উত্তরঃ 5·9 এবং 5·10 দেখ]
2. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া কোথায় হয়? সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি কয়টি দশায় বিভক্ত? ঐ দশাগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উত্তরঃ 5·11 ও 5·12 দেখ]
3. ফটোফসফোরাইলেশন কাকে বলে? ফটোফসফোরাইলেশন কত প্রকার ও কি কি? ছকের সাহায্যে ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। [উত্তরঃ 252-255 পৃঃ দেখ]
4. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী যৌগ কি? সালোকসংশ্লেষের কোন্ দশায় এটি উৎপন্ন হয়? ছকের সাহায্যে ঐ দশার বর্ণনা দাও। [উত্তরঃ 256 ও 257 পৃঃ দেখ]
5. সালোকসংশ্লেষ ও রাসায়নিক সংশ্লেষের মধ্যে পার্থক্য কি? কোন্ জীবাণু রাসায়নিক সংশ্লেষ করে থাকে? রাসায়নিক সংশ্লেষ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [উত্তরঃ 5·14 দেখ]
6. সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক কাকে বলে? সালোকসংশ্লেষে কোন্ কোন্ রঞ্জক অংশগ্রহণ করে? ঐ রঞ্জকগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উত্তরঃ 251 পৃঃ দেখ]
7. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি কোন্ কোন্ শর্তের উপর নির্ভরশীল? ঐ শর্তগুলি কত প্রকার? সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি ঐ শর্তগুলি দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়, আলোচনা কর। [উত্তরঃ 5·15 দেখ]
8. সালোকসংশ্লেষের তাৎপর্য আলোচনা কর। [উত্তরঃ 5·16 দেখ]

(B) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer type questions) :

9. ফটোলিসিস কাকে বলে? ফটোলিসিস প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে উল্লেখ কর। [উত্তর : 251-252 পৃঃ দেখ]

10. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় মুখ্য রঞ্জক পদার্থ কোন্‌টি? বর্ণালীর কোন্ কোন্ বর্ণ সালোকসংশ্লেষের পক্ষে উপযোগী? ফোটন বা কোয়াণ্টা কি? [উঃ 249 পৃঃ দেখ]

11. ক্লোরোফিল-a এবং ক্লোরোফিল-b অণুর রাসায়নিক-সংকেত উল্লেখ করে এদের গঠন বর্ণনা কর। [উঃ 247 পৃঃ দেখ]

12. উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদের কোন্ অংশে সালোকসংশ্লেষ হয়? [উঃ 249 পৃঃ দেখ]

13. সালোকসংশ্লেষকারী একক কাকে বলে? ঐ এককের গঠন বর্ণনা কর। [উঃ ঐ]

14. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্যকর রঞ্জকতন্ত্রগুলি কি কি? ঐ রঞ্জকতন্ত্রগুলির সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দাও। [উঃ 251 পৃঃ দেখ]

15. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কোন্ গ্যাস উপজাত বস্তু হিসেবে নির্গত হয়? ঐ গ্যাসের উৎস কি এবং কিভাবে তা প্রমাণ করা যায়? [উত্তর : 5·12 দেখ]

16. শব্দ চিত্রের (word diagram) মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষের আলোকদশার উল্লেখ কর। [উঃ 252 পৃঃ দেখ]

17. সবুজ ক্লোরোফিলযুক্ত উদ্ভিদে সূর্যের আলো থেকে গৃহীত সৌরশক্তি কিভাবে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বর্ণনা কর। [উত্তর : 5·12 দেখ]

18. কেলভিন চক্র কি? ছকের সাহায্যে চক্রটি বর্ণনা কর। [উঃ 256-257 পৃঃ দেখ]

19. অঙ্গার আত্তীকরণ কাকে বলে? সালোকসংশ্লেষকে অঙ্গার আত্তীকরণ বলে কেন? [উঃ 256 পৃঃ দেখ]

20. হিল বিক্রিয়া কি? সমীকরণসহ হিল বিক্রিয়াটি বর্ণনা কর। হিলের বিকারক কাকে বলে? [উঃ 257 পৃঃ দেখ]

(C) অতি সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্ট উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short or specific answer type questions) :

21. কোন্ প্রকার জীবদেহে সালোকসংশ্লেষ হয়? [উত্তর : 5·11 দেখ]

22. ফটোসিন্থেসিস শব্দটি কে প্রচলন করেন? [উঃ 245 পৃঃ দেখ]

23. সালোকসংশ্লেষের সংজ্ঞা দাও। [উত্তর : 5·9 দেখ]

24. সালোকসংশ্লেষের উপাদানগুলি কি কি? [উত্তর : 5·10 দেখ]

25. ফটোলিসিস কাকে বলে? [উঃ 247 পৃঃ দেখ]

26. কোন্ বিজ্ঞানী উদ্ভিদকোষের সবুজ রঞ্জক পদার্থটির নাম ক্লোরোফিল দিয়েছিলেন? [উঃ ঐ]

27. কোয়াণ্টাসোম কি? [উঃ 249 পৃঃ দেখ]

28. সালোকসংশ্লেষের সামগ্রিক বিক্রিয়াটি উল্লেখ কর। [উঃ 250 পৃঃ দেখ]

29. বিজারণ ক্ষমতা বলতে কি বোঝ? [উঃ 252 পৃঃ দেখ]

30. সালোকসংশ্লেষে পটাসিয়াম মৌলের ভূমিকা উল্লেখ কর। [উঃ 259 পৃঃ দেখ]

(D) পার্থক্য নির্দেশ কর (Differentiate between):

31. সালোকসংশ্লেষ ও রাসায়নিক সংশ্লেষ। [উত্তরঃ 5·14 দেখ]
32. সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন ও নন্-সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন। [উঃ 253-254 পৃঃ দেখ]
33. সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক ও সাহায্যকারী রঞ্জক। [উত্তরঃ 5·12 দেখ]
34. আলোক দশা ও অন্ধকার দশা। [উঃ 5·12 দেখ]
35. হিল বিক্রিয়া ও ব্ল্যাকম্যান বিক্রিয়া। [উঃ ঐ]
36. কোয়ান্টা ও কোয়ান্টাসোম। [উঃ ঐ]

(E) টীকা লিখ (Write notes on):

37. কেলভিন চক্র। [উঃ 5·12 দেখ]
38. হিল বিক্রিয়া। [উঃ ঐ]
39. আলোক দশা। [উঃ ঐ]
40. অন্ধকার দশা। [উঃ ঐ]
41. ব্ল্যাকম্যানের বিক্রিয়া। [উঃ ঐ]
42. রাসায়নিক সংশ্লেষ। [উঃ 5·14 দেখ]
43. অঙ্গার আত্তীকরণ। [উঃ 5·12 দেখ]
44. ক্লোরোফিল। [উঃ ঐ]
45. PSI ও PSII। [উঃ ঐ]

শ্বসন

(A) দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Long answer type questions):

1. শ্বসন কাকে বলে? শ্বসন কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার শ্বসনের সংজ্ঞা ও রাসায়নিক সমীকরণ উল্লেখ করে, তাদের পার্থক্য নির্দেশ কর। [উঃ 263 পৃঃ দেখ]
2. সবাত ও অবাত শ্বসনের সাধারণ পর্যায়টির নাম কি? ঐ পর্যায়ের বর্ণনা দাও। [উঃ 5·23 দেখ]
3. গ্লাইকোলিসিসের সর্বশেষ উৎপন্ন পদার্থের নাম কি? ঐ পদার্থটি অক্সিজেনের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে কিভাবে জারিত হয়, বুঝিয়ে দাও। [উঃ 5·23 এবং 5·24 দেখ]
4. ক্রেবস চক্রটি কোষের কোথায় সম্পন্ন হয়? ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়াগুলি ছকের সাহায্যে বর্ণনা কর। [উঃ 268 ও 270 পৃঃ দেখ]
5. শ্বসন ও শ্বাসকার্যের মধ্যে পার্থক্য কি? শ্বসন বস্তু কাকে বলে? শ্বসন বস্তু ও শ্বসনের মধ্যে সম্পর্ক কি বুঝিয়ে দাও। [উঃ 5·17 ও 5·18 দেখ]
6. প্রান্তীয় শ্বসন বা সাইটোক্রোম পথ কাকে বলে? প্রান্তীয় শ্বসন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। [উঃ 270-271 পৃঃ দেখ]
7. শ্বাস অঙ্গ কাকে বলে? প্রাণীর বিভিন্ন শ্বাস অঙ্গ ও শ্বসন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর। [উঃ 5·26 দেখ]
8. মানুষের শ্বাস অঙ্গের গঠন বর্ণনা করে শ্বাসকার্যের বিবরণ দাও। [উঃ 278-283 পৃঃ দেখ]

(B) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer type questions) :

9. অপচিতি কাকে বলে? শ্বসনকে অপচিতিমূলক বিপাক ক্রিয়া বলা হয় কেন? [উঃ 261 পৃঃ দেখ]
10. শ্বাসকার্য কাকে বলে? শ্বাসকার্যের সংগে শ্বসনের মূল পার্থক্য কি? [উঃ ঐ]
11. সবাত শ্বসনের রাসায়নিক সমীকরণটি লেখ, ঐ সমীকরণ থেকে কি কি বোঝা যায় উল্লেখ কর। [উঃ 263 পৃঃ দেখ]
12. কোহল সন্ধান কাকে বলে? কোহল সন্ধান এবং অবাত শ্বসনের মধ্যে মূল পার্থক্য কি? [উঃ 264 পৃঃ এবং 273 পৃঃ দেখ]
13. EMP-pathway কাকে বলে? ঐ পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলি কোষের কোথায় সম্পন্ন হয় এবং এই পর্যায়ের সর্বশেষ উৎপন্ন পদার্থটি কি? [উঃ 265-266 পৃঃ দেখ]
14. ইলেকট্রন প্রবাহ বা ইলেকট্রন স্তানান্তরণ কাকে বলে? ইলেকট্রন স্তানান্তরণ প্রক্রিয়াটি ছকের সাহায্যে দেখাও। [উঃ 271 পৃঃ দেখ]
15. উদ্ভিদদেহে কিভাবে শ্বাসকার্য হয়ে থাকে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উঃ 273-274 পৃঃ দেখ]
16. পতঙ্গশ্রেণীর প্রাণীদের শ্বাস অঙ্গের নাম কি? পতঙ্গশ্রেণীর প্রাণীদের শ্বাস-কার্য বর্ণনা কর। [উঃ 275-276 পৃঃ দেখ]
17. বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসন কাকে বলে? প্রক্রিয়া দুটির বর্ণনা দাও। [উঃ 281 পৃঃ দেখ]

(C) অতি সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্ট উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short or specific Answer type questions) :

18. খাদ্যের জারণে খাদ্যস্থ কোন্ শক্তির মুক্তি ঘটে? [উঃ 261 পৃঃ দেখ]
19. একগ্রাম মোল গ্লুকোজের সম্পূর্ণ জারণে কত পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়? [উঃ 262 পৃঃ দেখ]
20. শ্বসন কোথায় হয়? [উঃ ঐ]
21. সবাত শ্বসনে কি কি উৎপন্ন হয়? [উঃ 263 পৃঃ দেখ]
22. অবাত শ্বসনে কি কি উৎপন্ন হয়? [উঃ ঐ]
23. সবাত শ্বসনে মোট কত অণু ATP উৎপন্ন হয়? [উঃ 272 পৃঃ দেখ]
24. শ্বাস অঙ্গ কাকে বলে? [উঃ 273 পৃঃ দেখ]
25. এককোষী প্রাণীদের শ্বাস অংগের নাম কি? [উঃ 274 পৃঃ দেখ]
26. ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্যের দুটি দৃষ্টান্ত দাও। [উঃ 275 পৃঃ দেখ]
27. অতিরিক্ত শ্বাস অংগ কি? অতিরিক্ত শ্বাস অংগযুক্ত দুটি প্রাণীর নাম কর। [উঃ 276 পৃঃ দেখ]
28. এপিপোডাইট কি? [উঃ 277 পৃঃ দেখ]

(D) পার্থক্য নির্দেশ কর (Differentiate between) :

29. শ্বসন ও শ্বাসকার্য। [উঃ 262 পৃঃ দেখ]
30. সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন। [উঃ 284 পৃঃ দেখ]
31. সবাত ও অবাত শ্বসন। [উঃ 272 পৃঃ দেখ]
32. অবাত শ্বসন ও কোহল সন্ধান। [উঃ 273 পৃঃ দেখ]
33. বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসন। [উঃ 281 পৃঃ দেখ]

34. প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস। [উঃ 281 ও 282 পৃঃ দেখ]

(E) টীকা লেখ (Write notes on):

35. শ্বসন বস্তু। [উত্তরঃ 238 পৃঃ দেখ]
36. সবাত শ্বসন। [উঃ 263 পৃঃ দেখ]
37. অবাত শ্বসন। [উঃ ঐ]
38. কোহল সন্ধান। [উঃ 264 পৃঃ দেখ]
39. শ্বাস অঙ্গ। [উঃ 273 পৃঃ দেখ]
40. অতিরিক্ত শ্বাস অঙ্গ। [উঃ 276 পৃঃ দেখ]
41. প্লুরা। [উঃ 278 পৃঃ দেখ]
42. শ্বাসকার্য। [উঃ 261-262 পৃঃ দেখ]

পুষ্টি

(A) দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Long Answer type questions):

1. পুষ্টি কাকে বলে? স্বভোজী উদ্ভিদের পুষ্টি কিভাবে হয় তা আলোচনা কর। [উঃ 285-286 পৃঃ দেখ]
2. খাদ্যের মুখ্য ও সহায়ক উপাদানগুলি কি কি? পরভোজী উদ্ভিদের পুষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা কর। [উঃ 296, 301 ও 287-290 পৃঃ দেখ]
3. হলোজোইক পুষ্টি কাকে বলে? হলোজোইক পুষ্টির ভিন্ন পর্যায়গুলি কি কি? হলোজোইক পুষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা কর। [উঃ 290-296 পৃঃ দেখ]
4. অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাকের মধ্যে পার্থক্য কি? বহিঃকোষীয় পরিপাক পদ্ধতির বর্ণনা দাও। [উঃ 291-294 পৃঃ দেখ]
5. খাদ্য কাকে বলে? খাদ্যের উপাদানগুলি কত প্রকার ও কি কি? খাদ্যের শক্তি সরবরাহক উপাদানগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উঃ 296-301 পৃঃ দেখ]
6. জল-অঙ্গার বা কার্বোহাইড্রেট কাকে বলে? উদাহরণসহ জল-অঙ্গারের শ্রেণীবিভাগ কর। জল-অঙ্গারের ভূমিকা উল্লেখ কর। [উঃ 296-298 পৃঃ দেখ]
7. জীবের দেহগঠনকারী খাদ্যের মুখ্য উপাদান কি? এর সাংগঠনিক একক কি? এই জাতীয় খাদ্য উপাদানের উদাহরণসহ শ্রেণীবিভাগ কর। [উঃ 298-300 পৃঃ দেখ]
8. স্নেহ পদার্থ কাকে বলে স্নেহ পদার্থ কত প্রকার ও কি কি? স্নেহ পদার্থের গঠন, উৎস ও ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। [উঃ 300-301 পৃঃ দেখ]
9. খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিনের সংজ্ঞা দাও। বিভিন্ন প্রকার ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিনের রাসায়নিক নাম, উৎস, কার্যকারিতা ও অভাবজনিত প্রতিক্রিয়াগুলি উল্লেখ কর। [উঃ 301-305 পৃঃ দেখ]
10. জলে দ্রবণীয় ভিটামিনের রাসায়নিক নাম, উৎস, কার্যকারিতা ও অভাবজনিত প্রতিক্রিয়াগুলি উল্লেখ কর। [উঃ 305-313 পৃঃ দেখ]
11. ম্যাক্রো এলিমেন্ট ও মাইক্রো এলিমেন্ট কাকে বলে? উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর। [উঃ 286-287 পৃঃ দেখ]
12. খাদ্য কাকে বলে? মানবদেহে খাদ্য পরিপাক পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উঃ 296 ও 292 পৃঃ দেখ]

13. জীবদেহে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা ও তাদের উৎস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উঃ 313-317 পৃঃ দেখ]

(B) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer type questions):

14. পুষ্টি কাকে বলে? পোষক কাদের বলে? দেহ পরিপোষক ও দেহ সংরক্ষক পোষকগুলি কি কি? [উঃ 285 পৃঃ দেখ]
15. স্বভোজী পুষ্টির সংজ্ঞা দাও। উদ্ভিদের স্বভোজী পুষ্টি পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [উঃ 285-286 পৃঃ দেখ]
16. পরভোজী পুষ্টি কাকে বলে? উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার পরভোজী পুষ্টির বর্ণনা দাও। [উঃ 287-289 পৃঃ দেখ]
17. হলোজোইক পুষ্টি কাকে বলে? হলোজোইক পুষ্টির প্রথম ও শেষ পর্যায়ের বর্ণনা দাও। [উঃ 290-291 ও 296 পৃঃ দেখ]
18. বিজারণক্ষম শর্করা কাকে বলে? উদাহরণ দাও। জল-অঙ্গার বা কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা উল্লেখ কর। [উঃ 297-298 পৃঃ দেখ]
19. প্রথম শ্রেণীর প্রোটীন ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটীন বলতে কি বোঝ? উভয় শ্রেণীর প্রোটীনের উদাহরণ দাও। [উঃ 299 পৃঃ দেখ]
20. স্নেহ পদার্থ কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার স্নেহ পদার্থের বর্ণনা দাও। [উঃ 300-301 পৃঃ দেখ]
21. ভিটামিন শব্দটি কে এবং কবে প্রবর্তন করেন? ভিটামিন কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার ভিটামিনের রাসায়নিক নাম ও কার্যকারিতা উল্লেখ কর। [উঃ 302-313 পৃঃ দেখ]
22. ভিটামিনের সংজ্ঞা দাও। বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের অভাবজনিত প্রতিক্রিয়াগুলি উল্লেখ কর। অ্যান্টিভিটামিন কি? [উঃ 301-313 পৃঃ দেখ]
23. পুষ্টির সংজ্ঞা দাও। পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর। [উঃ 285 ও 317 পৃঃ দেখ]

(C) অতি সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্ট উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short or specific Answer type questions):

24. অপরিহার্য মৌলিক উপাদান কাকে বলে? [উঃ 286 পৃঃ দেখ]
25. চোষকমূল বা হস্টোরিয়া কি? [উঃ 288 পৃঃ দেখ]
26. অন্যোন্যজীবী কাকে বলে? [উঃ ঐ]
27. হলোজোইক পুষ্টির বিভিন্ন পর্যায় কি কি? [উঃ 290 পৃঃ দেখ]
28. নিডোব্লাস্ট কোষ কাকে বলে? এর কাজ কি? [উঃ ঐ]
29. অন্তঃকোষীয় পরিপাক কাকে বলে? [উঃ 291 পৃঃ দেখ]
30. পাকস্থলীর পাচক রসের উপাদানগুলি উল্লেখ কর। [উঃ 292 পৃঃ দেখ]
31. অগ্ন্যাশয় রসের উপাদানগুলি উল্লেখ কর। [উঃ 293 পৃঃ দেখ]
32. পয়স্বিনী বা ল্যাকটিয়াল কি? [উঃ 296 পৃঃ দেখ]
33. মল কি? [উঃ 296 পৃঃ দেখ]
34. বিজারণক্ষম শর্করা বা রিডিউসিং সুগার কাকে বলে? [উঃ 297 পৃঃ দেখ]
35. প্রস্থেটিক গ্রুপ কি? [উঃ 299 পৃঃ দেখ]
36. কোন্ ভিটামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়? বেরিবেরি কত প্রকার ও কি কি? [উঃ 306 পৃঃ দেখ]

37. পি. পি. ফ্যাক্টর কি? এর কার্যকারিতা উল্লেখ কর। [উঃ 308 পৃঃ দেখ]
38. পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া কি? এর প্রতিকার কিভাবে করা যায়? [উঃ 309 পৃঃ দেখ]
39. অ্যান্টি-ভিটামিন কাকে বলে? উদাহরণ দাও। [উঃ 313 পৃঃ দেখ]
40. খাদ্যে আয়োডিনের অভাবজনিত প্রতিক্রিয়াগুলি উল্লেখ কর। [উঃ 315 পৃঃ দেখ]

(D) **পার্থক্য নির্দেশ কর** (Differentiate between) :

41. স্বভোজী ও পরভোজী পুষ্টি। [উঃ 285 ও 287 পৃঃ দেখ]
42. ম্যাক্রো এলিমেন্ট ও মাইক্রো এলিমেন্ট। [উঃ 286 পৃঃ দেখ]
43. পূর্ণ পরজীবী ও আংশিক পরজীবী। [উঃ 287-288 পৃঃ দেখ]
44. বহিঃপরজীবী ও অন্তঃপরজীবী। [উঃ 288 পৃঃ দেখ]
45. মৃতজীবীয় পুষ্টি ও মিথোজীবীয় পুষ্টি। [উঃ ঐ]
46. অন্তঃকোষীয় পরিপাক ও বহিঃকোষীয় পরিপাক। [উঃ 291-292 পৃঃ দেখ]
47. সরল প্রোটীন, যুগ্ম প্রোটীন ডিরাইভড্ প্রোটীন। [উঃ 299 পৃঃ দেখ]
48. প্রথম শ্রেণীর প্রোটীন ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটীর। [উঃ ঐ]
49. সরল স্নেহ পদার্থ ও জটিল স্নেহ পদার্থ। [উঃ 300-301 পৃঃ দেখ]
50. ভিটামিন ও অ্যান্টিভিটামিন। [উঃ 301-313 পৃঃ দেখ]

সংবহন

(A) **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন** (Long Answer type questions) :

1. সংবহন কাকে বলে? উদ্ভিদের সংবহন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [উঃ 5·34 এবং 5·36 দেখ]
2. রসের উৎস্রোত বলতে কি বোঝ? উদ্ভিদদেহে রসের উৎস্রোত সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ উল্লেখ কর। [উঃ 324 পৃঃ দেখ]
3. সংবহনের বিভিন্ন মাধ্যম কি কি? অমেরুদণ্ডী প্রাণিদেহে সংবহন পদ্ধতির বর্ণনা দাও। [উঃ 322 ও 327 পৃঃ দেখ]
4. অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহন তন্ত্রের পার্থক্য উল্লেখ কর। মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত সংবহন পদ্ধতির বর্ণনা দাও। [উঃ 329-330 পৃঃ দেখ]
5. হৃৎপিণ্ড কাকে বলে? বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের তুলনামূলক আলোচনা কর। [উঃ 333-336 পৃঃ দেখ]
6. একচক্রী ও দ্বি-চক্রী সংবহন কাকে বলে? একচক্রী ও দ্বি-চক্রী সংবহনযুক্ত একটি করে প্রাণীর উদাহরণ দাও এবং ঐ প্রাণী দুটির রক্ত সংবহন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উঃ 334-336 পৃঃ দেখ]
7. চিহ্নিত চিত্রসহ মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা কর এবং হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত সংবহন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উঃ 346-347 পৃঃ দেখ]
8. রক্তবাহ কি? রক্তবাহ কত প্রকার ও কি কি? বিভিন্ন প্রকার রক্তবাহের গঠন বর্ণনা কর। [উঃ 338-340 পৃঃ দেখ]

9. সিস্টেমিক, পোর্টাল, করোনারী ও ফুসফুসীয় সংবহন সম্বন্ধে যা জান বর্ণনা কর। [উঃ 347-349 পৃঃ দেখ]
10. লসিকার সংজ্ঞা দাও। লসিকাতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উঃ 349-351 পৃঃ দেখ]

(B) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer type questions)ঃ

11. সংবহনের সংজ্ঞা দাও। সংবহনের বিভিন্ন মাধ্যমের বর্ণনা দাও। [উঃ 322 পৃঃ দেখ]
12. রসের উৎস্রোত কাকে বলে? রসের উৎস্রোত সম্পর্কিত অধিপ্রাণ মতবাদ ব্যাখ্যা কর। [উঃ 324-325 পৃঃ দেখ]
13. রসের উৎস্রোত সম্পর্কে—'বাষ্পমোচন-সংসক্তি টানবাদ'—মতবাদটি কার? মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। [উঃ 326 পৃঃ দেখ]
14. বন্ধ সংবহন, মুক্ত সংবহন ও অর্ধবন্ধ-অর্ধমুক্ত সংবহন কাকে বলে? উদাহরণ-সহ বুঝিয়ে দাও। [উঃ 329-330 পৃঃ দেখ]
15. পোর্টাল শিরা কাকে বলে? পোর্টাল শিরা কত প্রকার ও কি কি? [উঃ 339 পৃঃ দেখ]
16. রক্তের সংজ্ঞা দাও। রক্তের বিভিন্ন উপাদান উল্লেখ কর। [উঃ 331 পৃঃ দেখ]
17. "হৃৎপিণ্ড অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি রূপেও কাজ করে"—ব্যাখ্যা কর। [উঃ 338 পৃঃ দেখ]
18. লসিকাবহ কত প্রকার ও কি কি? বিভিন্ন প্রকার লসিকাবহ সম্পর্কে আলোচনা কর। [উঃ 349 পৃঃ দেখ]

(C) অতি সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্ট উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short or specific Answer type questions)ঃ

19. জীবদেহের সংবহনের বিভিন্ন মাধ্যম কি কি? [উঃ 322 পৃঃ দেখ]
20. মূলজ চাপ বা মূলজ প্রেস কাকে বলে? [উঃ 324 পৃঃ দেখ]
21. রিলে পাম্প থিওরি কার মতবাদ? মতবাদটি আলোচনা কর। [উঃ 325 পৃঃ দেখ]
22. পাল্‌সেটরী মুভমেন্ট থিওরি কার মতবাদ? মতবাদটি আলোচনা কর। [উঃ ঐ]
23. উদ্ভিদদেহে খাদ্যবস্তুর সংবহন পদ্ধতি আলোচনা কর। [উঃ 326-327 পৃঃ দেখ]
24. বন্ধসংবহন ও মুক্তসংবহন কাকে বলে? [উঃ 329-330 পৃঃ দেখ]
25. হিমোসিল কি? [উঃ 328 পৃঃ দেখ]
26. অর্ধবন্ধ-অর্ধমুক্ত সংবহন কাকে বলে? কোন্ প্রাণীতে ঐ ধরনের সংবহন দেখা যায়? [উঃ 329 পৃঃ দেখ]
27. ভেনাস হৃৎপিণ্ড কাকে বলে? কোন্ প্রাণীতে এ ধরনের হৃৎপিণ্ড দেখা যায়? [উঃ 335 পৃঃ দেখ]
28. কোন্ সরীসৃপে চার প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ড দেখা যায়? [উঃ 336 পৃঃ দেখ]
29. মিট্রাল কপাটিকা কি? মিট্রাল কপাটিকা হৃৎপিণ্ডে কোথায় থাকে? [উঃ ঐ]
30. কোন্ ধমনী দূষিত রক্ত এবং কোন্ শিরা বিশুদ্ধ রক্ত পরিবহণ করে? [উঃ 340 পৃঃ দেখ]

31. পেরিকার্ডিয়াম কি? পেরিকার্ডিয়ামের অন্তর্বর্তী স্থানের তরল পদার্থটির নাম কি? [উঃ 342 পৃঃ দেখ]
32. থেবেসিয়ান কপাটিকা কি এবং কোথায় অবস্থিত? [উঃ 343 পৃঃ দেখ]
33. লসিকা গ্রন্থি কি? [উঃ 350 পৃঃ দেখ]

(D) পার্থক্য নির্দেশ কর (Differentiate between):

34. অধিপ্রাণ মতবাদ ও ভৌত মতবাদ। [উঃ 325 ও 326 পৃঃ দেখ]
35. রিলে পাম্প থিওরি ও পাল্‌সেটারী মুভমেন্ট থিওরি। [উঃ 325 পৃঃ দেখ]
36. বন্ধসংবহন ও মুক্তসংবহন। [উঃ 329-330 পৃঃ দেখ]
37. ধমনী ও শিরা। [উঃ 340 পৃঃ দেখ]
38. সিস্টেমিক শিরা ও পোর্টাল শিরা। [উঃ 339 পৃঃ দেখ]
39. মিট্রাল কপাটিকা ও থেবেসিয়ান কপাটিকা। [উঃ 343-344 পৃঃ দেখ]
40. করোনারী সংবহন ও পোর্টাল সংবহন। [উঃ 348-349 পৃঃ দেখ]
41. অন্তর্মুখী লসিকাবহ ও বহির্মুখী লসিকাবহ। [উঃ 349 পৃঃ দেখ]
42. দক্ষিণ লসিকাবহ ও বক্ষ লসিকাবহ। [উঃ ঐ]
43. পয়ঃস্বিনী বা ল্যাকটিয়েলস ও লসিকা গ্রন্থি। [উঃ 350 পৃঃ দেখ]

রেচন

(A) দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Long Answer type questions):

1. রেচন কাকে বলে? উদ্ভিদের রেচন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও। [উঃ 5·57 ও 5·58 দেখ]
2. উদ্ভিদকোষে সঞ্চিত কয়েকটি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বার্জ্য পদার্থের বিবরণ দাও। [উঃ 5·59 দেখ]
3. অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেচন প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উঃ 5·61 দেখ]
4. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রধান রেচন অঙ্গের চিত্রসহ গঠন বর্ণনা কর। [উঃ 5·62 দেখ]
5. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৃক্ক কত প্রকার ও কি কি? নেফ্রনকে বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত একক বলা হয় কেন? চিত্রসহ নেফ্রনের গঠন ও কার্য বর্ণনা কর। [উঃ 362 ও 364 পৃঃ দেখ]
6. মূত্র কি? মূত্র কিভাবে তৈরি হয়? মূত্রত্যাগ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [উঃ 369 ও 368 পৃঃ দেখ]
7. বৃক্ক ছাড়া মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্যান্য রেচন অঙ্গের বর্ণনা দাও। বৃক্কের কাজগুলি উল্লেখ কর। [উঃ 371 ও 369 পৃঃ দেখ]

(B) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer type questions):

8. রেচন কাকে বলে? ক্ষরিত পদার্থের সঙ্গে রেচন পদার্থের পার্থক্য কি? [উঃ 5·57 দেখ]
9. উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলি প্রাণীদের রেচন পদার্থ থেকে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক কেন বুঝিয়ে দাও। [উঃ 5·58 দেখ]
10. উদ্ভিদের প্রধান প্রধান রেচন প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উঃ 353 পৃঃ দেখ]

11. উপক্ষার কি ধরনের উদ্ভিদ বর্জ্য পদার্থ? উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার উপক্ষারের নাম, উৎস ও ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ কর। [উঃ 353-354 পৃঃ দেখ]
12. বৃক্ক কাকে বলে? বৃক্ক কত প্রকার ও কি কি? একটি আদর্শ বৃক্কের লম্বচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। [উঃ 362 ও 363 পৃঃ দেখ]
13. মূত্র কি? মূত্রের উপাদানগুলি উল্লেখ কর। একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক মানুষ গড়ে দৈনিক কত পরিমাণ মূত্র ত্যাগ করে? [উঃ 369 ও 370 পৃঃ দেখ]
14. মল রেচন পদার্থ নয় কেন? [উঃ 352 পৃঃ দেখ]
15. উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলি প্রাণীদের রেচন পদার্থ থেকে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক কেন? [উঃ 352-353 পৃঃ দেখ]
16. রজন কি? রজন কত প্রকার ও কি কি? [উঃ 355 পৃঃ দেখ]
17. উদ্ভিদকোষে সঞ্চিত বিভিন্ন প্রকার খনিজ কেলাসের বর্ণনা দাও। [উঃ ঐ]
18. মাছেদের রেচন পদার্থের নাম কি? সরীসৃপ ও পক্ষীদের রেচন পদার্থের সঙ্গে মাছেদের রেচন পদার্থের মূল পার্থক্য কি? [উঃ 5·60 দেখ]
19. এককোষী প্রাণীদের রেচন ক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হয়? [উঃ 5·61 দেখ]
20. কোন্ প্রাণিদেহে প্রথম নির্দিষ্ট রেচন অঙ্গ লক্ষ্য করা যায়? ঐ ধরনের প্রাণীদের রেচন তন্ত্রের বর্ণনা দাও। [উঃ 359-360 পৃঃ দেখ]
21. কেঁচোর রেচন অঙ্গের নাম কি? ঐ অঙ্গের চিত্রসহ বর্ণনা দাও। [উঃ 360 পৃঃ দেখ]
22. সন্ধিপদ পর্বভুক্ত বিভিন্ন প্রাণীর রেচন তন্ত্রের বর্ণনা দাও। [উঃ 361 পৃঃ দেখ]

(C) অতি সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্ট উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short or specific Answer type questions) :

23. বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন অনেক পদার্থ উদ্ভিদদেহে অন্যান্য বিপাকীয় ক্রিয়ায় পুনরায় ব্যবহৃত হয়—একটি দৃষ্টান্ত দাও। [উঃ 352 পৃঃ দেখ]
24. কুইনাইন, নিকোটিন, রেসারপিন, স্ট্রীকনিন, মরফিন, অ্যাট্রোপিন—কোন্ উদ্ভিদের কোথায় পাওয়া যায়? [উঃ 357 পৃঃ দেখ]
25. খয়ের কি ধরনের বর্জ্য পদার্থ? [উঃ 354 পৃঃ দেখ]
26. একটি তরুক্ষীরের নাম কর, যা দুধের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়? [উঃ ঐ]
27. লিথোসিস্ট কি? [উঃ 355 পৃঃ দেখ]
28. উদ্ভিদ মূল দিয়ে বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে—একটি উদাহরণ দাও। [উঃ 356 পৃঃ দেখ]
29. নেফ্রন কি? [উঃ 364 পৃঃ দেখ]
30. রেনাল সাইনাস কি? [উঃ 363 পৃঃ দেখ]
31. রেনাল স্তম্ভ কি? [উঃ ঐ]
32. বেলিনির নালী কাকে বলে? [উঃ 364 পৃঃ দেখ]
33. বৃক্ক থেকে মূত্রাশয়ে প্রতি মিনিটে মূত্র সঞ্চয়ের পরিমাণ কত? [উঃ 369 পৃঃ দেখ]
34. রেচন কাজে মানুষের ত্বকের ভূমিকা উল্লেখ কর। [উঃ 371 পৃঃ দেখ]

35. অন্ত্র থেকে নির্গত দুটি রেচন পদার্থের নাম বল। [উঃ 372 পৃঃ দেখ]

(D) পার্থক্য নির্দেশ কর (Differentiate between):

36. রেচন ও ক্ষরণ। [উঃ 358 পৃঃ দেখ]
37. উপক্ষার ও তরুক্ষীর। [উঃ 353-354 পৃঃ দেখ]
38. ট্যানিন ও রজন। [উঃ 354 ও 355 পৃঃ দেখ]
39. সিস্টোলিথ ও র‍্যাফাইড। [উঃ 355-356 পৃঃ দেখ]
40. ম্যালপিজিয়ান নালিকা ও ম্যালপিজিয়ান করপাসল্। [উঃ 360 ও 364 পৃঃ দেখ]
41. নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা ও দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা। [উঃ 366 পৃঃ দেখ]
42. উদ্ভিদ ও প্রাণীর রেচন ক্রিয়া। [উঃ 372 পৃঃ দেখ]

(E) টীকা লেখ (Write notes on):

43. সিস্টোলিথ। [উঃ 355 পৃঃ দেখ]
44. র‍্যাফাইড। [উঃ 356 পৃঃ দেখ]
45. গ্লাইকোসাইড। [উঃ ঐ]
46. নেফ্রন। [উঃ 362 পৃঃ দেখ]
47. মূত্র। [উঃ 369 পৃঃ দেখ]

বৃদ্ধি

(A) দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Long Answer type questions):

1. বৃদ্ধি কাকে বলে? জড় পদার্থের বৃদ্ধির সঙ্গে জীবদেহের বৃদ্ধির পার্থক্য কি বুঝিয়ে দাও। সিগ্‌মেয়েড কার্ভ কি? এই কার্ভটি অঙ্কন করে এর বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ কর। [উঃ 373-374 পৃঃ দেখ]
2. মুখ্য বৃদ্ধিকাল কি? উদ্ভিদের বৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উঃ 375-376 পৃঃ দেখ]
3. উদ্ভিদের প্রাথমিক বৃদ্ধির দশাগুলি কি কি? বৃদ্ধির এই দশাগুলির বর্ণনা দাও। উদ্ভিদের অঙ্গজ বৃদ্ধি ও জননগত বৃদ্ধির পার্থক্য বুঝিয়ে দাও। [উঃ 376 পৃঃ দেখ]
4. উদ্ভিদের কাণ্ডের বৃদ্ধির পরিমাপ পদ্ধতিগুলির নাম উল্লেখ কর। আর্ক ইন্ডিকেটরের সাহায্যে উদ্ভিদের কাণ্ডের বৃদ্ধি পরিমাপ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উঃ 377-379 পৃঃ দেখ]
5. কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের মূলের বৃদ্ধি পরিমাপ করা যায়? ঐ যন্ত্রের সাহায্যে মূলের বৃদ্ধি পরিমাপ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উঃ 379-380 পৃঃ দেখ]
6. উদ্ভিদের বৃদ্ধির শর্তগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উঃ 379-381 পৃঃ দেখ]
7. প্রাণীর বৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উঃ 381-382 পৃঃ দেখ]

(B) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer type questions):

8. ল্যাগ, লগ ও স্থিতিশীল দশা কি? এই দশাগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উঃ 373-374 পৃঃ দেখ]

9. অগ্রস্থ, নিবেশিত ও পার্শ্বস্থ ভাজক কলার কার্যকারিতা উল্লেখ কর। [উঃ 375 পৃঃ দেখ]
10. উদ্ভিদের প্রাথমিক বৃদ্ধি ও গৌণ বৃদ্ধি সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে উল্লেখ কর। [উঃ 376 পৃঃ দেখ]
11. অক্সানোমিটারের সাহায্যে উদ্ভিদের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য কিভাবে পরিমাপ করা যায় বুঝিয়ে দাও। [উঃ 378 পৃঃ দেখ]
12. আলোকবিলাসী, আলোকবিমুখী ও আলোকনিরপেক্ষ উদ্ভিদ কাদের বলে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। [উঃ 380 পৃঃ দেখ]
13. প্রাণীর ভ্রূণের পরিস্ফুরণ পদ্ধতির বর্ণনা দাও। [উঃ 381 পৃঃ দেখ]
14. প্রাণীর বৃদ্ধির বিভিন্ন শর্ত উল্লেখ কর। [উঃ 383-384 পৃঃ দেখ]

(C) **অতি সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্ট উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন** (Very short or specific Answer type questions) :

15. বৃদ্ধির ফলে জীবদেহের শুষ্ক ওজন বাড়ে না কমে? [উঃ 373 পৃঃ দেখ]
16. মুখ্যবৃদ্ধিকাল কাকে বলে? [উঃ 375 পৃঃ দেখ]
17. বীজের ভ্রূণ কোথা থেকে পুষ্টি লাভ করে? [উঃ ঐ]
18. ক্যাম্বিয়াম কলার কাজ কি? [উঃ 376 পৃঃ দেখ]
19. ক্ষয়পূরণজাত বৃদ্ধি কাকে বলে? [উঃ ঐ]
20. হরাইজণ্টাল মাইক্রোস্কোপের কাজ কি? [উঃ 377 পৃঃ দেখ]
21. উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে কোন্ কোন্ উদ্বোধক সাহায্য করে? [উঃ 380 পৃঃ দেখ]
22. পরিস্ফুরণ কাকে বলে? [উঃ 381 পৃঃ দেখ]
23. ব্লাস্টুলা ও গ্যাস্ট্রুলা কি? [উঃ ঐ]
24. ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুরণ কাকে বলে? [উঃ ঐ]
25. রূপান্তর কি? [উঃ 382 পৃঃ দেখ]
26. পুনরুৎপাদন কাকে বলে? [উঃ ঐ]
27. প্রাণীর কোন্ ধরনের বৃদ্ধি আজীবন ঘটতে পারে? [উঃ 383 পৃঃ দেখ]

(D) **পার্থক্য নির্দেশ কর** (Differentiate between) :

28. ল্যাগ দশা ও লগ দশা। [উঃ 373-374 পৃঃ দেখ]
29. অঙ্গজ বৃদ্ধি ও জননগত বৃদ্ধি। [উঃ 376 পৃঃ দেখ]
30. আলোকবিলাসী ও আলোকবিমুখী। [উঃ 380 পৃঃ দেখ]
31. পরিস্ফুরণ ও রূপান্তর। [উঃ 381 ও 382 পৃঃ দেখ]
32. লার্ভা ও ভ্রূণ। [উঃ 382 ও 375 পৃঃ দেখ]
33. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিস্ফুরণ। [উঃ 382 পৃঃ দেখ]
34. উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও প্রাণীর বৃদ্ধি। [উঃ 385 পৃঃ দেখ]

চলন

(A) **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন** (Long Answer type questions) :

1. চলন ও গমনের সংজ্ঞা দাও। জীবের গমনের উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ কর। [উঃ 385 ও 386 পৃঃ দেখ]

2. উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার চলন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও। [উঃ 386-391 পৃঃ দেখ]
3. বক্রচলন কাকে বলে? উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার বক্রচলনের বর্ণনা দাও। [উঃ 387-391 পৃঃ দেখ]
4. প্রাণীর গমনের বিভিন্ন মাধ্যম কি কি? যে কোন একটি এককোষী প্রাণীর চলন সম্বন্ধে আলোচনা কর। [উঃ 394-396 পৃঃ দেখ]
5. হাইড্রার গমন অঙ্গের নাম কি? হাইড্রার বিভিন্ন প্রকার গমন পদ্ধতির বর্ণনা দাও। [উঃ 396-397 পৃঃ দেখ]
6. দ্বিপদ গমন কাকে বলে? মানুষের দ্বিপদ গমন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উঃ 399-400 পৃঃ দেখ]
7. খেচর প্রাণীর গমন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। [উঃ 5·77c পৃঃ দেখ]

(B) **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন** (Short Answer type questions):

8. জীব গমন করে কেন? [উঃ 5·75 দেখ]
9. উদ্ভিদের স্বতঃস্ফূর্ত বক্রচলন কাকে বলে? বনচাঁড়ালে ত্রিফলক পত্রের পার্শ্বীয় পত্রক দুটি ওঠানামা করে কেন? [উঃ 387 পৃঃ দেখ]
10. ফটোট্রপিজম কাকে বলে? ফটোট্রপিজমে অক্সিনের ভূমিকা উল্লেখ কর। [উঃ 388 ও 389 পৃঃ দেখ]
11. ব্যাপ্ত চলন কাকে বলে? লজ্জাবতীর পাতা ছুঁলেই মুড়ে যায় কেন বুঝিয়ে দাও। [উঃ 390 ও 391 পৃঃ দেখ]
12. উদ্ভিদের বৃদ্ধিজ চলন সম্বন্ধে আলোচনা কর। [উঃ 388 পৃঃ দেখ]
13. প্রকারণ চলন সম্বন্ধে আলোচনা কর। [উঃ 387 পৃঃ দেখ]
14. বিভিন্ন প্রকার আলোকবৃত্তি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [উঃ 388 পৃঃ দেখ]
15. উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার অভিকর্ষবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর। [উঃ 390-391 পৃঃ দেখ]
16. ব্যাপ্ত চলন কাকে বলে? উদ্ভিদের ব্যাপ্ত চলন বর্ণনা কর। [উঃ ঐ]
17. সল-জেল মতবাদটি কার? মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। [উঃ 395 পৃঃ দেখ]
18. এককোষী প্রাণীদের গমন পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উঃ 394-396 পৃঃ দেখ]

(C) **অতি সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্ট উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন** (Very short or specific Answer type questions):

19. উত্তেজিতা কাকে বলে? [উঃ 385 পৃঃ দেখ]
20. প্রকারণ চলন কাকে বলে? [উঃ 387 পৃঃ দেখ]
21. উদ্ভিদের বৃদ্ধিজ চলন কত প্রকার ও কি কি? [উঃ 388 পৃঃ দেখ]
22. আলোক তির্যকবর্তী অঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও। [উঃ ঐ]
23. অ্যাপোজিওট্রপিক অঙ্গের একটি উদাহরণ দাও। [উঃ 390 পৃঃ দেখ]
24. নিকটিন্যাস্টি কাকে বলে? উদাহরণ দাও। [উঃ 391 পৃঃ দেখ]
25. ক্ষণপদ কি? ক্ষণপদ সৃষ্টি কিভাবে হয় বুঝিয়ে দাও। [উঃ 395 পৃঃ দেখ]
26. ফ্ল্যাজেলারী গমন কি? [উঃ 396 পৃঃ দেখ]
27. মাছের চলন অঙ্গের নাম কি? মাছেদের দেহ মাকুর মত হয়েছে কেন? [উঃ 397-398 পৃঃ দেখ]
28. পাখীর ডানার অস্থিগুলির নাম কি? [উঃ 398 পৃঃ দেখ]

29. রোমিজেস ও রেকট্রিসেস কি? [উঃ ঐ]
30. পাখীর ডানা সঞ্চালনের পেশীগুলির নাম কি? [উঃ ঐ]
31. সোরিং কি? [উঃ ঐ]
32. মানব শিশু কিভাবে হামাগুড়ি দিয়ে চলে? [উঃ 399 পৃঃ দেখ]
33. বন মানুষের তুলনায় মানুষের পদক্ষেপ দীর্ঘ হয়েছে কেন? [উঃ 400 পৃঃ দেখ]
34. ফ্লেক্সর পেশী ও এক্সটেনসর পেশী কাকে বলে? [উঃ 401 পৃঃ দেখ]

(D) **টীকা লেখ (Write notes on):**

35. ট্যাক্‌টিক গমন বা প্রবৃত্ত বা আবিষ্ট গমন। [উঃ 387 পৃঃ দেখ]
36. প্রকারণ চলন। [উঃ ঐ]
37. ফটোট্রপিজম বা আলোকবৃত্তি। [উঃ 388 পৃঃ দেখ]
38. ন্যাস্টিক চলন বা ব্যাপ্তি চলন। [উঃ 390 পৃঃ দেখ]
39. সল-জেল মতবাদ। [উঃ 395 পৃঃ দেখ]
40. দ্বি-পদী গমন। [উঃ 399 পৃঃ দেখ]

(E) **পার্থক্য নির্দেশ কর (Differentiate between):**

41. চলন ও গমন। [উঃ 394 পৃঃ দেখ]
42. ট্যাক্‌টিক ও ন্যাস্‌টিক চলন। ..[উঃ 387 ও 390 পৃঃ দেখ]
43. ট্রপিক ও ন্যাস্‌টিক চলন। [উঃ 388 ও 390 পৃঃ দেখ]
44. কেমোট্যাক্সিস, কেমোট্রপিক ও কেমোন্যাস্টিক চলন। [উঃ 387, 390 ও 391পৃঃ দেখ]
45. বলন ও পরিবলন। [উঃ 388 পৃঃ দেখ]
46. হাইপোন্যাস্টি ও এপিন্যাস্টি। [উঃ ঐ]
47. সিলিয়ারী গমন ও ফ্ল্যাজেলারী গমন। [উঃ 396 পৃঃ দেখ]
48. ফ্লেক্সর পেশী ও এক্সটেনসর পেশী। [উঃ 401 পৃঃ দেখ]

জনন

(A) **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Long Answer type questions):**

1. জননের সংজ্ঞা দাও। জীবজগতের বিভিন্ন প্রকার জনন পদ্ধতির সংজ্ঞাসহ জননের গুরুত্ব উল্লেখ কর। [উঃ 5·78, 5·80 ও 5·79 পৃঃ দেখ]
2. উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক অঙ্গজ জননের বর্ণনা দাও। [উঃ 404-407 পৃঃ দেখ]
3. উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম অঙ্গজ জননের বর্ণনা দাও। [উঃ 406-408 পৃঃ দেখ]
4. অযৌন জননের সংজ্ঞা দাও। অযৌন জননের একক কি? উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার অযৌন জননের বর্ণনা দাও। [উঃ 408-409 পৃঃ দেখ]
5. যৌন জনন কাকে বলে? যৌন জনন কত প্রকার ও কি কি? উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার যৌন জননের উদাহরণসহ বর্ণনা দাও। [উঃ 409, 410-411 পৃঃ দেখ]
6. দ্বি-গর্ভাধান কাকে বলে? চিত্রসহ সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের দ্বি-গর্ভাধান পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উঃ 411-414 পৃঃ দেখ]

7. প্রাণীর বিভিন্ন প্রকার অযৌন জনন পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর। [উঃ 414-415 পৃঃ দেখ]

8. সংশ্লেষ ও নিষেকের মধ্যে পার্থক্য কি? গঠন উল্লেখ করে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা কর। [উঃ 417 পৃঃ দেখ]

9. কেঁচো একলিঙ্গ না উভলিঙ্গ? কেঁচোর পুং ও স্ত্রী জননতন্ত্রের বর্ণনা দাও। [উঃ 420-421 পৃঃ দেখ]

10. আরশোলার পুং ও স্ত্রী জননতন্ত্রের বর্ণনা দাও। [উঃ 422-423 পৃঃ দেখ]

11. কুনো ব্যাঙের পুং ও স্ত্রী জননতন্ত্রের চিহ্নিত চিত্র এঁকে পরস্পরের পার্থক্য নির্দেশ কর। [উঃ 424-426 পৃঃ দেখ]

12. কুনো ব্যাঙের নিষেক প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও। [উঃ 426-427 পৃঃ দেখ]

13. মানুষের পুং-জননতন্ত্র ও স্ত্রী-জননতন্ত্রের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [উঃ 427-429 পৃঃ দেখ]

(B) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer type ques ions) :

14. অপুংজনি কাকে বলে? [উঃ 417 পৃঃ দেখ]

15. উদ্ভিদ পরিবর্তিত ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের মাধ্যমে কিভাবে বংশবিস্তার করে বুঝিয়ে দাও। [উঃ 405-406 পৃঃ দেখ]

16. কলম কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার কলমের বর্ণনা দাও। [উঃ 406-408 পৃঃ দেখ]

17. ব্যাকটিরিয়ার যৌন জননকে জীনগত প্রজনন বস্তুর পুনঃসংযোগ বলা হয় কেন? [উঃ 409 পৃঃ দেখ]

18. জনুক্রম (Alternation of generations) বলতে কি বোঝ? [উঃ 429 পৃঃ দেখ]

19. সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের পুং-গ্যামেটোফাইটের চিত্রসহ বর্ণনা দাও। [উঃ 412-413 পৃঃ দেখ]

20. সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের স্ত্রী-গ্যামেটোফাইটের চিত্রসহ বর্ণনা দাও। [উঃ ঐ]

21. গেমিউল কি? [উঃ 415 পৃঃ দেখ]

22. পুনরুৎপাদন কি? উদাহরণ দাও। [উঃ ঐ]

23. শুধু ছকের সাহায্যে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় দেখাও। [উঃ 418 পৃঃ দেখ]

24. অণ্ডজ, অণ্ড-জরায়ুজ ও জরায়ুজ প্রাণী কাদের বলে? উদাহরণ দাও। [উঃ 420 পৃঃ দেখ]

25. আরশোলার বহিঃস্থ জনন অঙ্গগুলি কি কি? [উঃ 422 পৃঃ দেখ]

(C) টীকা লেখ (Write notes on) :

26. প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন। [উঃ 404 পৃঃ দেখ]

27. কৃত্রিম অঙ্গজ জনন। [উঃ 406 পৃঃ দেখ]
28. কলম। [উঃ ঐ]
29. সংশ্লেষ বা কনজুগেশান। [উঃ 417 পৃঃ দেখ]
30. নিষেক বা ফার্টিলাইজেশান। [উঃ ঐ]
31. দ্বি-নিষেক। [উঃ 414 পৃঃ দেখ]
32. পুনরুৎপাদন। [উঃ 415 পৃঃ দেখ]
33. বহিঃনিষেক বা বাহ্য নিষেক। [উঃ 427 পৃঃ দেখ]
34. নিওটেনি। [উঃ 417 পৃঃ দেখ]
35. পিডোজেনেসিস। [উঃ 417 পৃঃ দেখ]

(D) পার্থক্য নির্দেশ কর (Differentiate between) :

36. অযৌন জনন ও যৌন জনন। [উঃ 403 পৃঃ দেখ]
37. অঙ্গজ জনন ও যৌন জনন। [উঃ 404 ও 409 পৃঃ দেখ]
38. দাবা কলম ও জোড় কলম। [উঃ 407 পৃঃ দেখ]
39. দ্বি-বিভাজন ও বহুবিভাজন। [উঃ 408 পৃঃ দেখ]
40. জুস্পোর ও অ্যাপ্লানোস্পোর। [উঃ ঐ]
41. সংশ্লেষ ও নিষেক। [উঃ 417 পৃঃ দেখ]
42. আইসোগ্যামী ও অ্যানাইসোগ্যামী। [উঃ 410 ও 411 পৃঃ দেখ]
43. অপুংজনি ও পুনরুৎপাদন। [উঃ 417 ও 415 পৃঃ দেখ]
44. নিষেক ও দ্বি-নিষেক। [উঃ 411 ও 414 পৃঃ দেখ]

হরমোন

[HORMONES]

6

Syllabus : Hormones : Definition :

(a) Plant hormones—auxin—role in growth, phototropic and geotropic movements ; role in agriculture (mention Indole acetic acid, chemical formula not required).

(b) Animal hormones—Position of glands—pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal testis & ovary—Pituitary—ACTH, STH, TSH, GTH & ADH. Thyroid—Thyroxin ; Adrenal—Adrenalin ; Testis—Androgen ; Ovary—Oestrogen.

[Mention respective functions ; histology of glands and chemical composition of hormones not required.]

সূচনা (Introduction)

বিজ্ঞানী **বেলিস** (Bayles) 1902 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম লক্ষ্য করেন যে, কার্বোহাইড্রেট প্রোটীন ও চর্বিজাতীয় পদার্থ ; জল, সামান্য পরিমাণ খনিজ লবণ ও ভিটামিন জীবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিপাক ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন হলেও জীবের স্বাভাবিক এবং সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও জনন ক্রিয়ার জন্য আরও এক ধরনের অজানা রাসায়নিক বস্তুর প্রয়োজন। **বেলিস ও স্টারলিং** (Bayles and Starling) 1905 খ্রীষ্টাব্দে ঐ গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বস্তুটির নাম দেন **হরমোন** (Hormones)। হরমোন কথাটির অর্থ হল উত্তেজনা সৃষ্টি করা। হরমোনকে **উদ্বোধক**-ও বলে। এরা নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ (প্রোটীন, পেপটাইড, অ্যামাইনো অ্যাসিড, স্টেরয়েড ইত্যাদি)। খুব সামান্য পরিমাণ হরমোন জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কাজ করে। এই হরমোনের পরিমাণ বেশী হলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে। উৎপত্তিস্থল হতে নিঃসৃত হরমোন দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবাহিত হয়ে **রাসায়নিক সমন্বয় সাধনে** (Chemical co-ordination) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। **তাই হরমোনকে বলে রাসায়নিক সংবাদবাহক** (**Chemical messenger**)।

6.1. উৎপত্তিস্থল ও কার্যস্থল (Site of formation and action)

জীবদেহের যে স্থানে হরমোন উৎপন্ন হয় সেখানে তা কার্যকর হয় না। উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী কোন এক স্থানের কলা (tissues) বা যন্ত্রের (organs) উপর এটি কার্যকর হয়।

অতি অল্প পরিমাণে উপস্থিত থেকেই বিভিন্ন হরমোন নিজ-নিজ কাজ করে। বেশী মাত্রায় কোন হরমোন উৎপন্ন হলে (over-secretion), অথবা মোটেই উৎপন্ন না হলে নানা প্রকার রোগ-লক্ষণ দেখা দেয়। অতএব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে,

হরমোন হচ্ছে নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ, যা জীবদেহে কোন এক স্থানে স্বল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে অন্য কোন স্থানে বাহিত হয়ে গিয়ে সেখানে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

6.2. রাসায়নিক দূত (Chemical messenger)

'দূত' যেমন এক দেশের বার্তা আর এক দেশে বহন করে নিয়ে যায়, 'হরমোন' নামে পরিচিত রাসায়নিক পদার্থগুলিও তেমনই দেহের এক জায়গায় উৎপন্ন হয়ে অপর কোন জায়গায় গিয়ে সেখানকার অঙ্গকে উদ্দীপিত করে। এই কারণে হরমোনকে **রাসায়নিক দূত** বলা হয়। রাসায়নিক যোগাযোগ পদার্থরূপে হরমোন কাজ করে।

6.3. হরমোন ও রাসায়নিক সমন্বয় (Hormone and Chemical co-ordination)

প্রাণিদেহে বিভিন্ন অঙ্গের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় (Co-ordination) সাধন করে নার্ভতন্ত্র। নানা প্রকার হরমোনও এই সমন্বয় সাধনের কাজে সহায়তা করে। উদ্ভিদদেহে নার্ভতন্ত্র নেই। সেখানে হরমোন-ই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এই কারণে হরমোনকে জীবদেহের **রাসায়নিক সমন্বায়ক** (Chemical co-ordinator) বলা হয়। অপরপক্ষে, নার্ভতন্ত্রকে বলা হয় **ভৌত সমন্বায়ক** (Physical co-ordinator)।

সংজ্ঞা (Definition)

হরমোন হল এক ধরনের জৈব রাসায়নিক বস্তু, যা বিশেষ ধরনের কোন নির্দিষ্ট কোষগোষ্ঠী থেকে উৎপত্তি লাভ করে এবং বিশেষরূপে বাহিত হয়ে নিঃসরণ স্থান হতে দেহের দূরবর্তী কোন অঞ্চলের কোষগোষ্ঠীর বিপাকীয় কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

6.4. হরমোনের বৈশিষ্ট্য (Properties of Hormone)

হরমোনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) অতি অল্প মাত্রায় উপস্থিত থেকে এক-একটি হরমোন নিজ-নিজ কাজ করতে পারে।

(ii) হরমোন বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নিজে অংশগ্রহণ করতে পারে অথবা অনুঘটকের (Catalyst) ভূমিকা পালন করতে পারে।

(iii) এরা যে সব নির্দিষ্ট বিশেষ কোষ থেকে নিঃসৃত হয়, তাদের উপর কাজ না করে, দূরবর্তী কোন স্থানে পরিবাহিত হয়ে সেখানকার কোষগুলির উপর কাজ করে।

(iv) হরমোন প্রোটীনজাতীয় পদার্থ এবং নিঃসৃত গ্রন্থিসমূহ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে ভবিষ্যতের জন্য কখনও সঞ্চিত হয় না।

(v) নির্দিষ্ট কাজ শেষ হলে হরমোন সাধারণত নিষ্ক্রিয় বা বিনষ্ট হয়ে যায়।

(vi) হরমোন যে স্থানে উৎপন্ন হয়, সেখানে তা কার্যকর হয় না।

(vii) দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বাহিত হয়ে গেলেও এক-একটি নির্দিষ্ট অঙ্গে (লক্ষ্যবস্তু—Target) হরমোন তার সক্রিয়তা প্রকাশ করে।

(viii) হরমোনের কাজ কেবলমাত্র উৎপাদক প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহেই সীমাবদ্ধ নয়। উৎপাদকের দেহ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী বা উদ্ভিদদেহেও তা সমানভাবেই কাজ করতে পারে। এমনকি উদ্ভিজ্জ কোন কোন হরমোন প্রাণিদেহে এবং প্রাণিজ কোন কোন হরমোন উদ্ভিদদেহে কার্যকর হয়।

[**উদাহরণ :** বৃদ্ধিসহায়ক উদ্ভিদ হরমোন 'অক্সিন'-এর প্রভাবে *Euglena viridis* নামে এককোষী প্রাণীর বৃদ্ধি ঘটতে দেখা গেছে। আবার, উদ্ভিদের মূলের অগ্রভাগ বিনষ্ট হয়ে মূল হরমোন লাভে বঞ্চিত হলে, প্রাণিজ হরমোনের প্রভাবে উক্ত মূলের বৃদ্ধি ঘটতে দেখা গেছে।]

(ix) হরমোন জলে দ্রবণীয় বলে, সহজেই কোষরস বা রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়।

হরমোন ও উৎসেচকের পার্থক্য (Distinction between hormone and enzymes) :

হরমোন	উৎসেচক
1. হরমোন যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানে কাজ করে না। দূরবর্তী কোন এক স্থানের কলার উপর কাজ করে।	1. উৎসেচক সজীব কোষে উৎপন্ন হয়ে ঐ কোষের মধ্যে থেকেই নানা প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।
2. নির্দিষ্ট কাজ শেষ হলে হরমোন সাধারণত নিষ্ক্রিয় অথবা ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়।	2. নির্দিষ্ট কাজ শেষ হলে উৎসেচক নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। নিজেরা অপরিবর্তিত থাকে।

উদ্ভিদ হরমোন (Plant Hormones)

উদ্ভিদদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক শর্তাবলীর উপর নির্ভর করে না, উদ্ভিদদেহের ভিতরে উৎপন্ন রাসায়নিক পদার্থসমূহও উদ্ভিদদেহের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। বৃদ্ধিসহায়ক এইসব জৈব রাসায়নিক পদার্থকে **উদ্ভিদ হরমোন** বলে। উদ্ভিদ হরমোনগুলি আবার **ফাইটোহরমোন** (Phytohormone) নামেও পরিচিত। উদ্ভিদ হরমোনকে সাধারণত **বৃদ্ধিসহায়ক পদার্থ** (Growth substances) অথবা **বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রক** (Growth regulators) বলে।

1881 খ্রীষ্টাব্দে **চার্লস ডারউইন** (Charles Darwin) তাঁর প্রকাশিত "The Power of Movement in Plants" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ঘাসের চারা দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আলোকের উৎসের দিকে বেঁকে যায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, কোন প্রকার জৈব রাসায়নিক উদ্দীপক পদার্থ ঐ চারাগুলির অগ্রভাগ থেকে ওদের নিম্ন অংশে পরিবাহিত হয়ে ঐ বক্রতার সৃষ্টি করে। হরমোনের অস্তিত্ব ডারউইনই প্রথম প্রমাণ করেন।

স্যাক্‌স (Sachs, 1882, '87, '89) সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, অতি সামান্য মাত্রায় কোন রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি উদ্ভিদের পরিস্ফুরণ (development) নিয়ন্ত্রণ করে।

বয়সেন-জেনসেন (Boysen-Jensen, 1913) দেখান যে, অঙ্কুরিত ওটের ভ্রূণ-মুকুলাবরণীর (Oat coleoptile) একদিক আলো দিয়ে উদ্দীপ্ত করলে, তা থেকে কোন এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়, যার ফলে ভ্রূণমুকুলাবরণীতে আলোকবৃত্তি-জনিত বক্রতা (Phototropic curvature) দেখা যায়।

পল (Paal, 1914—1919) বয়সেন-জেনসেনের মতবাদের প্রতি সমর্থন জানান। তিনি বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রণকারী পদার্থকে 'যুগ্ম সম্বন্ধযুক্ত বাহক' (Correlation carrier) বলে অভিহিত করেন।

ওয়েন্ট (Went, 1928—1932) উদ্ভিদের বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রক পদার্থের পৃথকীকরণ (isolation), সনাক্তকরণ (identification) ইত্যাদি সংক্রান্ত পরীক্ষার জন্য ওটের ভ্রূণমুকুলাবরণীর পরীক্ষা (Oat coleoptile test) পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ওয়েন্ট এই বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক পদার্থটির নাম দেন **অক্সিন** (Auxin)। অক্সিন শব্দটি গ্রীক শব্দ অক্সি (auxe=grow, অর্থাৎ বর্ধনশীল) হতে নেওয়া হয়েছে। প্রথম আবিষ্কৃত উদ্ভিদ হরমোনই হল অক্সিন।

উদ্ভিদে বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রক পদার্থ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল নিচে বর্ণনা করা হল :

(a) ঘাসের চারা দৈর্ঘ্যে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোর উৎসের দিকে বেঁকে যায়।

(b) চারাগাছগুলির বর্ধনশীল অগ্রভাগ অস্বচ্ছ ধাতব টুপি দিয়ে ঢেকে দিলে ঐ গাছগুলির অগ্রভাগ আর আলোর উৎসের দিকে বেঁকে বাড়ে না।

(c) অঙ্কুরিত ওটের (Oat) ভ্রূণমুকুলাবরণীর (Coleoptile) একদিক আলো দিয়ে উদ্দীপ্ত করলে তা আলোর উৎসের দিকে বেঁকে বাড়তে থাকে (চিত্র 6.1)।

(d) ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগ কেটে দিলে দেখা যায় ভ্রূণ-কান্ডের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(e) কাটা ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগ পুনরায় কাটা দন্ডটির উপর রাখলে ভ্রূণ-কান্ডের বৃদ্ধি পুনরায় শুরু হয়।

(f) কিন্তু যদি ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগটি কেটে ফেলে কেবলমাত্র দন্ডটির একদিক আগের মত আলোর দ্বারা উদ্দীপ্ত করা হয়, তা হলে দন্ডটির কোন প্রতিক্রিয়া হয় না।

(g) কাটা দন্ডটির (Stump) অগ্রভাগে একটি জেলাটিন (Gelatin) খন্ড রেখে তার উপর যদি ভ্রূণমুকুলাবরণীর কাটা অগ্রভাগ রাখা যায়, তা হলেও পুনরায় বৃদ্ধি শুরু হয় (চিত্র 6.2)।

(h) কিন্তু জেলাটিনের বদলে যদি টিনের পাত রেখে অগ্রভাগটিকে পুনরায় তার উপর রাখা যায় তবে ভ্রূণকান্ডের কোন রকম বৃদ্ধি ঘটে না (চিত্র 6.2)।

(i) আবার কর্তিত অগ্রভাগটিকে একটি আগার খণ্ডে (Agar block) খানিকক্ষণ রেখে শুধুমাত্র আগার খণ্ডটিকে কর্তিত ভ্রূণমুকুলাবরণীর উপর রাখলে ভ্রূণকাণ্ডের বৃদ্ধি পুনরায় হয়।

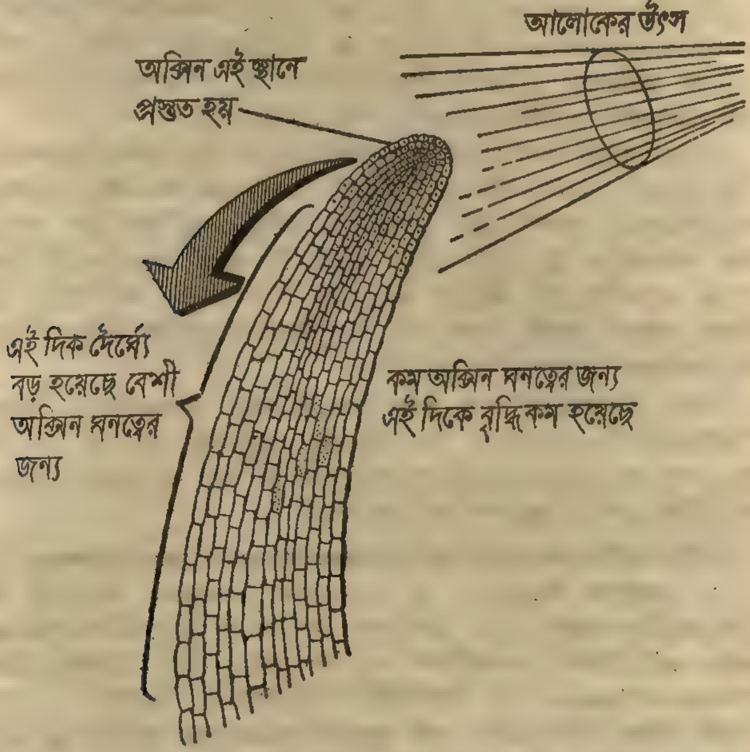

চিত্র 6.1 : অক্সিনের অসমান বণ্টনের ফলে আলোক উৎসের দিকে কাণ্ডের অগ্রভাগের বক্রচলন।

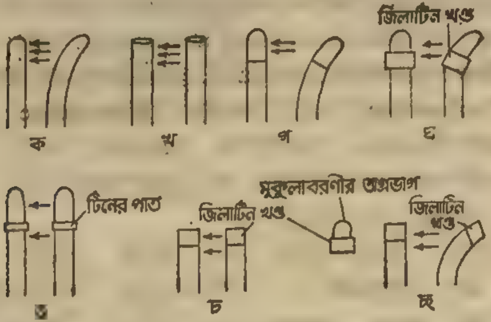

চিত্র 6.2 : কাণ্ডের অগ্রদেশে উদ্ভিদের বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রক পদার্থের উৎপত্তি এবং ভ্রূণমুকুলাবরণীর মাধ্যমে অক্সিনের একমুখী ও নিম্নগামী প্রবাহ দেখবার পরীক্ষা।

(j) কর্তিত অগ্রভাগটিকে ভ্রূণকাণ্ডের অগ্রভাগের একপাশে স্থাপন করলে দেখা যায় ভ্রূণকাণ্ডের বক্রবৃদ্ধি হয়েছে, অর্থাৎ যে পাশে কর্তিত অগ্রভাগটিকে রাখা হয়েছে সেই দিকের অক্সিনের পরিমাণ বেশী হবার ফলে ঐ দিকের কোষ বিভাজন বেশী হচ্ছে।

উপরিউক্ত পরীক্ষাগুলি হতে প্রমাণিত হয় যে, (a) কেবলমাত্র ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগ আলোর উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং (b) একপ্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ অঙ্কুরিত চারাগাছের বর্ধনশীল অগ্রভাগে উৎপন্ন হয়, যা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় নিচের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে উদ্ভিদ-অঙ্গের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে।

হরমোন সৃষ্টির জন্য উদ্ভিদদেহে প্রাণিদেহের মত কোন বিশেষ নিঃসরণকারী গ্রন্থি থাকে না। সাধারণ উদ্ভিদের বর্ধনশীল ভাজক কলায়, যথা—মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে হরমোন সংশ্লেষিত হয়। হরমোন সব সময়ই আগার দিক থেকে গোড়ার দিকে স্থানান্তরিত হয়। কচি পাতা, মুকুল, পুষ্পমঞ্জরী, ফুল ইত্যাদি অঙ্গেও হরমোন সংশ্লেষিত হয়ে ফ্লোয়েম কলার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন স্থানে বাহিত হয়। পরিণত কোষেও হরমোন উৎপন্ন হয় কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম হওয়ায় এরা উৎপত্তিস্থান থেকে স্থানান্তরিত হয় না।

উদ্ভিদ হরমোনের কাজ (**Functions of plant hormones**)**ঃ** হরমোন উদ্ভিদদেহের বৃদ্ধি, পরিস্ফুরণ, কোষ বিভাজন, মুকুল-গঠন, পাতা ও ফল ঝরা রোধ, অস্থানিক মূল বৃদ্ধি, বীজের অঙ্কুরোদ্গম, ফল গঠন, ক্যাম্বিয়ামের সক্রিয়তা এবং বিভিন্ন জৈবনিক ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে।

উদ্ভিদ হরমোনের শ্রেণীবিন্যাস (**Classification of plant hormones**)**ঃ**

(a) **প্রাকৃতিক** (**Natural**)ঃ যে হরমোনগুলি উদ্ভিদদেহে সংশ্লেষিত হয়, তাদের **প্রাকৃতিক হরমোন** বলে। উদাহরণঃ ইন্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Indole acetic acid, IAA) জিব্বারেল্লিনস্ বা জিব্বারেল্লিক অ্যাসিড (Gibberellins or Gibberellic acid, GA), সাইটোকাইনিন (Cytokinins) ইত্যাদি।

(b) **কৃত্রিম** (**Artificial**)ঃ এই হরমোন গবেষণাগারে তৈরি করা হয়। উদাহরণঃ ন্যাপথক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Naphthoxy acetic acid, NAA), ইনডোল প্রোপায়নিক অ্যাসিড (Indole propionic acid, IPA), ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (2-4 dichlorophenoxy acetic acid, 2-4D)।

(c) **আনুমানিক** বা **প্রকল্পিত** (**Postulated**)**ঃ** ফাইলোকলাইন (Phyllocaline), কলোকলাইন (Caulocaline), রাইজোকলাইন (Rhizocaline), ফ্লোরিজেন (Florigen), ডরমিন (Dormin), ভারনালিন (Vernalin) ইত্যাদি হরমোনগুলি বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করলেও, এরা কিভাবে কাজ করে ও এদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা যায় নি।

সাধারণত উদ্ভিদ হরমোনগুলির মধ্যে অক্সিন (Auxin), জিব্বারেল্লিন (Gibberellin) এবং সাইটোকাইনিন (Cytokinin) উল্লেখযোগ্য। উপরের হরমোনগুলি বৃদ্ধির সহায়ক (growth promoting)। আবার, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (Abscisic acid), ইথিলিন (Ethylene) ইত্যাদি হরমোনগুলি বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক (growth inhibiting)।

A. **অক্সিন** (Auxin) **:** এই ধরনের হরমোনগুলি একপ্রকার জৈব অ্যাসিড বা তা থেকে উৎপন্ন যৌগবস্তু। **কোগ্‌ল** (Kogl, 1934) ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ সর্বপ্রথম উদ্ভিদদেহ থেকে এই হরমোনটিকে আলাদা করেন। রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায়—এই হরমোনে তিন রকমের জৈব পদার্থ বর্তমান, যথা—অক্সিন a, অক্সিন b ও হেটেরো-অক্সিন—একসঙ্গে এদের বলে অক্সিন। এরা বিভিন্ন রকমের জটিল জৈব অম্ল। অক্সিন জারিত হয়ে বিনষ্ট হয়।

রাসায়নিক প্রকৃতিতে **অক্সিন a** হল অক্সেনোট্রায়োলিক অ্যাসিড (Auxenotriolic acid) $C_{18}H_{32}O_5$; **অক্সিন b** হল অক্সেনোলোনিক অ্যাসিড (Auxenolonic acid) $C_{18}H_{30}O_4$ এবং **হেটেরো-অক্সিন** হল ইন্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Indole acetic acid, সংক্ষেপে IAA) $C_{10}H_9O_2N$। তাছাড়া, ইন্ডোল অ্যাসিটোনাইট্রাইল (Indole acitonitrile, সংক্ষেপে IAN)-ও এই শ্রেণীর হরমোন। ভুট্টার দানা, কয়েক রকমের ছত্রাক এবং ব্যাকটিরিয়াতে এটি পাওয়া যায়।

অক্সিন নিজের উৎপত্তিস্থল হতে নিচের দিকে স্থানান্তরিত হয়। এদের পরিবহণ একমুখী (unidirectional)। অক্সিন সর্বদাই আগা থেকে গোড়ার দিকে পরিবাহিত হয় (basipetal transport)। এই হরমোন সহজেই জলে দ্রবীভূত এবং ব্যাপনক্ষম হয়। এটি সজীব কোষের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। অক্সিন ফেন্নায়েমের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরিত হয়।

অক্সিন একটি বিশেষ সীমিত ঘনত্বে অতি অল্প পরিমাণে উদ্ভিদ-অঙ্গের বৃদ্ধির হার বাড়ায়। এটি বেশী ঘনত্বে কান্ডের বৃদ্ধির হার বাড়ায় অথচ মূলের বৃদ্ধির হার কমায় অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্ভিদ-অঙ্গের বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ঘনত্বের অক্সিন প্রয়োজন হয়।

অক্সিন-সংশ্লেষ (Synthesis of auxins) **:** ট্রিপটোফান (Tryptophan) নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড হতে উৎপন্ন ইন্ডোল অ্যাসিটালডিহাইডের মাধ্যমে অক্সিন (ইন্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড) সংশ্লেষিত হয়।

অক্সিনের উৎপত্তিস্থল (Site of auxin formation) **:** উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে অগ্রস্থ ভাজক কলায় এবং বর্ধনশীল অংশে (অর্থাৎ কান্ড অথবা মূলের বর্ধনশীল অগ্রভাগে) অক্সিন উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদদেহে অক্সিন সাধারণত দুটি অবস্থায় থাকে—(i) **মুক্ত অক্সিন** (Free auxin) **:** এইপ্রকার অক্সিন সংশ্লেষিত হবার পর ব্যাপন প্রক্রিয়ায় নিচের দিকে পরিবাহিত হয়ে ভাজক কলার বৃদ্ধি ঘটায়, (ii) **আবদ্ধ অক্সিন** (Bound auxin) **:** এইপ্রকার অক্সিন প্রোটীনের সঙ্গে অক্সিন-প্রোটীন যৌগরূপে থাকে।

অক্সিনের কাজ (Role of auxin) **:**

(1) **কোষ বিভাজন** (Cell division) **:** সাইটোকাইনিনের উপস্থিতিতে অক্সিন DNA-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে নিউক্লিয়াসের বিভাজনে অংশগ্রহণ করে এবং এইভাবে কোষ বিভাজনের হার বাড়ায়।

(2) **কোষের আয়তন বৃদ্ধি** (Cell elongation) **:** অক্সিন কোষপ্রাচীরকে নমনীয় করে কোষের আয়তন বাড়তে সাহায্য করে।

(3) **ক্যাম্বিয়ামের সক্রিয়তা** (Cambial activity) : অক্সিন সাইটোকাইনিনের সঙ্গে মিলিতভাবে ক্যাম্বিয়াম স্তরে কোষ বিভাজনের সূচনা করে।

(4) **কোষের অভিস্রবণজনিত চাপ বৃদ্ধি এবং এদের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি** (Increase in osmotic pressure and cell elongation) : অক্সিন কোষস্থিত বস্তুর সংশ্লেষ বাড়ায়। এটি কোষপ্রাচীরকে নমনীয় করে, ফলে কোষে অধিক মাত্রায় জল প্রবেশ করে কোষ প্রসারিত হয়। এর ফলে কোষের আয়তন বাড়ে।

(5) **অগ্রমুকুলের প্রাধান্য** (Apical dominance) : অক্সিন পার্শ্ব মুকুলের বৃদ্ধি বন্ধ করে অগ্রমুকুলের বৃদ্ধি বাড়িয়ে দেয়। ফলে কান্ড দীর্ঘতর হয়। [তাই গাছের অগ্রভাগ ছেঁটে অগ্রমুকুলের প্রাধান্য কমানো হয় ; ফলে, উদ্ভিদের পার্শ্ব মুকুলের বৃদ্ধি ঘটে। গাছের শাখা-প্রশাখার পরিমাণ বাড়ে।]

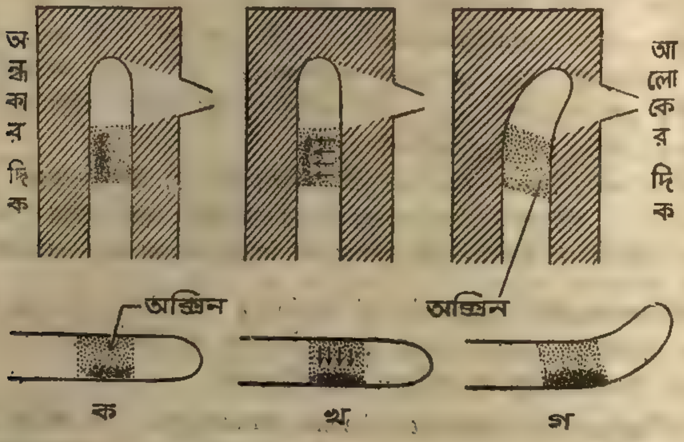

চিত্র 6.3 : কান্ডে ফটোট্রপিজম (চিত্রের উপরের সারি) ও জিওট্রপিজমের (চিত্রের নিচের সারি) সময় অক্সিনের ঘনত্বের অসম বিন্যাস।

(6) **চলন নিয়ন্ত্রণ** (Control of movement) : অক্সিন উদ্ভিদ-অঙ্গের বৃদ্ধি ও বৃদ্ধিজনিত চলন নিয়ন্ত্রিত করে। উদ্ভিদে ট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রিত করে অক্সিন। তার উপর তীব্র আলোকে অক্সিন জারিত হয়ে বিনষ্ট হয়। কাজেই কান্ডের দুপাশে অক্সিনের ঘনত্বের মাত্রার তারতম্যের জন্য কান্ডের বৃদ্ধিরও তারতম্য ঘটে। কান্ডের যে পাশে অক্সিনের ঘনত্ব বেশী থাকে সেই পাশের বৃদ্ধিও বেশী হয়। কিন্তু মূলের বেলায় ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অক্সিন সব সময় নিচের দিকে পরিবাহিত হয় বলে অনুভূমিক উদ্ভিদ-অঙ্গের নিচের অংশে অক্সিন পরিবাহিত হয়ে জমা হয় (চিত্র 6.4) এবং সেই অনুসারে কান্ডের অথবা মূলের বৃদ্ধি বাড়ায় বা কমায়। এর ফলেই উদ্ভিদ-অঙ্গে বৃদ্ধিজনিত বক্রতা দেখা যায়। মূলের বৃদ্ধি স্বল্প

ঘনত্বে অধিক হওয়ায় মূলের উপরের অংশের বৃদ্ধি বেশী হয়। ফলে মূল অভিকর্ষের দিকে বেঁকে যায় (চিত্র 6.5)।

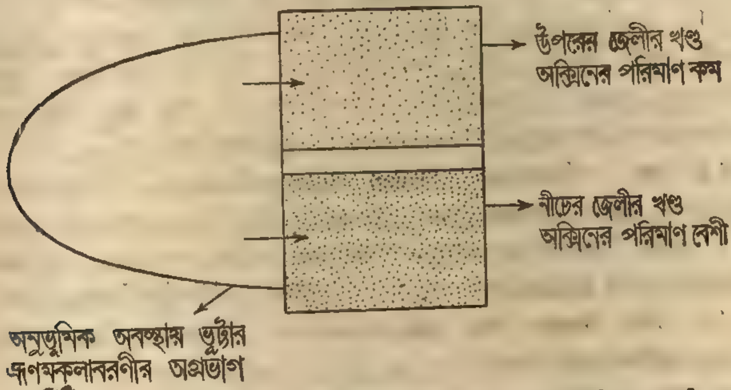

চিত্র 6.4 : অনুভূমিকভাবে ভ্রূণমুকুলাবরণী রাখার পর নিচের জেলীর খণ্ডে অক্সিনের বেশী সঞ্চয়।

(7) **জাইলেমের স্থূলীকরণ** (Thickening of Xylem) : অক্সিনের প্রভাবে জাইলেম কোষের কোষপ্রাচীরের স্থূলীকরণ ঘটে।

(8) **ফল গঠন** (Fruit formation) : নিষেকের পর ডিম্বাশয়ে অক্সিনের পরিমাণ বাড়ে। এর প্রভাবে ডিম্বক বীজে ও ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয়। কখনও কখনও নিষেকের আগেই ডিম্বাশয়ে অক্সিনের মাত্রা বাড়ে। তখন ডিম্বাশয় নিষেক ছাড়াই সরাসরি ফলে পরিণত হয়। নিষিক্ত না হয়ে ডিম্বক বীজে পরিণত হয় না বলে ফলের ভিতরে কোন বীজ উৎপন্ন হয় না। বীজহীন কলা, পেঁপে, আঙ্গুর টম্যাটো ইত্যাদি ফলের সৃষ্টি এভাবেই হয়। পরাগসংযোগ ও নিষেক ছাড়া ফল উৎপন্ন হওয়াকে **পারথেনোকার্পি** (Parthenocarpy) বলে। এর প্রভাবেই উৎপন্ন হয় বীজহীন ফল।

(9) **পাতা ও ফল ঝরা রোধ** (Check in leaf and fruit fall) : অক্সিন উদ্ভিদের পাতা ও ফল ঝরে পড়াকে রোধ করে।

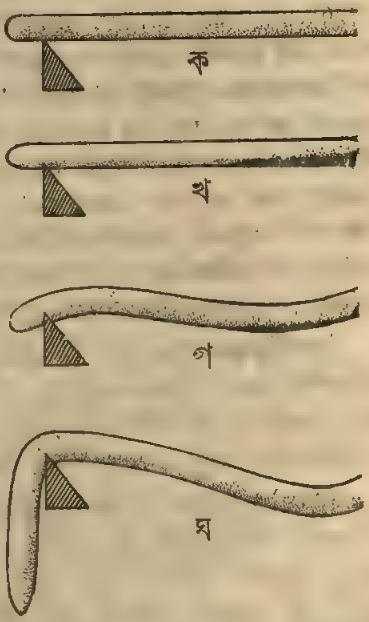

চিত্র 6.5 : ছবিতে ক্রমান্বয়ে অভিকর্ষ বৃদ্ধি চলন দেখানো হয়েছে।

(10) **ক্যালাস গঠন** (Callus formation) : অক্সিনের প্রভাবে মজ্জা,

বহির্মজ্জা অঞ্চলের স্থায়ী কোষ বিভাজিত হয়ে **ক্যালাস** (Callus), একই জাতীয় কোষ সমষ্টির উৎপত্তি ঘটে **গল** বা **টিউমারের** (Gall or Tumour) সৃষ্টি হয়।

(11) **অস্থানিক মূল বৃদ্ধি** (Increase in adventitious roots)ঃ অক্সিনের প্রভাবেই গাছের পাতার (যেমন, পাথরকুচি পাতা) কিনারা হতে অথবা বৃন্তের গোড়া হতে (যেমন, বিগোনিয়া পাতা) অস্থানিক মূল বের হয়। অনেকক্ষেত্রে অক্সিনের প্রভাবে উদ্ভিদের কর্তিত শাখা-প্রশাখা হতে অস্থানিক মূল নির্গত হয়।

(12) **অঙ্গ পরিস্ফুরণ** (Organ differentiation)ঃ জিব্বারেল্লিনের উপস্থিতিতে অক্সিন উদ্ভিদের মুকুল, পুষ্পমুকুল ইত্যাদির পরিস্ফুরণে অংশগ্রহণ করে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন পুষ্পমুকুল গঠনের জন্য দায়ী ফেন্নারিজেন (Florigen) নামক হরমোন [এক রকম অক্সিন (চাইলাখান Chailakhyan, 1836)]।

(13) **লিঙ্গ নির্ধারণ** (Sex determination)ঃ উদ্ভিদের লিঙ্গ নির্ধারণে অক্সিনের ভূমিকা দেখা যায়।

B. জিব্বারেল্লিন (Gibberellins)ঃ বাকানী (**Bakanae**) রোগে আক্রান্ত ধান গাছ অস্বাভাবিক দীর্ঘ হয়। **জিব্বারেল্লা ফুজিকুরই** (*Gibberella fujikuroi*) নামে একটি ছত্রাক এই রোগ সৃষ্টি করে। জাপানী বিজ্ঞানী **কুরোসাওয়া** (Kurosaw, 1926) লক্ষ্য করেন যে, এই ছত্রাকটির নির্যাসও ধান গাছে এই রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এই ছত্রাকটি হতে বৃদ্ধিকর ক্ষমতাসম্পন্ন পদার্থটি পৃথক করে তার নাম দেওয়া হয় **জিব্বারেল্লিন** [**য়াবুটা** (Yabuta), 1935]। জিব্বারেল্লিনের মৌলিক রাসায়নিক সঙ্কেত হল $C_{19}H_{22}O_6$। বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ হতে আজ পর্যন্ত প্রায় 40 প্রকার জিব্বারেল্লিন পৃথক করা হয়েছে। এই ধরনের হরমোনগুলি বর্ণহীন ও গন্ধহীন জৈব অ্যাসিড। এদের GA_1, GA_2, GA_3……GA_{40} এইভাবে উল্লেখ করা হয়। এইপ্রকার হরমোন জাইলেম ও ফেন্নায়েমের ভিতর দিয়ে উদ্ভিদদেহের **সর্বদিকে পরিবাহিত হয়**। এটি সহজে জলে দ্রবীভূত হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদ-অঙ্গের বৃদ্ধির জন্য জিব্বারেল্লিনের ঘনত্ব বিভিন্ন হয়।

উৎপত্তিস্থল (Site of formation)ঃ জিব্বারেল্লিন সাধারণত উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঞ্চল, যেমন—শীর্ষমুকুল, অপরিণত পাতা, মূলের অগ্রভাগ, বর্ধনশীল বীজ, অঙ্কুরিত চারা, বীজপত্র ইত্যাদিতে উৎপন্ন হয়। এই হরমোন সাধারণত পরিপক্ক বীজে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে সঞ্চিত থাকে।

জিব্বারেল্লিনের কাজ (Action of Gibberellins)ঃ অক্সিনের মত সাধারণত জিব্বারেল্লিন কোষপ্রাচীরকে প্রসারিত করে কোষের আয়তন বাড়ায়; ফলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গটিও বাড়ে। তাই, বেঁটে গাছে এটি প্রয়োগ করলে গাছ লম্বা হয়। এই হরমোন অক্সিনের মত কাজ করে। কাজগুলি নিম্নরূপঃ (1) **কোষ বিভাজন**ঃ এটি নিউক্লিয়াস বিভাজনকে প্রভাবিত করে কোষ বিভাজনে সহায়তা করে। (2) **ক্যাম্বিয়ামের কোষ বিভাজন ত্বরান্বিত করা**ঃ অক্সিনের মত জিব্বারেল্লিন ক্যাম্বিয়ামের কোষ বিভাজন ত্বরান্বিত করে। (3) **পর্বমধ্যের বৃদ্ধি**ঃ এর প্রভাবে পর্বমধ্য খুব দীর্ঘ হয়। (4) **কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধি**ঃ এটি কাক্ষিক মুকুলের

বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। (5) **বীজের সুপ্ত দশার অবসান** : নিষেকের পরে যখন বীজ তৈরি হয়, তখন জিব্বারেল্লিনের মাত্রা খুব বেড়ে যায়। ক্রমে বীজ সম্পূর্ণভাবে তৈরি হলে বীজে জিব্বারেল্লিনের মাত্রা ভীষণভাবে কমে যায়। এই অবস্থায় বীজ অঙ্কুরিত হয় না। বীজের এইরকম অবস্থাকে **সুপ্তাবস্থা** (Dormancy) বলে। জিব্বারেল্লিন বীজের সুপ্তাবস্থা দূর করে। অঙ্কুরোদ্গমের আগে বীজের ভিতরে জিব্বারেল্লিনের পরিমাণ আবার বাড়ে। (6) **পরিস্ফুরণ** : জিব্বারেল্লিনের প্রভাবে উদ্ভিদের মুকুল ও পুষ্পের পরিস্ফুরণ ঘটে। (7) **বীজহীন ফল উৎপাদন** : এটি উদ্ভিদের গর্ভাশয়ের বৃদ্ধি ঘটিয়ে বীজহীন ফল উৎপন্ন করে। (8) **পাতা ও ফুলের আয়তন বৃদ্ধি** : জিব্বারেল্লিনের প্রভাবে গাছের পাতা ও ফুলের আয়তন বৃদ্ধি পায়। (9) **লিঙ্গ-নির্ধারণ** : এর প্রভাবে উদ্ভিদের লিঙ্গের বাহ্য প্রকাশ ঘটে।

অক্সিনের সঙ্গে জিব্বারেল্লিনের পার্থক্য (Differences between Auxin and Gibberellins) :

(1) অক্সিন শুধু আগার দিক হতে গোড়ার দিকে একমুখী পরিবাহিত হয়; জিব্বারেল্লিন যে-কোন দিকে পরিবাহিত হয়। (2) অক্সিন অগ্রমুকুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধি ব্যাহত করে; কিন্তু জিব্বারেল্লিন কাক্ষিক মুকুলের পূর্ণবিকাশে সাহায্য করে। (3) অক্সিন ট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রিত করে; কিন্তু ট্রপিক চলনে জিব্বারেল্লিনের কোন ভূমিকা নেই।

C. **সাইটোকাইনিন** (Cytokinins) : কয়েকটি সমগোত্রীয় জৈব বস্তু সমষ্টিগতভাবে **কাইনিন** নামে পরিচিত। এটি কোষ বিভাজনের সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis) প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে বলে একে **কাইনেটিন** (Kinetin) বলে।

মিলার (Miller, 1955) ঐ হরমোনটিকে সাইটোকাইনিন (Cytokinin) নামে অভিহিত করেন।

অক্সিন ও জিব্বারেল্লিন থেকে সাইটোকাইনিনের পার্থক্য এই যে, এটি ক্ষারধর্মী এবং উৎপত্তিস্থলে অথবা উৎপত্তিস্থল হতে পরিবাহিত হয়ে দূরবর্তী স্থানেও প্রভাব বিস্তার করে। এটি উদ্ভিদদেহের সব দিকেই পরিবাহিত হতে পারে। এটি জলে সহজে দ্রবীভূত হয়। এর রাসায়নিক সঙ্কেত হল $C_{10}H_9N_5O$।

কাইনেটিন নামে এই হরমোন ঈস্ট নামক ছত্রাকে, প্রাণিকোষে ও বিভিন্ন রকমের ফলে, যেমন—আম, কলা, টম্যাটো ইত্যাদিতে এবং নারিকেলের জলে পাওয়া যায়। ভুট্টা বীজের সস্যে **জিয়াটিন** (Zeatin) নামে যে হরমোন পাওয়া যায় তা সাইটোকাইনিন হরমোন সমষ্টির অন্যতম। [**লেথাম** (Letham), 1964]।

উৎপত্তিস্থল (Site of formation) : ভাজক কলা, অঙ্কুরিত বীজ, মুকুল, টম্যাটো, আপেল, পালংশাক ইত্যাদি সাইটোকাইনিনের উৎপত্তিস্থল।

সাইটোকাইনিনের কাজ (Action of Cytokinins) : সাইটোকাইনিন অক্সিনের উপস্থিতিতে কাজ করে। এরা (1) উদ্ভিদকোষের বিভাজনে (মাইটোসিস), (2) বীজের অঙ্কুরোদ্গমে, (3) মুকুল উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে, (4) কাইনিন অগ্রমুকুলের অবাধ বৃদ্ধি রোধ করে এবং (5) উদ্ভিদের জরাপ্রাপ্তি বিলম্বিত করে। তাছাড়া, (6) বিভিন্ন প্রকার সাইটোকাইনিন উদ্ভিদ কলার বিভিন্ন অঙ্গের বিভেদ

(differentiation)-কে প্রভাবিত করে। সাইটোকাইনিনের অন্যান্য কাজ হল প্রো-প্লাসটিড থেকে প্লাসটিড গঠন এবং বিচ্ছিন্ন পত্রের ক্লোরোফিল বিনষ্ট হতে বিলম্বিত করা।

কৃষিকাজে ও উদ্যান বিদ্যায় হরমোনের প্রভাব (Role of Hormones in agriculture and horticulture)ঃ হরমোন প্রয়োগ করে কৃষিকাজে নানা প্রকার সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। ঐসব সুবিধা নিম্নরূপ ঃ

(1) **কলম তৈরি করা** (Rooting of cutting)ঃ গোলাপ, জবা, বেল ইত্যাদি যেসব উদ্ভিদে সাধারণত কোন বীজ উৎপন্ন হয় না, তাদের ব্যাপক চাষের জন্য অক্সিন প্রয়োগ করা হয়। এইসব গাছের শাখা কেটে কাটা-অংশে অক্সিনের দ্রবণ প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে শাখার কাটা-অংশের চারপাশ থেকে অস্থানিক মূল বের হয় এবং ঐ মূলযুক্ত শাখা রোপণ করলে নতুন গাছের সৃষ্টি হয়।

(2) **ক্ষত নিরাময়** (Healing of wounds)ঃ উদ্ভিদের গাত্রে ক্ষত সৃষ্টি হলে সেই ক্ষতস্থান দিয়ে উদ্ভিদদেহে ছত্রাক ঢুকে রোগ সৃষ্টি করে। অক্সিন প্রয়োগ করে এই ক্ষত সারানো হয়।

(3) **আগাছা বিনাশ করা** (Killing of weeds)ঃ একরকমের অক্সিন বেশী মাত্রায় ব্যবহার করলে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ বিনষ্ট হয়। তাই ধান, গম, যব ইত্যাদি একবীজপত্রী উদ্ভিদের চাষে ঐরূপ অক্সিন প্রয়োগ করে দ্বিবীজপত্রী আগাছা (weed) নির্মূল করা হয়। আগাছা বিনাশ করতে অক্সিনের যে দ্রবণ ব্যবহার করা হয়, তাতে অক্সিনের পরিমাণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম থাকে।

(4) **অঙ্কুরোদ্গম বিলম্বিত করা** (Delaying of sprouting)ঃ কৃত্রিম উপায়ে তৈরি একরকমের অক্সিন আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদিতে প্রয়োগ করে এদের অঙ্কুরোদ্গম (sprouting) বিলম্বিত করা হয়।

(5) **ফল উৎপাদন ও পক্বতা ত্বরান্বিত করা** (Enhancing of fruiting and ripening)ঃ আনারসের চাষে নির্দিষ্ট মাত্রার অক্সিনের দ্রবণ কিছু পরিণত গাছে ছিটিয়ে দেখা গেছে যে, এইসব গাছে সত্বর আনারস উৎপন্ন হয় এবং সেগুলি সত্বর পাকে।

(6) **ফল ও পাতা ঝরা বিলম্বিত করা** (Delaying of shedding of fruits and leaves)ঃ অক্সিনের দ্রবণ ছিটিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পাকা ফল বিলম্বে গাছ থেকে পড়ে। তাছাড়া, অক্সিন দ্রবণ ছিটিয়ে পাতা ও ফলের অকালে ঝরে পড়া রোধ করা হয়।

(7) **বীজহীন ফল উৎপাদন** (Formation of Parthenocarpic fruits)ঃ নিষেকের আগে ডিম্বাশয়ে অক্সিনের দ্রবণ প্রয়োগ করে উন্নত মানের এবং বীজহীন টম্যাটো, কলা, আঙ্গুর খেজুর, পেয়ারা ইত্যাদি ফল উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

(8) **বীজের সুপ্ত দশার অবসান ঘটানো** (Breaking seed-dormancy)ঃ জিব্বারেল্লিন প্রয়োগ করে বীজের সুপ্তাবস্থা ভাঙ্গা হয়। এভাবে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ত্বরান্বিত করা হয়।

(9) **পুষ্পমুকুল প্রস্ফুটন** (Flowering)ঃ অক্সিন প্রয়োগ করে পুষ্পমুকুলের প্রস্ফুটন ত্বরান্বিত করা যায়।

(10) **ফলের পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করা** (Control of fruiting) : গাছের সমুদয় ফলের একই সঙ্গে পরিণত হওয়া ও পাকা, ব্যবসায়ের পক্ষে লাভজনক নাও হতে পারে। সেজন্য ঐসকল গাছে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অক্সিন দ্রবণ ছিটিয়ে ওদের ফলগুলি যাতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরিণত হয় ও পাকে তার ব্যবস্থা করা হয়।

(11) **গাছের ফুল ঝরানো** (Thinning of flowers) : গাছে খুব বেশী ফুল জন্মালে গাছে ফলের সংখ্যা খুব বেশী হতে পারে। এতে একদিকে যেমন বেশী ফলের ভারে গাছের ডাল ভেঙ্গে যেতে পারে, অন্যদিকে তেমনি বেশী ফলনের জন্য ফলের আকার ছোট হবার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য উপযুক্ত মাত্রার অক্সিন দ্রবণ ছিটিয়ে গাছ থেকে ফুল ঝরিয়ে ফুলের সংখ্যা কমানো হয়। অবশিষ্ট ফুল হতে যে ফল উৎপন্ন হয় সেগুলি আকারে তুলনামূলকভাবে বড় হয়।

(12) **জরা রোধ** (Inhibition of senescence) : সাইটোকাইনিন দ্রবণ প্রয়োগ করে উদ্ভিদে কোষ বিভাজন বৃদ্ধি করা হয় এবং এভাবে জরা রোধ করা সম্ভব হয়।

অক্সিনের জৈব সংশ্লেষ (Biosynthesis of Auxins) : ট্রিপটোফ্যান (Tryptophan) নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড হতে ইন্ডোল অ্যাসিটালডিহাইডের মাধ্যমে কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগে অক্সিন নামক প্রধান উদ্ভিদ হরমোনটি সংশ্লেষিত হয়। [**ওয়াইল্ডম্যান** এবং **বনার** (Wildman and Bonner, 1947)

কয়েকটি উদ্ভিদ হরমোনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য :

উদ্ভিদ হরমোনের নাম	উৎস	প্রকৃতি	উল্লেখযোগ্য কার্যকারিতা
1. অক্সিন (Auxin)	কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগ	IAA—ইন্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড। রাসায়নিক সংকেত $C_{10}H_9O_2N$	উদ্ভিদদেহের সব রকম বৃদ্ধিতে কাজ করে, যেমন—কোষ বৃদ্ধি, মূলের বৃদ্ধি, জাইলেমের বৃদ্ধি, গৌণ বৃদ্ধি ইত্যাদি।
2. জিব্বারেলিন (Gibberellins)	অঙ্কুরোন্মুখ এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এমন বীজ ও দ্রুত বর্ধনশীল কলা	GA—জিব্বারেলিক অ্যাসিড। GA_3-এর রাসায়নিক সংকেত $C_{19}H_{22}O_6$	বংশগত খর্বতা নষ্ট করে এবং বীজের অঙ্কুরোদ্গমে সাহায্য করে।
3. সাইটোকাইনিন (Cytokinins)	বীজের সস্য, যেমন—ভুট্টা, নারিকেলের দুধ ইত্যাদি	$C_{10}H_9N_5O$ রাসায়নিক সংকেতযুক্ত 6-ফুরফুরাইল অ্যামাইনো পিউরিন	কোষ বিভাজন দ্রুততর করে এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ গঠনে কাজ করে।

তিনটি আনুমানিক উদ্ভিদ হরমোনের নাম ও তাদের কার্যকারিতা ঃ

হরমোনের নাম	কার্যকারিতা
1. অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (Abscissic acid or ABA)	উদ্ভিদ-অঙ্গের বার্ধক্য আনয়নে এবং বিভিন্ন অঙ্গের পতনে কাজ করে অর্থাৎ উদ্ভিদের দ্রুত বার্ধক্য এনে মাতৃদেহ থেকে সেই অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে, বীজের সুপ্ত অবস্থাকে বাড়িয়ে দেয়।
2. ইথিলিন (Ethylene)	ফুল ফোটাতে, পাতা ও ফুল ঝরাতে এবং ফলের পক্কতায় কার্যকর, তাছাড়া উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড ফুল এবং ফলের মোচনেও কার্যকর।
3. ফ্লোরিজেন (Florigen)	এই হরমোন পত্রমুকুলকে পুষ্পমুকুলে পরিবর্তিত করে উদ্ভিদের ফুল ফোটাতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

প্রাণী হরমোন (Animal Hormones)

6.5. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine glands)

প্রাণীদের ক্ষেত্রে নানা প্রকার গ্রন্থি থেকে হরমোন উৎপন্ন হয়। হরমোন উৎপাদক গ্রন্থিগুলি নালীবিহীন (ductless)। এইজন্য এদের **অনাল গ্রন্থি** (ductless glands) বলে। নালী না থাকায় এইসব গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত পদার্থ (হরমোন) গ্রন্থির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে তবেই গ্রন্থির বাইরে আসতে পারে। ক্ষরিত পদার্থ বাইরে আসার কোন নালী না থাকায় ঐ গ্রন্থিগুলিকে **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিও** বলা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, কয়েকটি নালীযুক্ত গ্রন্থি থেকেও হরমোন উৎপন্ন হয়, যেমন—অগ্ন্যাশয় (Pancreas), ডিম্বাশয় (Ovary), শুক্রাশয় (Testis) ইত্যাদি। তবে এই সকল গ্রন্থি থেকে হরমোনগুলি কখনই নালীপথে বাইরে আসে না। তারা রক্তস্রোতের মাধ্যমেই বাইরে আসে।

● **হরমোন উৎপাদক গ্রন্থিগুলি থেকে উৎপন্ন রস বা হরমোন বাইরে আসার কোন নালী না থাকায় ঐ গ্রন্থিগুলিকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।**

6.6. ট্রফিক* হরমোন ও লোকাল হরমোন (Trophic* and Local Hormones)

যে সব হরমোন একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়ে অন্য একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে হরমোন নিঃসরণে উদ্দীপিত করে, তাদের **ট্রফিক** বা **উদ্দীপক হরমোন** বলে, যথা—সোমাটোট্রপিক হরমোন, গোনাডোট্রপিক হরমোন, অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন ইত্যাদি (6.9 II অংশ দ্রষ্টব্য)।

* 'ট্রফিক' ও 'ট্রপিক' (Trophic or Tropic)—এই দুনামেই পরিচিত।

যে সব হরমোন 'উৎপাদক গ্রন্থির' মধ্যেই কার্যকর হয়, তাদের **লোকাল হরমোন** বলে, যথা—টেস্টোস্টেরোন (শুক্রাশয় থেকে উৎপন্ন এই হরমোনটি শুক্রাশয়ের মধ্যে শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়া অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে)।

6.7. নিউরোহরমোন (Neurohormone)

নার্ভতন্ত্র সমন্বিত প্রাণীদের কোন কোন নার্ভকোষ থেকে একপ্রকার হরমোন উৎপন্ন হয়। ঐসব হরমোনকে **নিউরোহরমোন** বলে। নিউরোহরমোন উৎপাদক কোষ **নিউরোসেক্রিটরি কোষ** (Neuro-secretory cells) নামে পরিচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্কে অবস্থিত **হাইপোথ্যালামাস** (Hypothalamus) নামক অংশের নিউরোসেক্রিটরি কোষ থেকে **রিলিজিং ফ্যাক্টর** বা **রিলিজিং হরমোন** (Releasing hormone) নামে একটি নিউরোহরমোন উৎপন্ন হয়। উক্ত হরমোন রক্তস্রোতের মাধ্যমে পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রখণ্ডে গিয়ে তাকে উদ্দীপিত করে, ফলে ঐ অংশ থেকে হরমোন উৎপন্ন হয় (চিত্র 6.6)।

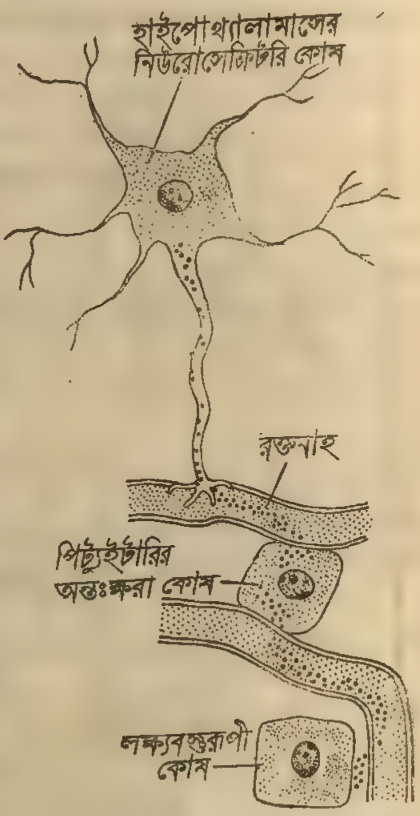

চিত্র 6.6 ঃ হাইপোথ্যালামাসের নিউরোসেক্রিটরি কোষ কর্তৃক পিটুইটারির অগ্রখণ্ডের অন্তঃক্ষরা কোষের রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের চিত্র।

● **নার্ভতন্ত্রে উপস্থিত হরমোন উৎপাদক কোষকে নিউরোসেক্রিটরি কোষ বলে।**

● **নার্ভতন্ত্রে উপস্থিত নিউরোসেক্রিটরি কোষ থেকে উৎপন্ন হরমোনকে নিউরোহরমোন বলে।**

6.8. প্রাণিদেহে হরমোনের ভূমিকা (Role of hormones in animals)

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি যথাযথ পরিমাণে হরমোন উৎপন্ন না করলে আমাদের নানা রকম রোগ সৃষ্টি হতে পারে এবং তা থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। হরমোন প্রাণিদেহে যে সব কাজে প্রভাব বিস্তার করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল ঃ (i) দেহের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ (development) (ii) গৌণ যৌন অঙ্গের বিকাশ (development of secondary sexual characters), (iii) বিপাক

(metabolism), (iv) আবেগ (emotion) সৃষ্টি, (v) আত্মরক্ষামূলক রঙ সৃষ্টি, (vi) উভচর (Amphibia) ও পতঙ্গদের রূপান্তর (metamorphosis) ইত্যাদি।

6.9. প্রাণীদের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine glands of animals)

প্রাণিদেহে যে সব অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি পাওয়া যায় এবং তাদের থেকে উৎপন্ন হরমোন সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হল।*

(A) পিট্যুইটারি (Pituitary)

I. অবস্থান (Position) ঃ করোটির (skull) মধ্যে মস্তিষ্কের (brain)

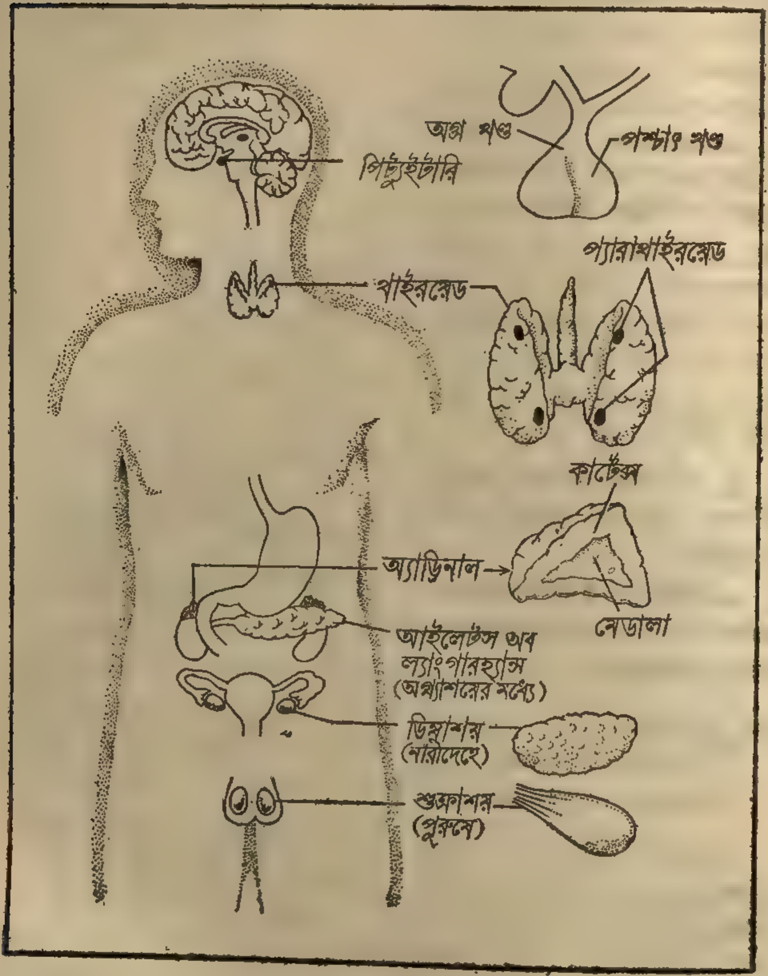

চিত্র 6.7 ঃ মানবদেহে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির অবস্থান।

* পাঠ্যসূচীতে উল্লিখিত হরমোনগুলি ছাড়া অন্যগুলির আলোচনা করা হল না।

অঙ্কদেশে এর অবস্থান (চিত্র 6.7)। মস্তিষ্কের **হাইপোথ্যালামাস** অংশের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র বৃন্ত দ্বারা এটি যুক্ত থাকে এবং করোটির **স্ফেনয়েড** অস্থির একটি খাঁজে অবস্থান করে।

পিটুইটারি গ্রন্থির অপর নাম **হাইপোফাইসিস** (Hypophysis)। আকারে খুব ছোট হলেও [পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে এর ওজন মাত্র আধ (0·5) গ্রাম] অন্যান্য সমস্ত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির তুলনায় এই গ্রন্থিটির ক্রিয়াকলাপ খুব জটিল। নয়টি অথবা তার চেয়েও বেশী হরমোন এই গ্রন্থিটি থেকে উৎপন্ন হয়। পিটুইটারি গ্রন্থিকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির 'দলনেতা' বা **প্রভুগ্রন্থি** (Master gland) আখ্যা দেওয়া হয়। কেননা, অন্যান্য কয়েকটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির (যথা—থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল, ডিম্বাশয়, শুক্রাশয় ইত্যাদির) ক্রিয়াকলাপ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পিটুইটারির কিছু ক্রিয়াকলাপ আবার মস্তিষ্কের **হাইপোথ্যালামাস** অংশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (6.7 অংশ ও 6.9A IV অংশ দ্রষ্টব্য)।

অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীতে পিটুইটারি গ্রন্থি তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা—অগ্রখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও পশ্চাৎখণ্ড। আমাদের শিশুকালে মধ্যখণ্ডটি পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেলেও পরিণত অবস্থায় এই অংশটি খুব ক্ষুদ্রকায় হয়। তাই পূর্ণবয়স্ক মানুষের পিটুইটারি প্রধানত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা—**অগ্র পিটুইটারি** বা **অ্যাডিনোহাইপোফাইসিস** (Adenohypophysis) ও **পশ্চাৎ পিটুইটারি** বা **নিউরোহাইপোফাইসিস** (Neurohypophysis)। অগ্র পিটুইটারির উৎপত্তি মুখবিবরের ছাদ থেকে এবং পশ্চাৎ পিটুইটারির উৎপত্তি মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ থেকে।

II. **অগ্র পিটুইটারি থেকে উৎপন্ন হরমোন** ঃ পিটুইটারির অগ্রখণ্ড থেকে যেসব হরমোন উৎপন্ন হয়, তাদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা—(1) দেহের সাধারণ কলাগুলির উপর প্রভাব বিস্তারকারী হরমোন, যথা—STH ও (2) বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির উপর প্রভাব বিস্তারকারী হরমোন, যথা—TSH, ACTH, GTH ইত্যাদি।

(a) **সোমাটোট্রপিক হরমোন** (Somatotropic Hormone or STH) বা **বৃদ্ধি হরমোন** (Growth Hormone or GH)।

কাজ ঃ (i) এই হরমোনের প্রভাবে **দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি** (normal growth) ঘটে। (ii) এর প্রভাবে দেহে একদিকে **প্রোটীন-সংশ্লেষের পরিমাণ বৃদ্ধি** পায় এবং সেই সঙ্গে **প্রোটীনের অপচিতি বা বিনাশ হ্রাস পায়**। প্রকৃতপক্ষে, প্রোটীনের বিপাক-সংশ্লিষ্ট এই দুটি কাজের পরিণতিতেই দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। (iii) এই হরমোন যকৃৎকে **সোমাটোমিডিন** (Somatomedin) নামে একটি বস্তু সৃষ্টিতে উদ্দীপিত করে। উক্ত সোমাটোমিডিন অস্থি ও তরুণাস্থির বৃদ্ধি ঘটায়। (iv) এই হরমোন ইনসুলিনের ক্রিয়াকে বাধা দেওয়ার (inhibition) ফলে **রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি** পায়। (v) এই হরমোনের প্রভাবে মেদকলায় মেদের (fats) আর্দ্র-বিশ্লেষ (hydrolysis) ঘটায় **রক্তে ফ্যাটি অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়** এবং কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটীনের পরিবর্তে উক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড শক্তি উৎপাদনের কাজে

ব্যবহৃত হয়। (vi) শিশুর জন্মের পর মাতার স্তনগ্রন্থি থেকে **দুগ্ধ ক্ষরণ** এই হরমোনের দ্বারা উদ্দীপিত হয় (এই ব্যাপারে অগ্র পিট্যুইটারি থেকে উৎপন্ন আর একটি হরমোন 'প্রোল্যাকটিন'*-এর কাজের সঙ্গে STH-এর কাজের মিল আছে)।

হ্রাসজনিত প্রতিক্রিয়া ঃ শিশুকাল থেকে এই হরমোনের অভাব ঘটলে দেহ অত্যন্ত খর্ব হয়ে **বামনত্ব** (Dwarfism) ঘটে (চিত্র 6.8)।

আধিক্যজনিত প্রতিক্রিয়া ঃ (i) শিশুকাল থেকে এই হরমোনের আধিক্য ঘটলে দেহ **দৈত্যাকার** (Gigantism) হয়। [এইরূপ যে মানুষের কথা সর্বশেষ নথিভুক্ত (recorded) হয়েছে তার উচ্চতা 8 ফুট 11·1 ইঞ্চি অর্থাৎ প্রায় 2·68 মিটার]। (ii) বয়ঃপ্রাপ্তির পর এই হরমোনের আধিক্য ঘটলে চোয়াল, চিবুক, নাক, করতল (hands) ও পদতলের (feet) অতিবৃদ্ধি ঘটে দেহের আকৃতি অনেকটা গরিলার মত দেখায়। এই লক্ষণের নাম **অ্যাক্রোমেগালি** (Acromegaly) [চিত্র 6.9]।

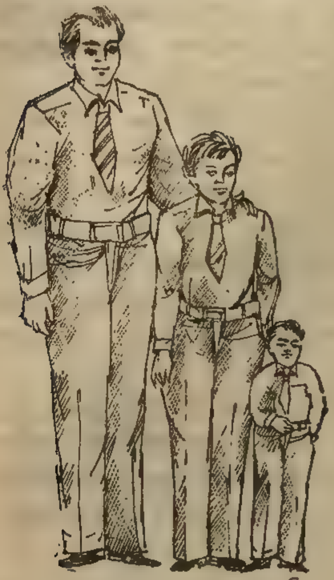

চিত্র 6.8

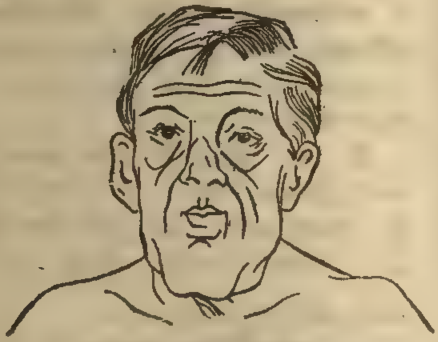

চিত্র 6.9

চিত্র 6.8 ঃ সোমাটোট্রপিক হরমোনের আধিক্য ও হ্রাসজনিত প্রতিক্রিয়ার পরিণতি—দৈত্যাকার ও বামন অবস্থা (মাঝখানে একজন স্বাভাবিক উচ্চতার মানুষকে দেখানো হয়েছে।
চিত্র 6.9 ঃ সোমাটোট্রপিক হরমোনের আধিক্যজনিত প্রতিক্রিয়া—অ্যাক্রোমেগালি।

(b) **থাইরয়েড-উদ্দীপক হরমোন** (Thyroid-stimulating hormone or TSH) বা **থাইরোট্রপিক হরমোন** বা **থাইরোট্রপিন** (Thyrotropin)।

কাজ ঃ থাইরয়েড গ্রন্থির যথাযথ **গঠন ও ক্ষরণ** (secretion) এই হরমোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রক্তে এই হরমোনের হ্রাসবৃদ্ধিজনিত প্রতিক্রিয়া থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হরমোনগুলির (থাইরক্সিন, ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন ও থাইরোক্যালসিটোনিনের) হ্রাসবৃদ্ধিজনিত প্রতিক্রিয়ার অনুরূপ।

* পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(c) **অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন** (Adrenocorticotropic hormone or ACTH) বা **অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স-উদ্দীপক হরমোন** বা **অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রপিন** (Adrenocorticotropin)।

কাজঃ অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের যথাযথ **গঠন ও ক্ষরণ** এই হরমোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রক্তে এই হরমোনের হ্রাসবৃদ্ধিজনিত প্রতিক্রিয়া অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে উৎপন্ন হরমোনগুলির (অ্যালডোস্টেরোন, কর্টিকোস্টেরোন, কর্টিসোন ইত্যাদির) হ্রাসবৃদ্ধিজনিত প্রতিক্রিয়ার অনুরূপ।

(d) **গোনাডোট্রপিক হরমোন** (Gonadotropic hormone or GTH) বা **গোনাড-উদ্দীপক হরমোন** বা **গোনাডোট্রপিন** (Gonadotropin)।

কাজঃ কমপক্ষে দুটি গোনাডোট্রপিক হরমোনের অস্তিত্ব জানা গেছে, যথা—

(1) **ফলিক্‌ল-স্টিমুলেটিং হরমোন** (FSH): (i) এই হরমোনের প্রভাবে নারীদের ক্ষেত্রে **ডিম্বাণুর পরিণতি লাভ** (maturation) এবং ডিম্বাশয় থেকে **ইস্ট্রোজেন** (Estrogen) হরমোনের **ক্ষরণ** ঘটে। (ii) পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হরমোনের প্রভাবে **স্পার্মাটোজেনেসিস** অর্থাৎ **শুক্রাণু সৃষ্টি** ও তাদের **পরিণতি লাভ** ঘটে।

(2) **লুটিনাইজিং হরমোন** (Luteinizing hormone or LH): (i) নারীদের ক্ষেত্রে এই হরমোন FSH-এর সঙ্গে যৌথভাবে **ওভুলেশন** অর্থাৎ ডিম্বাশয় থেকে পরিণত ডিম্বাণুর নিষ্ক্রমণ ঘটায়; **করপাস লুটিয়াম** (Corpus luteum) গঠন ও **প্রোজেস্টেরোন** (Progesterone) হরমোনের **ক্ষরণ** ঘটায়। (ii) পুরুষদের ক্ষেত্রে LH-কে 'ইন্টারস্টিশিয়াল সেল স্টিমুলেটিং হরমোন' (ICSH) বলা হয়, এই হরমোনের প্রভাবে শুক্রাশয় থেকে **টেস্টোস্টেরোন** (Testosterone) হরমোনের **ক্ষরণ** ঘটে।

III. **পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে উৎপন্ন হরমোনঃ** পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে প্রাপ্ত হরমোনগুলি* প্রকৃতপক্ষে হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত বিশেষ নার্ভকোষে (নিউরোসেক্রিটরি কোষ) উৎপন্ন হয় এবং উক্ত কোষের অ্যাক্সন দ্বারা বাহিত হয়ে পশ্চাৎ পিটুইটারিতে উপস্থিত হয় (চিত্র 6.10) ও উক্ত অ্যাক্সনপ্রান্তেই সঞ্চিত থাকে। দেহের প্রয়োজনে ঐগুলির রক্তে নিঃসরণ ঘটে।

(a) **অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন** (Antidiuretic hormone or ADH) বা **ভ্যাসোপ্রেসিন** (Vasopressin).

কাজঃ (i) এই হরমোন বৃক্কের **নেফ্রনের জল পুনঃশোষণ** (reabsorption) **ক্ষমতা বৃদ্ধি** করে। ফলে মূত্রের পরিমাণ পরিমিত হয়। [এইটিই ভ্যাসোপ্রেসিনের স্বাভাবিক কাজ। দেহে ভ্যাসোপ্রেসিন আদৌ উৎপন্ন না হলে একজন ব্যক্তিকে দৈনিক 20 লিটারেরও বেশী মূত্র ত্যাগ করতে হবে]।

হ্রাসজনিত প্রতিক্রিয়াঃ এই হরমোনের অভাবে নেফ্রনের জল পুনঃশোষণ ক্ষমতা লোপ পায়, যার ফলে **মূত্রে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়**।

---

* দুটি হরমোন এখান থেকে উৎপন্ন হয় (ADH ও অক্সিটোসিন)—তার মধ্যে একটি (ADH) পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

আধিক্যজনিত প্রতিক্রিয়া ঃ (i) এই হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি ঘটলে নেফ্রনের জল পুনঃশোষণ ক্ষমতার মাত্রা বৃদ্ধি ঘটে, ফলে **মূত্রে জলের পরিমাণ হ্রাস** পায়। (ii) অতিরিক্ত ভ্যাসোপ্রেসিন রক্তবাহের প্রাচীরের মসৃণ পেশীর সঙ্কোচন ঘটিয়ে **রক্তচাপ** (Blood pressure) বৃদ্ধি করে।

(iii) মসৃণ পেশীর সঙ্কোচন ঘটার ফলে **পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র** ও **বৃহদন্ত্রের সঞ্চালনও** (movement) **বৃদ্ধি** পায়।

IV. পিট্যুইটারির ক্রিয়ায় হাইপোথ্যালামাসের ভূমিকা (Role of Hypothalamus on the actions of Pituitary) ঃ পিট্যুইটারি গ্রন্থির সমস্ত ক্ষরণক্রিয়াই

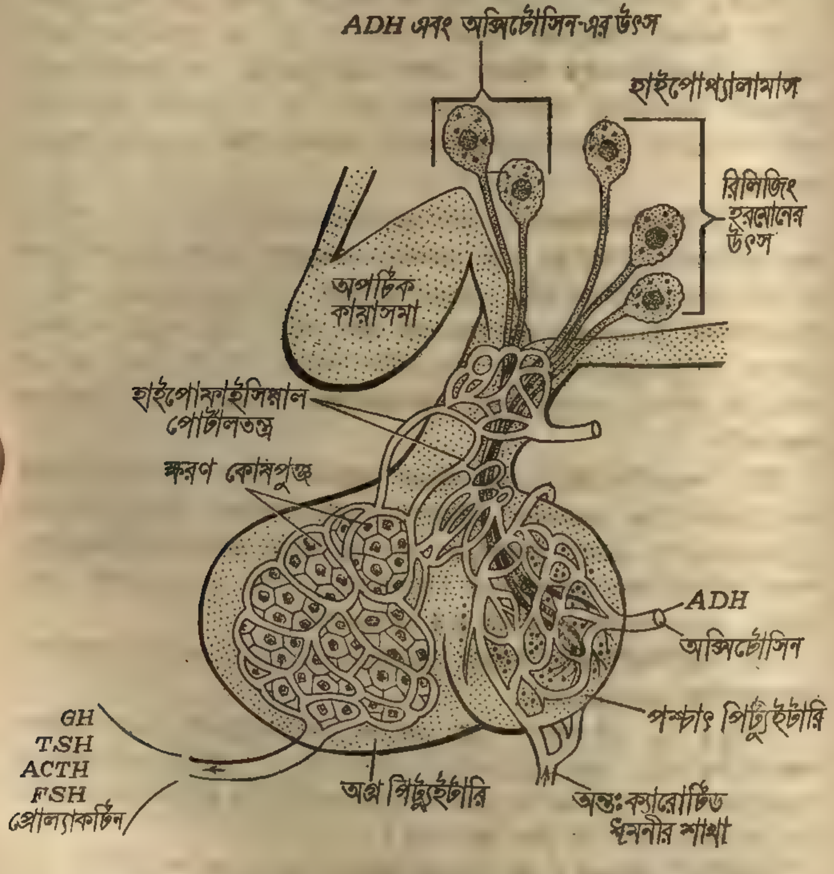

চিত্র 6.10 ঃ হাইপোথ্যালামাস ও পিট্যুইটারির গঠনগত সম্পর্কের নক্শাকার চিত্র।

হাইপোথ্যালামাস অংশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। **পিট্যুইটারির পশ্চাৎখণ্ড** থেকে নিঃসৃত হরমোনগুলির প্রকৃত উৎসস্থল হাইপোথ্যালামাস।

এছাড়া **পিটুইটারির অগ্রখন্ড** থেকে উৎপন্ন হরমোনগুলির উৎপাদন হাইপোথ্যালামাস কর্তৃক নিচে উল্লিখিত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হয়।

(1) STH বা বৃদ্ধি হরমোন হাইপোথ্যালামাসে উৎপন্ন **গ্রোথ হরমোন-রিলিজিং হরমোন** (GHRH) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ফ্যাক্টরটি হাইপোথ্যালামাসে উৎপন্ন হয়ে 'হাইপোফাইসিয়াল পোর্টাল তন্ত্রের' (পিটুইটারি পোর্টাল তন্ত্রের) মাধ্যমে অগ্রখণ্ডে পৌঁছায়।

(2) TSH-এর উৎপাদন হাইপোথ্যালামাসে উৎপন্ন **থাইরোট্রপিন-রিলিজিং হরমোন** (TRH) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(3) ACTH-এর উৎপাদন হাইপোথ্যালামাসে উৎপন্ন **কর্টিকোট্রপিন-রিলিজিং হরমোন** (CRH) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(4) GTH-এর উৎপাদন হাইপোথ্যালামাসে উৎপন্ন **গোনাডোট্রপিন-রিলিজিং হরমোন** (GnRH) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(B) থাইরয়েড (Thyroid)

I. অবস্থান (Position) **:** আমাদের গলায় শ্বাসনালীর (Trachea) অঙ্কদেশে ও স্বরযন্ত্রের (Larynx) ঠিক নিচে এই গ্রন্থিটি আছে। এটি একটি একক (unpaired) গ্রন্থি। এটি যদিও দুটি খন্ড নিয়ে গঠিত তবুও খন্ড দুটি একটি মধ্যবর্তী অংশ দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে (চিত্র 6.7)।

II. থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হরমোন : থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তিনটি হরমোন (থাইরক্সিন বা T_4*, ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন বা T_3**, থাইরোক্যালসিটোনিন) উৎপন্ন হয়—এদের মধ্যে কেবলমাত্র থাইরক্সিন পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

থাইরক্সিন : থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হরমোনগুলির মধ্যে শতকরা 95 ভাগ হচ্ছে থাইরক্সিন (T_4) ; ট্রাইআয়োডোথাইরোনিনের (T_3) পরিমাণ শতকরা 5 ভাগেরও কম। এই দুটি হরমোনের কাজ একই রকমের, তাই এদের একসঙ্গে 'থাইরয়েড হরমোন' আখ্যা দেওয়া হয়। T_3-র উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম হলেও তার ক্রিয়া খুব দ্রুত শুরু হয়। T_4-এর তুলনায় T_3 প্রায় 3-5 গুণ বেশী সক্রিয়।

কাজ : থাইরক্সিন ও ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন (Triiodothyronine) যৌথ-ভাবে নিম্নলিখিত কাজগুলি করে :

(i) দেহের **বিপাকীয় কাজের**, বিশেষ করে প্রতিটি **কোষে শ্বসনের** গতি বৃদ্ধি করে।

(ii) **প্রোটীন-সংশ্লেষের** মাধ্যমে এরা **দেহের স্বাভাবিক** বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

(iii) পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন 'বৃদ্ধি হরমোনের' সঙ্গে একত্রে এরা

---

* প্রতি থাইরক্সিন অণুতে 4টি করে আয়োডিন পরমাণু থাকে।

** ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন অণুর গঠন থাইরক্সিনের মতই, তবে প্রতি অণুতে 4টির পরিবর্তে 3টি আয়োডিন পরমাণু থাকে।

অস্থির বৃদ্ধি ঘটায়। (iv) গ্লুকোজ শোষণ ও দেহে তার ব্যবহার, গ্লুকোনিওজেনেসিস* ইত্যাদির মাধ্যমে এরা **কার্বোহাইড্রেটের বিপাক** (metabolism) নিয়ন্ত্রণ করে। (iv) এরা **গোনাডের** (ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়) **স্বাভাবিক বিকাশ** ঘটায়। (v) **মূত্রের সঙ্গে নাইট্রোজেন ত্যাগ** এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। (vi) উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে **লার্ভা থেকে পূর্ণাঙ্গ দশায় রূপান্তর** (metamorphosis), যথা—ব্যাঙাচির পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তর, এই হরমোনগুলির প্রভাবে সম্ভব হয়। (vii) এই হরমোনগুলির প্রভাবে উভচর, সরীসৃপ ও পক্ষীদের **নির্মোচন** (moulting) বা খোলস ত্যাগ ঘটে।

হ্রাসজনিত প্রতিক্রিয়া ঃ (i) বাল্যকালে থাইরয়েড হরমোনের অভাবে **ক্রেটিনিজম** (Cretinism) বা **বামনত্ব** দেখা দেয়। এর ফলে দেহ খর্বকায় ও বুদ্ধি অপরিণত হয় এবং প্রজননশক্তির বিকাশ ঘটে না (চিত্র 6.11)। (ii) বয়ঃপ্রাপ্তির পর এই হরমোনের ক্ষরণ কমে গেলে **মিক্সিডিমা** (Myxedema) রোগ দেখা দেয়। এই রোগে ত্বকে অর্ধ-তরল বস্তু জমা হয়ে মুখ ও দেহে শোথের মত স্ফীতি দেখা যায় এবং কর্মে উদ্দীপনা, বুদ্ধি প্রভৃতি হ্রাস পায়।

চিত্র 6.11 ঃ ক্রেটিনিজম [42 বছর বয়সের ছবি—উচ্চতা 3 ফুট 9 ইঞ্চি]।

খাদ্যে আয়োডিনের অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ঃ থাইরয়েড হরমোন সৃষ্টির জন্য কিছু পরিমাণ আয়োডিন আমাদের খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। খাদ্যে আয়োডিনের অভাব ঘটলে **গলগণ্ড** (Simple goiter or Colloid goiter) নামে একপ্রকার উপসর্গ দেখা দেয়। থাইরয়েড গ্রন্থিটি আকারে অত্যধিক বড় হলে তাকে গলগণ্ড বলে (চিত্র 6.12)। খাদ্যে আয়োডিনের পরিমাণ কম থাকলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে থাইরয়েড গ্রন্থিটি আকারে বড় হয়ে বেশী পরিমাণে থাইরয়েড হরমোন সৃষ্টির চেষ্টা করে। এর ফলেই গলগণ্ডের উৎপত্তি হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এর দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ গলগণ্ড ছাড়া এইসব মানুষের মধ্যে থাইরয়েড হরমোন হ্রাসজনিত অন্য কোন উপসর্গের সৃষ্টি হয় না। তবে খাদ্যে আয়োডিনের পরিমাণ খুব কম হলে, শিশুদের মধ্যে **ক্রেটিনিজম** ও বয়স্কদের মধ্যে **মিক্সিডিমা** রোগের আবির্ভাব ঘটে।

চিত্র 6.12 ঃ গলগণ্ড।

যে সব জায়গার মাটিতে আয়োডিনের পরিমাণ কম থাকে (যেমন—ভারতবর্ষে হিমালয়ের পার্বত্য এলাকা, ইউরোপে আল্পস পর্বত অঞ্চল ও উত্তর আমেরিকায় গ্রেট হ্রদ অঞ্চল) সেখানকার

* অ-কার্বোহাইড্রেট জাতীয় উপাদান থেকে গ্লুকোজ ও গ্লাইকোজেনের সংশ্লেষণ।

মানুষের মধ্যে গলগণ্ড রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এইসব এলাকার মানুষের খাদ্যে আয়োডিনের মাত্রা বাড়িয়ে উপরিউক্ত রোগগুলির আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। খাদ্যে আয়োডিন সরবরাহের সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, খাদ্য-লবণের সঙ্গে আয়োডিন যোগ করা। আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রি হয়।

আধিক্যজনিত প্রতিক্রিয়া ঃ দেহে থাইরয়েড হরমোনের আধিক্য ঘটলে **গ্রেভ্স-বর্ণিত রোগ** (Graves' disease) বা **এক্সপথালমিক গয়টার** (Exophthalmic goiter) দেখা দেয় (চিত্র 6.13)। এই রোগে চোখ দুটি ঠেলে বের হয়ে আসে, দেহের

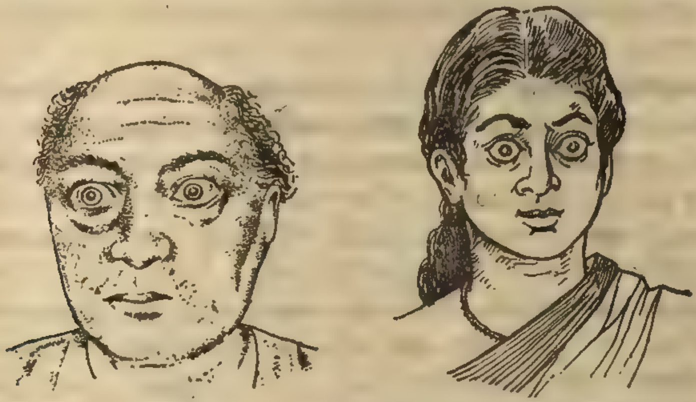

চিত্র 6.13 ঃ থাইরক্সিন হরমোনের আধিক্যজনিত প্রতিক্রিয়া—এক্সপথালমিক গয়টার।

ওজন কমে যায় এবং আবেগপ্রবণতা (emotionalism) বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে মৌল বিপাক হার (**BMR**) এবং হৃৎস্পন্দনের হারও বৃদ্ধি পায়।

থাইরয়েড গ্রন্থির কিছুটা অংশ অস্ত্রোপচারের দ্বারা অপসারণ করে থাইরয়েড হরমোন বৃদ্ধিজনিত উপসর্গ দূর করা যায়।

অন্যের প্রভাব ঃ থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ পিটুইটারি গ্রন্থির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(C) প্যারাথাইরয়েড (Parathyroid)

I. অবস্থান (Position) ঃ থাইরয়েড গ্রন্থির পৃষ্ঠদেশে দু জোড়া খুব ছোট-ছোট অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি লাগানো থাকে—এইগুলিই প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (চিত্র 6.7)। অস্থিবিশিষ্ট মাছ ছাড়া আর সব মেরুদণ্ডী প্রাণীতেই এই গ্রন্থির অস্তিত্ব আছে।

II. প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হরমোন ঃ এই গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হরমোনের নাম **প্যারাথরমোন** (Parathormone or PTH)।

কাজ ঃ (i) রক্ত ও বিভিন্ন কলার মধ্যে **ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটের সাম্য বজায় রাখা** এই হরমোনের প্রধান কাজ। রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি এবং ফসফেটের মাত্রা হ্রাসের মাধ্যমে এই সাম্য রক্ষিত হয়। প্যারাথরমোন অস্থি, বৃক্ক

(Kidney) ও অন্ত্রের (Intestine) উপর তার যুগপৎ ক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত উপায়ে এই সাম্য রক্ষায় সাহায্য করে :

(a) রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা হ্রাস পেলে অস্থি থেকে ক্যালসিয়াম মুক্ত হয়ে রক্তে আসে।

(b) অন্ত্র থেকে অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম শোষিত হয়।

(c) বৃক্কের রেনাল টিউবিউলে ক্যালসিয়ামের পুনঃশোষণ (reabsorption) বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ফসফেটের পুনঃশোষণ হ্রাস পায়।

[রক্তে যখনই ক্যালসিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তখনই ফসফেটের মাত্রা হ্রাস পাওয়ার যে ঘটনার কথা শারীরবিজ্ঞানীদের জানা ছিল, প্যারাথরমোনের ক্রিয়া জানার পর তার সঠিক কারণ বোঝা সম্ভব হয়েছে।]

হ্রাসজনিত প্রতিক্রিয়া : (i) দেহে প্যারাথরমোনের মাত্রা হ্রাস পেলে রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণও হ্রাস পায় (**হাইপোক্যালসিমিয়া**—Hypocalcemia)। এর পরিণতিস্বরূপ **টিটানি** (Tetany) নামক রোগের সৃষ্টি হয়। এই রোগে নার্ভতন্ত্র ও পেশীর উত্তেজিতা (Excitability) বৃদ্ধি পায়, ফলে মাঝে মাঝে পেশীর খিঁচুনি (Cramp), তড়কা (Convulsion) ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। দেহে প্যারাথরমোনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

[অতীত দিনে অনেক ক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্রন্থির অপসারণের ফলে মৃত্যু ঘটতে দেখা যেতো। পরবর্তীকালে জানা গেছে, ঐসব ক্ষেত্রে থাইরয়েডের অপসারণ নয়—থাইরয়েডের সঙ্গে প্যারাথাইরয়েডের অপসারণই মৃত্যুর কারণ।]

আধিক্যজনিত প্রতিক্রিয়া : দেহে প্যারাথরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি দেখা যায় :

(i) অস্থি থেকে ক্যালসিয়াম মুক্ত হয়ে রক্তে আসতে থাকে এবং রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি পায় (**হাইপারক্যালসিমিয়া**—Hypercalcemia)। এর পরিণতিস্বরূপ **অস্থিবিকৃতি** (bone deformation) এবং ঘন-ঘন **অস্থিভঙ্গের** (bone fracture) ঘটনা ঘটতে থাকে। (ii) **বৃক্কে পাথুরি** (Kidney stone) সৃষ্টি হয়। (iii) **নার্ভতন্ত্রের উত্তেজিতা হ্রাস** পায় এবং **সরেখ পেশীর দৌর্বল্য** (Weakness) দেখা দেয়।

(D) অ্যাড্রিনাল (Adrenal)

I. **অবস্থান** (Position) : প্রতিটি বৃক্কের সামনের দিকে একটি ছোট অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি, অর্থাৎ মোট একজোড়া গ্রন্থি, বৃক্কের সঙ্গে যুক্ত থাকে—ঐগুলিই অ্যাড্রিনাল বা সুপ্রারিনাল (Suprarenal) গ্রন্থি। প্রতিটি অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি দুটি করে অংশ নিয়ে গঠিত, যথা—**মেডালা** ও **কর্টেক্স**। মেডালা থাকে মাঝখানে এবং তাকে ঘিরে থাকে কর্টেক্স। উৎপত্তি ও কাজের দিক থেকে এরা সম্পূর্ণ আলাদা।

মেডালার উৎপত্তি নার্ভ-কলা থেকে এবং কর্টেক্সের উৎপত্তি দেহগহ্বরের আবরণ (Coelomic epithelium) থেকে।

II. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হরমোন ঃ অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির মেডালা ও কর্টেক্স—এই দুই জায়গা থেকেই ভিন্ন ভিন্ন হরমোন উৎপন্ন হয়। এইসব হরমোনের মধ্যে কেবলমাত্র **অ্যাড্রিনালিন** (Adrenalin) হরমোনটি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই হরমোনটির অপর নাম **এপিনেফ্রিন** (Epinephrine)। এর উৎপত্তি **মেডালা** অংশ থেকে। আমাদের জীবনধারণের জন্য অ্যাড্রিনালিন অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়। সেই কারণে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির 'মেডালা' অংশটিকে সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করলেও আমাদের কোন ক্ষতি হয় না।

কাজ ঃ যতক্ষণ আমাদের মন শান্ত থাকে ততক্ষণ আমাদের অ্যাড্রিনালিনের প্রয়োজন হয় না ; কিন্তু সংকটের সময়, বিশেষ করে আমরা যখন খুব ভীত হই, ক্রুদ্ধ হই অথবা মারামারিতে প্রবৃত্ত হই, তখনই অ্যাড্রিনাল-মেডালা থেকে অ্যাড্রিনালিন ক্ষরিত হয়। অ্যাড্রিনালিনের প্রভাবে (i) **হৃৎপিণ্ডের গতি** বৃদ্ধি পায়, (ii) **রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়**, (iii) **রক্ত-শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়**, (iv) **চোখের তারাগুলি বড়-বড় হয়** ও (v) **লোম খাড়া হয়ে ওঠে**। এইসব প্রতিক্রিয়াকে একসঙ্গে 'লড়াই-কর-অথবা-পালাও' (Fight-or-flight) প্রতিক্রিয়া বলে।

বিপদের সময় এই হরমোন ক্ষরিত হয় বলে একে **আপদকালীন হরমোন** (Emergency Hormone) বলা হয়।

[ঐ একই রকম প্রভাববিশিষ্ট আর একটি পদার্থ হচ্ছে **নরঅ্যাড্রিনালিন** (Noradrenalin)। সামান্য পরিমাণে এই বস্তুটি অ্যাড্রিনাল-মেডালা থেকে উৎপন্ন হয়। সমবেদী (Sympathetic) নার্ভতন্ত্র থেকেও 'নরঅ্যাড্রিনালিন' (বেশী পরিমাণে) এবং 'অ্যাড্রিনালিন' (অল্প পরিমাণে) উৎপন্ন হয়। অ্যাড্রিনাল-মেডালার মত সমবেদী নার্ভতন্ত্রও 'লড়াই-কর-অথবা-পালাও' প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এই দুটি অংশের কাজের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্যের কারণ, এদের উৎপত্তিগত মিল। দেখা গেছে, প্রত্যেক সমবেদী নার্ভপ্রবাহ-পথে দুটি করে চেষ্টীয় (Motor) নিউরোন থাকে ; এর একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে অ্যাড্রিনাল-মেডালার সমবেদী নার্ভপ্রবাহ-পথ। সেখানে মাত্র একটি চেষ্টীয় নিউরোন আছে। প্রকৃতপক্ষে, অ্যাড্রিনাল-মেডালাটি একটি বিশেষিত (Specialized) দ্বিতীয় চেষ্টীয় নিউরোন। অন্যভাবে বলা যায়, যে কোষটির দ্বিতীয় চেষ্টীয় নিউরোনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেটি একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে পরিণত হয়েছে। সেই কারণে অ্যাড্রিনাল-মেডালা এবং সমবেদী নার্ভপ্রবাহ পথের প্রত্যেক দ্বিতীয় চেষ্টীয় নিউরোন থেকে উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে এত মিল।]

হ্রাসজনিত প্রতিক্রিয়া ঃ অ্যাড্রিনাল মেডালার ক্রিয়া হ্রাসজনিত প্রতিক্রিয়ার কোন বহিঃপ্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয় না। কেননা, অ্যাড্রিনাল-মেডালার ক্রিয়া সমবেদী নার্ভতন্ত্র দ্বারাও সম্পন্ন হয়।

আধিক্যজনিত প্রতিক্রিয়া ঃ (i) **রক্তচাপ বৃদ্ধি** ; এই চাপ বৃদ্ধি দুই রকমের হতে পারে—সবিরাম (intermittent) অথবা স্থায়ী।

(E) শুক্রাশয় (Testis)

I. অবস্থান (Position) ঃ উন্নত ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী ব্যতীত সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীতে শুক্রাশয়ের অবস্থান **উদর গহ্বরে** (abdominal cavity)।

উন্নত ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে এই অঙ্গটি উদর গহ্বরের বাইরে **শুক্রাশয় থলি** (scrotal sac) নামে একটি থলির মধ্যে থাকে।

II. শুক্রাশয় থেকে উৎপন্ন হরমোন ঃ শুক্রাশয়ের 'ইন্টারস্টিশিয়াল' (Interstitial) কোষ থেকে **টেস্টোস্টেরোন*** নামে একটি হরমোন উৎপন্ন হয়।

কাজ ঃ যৌবনারম্ভ থেকে এই হরমোনটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উৎপন্ন হতে শুরু করে এবং এর প্রভাবে নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন হয় ঃ

(i) পুরুষদের সমস্ত **গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের** (Secondary sexual characters) যথা, পুরুষ মানুষের দাড়ি-গোঁফ, ভরাট গলা, বৃহৎ ও সবল পেশী, তলপেটে কেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিন্যাস, সিংহের কেশর, মোরগের ঝুঁটি, ময়ূরের পেখম, বিভিন্ন পুরুষ পাখীর উজ্জ্বল রঙ ইত্যাদির **আবির্ভাব ঘটে**।

(ii) পুরুষদের সমস্ত **গৌণ যৌন অঙ্গের** (যথা—শুক্রনালী ও তৎসংলগ্ন গ্রন্থি, পুরুষাঙ্গ ইত্যাদির) **পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে**।

(iii) FSH-এর সঙ্গে যৌথভাবে এই হরমোনটি **শুক্রাণু উৎপাদন** (Spermatogenesis) অব্যাহত রাখে।

(iv) **যৌন কামনা বৃদ্ধি করে।**

(v) **অস্থির বৃদ্ধি ঘটায়।**

অন্যের প্রভাব ঃ অগ্র পিটুইটারি থেকে উৎপন্ন ICSH-এর প্রভাবে টেস্টোস্টেরোন উৎপন্ন হয়।

হ্রাস অথবা অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ঃ যৌবনারম্ভের সময়ে দেহে টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা হ্রাস ঘটলে (অগ্র পিটুইটারি থেকে গোনাডোট্রপিক হরমোন সৃষ্টি না হওয়ার জন্য) অথবা টেস্টোস্টেরোনের সম্পূর্ণ অভাব ঘটলে (শুক্রাশয় দুটিকে দেহ থেকে অপসারণের জন্য) পুরুষদের কোন **গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে না** এবং **গৌণ যৌন অঙ্গগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না।**

যৌবনারম্ভের পর টেস্টোস্টেরোনের অভাব ঘটলে (শুক্রাশয় দুটিকে অপসারণের জন্য) গৌণ যৌন অঙ্গগুলি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

(F) ডিম্বাশয় (Ovary)

I. অবস্থান (Position) **ঃ** সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীতেই ডিম্বাশয়ের অবস্থান **উদর গহ্বরে।**

II. ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হরমোন ঃ ডিম্বাশয় থেকে একাধিক হরমোন উৎপন্ন হয় ; তাদের মধ্যে কেবলমাত্র **ইস্ট্রোজেন** (Estrogen) পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ডিম্বাশয়ের **ফলিকলের** কোষগুলি (follicular cells) থেকে এই হরমোন ক্ষরিত হয়।

---

* শুক্রাশয় থেকে উৎপন্ন **অ্যান্ড্রোজেন** (Androgen)-হরমোনকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেসব হরমোন পুরুষদের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যগুলি (Secondary sexual characters) সৃষ্টিতে সক্ষম, তাদের **অ্যান্ড্রোজেন** বলা হয়। 'টেস্টোস্টেরোন' একটি অ্যান্ড্রোজেন। অ্যাড্রিনাল-কর্টেক্স থেকে স্বল্প মাত্রায় অ্যান্ড্রোজেন উৎপন্ন হয়।

কাজ ঃ বয়ঃসন্ধিক্ষণ (puberty) থেকে এই হরমোনটি (ইস্ট্রোজেন) উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উৎপন্ন হতে শুরু করে এবং এর প্রভাবে স্ত্রীদেহে নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন হয় ঃ

(i) সমস্ত **গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের** (যথা—স্তন বৃদ্ধি, কটিদেশের প্রস্থ বৃদ্ধি, কোমল কণ্ঠস্বর, তলপেটে কেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিন্যাস ইত্যাদির) **আবির্ভাব ঘটে।**

(ii) **সমস্ত গৌণ জনন অঙ্গের** [যথা—ডিম্বনালী, জরায়ু (Uterus), যোনি (Vagina) ইত্যাদির] **পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।**

(iii) দেহে **মেদকলার বৃদ্ধি ঘটে।**

(iv) প্রাইমেট-বর্গীয় প্রাণীদের (অর্থাৎ মানুষ ও বানরগোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীদের) স্ত্রীদের **ঋতুচক্র** (Menstrual cycle) সম্পন্ন হয়।

(v) অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্ত্রীদের **কামোদ্দীপনা** (Oestrous cycle) ঘটে।

(vi) স্তন্যপায়ীদের **গর্ভাবস্থায় জরায়ুর বৃদ্ধি ঘটে।**

অন্যের অভাব ঃ অগ্র পিটুইটারি থেকে উৎপন্ন FSH-এর প্রভাবে ইস্ট্রোজেন হরমোন উৎপন্ন হয়।

হ্রাস অথবা অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ঃ বয়ঃসন্ধিক্ষণকালে দেহে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা হ্রাস ঘটলে (অগ্র পিটুইটারি থেকে FSH সৃষ্টি না হওয়ার জন্য) অথবা ইস্ট্রোজেনের সম্পূর্ণ অভাব ঘটলে (ডিম্বাশয় দুটিকে দেহ থেকে অপসারণের জন্য) নারীদের গৌণ **যৌন বৈশিষ্ট্যের ও ঋতুচক্রের আবির্ভাব ঘটে না** এবং **গৌণ যৌন অঙ্গগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না।**

বয়ঃসন্ধিক্ষণ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইস্ট্রোজেনের অভাব ঘটলে (ডিম্বাশয় দুটিকে অপসারণের জন্য) গৌণ যৌন অঙ্গগুলি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

অ্যাণ্ড্রোজেন ও ইস্ট্রোজেনের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Androgen and Estrogen) ঃ

অ্যাণ্ড্রোজেন	ইস্ট্রোজেন
1. শুক্রাশয়ের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ থেকে উৎপন্ন হয়। স্বল্প পরিমাণে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকেও উৎপন্ন হয়।	1. ডিম্বাশয়ের ফলিক্‌লের কোষ থেকে উৎপন্ন হয়।
2. পুরুষদের দেহে **গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের** আবির্ভাব ঘটায়, **গৌণ জনন অঙ্গের** পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়, **শুক্রাণু উৎপাদন** অব্যাহত রাখে, **যৌন কামনা** বৃদ্ধি করে, **অস্থির বৃদ্ধি** ঘটায়।	2. স্ত্রীদেহে তাদের নিজস্ব **গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের** আবির্ভাব ঘটায়, **গৌণ জনন অঙ্গের** পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়, **ঋতুচক্রের আবর্তন** ঘটায়, **গর্ভাবস্থায় জরায়ুর বৃদ্ধি** ঘটায়, **কামোদ্দীপনার** উদ্রেক করে।

পাঠ্যসূচীভুক্ত হরমোনগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হরমোনের নাম	উৎস	ক্রিয়া	হ্রাসজনিত প্রতিক্রিয়া	আধিক্যজনিত প্রতিক্রিয়া
1. সোমাটোট্রপিক হরমোন (STH)	অগ্র পিট্যুইটারি	দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।	শিশুকাল থেকে এই হরমোনের অভাবে 'বামনত্ব' ঘটে।	শিশুকাল থেকে আধিক্যের জন্য 'দৈত্যাকার' দেহ ; বয়ঃপ্রাপ্তির পর আধিক্যের জন্য 'অ্যাক্রোমেগালি'।
2. থাইরোট্রপিক হরমোন (TSH)	ঐ	থাইরয়েড গ্রন্থিকে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।	থাইরয়েড হরমোনের হ্রাসজনিত ক্রিয়ার অনুরূপ।	থাইরয়েড হরমোনের আধিক্যজনিত ক্রিয়ার অনুরূপ।
3. অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন (ACTH)	ঐ	অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সকে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।	অ্যাডিসন-বর্ণিত রোগ (Addison's disease)।	কুশিং-বর্ণিত রোগ (Cushing's syndrome)।
4. গোনাডোট্রপিক হরমোন (GTH)	ঐ	ডিম্বাণুর পরিণতিলাভ, শুক্রাণু সৃষ্টি, ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয় থেকে হরমোন উৎপাদন।	ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়ের ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে।	
5. অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন (ADH) বা ভ্যাসোপ্রেসিন	পশ্চাৎ পিট্যুইটারি	বৃক্কের নেফ্রনের জল পুনঃশোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ফলে মূত্রের পরিমাণ পরিমিত হয়।	মূত্রে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি।	মূত্রে জলের পরিমাণ হ্রাস, রক্তচাপ বৃদ্ধি, পাকস্থলী ও অন্ত্রের সঞ্চালন বৃদ্ধি।

হরমোনের নাম	উৎস	ক্রিয়া	হ্রাসজনিত প্রতিক্রিয়া	আধিক্যজনিত প্রতিক্রিয়া
6. থাইরক্সিন	থাইরয়েড	বিপাকীয় কাজের—বিশেষত শ্বসনের গতি বৃদ্ধি করে, অস্থির বৃদ্ধি ও প্রোটীন-সংশ্লেষের মাধ্যমে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়, গোনাডের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়, মূত্রের সঙ্গে নাইট্রোজেন ত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করে, উভচর প্রাণীদের রূপান্তর এবং উভচর, সরীসৃপ ও পক্ষীদের নির্মোচন ঘটায়।	শিশুদের ক্রেটিনিজম, বয়স্কদের মিক্সিডিমা।	এক্সপথালমিক গয়টার বা গ্রেভ্‌স-বর্ণিত রোগ।
7. প্যারাথরমোন (PTH)	প্যারাথাইরয়েড	রক্ত ও কলার মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফেটের সাম্য বজায় রাখে।	টিটানি রোগ।	হাইপারক্যালসিমিয়া, বৃক্কে পাথুরি, নার্ভতন্ত্রের উত্তেজিতা হ্রাস, সরেখ পেশীর দৌর্বল্য।
8. অ্যাড্রিনালিন বা এপিনেফ্রিন	অ্যাড্রিনাল মেডালা	হৃৎপিণ্ডের গতি, রক্তচাপ ও রক্ত-শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করে।	কোনরূপ বহিঃপ্রকাশ ধরা পড়ে না, কেননা অ্যাড্রিনালিনের ক্রিয়া সমবেদী নার্ভতন্ত্র দ্বারাও সম্পন্ন হয়।	রক্তচাপ বৃদ্ধি।
9. টেস্টোস্টেরোন	শুক্রাশয়ের ইণ্টার-স্টিশিয়াল কোষ	পুরুষদের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি, গৌণ যৌন অঙ্গের পরিপূর্ণ বিকাশ, শুক্রাণু উৎপাদন, যৌন কামনা বৃদ্ধি, অস্থির বৃদ্ধি।	পুরুষদের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে না ও গৌণ যৌন অঙ্গের যথাযথ বিকাশ ঘটে না।	
10. ইস্ট্রোজেন	ডিম্বাশয়ের ফলিক্‌লের কোষ	স্ত্রীদের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি, গৌণ যৌন অঙ্গের পরিপূর্ণ বিকাশ, প্রাইমেটবর্গীয় প্রাণীদের ঋতুচক্রের আবর্তন, স্তন্যপায়ীদের গর্ভাবস্থায় জরায়ুর বৃদ্ধি।	স্ত্রীদের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের ও ঋতুচক্রের আবির্ভাব ঘটে না ; গৌণ যৌন অঙ্গের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না।	

6.10. নির্দিষ্ট অঙ্গে বা লক্ষ্যবস্তুরূপী অঙ্গে হরমোনের কর্মপদ্ধতি (Mode of action of Hormones on target organs)

নির্দিষ্ট অঙ্গে হরমোনগুলি দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের কাজ করে। 'স্টেরয়েড' হরমোনগুলির কর্মপদ্ধতি 'প্রোটীন ও পলিপেপটাইড' হরমোনগুলি থেকে পৃথক ধরনের।

(I) **স্টেরয়েড হরমোনগুলির কর্মপদ্ধতি ঃ** স্টেরয়েড হরমোনগুলি (যথা—ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরোন, অ্যালডোস্টেরোন, ক্যালসিফেরল ইত্যাদি) সরাসরি **কোষের ভিতরে প্রবেশ করে।** সেখানে নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমিক ধাপে এরা কাজ করে।

(i) সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত একটি প্রোটীনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে।

(ii) নিউক্লিয়াসের ভিতরে 'হরমোন-প্রোটীন যৌগটি' (Hormone-protein complex) নির্দিষ্ট জীনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে সক্রিয় করে তোলে। ফলে কোষের ভিতর অভিপ্রেত বস্তুটি তৈরি হতে থাকে।

(II) **প্রোটীন ও পলিপেপটাইড হরমোনগুলির কর্মপদ্ধতি ঃ** এইসব হরমোন (যথা—ইনসুলিন, ACTH, TSH, ADH, LH)-এর অণুগুলি আকারে বড় হওয়ার জন্য কোষের ভিতর প্রবেশ করতে পারে না। এরা প্রথমে প্লাজমা পর্দায় উপস্থিত নির্দিষ্ট গ্রাহকের (Specific receptor) সঙ্গে যুক্ত হয়। তারপর নিম্নলিখিত যে কোন একটি পদ্ধতিতে ক্রিয়া করে।

(a) বিভিন্ন আয়ন বা সাবস্ট্রেটের অনুকূলে **প্লাজমা পর্দার ভেদ্যতার** (Permeability) **পরিবর্তন** ঘটায়। ইনসুলিন এই পদ্ধতিতে কাজ করে। ইনসুলিনের প্রভাবে পেশী কোষের প্লাজমা পর্দা ভেদ করে গ্লুকোজ প্রবেশের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

(b) (i) নির্দিষ্ট হরমোনটি প্লাজমা পর্দায় উপস্থিত 'অ্যাডিনিল সাইক্লেজ' (Adenyl cyclase) নামে একটি উৎসেচককে সক্রিয় করে।

(ii) সক্রিয় অ্যাডিনিল সাইক্লেজ অতঃপর কোষে প্রবেশ করে সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত ATP-কে 'Cyclic AMP-তে (Adenosine monophosphate) পরিণত করে। এই Cyclic AMP 'দ্বিতীয় দূত' (Second messenger) হিসেবে এক-এক প্রকার কোষকে এক-এক ভাবে উদ্দীপিত করে। এর প্রভাবে যকৃতের কোষ গ্লাইকোজেনকে গ্লুকোজে পরিণত করে এবং থাইরয়েড গ্রন্থির কোষ থেকে 'থাইরক্সিন', অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের কোষ থেকে 'অ্যালডোস্টেরোন', বৃক্কের কোষ থেকে 'রেনিন' (Renin) প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

● বিষয়-সংক্ষেপ ●

● **উদ্ভিদ হরমোনঃ**

বেলিস ও স্টারলিং 1905 খ্রীষ্টাব্দে 'হরমোন' রাসায়নিক বস্তুটির নামকরণ করেন। হরমোন হচ্ছে নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা জীবদেহে কোন নির্দিষ্ট অঙ্গ বা কোন নির্দিষ্ট কোষগোষ্ঠী থেকে উৎপত্তি লাভ করে এবং বিশেষ রূপে বাহিত হয়ে নিঃসরণ স্থান হতে দেহের দূরবর্তী কোন অঞ্চলের কোষগোষ্ঠীর বিপাকীয় কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অতি অল্প মাত্রায় উপস্থিত থেকে এক একটি হরমোন নিজ নিজ কাজ করতে পারে। নির্দিষ্ট কাজ শেষ হলে হরমোন সাধারণত নিষ্ক্রিয় বা বিনষ্ট হয়ে যায়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি-সহায়ক জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলিকে উদ্ভিদ হরমোন বলে। প্রাকৃতিক উদ্ভিদ হরমোনগুলি হল অক্সিন, জিব্বারেলিন এবং সাইটোকাইনিন। অক্সিন কাণ্ড, পাতা ইত্যাদির অগ্রস্থ বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে অবস্থিত ভাজক কলা হতে নিঃসৃত হয়। অক্সিন নিজের উৎপত্তিস্থল হতে নিচের দিকে স্থানান্তরিত হয়। এদের পরিবহণ একমুখী। অক্সিন বেশী ঘনত্বে কাণ্ডের বৃদ্ধির হার বাড়ায় অথচ মূলের বৃদ্ধির হার কমায়। অক্সিন ট্রিপটোফ্যান নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড হতে সংশ্লেষিত হয়। কোষ

বিভাজন, কোষের আয়তন বৃদ্ধি, ক্যাম্বিয়ামের সক্রিয়তা, অগ্রমুকুলের প্রাধান্য, চলন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে অক্সিনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

জিব্বারেল্লিন সাধারণত উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঞ্চল, যেমন—শীর্ষমুকুল, অপরিণত পাতা, মূলের অগ্রভাগ, বর্ধনশীল বীজ, অঙ্কুরিত চারা, বীজপত্র ইত্যাদিতে উৎপন্ন হয়। এই হরমোন সাধারণত পরিপক্ক বীজে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। বীজের সুপ্ত দশার অবসান ঘটিয়ে বীজ অঙ্কুরিত হতে জিব্বারেল্লিন কার্যকর। জিব্বারেল্লিনের প্রভাবে পর্বমধ্য খুব দীর্ঘ হয়। বেঁটে গাছে এই হরমোন প্রয়োগ করলে গাছ লম্বা হয়। ভাজক কলা, অঙ্কুরিত বীজ, মুকুল, টম্যাটো, আপেল ইত্যাদি সাইটোকাইনিনের উৎপত্তি-স্থল। তাছাড়া নারিকেলের দুধে প্রচুর পরিমাণে সাইটোকাইনিন থাকে। সাইটোকাইনিন উদ্ভিদকোষের বিভাজনে (মাইটোসিস), বীজের অঙ্কুরোদ্গমে, অগ্রমুকুলের অবাধ বৃদ্ধি রোধে, মুকুল উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া প্রোটীন, RNA ইত্যাদি সংশ্লেষে কার্যকর। উদ্ভিদ হরমোন যথা ইণ্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (IAA), ইণ্ডোল বিউ-টাইরিক অ্যাসিড (IBA), ন্যাপ্থক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (NAA), ডাইক্লোরো-ফেনোক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (2-4, D) ইত্যাদি কৃষিকাজ ও উদ্যান বিদ্যায় প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। উপরিউক্ত হরমোন বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করে কৃষিকাজে নানা প্রকার সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয়েছে, ঐসব সুবিধা হল—কলম তৈরি করা, ক্ষয় নিরাময়, আগাছা বিনাশ করা, অঙ্কুরোদ্গম বিলম্বিত করা, ফল উৎপাদন ও পক্কতা ত্বরান্বিত করা, বীজহীন ফল উৎপাদন করা (পার্থেনোকার্পি) ইত্যাদি।

● **প্রাণী হরমোনঃ**

1. হরমোন উৎপাদক গ্রন্থিগুলি থেকে উৎপন্ন রস বা হরমোন বাইরে আসার কোন নালী না থাকায় ঐ গ্রন্থিগুলিকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।
2. যেসব হরমোন কোন একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়ে অন্য কোন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে তাদের 'ট্রফিক' বা ট্রপিক হরমোন' বলে ; উদাঃ সোমাটোট্রটিক, গোনাডোট্রপিক, অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রপিক ইত্যাদি হরমোন।
3. যেসব হরমোন উৎপাদক গ্রন্থির মধ্যেই কার্যকর হয় তাদের 'লোকাল হরমোন' বলে ; উদাঃ টেস্টোস্টেরোন।
4. নার্ভতন্ত্রে উপস্থিত হরমোন উৎপাদক কোষকে নিউরোসেক্রিটরি কোষ বলে।
5. নিউরোসেক্রিটরি কোষ থেকে উৎপন্ন হরমোনকে নিউরোহরমোন বলে।
6. হরমোনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে—দেহের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ ঘটানো, গৌণ যৌন অঙ্গের বিকাশ ঘটানো, বিপাক, আবেগ সৃষ্টি, আত্মরক্ষা-মূলক রঙ সৃষ্টি, উভচর ও পতঙ্গদের রূপান্তর ঘটানো ইত্যাদি।
7. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের উল্লেখযোগ্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি হচ্ছে—পিটুইটারি বা হাইপোফাইসিস, হাইপোথ্যালামাস, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল, অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিত আইলেট্স-অফ-ল্যাংগারহ্যান্স, শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়।
8. পিটুইটারি গ্রন্থি দুটি খণ্ড নিয়ে গঠিত—অগ্র পিটুইটারি বা অ্যাডিনো-হাইপোফাইসিস এবং পশ্চাৎ পিটুইটারি বা নিউরোহাইপোফাইসিস।
9. অগ্র পিটুইটারি থেকে উৎপন্ন হরমোনগুলির নাম—(i) সোমাটোট্রপিক হরমোন (STH)—এটি দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে ; (ii) থাইরো-ট্রপিক হরমোন (TSH)—থাইরয়েড গ্রন্থিকে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে ; (iii) অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন (ACTH)—অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সকে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে ; (iv) গোনাডোট্রপিক হরমোন (GTH)—

ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়কে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে ; তাছাড়া ডিম্বাণুর পরিণতি লাভ এবং শুক্রাণু সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

10. পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে উৎপন্ন হরমোনের নাম—অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন (ADH) বা ভ্যাসোপ্রেসিন। এর প্রকৃত উৎসস্থল হাইপোথ্যালামাস। এটি মূত্রের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।
11. পিটুইটারির অগ্রখণ্ড থেকে উৎপন্ন হরমোনগুলির উৎপাদন হাইপোথ্যালামাস থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন হরমোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হাইপোথ্যালামাস থেকে উৎপন্ন এই হরমোনগুলি হচ্ছে—গ্রোথ হরমোন-রিলিজিং হরমোন (GHRH), থাইরোট্রপিন-রিলিজিং হরমোন (TRH), কর্টিকোট্রপিন-রিলিজিং হরমোন (CRH) ও গোনাডোট্রপিন-রিলিজিং হরমোন (GnRH)।
12. থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হরমোনগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে থাইরক্সিন (শতকরা 95 ভাগ) ; এছাড়া অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় আরও দুটি হরমোন —ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন এবং থাইরোক্যালসিটোনিন।
13. থাইরক্সিন দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিপাকীয় কাজ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই হরমোনের অভাবে শিশুদের **ক্রেটিনিজম** বা বামনত্ব এবং বয়স্কদের **মিক্সিডিমা** রোগ দেখা দেয়। এই হরমোনের অধিক ক্ষরণে **এক্সপথালমিক গয়টার** বা **গ্রেভস্-বর্ণিত রোগ** হয়।
14. প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হরমোনের নাম প্যারাথরমোন। এই হরমোন রক্ত ও কলার মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফেটের সাম্য বজায় রাখে।
15. প্যারাথরমোনের অভাবে **টিটানি** রোগ হয়। এর অধিক ক্ষরণে বৃক্কে পাথুরি জন্মায়, সরেখ পেশীর দৌর্বল্য ঘটে।
16. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি দুটি অংশে বিভক্ত—মেডালা ও কর্টেক্স। অ্যাড্রিনাল মেডালা থেকে উৎপন্ন হরমোনের নাম অ্যাড্রিনালিন বা এপিনেফ্রিন। এর প্রভাবে হৃৎপিণ্ডের গতি, রক্তচাপ ও রক্ত-শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
17. বিপদের সময়ে ক্ষরিত হয় বলে অ্যাড্রিনালিনকে আপদকালীন হরমোন বলা হয়।
18. শুক্রাশয়ের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ থেকে উৎপন্ন হরমোনের নাম টেস্টোস্টেরোন।
19. টেস্টোস্টেরোনের প্রভাবে পুরুষদের শুক্রাণু উৎপাদন, যৌন কামনা বৃদ্ধি, গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি ও গৌণ যৌন অঙ্গের বিকাশ ঘটে।
20. ডিম্বাশয়ের ফলিকলের কোষ থেকে উৎপন্ন হরমোনের নাম ইস্ট্রোজেন।
21. ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে স্ত্রীদের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি, গৌণ যৌন অঙ্গের বিকাশ, ঋতুচক্রের আবর্তন, গর্ভাবস্থায় জরায়ুর বৃদ্ধি প্রভৃতি ঘটে।

অনুশীলনী

(A) দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Long Answer type questions)

1. হরমোন কি ? হরমোনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [উঃ পৃঃ 462-463 দেখ]
2. অক্সিন কি ? এর কার্য উল্লেখ কর। [উঃ পৃঃ 467-470 দেখ]
3. জিব্বারেল্লিন কি ? এর কার্য উল্লেখ কর। [উঃ পৃঃ 470-471 দেখ]
4. সাইটোকাইনিন কি ? এর কার্য উল্লেখ কর। [উঃ পৃঃ 471-472 দেখ]
5. কৃষিকাজ ও উদ্যান বিদ্যায় হরমোনের ভূমিকা উল্লেখ কর। [উঃ পৃঃ 472-473 দেখ]

6. মানবদেহে যেসব অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে তাদের নাম কর। পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন যেসব হরমোন তোমাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত সেগুলির কাজ উল্লেখ কর। [উঃ 476-481 অংশ দেখ]
7. থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হরমোনের নাম কর এবং তাদের কার্য উল্লেখ কর। [উঃ পৃঃ 481-484 দেখ]
8. শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন যেসব হরমোন তোমাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত তাদের নাম কর ও প্রত্যেকের কার্য উল্লেখ কর। [উঃ পৃঃ 485-487 দেখ]
9. হরমোনের কর্মপদ্ধতি উল্লেখ কর। [উঃ পৃঃ 490 দেখ]

(B) **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন** (Short Answer type questions) :

1. হরমোনকে 'রাসায়নিক দূত' বলা হয় কেন? [উঃ পৃঃ 462 দেখ]
2. হরমোন ও উৎসেচকের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ পৃঃ 463 দেখ]
3. উদ্ভিদের কোন্ অংশ থেকে হরমোন উৎপন্ন হয়? উদ্ভিদ হরমোন কি কি ধরনের কাজ করে? [উঃ পৃঃ 466 দেখ]
4. অক্সিন ও জিব্বারেল্লিনের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। [উঃ পৃঃ 471 দেখ]
5. 'ট্রফিক' ও 'লোকাল' হরমোন বলতে কি বোঝ? একটি ট্রফিক ও একটি লোকাল হরমোনের নাম কর। [উঃ পৃঃ 474-475 দেখ]
6. নিউরোহরমোন কি? একটি উদাহরণ দাও। [উঃ পৃঃ 474-475 দেখ]
7. প্রাণিদেহে হরমোন প্রধানত কি কি কাজ করে? [উঃ পৃঃ 475-476 দেখ]
8. দেহে সোমাটোট্রপিক হরমোনের হ্রাস বা আধিক্য ঘটলে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়? [উঃ পৃঃ 477-478 দেখ]
9. গোনাডোট্রপিক হরমোনের কার্য উল্লেখ কর। [উঃ পৃঃ 479 দেখ]
10. পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন যে হরমোনটি তোমাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত তার কার্য উল্লেখ কর। দেহে ঐ হরমোনটির হ্রাস ও আধিক্য ঘটলে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়? [উঃ পৃঃ 479-480 দেখ]
11. পিটুইটারি গ্রন্থির ক্রিয়ায় হাইপোথ্যালামাস কি ভূমিকা পালন করে? [উঃ পৃঃ 480-481 দেখ]
12. থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হরমোনের কাজগুলি উল্লেখ কর। [উঃ পৃঃ 481-482 দেখ]
13. দেহে থাইরয়েড হরমোনের হ্রাস ও আধিক্য ঘটলে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়? [উঃ পৃঃ 482-483 দেখ]
14. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন যে হরমোনটি তোমাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত তার কাজ উল্লেখ কর। [উঃ পৃঃ 485 দেখ]
15. মানুষের দেহে টেস্টোস্টেরোন ও ইস্ট্রোজেনের অভাব ঘটলে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়? [উঃ পৃঃ 486-487 দেখ]

(C) **অতি সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্ট উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন** (Very short or specific Answer type questions) :

1. উদ্ভিদের দুটি প্রাকৃতিক হরমোনের নাম লেখ। [উঃ পৃঃ 466 দেখ]

2. উদ্ভিদের দুটি কৃত্রিম ও দুটি আনুমানিক (বা প্রকল্পিত) হরমোনের নাম কর। [উঃ পৃঃ 466 দেখ]
3. উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহায়ক ও বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক একটি করে হরমোনের নাম লেখ। [উঃ পৃঃ 464 দেখ]
4. নিউরোসেক্রিটরি কোষ কাকে বলে ? [উঃ পৃঃ 475 দেখ]
5. পিটুইটারি গ্রন্থি কোথায় অবস্থিত ? [উঃ পৃঃ 476-477 দেখ]
6. পিটুইটারিকে 'প্রভুগ্রন্থি' বলা হয় কেন ? [উঃ পৃঃ 477 দেখ]
7. বামনত্ব (Dwarfism) ও অ্যাক্রোমেগালি-র কারণ কি ? [উঃ পৃঃ 478 দেখ]
8. কোন্ হরমোনের প্রভাবে স্পার্মাটোজেনেসিস ঘটে ? ঐ হরমোন কোথা থেকে উৎপন্ন হয় ? [উঃ পৃঃ 479 দেখ]
9. কোন্ কোন্ হরমোনের প্রভাবে ওভুলেশন ঘটে ? উক্ত হরমোনগুলি কোথা থেকে উৎপন্ন হয় ? [উঃ পৃঃ 479 দেখ]
10. ADH বলতে কি বোঝ ? এই হরমোনের উৎসস্থল উল্লেখ কর। [উঃ পৃঃ 479 দেখ]
11. ক্রেটিনিজম কি ? এর কারণ কি ? [উঃ পৃঃ 482 দেখ]
12. মিক্সিডিমা কি ? এর কারণ কি ? [উঃ পৃঃ 482 দেখ]
13. গ্রেভ্‌সবর্ণিত রোগ বা এক্সপথালমিক গয়টার কি ? এই রোগের কারণ কি ? [উঃ পৃঃ 483 দেখ]
14. প্যারাথরমোনে-র উৎস উল্লেখ কর। দেহে এই হরমোনেক মাত্রা হ্রাস ঘটলে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ? [উঃ পৃঃ 483-484 দেখ]
15. অ্যাড্রিনালিন কোথা থেকে উৎপন্ন হয় ? এই হরমোনের প্রভাবে কি ঘটে ? [উঃ পৃঃ 485 দেখ]
16. বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া শব্দ/শব্দসমষ্টি থেকে শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
   (ক) অক্সিনের প্রভাবে উদ্ভিদদেহের বৃদ্ধি ——। (ঘটে/ঘটে না)
   (খ) অক্সিন উদ্ভিদের বৃদ্ধিজনিত চলন নিয়ন্ত্রণ ——। (করে/করে না)
   (গ) অক্সিন গাছ থেকে ফল ঝরে পড়া রোধ ——। (করে/করে না)
   (ঘ) জিব্বারেল্লিন কোষ বিভাজন ত্বরান্বিত ——। (করে/করে না)
   (ঙ) জিব্বারেল্লিনের প্রভাবে —— ফল উৎপন্ন হয়। (বীজহীন/বীজযুক্ত)
   (চ) টেস্টোস্টেরোন একটি —— হরমোন। (ট্রপিক/লোকাল)
   (ছ) সোমাটোট্রপিক হরমোনের প্রভাবে প্রোটীন সংশ্লেষের পরিমাণ —— পায়। (বৃদ্ধি/হ্রাস)
   (জ) —— হরমোনের প্রভাবে নেফ্রনের জল,পুনঃশোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। (ভ্যাসোপ্রেসিন/অ্যাড্রিনালিন)
   (ঝ) —— হরমোনের অভাবে টিটানি রোগের সৃষ্টি হয়। (প্যারাথরমোন/ইস্ট্রোজেন)
   (ঞ) অ্যাড্রিনালিনের অপর নাম ——। (থাইরক্সিন/এপিনেফ্রিন)

বংশগতি [HEREDITY] 7

Syllabus : Heredity : Definition, Mendel's experiment, monohybrid and dihybrid cross (cite one example from plant and one from animal) ; Mendel's laws.

7.1. বংশগতি (Herdity)

পিতামাতার দৈহিক ও চারিত্রিক নানা বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রকাশ পায়। কুঞ্চিত কেশ (Wavy hair), কটা চোখ (Brown eyes), টাক মাথা (Baldness), টোল খাওয়া গাল (Dimpled cheek), মাথার পিছন দিকে সাদা চুলের গুচ্ছ (White occipital lock of hair) প্রভৃতি দৈহিক বৈশিষ্ট্য বংশ-পরম্পরায় চলতে দেখা যায়। মধুমেহ (Diabetes), হিমোফিলিয়া (রক্তের তঞ্চন ঘটানোর অক্ষমতা) প্রভৃতি ব্যাধিও পিতামাতা থেকে সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রকাশ পায়। উন্নত বুদ্ধিবৃত্তি (Intelligence) ও গান-বাজনা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সুকুমার শিল্পে নৈপুণ্য বিশেষ বিশেষ পরিবারে বংশ-পরম্পরায় চলে। **এক প্রজন্ম** (Generation) **থেকে পরবর্তী প্রজন্মে দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এই প্রবাহকে বংশগতি** (Heredity) **বা উত্তরাধিকার** (Inheritance) **বলা হয়**। বিজ্ঞানের যে শাখা বংশগতি সম্পর্কে আলোচনা ও তার কারণ অনুসন্ধানে নিয়োজিত, সেই শাখাকে **জীনতত্ত্ব** (Genetics) বা **সুপ্রজননবিদ্যা** বলে।

চিত্র 7.1 : গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল

7.2. মেণ্ডেল—সুপ্রজননবিদ্যার জনক (Mendel—the Father of Genetics)

বংশগতি সম্পর্কে আলোচনাকালে সর্বাগ্রে যাঁর নাম মনে আসে তিনি ছিলেন অস্ট্রিয়াবাসী একজন ধর্মযাজক—নাম **গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল** (Gregor Johan Mendel)। বর্তমানের চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত ব্রনো (Brno) শহরের গির্জার বাগানে 1858-1866 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মেণ্ডেল ভোজ্য (edible) মটরশুঁটি উদ্ভিদকে (*Pisum sativum*) নিয়ে সংকরায়ণ (hybridization) সংক্রান্ত কতকগুলি পরীক্ষা করেন। বংশগতির পদ্ধতি জানার জন্যই তিনি ঐ পরীক্ষাগুলি চালান। পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে মেণ্ডেল দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ঐ সিদ্ধান্তগুলি **বংশগতি সম্পর্কে মেণ্ডেলের সূত্র** (Mendel's laws of heredity) বা **মেণ্ডেলিজম** (Mendelism) নামে পরিচিত।

মেণ্ডেল তাঁর গবেষণার ফলাফল 1866 খ্রীষ্টাব্দে একটি অখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করার ফলে উক্ত গবেষণা কাজটি তৎকালীন বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। 1900 খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের **দ্য ভ্রিস** (De Vries), জার্মানীর **কোরেন্স** (Correns) এবং অস্ট্রিয়ার **জেরম্যাক** (Tschermak) সংকরায়ণ সংক্রান্ত তাঁদের পরীক্ষা থেকে পৃথক-পৃথক ভাবে মেণ্ডেলের মত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এঁদের প্রচেষ্টাতেই মেণ্ডেলের আবিষ্কারের কথা ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে অন্যান্য বিজ্ঞানী জানতে পারেন। মেণ্ডেলের সূত্রগুলিকে বর্তমানে বংশগতি ও সুপ্রজননবিদ্যার ভিত্তিপ্রস্তর বলে মনে করা হয়। এই কারণেই তাঁকে 'সুপ্রজননবিদ্যার জনক' বলে অভিহিত করা হয়।

> **সংকরায়ণ কাকে বলে ?** একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু জীনগত ভাবে ভিন্ন (genetically different) বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুটি জীবের মধ্যে যৌন জনন ঘটানোকে সংকরায়ণ (Hybridization) বলে। উদাহরণ ঃ দীর্ঘ ও খর্ব কাণ্ড-বিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের মধ্যে ইতর পরাগযোগের মাধ্যমে যৌন জনন।

7.3. মেণ্ডেলের পরীক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য
(Some information about Mendel's experiments)

মেণ্ডেল বিভিন্ন বিকল্প (Alternative) বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভোজ্য মটরশুঁটি (*P. sativum*) উদ্ভিদের মধ্যে ইতর পরাগযোগ (Cross pollination) ঘটিয়ে তাঁর পরীক্ষা চালান। তিনি সাত জোড়া বিকল্প বৈশিষ্ট্যকে তাঁর পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেন। ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

(1) **লম্বা ও বামন** (Dwarf) উদ্ভিদদেহ।
(2) **রঙিন ও সাদা** ফুল।
(3) **কাক্ষিক** (Axillary) ও **শীর্ষদেশীয়** (Terminal) বা **প্রান্তীয়** ফুল।
(4) **হলুদ ও সবুজ** ফল (Pod)।
(5) **মসৃণ** (Smooth) ও **খাঁজযুক্ত** (Constricted) ফল।
(6) **হলুদ ও সবুজ** বীজ (Seed)।
(7) **সুগোল** (Round) ও **কুঞ্চিত** (Wrinkled) বীজ।

উক্ত বিকল্প বৈশিষ্ট্যের এক-একটি জোড়াকে **অ্যালিলোমর্ফিক বৈশিষ্ট্য** (Allelomorphic characters) বলে। একটি উদ্ভিদে প্রতি জোড়া বিকল্প বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে কোন একটির প্রকাশ দেখা যায়।

7.4. কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় (Some cognizable points)

মেণ্ডেলের পরীক্ষা ও তার ফলাফল সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে অন্যান্য কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই কারণে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিচে কিছু আলোচনা করা হল ঃ

(1) যে কোন জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে তার ক্রোমোসোমে

উপস্থিত জীন (Genes)। একটি প্রজাতির অধিকাংশ জীবের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাকে প্রজাতিটির **স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য** (Normal trait) বলে ধরা হয়।

(2) একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য একাধিক জীনের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফল। কখনও কখনও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জীনগুলির মধ্যে কোন একটির গঠনগত কোন পরিবর্তন হওয়ার ফলে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যটির পরিবর্তে সম্পূর্ণ নতুন আর একটি বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে। এই ঘটনাকে বলা হয় **মিউটেশন** (Mutation) এবং নতুন বৈশিষ্ট্যটিকে বলা হয় **মিউটেশনজনিত বৈশিষ্ট্য** (Mutated trait)। যে জীনটির মিউটেশন ঘটে, তাকে **মিউটেটেড জীন** (Mutated gene) বলা হয়।

(3) একটি নির্দিষ্ট জীন একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের একটি নির্দিষ্ট অংশে থাকে। ক্রোমোসোমের ঐ অংশটিকে ঐ বিশেষ জীনের **লোকাস** (Locus) বলা হয় (চিত্র 7.2)।

(4) কোন একজোড়া সমসংস্থ ক্রোমোসোমের কোন একটি নির্দিষ্ট লোকাসে একটি 'মিউটেটেড জীন' ও একটি 'স্বাভাবিক জীন' (Normal gene) উপস্থিত থাকতে পারে। এইরকম বিপরীতধর্মী জীন জোড়াকে **অ্যালিল** (Alleles) বা **অ্যালিলোমর্ফ** (Allelomorphs) বলা হয়।

চিত্র 7.2 : দুটি সমসংস্থ ক্রোমোসোমের নকশাকার চিত্র। বিভিন্ন লোকাসে অবস্থিত জীনগুলিকে বিভিন্নরূপে আঁকা হয়েছে।

(5) সমসংস্থ ক্রোমোসোম-জোড়ার কোন লোকাসের জীন দুটি একই রকমের হলে (দুটিই স্বাভাবিক বা দুটিই মিউটেটেড) লোকাসটিকে **হোমোজাইগাস লোকাস** (Homozygous locus) বা **খাঁটি লোকাস** (Pure locus) বা **বিশুদ্ধ লোকাস** বলা হয় এবং জীন দুটি ভিন্ন রকমের হলে (একটি স্বাভাবিক ও একটি মিউটেটেড) লোকাসটিকে **হেটেরোজাইগাস লোকাস** (Heterozygous locus) বা **সংকর লোকাস** (Hybrid locus) বলা হয়। খাঁটি লোকাসের জন্য যে বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়, তাকে 'খাঁটি বৈশিষ্ট্য' বলা হয়; যেমন—মটরশুঁটির 'খাঁটি হলুদ বীজ' বা 'খাঁটি সবুজ বীজ'। পক্ষান্তরে, সংকর লোকাসের জন্য যে বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়, তাকে 'সংকর বৈশিষ্ট্য' বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মটরশুঁটির 'সংকর হলুদ বীজ', 'সংকর দীর্ঘ উদ্ভিদদেহ' ইত্যাদি।

(6) একটিমাত্র সংকর লোকাসকে ভিত্তি করে কোন সংকরায়ণ পরীক্ষা করা হলে তাকে **মনোহাইব্রিড ক্রস** (Monohybrid cross) বা **এক-সংকর ক্রস** বলা হয়। সেইরকম দুটি বা তিনটি সংকর লোকাসকে ভিত্তি করে কোন সংকরায়ণ পরীক্ষা করা হলে তাদের যথাক্রমে **ডাই-হাইব্রিড ক্রস** (Dihybrid cross) বা **দ্বি-সংকর ক্রস** এবং **ট্রাইহাইব্রিড ক্রস** (Trihybrid cross) বা **ত্রি-সংকর ক্রস** বলে।

● **জীনের গঠনগত পরিবর্তনের ফলে কোন নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাবের ঘটনাকে বলা হয় মিউটেশন।** উদাহরণ ঃ ড্রসোফিলা নামক পতঙ্গে 'লাল' চক্ষুর পরিবর্তে 'সাদা' চক্ষুর আবির্ভাব।

● **সমসংস্থ ক্রোমোসোমের একটি নির্দিষ্ট লোকাসে একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জীবে যে সব বিপরীতধর্মী (Contrasting) জীন থাকে, তাদের বলা হয় অ্যালিল।** উদাহরণ ঃ মটরশুঁটির বিটপের 'দীর্ঘ' ও 'খর্ব' বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জীন পরস্পরের অ্যালিল।

● **যে জীব কোন সমসংস্থ ক্রোমোসোম জোড়ার একটি নির্দিষ্ট লোকাসে একই রকমের জীন বহন করে, সেই জীবকে উক্ত লোকাসের ব্যাপারে হোমোজাইগোট (Homozygote) বা খাঁটি জীব বলা হয়।**

● **যে জীব কোন সমসংস্থ ক্রোমোসোম জোড়ার একটি নির্দিষ্ট লোকাসে ভিন্নধর্মী জীন বহন করে, সেই জীবকে উক্ত লোকাসের ব্যাপারে হেটেরো-জাইগোট (Heterozygote) বা হাইব্রিড বা সংকর জীব বলা হয়।**

7.5. মনোহাইব্রিড ক্রস বা এক-সংকর ক্রস সংক্রান্ত মেণ্ডেলের পরীক্ষা (Monohybrid Cross of Mendel)

● ১ম উদাহরণ ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মেণ্ডেল বিভিন্ন বিকল্প বৈশিষ্ট্যযুক্ত মটরশুঁটি উদ্ভিদকে নিয়ে সংকরায়ণ পরীক্ষা করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি বিকল্প বৈশিষ্ট্যের দুটি খাঁটি উদ্ভিদ নির্বাচন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি খাঁটি **লাল** (red) ও খাঁটি **সাদা** পুষ্পবিশিষ্ট দুটি উদ্ভিদ নির্বাচন করেন। [উদ্ভিদগুলি যে খাঁটি ছিল তা বোঝা যায় তাদের মধ্যে স্ব-পরাগযোগ (Self-pollination)* ঘটিয়ে। স্ব-পরাগযোগের ফলে লাল পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদ থেকে কেবল লাল পুষ্পবিশিষ্ট এবং সাদা পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদ থেকে কেবল সাদা পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদই উৎপন্ন হয়।] তিনি উক্ত দু রকম উদ্ভিদের মধ্যে ইতর পরাগযোগ** ঘটান। উক্ত পরাগ-যোগের ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদগুলির সব কয়টিই লাল পুষ্পশোভিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সংকরায়ণ পরীক্ষায় প্রথম যে দুটি উদ্ভিদের মধ্যে ইতর পরাগযোগ ঘটানো হয় বা প্রথম যে দুটি প্রাণীর মধ্যে সংকরায়ণ করা হয় তাদের **পিতা-মাতা প্রজন্ম** (Parental generation) বলা হয় এবং P_1 সঙ্কেত দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। P_1 প্রজন্ম থেকে উৎপন্ন প্রজন্মকে **প্রথম অপত্য প্রজন্ম** (First filial generation) বা F_1 **প্রজন্ম** বলে। F_1 প্রজন্ম থেকে উৎপন্ন প্রজন্মকে **দ্বিতীয় অপত্য প্রজন্ম** (Second filial generation) বা F_2 **প্রজন্ম** বলা হয়। মেণ্ডেল F_1 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলির মধ্যে স্ব-পরাগযোগ ঘটান এবং লক্ষ্য করেন

* কোন পুষ্পের পরাগধানী থেকে সেই পুষ্পেরই গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর স্থানান্তরিত হওয়াকে 'স্ব-পরাগযোগ' বলে।

** কোন পুষ্পের পরাগধানী থেকে ঐ প্রজাতির অন্য কোন উদ্ভিদের পুষ্পের গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর স্থানান্তরিত হওয়াকে ইতর পরাগযোগ বলে।

যে, তাদের প্রত্যেকটি থেকে F_2 প্রজন্মে রঙিন পুষ্পযুক্ত ও সাদা পুষ্পযুক্ত দু রকম উদ্ভিদেরই সৃষ্টি হয়েছে এবং উক্ত দু রকম উদ্ভিদের অর্থাৎ লাল ও সাদা পুষ্পযুক্ত উদ্ভিদের অনুপাত দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে 3 : 1। উক্ত ফলাফলের সঙ্কেত নিচে দেওয়া হল :

P_1.........লাল × সাদা [ইতর পরাগযোগ ঘটানো হয়]
F_1......... লাল [স্ব-পরাগযোগ ঘটানো হয়]
F_2.........3 লাল : 1 সাদা

বর্তমানকালে ক্রোমোসোম এবং জীন সম্পর্কে আমাদের যথাযথ ধারণা থাকার ফলে মেন্ডেলের পরীক্ষার ফলগুলিকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি। মটরশুঁটির ক্ষেত্রে লাল পুষ্প একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং অনেকগুলি জীনের পারস্পরিক ক্রিয়ায় ঐ রঙের সৃষ্টি হয়। এই স্বাভাবিক জীনগুলির যে কোন একটিতে মিউটেশনের ফলে সাদা পুষ্পের উদ্ভব হয়েছে। এখন স্বাভাবিক জীনটিকে 'R' (বড় হাতের R বলে উচ্চারণ করতে হবে) প্রতীক দ্বারা এবং মিউটেটেড জীনটিকে 'w' (ছোট হাতের w বলে উচ্চারণ করতে হবে) প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করলে P_1 প্রজন্মের খাঁটি লাল এবং খাঁটি সাদা পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদের সাদা লোকাসটির* (white locus) জেনেটিক সংযুতি (genetic composition) যথাক্রমে RR এবং ww হবে।

এখন উপরিউক্ত লাল পুষ্পযুক্ত গাছটির পুং ও স্ত্রী দু রকম জননকোষের প্রতিটিতেই সাদা লোকাসে উপস্থিত জীনের সঙ্কেত হবে R ; সেইরূপ সাদা পুষ্পযুক্ত গাছের প্রতিটি জননকোষে উক্ত লোকাসে উপস্থিত জীনের সঙ্কেত হবে w। যখন উল্লিখিত দু রকম গাছের মধ্যে ইতর পরাগযোগ ঘটবে তখন একটি R এবং একটি w জীনবিশিষ্ট জননকোষের মিলন ঘটবে। ফলে Rw জেনেটিক সংযুতিসম্পন্ন F_1 উদ্ভিদের সৃষ্টি হবে (চিত্র 7.3)। নতুন উদ্ভিদগুলির সাদা লোকাসটিতে R এবং w এই দু রকম জীন উপস্থিত থাকলেও উদ্ভিদগুলি লাল পুষ্পবিশিষ্ট হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক জীনটিকে (R) **প্রকট** বা **প্রবল জীন** (Dominant gene) ও মিউটেটেড জীনটিকে (w) **প্রচ্ছন্ন** বা **অপ্রবল জীন** (Recessive gene) বলা হয় এবং উদ্ভিদটিকে সাদা লোকাসে **সংকর** বলা হয়।

- **দুটি অ্যালিলোমর্ফিক জীনের মধ্যে যে জীনটি হেটেরোজাইগাস অবস্থায় অপর জীনের ক্রিয়াকে অবদমিত করে নিজের সক্রিয়তার প্রকাশ ঘটায়, তাকে 'প্রবল জীন' বা 'প্রকট জীন' বলে। প্রবল জীন কর্তৃক নির্ধারিত গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে 'প্রবল গুণ' বলে।** উদাহরণ : মটরশুঁটির দীর্ঘ বিটপ, **লাল** পুষ্প ইত্যাদি।

- **দুটি অ্যালিলোমর্ফিক জীনের মধ্যে হেটেরোজাইগাস অবস্থায় যে জীনটি নিজ ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটাতে পারে না, তাকে 'অপ্রবল জীন' বা 'প্রচ্ছন্ন জীন' বলে। অপ্রবল জীন কর্তৃক নির্ধারিত গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে 'অপ্রবল গুণ' বলে। অপ্রবল জীন হোমোজাইগাস অবস্থায় অপ্রবল গুণের প্রকাশ ঘটায়।** উদাহরণ : মটরশুঁটির খর্ব বিটপ, সাদা পুষ্প ইত্যাদি।

* একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কোন জীবে কোন লোকাসে একবার মিউটেশন ঘটলে ঐ প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সকল জীবে ঐ লোকাসটি মিউটেটেড জীনের নামে পরিচিত হয়।

সংকর উদ্ভিদে R এবং w অ্যালিলগুলি (বা জীনগুলি) পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় না। সেই কারণে, তাদের জননকোষ সৃষ্টির সময় যখন মায়োটিক বিভাজন হয় তখন R এবং w পরস্পর পৃথক হয়ে যায় (চিত্র 7.3)। ফলে অর্ধেক জননকোষ R অ্যালিলকে এবং অর্ধেক জননকোষ w অ্যালিলকে লাভ করে। এখন এই সংকর উদ্ভিদগুলিতে স্ব-পরাগযোগ ঘটলে একটি R পুং-জননকোষ যেমন একটি R অথবা w স্ত্রী-জননকোষকে নিষিক্ত করতে পারে, তেমনি একটি w পুং-জননকোষও একটি R অথবা w স্ত্রী-জননকোষকে নিষিক্ত করতে পারে। ফলে, উক্ত সংকর উদ্ভিদে স্ব-পরাগযোগ দ্বারা নিম্নলিখিত অনুপাতে বংশধর সৃষ্টি হয়—1 RR : 2 Rw : 1 ww। প্রথম দুটি শ্রেণীর উদ্ভিদগুলি লাল পুষ্পবিশিষ্ট এবং শেষোক্ত শ্রেণীর উদ্ভিদগুলি সাদা পুষ্পবিশিষ্ট হয়। অতএব, লাল ও সাদার অনুপাত দাঁড়ায় 3 : 1 (চিত্র 7.3 এবং 7.4)। বংশগতিতে এই 3 : 1 অনুপাতকে **এক-সংকর ফিনোটাইপগত অনুপাত** বলা হয়।

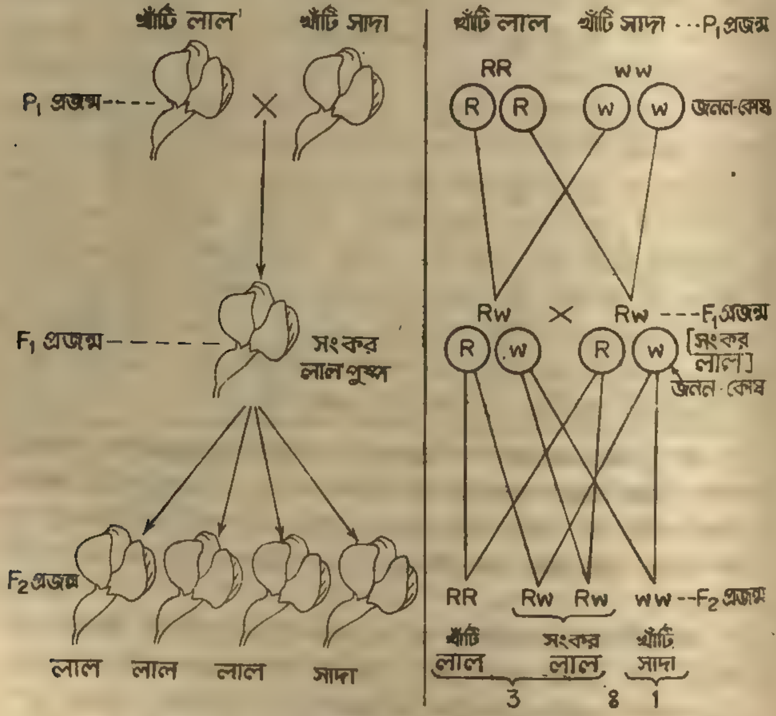

চিত্র 7.3 : মটরশুঁটিতে এক-সংকর ক্রস ও তার ফলাফল।

মেণ্ডেল F_2 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলির মধ্যে স্ব-পরাগযোগ ঘটিয়ে লক্ষ্য করেন, লাল পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদগুলির 3 ভাগের 1 ভাগ থেকে কেবলই লাল পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, ঐ গাছগুলি ছিল খাঁটি লাল (pure

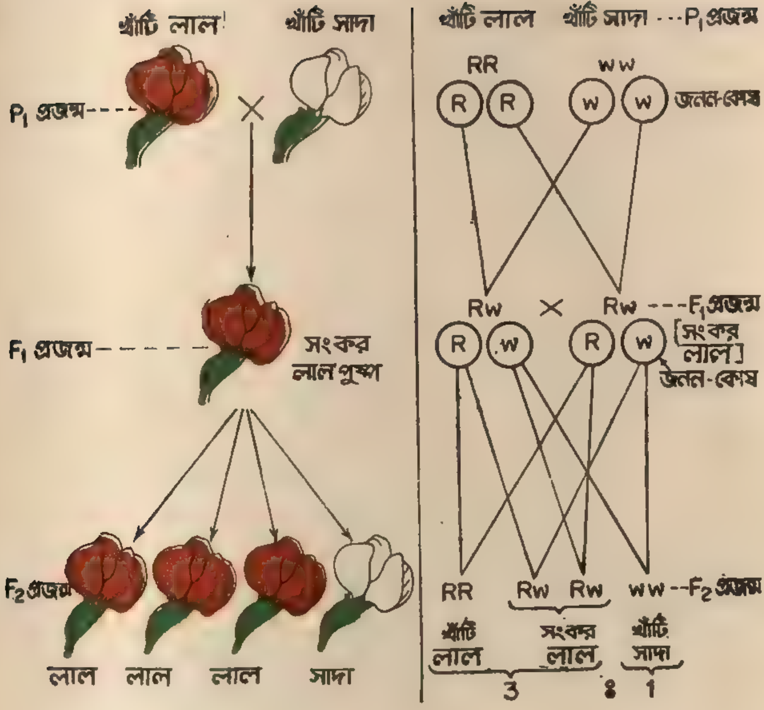

মটরশুঁটিতে এক-সংকর ক্রস ও তাহার ফলাফল।

red) এবং তাদের জেনেটিক সংযুতি RR। লাল পুষ্পবিশিষ্ট বাকী উদ্ভিদগুলি (3 ভাগের 2 ভাগ) লাল ও সাদা পুষ্পবিশিষ্ট দু রকম উদ্ভিদেরই সৃষ্টি করেছে। অতএব, তারা ছিল সংকর লাল (hybird red) এবং তাদের জেনেটিক সংযুতি Rw। সাদা পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদগুলি কেবলই সাদা পুষ্পের উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছে। অতএব, তারা ছিল খাঁটি সাদা (pure white) এবং তাদের জেনেটিক সংযুতি ww।

[মেণ্ডেলের সময় অ্যালিল বা জীনের কথা জানা ছিল না। তিনি মনে করতেন মটরশুটি উদ্ভিদের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট এক-একটি **ফ্যাক্টর** (Factor) বা **উপাদান** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে মেণ্ডেলের কল্পিত ফ্যাক্টরকে 'জীন' বলা হয়।]

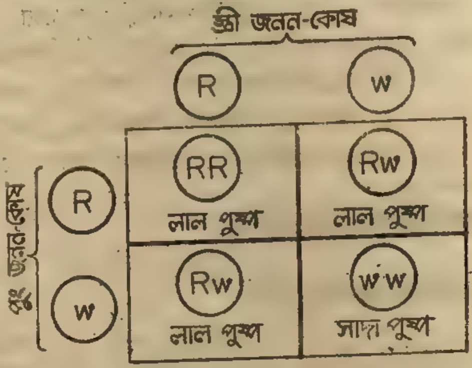

চিত্র 7.4 : চেকারবোর্ডের সাহায্যে মনোহাইব্রিড ক্রসের ফলাফল।

পর্যবেক্ষণ (Observation) : সংকরায়ণ-সংক্রান্ত উপরিউক্ত পরীক্ষাকালে মেণ্ডেল দুটি জিনিস লক্ষ্য করেন—(1) সংকর উদ্ভিদগুলিতে দুটি ফ্যাক্টরের মধ্যে মাত্র একটির প্রকাশ ঘটছে, অপরটি নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না। (2) F_1 প্রজন্মের সংকরগুলি থেকে খাঁটি লাল ও খাঁটি সাদা পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদের সৃষ্টি হচ্ছে, অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে F_1 সংকরগুলিতে সাদা ফ্যাক্টর ও তার স্বাভাবিক ফ্যাক্টরের মধ্যে মিশ্রণ ঘটেনি। [কিন্তু এই পরীক্ষার পূর্বে ধারণা ছিল যে সংকর উদ্ভিদে লাল ও সাদা ফ্যাক্টরের মধ্যে মিশ্রণ ঘটে এবং তারা কখনই খাঁটি উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে পারে না।]

সিদ্ধান্ত (Inference) : উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণগুলি থেকে মেণ্ডেল যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা বংশগতি সম্পর্কে মেণ্ডেলের প্রথম সূত্ররূপে পরিচিত।

সূত্রটি নিম্নরূপ :

(1) **সেগ্রিগেশান বা পৃথগ্‌ভবনের সূত্র** (Law of Segregation) : **সংকর জীবের মধ্যে বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলির বা তাদের ফ্যাক্টরগুলির মিশ্রণ ঘটে না। তাদের মধ্যে জননকোষ সৃষ্টির সময় বিপরীত ফ্যাক্টরগুলি পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং এক-একটি জননকোষ এক-একটি ফ্যাক্টর লাভ করে।***

---

* কোন কোন পাঠ্যপুস্তকে মেণ্ডেলের বংশগতির সূত্রগুলির মধ্যে 'প্রকটতা ও প্রচ্ছন্নতার সূত্র' (Law of dominance and recessiveness) নামে একটি সূত্রের উল্লেখ দেখা যায়। মেণ্ডেল তাঁর গবেষণাপত্রে ঐরূপ কোন সূত্রের উল্লেখ করেননি। কেননা মটর গাছে 'পুষ্প

মেণ্ডেলের উপরিউক্ত পরীক্ষার F_2 প্রজন্মের লাল পুষ্পবিশিষ্ট সব কয়টি উদ্ভিদের জেনেটিক সংযুতি একই রকমের ছিল না। 3 ভাগের 1 ভাগ উদ্ভিদের জেনেটিক সংযুতি ছিল RR এবং 2 ভাগের Rw [চিত্র 7.3 দ্রষ্টব্য]। অতএব দেখা যাচ্ছে, একই বাহ্যিক লক্ষণবিশিষ্ট (এক্ষেত্রে লাল ফুল) সকল উদ্ভিদের জেনেটিক সংযুতি একরকম হয় না। কোন একটি জীবের বাহ্যিক লক্ষণকে তার **ফিনোটাইপ** (Phenotype) এবং জেনেটিক সংযুতিকে তার **জিনোটাইপ** (Genotype) বলা হয়। আলোচ্য পরীক্ষার F_2 প্রজন্মে দুটি ফিনোটাইপগত শ্রেণী (লাল ও সাদা) এবং তিনটি জিনোটাইপগত শ্রেণী (RR, Rw, ww) আছে। অতএব মনোহাইব্রিড ক্রসের F_1 প্রজন্মের (আলোচ্য ক্ষেত্রে F_2 প্রজন্মের) 'ফিনোটাইপগত অনুপাত' (Phenotypic ratio) ও 'জিনোটাইপগত অনুপাত' (Genotypic ratio) নিম্নরূপ ঃ

ফিনোটাইপগত অনুপাত ঃ 3 : 1
[প্রকট বৈশিষ্ট্য] [প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য]

জিনোটাইপগত অনুপাত ঃ 1 : 2 : 1
[দুটি প্রকট জীন] [একটি প্রকট ও একটি প্রচ্ছন্ন জীন] [দুটি প্রচ্ছন্ন জীন]

● **কোন জীবের বাহ্যিক লক্ষণকে তার ফিনোটাইপ বলে।** উদাহরণ ঃ লাল পুষ্পযুক্ত মটরশুঁটি গাছ, দীর্ঘ বিটপবিশিষ্ট মটরশুঁটি গাছ ইত্যাদি।
● **কোন জীবের জেনেটিক সংযুতিকে তার জিনোটাইপ বলে।** উদাহরণ ঃ RR, Rw, ww ইত্যাদি।

মেণ্ডেল পূর্ব-বর্ণিত একটিমাত্র পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে 'সেগ্রিগেশানের সূত্র' উদ্ভাবন করেননি। তিনি মটরশুঁটির আরও যে সব বিকল্প বৈশিষ্ট্যকে তাঁর সংকরায়ণ পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেন তা 497 পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত বিকল্প বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোনটি প্রকট ও কোনটি প্রচ্ছন্ন তা 7.1 নং **তালিকায়** উল্লেখ করা হল। তালিকায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে ছাত্রছাত্রীরা সহজেই মনোহাইব্রিড ক্রসের প্রতি ক্ষেত্রে F_1 প্রজন্মের ফিনোটাইপগত ও জিনোটাইপগত অনুপাত নির্ধারণ করতে পারবে।

ক্রোমোসোম ও জীন সম্পর্কে লব্ধ ধারণার ভিত্তিতে মেণ্ডেলের মনোহাইব্রিড ক্রস সংক্রান্ত পরীক্ষার সংক্ষিপ্তসার ঃ

(i) মেণ্ডেল P_1 প্রজন্মে খাঁটি **লাল** পুষ্পবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদ ও খাঁটি **সাদা** পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে ইতর পরাগযোগ ঘটান।

প্রদান কাল' (flowering time) সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যটির পরীক্ষাকালে তিনি F_1 প্রজন্মে মাঝামাঝি অবস্থার প্রকাশ লক্ষ্য করেন এবং তা থেকে তিনি উপলব্ধি করেন যে, সব ক্ষেত্রে প্রকটতার অস্তিত্ব নেই। অতএব, সেটিকে একটি সূত্র হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। [দ্রষ্টব্য ঃ "A Short History of Genetics"—L. C. Dunn]।

(ii) যেহেতু P_1 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলি ছিল খাঁটি বা বিশুদ্ধ, অতএব তাদের জিনোটাইপ ছিল যথাক্রমে RR (লাল) ও ww (সাদা) [চিত্র 7.3]।

(iii) P_1 প্রজন্মের লাল পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদগুলির গ্যামেটে ছিল 'R' জীন এবং সাদা পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদগুলির গ্যামেটে ছিল 'w' জীন।

(iv) উক্ত দু রকম গ্যামেটের মিলনে উৎপন্ন F_1 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলির জিনোটাইপ ছিল Rw এবং সমস্ত উদ্ভিদই ছিল লাল পুষ্পবিশিষ্ট। এদের জিনোটাইপ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এরা ছিল হাইব্রিড বা সংকর—এক্ষেত্রে মনোহাইব্রিড বা এক-সংকর।

(v) এইসব এক-সংকর উদ্ভিদের মধ্যে দু রকম পুং-গ্যামেট (R এবং w) এবং দু রকম স্ত্রী-গ্যামেট (R এবং w) সৃষ্টি হয়েছিল (চিত্র 7.3 ও 7.4)।

(vi) F_1 প্রজন্মের গ্যামেটগুলির মিলনে F_2 প্রজন্মে দু রকম ফিনোটাইপ (লাল ও সাদা পুষ্পবিশিষ্ট) এবং তিন রকম জিনোটাইপবিশিষ্ট (RR, Rw, ww) উদ্ভিদের সৃষ্টি সম্ভব হয়। উদ্ভিদগুলির ফিনোটাইপগত অনুপাত ছিল 3 (রঙিন) : 1 (সাদা)।

F_2 প্রজন্মের উক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে মেন্ডেল সিদ্ধান্ত করেন যে, হাইব্রিড বা সংকর জীবে বিপরীতধর্মী ফ্যাক্টর বা অ্যালিলগুলির মিশ্রণ ঘটে না এবং সংকর জীবে গ্যামেট সৃষ্টির সময় বিপরীতধর্মী অ্যালিলগুলির পৃথগ্‌ভবন ঘটে। এই পৃথগ্‌ভবন ঘটার ফলেই F_2 প্রজন্মে 3 : 1 ফিনোটাইপগত অনুপাত পাওয়া সম্ভব হয়।

7.1 নং তালিকা

বৈশিষ্ট্যযুক্ত অঙ্গ অথবা বৈশিষ্ট্যের ধরন	প্রকট	প্রচ্ছন্ন
বিটপ	দীর্ঘ	খর্ব
পুষ্প	রঙিন	সাদা
পুষ্পের অবস্থান	কাক্ষিক	শীর্ষদেশীয় বা প্রান্তীয়
ফলের (শিম্বের) রঙ	সবুজ	হলুদ
ফলের (শিম্বের) আকার	মসৃণ	খাঁজযুক্ত
বীজপত্রের রঙ	হলুদ	সবুজ
বীজের আকার	সুগোল	কুঞ্চিত

● ২য় উদাহরণ ঃ

(A) **পরীক্ষা (Experiment) ঃ** এই পরীক্ষায় মেণ্ডেল খাঁটি দীর্ঘ (pure tall) ও খাঁটি খর্ব (pure dwarf) কাণ্ডবিশিষ্ট দুই রকম উদ্ভিদ নির্বাচন করেন। তিনি উক্ত দুই রকম উদ্ভিদের মধ্যে ইতর পরাগযোগ (cross-pollination) ঘটান। উক্ত পরাগযোগের ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদগুলির সব কয়টিই দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট হয়। F_1 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলির মধ্যে মেণ্ডেল স্ব-পরাগযোগ ঘটান এবং লক্ষ্য করেন যে, তাদের প্রত্যেকটি থেকে F_2 প্রজন্মে দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট ও খর্ব কাণ্ডবিশিষ্ট দুই রকমের উদ্ভিদেরই সৃষ্টি হয়েছে এবং উক্ত দুই রকম উদ্ভিদের অর্থাৎ দীর্ঘ ও খর্ব কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদের অনুপাত দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে 3 : 1। উক্ত ফলাফলের সঙ্কেত নিচে দেওয়া হল ঃ

P_1......দীর্ঘ × খর্ব [ইতর পরাগযোগ ঘটানো হয়]
F_1......দীর্ঘ [স্ব-পরাগযোগ ঘটানো হয়]
F_2......3 দীর্ঘ : 1 খর্ব

মটরশুঁটির ক্ষেত্রে দীর্ঘ কাণ্ড একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং অনেকগুলি জীনের পারস্পরিক ক্রিয়ায় ঐ দীর্ঘ বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়। এই স্বাভাবিক জীনগুলির যে কোন একটিতে মিউটেশনের ফলে খর্ব কাণ্ডের উদ্ভব হয়েছে। এখন স্বাভাবিক জীনটিকে 'T' প্রতীক চিহ্ন দ্বারা এবং মিউটেটেড জীনটিকে 't' প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করলে P_1 প্রজন্মের খাঁটি দীর্ঘ এবং খাঁটি খর্ব কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদ-দুটির জীনগত সংযুতি (genetic composition) যথাক্রমে TT এবং tt হবে।

উপরিউক্ত দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট গাছটির পুং (♂) ও স্ত্রী (♀) দুই রকম জননকোষের প্রতিটিতেই উপস্থিত জীনের সঙ্কেত হবে T ; সেইরূপ খর্ব কাণ্ডবিশিষ্ট গাছের প্রতিটি জননকোষে উপস্থিত জীনের সঙ্কেত হবে t। যখন উল্লিখিত দুই রকম গাছের মধ্যে ইতর পরাগযোগের মাধ্যমে পরনিষেক ঘটে তখন একটি T এবং একটি t জীনবিশিষ্ট জননকোষের মিলন ঘটে। ফলে Tt জেনেটিক সংযুতি সম্পন্ন F_1 উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। অপত্য উদ্ভিদগুলির কাণ্ডের দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত লোকাসটিতে T এবং t এই দুই রকম জীন উপস্থিত থাকলেও উদ্ভিদগুলি দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট হয়। এরূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক জীনটিকে (T) **প্রকট** বা **প্রবল জীন** ও মিউটেটেড জীনটিকে (t) **প্রচ্ছন্ন** বা **অপ্রবল জীন** বলা হয় এবং উদ্ভিদটিকে উক্ত বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে **সংকর** (Hybrid) বলা হয়।

সংকর উদ্ভিদে T এবং t অ্যালিলগুলি (বা জীনগুলি) পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় না। তাই এদের জননকোষ সৃষ্টির সময় যখন মায়োটিক বিভাজন হয় তখন T এবং t পরস্পর পৃথক হয়ে যায়। ফলে অর্ধেক জননকোষ T অ্যালিলকে এবং অর্ধেক জননকোষ t অ্যালিলকে লাভ করে। এখন এই সংকর উদ্ভিদগুলির মধ্যে স্ব-পরাগযোগের মাধ্যমে স্বনিষেক ঘটে একটি T পুং-জননকোষ যেমন একটি T অথবা t স্ত্রী-জননকোষকে নিষিক্ত করতে পারে, তেমনি একটি t পুং-জননকোষও একটি T অথবা t স্ত্রী-জননকোষকে নিষিক্ত করতে পারে। ফলে উক্ত সংকর উদ্ভিদে স্বনিষেকের দ্বারা নিম্নলিখিত অনুপাতে বংশধর সৃষ্টি হয়—1TT : 2Tt : 1tt।

দীর্ঘ বিটপ ও খর্ব বিটপ-যুক্ত মটর-শুঁটিতে এক সংকর ক্রস ও তার ফলাফল

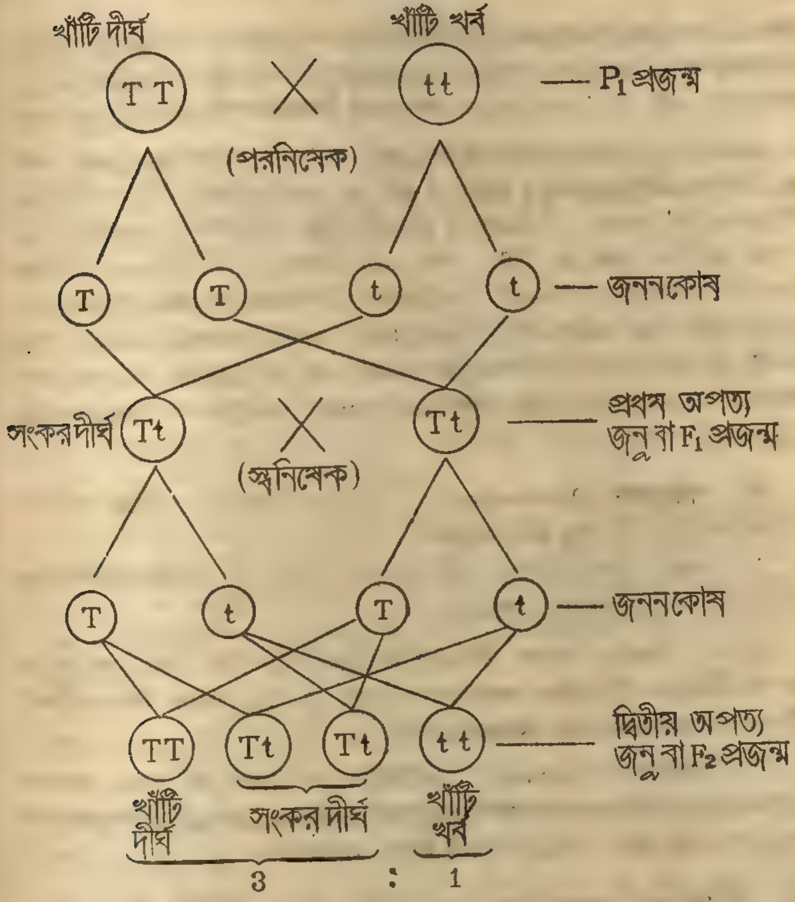

F_2 প্রজন্ম

জননকোষ ⟶

♂ / ♀	T	t
T	T T	T t
t	T t	t t

চেকার বোর্ড

F_2-জনুর ফিনোটাইপ:
দীর্ঘ বিটপ = 3
খর্ব বিটপ = 1
সুতরাং একসংকর ক্রস-এর F_2-জনুর ফিনোটাইপের অনুপাত = 3:1

প্রথম দুটি শ্রেণীর উদ্ভিদগুলি দীর্ঘ কান্ডবিশিষ্ট এবং শেষোক্ত শ্রেণীর উদ্ভিদগুলি খর্ব কান্ডবিশিষ্ট হয়। অতএব দীর্ঘ কান্ড ও খর্ব কান্ডের অনুপাত দাঁড়ায় 3 : 1। বংশগতিতে এই 3 : 1 অনুপাতকে **এক-সংকর ফিনোটাইপগত** অনুপাত বলা হয়।

মেন্ডেল F_2 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলির মধ্যে স্বনিষেক ঘটিয়ে লক্ষ্য করেন, দীর্ঘ কান্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদগুলির 3 ভাগের 1 ভাগ ($\frac{1}{3}$) থেকে কেবলই দীর্ঘ কান্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, ঐ গাছগুলি ছিল খাঁটি দীর্ঘ (pure tall) এবং তাদের জেনেটিক সংযুতি TT। দীর্ঘ কান্ডবিশিষ্ট বাকী উদ্ভিদগুলি অর্থাৎ 3 ভাগের 2 ভাগ ($\frac{2}{3}$) দীর্ঘ ও খর্ব কান্ডবিশিষ্ট দু রকম উদ্ভিদেরই সৃষ্টি করেছে। অতএব তারা ছিল সংকর দীর্ঘ (hybrid tall) এবং তাদের জেনেটিক সংযুতি Tt। আবার, খর্ব কান্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদগুলি কেবলই খর্ব কান্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছে। অতএব তারা ছিল খাঁটি খর্ব (pure dwarf) এবং তাদের জেনেটিক সংযুতি tt।

(B) **পর্যবেক্ষণ** (Observation) ঃ সংকরায়ণ সংক্রান্ত উপরিউক্ত পরীক্ষা-কালেও মেন্ডেল দুটি বিষয় লক্ষ্য করেন—

(1) সংকর উদ্ভিদগুলিতে দুটি ফ্যাক্টরের মধ্যে মাত্র একটির প্রকাশ ঘটছে, অপরটি নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না।

(2) F_1 প্রজন্মের সংকর উদ্ভিদগুলি থেকে খাঁটি দীর্ঘ ও খাঁটি খর্ব কান্ড-বিশিষ্ট উদ্ভিদের সৃষ্টি হচ্ছে, অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, F_1 সংকর উদ্ভিদগুলিতে দীর্ঘ ও খর্ব ফ্যাক্টরের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেনি।

(C) **সিদ্ধান্ত** (Inference) ঃ উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণগুলি থেকে মেন্ডেল যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা বংশগতি সম্পর্কে মেন্ডেলের প্রথম সূত্র (পৃথগ্‌ভবন সূত্র) রূপে পরিচিত। সূত্রটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

7.6. অসম্পূর্ণ প্রকটতা (Incomplete dominance)

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুটি অ্যালিলের মধ্যে একটি প্রকট ও অপরটি প্রচ্ছন্ন হলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটে না। অর্থাৎ, দুটি অ্যালিলের কোনটিরই প্রকাশ না ঘটে একটি মধ্যবর্তী (Intermediate) বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, স্ন্যাপড্রাগন (Snapdragon) নামক উদ্ভিদে লাল ও সাদা, দু রকমের ফুল দেখা যায়। খাঁটি লাল পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদ ও খাঁটি সাদা পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে ইতর পরাগযোগ ঘটলে F_1 প্রজন্মে গোলাপী পুষ্পের আবির্ভাব হয়। আবার, F_1 প্রজন্মের সংকর উদ্ভিদগুলির মধ্যে সংকরায়ণ ঘটলে F_2 প্রজন্মে 1 লাল : 2 গোলাপী : 1 সাদা পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। এই অনুপাত মেন্ডেলের পরীক্ষার F_2 প্রজন্মের জিনোটাইপগত অনুপাতের (Genotypic ratio) অনুরূপ। এই অনুপাত থেকে বোঝা যায়, F_1 প্রজন্মের সংকর উদ্ভিদগুলির মধ্যে পুষ্পের রঙ সংক্রান্ত দুটি অ্যালিলের মিশ্রণ ঘটে না—তারা নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রেখেও নতুন একটি ফিনোটাইপের (এক্ষেত্রে 'গোলাপী') উদ্ভব ঘটায়। **পিতা ও মাতার**

দেহে উপস্থিত দুটি ভিন্নধর্মী জীন বা অ্যালিল সন্তান-সন্ততিতে হেটেরোজাইগাস অবস্থায় এইরূপ নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটালে, সেই ঘটনাকে 'অসম্পূর্ণ প্রকটতা' বলা হয়।

এর বিপরীত ঘটনাকে, অর্থাৎ হেটেরোজাইগাস অবস্থায় দুটি অ্যালিলের মধ্যে একটিকে অবদমিত করে অপরটির প্রকাশ হওয়ার ঘটনাকে **সম্পূর্ণ প্রকটতা (Complete dominance)** বলে।

অনেক প্রাণীতেও অসম্পূর্ণ প্রকটতার ঘটনা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি হোমোজাইগাস কালো (Black) অ্যান্ডালুসিয়ান মুরগী (Andalusian fowl) ও একটি হোমোজাইগাস ছিট-ছিট দাগবিশিষ্ট সাদা (Splashed white) মোরগের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটলে F_1 প্রজন্মের সংকর মুরগীগুলি নীল (Blue) রঙের হয়— অর্থাৎ পিতামাতার ফিনোটাইপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ফিনোটাইপ। অতএব, এটিও অসম্পূর্ণ প্রকটতার একটি দৃষ্টান্ত।

অসম্পূর্ণ প্রকটতার ঘটনাগুলি মেন্ডেলের প্রথম সূত্রকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করে না। এইসব ক্ষেত্রেও মেন্ডেলের প্রথম সূত্র প্রযোজ্য। মটরশুঁটি উদ্ভিদে মেন্ডেলের পরীক্ষাগুলির সঙ্গে অসম্পূর্ণ প্রকটতার ঘটনাগুলির একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে, এইসব ক্ষেত্রে সংকর জীবগুলিকে তাদের ফিনোটাইপ দিয়ে সহজেই চিনে নেওয়া যায়।

7.7. 3 : 1 অনুপাত কখন সম্ভব? (When 3 : 1 ratio is obtained ?)

দীর্ঘ ও খর্ব মটরশুঁটি উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ দ্বারা F_2 প্রজন্মে যদি মাত্র 4টি উদ্ভিদ উৎপাদিত হয়, তাহলে তার মধ্যে 3টি যে দীর্ঘ এবং 1টি যে খর্ব হবে এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কেননা, 3 : 1 অনুপাত একটি গড় ফল (Average result)—পরম ফল (Absolute result) নয়। **অল্টেনবার্গ** (Altenburg) এই ব্যাপারটিকে মুদ্রা নিক্ষেপের (tossing of a coin) সঙ্গে তুলনা করেছেন। মুদ্রা নিক্ষেপকালে 1 : 1 অনুপাতে 'হেড' ও 'টেল' পাওয়া সম্ভব। কিন্তু একটি মুদ্রাকে মাত্র দুবার নিক্ষেপ করলে উক্ত অনুপাতে হেড ও টেল না পেয়ে, দু বারই হেড বা দু বারই টেল লাভ হতে পারে। কিন্তু মুদ্রাটিকে যদি বহুবার নিক্ষেপ করা হয়, ধরা যাক 100 বার, তাহলে প্রায় 50 বার হেড ও প্রায় 50 বার টেল পাওয়া সম্ভব (অর্থাৎ, 1 : 1 অনুপাতে)। অতএব ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে, যত বেশী বার মুদ্রাটি নিক্ষিপ্ত হবে হেড ও টেল প্রাপ্তির সংখ্যা ততই 1 : 1 অনুপাতের কাছাকাছি পৌঁছাবে। সংকরায়ণ সংক্রান্ত পরীক্ষার ক্ষেত্রেও সন্তান-সন্ততির সংখ্যা F_2 প্রজন্মে যত বেশী হবে, পরীক্ষালব্ধ ফলও ততই 3 : 1 অনুপাতের কাছাকাছি আসবে। মেন্ডেলের পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি (অর্থাৎ, F_2 প্রজন্মের উদ্ভিদ সংখ্যা) পরপৃষ্ঠায় 7.2 নং তালিকায় দেওয়া হল।

7.2 নং তালিকা

P_1 প্রজন্ম	F_1	F_2	F_2 অনুপাত
1. লাল × সাদা পুষ্প	সব লাল	705 লাল : 224 সাদা	3·15 : 1
2. কাক্ষিক × প্রান্তীয় পুষ্প	সব কাক্ষিক	651 কাক্ষিক : 207 প্রান্তীয়	3·14 : 1
3. দীর্ঘ × খর্ব বিটপ	সব দীর্ঘ	787 দীর্ঘ : 277 খর্ব	2·84 : 1
4. সবুজ × হলুদ ফল	সব সবুজ	428 সবুজ : 152 হলুদ	2·82 : 1
5. মসৃণ × খাঁজযুক্ত ফল	সব মসৃণ	882 মসৃণ : 299 খাঁজযুক্ত	2·95 : 1
6. সুগোল × কুঞ্চিত বীজ	সব সুগোল	5,474 সুগোল : 1,850 কুঞ্চিত	2·96 : 1
7. হলুদ × সবুজ বীজপত্র	সব হলুদ	6,022 হলুদ : 2,001 সবুজ	3·01 : 1

7.8. মেণ্ডেল কেন ভোজ্য মটর গাছকে পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করেন ? (**Why Mendel selected edible peas for his experiment ?**)

নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে মেণ্ডেল মটর গাছকে তাঁর পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করেন ঃ

(i) মটর গাছ যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণু ; অর্থাৎ, সামান্য কারণে তাদের মৃত্যু ঘটে না এবং সহজেই বাগানে চাষ করা যায়। (ii) সংকরায়ণ পরীক্ষায় যত তাড়াতাড়ি এবং যত বেশী পরিমাণে নতুন অপত্য (offspring) পাওয়া যায়, ততই কাজের সুবিধা হয়। মটরগাছ এই শর্ত পূরণ করে। (iii) ফুলগুলি উভলিঙ্গ এবং জনন অঙ্গগুলি দলমণ্ডল দ্বারা সম্পূর্ণ ঢাকা থাকার ফলে, তারা স্বপরাগী (Self-pollinated)। অর্থাৎ, প্রয়োজনবোধে তাদের স্ব-পরাগযোগ ঘটানো মোটেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। (iv) জনন অঙ্গগুলি তুলনামূলকভাবে বড় হওয়ার জন্য মুকুল থেকে অপরিণত পুংকেশরগুলিকে অপসারিত করা মেণ্ডেলের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল এবং অন্য পুষ্প থেকে পরিণত পরাগ এনে ইতর পরাগযোগ ঘটানোও সহজ ছিল। (v) মটরগাছে অনেক সুনির্দিষ্ট প্রকারভেদ (Clear-cut varieties) আছে (যথা—দীর্ঘ ও খর্ব উদ্ভিদ, হলুদ ও সবুজ বীজত্বক, সুগোল ও কুঞ্চিত বীজ, লাল ও সাদা ফুল ইত্যাদি)। (vi) সংকর উদ্ভিদগুলি উর্বর (fertile) হয়।

7.9. প্রাণীতে মনোহাইব্রিড ক্রস (**Monohybrid cross in an Animal**)

মেণ্ডেলের বংশগতির সূত্রগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন দেশে বহু সংখ্যক গবেষক সংকরায়ণ সংক্রান্ত অসংখ্য পরীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করেন যে, মেণ্ডেলের সূত্রগুলি উদ্ভিদে এবং প্রাণী, এই দু রকম জীবের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। প্রাণীদের ক্ষেত্রে মেণ্ডেলের প্রথম সূত্রের যুক্তিসিদ্ধতা নিম্নলিখিত পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়।

7.9A. গিনিপিগের দেহবর্ণ (Fur colour of Guineapig)

গিনিপিগের ক্ষেত্রে কালো লোম ও সাদা লোম যথাক্রমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। একটি হোমোজাইগাস কালো লোমবিশিষ্ট (**BB**) গিনিপিগের ও একটি হোমোজাইগাস সাদা লোমবিশিষ্ট (ww) গিনিপিগের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটলে F_1 প্রজন্মের সব কয়টি গিনিপিগই কালো লোমবিশিষ্ট হয় (চিত্র 7.5)। F_1 প্রজন্মের এই কালো লোমবিশিষ্ট গিনিপিগগুলি সবই সংকর (**Bw**)।

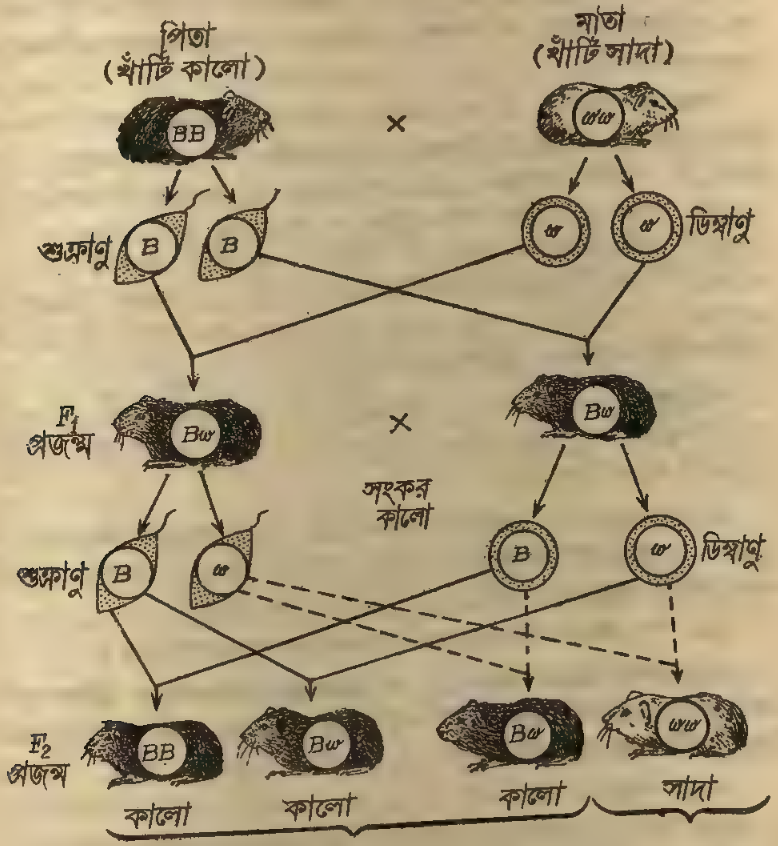

চিত্র 7.5 : গিনিপিগে এক-সংকর ক্রস ও তার ফলাফল।

F_1 প্রজন্মের উক্ত সংকর গিনিপিগগুলির মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে F_2 প্রজন্মে 3/4 ভাগ কালো লোমবিশিষ্ট ও 1/4 ভাগ সাদা লোমবিশিষ্ট (অর্থাৎ 3 : 1 অনুপাতে) গিনিপিগের জন্ম হয়।

আবার, F_2 প্রজন্মের সাদা গিনিপিগগুলি কেবলমাত্র সাদা গিনিপিগেরই জন্ম দেয়। অপরপক্ষে, কালো গিনিপিগগুলির মধ্যে কতকগুলি থেকে (1/3 ভাগ)

কেবলমাত্র কালো গিনিপিগের এবং কতকগুলি থেকে (2/3 ভাগ) সাদা ও কালো দু রকম গিনিপিগেরই জন্ম হয়।

উক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায়, মেণ্ডেল মটরগাছের ক্ষেত্রে সংকরায়ণ পরীক্ষায় যে ধরনের ফলাফল পেয়েছিলেন, গিনিপিগের ক্ষেত্রেও সেই একই রকমের ফলাফল পাওয়া যায়। অতএব, মেণ্ডেলের বংশগতির সূত্র গিনিপিগের (অর্থাৎ প্রাণীদের) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

7.10. ডাই-হাইব্রিড ক্রস বা দ্বি-সংকর ক্রস সংক্রান্ত মেণ্ডেলের পরীক্ষা (Mendel's Experiment on Dihybrid Cross)

একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত উদ্ভিদের স্থলে দু জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত মটরশুঁটি উদ্ভিদ নিয়ে মেণ্ডেল সংকরায়ণ সংক্রান্ত আরও কতকগুলি পরীক্ষা চালান। এইসব পরীক্ষার F_1 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলি দুটি লোকাসে সংকর বলে তাদের **ডাই-হাইব্রিড** বা **দ্বি-সংকর** আখ্যা দেওয়া হয়। F_1 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলিতে স্ব-পরাগযোগ ঘটিয়ে মেণ্ডেল F_2 প্রজন্মে 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতে বিভিন্ন ফিনোটাইপবিশিষ্ট উদ্ভিদের সৃষ্টি হতে দেখেন। কিভাবে উক্ত অনুপাত সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে মেণ্ডেল কি সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তা মেণ্ডেলের একটি পরীক্ষা আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

পরীক্ষা (Experiment) ঃ (i) মেণ্ডেল একটি দীর্ঘ বিটপ ও লাল পুষ্পবিশিষ্ট খাঁটি উদ্ভিদের সঙ্গে খর্ব বিটপ ও সাদা পুষ্পবিশিষ্ট একটি উদ্ভিদের ইতর পরাগযোগ ঘটান (চিত্র 7.8)।

(ii) এর ফলে F_1 প্রজন্মে যে উদ্ভিদগুলির সৃষ্টি হয় সেগুলি সবই দীর্ঘ বিটপ ও লাল পুষ্পবিশিষ্ট হয় (কেননা, 'দীর্ঘ বিটপ' ও 'লাল পুষ্প' এই দুটিই প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং 'খর্ব বিটপ' ও 'সাদা পুষ্প' প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য)।

(iii) F_1 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলিতে মেণ্ডেল স্ব-পরাগযোগ ঘটান।

পর্যবেক্ষণ (Observation) ঃ F_1 প্রজন্মের ডাই-হাইব্রিড উদ্ভিদগুলিতে স্ব-পরাগযোগের দ্বারা F_2 প্রজন্মে নিম্নলিখিত অনুপাতে চারটি ভিন্ন ফিনোটাইপ-বিশিষ্ট উদ্ভিদের আবির্ভাব হয় ঃ—

9 দীর্ঘ লাল : 3 দীর্ঘ সাদা : 3 খর্ব লাল : 1 খর্ব সাদা।
[এই 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতকে **দ্বি-সংকর ফিনোটাইপগত অনুপাত** বলা হয় ।]

সিদ্ধান্ত (Inference) ঃ উপরিউক্ত ফলাফল থেকে মেণ্ডেল বুঝতে পারেন ঃ

(i) দীর্ঘ বিটপ ও লাল ফুল, যা পিতা অথবা মাতার যে কোন একজনের মধ্যে উপস্থিত ছিল, তা একসঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় না। খর্ব বিটপ ও সাদা ফুলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যদি উক্ত প্রতি জোড়া বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হত, তাহলে F_2 প্রজন্মে 3/4 ভাগ 'দীর্ঘ লাল' ও 1/4 ভাগ 'খর্ব সাদা' উদ্ভিদ সৃষ্টি হত।

(ii) যেহেতু F_2 প্রজন্মে কিছু উদ্ভিদ, 'দীর্ঘ লাল' এবং 'খর্ব সাদা' ছাড়াও কিছু উদ্ভিদ 'দীর্ঘ সাদা' ও কিছু উদ্ভিদ 'খর্ব লাল' হয়েছে, অতএব উক্ত প্রতি জোড়া বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরগুলি স্বাধীনভাবে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তগুলি থেকে মেন্ডেল বংশগতি সম্পর্কে তাঁর দ্বিতীয় সূত্রটি উদ্ভাবন করেন। সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

(2) **ইনডিপেনডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট বা স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র (Law of Independent Assortment) ঃ কোন জীব দুটি বা তার চেয়ে বেশী লোকাসে সংকর হলে তার জননকোষ সৃষ্টির সময়ে কোন একজোড়া ফ্যাক্টর পৃথগ্‌ভবনের ব্যাপারে অপর কোন জোড়ার উপর নির্ভর করে না।**

● ক্রোমোসোম ও জীন সম্পর্কে লব্ধ ধারণার ভিত্তিতে মেণ্ডেলের ডাই-হাইব্রিড ক্রস সংক্রান্ত পরীক্ষার সংক্ষিপ্তসার ঃ

(i) মেন্ডেল P_1 প্রজন্মে খাঁটি দীর্ঘ বিটপ ও লাল পুষ্পবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদ ও খাঁটি খর্ব বিটপ ও সাদা পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে ইতর পরাগযোগ ঘটান।

(ii) যেহেতু P_1 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলি ছিল খাঁটি বা বিশুদ্ধ, অতএব তাদের জিনোটাইপ ছিল **TTRR** (দীর্ঘ লাল) [**'T'** ও **'R'** যথাক্রমে দীর্ঘ ও লাল ফিনোটাইপের জন্য নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরকে সূচিত করছে] এবং **ttrr** (খর্ব সাদা) [এক্ষেত্রে **'t'** ও **'r'** যথাক্রমে খর্ব ও সাদা ফিনোটাইপের জন্য নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরকে সূচিত করছে]।

(iii) **'T'** এবং **'R'**, তদ্রূপ **'t'** ও **'r'**-এর অবস্থান ভিন্ন-ভিন্ন ক্রোমোসোমে।

(iv) P_1 প্রজন্মের দীর্ঘ বিটপ ও লাল পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদগুলির গ্যামেটে ছিল **'TR'** জীন এবং খর্ব বিটপ ও সাদা পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদগুলির গ্যামেটে ছিল **'tr'** জীন।

(v) উক্ত দু রকম গ্যামেটের মিলনে উৎপন্ন F_1 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলির জিনোটাইপ ছিল **TtRr** এবং সমস্ত উদ্ভিদই ছিল দীর্ঘ বিটপ ও লাল পুষ্পবিশিষ্ট। এদের জিনোটাইপ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এরা ছিল ডাই-হাইব্রিড বা দ্বি-সংকর।

(vi) এইসব দ্বি-সংকর উদ্ভিদের মধ্যে চার রকম পুং-জননকোষ (**TR, tr, Tr, tR**) এবং চার রকম স্ত্রী-জননকোষ (**TR, tr, Tr, tR**) সৃষ্টি হয়েছিল (চিত্র 7.6)।

(vii) F_1 প্রজন্মের দ্বি-সংকর উদ্ভিদগুলি থেকে উৎপন্ন গ্যামেট বা জননকোষগুলি নানাভাবে মিলিত হয়ে চার রকম ফিনোটাইপবিশিষ্ট (দীর্ঘ লাল, দীর্ঘ সাদা, খর্ব লাল, খর্ব সাদা) উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদগুলির ফিনোটাইপগত অনুপাত ছিল 9 (দীর্ঘ লাল) : 3 (দীর্ঘ সাদা) : 3 (খর্ব লাল) : 1 (খর্ব সাদা)।

F_2 প্রজন্মের উক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে মেণ্ডেল সিম্ধান্ত করেন যে, দ্বি-সংকর জীবে গ্যামেট সৃষ্টির সময় একজোড়া ফ্যাক্টর তাদের পৃথগ্‌ভবনের ব্যাপারে অপর জোড়ার উপর নির্ভরশীল থাকে না। প্রতি জোড়া ফ্যাক্টর তাদের পৃথগ্‌ভবনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এইরূপ স্বাধীনভাবে তাদের পৃথগ্‌ভবন ঘটার ফলেই 9 : 3 : 3 : 1 ফিনোটাইপগত অনুপাত পাওয়া যায়।

● মটরশুঁটি উদ্ভিদে ডাই-হাইব্রিড ক্রসের দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ

পরীক্ষা (Experiment) ঃ (i) মেণ্ডেল একটি হলুদ ও গোল (বা মসৃণ) বীজ-বিশিষ্ট খাঁটি উদ্ভিদের সঙ্গে সবুজ ও কুঞ্চিত বীজবিশিষ্ট খাঁটি উদ্ভিদের ইতর পরাগযোগ ঘটান (চিত্র 7.8)।

(ii) এর ফলে F_1 প্রজন্মে যে উদ্ভিদগুলির সৃষ্টি হয়, সেগুলি সবই হলুদ ও গোল বীজবিশিষ্ট হয় (কেননা, বীজের 'হলুদ বর্ণ' এবং 'গোল আকার' এই দুটিই প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং 'সবুজ বর্ণ' ও 'কুঞ্চিত আকার' প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য)।

(iii) F_1 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলিতে মেণ্ডেল স্ব-পরাগযোগ ঘটান।

পর্যবেক্ষণ (Observation) ঃ F_1 প্রজন্মের ডাই-হাইব্রিড উদ্ভিদগুলিতে স্ব-পরাগযোগের দ্বারা F_2 প্রজন্মে নিম্নলিখিত অনুপাতে চারটি ভিন্ন ফিনোটাইপ-বিশিষ্ট উদ্ভিদের আবির্ভাব হয় ঃ

9 হলুদ গোল : 3 হলুদ কুঞ্চিত : 3 সবুজ গোল : 1 সবুজ কুঞ্চিত।

সিদ্ধান্ত (Inference) ঃ উপরিউক্ত ফলাফল থেকে মেণ্ডেল বুঝতে পারেন ঃ

(i) হলুদ বর্ণের ও গোল আকারের জন্য প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টর, যা পিতা অথবা মাতা উদ্ভিদের যে কোন একজনের মধ্যে উপস্থিত ছিল, তা একসঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় না। সবুজ বর্ণ ও কুঞ্চিত আকারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যদি উক্ত প্রতি জোড়া বৈশিষ্ট্যের ফ্যাক্টর একসঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হত, তাহলে F_2 প্রজন্মে কেবলমাত্র 3/4 ভাগ 'হলুদ গোল' ও 1/4 ভাগ 'সবুজ কুঞ্চিত বীজ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ সৃষ্টি হত।

(ii) যেহেতু F_2 প্রজন্মে চার শ্রেণীর উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়েছে, অতএব বীজের বর্ণ ও আকার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতি জোড়া ফ্যাক্টর স্বাধীনভাবে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে।

এই সিম্ধান্তগুলি থেকে মেণ্ডেল বংশগতি সম্পর্কে তাঁর দ্বিতীয় সূত্রটি অর্থাৎ স্বাধীন বিন্যাসের সূত্রটি (পূর্বেই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে) উদ্ভাবন করেন।

● ক্রোমোসোম ও জীন সম্পর্কে লব্ধ ধারণার ভিত্তিতে এই পরীক্ষার সংক্ষিপ্তসার ঃ

(i) মেণ্ডেল P_1 প্রজন্মে খাঁটি হলুদ গোল বীজবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদ ও খাঁটি সবুজ কুঞ্চিত বীজবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের মধ্যে ইতর পরাগযোগ ঘটান।

(ii) যেহেতু P_1 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলি ছিল খাঁটি, অতএব তাদের জিনোটাইপ ছিল YYRR (হলুদ গোল) ['Y' ও 'R' যথাক্রমে হলুদ ও গোল ফিনোটাইপের জন্য নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরকে সূচিত করছে] এবং yyrr (সবুজ কুঞ্চিত) [এক্ষেত্রে

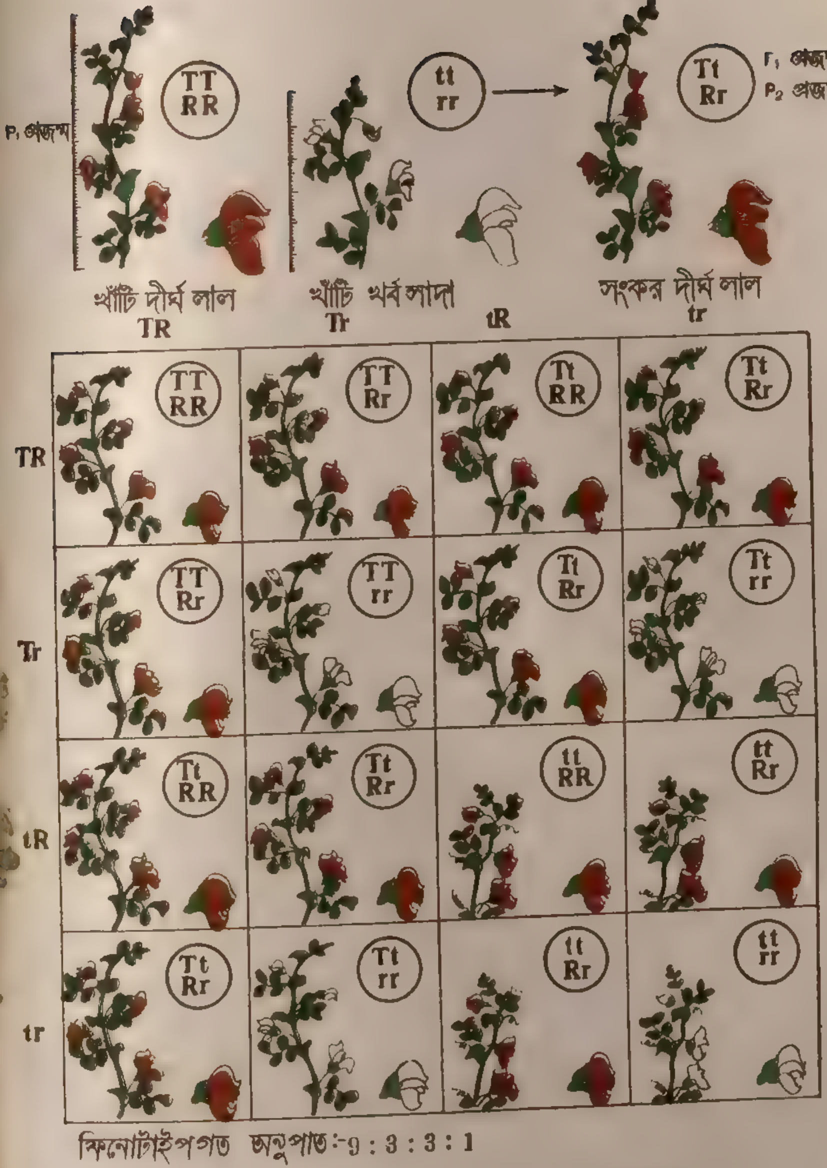

চিত্র 7.6 : মটরশুঁটিতে দ্বি-সংকর ক্রস ও তার ফলাফল।

'y' ও 'r' যথাক্রমে সবুজ ও কুঞ্চিত ফিনোটাইপের জন্য নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরকে সূচিত করছে]।

মটর শুঁটিতে বীজপত্র ও বীজের আকৃতি নিয়ে মেণ্ডেলের দ্বি-সংকর ক্রস ও তার ফলাফল

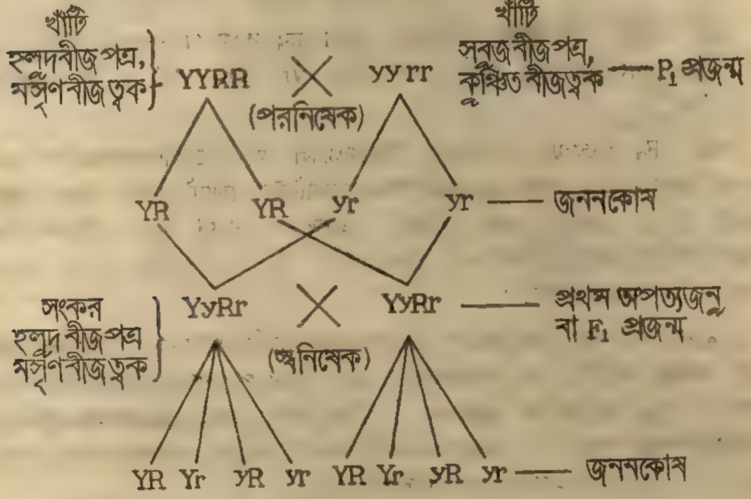

জননকোষ →

F₂ জন্ম বা দ্বিতীয় অপত্য জন্ম

♂/♀	YR	Yr	yR	yr
YR	YYRR	YYRr	YyRR	YyRr
Yr	YYRr	YYrr	YyRr	Yyrr
yR	YyRR	YyRr	yyRR	yyRr
yr	YyRr	Yyrr	yyRr	yyrr

চেকার বোর্ড

F_2 - জন্মের ফিনোটাইপ :

হলুদ বীজপত্র, মসৃণ বীজত্বক = 9
হলুদ বীজপত্র, কুঞ্চিত বীজত্বক = 3
সবুজ বীজপত্র, মসৃণ বীজত্বক = 3
সবুজ বীজপত্র, কুঞ্চিত বীজত্বক = 1

সুতরাং দ্বি-সংকর ক্রস-এর F_2 জন্মের ফিনোটাইপের অনুপাত = 9 : 3 : 3 : 1

চিত্র : 7.8

(iii) 'Y' এবং 'R', তদ্রূপ 'y' ও 'r'-এর অবস্থান ভিন্ন-ভিন্ন ক্রোমোসোমে।

(iv) P_1 প্রজন্মের হলুদ গোল বীজবিশিষ্ট উদ্ভিদগুলির গ্যামেটে ছিল 'YR' জীন এবং সবুজ কুঞ্চিত বীজবিশিষ্ট উদ্ভিদগুলির গ্যামেটে ছিল 'yr' জীন।

(v) উক্ত দুই রকম গ্যামেটের মিলনে উৎপন্ন F_1 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলির জিনোটাইপ ছিল YyRr এবং সমস্ত উদ্ভিদই ছিল হলুদ গোল বীজবিশিষ্ট।

(vi) এইসব দ্বি-সংকর উদ্ভিদের মধ্যে চার রকম পুং-গ্যামেট (YR, yr, Yr, yR) এবং চার রকম স্ত্রী-গ্যামেট (YR, yr, Yr, yR) সৃষ্টি হয়েছিল [চিত্র 7.8]।

(vii) F_1 প্রজন্মের দ্বি-সংকর উদ্ভিদগুলি থেকে উৎপন্ন গ্যামেট বা জনন-কোষগুলি নানাভাবে মিলিত হয়ে চার রকম ফিনোটাইপবিশিষ্ট (হলুদ গোল, হলুদ কুঞ্চিত, সবুজ গোল, সবুজ কুঞ্চিত) উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদগুলির ফিনোটাইপগত অনুপাত ছিল 9 (হলুদ গোল) : 3 (হলুদ কুঞ্চিত) : 3 (সবুজ গোল) : 1 (সবুজ কুঞ্চিত)।

F_2 প্রজন্মের উক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে মেন্ডেল সিদ্ধান্ত করেন যে, দ্বি-সংকর জীবে গ্যামেট সৃষ্টির সময় একজোড়া ফ্যাক্টর তাদের পৃথগ্‌ভবনের ব্যাপারে অপর জোড়ার উপর নির্ভরশীল থাকে না। প্রতি জোড়া ফ্যাক্টর তাদের পৃথগ্‌ভবনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এইরূপ স্বাধীনভাবে তাদের পৃথগ্‌ভবন ঘটার ফলেই 9 : 3 : 3 : 1 ফিনোটাইপগত অনুপাত পাওয়া যায়।

প্রকট লক্ষণ ও প্রচ্ছন্ন লক্ষণের পার্থক্য :

প্রকট লক্ষণ	প্রচ্ছন্ন লক্ষণ
1. দুটি বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে যে বৈশিষ্ট্যটির প্রকাশ ঘটে, তাকে প্রকট লক্ষণ বলে।	1. দুটি বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে যে বৈশিষ্ট্যটির প্রকাশ ঘটে না, তাকে প্রচ্ছন্ন লক্ষণ বলে।
2. প্রকট লক্ষণ হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস যে কোন অবস্থায় প্রকাশিত হতে পারে।	2. প্রচ্ছন্ন লক্ষণ শুধুমাত্র হোমোজাইগাস অবস্থায় প্রকাশিত হতে পারে।
উদাহরণ ঃ একটি বিশুদ্ধ দীর্ঘাকার (TT) ও খর্বাকার (tt) মটর গাছের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে F_1 জনুতে সংকর দীর্ঘাকার (Tt) মটর গাছের সৃষ্টি হয়। কারণ T হচ্ছে প্রকট লক্ষণ।	উদাহরণ ঃ একটি বিশুদ্ধ দীর্ঘাকার (TT) ও খর্বাকার (tt) মটর গাছের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে F_1 জনুতে সংকর উদ্ভিদগুলি হয় দীর্ঘাকার কারণ এক্ষেত্রে t হচ্ছে প্রচ্ছন্ন লক্ষণ।

ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপের পার্থক্য ঃ

ফিনোটাইপ (Phenotype)	জিনোটাইপ (Genotype)
1. কোন জীবের বাহ্যিক লক্ষণকে তার ফিনোটাইপ বলে।	1. কোন জীবের জীনঘটিত বা জেনেটিক সংযুতিকে তার জিনোটাইপ বলে।
2. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফিনোটাইপের দৃষ্টিগ্রাহ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উদাহরণ ঃ দীর্ঘ বিটপবিশিষ্ট মটর গাছ, লাল পুষ্পযুক্ত মটর গাছ ইত্যাদি।	2. কখনোই জীনোটাইপের দৃষ্টিগ্রাহ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। একটি ফিনোটাইপের দুটি জিনোটাইপ থাকতে পারে। যেমন—মটর গাছের দীর্ঘ বৈশিষ্ট্যের জিনোটাইপ **TT** অথবা **Tt** ; মটর গাছের লাল পুষ্পের ক্ষেত্রে **RR**, **Rw** ইত্যাদি হতে পারে।

7.11. গিনিপিগে ডাই-হাইব্রিড ক্রস (Dihybrid cross in Guineapig)

গিনিপিগের লোমের রঙ ও প্রকৃতি, এই দুই ব্যাপারেই প্রকারভেদ দেখা যায়। লোমগুলি সাদা অথবা কালো এবং মসৃণ (smooth) অথবা অমসৃণ (rough)

চিত্র 7.9 ঃ গিনিপিগের দ্বি-সংকর ক্রস ও তার ফলাফল।

হতে পারে। কালো (B) ও সাদা (w) যথাক্রমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য ; তেমনই অসমৃণ (R) ও মসৃণ (s) যথাক্রমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য।

একটি হোমোজাইগাস কালো ও অমসৃণ লোমবিশিষ্ট (BB RR) গিনিপিগ এবং একটি হোমোজাইগাস সাদা ও মসৃণ লোমবিশিষ্ট (ww ss) গিনিপিগের মধ্যে

সংকরায়ণ ঘটলে F_1 প্রজন্মের সবকয়টি গিনিপিগই কালো ও অমসৃণ লোমবিশিষ্ট হয় (চিত্র 7.9)। F_1 প্রজন্মের এই গিনিপিগগুলি সবই সংকর (Bw Rs)—এক্ষেত্রে দ্বি-সংকর।

F_1 প্রজন্মের এই দ্বি-সংকর গিনিপিগগুলির প্রত্যেকটিতে গ্যামেট সৃষ্টির সময় মায়োটিক বিভাজন হওয়ার ফলে চার রকমের গ্যামেট সৃষ্টি হয়, যথা—**BR**, ws, **Bs** ও **wR** (চিত্র 7.10—নিচের অংশ)।

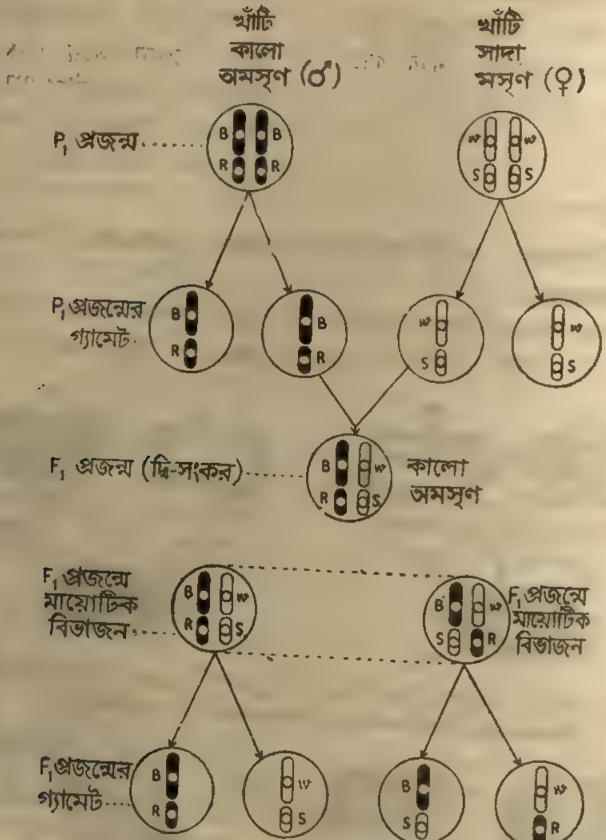

চিত্র 7. 10 : কালো অমসৃণ ও সাদা মসৃণ গিনিপিগের মধ্যে সংকরায়ণ এবং F_1-এ প্রজন্মে গ্যামেট সৃষ্টি।

F_1 প্রজন্মের এই গিনিপিগগুলির মধ্যে সংকরায়ণের সময় পুং ও স্ত্রী গ্যামেটগুলি নানাভাবে মিলিত হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, **BR** জিনোটাইপবিশিষ্ট একটি পুং-গ্যামেট চার রকম স্ত্রী-গ্যামেটের (**BR**, ws, **Bs**, **wR**) যে কোন একটির সঙ্গে মিলিত হতে পারে। আলোচ্য ক্ষেত্রে মোট চার রকম পুং-গ্যামেট সৃষ্টি হয় (**BR**, ws,

Bs, wR) এবং এদের মধ্যে যে কোন এক রকমের পুং-গ্যামেট চার রকম স্ত্রী-গ্যামেটের যে কোন এক রকমের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। ফলে, মোট 16টি ভিন্ন ভিন্ন রকমের কম্বিনেশন বা সমবায় সম্ভব হয়। 7.11 নং চিত্রে যে রকম দেখানো হয়েছে সেইরকম একটি ছক কেটে তার উপরের দিকে চার রকমের স্ত্রী-গ্যামেট ও বাম দিকে চার রকমের পুং-গ্যামেটকে বসিয়ে সম্ভাব্য কম্বিনেশনগুলিকে সহজেই নিরূপণ করা যায়। এইরকম ছককে **চেকারবোর্ড** (Checkerboard) বলে।

স্ত্রী গ্যামেট

পুং গ্যামেট	BR	ws	Bs	wR
BR	BBRR কালো অমসৃণ	Bw Rs কালো অমসৃণ	BB Rs কালো অমসৃণ	Bw RR কালো অমসৃণ
ws	Bw Rs কালো অমসৃণ	ww ss সাদা মসৃণ	Bw ss কালো মসৃণ	ww Rs সাদা অমসৃণ
Bs	BB Rs কালো অমসৃণ	Bw ss কালো মসৃণ	BB ss কালো মসৃণ	Bw Rs কালো অমসৃণ
wR	Bw RR কালো অমসৃণ	ww Rs সাদা অমসৃণ	Bw Rs কালো অমসৃণ	ww RR সাদা অমসৃণ

চিত্র 7.11 : কালো অমসৃণ এবং সাদা মসৃণ গিনিপিগের ক্রস থেকে 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাত লাভের চিত্র-সংকেত।

7.11 নং চিত্রের ছকটিকে সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তাতে 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতে চারটি ফিনোটাইপের (যথাক্রমে কালো অমসৃণ, কালো মসৃণ, সাদা অমসৃণ, সাদা মসৃণ) অস্তিত্ব রয়েছে।

উক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায়, মেণ্ডেল মটরগাছের ক্ষেত্রে দ্বি-সংকরায়ণ পরীক্ষায় যে ধরনের ফলাফল পেয়েছিলেন, গিনিপিগের ক্ষেত্রেও সেই একই রকমের ফলাফল

পাওয়া যায়। অতএব, দ্বি-সংকরায়ণ পরীক্ষা থেকে উদ্ভাবিত মেন্ডেলের সূত্র গিনিপিগের (অর্থাৎ প্রাণীদের) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

7.12. 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাত নির্ণয়ের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct method of determining 9 : 3 : 3 : 1 ratio)

উপরিউক্ত 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতের সবকয়টি কালো এবং সবকয়টি সাদার সংখ্যা যোগ করলে দেখা যাবে তাদের অনুপাত হচ্ছে 12 কালো : 4 সাদা ; অর্থাৎ, 3 কালো : 1 সাদার সমতুল। সবকয়টি অমসৃণ এবং সবকয়টি মসৃণের সংখ্যা যোগ করলে দেখা যাবে যে, তাদের অনুপাতও 3 (অমসৃণ) : 1 (মসৃণ), অর্থাৎ 'এক-সংকর ক্রসের' সমতুল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দ্বি-সংকর ক্রসের দ্বারা লব্ধ গিনিপিগগুলিতে প্রতিটি বৈশিষ্ট্য পৃথকভাবে (লোমের রঙ বা প্রকৃতি) বিবেচনা করলে তাদের অনুপাত দাঁড়ায় 3 : 1। কিন্তু দুটি বৈশিষ্ট্যকে একসঙ্গে বিবেচনা করে গিনিপিগগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করলে তাদের অনুপাত দাঁড়ায় 9 : 3 : 3 : 1।

F_2 প্রজন্মে প্রতিটি লোকাস 3 : 1 অনুপাত প্রদান করে। এই তথ্যটির উপর ভিত্তি করে দুটি লোকাসের অনুপাতের সংযুক্তির মাধ্যমে 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতটি আমরা প্রত্যক্ষভাবে পেতে পারি। কেননা, F_2 প্রজন্মে 3 কালো : 1 সাদা অনুপাতটির দ্বারা যা প্রকাশিত হয়, 3/4 কালো এবং 1/4 সাদার দ্বারাও তাই বোঝায়। অতএব, F_2 প্রজন্মের প্রতি 16টি গিনিপিগের মধ্যে 3/4 অংশ বা গড়ে 12টি গিনিপিগ

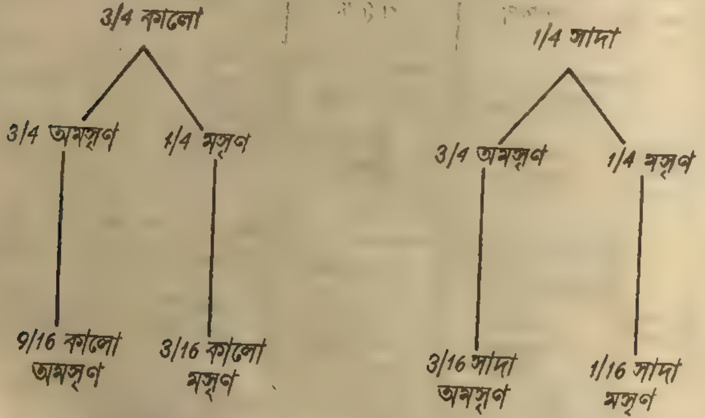

চিত্র 7.12 : 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাত নির্ণয়ের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি।

কালো রঙের হবে এবং 1/4 অংশ বা গড়ে 4টি গিনিপিগ সাদা রঙের হবে (চিত্র 7.12) আবার, 12টি কালো গিনিপিগের মধ্যে 3/4 অংশ হবে অমসৃণ লোমবিশিষ্ট এবং 1/4 অংশ হবে মসৃণ লোমবিশিষ্ট। ফলে 9 কালো অমসৃণ : 3 কালো মসৃণ অনুপাতটি পাওয়া যাবে। ঐভাবেই, 4টি সাদা গিনিপিগের মধ্যে 3/4 অংশ হবে অমসৃণ লোমবিশিষ্ট এবং 1/4 অংশ হবে মসৃণ লোমবিশিষ্ট। ফলে, 3 সাদা অমসৃণ : 1 সাদা মসৃণ অনুপাতটি পাওয়া যাবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতটি চেকারবোর্ডের অথবা 7.12 নং চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ের যে কোন একটির দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব। প্রতি লোকাসের 3 : 1 অনুপাতের সংযোগে 7.10 নং চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ে 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাত লাভের পদ্ধতিটিকে **প্রত্যক্ষ পদ্ধতি** (Direct method) এবং চেকারবোর্ড পদ্ধতিটিকে **অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতি** (Indirect method) বলা হয়।

7.13. মেণ্ডেলের সূত্রগুলির যুক্তিসিদ্ধতা (Validity of Mendel's laws)

মেণ্ডেলের প্রথম সূত্রটি (সেগ্রিগেশান বা পৃথগ্‌ভবনের সূত্র) সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত (Correct)। এখনও পর্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই ফ্যাক্টর বা অ্যালিলের মিশ্রণের কথা শোনা যায়নি।

মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটি (ইনডিপেনডেণ্ট অ্যাসর্টমেণ্ট বা স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র) সর্বাংশে নির্ভুল নয়। একজোড়া ফ্যাক্টর বা জীন সব সময়েই অন্য জোড়া থেকে স্বাধীনভাবে পৃথক হতে পারে না, যেহেতু অনেক জীন-ই (একই ক্রোমোসোমের জীনগুলি) পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে—এদের **লিঙ্কড জীন** (linked genes) বলা হয়। একজোড়া লিঙ্কড জীন অপর জোড়া লিঙ্কড জীন থেকে স্বাধীনভাবে পৃথক হতে পারে না। তাই লিঙ্কড জীনের ক্ষেত্রে মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটি প্রযোজ্য নয়। তবে, ভিন্ন ক্রোমোসোমে অবস্থিত জীনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সূত্রটি কার্যকর হয়।

7.14. বংশগতি সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা ও সেগুলির সমাধান (Some problems on heredity and their solution)

7.14A. মানুষের ক্ষেত্রে বাদামী বা কালো চক্ষু (B) নীল চক্ষুর (b) উপর প্রকট। কালো চক্ষুবিশিষ্ট মাতা ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট পিতার দুটি সন্তানের মধ্যে

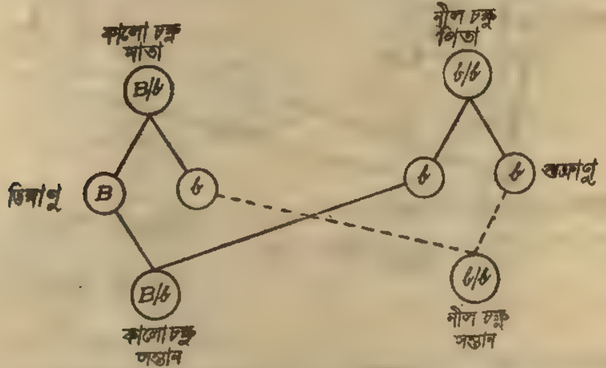

একটি কালো চক্ষুবিশিষ্ট ও একটি নীল চক্ষুবিশিষ্ট। পরিবারের সকলের জিনোটাইপ নির্ধারণ কর।

সমাধান ঃ (i) নীল চক্ষু যেহেতু একটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য, অতএব, প্রত্যেক নীল চক্ষুবিশিষ্ট মানুষই নির্দিষ্ট লোকাসে হোমোজাইগাস এবং তাদের জিনোটাইপ b/b। তদনুযায়ী **পিতা ও একটি সন্তানের (নীল চক্ষুবিশিষ্ট)** এই **b/b** জিনোটাইপ।

(ii) নীল চক্ষুবিশিষ্ট সন্তানটি একটি '**b**' জীন পিতার কাছ থেকে এবং অপর '**b**' জীনটি অবশ্যই মাতার কাছ থেকে পেয়েছে। অতএব, কালো চক্ষুবিশিষ্ট **মাতা** অনিবার্যভাবেই **সংকর** এবং তাঁর জিনোটাইপ **B/b**।

(iii) আবার, পিতার জিনোটাইপ **b/b** হওয়ার জন্য কালো চক্ষুবিশিষ্ট সন্তানে অবশ্যই একটি '**b**' জীন থাকবে। ফলে, **কালো চক্ষুবিশিষ্ট** সন্তানটিও **সংকর** এবং তার জিনোটাইপ **B/b**।

7.14B. বাদামী চক্ষুবিশিষ্ট এক ভদ্রলোক যদি নীল চক্ষুবিশিষ্ট একজন মহিলাকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের বাদামী চক্ষুবিশিষ্ট ছয়টি সন্তান হয়, তবে ঐ পরিবারের সকলের জিনোটাইপ কি ?

সমাধান ঃ (i) মানুষের ক্ষেত্রে নীল চক্ষু একটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য হওয়ার জন্য প্রত্যেক নীল চক্ষু মানুষই নির্দিষ্ট লোকাসে হোমোজাইগাস। নীল চক্ষুর জন্য নির্দিষ্ট জীনকে '**b**' দ্বারা চিহ্নিত করলে আলোচ্য প্রশ্নে **মাতার** জিনোটাইপ হবে **b/b**।

(ii) মানুষের বাদামী চক্ষু একটি প্রকট বৈশিষ্ট্য। তাই যে কোন বাদামী

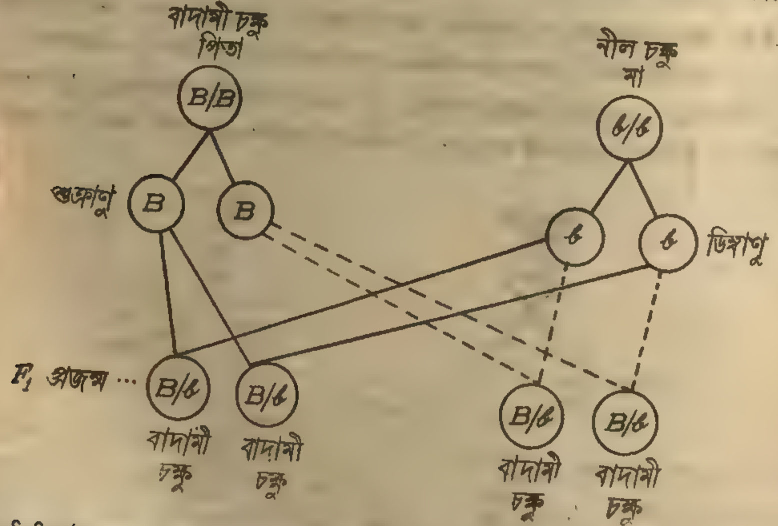

চক্ষুবিশিষ্ট মানুষ খাঁটি (হোমোজাইগাস) অথবা সংকর হতে পারে। বাদামী চক্ষুর জন্য নির্দিষ্ট জীনকে '**B**' দ্বারা চিহ্নিত করলে আলোচ্য প্রশ্নে পিতা ও সন্তানদের জিনোটাইপ **B/B** অথবা **B/b** হওয়া সম্ভব। কিন্তু মাতার জিনোটাইপ যেহেতু **b/b**,

অতএব **বাদামী চক্ষু সন্তানদের** জিনোটাইপ কখনই **B/B** হওয়া সম্ভব নয়—তাদের জিনোটাইপ **B/b**।

(iii) পরিবারে অপেক্ষাকৃত বেশী (ছয়টি) সন্তান সংখ্যার দ্বারা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, সন্তানদের ফিনোটাইপ বিপরীত প্রকার (অর্থাৎ নীল চক্ষু) হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে, পিতা কালো চক্ষুর ব্যাপারে হোমোজাইগাস বা খাঁটি এবং তাঁর জিনোটাইপ **B/B**। পিতা সংকর (**B/b**) হলে, কোনও না কোন সন্তান নীল চক্ষুবিশিষ্ট (**b/b**) হত।

7.14C. ডায়াবিটিস একটি বংশগত রোগ। ডায়াবিটিস রোগের জীনটি (**d**) প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির। পিতা অথবা মাতার মধ্যে একজন ডায়াবিটিস রোগাক্রান্ত এবং অন্যজন খাঁটি স্বাভাবিক (**D/D**) প্রকৃতির। সন্তানদের ডায়াবিটিসের সম্ভাবনা কিরূপ?

(i) ডায়াবিটিস রোগের জীনটি প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির হওয়ার জন্য ডায়াবিটিক পিতার জিনোটাইপ অবশ্যই **d/d**।

(ii) প্রশ্নানুযায়ী যেহেতু মাতার জিনোটাইপ **D/D**, অতএব প্রত্যেক সন্তানে একটি করে '**D**' জীন থাকবে। এই জীনটি প্রকট হওয়ার ফলে কোন সন্তানই ডায়াবিটিস রোগাক্রান্ত হবে না।

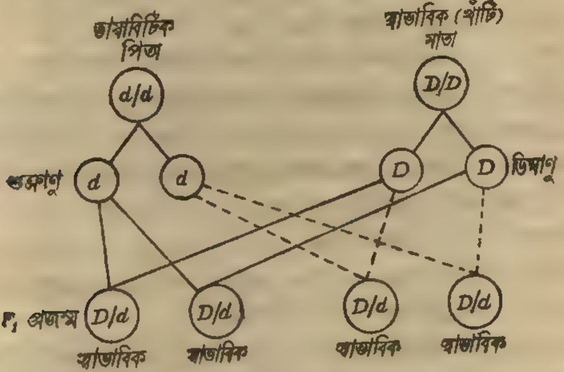

7.14D. মটরশুঁটিতে হলুদ ও সবুজ বীজ যথাক্রমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। হলুদ বীজবিশিষ্ট দুটি উদ্ভিদের মধ্যে ইতর পরাগযোগের ফলে নিম্নলিখিত সংখ্যক অপত্য উদ্ভিদ উৎপন্ন হল :

হলুদ বীজবিশিষ্ট—118

সবুজ বীজবিশিষ্ট— 39

হলুদ ও সবুজ বৈশিষ্ট্যের জন্য যথাক্রমে **Y** ও **g** অক্ষর দুটি ব্যবহার করে পিতৃ-উদ্ভিদ ও মাতৃ-উদ্ভিদের সম্ভাব্য জিনোটাইপ নির্ধারণ কর।

সমাধান ঃ 118 ও 39-এর অনুপাত 3 : 1 অনুপাতের খুবই কাছাকাছি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইতর পরাগযোগের ফলে উৎপন্ন অপত্য উদ্ভিদগুলির ফিনোটাইপগত অনুপাত (হলুদ : সবুজ) এক-সংকর ক্রস থেকে প্রাপ্ত ফিনোটাইপগত অনুপাতের সমতুল।

অতএব, আলোচ্য ক্ষেত্রে পিতৃ ও মাতৃ-উদ্ভিদ দুটিই ছিল এক-সংকর এবং তাদের প্রত্যেকের জিনোটাইপ ছিল Y/g।

7.14E. উপরিউক্ত প্রশ্নের (7.14D) হলুদ বীজ উৎপাদক অপত্য উদ্ভিদগুলির মধ্যে কতগুলি থেকে স্ব-পরাগযোগের দ্বারা সবুজ বীজ উৎপাদক উদ্ভিদ জন্মানো সম্ভব?

সমাধান ঃ (i) মেন্ডেলের এক-সংকর ক্রসের ফলাফল অনুযায়ী আমরা জানি, উপরিউক্ত প্রশ্নের হলুদ বীজবিশিষ্ট অপত্য উদ্ভিদগুলির মধ্যে দু রকম জিনোটাইপবিশিষ্ট উদ্ভিদ আছে, যথা—1/3 ভাগ Y/Y এবং 2/3 ভাগ Y/g।

(ii) প্রশ্নানুযায়ী স্ব-পরাগযোগের মাধ্যমে প্রথমোক্ত শ্রেণীর (Y/Y) উদ্ভিদগুলি থেকে সবুজ বীজ উৎপাদক উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব নয়। কেবলমাত্র শেষোক্ত শ্রেণীর (Y/g) উদ্ভিদগুলি থেকেই সবুজ বীজ উৎপাদক উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব।

অতএব, 118টি হলুদ বীজবিশিষ্ট উদ্ভিদের 2/3 ভাগ থেকে অর্থাৎ প্রায় 78টি উদ্ভিদ থেকে সবুজ বীজ উৎপাদক উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব।

7.14F. মানুষের ক্ষেত্রে সোজা কেশ (S) ও কুঞ্চিত কেশ (s) যথাক্রমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য ; আবার বাদামী চক্ষু (B) ও নীল চক্ষু (b) যথাক্রমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। সোজা কেশ ও বাদামী চক্ষুবিশিষ্ট এক ভদ্রলোক কুঞ্চিত কেশ ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট একজন ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করলেন। তাঁদের সন্তানদের মধ্যে কেহ কেহ সোজা কেশ ও বাদামী চক্ষুবিশিষ্ট এবং কেহ কেহ কুঞ্চিত কেশ ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট হল। পিতা ও সন্তানদের জিনোটাইপ নির্ধারণ কর এবং চেকারবোর্ডের সাহায্যে F_2 প্রজন্মের ফিনোটাইপগত অনুপাত নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ (i) কুঞ্চিত কেশ (s) ও নীল চক্ষু (b) যেহেতু দুটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য, অতএব 'কুঞ্চিত কেশ ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট' **মাতা** অবশ্যই উক্ত দুটি লোকাসে হোমোজাইগাস এবং তাঁর জিনোটাইপ 'ss bb'।

(ii) সোজা কেশ (S) ও বাদামী চক্ষু (B) যেহেতু দুটি প্রকট বৈশিষ্ট্য ; অতএব 'সোজা কেশ ও বাদামী চক্ষুবিশিষ্ট' পিতার জিনোটাইপ 'SS BB' (হোমোজাইগাস) অথবা 'Ss Bb' (হেটেরোজাইগাস)-এর যে কোন একটি হতে পারে। কিন্তু কোন কোন সন্তানের কুঞ্চিত কেশ ও নীল চক্ষু হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে যে, **পিতার** জিনোটাইপ 'Ss Bb'। কেননা, 'কুঞ্চিত কেশ ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট' সন্তানদের জিনোটাইপ অবশ্যই 'ss bb' হতে হবে। মাতার কাছ থেকে এই সন্তানেরা একটি করে 's' এবং 'b' জীন পেয়েছে। অতএব, তাদের আর একটি করে 's' এবং 'b' জীন পিতার কাছ থেকে পাওয়া। অতএব, পিতা আলোচ্য লোকাস দুটিতে সংকর।

(iii) সোজা কেশ ও বাদামী চক্ষুবিশিষ্ট সন্তানেরা যেহেতু তাদের হোমোজাইগাস মাতার কাছ থেকে 's' এবং 'b' অ্যালিল ছাড়া অন্য কোন অ্যালিল পেতে পারে না,

অতএব সোজা কেশ ও বাদামী চক্ষুবিশিষ্ট সন্তানেরা হেটেরোজাইগাস বা সংকর এবং তাদের জিনোটাইপ 'Ss Bb'।

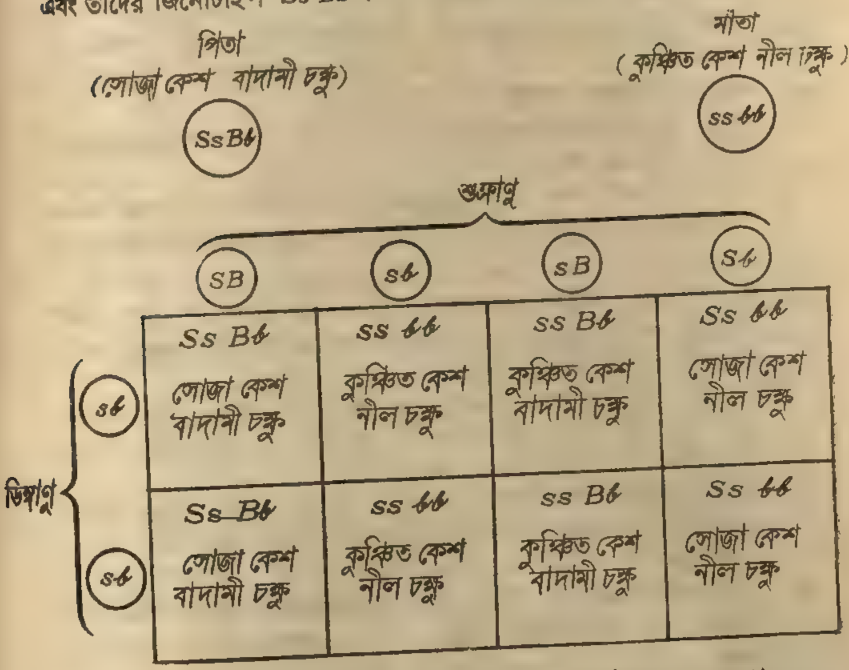

চেকারবোর্ড থেকে প্রাপ্ত F_2 প্রজন্মের ফিনোটাইপগত অনুপাত ঃ

1 (সোজা কেশ বাদামী চক্ষু) : 1 (সোজা কেশ নীল চক্ষু) : 1 (কুঞ্চিত কেশ বাদামী চক্ষু) : 1 (কুঞ্চিত কেশ নীল চক্ষু)

বিষয়-সংক্ষেপ

1. এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রবাহকে বংশগতি বা উত্তরাধিকার বলে।
2. বিজ্ঞানের যে শাখা বংশগতি সম্পর্কে আলোচনা ও তার কারণ অনুসন্ধানে নিয়োজিত, তার নাম জীনতত্ত্ব।
3. ক্রোমোসোমদেহের যে অংশে একটি নির্দিষ্ট জীন অবস্থান করে সেই অংশটিকে উক্ত জীনের লোকাস বলা হয়।
4. জীনের গঠনগত পরিবর্তনের ফলে কোন নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাবের ঘটনাকে বলা হয় মিউটেশন।
5. সমসংস্থ ক্রোমোসোমের একটি নির্দিষ্ট লোকাসে (একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জীবে) যে সব বিপরীতধর্মী জীন উপস্থিত থাকতে পারে তাদের বলা হয় অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ।

6. সমসংস্থ ক্রোমোসোম-জোড়ার কোন্ লোকাসের জীন দুটি সমধর্মী (যথা— T/T, Y/Y, r/r ইত্যাদি) হলে লোকাসটিকে হোমোজাইগাস লোকাস বা খাঁটি লোকাস বা বিশুদ্ধ লোকাস বলে।
7. সমসংস্থ ক্রোমোসোম-জোড়ার কোন্ লোকাসের জীন দুটি বিপরীতধর্মী (যথা—T/t, Y/y, R/r ইত্যাদি) হলে লোকাসটিকে হেটেরোজাইগাস লোকাস বা সংকর লোকাস বলে।
8. একটি মাত্র সংকর লোকাসকে ভিত্তি করে সংকরায়ণ পরীক্ষাকে এক-সংকর ক্রস বা মনোহাইব্রিড ক্রস বলে।
9. দুটি বা তিনটি সংকর লোকাসকে ভিত্তি করে সংকরায়ণ পরীক্ষাকে যথাক্রমে দ্বি-সংকর ক্রস বা ডাই-হাইব্রিড ক্রস এবং ত্রি-সংকর ক্রস বা ট্রাই-হাইব্রিড ক্রস বলে।
10. যে জীব কোন সমসংস্থ ক্রোমোসোম-জোড়ার একটি নির্দিষ্ট লোকাসে সমধর্মী বা একই রকমের জীন বহন করে, সেই জীবকে উক্ত লোকাসের ব্যাপারে হোমোজাইগোট বা খাঁটি জীব বলা হয়।
11. যে জীব কোন সমসংস্থ ক্রোমোসোম-জোড়ার একটি নির্দিষ্ট লোকাসে ভিন্নধর্মী জীন বহন করে, সেই জীবকে উক্ত লোকাসের ব্যাপারে হেটেরোজাইগোট বা হাইব্রিড বা সংকর জীব বলা হয়।
12. দুটি অ্যালিলোমর্ফিক জীনের মধ্যে যে জীনটি অপর জীনের ক্রিয়াকে অবদমিত করে নিজের সক্রিয়তার প্রকাশ ঘটায়, তাকে প্রবল জীন বা প্রকট জীন বলে।
13. দুটি অ্যালিলোমর্ফিক জীনের মধ্যে হেটেরোজাইগাস অবস্থায় যে জীনটি নিজের ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটাতে পারে না, তাকে অপ্রবল জীন বা প্রচ্ছন্ন জীন বলে।
14. মেণ্ডেল মটরশুটি উদ্ভিদকে নিয়ে সংকরায়ণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বংশগতি সম্পর্কে দুটি সূত্রের উদ্ভাবন করেন।
15. মেণ্ডেলের প্রথম সূত্র (সেগ্রিগেশান বা পৃথগভবনের সূত্র)ঃ সংকর জীবের মধ্যে বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলির বা তাদের ফ্যাক্টরগুলির মিশ্রণ ঘটে না। তাদের মধ্যে জননকোষ সৃষ্টির সময় বিপরীত ফ্যাক্টরগুলি পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং এক-একটি জননকোষ এক-একটি ফ্যাক্টর লাভ করে।
16. মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র (ইন্ডিপেনডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট বা স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র)ঃ কোন জীব দুটি বা তার চেয়ে বেশী লোকাসে সংকর হলে তার জননকোষ সৃষ্টির সময়ে কোন একজোড়া ফ্যাক্টর পৃথগ্ভবনের ব্যাপারে অপর কোন জোড়ার উপর নির্ভর করে না। এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন।
17. কোন জীবের বাহ্যিক লক্ষণকে তার ফিনোটাইপ বলে।
18. কোন জীবের জেনেটিক সংযুক্তিকে তার জিনোটাইপ বলে।
19. বংশগতিতে 3 : 1 অনুপাতকে 'এক-সংকর ফিনোটাইপগত অনুপাত' এবং 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতকে 'দ্বি-সংকর ফিনোটাইপগত অনুপাত' বলে।
20. পিতা ও মাতার দেহে উপস্থিত দুটি ভিন্নধর্মী জীন বা অ্যালিল সন্তান-সন্ততিতে হেটেরোজাইগাস অবস্থায় নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটালে, সেই ঘটনাকে 'অসম্পূর্ণ প্রকটতা' বলা হয়। উদাঃ স্ন্যাপড্রাগনের লাল ও সাদা

পুষ্পবিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে ইতর পরাগযোগের মাধ্যমে গোলাপী পুষ্প-বিশিষ্ট উদ্ভিদের আবির্ভাব।

21. 3 : 1 অনুপাত একটি 'গড় ফল' (Average result)—'পরম ফল' (Absolute result) নয়।

22. মেণ্ডেলের প্রথম সূত্রটি সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত, কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রটি সর্বাংশে নির্ভুল নয়। লিঙ্ক্ড জীনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সূত্রটি প্রযোজ্য নয়।

অনুশীলনী

(A) দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Long Answer type questions)

1. এক-সংকর ক্রস বা মনোহাইব্রিড ক্রস কাকে বলে ? এক-সংকর ক্রস সংক্রান্ত মেণ্ডেলের পরীক্ষা পদ্ধতির বর্ণনা দাও। [উঃ 497 ও 498 পৃষ্ঠা দেখ]
2. এক-সংকর ক্রস সংক্রান্ত পরীক্ষা থেকে মেণ্ডেল কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন বুঝিয়ে দাও। [উঃ 501 পৃষ্ঠা দেখ]
3. প্রবল গুণ এবং অপ্রবল গুণ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও। মেণ্ডেলের প্রথম সূত্রটি উল্লেখ কর। [উঃ 499 এবং 501 পৃষ্ঠা দেখ]
4. ক্রোমোসোম ও জীন সম্পর্কে লব্ধ ধারণার ভিত্তিতে মনোহাইব্রিড ক্রস সংক্রান্ত পরীক্ষার সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ কর। [উঃ 502 পৃষ্ঠা দেখ]
5. অসম্পূর্ণ প্রকটতা কাকে বলে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। বংশগতিতে 3 : 1 অনুপাতকে কি কি বলে ? 3 : 1 অনুপাত কখন সম্ভব ? [উঃ 506, 500 এবং 507 পৃষ্ঠা দেখ]
6. মেণ্ডেল কেন ভোজ্য মটর গাছকে পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করেছিলেন ? মেণ্ডেল মটর গাছের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে তাঁর বংশগতি সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলো করেছিলেন ? মেণ্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলগুলি তালিকাবদ্ধ কর। [উঃ 508, 496 এবং 508 পৃষ্ঠা দেখ]
7. প্রাণীদের ক্ষেত্রে মেণ্ডেলের প্রথম সূত্রের যুক্তিসিদ্ধতা একটি উপযুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝিয়ে দাও। [উঃ 508-510 পৃষ্ঠা দেখ]
8. দ্বি-সংকর ক্রস বা ডাইহাইব্রিড ক্রস কাকে বলে ? দ্বি-সংকর ক্রস সংক্রান্ত মেণ্ডেলের একটি পরীক্ষার বর্ণনা দাও। [উঃ 497 ও 512 পৃষ্ঠা দেখ]
9. দ্বি-সংকর ক্রস সংক্রান্ত পরীক্ষা থেকে মেণ্ডেল কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ? ঐ পরীক্ষা থেকে মেণ্ডেল যে সূত্রটি উদ্ভাবন করেছিলেন তার উল্লেখ কর। [উঃ 510-511 পৃষ্ঠা দেখ]
10. ক্রোমোসোম ও জীন সম্পর্কে লব্ধ ধারণার ভিত্তিতে মেণ্ডেলের দ্বি-সংকর ক্রস সংক্রান্ত পরীক্ষার সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ কর। [উঃ 511 পৃষ্ঠা দেখ]
11. দ্বি-সংকর ক্রস কাকে বলে ? চেকারবোর্ডের সাহায্যে গিনিপিগের দ্বি-সংকর ক্রস পরীক্ষাটি বুঝিয়ে দাও। [উঃ 497 এবং 517 পৃষ্ঠা দেখ]

(B) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer type questions)

12. বংশগতি ও সুপ্রজনন বিদ্যার সংজ্ঞা দাও। মেণ্ডেলকে সুপ্রজনন বিদ্যার জনক বলা হয় কেন ? [উঃ 495 পৃষ্ঠা দেখ]

13. অ্যালিলোমর্ফিক বৈশিষ্ট্য কাকে বলে ? মেণ্ডেল মটরশুঁটি গাছের যে অ্যালিলোমর্ফিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে তাঁর পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন সেগুলো উল্লেখ কর। [উঃ 496 পৃষ্ঠা দেখ]
14. বংশগতিতে খাঁটি জীব ও সংকর জীব কাকে বলে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। [উঃ 498 পৃষ্ঠা দেখ]
15. মটরশুঁটিতে এক-সংকর ক্রস ও তার ফলাফল শুধু ছক ও চেকারবোর্ডের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও। [উঃ 500 এবং 501 পৃষ্ঠা দেখ]
16. প্রকটতা ও প্রচ্ছন্নতার সূত্রটিকে কেন বংশগতির সূত্র হিসেবে গ্রহণ করা চলে না [উঃ 501-502 পৃষ্ঠা দেখ]
17. ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ কাকে বলে ? এক-সংকর ক্রসে ঐ অনুপাতগুলি কত ? এক-সংকর ক্রস থেকে প্রাপ্ত মেণ্ডেলের প্রথম সূত্রটি উল্লেখ কর। [উঃ 501 ও 502 পৃষ্ঠা দেখ]
18. প্রবল গুণ ও অপ্রবল গুণ বলতে কি বোঝ ? বংশগতির পরীক্ষায় মেণ্ডেল কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন অ্যালিলোমর্ফিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রবল ও কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলো অপ্রবল বা প্রচ্ছন্ন ছকের মাধ্যমে দেখাও ? [উঃ 499 ও 503 পৃষ্ঠা দেখ]
19. অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও সম্পূর্ণ প্রকটতা কাকে বলে ? দৃষ্টান্ত দাও। একটি খাঁটি কালো অ্যান্ডালুসিয়ান মুরগী ও একটি খাঁটি ছিট ছিট দাগ বিশিষ্ট সাদা মোরগের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে F_1 প্রজন্মের সংকর মুরগীগুলি নীল বর্ণের হয়। এ থেকে তুমি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে ? [উঃ 505-507 পৃষ্ঠা দেখ]
20. দ্বি-সংকর ক্রস কাকে বলে ? দ্বি-সংকর ক্রস থেকে প্রাপ্ত মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটি উল্লেখ কর। [উঃ 497 ও 511 পৃষ্ঠা দেখ]
21. মেণ্ডেলের সূত্রগুলির যুক্তিসিদ্ধতা বিচার কর। [উঃ 519 পৃষ্ঠা দেখ]
22. নিচের বংশগতি সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সমাধান কর—
    (a) মানুষের ক্ষেত্রে কালো চক্ষু (B) নীল চক্ষুর (b) উপর প্রকট। কালো চক্ষুবিশিষ্ট মাতা ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট পিতার সন্তানদের মধ্যে একটি কালো ও একটি নীল চক্ষুবিশিষ্ট। পরিবারের সকলের জিনোটাইপ নির্ধারণ কর। [উঃ 519 পৃষ্ঠার 7.14A দেখ]
    (b) বাদামী চক্ষুবিশিষ্ট এক ভদ্রলোক যদি নীল চক্ষুবিশিষ্ট একজন মহিলাকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের বাদামী চক্ষুবিশিষ্ট ছয়টি সন্তান হয়, তবে ঐ পরিবারের সকলের জিনোটাইপ কি হবে ? [উঃ 519 পৃষ্ঠার 7.14B দেখ]
    (c) ডায়াবিটিস মানুষের একটি বংশগত রোগ। ডায়াবিটিস রোগের জীনটি (d) প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির। পিতা অথবা মাতার মধ্যে একজন ডায়াবিটিস রোগাক্রান্ত এবং অন্যজন খাঁটি স্বাভাবিক(D/D)প্রকৃতির। সন্তানদের ডায়াবিটিসের সম্ভাবনা কিরূপ ? [উঃ 521 পৃষ্ঠার 7.14J দেখ]

(d) মানুষের ক্ষেত্রে সোজা কেশ (S) ও কুঞ্চিত কেশ (s) যথাক্রমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য, আবার বাদামী চক্ষু (B) ও নীল চক্ষু (b) যথাক্রমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। সোজা কেশ ও বাদামী চক্ষু-বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক কুঞ্চিত কেশ ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট একজন ভদ্র মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁদের সন্তানদের মধ্যে কেহ কেহ সোজা কেশ ও বাদামী চক্ষুবিশিষ্ট এবং কেহ কেহ কুঞ্চিত কেশ ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট হল। পিতা ও সন্তানদের জিনোটাইপ নির্ধারণ কর।
[উঃ 522 পৃষ্ঠার 7.14ক দেখ]

(C) অতি সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্ট উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short or specific Answer type questions)

23. বংশগতি কাকে বলে ? [উঃ 495 পৃষ্ঠা দেখ]
24. মেণ্ডেলকে সুপ্রজনন বিদ্যার জনক বলা হয় কেন ? [উঃ ঐ]
25. কোন্ কোন্ বিজ্ঞানী মেণ্ডেলের সূত্রের পুনরুদ্ধার করেন ? [উঃ 496 পৃষ্ঠা দেখ]
26. মিউটেশন কি ? [উঃ 497 পৃষ্ঠা দেখ]
27. অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ কাকে বলে ? [উঃ ঐ]
28. বংশগতিতে খাঁটি জীব ও সংকর জীব বলতে কি বোঝ ? [উঃ 498 পৃষ্ঠা দেখ]
29. প্রবল গুণ ও অপ্রবল গুণ কাকে বলে ? [উঃ 499 পৃষ্ঠা দেখ]
30. বংশগতিতে 3 : 1 অনুপাতকে কি বলে ? [উঃ 500 পৃষ্ঠা দেখ]
31. ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ কাকে বলে ? [উঃ 502 পৃষ্ঠা দেখ]
32. সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলতে কি বোঝ ? [উঃ 506—507 পৃষ্ঠা দেখ]
33. বংশগতিতে 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতকে কি বলে ? [উঃ 510 পৃষ্ঠা দেখ]

(D) টীকা লেখ (Write notes on) :

34. গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল। [উঃ 495 পৃষ্ঠা দেখ]
35. মিউটেশন। [উঃ 497 পৃষ্ঠা দেখ]
36. অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ। [উঃ ঐ]
37. প্রবল ও অপ্রবল বৈশিষ্ট্য। [উঃ 499 পৃষ্ঠা দেখ]
38. ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ। [উঃ 502 পৃষ্ঠা দেখ]
39. অসম্পূর্ণ প্রকটতা। [উঃ 506 পৃষ্ঠা দেখ]
40. মেণ্ডেলের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র। [উঃ 501 এবং 511 পৃষ্ঠা দেখ]

অভিব্যক্তি বা বিবর্তন ৪

[EVOLUTION]

Syllabus : Evolution : Definition, evidences—morphological, palaeontological (mention only Archaeopteryx) and embryological (ontogenesis not required). [Evidences in outline only]

Theories of Darwin, Lamarck & De Vries (in brief).

8.1. আলোচনা ও সংজ্ঞা (Discussion and Definition)

'অভিব্যক্তি' বা 'বিবর্তন' কথার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুর খুব ধীর এবং ক্রমাগত পরিবর্তন। আকাশের বুকে যে অসংখ্য নক্ষত্র আছে, তারা ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করে ক্রমাগত ঠান্ডা হচ্ছে। নক্ষত্ররাজির এই ক্রমাগত পরিবর্তনকে **নক্ষত্রের বিবর্তন** বলা যায়। মনে রাখা দরকার, বিবর্তন বা অভিব্যক্তি কথার অর্থ শুধু ক্রমাগত পরিবর্তনই নয়, সেই পরিবর্তনের গতিটিও খুব ধীর।

যখন 'বিবর্তন' শব্দটিকে আমরা জীবের সঙ্গে যুক্ত করি—অর্থাৎ 'জীব-বিবর্তন' (Organic evolution) কথাটি ব্যবহার করি, তখন আমাদের মনের মধ্যে 'ক্রমোন্নতির' কথাও ভেসে ওঠে। বর্তমানে পৃথিবীর বুকে যে অসংখ্য জীবগোষ্ঠী রয়েছে এদের কারও বা দেহ একটিমাত্র কোষ দিয়ে গঠিত আবার কারও দেহে আছে কোটি কোটি কোষ, কেহ দেখতে অতিকায় আবার কাকেও বা খালি চোখে দেখাই যায় না, কেহ মেরুদণ্ডবিশিষ্ট, কেহ বা মেরুদণ্ডহীন। এইসব বিচিত্র জীবগোষ্ঠীর আবির্ভাব একদিনে ঘটেনি। অতীত দিনের অতি সরল দৈহিক গঠনবিশিষ্ট অনুন্নত জীবগোষ্ঠী থেকে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতি ধীর গতিতে বর্তমানের উন্নত শ্রেণীর জীবদের আবির্ভাব ঘটেছে। এই উন্নত শ্রেণীর জীবদের দেহের গঠন অতীত দিনের অনুন্নত জীবদের তুলনায় অত্যন্ত জটিল। **যে প্রক্রিয়ায় অনুন্নত ও সরল আকৃতির পূর্ব-পুরুষ বা উদ্‌বংশীয়** (ancestral) **জীবগোষ্ঠী থেকে নানা প্রকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতি মন্থর গতিতে জটিল দেহযন্ত্রবিশিষ্ট উন্নত জীবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, তাকে বলা হয় জীব-বিবর্তন (বা জীব অভিব্যক্তি)।**

8.2. জীবনের ক্রমবিকাশ (Evolution of living organisms)

পৃথিবীর নানা অঞ্চলে পাললিক শিলা (Sedimentary rocks)-র স্তর আছে। বিভিন্ন সময়ে ঐ সমস্ত স্তরের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন স্তরের বয়স নির্ধারণ করতে পারেন। বয়সের ভিত্তিতে এক-একটি স্তরকে এক-একটি **ভূ-তত্ত্বীয় পর্যায়** (Geological period) রূপে চিহ্নিত করা হয়। এক-একটি ভূ-তত্ত্বীয় পর্যায়কে আবার কয়েকটি **উপপর্যায়ে** (Epochs) ভাগ করা হয়; অপরপক্ষে কয়েকটি ভূ-তত্ত্বীয় পর্যায়কে এক-একটি **ভূ-তত্ত্বীয় যুগ** (Geological era) রূপে চিহ্নিত করা হয় [8.1 নং তালিকা দ্রষ্টব্য]।

8.1 নং তালিকা

বিভিন্ন ভূ-তত্ত্বীয় যুগের আনুমানিক বয়স ও সেই সময়ের প্রাণী ও উদ্ভিদ

যুগ	পর্যায়	উপপর্যায়	বয়স (বছরে)	উল্লেখযোগ্য জীব	প্রাধান্য
সেনোজোয়িক (Cenozoic)	কোয়াটারনারি (Quaternary)	সাম্প্রতিক (Recent)	10,000	সভ্য মানব।	মানবের যুগ।
		প্লিসটোসীন (Pleistocene)	10,00,000	বৃহদাকার স্তন্যপায়ীদের অবলুপ্তি।	স্তন্যপায়ী এবং আধুনিক উদ্ভিদের যুগ।
	টারশিয়ারি (Tertiary)	প্লায়োসীন (Pliocene)	1.00,00,000	আদিম মানবের উৎপত্তি।	
		মায়োসীন (Miocene)	3,00,00,000	স্তন্যপায়ী, বিশেষত মানবরূপী বানরদের প্রাচুর্য; স্থলজ উদ্ভিদের স্বর্ণ যুগ।	
		অলিগোসীন (Oligocene)	4,00,00,000	উন্নত স্তন্যপায়ীদের ক্রমবিকাশ, আদিম স্তন্যপায়ীদের অবলুপ্তি।	
		ইওসীন (Eocene)	6,00,00,000	আদিম স্তন্যপায়ীদের সংখ্যা হ্রাস; শস্য, ঘাস ও ফল জাতীয় উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ।	
		প্যালিওসীন (Paleocene)	7.50,00 000	আদিম স্তন্যপায়ীদের ক্রমবিকাশ।	
মেসোজোয়িক (Mesozoic)	ক্রিটেসিয়াস (Cretaceous)		13,50,00,000	ডাইনোসোর ও টেরোড্যাক্টাইলের অবলুপ্তি।	সরীসৃপ ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের যুগ।
	জুরাসিক (Jurassic)		16,50,00,000	পক্ষী ও টেরোড্যাক্টাইলের ক্রমবিকাশ।	
	ট্রায়াসিক (Triassic)		20,50,00,000	ডাইনোসোরের ক্রমবিকাশ; ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের বিস্তার।	

8.1 নং তালিকা *(Contd.)*

যুগ	পর্যায়	উপপর্যায়	বয়স (বছরে)	উল্লেখযোগ্য জীব	প্রাধান্য
	পারমিয়ান (Permian)		23,00,00,000	স্থলজ মেরুদণ্ডীদের ও আধুনিক পতঙ্গদের ক্রমবিকাশ, সজীব উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ।	উভচর এবং টেরিডোফাইটা উদ্ভিদের প্রাধান্য।
	কার্বনিফেরাস (Carboniferous)		28,00,00,000	উভচর ও আদিম পতঙ্গের বিস্তার ; রেণু উৎপাদনকারী উদ্ভিদের প্রাধান্য।	
	ডেভোনিয়ান (Devonian)		32,50,00,000	উভচর ও মৎস্যের ক্রমবিকাশ ; স্থল-শামুক, মাকড়সা ইত্যাদির উৎপত্তি।	
প্যালিওজোয়িক (Paleozoic)	সিলুরিয়ান (Silurian)		36,00,00,000	প্রথম বায়ুতে শ্বাসকার্য চালাবার উপযুক্ত প্রাণীর (পতঙ্গ ও কাঁকড়াবিছা) আবির্ভাব ; মাছের আবির্ভাব ; প্রথম স্থলজ উদ্ভিদ।	মৎস্য যুগ।
	অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)		42,50,00,000	অস্ট্রাকোডার্মদের (চোয়ালবিহীন মাছ) আবির্ভাব ; কম্বোজ প্রাণীদের ক্রমবিকাশ। ট্রাইলোবাইট প্রাণীর স্বর্ণ যুগ।	
	ক্যাম্ব্রিয়ান (Cambrian)		50,00,00,000	ট্রাইলোবাইট প্রাণীর ক্রমবিকাশ, সামুদ্রিক শৈবাল।	সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের যুগ।
আর্কিওজোয়িক (Archeozoic)			2,00,00,00,000+	সরলতম সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও শৈবাল।	জীবনের উষালগ্ন।

কাদা, বালি ইত্যাদি যে সকল বস্তু থেকে পাললিক শিলা গঠিত হয় সেই সকল বস্তুর মধ্যে যদি কোনভাবে উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের কোন কঠিন অংশ [যথা—কাঠ, অস্থি, দন্ত, খোলক (Shell), আঁশ (Scale) ইত্যাদি] আবদ্ধ হয়, তাহলে শিলা গঠনের সময় জীবদেহের ঐ সকল কঠিন অংশও শিলীভূত হয়ে যায়। এইরূপ শিলীভূত জীবদেহকে **জীবাশ্ম** (Fossil) বলে। অনেক সময় জীবের নরম দেহ বা দেহাংশও (যথা—গাছের পাতা, পাখির পালক ইত্যাদি) নরম মাটির বুকে যে ছাপ সৃষ্টি করে, মাটি শিলায় পরিণত হয়ে সেই ছাপকে তার বুকে ধরে রাখে। এও একপ্রকার জীবাশ্ম।

● **পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে পুরাকালের কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের অথবা দেহাংশের শিলীভূত রূপকে, অথবা তাদের অস্তিত্বের নির্দেশক কোন চিহ্নকে** (যথা—গাছের পাতা, পাখির পালক ইত্যাদির ছাপকে) **জীবাশ্ম বলে।**

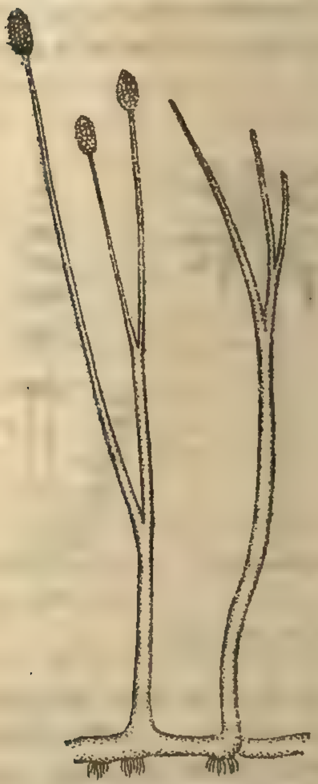

চিত্র 8.1 : রাইনিয়া (*Rhynia*) নামক প্রাচীন সাইলোফাইটেল।

কোনও যুগের শিলার মধ্যে জীবাশ্মের অস্তিত্ব থেকে সেই বিশেষ যুগের জীবগোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। 8.1 নং তালিকায় ভূ-তত্ত্বীয় বিভিন্ন যুগ, পর্যায় ও উপপর্যায়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন জীবাশ্ম সম্পর্কে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সরল আকৃতির জীবগোষ্ঠী থেকে ধীরে ধীরে উন্নত ও জটিল দেহবিশিষ্ট জীবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে।

200 কোটি বছর আগে জীবনের সূত্রপাত ঘটলেও প্রাচীনতম জীবের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় **ক্যাম্ব্রিয়ান** পর্যায়ের গোড়ার দিকে (**early Cambrian period**), অর্থাৎ আনুমানিক 50 কোটি বছর আগেকার কথা। এই সময়কার শিলার বুকে অনুন্নত অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের কিছু কিছু নির্দর্শন, যথা—কোন কোন এককোষী প্রাণীর (**Radiolarians**) খোলক (**Shell**), স্পঞ্জের কাঁটা (**Spicules**), অঙ্গুরীমাল প্রাণীদের গর্ত ইত্যাদি জীবাশ্মের আকারে পাওয়া যায়। ক্যাম্ব্রিয়ান পর্যায়ের সময়সীমার মধ্যে এক-এক করে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের সকল পর্বেরই (**Phyla**) আবির্ভাব ঘটে। এই সময়ে উদ্ভিদ বলতে ছিল কেবল নানা প্রকার সামুদ্রিক শৈবাল।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে আরও পরবর্তী কালে—**অর্ডোভিসিয়ান** পর্যায়ে। এই সময়কার মেরুদণ্ডীরা ছিল চোয়ালবিহীন (Jawless) অস্ট্রাকোডার্ম—বর্তমান কালের ল্যামপ্রে (Lamprey) ও হ্যাগফিশ (Hagfish) নামক চোয়ালবিহীন জলজ প্রাণীরা এদের বংশধর। চোয়ালযুক্ত মেরুদণ্ডীদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে মৎস্য রূপে, **সিলুরিয়ান** পর্যায়ে। সিলুরিয়ান ও ডেভোনিয়ান পর্যায়কে বলা হয় **মৎস্য যুগ**—কেননা, ঐ সময়ে প্রাণিরাজ্যে মৎস্যদের প্রাধান্য দেখা যায়। সিলুরিয়ান পর্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বায়ুতে শ্বাসকার্য চালাবার উপযোগী প্রাণী ও উদ্ভিদদের—অর্থাৎ স্থলজ প্রাণী ও উদ্ভিদদের আবির্ভাব। ঐসব প্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কাঁকড়াবিছা, পতঙ্গ ইত্যাদি। ঐ সময়কার উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ ছিল সাইলোফাইটেলস (Psilophytales)। উক্ত উদ্ভিদদের পাতা ও প্রকৃত মূল (true roots) ছিল না। কাণ্ড ও ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড নিয়ে দেহটি গঠিত ছিল। সবুজ কাণ্ডের সাহায্যে তারা সালোকসংশ্লেষ ঘটাত (চিত্র 8.1)। দেহে সংবহন কলারও কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, জলে ও স্থলে দুই জায়গাতেই প্রাণীদের চেয়ে উদ্ভিদদের আবির্ভাব ঘটে আগে। এর কারণ, উদ্ভিদবিহীন এলাকায় প্রাণীরা বাঁচতে পারে না।

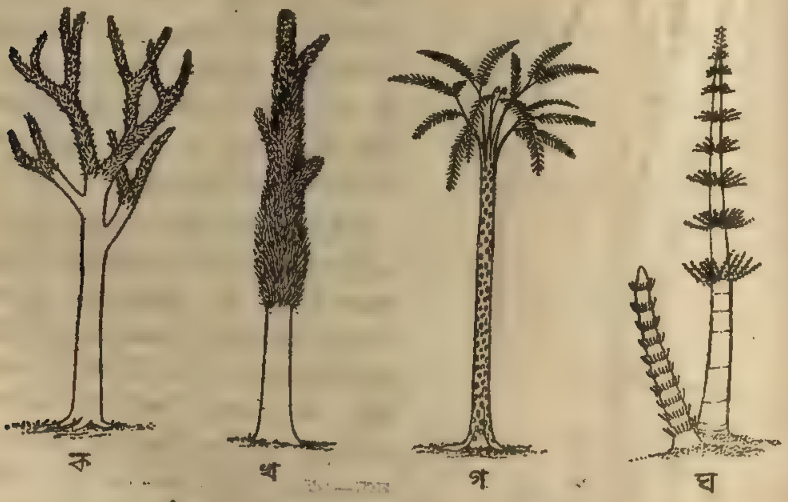

চিত্র 8.2 : ডেভোনিয়ান পর্যায়ের কয়েক প্রকার উদ্ভিদ।

ডেভোনিয়ান পর্যায়ে সবুজ শৈবাল থেকে ফার্ণ ও অন্যান্য নানা প্রকার টেরিডোফাইটা জাতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তি হয় (চিত্র 8.2)। এইসব উদ্ভিদে সুনির্দিষ্ট সংবহন কলা ছিল। এদের কোন কোনটির আকার ছিল বৃক্ষের (tree) মত—লম্বায় প্রায় 30 মিটার এবং গুঁড়ির ব্যাস প্রায় 2 মিটার। অতএব, পৃথিবীর বুকে প্রথম অরণ্যের আবির্ভাব ঘটে এই সময়ে। ডেভোনিয়ান পর্যায়ের শেষদিকে মৎস্য থেকে প্রাচীনতম স্থলজ মেরুদণ্ডী অর্থাৎ উভচর প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটে।

উভচরদের আগমনের মধ্য দিয়ে প্রাণিরাজ্যে শ্বাসযন্ত্র হিসেবে ফুলকার পরিবর্তে ফুসফুসের আবির্ভাব ঘটে এবং গমন অঙ্গ হিসেবে পাখনার পরিবর্তে আবির্ভাব ঘটে পদ (limbs)-এর।

কার্বনিফেরাস পর্যায়ে উদ্ভিদরাজ্যে টেরিডোফাইটাদের প্রাধান্য দেখা যায়—সেইজন্য এই পর্যায়কে **টেরিডোফাইটাদের যুগ** বলা হয়। এই পর্যায়ে ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে বনভূমি ধ্বংস পেয়ে পৃথিবীতে কয়লার ভান্ডার গড়ে ওঠে। সেইজন্য এই পর্যায়ের নাম **কার্বনিফেরাস** বা **অঙ্গার যুগ** (Coal age)। কার্বনিফেরাস পর্যায়ের শেষদিকে ব্যক্তবীজী (Gymnosperms) উদ্ভিদদের আবির্ভাব ঘটে ; বর্তমান কালের সুপরিচিত গুপ্তবীজী (Angiosperms) উদ্ভিদদের তখন কোন অস্তিত্বই ছিল না।

সম্ভবত কার্বনিফেরাস পর্যায়ের শেষদিকে উভচরদের থেকে নানা ধরনের সরীসৃপের আবির্ভাব ঘটে এবং **মেসোজোয়িক যুগে** প্রাণিরাজ্যে সরীসৃপদের একচ্ছত্র আধিপত্য দেখা যায়। এইজন্য মেসোজোয়িক যুগকে **সরীসৃপদের যুগ** বলা হয়। এই সময়কার সরীসৃপদের মধ্যে প্রধান ছিল নানা প্রকার ডাইনোসোর, টেরোড্যাকটাইল ইত্যাদি। মেসোজোয়িক যুগেই সরীসৃপদের দুটি পৃথক গোষ্ঠী থেকে পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের উৎপত্তি হয়। এই যুগে গুপ্তবীজী উদ্ভিদদেরও আবির্ভাব ঘটে, তবে উদ্ভিদরাজ্যে এই যুগে প্রাধান্য ছিল ব্যক্তবীজী উদ্ভিদদের।

সেনোজোয়িক যুগের গোড়া থেকেই স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিকাশ শুরু হয় এবং তাদের চরম বিকাশ দেখা যায় এই যুগের **মায়োসীন** উপপর্যায়ে। এই সময়ে মানবরূপী বানরদের (Apes) বা বনমানুষদের আবির্ভাব ঘটে। এই বনমানুষদের একটি গোষ্ঠী থেকে আদিম মানুষের এবং আর একটি গোষ্ঠী থেকে বর্তমান যুগের বনমানুষদের (শিম্পাঞ্জী, গরিলা ইত্যাদির) উৎপত্তি হয়। আদিম মানুষের উৎপত্তি হয় সেনোজোয়িক যুগের **প্লায়োসীন** উপপর্যায়ে—অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় 1 কোটি বছর আগে। আদিম মানুষের নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জ্ঞানী মানুষ (*Homo sapiens*)—অর্থাৎ বর্তমান মানুষের আবির্ভাব ঘটে। সেনোজোয়িক যুগে উদ্ভিদ-রাজ্যে ব্যক্তবীজী উদ্ভিদদের প্রাধান্য লোপ পায় এবং গুপ্তবীজী উদ্ভিদদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনুন্নত এবং সরল জীবগোষ্ঠী থেকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে উন্নত ও জটিল দেহবিশিষ্ট জীবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে, উপরের আলোচনা থেকে তা পরিষ্কার-ভাবে বোঝা গেল।

8.3. জীব-বিবর্তনের প্রমাণ (Evidences of Organic Evolution)

পূর্বের আলোচনায় বলা হয়েছে বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিভিন্ন জীবের আবির্ভাব ঘটেছে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, বিবর্তনের সপক্ষে কোন প্রমাণ আছে কি না। এর উত্তরে বলা যায়, বিবর্তন যে ঘটেছে সে ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রমাণগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। পরপৃষ্ঠায় তিন শ্রেণীর প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

8.3A. অঙ্গসংস্থানঘটিত প্রমাণ (Morphological Evidences)

জীববিজ্ঞানের যে শাখা প্রাণী ও উদ্ভিদদের দেহের বাইরের ও ভিতরের অঙ্গসমূহের গঠন সম্পর্কে অনুসন্ধান করে, সেই শাখার নাম **অঙ্গসংস্থানবিদ্যা** বা **মরফোলজি**। খালি চোখে যে সব অঙ্গ দেখা যায় তাদের গঠন সম্পর্কে অনুসন্ধানে নিয়োজিত শাখার নাম **শারীরস্থান** বা **অ্যানাটমি**। এটি মরফোলজি বা অঙ্গসংস্থান-বিদ্যার বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি শাখা।

প্রাণী ও উদ্ভিদদের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন পর্যালোচনা করলে জীব-বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ মেলে। অঙ্গসংস্থানঘটিত প্রমাণগুলি নিম্নরূপ ঃ

(I) সমসংস্থ অঙ্গঘটিত প্রমাণ (Evidences from Homologous organs) ঃ **জীবদেহের যে সব অঙ্গের উৎপত্তিস্থল এক এবং গঠন-কাঠামোয় যথেষ্ট মিল দেখা যায়, সেইসব অঙ্গকে সমসংস্থ অঙ্গ বলা হয়।** ব্যাঙের অগ্রপদ, পাখির ডানা, মানুষের হাত ইত্যাদি অঙ্গগুলি সমসংস্থ অঙ্গ।

কোন উভচর ও সরীসৃপের অগ্রপদ, পাখি ও বাদুড়ের ডানা, মানুষের হাত এবং তিমির ফ্লিপার (flipper) বা অগ্রপদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন মিল নেই।

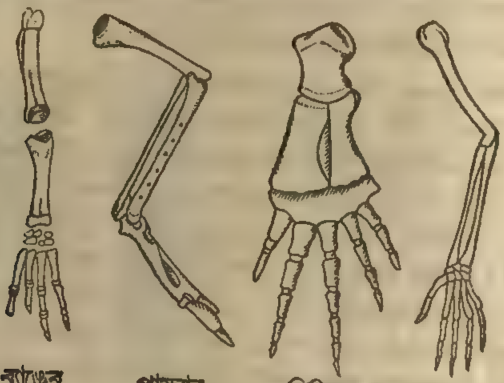

চিত্র 8.3 ঃ কয়েকটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর অগ্রপদের অস্থির কাঠামো।

কিন্তু ঐগুলি ব্যবচ্ছেদ করে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, উক্ত অঙ্গগুলি একই প্রকার অস্থি, পেশী ও নার্ভ দ্বারা গঠিত। অঙ্গগুলির মধ্যে গঠনগত সামান্য যে পার্থক্য দেখা যায় তা তাদের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজের জন্য। উভচর ও সরীসৃপরা অগ্রপদকে ব্যবহার করে চলার কাজে, পাখি ও বাদুড় উড়বার কাজে, মানুষ কোন কিছু ধরার কাজে এবং তিমি সাঁতার কাটার কাজে। কাজের অমিল সত্ত্বেও অঙ্গগুলির মূল কাঠামোটি একই রকমের। উক্ত প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বাহু (arm) একটি লম্বা অস্থি (হিউমারাস) দ্বারা, প্রবাহু (forearm) পাশাপাশি অবস্থিত দুটি লম্বা অস্থি (রেডিয়াস ও আলনা) দ্বারা, কব্জি কতিপয় ছোট-ছোট অস্থি

(কারপালস্) দ্বারা এবং করতল (palm) ও অঙ্গুলি একটু লম্বাটে ধরনের কতকগুলি ছোট-ছোট অস্থি (মেটাকারপালস্ ও ফ্যালান্জেস) দ্বারা গঠিত (চিত্র 8.3)। শুধু অগ্রপদই নয়, উক্ত প্রাণীদের পশ্চাৎপদের মূল কাঠামোটিও একই রকমের। এইরূপ গঠনগত মিলযুক্ত অঙ্গকে **সমসংস্থ অঙ্গ** (Homologous organs) বলা হয়। সমসংস্থ অঙ্গগুলি বিবর্তনের পক্ষে জোরালো যুক্তি। বিভিন্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর (যথা—উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর) অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের গঠনগত মিল এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, তারা সকলে একই পূর্ব-পুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তা না হলে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত অঙ্গের মধ্যে এত মিল থাকত না।

শুধু অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদই নয়, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কশেরুকাগুলিও (Vertebrae) সমসংস্থ অঙ্গ। মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর কশেরুকা পরীক্ষা করলে দেখা যায়, সেগুলির কাঠামোয় চমকপ্রদ মিল আছে। প্রতি ক্ষেত্রেই কশেরুকাতে সেনট্রাম, নিউরাল আর্চ, নিউরাল স্পাইন, নিউরাল ক্যানাল প্রভৃতি অংশ আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর একটি নির্দিষ্ট অঙ্গের গঠনে এই উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, তারা সকলে একই পূর্ব-পুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সেই পূর্ব-পুরুষের কাছ থেকে তারা উক্ত অঙ্গটির গঠনগত কাঠামো উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। অন্যভাবে বলা যায়, একই পূর্ব-পুরুষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে।

উদ্ভিদদের ক্ষেত্রেও সমসংস্থ অঙ্গের অস্তিত্ব আছে। যে কোন উদ্ভিদের বায়ব (aerial) কাণ্ড এবং আদা, হলুদ, আলু ইত্যাদি উদ্ভিদের ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডগুলি সমসংস্থ অঙ্গ। আপাতদৃষ্টিতে উক্ত অঙ্গগুলিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অঙ্গ বলে মনে হলেও, যত্ন সহকারে পরীক্ষা করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে গঠনগত অনেক মিল আছে (যথা—পর্ব, পর্বমধ্য, মুকুল ইত্যাদির অস্তিত্ব)। বিভিন্ন উদ্ভিদের সমসংস্থ অঙ্গগুলির মধ্যে এইরূপ গঠনগত মিল থেকে এ কথা বলা যায় যে, উদ্ভিদগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই তথ্য বিবর্তনের মতবাদকে সমর্থন করে।

● **ফ্লিপার** ঃ স্তন্যপায়ী জলচর প্রাণী তিমির অগ্রপদগুলি মাছের পাখনার মত দেখতে; পাখনা-সদৃশ উক্ত অঙ্গগুলির নাম **ফ্লিপার**। ফ্লিপারের বহিরাকৃতি মাছের পাখনার মত হলেও তার অন্তর্গঠন উভচর, সরীসৃপ বা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের অগ্রপদের মতই। একই রকমের অস্থি, পেশী ও নার্ভ দ্বারা ফ্লিপার এবং উক্ত প্রাণীদের অগ্রপদ গঠিত। ফ্লিপারের সঙ্গে উক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অগ্রপদের চমকপ্রদ মিল এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, এরা সকলেই একই পূর্ব-পুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

[● **সমবৃত্তীয় অঙ্গ (Analogous Organs)** ঃ সমসংস্থ অঙ্গের আলোচনা কালে সমবৃত্তীয় অঙ্গের কথাও মনে আসে।

জীবদেহের যে সব অঙ্গ একই রকম কাজ করে, কিন্তু যাদের উৎপত্তিস্থল ও গঠন-কাঠামো এক

নয়, সেইসব অঙ্গকে **সমবৃত্তীয় অঙ্গ** বলে। উদাহরণ ঃ পাখির ডানা ও পতঙ্গের ডানা (এই দু রকম অঙ্গই উড্ডয়নে সাহায্য করে) ; মটর গাছের আকর্ষ ও ঝুমকালতার আকর্ষ—প্রথমটি রূপান্তরিত পত্রক (Leaflet) ও দ্বিতীয়টি রূপান্তরিত শাখা (Stem) (এই দু রকম আকর্ষই দুর্বল কান্ড উদ্ভিদকে কোন অবলম্বনকে জড়িয়ে উপর দিকে উঠতে সাহায্য করে)।

দুটি জীবে সমবৃত্তীয় অঙ্গের উপস্থিতি তাদের মধ্যে সম্পর্কের কোন ইঙ্গিত দেয় না—অর্থাৎ বিবর্তন মতবাদকে সমর্থনের ব্যাপারে সমবৃত্তীয় অঙ্গের কোন ভূমিকা নেই*। এই অঙ্গগুলি একই রকম পরিবেশে জীবের একই ধরনের অভিযোজনের দৃষ্টান্ত।]

(II) তুলনামূলক শারীরস্থান ঘটিত প্রমাণ (Evidences from Comparative anatomy) ঃ বিভিন্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর কোন কোন অঙ্গের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে জীব-বিবর্তনের পক্ষে সমর্থন মেলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ **হৃৎপিন্ডের** কথাই ধরা যেতে পারে। মাছেদের হৃৎপিন্ডে মাত্র দুটি প্রকোষ্ঠ আছে (তার মধ্য দিয়ে কেবল অক্সিজেনবিহীন রক্ত চলাচল করে), উভচর ও অধিকাংশ সরীসৃপের হৃৎপিন্ডে আছে তিনটি প্রকোষ্ঠ (তার ভিতর অক্সিজেনযুক্ত ও অক্সিজেনবিহীন রক্তের মিশ্রণ ঘটে) এবং পাখি ও স্তন্যপায়ীদের হৃৎপিন্ডে আছে চারটি করে প্রকোষ্ঠ (তাদের ভিতর দু ধরনের রক্তের মিশ্রণ ঘটে না) (চিত্র 8.4)। দেখা যাচ্ছে, অনুন্নত শ্রেণীর প্রাণী (মৎস্য) থেকে শুরু করে উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের (পাখি ও স্তন্যপায়ীর) মধ্যে অঙ্গটির ক্রমিক উন্নতি ঘটেছে। এই তথ্য বিবর্তনের মতবাদকেই সমর্থন করে।

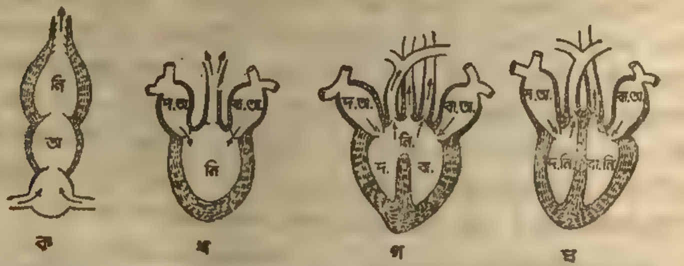

চিত্র.8.4 ঃ বিভিন্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিন্ডের লম্বচ্ছেদে তাদের প্রকোষ্ঠগুলি দেখানো হয়েছে। (ক) মৎস্য, (খ) উভচর, (গ) সরীসৃপ, (ঘ) পক্ষী ও স্তন্যপায়ী। অ = অলিন্দ নি = নিলয়, দ = দক্ষিণ, বা = বাম।

বিভিন্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর **মস্তিষ্কের** গঠনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলেও একই প্রকার তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক পাঁচটি মূল খণ্ড নিয়ে গঠিত, যথা—অলফ্যাক্টরি লোব, সেরিব্রাম, অপটিক লোব, সেরিবেলাম ও মেডালা অবলংগেটা (চিত্র 8.5)। অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রেই অঙ্গটির মূল কাঠামো একই রকমের—কেবল অনুন্নত শ্রেণীর প্রাণী (মৎস্য) থেকে শুরু করে

* দ্রষ্টব্য ঃ "A Dictionary of Biology"—M. Abercrombie, C. J. Hickman, M. L. Johnson (Penguin Books Ltd.)

উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে অঙ্গটির ক্রমিক উন্নতি ঘটেছে। বুদ্ধিবৃত্তি ও অঙ্গ-সঞ্চালনকে সুনিয়ন্ত্রিত করার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত খন্ড-দুটির—যথাক্রমে সেরিব্রাম ও সেরিবেলামের নিম্নলিখিত ক্রমে আয়তন বৃদ্ধি ঘটেছেঃ

মৎস্য → উভচর → সরীসৃপ → পক্ষী → স্তন্যপায়ী।

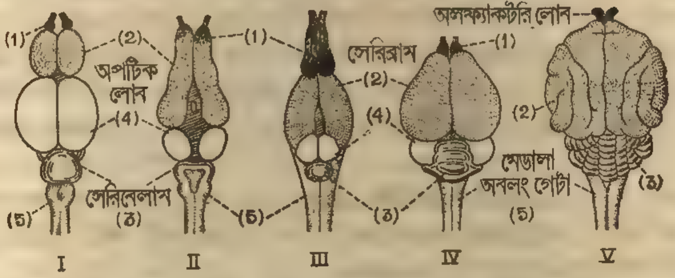

চিত্র 8.5 : বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের গঠনের ক্রমিক উন্নতি দেখানো হয়েছে।

আবার, প্রত্যেকটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর মেরুদণ্ডের গ্রীবা অংশে সাতটি করে কশেরুকা আছে। গ্রীবাহীন তিমি, সাধারণ দৈর্ঘ্যের গ্রীবাবিশিষ্ট মানুষ, এমনকি অতি দীর্ঘ গ্রীবাবিশিষ্ট প্রাণী জিরাফের ক্ষেত্রেও **গ্রীবা কশেরুকার** (Cervical vertebrae) সংখ্যা 7 (সাত)। উপরিউক্ত দুটি উদাহরণ থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই পেঁছানো যায় যে, উক্ত প্রাণীগুলি একই পূর্ব-পুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ এইসব তথ্যও বিবর্তনের মতবাদকে সমর্থন করে।

প্যাপিলিওনেসী গোত্রভুক্ত সমস্ত উদ্ভিদের ফুলের গঠন একই রকমের (প্রজাপতিসম—**Papilionaceous**)। আবার, ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা ও জিমনোস্পার্ম গোষ্ঠীভুক্ত সমস্ত উদ্ভিদের আর্কিগোনিয়ার গঠন একই রকমের। বিভিন্ন উদ্ভিদ গোষ্ঠীর শারীরস্থান সংক্রান্ত উক্ত সাদৃশ্যগুলি থেকে এটাই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তারা একই পূর্ব-পুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই তথ্যও বিবর্তনের মতবাদকেই সমর্থন করে।

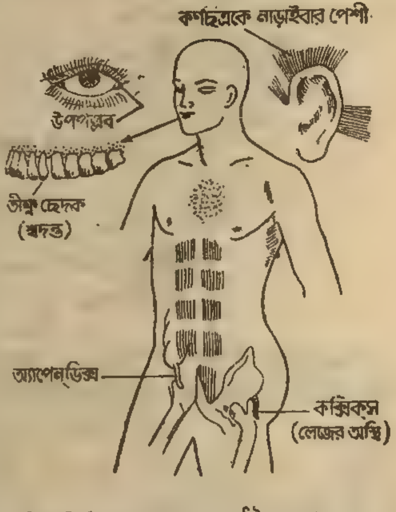

চিত্র 8.6 : মানুষের কয়েকটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গ।

(III) লুপ্তপ্রায় অঙ্গঘটিত প্রমাণ (Evidences from Vestigeal organs) **:** বিভিন্ন প্রাণীর দেহে উপস্থিত লুপ্তপ্রায় বা **ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গগুলি**-ও জীব-বিবর্তনের পক্ষে জোরালো যুক্তি। অনেক

প্রাণীর দেহে এক বা একাধিক এমন অঙ্গ দেখা যায়, যেগুলি আকারে ছোট এবং কোন কাজে লাগে না। ঐসব অঙ্গকে **লুপ্তপ্রায়** বা **ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গ** বলে। একটি প্রাণীর লুপ্তপ্রায় কোন অঙ্গ অপর কোন প্রাণীর দেহে সুগঠিত ও ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, (i) ঘোড়া, গিনিপিগ প্রভৃতি তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণীতে ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে **সিকাম** বা **অ্যাপেন্ডিক্স্** নামে একটি বড়-সড় অংশ আছে, যা সেলুলোজ পরিপাকে বিশেষ সাহায্য করে। কিন্তু মানুষ ও মাংসাশী স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে ঐ অঙ্গটি আকারে ছোট এবং তার কোন কাজ নেই (চিত্র 8.6)।* (ii) মানুষের লেজ নেই, কিন্তু মেরুদণ্ডের শেষদিকে কয়েকটি কশেরুকা মিলিত হয়ে **কক্সিক্স** (Coccyx) বা **ত্রিকাস্থি** নামে একটি ক্ষুদ্র অংশ গঠন করেছে। ঐটি লেজবিশিষ্ট প্রাণীদের লেজের অংশ। (iii) ব্যাঙ, পাখি ও অন্যান্য স্থলজ মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখে **নিকটিটেটিং মেমব্রেন** নামে একটি তৃতীয় অক্ষিপল্লব বা **উপপল্লব** আছে। মানুষের চোখের ভিতর দিকের কোণে ঐটি একটি ছোট্ট সাদাটে পর্দারূপে লুপ্তপ্রায় অবস্থায় বিরাজ করছে।

মানুষের প্রায় 90টি লুপ্তপ্রায় অঙ্গ আছে। প্রশ্ন জাগতে পারে, যে অঙ্গের কোন কাজ নেই প্রাণিদেহে সেরূপ অঙ্গ থাকবার কারণ কি ? এর একমাত্র কারণ, লুপ্তপ্রায় অঙ্গযুক্ত প্রাণীদের উৎপত্তি হয়েছে এমন সব প্রাণী থেকে যাদের মধ্যে উক্ত অঙ্গগুলি সুগঠিত ও সক্রিয় ছিল।

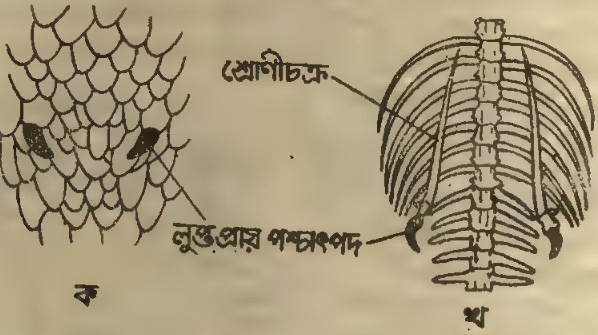

চিত্র 8.7 : অজগর সাপের লুপ্তপ্রায় পশ্চাৎপদ।
(ক) দেহের বাইরের দৃশ্য, (খ) দেহের ভিতরের দৃশ্য।

মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীতেও লুপ্তপ্রায় অঙ্গ দেখা যায়। (i) নিউজীল্যান্ডের কিউই (Kiwi) পাখি এবং আফ্রিকার উটপাখি (Ostrich) উড়তে পারে না, কিন্তু তাদের ডানা আছে। তবে ডানাকে নাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় মাংসপেশীগুলি লুপ্তপ্রায়। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, উড়বার ক্ষমতাযুক্ত কোন পূর্ব-পুরুষ থেকে উক্ত পাখিদের উৎপত্তি হয়েছে।

---

* মানুষের ক্ষেত্রে ঐ অঙ্গটিতে জীবাণু সংক্রমণের ফলে 'অ্যাপেনডিসাইটিস' নামে মারাত্মক রোগ হয়। তখন অস্ত্রোপচারের সাহায্যে একে অপসারণ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

(ii) তিমি নামক স্তন্যপায়ী জলচর প্রাণীর ও পাইথন (Python) নামক অজগর সাপের পা নেই। কিন্তু তাদের পেটের কাছে দেহের ভিতরে এমন কয়েকটি অস্থি আছে, যেগুলি শ্রোণীচক্র ও পশ্চাৎপদের লুপ্তপ্রায় অংশ (চিত্র 8.7)। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পদবিশিষ্ট কোন পূর্ব-পুরুষ থেকে এদের উৎপত্তি হয়েছে।

কোন কোন উদ্ভিদেও লুপ্তপ্রায় অঙ্গ দেখা যায়। ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের শল্কপত্র (Scale leaves) লুপ্তপ্রায় অঙ্গের উদাহরণ।

● **বিভিন্ন জীবের দেহে এমন কতকগুলি অঙ্গ থাকে যেগুলি আকারে খুব ছোট এবং নিষ্ক্রিয়, অথচ ঐ অঙ্গগুলিই অন্যান্য কতিপয় জীবের দেহে আকারে বেশ বড় এবং সক্রিয় অবস্থায় দেখা যায়। প্রথমোক্ত জীবদের ক্ষেত্রে অঙ্গগুলিকে লুপ্তপ্রায় বা ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গ বলে।**

(IV) **সংযোগকারী যোগসূত্র ঘটিত প্রমাণ** (Evidences from connecting links) : জীব-বিবর্তন মতবাদ অনুযায়ী এক গোষ্ঠীর জীব থেকে আর এক গোষ্ঠীর জীবের আবির্ভাব ঘটলে, দুটি গোষ্ঠীর মধ্যবর্তী রূপের জীব বা অন্তর্বর্তী জীব (Intermediate forms) অবশ্যই থাকা উচিত। এইসব অন্তর্বর্তী জীবকে **সংযোগকারী যোগসূত্র** বলে। অতীত কালে মেরুদণ্ডীদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংযোগকারী যোগসূত্র যে বাস্তবিকই ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বর্তমানেও কিছু কিছু অন্তর্বর্তী জীবের অস্তিত্ব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অস্ট্রেলিয়ার **প্লাটিপাস** (Platypus) বা হংসচঞ্চু নামক প্রাণীটির কথা উল্লেখ করা যায় (চিত্র 8.8)। এই প্রাণীদের মধ্যে সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী—এই দুটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। সরীসৃপদের মত এরা ডিম পাড়ে এবং এদের ক্লোয়েকা বা অবসারণী আছে ; অপরপক্ষে, স্তন্যপায়ীদের মত এদের সারা দেহ লোমে ঢাকা এবং ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে তাদের স্তনদুগ্ধ পান করায়।

চিত্র 8.8 : প্লাটিপাস।

অন্তর্বর্তী প্রাণীদের অনেকেই পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়েছে। জীবাশ্ম থেকে তাদের অস্তিত্বের কথা জানা গেছে। মৎস্য ও উভচরদের অন্তর্বর্তী প্রাণী **ডিপ্লোভার্টিব্রন** (Diplovertebron), উভচর ও সরীসৃপদের অন্তর্বর্তী প্রাণী **সেমুরিয়া** (Seymouria) এবং সরীসৃপ ও পাখিদের অন্তর্বর্তী প্রাণী **আর্কিওপ্টেরিক্স** (Archaeopteryx)-এর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। অতএব, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মৎস্য→উভচর→সরীসৃপ→পক্ষী, এই নির্দিষ্ট পথে মেরুদণ্ডীদের বিবর্তন ঘটেছে এবং সরীসৃপ থেকে একদিকে যেমন

পাখিদের আবির্ভাব হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীদেরও উৎপত্তি ঘটেছে (দৃষ্টান্ত—প্ল্যাটিপাস)।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে **টেরিডোস্পার্ম** (Pteridosperms) নামে একপ্রকার উদ্ভিদ-গোষ্ঠীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। তাদের সঙ্গে টেরিডোফাইটা ও সপুষ্পক উদ্ভিদদের (Spermatophyta) যথেষ্ট মিল আছে। অতএব, অনুমান করা যায়, টেরিডোফাইটা থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে সপুষ্পক উদ্ভিদদের আবির্ভাব হয়েছে।

বিবর্তনের মাধ্যমে যে পৃথিবীতে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে, অন্তর্বর্তী জীবগোষ্ঠী থেকে তারই প্রমাণ মেলে।

8.3B. প্রত্নজীববিদ্যা থেকে প্রমাণ (Palaeontological Evidences)

বিজ্ঞানের যে শাখা পৃথিবীর বুক থেকে অবলুপ্ত জীবদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তার নাম **প্রত্নজীববিদ্যা**। অবলুপ্ত জীবদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় জীবাশ্মের মাধ্যমে।

পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে পুরাকালের কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের অথবা দেহাংশের শিলীভূত রূপকে, অথবা তাদের অস্তিত্বের নিদর্শক কোন চিহ্নকে (যথা—গাছের পাতা, পাখির পালক ইত্যাদির ছাপকে) **জীবাশ্ম বলে**।

[বিস্তারিত তথ্যের জন্য 8.2 অংশ দ্রষ্টব্য।]

জীবাশ্মের প্রকারভেদ ঃ জীবাশ্ম নানা রকমের হতে পারে। নিচে এ-সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

(1) **সম্পূর্ণ দেহের জীবাশ্ম ঃ** এইপ্রকার জীবাশ্ম থেকে জীবটি দেখতে কিরকম ছিল, তার আকার, আয়তন ইত্যাদি সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা পাওয়া যায়। বরফ, তেল ও মোম, অ্যামবার* ইত্যাদি পদার্থ খুব ভাল সংরক্ষক (Preservative)। এইসব পদার্থের মধ্যে ঢাকা পড়লে জীবদেহের পচন ঘটে না। ফলে, দেহের নরম অংশগুলি সহ অবিকৃত অবস্থায় পুরাকালের জীবজন্তুর সম্পূর্ণ দেহের জীবাশ্ম পাওয়া সম্ভব হয়। সাইবেরিয়ায় বরফের স্তূপের ভিতর থেকে, হাতীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পুরাকালের প্রাণী **ম্যামথের** এইরূপ অবিকৃত সম্পূর্ণ জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। পোল্যান্ডের একটি তেল ও মোমের খনির (Oil and wax mine) ভিতর থেকে পাওয়া গেছে অতীত যুগের **গন্ডারের** একটি সম্পূর্ণ দেহের জীবাশ্ম। পাইন গাছ থেকে বেরিয়ে আসা রজন প্রথমে বেশ নরম থাকে। এর মধ্যে পতঙ্গ এবং অন্যান্য ছোটখাট নরমদেহী প্রাণী আটক পড়ে যেতে পারে। এর পর রজনের উদ্বায়ী অংশের বাষ্পায়নের (Evaporation) ফলে তা ধীরে ধীরে কঠিন হয় এবং পরিশেষে অ্যামবারে পরিণত হয়। এই অ্যামবারের মধ্যে উক্ত প্রাণীদের সম্পূর্ণ দেহ অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। এইভাবে গঠিত বহু পতঙ্গ, মাকড়সা ও অন্যান্য নরমদেহী প্রাণীর সম্পূর্ণ দেহের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে।

* পাইন গাছের রজনের (Resin) প্রস্তরীভূত রূপ।

(2) **শিলীভবন** (Petrifaction)ঃ উদ্ভিদের কাষ্ঠল অংশ এবং প্রাণীদের দেহের কঠিন অংশগুলি (অস্থি, দন্ত, খোলক ইত্যাদি) এই পদ্ধতিতে জীবাশ্মে পরিণত হয়। মাটির নিচে চাপা পড়ার পর উক্ত অংশগুলিতে উপস্থিত জৈব পদার্থগুলির ধীরে ধীরে শটন (decomposition) ঘটে, কিন্তু অজৈব পদার্থগুলি অবিকৃত অবস্থায় থাকে। জৈব পদার্থগুলির শটনের ফলে জীব দেহাংশে যে সব ছিদ্রের সৃষ্টি হয় সেই ছিদ্রগুলিতে ধীরে ধীরে সিলিকেট, সালফেট, কার্বোনেট, লৌহ প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ বস্তু জমা হতে থাকে। এইভাবে কালক্রমে শিলীভূত জীবাশ্মের সৃষ্টি হয়। এইপ্রকার জীবাশ্ম, প্রকৃতপক্ষে. কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহাংশের শিলা বা পাথরে গঠিত একটি নকল (Copy)।

(3) **প্রাকৃতিক মোল্ড ও কাস্ট** (Natural moulds and casts)ঃ জীবদেহের নরম অংশ মাটির নিচে চাপা পড়লে উক্ত অংশকে ঘিরে থাকা মাটি কালক্রমে কঠিন শিলায় পরিণত হতে পারে। ইতিমধ্যে জীবদেহের অংশটির পচন ও শটন ঘটায় এবং পচা-গলা অংশগুলি জলস্রোতে ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে যাওয়ায়, শিলীভূত মাটির বুকে জীবদেহের একটি অবিকল মোল্ড বা ছাঁচের সৃষ্টি হয়।

অনেক সময় উক্ত মোল্ডরূপী জীবাশ্মের শূন্যস্থানে অন্যান্য বস্তু জমা হয়ে নির্দিষ্ট জীবদেহের অবিকল আকৃতি লাভ করে। এইরূপ জীবাশ্ম **প্রাকৃতিক কাস্ট** নামে পরিচিত।

(4) **পায়ের ছাপ ও দেহের ছাপ** (Footprints and trails)ঃ অনেক সময় নরম মাটির বুকে প্রাণীদের পায়ের ও দেহের ছাপ পড়ে। পরে ঐ মাটি শুকিয়ে গেলে এবং কালক্রমে শিলায় পরিণত হলে ঐসব ছাপ সেখানে থেকে যায়। এইগুলিও এক ধরনের জীবাশ্ম।

(5) **কয়লায় রূপান্তর** (Carbonization)ঃ উপরের মাটির প্রচন্ড চাপে উদ্ভিদদেহ থেকে যখন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বের হয়ে গিয়ে কেবলমাত্র কার্বন অবশিষ্ট থাকে, তখন এইরকম জীবাশ্মের সৃষ্টি হয়।

জীবাশ্মের মাধ্যমে প্রাণী ও উদ্ভিদদের ধারাবাহিক পরিবর্তনের অর্থাৎ জীব-বিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে। সেই কারণে জীবাশ্মকে বিবর্তনের সপক্ষে অন্যতম প্রমাণ বলে ধরা হয়।

আর্কিওপ্‌টেরিক্স ঃ জার্মানীর ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে 'আর্কিওপ্‌টেরিক্স' নামে প্রাচীনতম পাখির জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। উক্ত জীবাশ্ম থেকে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, আর্কিওপ্‌টেরিক্সের দেহে পাখি ও সরীসৃপ, এই দুটি শ্রেণীর মেরুদন্ডী প্রাণীরই বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল। কাকের মত দৈহিক আয়তনের এই প্রাচীনতম পাখিটির বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য ঃ

(i) **কশেরুকা দিয়ে গঠিত লম্বা লেজ ছিল** ; লেজে 18—20টি পুচ্ছ কশেরুকা (Caudal vertebrae) ছিল।

(ii) অগ্রপদটি ডানায় রূপান্তরিত হলেও তাতে সরীসৃপদের মত **নখরযুক্ত** (Clawed) **আঙ্গুল** ছিল। আঙ্গুলের সংখ্যা মাত্র 3টি হলেও (প্রথম,

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঙ্গুল), ঐ আঙ্গুলগুলিতে **ফ্যালাংসের** (আঙ্গুলের অস্থি) **সংখ্যা ছিল সরীসৃপদের উক্ত আঙ্গুলগুলিতে ফ্যালাংসের সংখ্যার সমান** (প্রথম আঙ্গুলে 2টি, দ্বিতীয় আঙ্গুলে 3টি এবং তৃতীয় আঙ্গুলে 4টি)।

(iii) বক্ষ কশেরুকা-সংলগ্ন পঞ্জরাস্থি (ribs) ছাড়াও, কুমীরদের মত **উদর অঞ্চলেও পঞ্জরাস্থি** (Abdominal ribs) ছিল।

(iv) **কার্পো-মেটাকারপাস*** (Carpo-metacarpus) **অস্থি ছিল না।**

(v) **চঞ্চুতে** সুগঠিত **দাঁত ছিল।**

পাখির বৈশিষ্ট্য ঃ

(i) অগ্রপদ **ডানায়** রূপান্তরিত হয়েছিল।

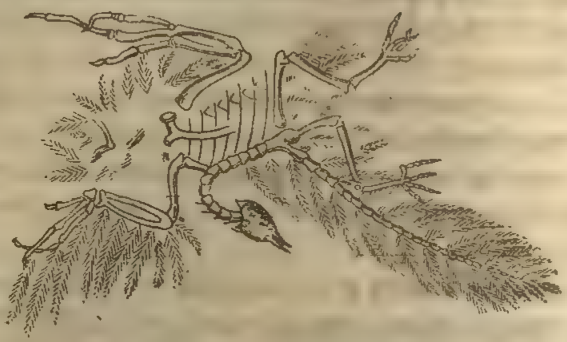

চিত্র 8.9 ঃ আর্কিওপ্টেরিক্সের জীবাশ্ম।

চিত্র 8.10 ঃ আর্কিওপ্টেরিক্সের কল্পিত রূপ।

(ii) দেহ **পালকে** ঢাকা ছিল। ডানায় এবং লম্বা লেজের দুধারে পাখিদের মত বড়-বড় পালক ছিল (চিত্র 8.10)।

* পাখিদের ক্ষেত্রে এই অস্থি দেখা যায়। মণিবন্ধের কয়েকটি কারপাল অস্থি ও করতলের মেটাকারপাল অস্থিগুলির সংযুক্তিতে এই অস্থি গঠিত হয়।

(iii) **শ্রোণীচক্রের (Pelvic girdle) গঠন** ছিল পাখিদের মত।

(iv) পশ্চাৎপদে **টার্সো-মেটাটারসাস*** **(Tarso-metatarsus) অস্থি ছিল**।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে বোঝা গেল, আর্কিওপ্টেরিক্স ছিল এমন একপ্রকার প্রাণী, যাদের মধ্যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দুটি পৃথক শ্রেণীর (সরীসৃপ ও পক্ষী) বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল। এই ধরনের প্রাণীদের জীব-বিবর্তনের সপক্ষে সবচেয়ে বিশ্বাসজনক প্রমাণ হিসেবে ধরা যায়। কেননা, 'জীব-বিবর্তন' কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থই হচ্ছে, পূর্ববর্তী জীবগোষ্ঠী থেকে পরিবর্তন ও ক্রমোন্নতির মাধ্যমে নতুন জীবগোষ্ঠীর আবির্ভাব। সরীসৃপ শ্রেণী থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে যে পক্ষী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে, আর্কিওপ্টেরিক্স তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

[**প্রাচীনতম পাখি—প্রোটোআভিস** (Earliest bird—Protoavis) : সম্প্রতি টেক্সাসটেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও মিউজিয়াম সায়েন্সের প্রফেসর ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বিশ্বের নানা দুর্গম প্রান্ত থেকে আশ্চর্য সব জীবাশ্ম আবিষ্কার করে পাখিদের বিবর্তনের ব্যাপারে নতুন আলোকপাত করেছেন। তিনি দক্ষিণ মেরু অভিযানে তিনবার মার্কিন বিজ্ঞানী দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। চাঞ্চল্যকর তাঁর সাম্প্রতিকতম আবিষ্কার **পৃথিবীর প্রাচীনতম পাখি—প্রোটোআভিস**।

চিত্র 8.11 : প্রোটোআভিসের কল্পিত রূপ।

1861 সালে জার্মানীর ব্যাভেরিয়ায় এক চুনাপাথরের খাদে আর্কিওপ্টেরিক্সের আবিষ্কার হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, এই আর্কিওপ্টেরিক্সই ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম পাখি। কিন্তু সম্প্রতি পশ্চিম টেক্সাসের ছোট্ট শহর পোস্টের কাছে টেক্সাসটেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দু বছর ধরে অভিযান

* পাখিদের গোড়ালির টারসাল অস্থি ও পদতলের মেটাটারসাল অস্থির সংযুক্তিতে এই অস্থি গঠিত হয়। [পাঠ্যসূচীতে শুধু আর্কিওপ্টেরিক্সের জীবাশ্ম অন্তর্ভুক্ত।]

চালিয়ে প্রোটোআভিস নামে যে পাখির জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন, তা আর্কিওপ্‌টেরিক্স থেকেও অন্তত 7½ কোটি বছরের পুরানো। জীবাশ্ম বিজ্ঞানে প্রোটোআভিস বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার।

225 মিলিয়ন বা সাড়ে বাইশ কোটি বছরের পুরানো প্রোটোআভিসের আকৃতি ছিল বর্তমান যুগের কাকের মত। সদ্য আবিষ্কৃত এই পাখির জীবাশ্মটির মধ্যে পাখি ও সরীসৃপের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ দেখা গেছে।

সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য :

(i) এদের লেজ ছিল লম্বা এবং লেজের কাঠামো ছিল হাড়ের।

(ii) চঞ্চুতে দাঁত ছিল—তবে চোয়ালের পিছন দিকে দাঁত ছিল না।

(iii) অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত হলেও তাতে সরীসৃপের মত নখরযুক্ত আঙ্গুল ছিল।

(iv) এদের থাবা ছিল এবং শ্রোণীচক্র ও পিছনের পাগুলি ছিল ছোটখাট ডাইনোসরের মত।

(v) বক্ষ কশেরুকা-সংলগ্ন পঞ্জরাস্থি ছাড়াও সরীসৃপের মত উদর পঞ্জরাস্থি ছিল।

(vi) পিছনের পাগুলি ছিল বেশ শক্ত পোক্ত—ফলে এরা যেমন দৌড়াতে পারতো, তেমনি পারতো উড়তে।

পাখির বৈশিষ্ট্য :

(i) দেহ পালক দ্বারা আবৃত ছিল। এদের পালকের চিহ্ন তার জীবাশ্ম থেকে পাওয়া যায় নি বটে, তবে বাহু ও হাতে এমন কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাদের পালক ছিল।

(ii) অস্থি ছিল ফাঁপা, যা এদের উড়তে সাহায্য করত।

(iii) অগ্রপদটি ডানায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

(iv) এদের চঞ্চু ছিল তবে চঞ্চুতে দাঁত ছিল।

সুতরাং পাখির উৎপত্তি, তার বৈচিত্র্য, বিবর্তনজনিত সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে প্রোটোআভিস এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।]

বর্তমান পৃথিবীর বিশেষ কিছু কিছু উন্নততর প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের সঠিক প্রমাণ জীবাশ্ম বিজ্ঞান থেকে পাওয়া গেছে। এই প্রাণীগুলির মধ্যে ঘোড়া, হাতী, উট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখানে ঘোড়ার বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল (চিত্র 8.12)।

বিভিন্ন কালের পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে ঘোড়ার পূর্ব-পুরুষদের বহু জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। ঘোড়ার আদি পুরুষ **ইয়োহিপ্পাস** (*Eohippus*) আজ থেকে প্রায় 6 কোটি বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত, যাদের উচ্চতা ছিল 28 সেমি. (প্রায় 11 ইঞ্চি—অর্থাৎ একটি বিড়ালের উচ্চতার সমান)। এদের অগ্রপদে চারটি ও পশ্চাৎপদে তিনটি করে আঙ্গুল ছিল। ইয়োহিপ্পাসের পরে এসেছিল **মেসোহিপ্পাস** (*Mesohippus*), যাদের উচ্চতা ছিল 61 সেমি. (প্রায় 24 ইঞ্চি)।

এদের অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদে তিনটি করে আঙ্গুল ছিল এবং আঙ্গুলগুলি মাটি স্পর্শ করতো। পরবর্তীকালে মেরিচিপ্পাস (*Merichippus*) ও প্লিওহিপ্পাস (*Pliohippus*) নামক ঘোড়াদের আবির্ভাব ঘটেছিল, যাদের উচ্চতা ছিল যথাক্রমে 102 সেমি. (প্রায় 40 ইঞ্চি) ও 127 সেমি. (প্রায় 50 ইঞ্চি)। এদের অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদে

চিত্র 8.12 : ঘোড়ার বিবর্তন।
ডানদিকের সারিতে উচ্চতার ক্রমিক বৃদ্ধি এবং বামদিকের সারিতে অগ্রপদে ও পশ্চাৎপদে আঙ্গুলের সংখ্যায় ক্রমিক হ্রাস দেখানো হয়েছে।

তিনটি করে আঙ্গুল থাকলেও পাশের আঙ্গুল দুটি মাটি স্পর্শ করত না। পরবর্তীকালে বর্তমান কালের ঘোড়া ইকোয়াস (*Equus*)-এর উৎপত্তি হয়েছে, যার উচ্চতা 153 সেমি. (প্রায় 60 ইঞ্চি) এবং এর পাশের আঙ্গুলগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খুব ছোট হয়ে গেছে। এখান থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বিবর্তন ধীরে ধীরে

যুগের পর যুগ ধরে জীবের উপর কার্যকর হয় এবং বর্তমান যুগের জীবেরা পূর্বতন জীবের পরিবর্তিত ও বিবর্তিত রূপ।

জীবন্ত জীবাশ্ম (Living fossil) : কোন গোষ্ঠীর জীবের জীবাশ্মের মধ্যে অতীতকালে, অর্থাৎ যে যুগে জীবাশ্মটি গঠিত হয়েছিল সেই যুগে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জীবটির গঠন কি রকম ছিল তার যেমন আভাস পাওয়া যায়, তেমনই বর্তমান পৃথিবীতে এমন কতকগুলি জীবের অস্তিত্ব আছে যাদের মধ্যে কোন কোন জীবগোষ্ঠীর সুদূর অতীতের পূর্ব-পুরুষদের বৈশিষ্ট্যের আভাস মেলে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, **প্লাটিপাস** নামক প্রাণীটির থেকে আমরা স্তন্যপায়ীদের পূর্ব-পুরুষ সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাই। নিম্নস্তরের এই স্তন্যপায়ীটির মধ্যে একই সঙ্গে স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায়, এই ধরনের প্রাণীদের মধ্য দিয়েই সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব ঘটেছে। আবার, **পেরিপেটাস** (*Peripatus*) নামক অমেরুদণ্ডী প্রাণীটির মধ্যে অ্যানিলিডা ও আর্থ্রোপোডা এই দুটি পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদেরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এর থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, পেরিপেটাসের মত প্রাণীদের মধ্য দিয়েই অ্যানিলিডা পর্ব থেকে আর্থ্রোপোডা পর্বের উদ্ভব ঘটেছে। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ **নিটাম** (Gnetum)-এর জাইলেম কলায় গুপ্তবীজী উদ্ভিদদের মত ট্র্যাকীয়ার উপস্থিতি, তাছাড়াও তাদের মধ্যে আর্কিগোনিয়ামের অনুপস্থিতি থেকে বোঝা যায়, নিটামের মত কোন ব্যক্তবীজী শ্রেণীর উদ্ভিদ থেকে গুপ্তবীজী শ্রেণীর উদ্ভিদদের আবির্ভাব ঘটেছে। প্লাটিপাস, পেরিপেটাস, নিটাম ইত্যাদি প্রাণী ও উদ্ভিদকে বলা হয় 'জীবন্ত জীবাশ্ম'। **সুদূর অতীত যুগে উৎপন্ন যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় এখনও পৃথিবীর বুকে বিরাজ করছে, কিন্তু তাদের সমগোত্রীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীরা বহুকাল পূর্বেই পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়েছে, সেইসব উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বলা হয় জীবন্ত জীবাশ্ম।** জীবন্ত জীবাশ্মগুলি বিবর্তনের সপক্ষে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

8.3C. ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ (Embryological Evidences)

ডিমের ভিতর অথবা গর্ভের মধ্যে (স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে) অবস্থিত শিশু-প্রাণী এবং বীজের মধ্যে অবস্থিত শিশু-উদ্ভিদ **ভ্রূণ** (Embryo) নামে পরিচিত। নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির পদ্ধতি পর্যালোচনাকে বলা হয় **ভ্রূণতত্ত্ব** (Embryology)। বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ভ্রূণ সৃষ্টির ঘটনা পর্যালোচনা করলে জীব-বিবর্তনের সপক্ষে প্রমাণ মেলে।

মাছ থেকে শুরু করে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর (মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর) ভ্রূণের মধ্যে প্রথম দিকে এতই মিল থাকে যে, তাদের পরস্পরকে পৃথকভাবে চেনা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ ঐসব প্রাণীর সদ্য গঠিত ভ্রূণকে একসঙ্গে রেখে দিলে কোনটি মাছের, কোনটি সরীসৃপের বা স্তন্যপায়ীর তা আদৌ বোঝা যায় না। যতই দিন যায় ততই তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হতে থাকে এবং যথাসময়ে তারা নিজ নিজ আকৃতি লাভ করে (চিত্র 8.13)।

মাছেদের শ্বাসযন্ত্র ফুলকা, অপরপক্ষে উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের শ্বাসযন্ত্র ফুসফুস। শেষোক্ত শ্রেণীগুলির প্রাণীদের শ্বাসযন্ত্র ফুসফুস হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভ্রূণে, এমনকি মানুষের ভ্রূণেও, একসময়ে মাছেদের মত **ফুলকা ছিদ্রের** আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তীকালে সেগুলির অবলুপ্তি ঘটে। উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী,

চিত্র 8.13 ঃ বিভিন্ন প্রকার মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণের তুলনামূলক চিত্র।

স্তন্যপায়ী এমনকি মানুষের ভ্রূণেও **হৃৎপিণ্ডটি** প্রথম অবস্থায় মাছেদের হৃৎপিণ্ডের মত **দু প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট** হয়। পরবর্তীকালে উক্ত অঙ্গটি নিজ নিজ শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য লাভ করে। মানুষের ভ্রূণে একসময়ে অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর মত **লেজের** আবির্ভাব হয়, যদিও পরবর্তীকালে সেটির অবলুপ্তি ঘটে।

পরিণত দশায় প্রাণিদেহে যে সব অঙ্গের কোন অস্তিত্বই নেই, ভ্রূণের মধ্যে সেইসব অঙ্গের আবির্ভাবের কারণ কি ? এই প্রশ্নের একমাত্র সদুত্তর হচ্ছে, সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী একই পূর্ব-পুরুষ থেকে আবির্ভূত হয়েছে এবং সেই পূর্ব-পুরুষের পরিস্ফুরণ পদ্ধতি (developmental mechanisms) প্রত্যেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছে। প্রাণীরা যত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হয় তাদের ভ্রূণের মধ্যে মিল তত দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই মাছ ও স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণের তুলনায় পাখি ও স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণের মধ্যে মিল দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখা যায়। এইসব তথ্য জীব-বিবর্তন মতবাদকে সমর্থন করে।

এই ধরনের আরও অনেক নজির প্রাণিজগতে আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অ্যাসিডিয়া *(Ascidia)* নামক নিম্নশ্রেণীর কর্ডাটা প্রাণীতে পরিণত অবস্থায় নোটোকর্ড থাকে না, কিন্তু তাদের ভ্রূণদশায় কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের মত নোটোকর্ড দেখা যায়। অতএব, এদের ভ্রূণের গঠন পর্যালোচনার মাধ্যমে কর্ডাটা পর্বের সঙ্গে এদের আত্মীয়তা প্রমাণিত হয়। স্যাকুলিনা *(Sacculina)* নামক আর্থ্রোপোডা পর্বভুক্ত প্রাণীতে (যারা কাঁকড়ার দেহে পরজীবী হিসেবে বাস করে) পরিণত অবস্থায় এমন কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না, যা থেকে প্রাণিজগতে তাদের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়। কিন্তু তাদের ভ্রূণতত্ত্ব পর্যালোচনা করলে আর্থ্রোপোডা পর্বের 'ক্রাসটেসিয়া' শ্রেণীর সঙ্গে তাদের মিল দেখা যায়। এই তথ্য ক্রাসটেসিয়া শ্রেণীর সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা প্রমাণিত করে। সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণে **অ্যামনিয়ন, অ্যালানটয়েস, করিয়ন, ইয়ক-স্যাক** ইত্যাদি পর্দার উপস্থিতি, উক্ত তিন শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে আত্মীয়তা সূচিত করে।

['Ontogenesis' পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তার আলোচনা করা হল না।]

উদ্ভিদগোষ্ঠীর ভ্রূণতত্ত্ব পর্যালোচনা করলেও জীব-বিবর্তনের সপক্ষে প্রমাণ মেলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রায়োফাইটা গোষ্ঠীর উদ্ভিদ মসের ভ্রূণ **প্রোটোনেমার** সঙ্গে আদি শৈবালের (Algae) যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আবার, টেরিডোফাইটা গোষ্ঠীভুক্ত ফার্ণের হৃৎপিণ্ডাকৃতি সবুজ রঙের **প্রোথ্যালাসের** সঙ্গে ব্রায়োফাইটা গোষ্ঠীভুক্ত লিভারওয়ার্ট (Liverworts) জাতীয় উদ্ভিদদের থ্যালাসের অনেক মিল আছে। কয়েক প্রকার বাবলা-জাতীয় উদ্ভিদে *(Acacia sp.)* পরিণত অবস্থায় পত্রফলক (Leaf blade) দেখা যায় না, ঐসব ক্ষেত্রে পর্ণবৃন্তটি (Leaf stalk) পত্রফলকের মত চ্যাপ্টা ও সবুজ হয়। কিন্তু উক্ত বাবলা-জাতীয় উদ্ভিদগুলিতে শিশু অবস্থায় পত্রফলক দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় পত্রফলকযুক্ত পূর্ব-পুরুষ থেকে উক্ত উদ্ভিদগুলির আবির্ভাব ঘটেছে।

•8.3D. রক্ষাপ্রদ সাদৃশ্যঘটিত প্রমাণ (Evidence from Protective resemblance)

শতাব্দীর মধ্যে সংঘটিত প্রমাণ (Evidence from an incident within a century) ঃ শিল্প-বিপ্লবের আগে ইংলণ্ডে সাদা রঙের পেপার্ড মথ বিস্টন

• উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বেটুলোরিয়া *(Biston betularia)*-র সংখ্যা ছিল প্রচুর। এদের সাদা ডানায় কালো ছিট ছিট দাগ ছিল। মাঝে মাঝে এদের মধ্যে মিউটেশনজনিত কারণে কালো রঙের কিছু মথ সৃষ্টি হত, যারা অতি সহজেই তাদের প্রধান শত্রু পাখিদের চোখে ধরা পড়ত। ফলে কয়েকটি শিল্পাঞ্চল ছাড়া তাদের প্রায় দেখা যেত না। শিল্প-

চিত্র 8.14 A—বিস্টন বেটুলোরিয়া (সাদা) B—বিস্টন কার্বোনেরিয়া (কালো)।

বিপ্লবের পর শিল্পপ্রধান অঞ্চলের বিস্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে ধোঁয়া এবং কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। ফলে সাদা মথের পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হল এবং কালো মথের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় এদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হল। এই নতুন প্রজাতির নাম **বিস্টন কার্বোনেরিয়া** *(Biston carbonaria)* [চিত্র 8.14]।

8.4. অভিব্যক্তি বা বিবর্তনের বিভিন্ন মতবাদ (Theories of Organic Evolution)

বিবর্তন ঘটেছে এই কথা জানার পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, কি উপায়ে বিবর্তন ঘটেছে? বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী বিবর্তনের পদ্ধতি—অর্থাৎ কি উপায়ে বিবর্তন ঘটেছে, সে সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে ঐ সকল মতামত **বিবর্তনের মতবাদ** নামে পরিচিত।

A. ল্যামার্কের মতবাদ (Theory of Lamarck) : জাঁ ব্যাপটিস্ট দ্য ল্যামার্ক (Jean Baptiste de Lamarck, 1744-1829) ছিলেন একজন ফরাসীদেশীয় জীববিজ্ঞানী। তাঁর ছেলেবেলা খুব দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁকে ধর্মযাজক করার, কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁর আদৌ উৎসাহ ছিল না। তাই তিনি সেনাদলে যোগ দেন। পরে সেনাদল ত্যাগ করে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠগ্রহণ শুরু করেন। কিন্তু প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকার জন্য শীঘ্রই তিনি চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা ত্যাগ করে উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা শুরু করেন। পরে উদ্ভিদবিদ্যার চেয়েও প্রাণিবিদ্যার প্রতি তিনি বেশী আকৃষ্ট হন এবং উক্ত বিদ্যার চর্চা শুরু করেন। প্রাণিবিদ্যার চর্চাকালে জীব-বিবর্তন সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা তাঁর মনে দানা বাঁধতে থাকে। 1809 খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'Philosophic Zoologique' নামক পুস্তকে জীব-বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন।

ল্যামার্কের মতবাদ দুটি মূল সূত্রের (laws) উপর প্রতিষ্ঠিত। সূত্র-দুটি হচ্ছে—(1) অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র এবং (2) জীবনকালে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার-সূত্র।

(1) **অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র** (Law of use and disuse of organs) ঃ প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবে—অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার উদ্দেশ্যে, কোন কোন অঙ্গের বেশী মাত্রায় ব্যবহার ঘটে ; আবার, অপর কতকগুলি অঙ্গের ব্যবহার কমে যায়। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে নির্দিষ্ট অঙ্গ বা অঙ্গগুলি সবল ও সুগঠিত হয়। অপরপক্ষে, ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে অঙ্গগুলি দুর্বল ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কালক্রমে অবলুপ্ত হয়।

চিত্র 8.15 ঃ
জাঁ ব্যাপটিস্ট দ্য ল্যামার্ক।

(2) **জীবনকালে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার-সূত্র** (Law of Inheritance of acquired characters) ঃ কোন জীব তার জীবনকালে (পরিবেশের প্রভাবে) যে সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তা পরবর্তী প্রজন্মের জীবে সঞ্চারিত হয়।

এইভাবে প্রতি প্রজন্মে অর্জিত সামান্য মাত্রার পরিবর্তন পরবর্তী প্রজন্মে জমা হতে হতে কালক্রমে এটি একটি বড়-সড় পরিবর্তন হিসেবে দেখা দেয়। এইভাবে জীবের বিবর্তন ঘটে।

অতএব ল্যামার্কের মতবাদটি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ **ব্যবহার বা অব্যবহারের ফলে যে কোন জীবের নির্দিষ্ট অঙ্গের গঠনগত পরিবর্তন ঘটে। উক্ত পরিবর্তন এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়।**

ল্যামার্কের নিজের দেওয়া কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাঁর মতবাদটির ব্যাখ্যা করা হল।

(i) ল্যামার্কের মতে স্থলচর পাখি থেকে জলচর পাখিদের আবির্ভাব হয়েছে। কোন স্থলচর পাখি খাদ্যের খোঁজে জলে গেলে জল ঠেলে অগ্রসর হওয়ার জন্য তারা পায়ের আঙ্গুলগুলিকে অবশ্যই প্রসারিত করতো। তার ফলে আঙ্গুলের গোড়ার চামড়ায় টান পড়তো। এর পরিণতিতে জলচর পাখিদের পূর্ব-পুরুষে আঙ্গুলের গোড়ার চামড়া প্রতি প্রজন্মে সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে কালক্রমে লিপ্তপদের (webbed feet) সৃষ্টি হয়।

(ii) ল্যামার্কের মতে, হরিণজাতীয় প্রাণী থেকে জিরাফের আবির্ভাব ঘটে থাকতে পারে। জিরাফরা গাছের কচি পাতা ও ডাল খায়। গাছের উপর দিকের কচি পাতা ও ডাল পাবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালানোর ফলে জিরাফের পূর্ব-পুরুষদের গলা ও সামনের পা প্রতি প্রজন্মে একটু একটু করে লম্বা হয়েছে। এইভাবে বর্তমান কালের লম্বা গলা ও পা-বিশিষ্ট জিরাফের আবির্ভাব হয়েছে।

(iii) অব্যবহারের ফলে অঙ্গের অবলুপ্তির উদাহরণ হিসেবে ল্যামার্ক সাপের

দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। গর্ত ও ফাটলের মধ্যে চলার সময় সাপের পূর্ব-পুরুষরা পা-কে ব্যবহার না করার ফলে প্রতি প্রজন্মে এটি একটু একটু করে দুর্বল হয়ে অবশেষে সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে।

● **ল্যামার্কের মতবাদের সমর্থনে যুক্তি**ঃ কয়েকজন বিজ্ঞানী তাঁদের পরীক্ষার মাধ্যমে ল্যামার্কের মতবাদকে সমর্থন করেন। উক্ত পরীক্ষাগুলি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

1. **লাইসেনকোর পরীক্ষা** (Experiments of Lysenko)ঃ লাইসেনকো ছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হন। তিনি দাবি করেন, নিজ জীবনকালে অর্জিত এইসব বৈশিষ্ট্য তাঁর পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদেরা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছে। এই ঘটনা **লাইসেনকোবাদ** (Lysenkoism) নামে পরিচিত।

2. **ম্যাকডুগালের পরীক্ষা** (Experiments of Macdougall)ঃ ম্যাকডুগাল ইঁদুরদের শিক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত একটি পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার জন্য তিনি এমন একটি বাক্স ব্যবহার করেন যাতে দুটি নির্গমন পথ ছিল—একটি বড় এবং অপরটি ছোট। বড় পথটি ছিল আলোকিত এবং ছোট পথটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। বড় পথটি দিয়ে যাতায়াতের সময় ইঁদুরেরা মৃদুভাবে তড়িতাহত হত। ফলে অল্প কিছুকালের মধ্যেই ইঁদুরেরা বড় পথটি পরিত্যাগ করে ছোট পথটি দিয়ে যাতায়াতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ম্যাকডুগাল দাবি করেন, ইঁদুরদের জীবনকালে অর্জিত এই বৈশিষ্ট্য তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হতে তিনি দেখেছেন, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যটি বংশগতি লাভ করেছে।

3. **কামারের পরীক্ষা** (Experiments of Kammerer)ঃ কামারের লাল, নীল, হলুদ প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের বাক্সে স্যালামাণ্ডারদের (উভচর শ্রেণীর প্রাণী) পালন করেন এবং কিছুকাল পরে লক্ষ্য করেন, স্যালামাণ্ডারদের গায়ের রঙ বাক্সের রঙের মত হয়েছে। তিনি দাবি করেন, জীবনকালে অর্জিত এই বৈশিষ্ট্য তাঁর পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত স্যালামাণ্ডাররা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছে।

উক্ত পরীক্ষাগুলির সত্যতা যাচাই করার জন্য পরবর্তীকালে অনেক বিজ্ঞানী পরীক্ষাগুলির পুনরাবৃত্তি করেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই লাইসেনকো, ম্যাকডুগাল বা কামারের দাবির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

● **ল্যামার্কের মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি**ঃ নিচে বর্ণিত পরীক্ষাগুলি ল্যামার্কের মতবাদকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছে।

1. **ভাইসম্যানের পরীক্ষা** (Experiment of Weismann)ঃ জার্মান বিজ্ঞানী ভাইসম্যান সাদা ইঁদুরের উপর তাঁর পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, পরিবেশের প্রভাবজনিত কোন দৈহিক বৈশিষ্ট্য বংশগতি লাভ করে না। তিনি পর পর 20টি প্রজন্ম ধরে তাঁর পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ইঁদুরগুলির লেজ কেটে দেন এবং একবিংশতি (21st) প্রজন্মেও তিনি লেজবিহীন কোন ইঁদুর সৃষ্টি করতে সমর্থ হননি। এ থেকে

প্রমাণিত হয় যে দেহকোষের কোন পরিবর্তন (লেজবিহীন অবস্থা) বংশগতি লাভ করে না।

প্রকৃতপক্ষে, ভাইসম্যান তাঁর অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে **জার্মপ্লাজম তত্ত্বের** (Germ-plasm theory) প্রবর্তন করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক জীবের দেহ 'সোমাটোপ্লাজম' (দেহকোষ) ও 'জার্মপ্লাজম' (জননকোষ) দ্বারা গঠিত। যৌন জননে সক্ষম জীবে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে কেবলমাত্র জার্মপ্লাজম সঞ্চারিত হয়। সুতরাং, কেবলমাত্র জার্মপ্লাজমের মধ্যে কোন পরিবর্তনই বংশগতি লাভ করতে পারে। পরিবেশের প্রভাব সোমাটোপ্লাজমের মধ্যে যে পরিবর্তন আনে তা সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হতে পারে না। তাই লেজ কাটা ইঁদুর লেজবিহীন ইঁদুরের জন্ম দিতে পারে না।

2. **পেইনের পরীক্ষা** (Experiment of Payne) : ড্রসোফিলা নামক পতঙ্গের উপর পেইনের পরীক্ষা ল্যামার্কের 'অব্যবহারের সূত্রকে' সমর্থন করে না। পেইনের পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ড্রসোফিলাগুলি পর পর 69 প্রজন্ম ধরে অন্ধকারে থাকা সত্ত্বেও তাদের দৃষ্টিশক্তি আদৌ ব্যাহত হয়নি।

ল্যামার্কের মতবাদ সম্পর্কে বর্তমান ধারণা : বংশগতিবিদ্যা সম্পর্কে আধুনিকতম জ্ঞান ল্যামার্কের মতবাদকে সমর্থন করে না। বর্তমানে আমরা জানি, যে কোন দুটি প্রজন্মের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হচ্ছে জননকোষ। সুতরাং, কোন বৈশিষ্ট্যকে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হতে গেলে জননকোষের ক্রোমোসোমে অবস্থিত জীনের পরিবর্তনের মাধ্যমেই কেবল তা হতে পারে। এই জ্ঞানের ভিত্তিতে ল্যামার্কের মতবাদ সম্পর্কে বর্তমান ধারণাটি নিম্নরূপ :

(i) এককোষী জীব, অঙ্গজ জননে সক্ষম উদ্ভিদ ও অযৌন জননে সক্ষম প্রাণীতে (যাদের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশী নয়) ল্যামার্কের মতবাদ প্রযোজ্য হতে পারে।

(ii) কেবলমাত্র যৌন জননে সক্ষম জীবে (পৃথিবীর অধিকাংশ জীবই এই গোষ্ঠীভুক্ত) ল্যামার্কের মতবাদ প্রযোজ্য নয়।

জীবদেহের গঠনগত পরিবর্তন সম্পর্কে ল্যামার্কের তত্ত্ব (অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র) বেশ সরল ও আকর্ষণীয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা ভ্রান্ত। বংশগতি সম্পর্কে অধুনা লব্ধ জ্ঞান থেকে আমরা জানি যে, গ্রীবা বা অন্য কোন অঙ্গকে টেনে লম্বা করার চেষ্টা জননকোষের DNA-কে কোনভাবেই প্রভাবিত করে না, ফলে পরবর্তী প্রজন্মে কোন প্রকার পরিবর্তন আসতে পারে না।

B. ডারউইনের মতবাদ (Theory of Darwin) বা প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ (Theory of Natural Selection)

পশ্চাৎপট : চার্লস ডারউইন (Charles Darwin, 1809-1882) ছিলেন একজন ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী (চিত্র 8.16)। ইংরেজ ভূবিজ্ঞানী (Geologist) **চার্লস লিয়েল** (Charles Lyell)-এর 1830 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গবেষণাপত্র ডারউইনের কল্পনাপ্রবণ মনকে উজ্জীবিত করে। লিয়েল তাঁর গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছিলেন, বর্তমান কালের পৃথিবী অতীত যুগের পৃথিবীর এক পরিবর্তিত রূপ। পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, তটরেখা, সমতলভূমি,

মরুভূমি ইত্যাদির যুগ-যুগ ধরে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। লিয়েলের গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়, তাঁর সময়ে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে ধারণা ছিল, পৃথিবী তার চেয়ে অনেক প্রাচীন। লিয়েলের এই গবেষণাপত্র ডারউইনের কল্পনাপ্রবণ মনে নানা প্রশ্নের উদ্রেক করে। প্রশ্নগুলি ছিল এই রকমের: পৃথিবী যদি খুব প্রাচীন হয় তাহলে হাজার হাজার বছর আগে তার রূপ কিরকম ছিল? বর্তমানে পৃথিবীর বুকে যে সব জীব দেখা যায়, অতীতেও কি তারাই পৃথিবীর বুকে ছিল? অন্য আর কোন রকমের জীব সেখানে ছিল কি? এই রকমের অজস্র প্রশ্ন তাঁর মনে উঁকি দিতে থাকে।

চিত্র 8.16 : চার্লস ডারউইন।

1831 খ্রীষ্টাব্দে, ডারউইনের যখন 22 বছর বয়স, তখন 'এইচ্.এম্.এস্. বিগ্‌ল' (H.M.S. Beagle—চিত্র 8.17) নামে একটি জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা ও তার কাছে অবস্থিত গ্যালাপেগস দ্বীপপুঞ্জ ও সংলগ্ন অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঐসব জায়গায় যায়। ডারউইন প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে ঐ জাহাজে কাজ পান।

গ্যালাপেগস দ্বীপপুঞ্জের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেখে ডারউইন আশ্চর্য হয়ে যান। এই দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপের একই প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে তিনি যথেষ্ট ভেদ (Variation) বা পার্থক্য লক্ষ্য করেন। দ্বীপগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির (Subspecies) অনেক ফিঞ্চ (Finch) পাখি ছিল। প্রায় 600 মাইল দূরে অবস্থিত দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের ফিঞ্চ পাখিদের সঙ্গে এইসব ফিঞ্চ পাখির যথেষ্ট পার্থক্য তাঁর চোখে পড়ে। খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত প্রজাতিদের মধ্যেও চঞ্চুর আকার (Shape) ও দৈর্ঘ্যে যথেষ্ট তারতম্য ছিল (চিত্র 8.18) এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাদ্যে অভ্যস্ত ছিল। কতিপয় ছোট ছোট দ্বীপের একদল ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত প্রাণীর মধ্যে এই বৈসাদৃশ্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এই চিন্তায় ডারউইন মগ্ন হয়ে পড়েন।

1837 খ্রীষ্টাব্দে ডারউইন সমুদ্রে তথ্যানুসন্ধানের কাজ শেষ করে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। এর কিছুকাল পরে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ **ম্যালথাস** (T. R. Malthus)-এর লেখা একটি প্রবন্ধ তাঁর নজরে আসে। প্রবন্ধটির নাম, "An Eassy on the Principle of Population". ঐ প্রবন্ধে ম্যালথাস উল্লেখ করেন যে, মানুষের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তাদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় বহুগুণ বেশী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারের মধ্যে এই সম্পর্ক 'খাদ্যের জন্য সংগ্রাম' সৃষ্টি করতে পারে এবং তা থেকে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের নানা রকম তথ্যের সঙ্গে গৃহপালিত পায়রাদের মধ্যে নানা প্রকার পরিবৃত্তি বা ভেদ (Variations)-ও ডারউইনের মনকে নাড়া দেয়। সচরাচর

যে সব পায়রা আমরা দেখি তাদের থেকে পায়রা-পালকরা কয়েক শতাব্দী ব্যাপী সযত্ন প্রয়াসে বিভিন্ন অদ্ভুত আকৃতির পায়রা সৃষ্টি করতে সমর্থ হন।

চিত্র 8.17 : H. M. S. Beagle জাহাজ।

উপরিউক্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে ডারউইন বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর মতবাদটি রচনা করেন। এই মতবাদ **প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ** নামে পরিচিত। কেননা, এই মতবাদে প্রকৃতিকে নির্বাচন-কর্ত্রী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। পশুপালকেরা যেমন তাঁদের পশুপালের (herds) মধ্যে যে পশুগুলি সুগুণবিশিষ্ট সেইগুলিকে নির্বাচন করে সযত্নে লালন-পালন করেন এবং কেবলমাত্র তাদের বংশধর সৃষ্টি করার সুযোগ দিয়ে নিজ নিজ পশুপালকে ক্রমশ উন্নত করেন, প্রকৃতিও তেমনি কেবলমাত্র সুগুণবিশিষ্ট জীবগুলিকে বেঁচে থাকার এবং বংশধর সৃষ্টি করার সুযোগ দিয়ে উন্নত মানের নতুন ধরনের জীব সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

ল্যামার্কের মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় 50 বছর পরে 1859 খ্রীষ্টাব্দে ডারউইনের মতবাদ প্রকাশিত হয়।*

ডারউইনের মতবাদ কয়েকটি দৃষ্টিগ্রাহ্য সত্যের (Observable facts) উপর ভিত্তি করে রচিত। ঐ সত্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে তিনি কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। উক্ত সত্য ও সিদ্ধান্তগুলিকে পরপৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হল ঃ

* ডারউইনের লেখা "On the Origin of Species by means of Natural election" নামক গ্রন্থে মতবাদটি প্রকাশিত হয়।

(1) মাত্রাতীত জন্মহার (Prodigality of production) : প্রথম সত্য, হচ্ছে, প্রতি প্রজাতির জীবের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে বংশধর সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়।

চিত্র 8.18 : গ্যালাপেগস দ্বীপপুঞ্জের ফিঞ্চ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি স্ত্রী-ঝিনুক (Female Oyster) একসঙ্গে গড়ে 16 কোটি ডিম পাড়ে। প্রতিটি ডিম থেকে উৎপন্ন ঝিনুক বেঁচে থাকলে এবং তারা ঐ

হারে বংশধর সৃষ্টি করলে একটি মাত্র স্ত্রী-ঝিনুক থেকে পঞ্চম প্রজন্মে যত ঝিনুক উৎপন্ন হবে তাদের খোলকের পরিমাণ দাঁড়াবে পৃথিবীর আকারের প্রায় আট গুণ। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ঘটনা ঘটে না।

(2) **যে কোন প্রজাতির জীব-সংখ্যা মোটামুটি ধ্রুবক** (Population of a given species is more or less constant): দ্বিতীয় সত্য হচ্ছে, কোন প্রজাতির জন্মহারের সঙ্গে তার জীব-সংখ্যা (population) বৃদ্ধির সঙ্গতি নেই—অর্থাৎ, জন্মহার অধিক হওয়া সত্ত্বেও যে কোন প্রজাতির জীব-সংখ্যা মোটামুটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে থাকে।

(3) **বাঁচার জন্য সংগ্রাম** (Struggle for existence): উপরিউক্ত দুটি সত্যের উপর ভিত্তি করে ডারউইন সিদ্ধান্ত করেন, প্রকৃতির বুকে বেঁচে থাকার জন্য জীবদের পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় (**প্রথম সিদ্ধান্ত**)। একে তিনি বাঁচার জন্য সংগ্রাম বা জীবন সংগ্রাম বলে আখ্যা দেন।

উক্ত সংগ্রাম তিন রকমের:

(a) **সমপ্রজাতির মধ্যে সংগ্রাম** (Intraspecific struggle): পৃথিবীতে খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত হওয়ার ফলে একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত জীবদের মধ্যে প্রতিনিয়ত খাদ্য ও বাসস্থান লাভের জন্য প্রতিযোগিতা চলে। জঙ্গলে বড়-বড় গাছের নিচে অনেক চারাগাছ জন্মায়, কিন্তু প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি চারা বড় গাছে পরিণত হতে পারে।

(b) **অসমপ্রজাতির মধ্যে সংগ্রাম** (Interspecific struggle): দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যেও বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম চলে। ব্যাঙকে সাপের সঙ্গে, ইঁদুরকে বিড়ালের সঙ্গে, হরিণকে বাঘের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়।

(c) **পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম** (Environmental struggle): বেঁচে থাকার জন্য ভৌত পরিবেশের (যথা—খরা, বন্যা, শৈত্য ইত্যাদির) বিরুদ্ধেও জীবদের সংগ্রাম করতে হয়।

মানবজাতির মধ্যেও এই তিন প্রকার সংগ্রাম দেখা যায়। যুদ্ধকে 'সমপ্রজাতির মধ্যে সংগ্রাম' রূপে, বিভিন্ন জীব থেকে উৎপন্ন ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে 'অসমপ্রজাতির মধ্যে সংগ্রাম' এবং খরা, বন্যা ইত্যাদিজনিত দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে 'পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম' রূপে উল্লেখ করা যায়।

(4) **পরিবৃত্তি** বা **প্রকারণ** বা **ভেদ** (Variations): ডারউইনের তৃতীয় সত্য হচ্ছে, 'পরিবৃত্তি' বা 'প্রকারণ' বা 'ভেদ'। একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জীব হুবহু একই রকম নয়। তাদের মধ্যে নানারকম পার্থক্য দেখা যায়। একই পিতা-মাতার সন্তান-সন্ততির মধ্যেও এইরূপ পার্থক্য চোখে পড়ে। আকৃতি ও আচরণগত এইসব পার্থক্যকে বলা হয় **পরিবৃত্তি**। কোন কোন পরিবৃত্তি জীবকে তার বেঁচে থাকার সংগ্রামে বা 'জীবন-সংগ্রামে' সাহায্য করে। এইরূপ পরিবৃত্তিকে অনুকূল বা সুবিধাজনক (favourable) পরিবৃত্তি বলা হয়। আবার কোন কোন পরিবৃত্তি জীবকে 'জীবন-সংগ্রামে' জয়ী হতে সাহায্য করে না। একে প্রতিকূল বা অসুবিধাজনক (unfavourable) পরিবৃত্তি বলে।

(5) **যোগ্যতমের জয়** (Survival of the fittest)ঃ ডারউইন তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত ও তৃতীয় সত্য থেকে **দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে** পেঁছান। এই সিদ্ধান্তটি হচ্ছে, যোগ্যতমের জয়—অর্থাৎ যে সব জীবের মধ্যে অনুকূল পরিবৃত্তি থাকে তারা জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয় এবং পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকে। যাদের মধ্যে অনুকূল পরিবৃত্তি থাকে না, অর্থাৎ প্রতিকূল ভেদযুক্ত জীবেরা জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং ধীরে ধীরে এ পৃথিবী থেকে চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

(6) **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Natural Selection)ঃ প্রকৃতির বুকে অনুষ্ঠিত সংগ্রামের মাধ্যমে যোগ্যতমের জয়কে ডারউইন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' আখ্যা দেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনে যারা বাঁচার অধিকার পায় তাদের বংশধরেরা উত্তরাধিকার-সূত্রে অনুকূল পরিবৃত্তিগুলি লাভ করে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অর্থাৎ হাজার হাজার বছর ধরে, যদি কোন প্রজাতির মধ্যে কেবল যোগ্যতমরাই বাঁচার অধিকার লাভ করে এবং বাকীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে কালচক্রে প্রজাতির পরিবর্তন ঘটে সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির জীবের আবির্ভাব ঘটে।

ডারউইনের মতবাদের সারাংশ নিচে দেওয়া হল ঃ

সত্য	সিদ্ধান্ত
(1) মাত্রাতীত জন্মহার। (2) যে কোন প্রজাতির জীব-সংখ্যা মোটামুটি ধ্রুবক।	(a) বাঁচার জন্য সংগ্রাম।
(3) বাঁচার জন্য সংগ্রাম। (4) পরিবৃত্তি বা ভেদ।	(b) যোগ্যতমের জয়।
(5) যোগ্যতমের জয়। (6) প্রাকৃতিক নির্বাচন।	(c) নতুন প্রজাতির উদ্ভব।

● **যোগ্যতমের মাপকাঠি** (Measure of fitness)ঃ ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ' সম্পর্কে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। 'যোগ্যতমের জয়' সিদ্ধান্তে 'যোগ্যতা' বলতে অনেকেই ধারণা করেছিলেন, পশুসুলভ হানাহানি ও রসদের কাড়াকাড়ির মাধ্যমে যোগ্যতা নিরূপণ। জীবজগতে এইভাবে যোগ্যতা নিরূপণের ঘটনা খুব বেশী নয়। জীবজগতে যোগ্যতার পরিমাপ সাধারণত করা হয়ে থাকে, পরিণত (mature) সন্তান-সন্ততি সৃষ্টির মাপকাঠিতে। অর্থাৎ, যে নির্দিষ্ট প্রাণীটি বা উদ্ভিদটি সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় পরিণত সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করতে পারে সে-ই হচ্ছে 'যোগ্যতম'। এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের জীন ভান্ডারে (gene pool) যে জীবের জেনেটিক অবদান যত বেশী, সেই জীব তত যোগ্য। এই যোগ্যতা নিরূপণে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি ক্রিয়াশীল ঃ

1. **উদ্বর্তন** (Survival)ঃ যে কোন জীবের ক্ষেত্রে যতদিন পর্যন্ত জননক্ষমতা থাকে ততদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যোগ্যতা। সুগুণ সম্পন্ন

কোন জীব যদি বংশবিস্তারের সুযোগ লাভের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে উক্ত সুগুণের কোন মূল্যই থাকে না। যদি কোন বৈশিষ্ট্য কোন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত একটি জীবের, জননক্ষমতার শেষ হওয়া পর্যন্ত তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করে, তাহলে সেই বৈশিষ্ট্যটি নির্দিষ্ট জীবটিকে প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য জীবের তুলনায় অধিকতর যোগ্যতা দান করে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকেই বলা হয় **অভিযোজন** (Adaptations)। এই বৈশিষ্ট্যগুলি গঠনগত, শারীরবৃত্তীয়, আচরণগত অথবা উক্ত সব রকমেরই হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের পর শহরগুলির শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে **বিস্টন বেটুলেরিয়া** (*Biston betularia*) মথের সম্পূর্ণ কালো রঙের গোষ্ঠীর (*B. carbonaria*) আবির্ভাব, উক্ত মথগুলির গঠনগত অভিযোজনের ফলেই সম্ভব হয়।

2. লৈঙ্গিক নির্বাচন (Sexual selection)**ঃ** যোগ্যতা যে সব কারণের (Factors) দ্বারা প্রভাবিত হয় 'লৈঙ্গিক নির্বাচন' তার মধ্যে একটি। এ ব্যাপারে একটি পরীক্ষা করার সময় লাল চক্ষু স্ত্রী, লাল চক্ষু পুরুষ, সাদা চক্ষু স্ত্রী ও সাদা চক্ষু পুরুষ ড্রসোফিলাকে সমান সংখ্যায় একটি পোষক মাধ্যমে (Culture medium) রাখা হয়। যদিও এটি একটি পরীক্ষিত সত্য যে, লাল চক্ষু ও সাদা চক্ষু ড্রসোফিলাদের আয়ু ও স্বাস্থ্যে (Health) কোন তারতম্য নেই, তবু আলোচ্য পরীক্ষায় 25 প্রজন্ম পরে পোষক মাধ্যমে একটিও সাদা চক্ষু ড্রসোফিলার অস্তিত্ব ছিল না। আলোচ্য পরীক্ষার সময় জানা যায়, শুধু লাল চক্ষু স্ত্রীরাই নয়, সাদা চক্ষু স্ত্রীরাও লাল চক্ষু পুরুষদের জনন কাজের সঙ্গী হিসেবে পছন্দ করে। এই লৈঙ্গিক নির্বাচনের জন্যই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তুলনামূলকভাবে কম যোগ্যতা সম্পন্ন (Less fit) ড্রসোফিলাদের (সাদা চক্ষু ড্রসোফিলাদের) অবলুপ্তি ঘটে।

● **প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের সমালোচনা ঃ** ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ সাড়া জাগায়। তৎকালীন বহু বিজ্ঞানীই এই তত্ত্বকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নেন। কিন্তু পরবর্তী কালে এর বহু ত্রুটি ধরা পড়ে। উল্লেখযোগ্য ত্রুটিগুলি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

(i) ডারউইন প্রকারণ বা পরিবৃত্তির কিভাবে উৎপত্তি ঘটে, সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি।

(ii) অনুকূল পরিবৃত্তিগুলি কিভাবে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়, সে সম্পর্কে তিনি উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি।

(iii) ডারউইন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবৃত্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু নতুন প্রজাতি উদ্ভবের ব্যাপারে উক্ত পরিবৃত্তিগুলির বিশেষ কোন ভূমিকা নেই।

(iv) প্রাকৃতিক নির্বাচন একমুখী (unidirectional)। পরিবৃত্তির একমুখী নির্বাচনের দ্বারা প্রাণী বা উদ্ভিদ অতি-বিশেষিত (over specialized) হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এলক হরিণের (Elk deer) শিং ও স্যাবার টুথ বাঘের (Sabre

tooth tiger) দাঁত অতি-বিশেষিত হওয়ার ফলে খুব জটিল হয়ে পড়ে—এর পরিণতিতে উক্ত প্রাণীগুলির অবলুপ্তি ঘটে।

(v) পরজীবী প্রাণীদের অনেক অঙ্গ সুগঠিত হয় না। প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব এই ঘটনার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

ডারউইনের মতবাদের সমালোচনা করার সময় অনেকেই বলেন, অনুকূল পরিবৃত্তিগুলি (Variations) কিভাবে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় অথবা কিভাবে ঐ পরিবৃত্তিগুলির আবির্ভাব হয় সে সম্পর্কে ডারউইন উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। এই ধরনের সমালোচনা আদৌ শোভন নয়। কেননা, ডারউইনের সময়ে বংশগতিবিদ্যা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব প্রকাশেরও প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরে, মেণ্ডেলের গবেষণা কাজের পুনরাবিষ্কারের মাধ্যমে, বংশগতি সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণার সৃষ্টি হয়। তারও পরে, বংশগতিবিদ্যার আরও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, আমরা জানতে পেরেছি যে কোন প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীব-বিবর্তন ঘটে। আবার, যে কোন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে জিনোটাইপ ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার (interactions) মাধ্যমে। অতএব, বিবর্তনের মূলে আছে জীববিশেষের জিনোটাইপের পরিবর্তন।

কোষবিজ্ঞান ও বংশগতি বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে কিছুটা সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সংশোধনের মাধ্যমে আলোচ্য তত্ত্বের দুর্বলতাগুলিকে দূর করা হয়। এই সংশোধিত প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব **নয়া-ডারউইনবাদ** (Neo-Darwinism) বা **সংশ্লেষণবাদ** (Synthetic theory) নামে পরিচিত। যে সব বিজ্ঞানীর গবেষণার মাধ্যমে নয়া-ডারউইনবাদের জন্ম হয় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন—**ডব্‌ঝান্‌স্কি** (Dobzhansky), **গোল্ডস্মিড** (Goldschmidt), **ফিশার** (Fisher), **হ্যালডেন** (Haldane), **সিম্পসন** (Simpson)।

নিচে জনন, পরিব্যক্তি (Mutation) এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে সম্পর্ক ছকের মাধ্যমে দেখানো হল ঃ

জীবন—জীনের সংগ্রহ, জিনোটাইপ গঠনকারী

↓

জনন

↓

বিশ্বস্তভাবে জনিত্রী জিনোটাইপকে নকল করে	জনিত্রী জিনোটাইপকে নকল করার সময় সামান্য পরিবর্তন ঘটে (পরিব্যক্তি)
	↓
	অভিব্যক্তি জনিত সুযোগ দেখা যায়
	↓
	প্রাকৃতিক নির্বাচনে কাজ করে
	↓
	আরো অধিক অভিব্যক্তির সুযোগ আসে

প্রাকৃতিক নির্বাচনে পরিব্যক্তি কাঁচা মালের (**Raw materials**) কাজ করে। পরিব্যক্তি ব্যতীত অভিব্যক্তি একেবারেই অসম্ভব, কারণ পরিব্যক্তি জিনোটাইপের

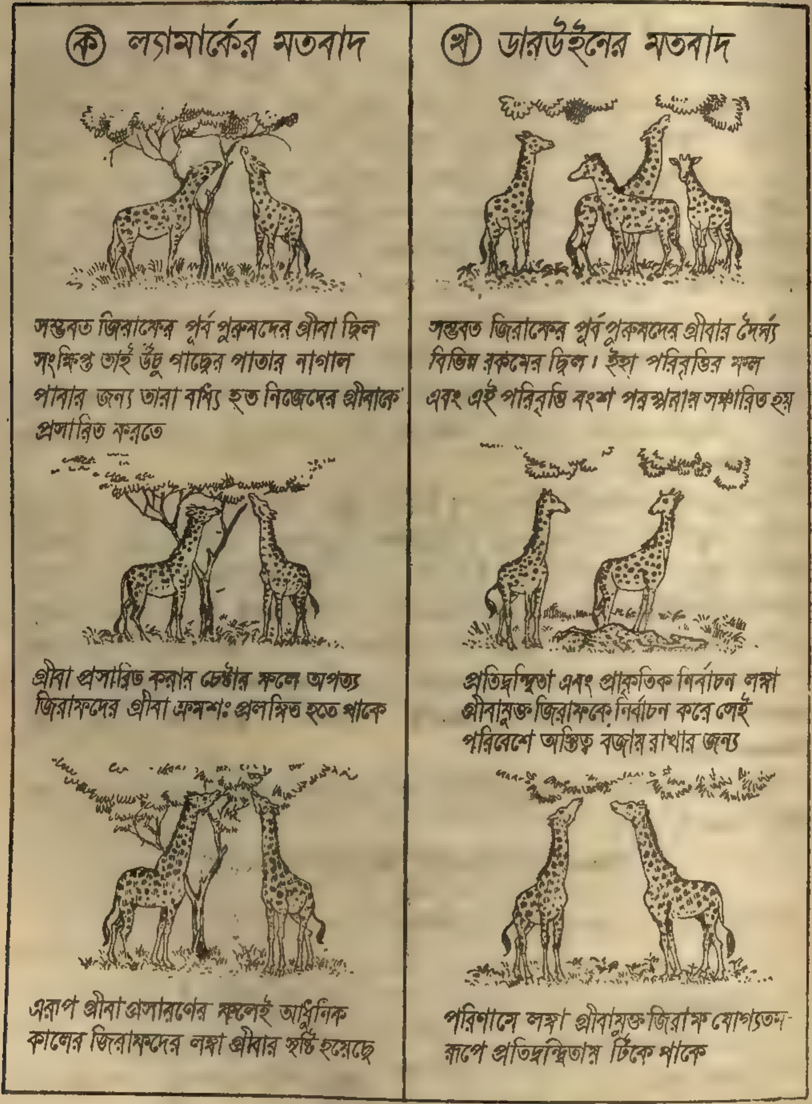

চিত্র 8.19 ঃ চিত্রের মাধ্যমে লম্বা গ্রীবা জিরাফের আবির্ভাব সম্পর্কে ল্যামার্ক ও ডারউইনের ধারণার প্রকাশ।

মধ্যে অভিনবত্ব এনে দেয়। নতুন গঠনগত বিন্যাসে অভিনবত্ব অভিব্যক্তি ব্যতীত অসম্ভব। পরিব্যক্তি হঠাৎ ঘটে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন যোগ্যতমদের স্থান করে দেয়।

লম্বা গ্রীবা জিরাফের আবির্ভাব সম্পর্কে ল্যামার্ক ও ডারউইনের মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা ঃ

ল্যামার্কের মতবাদ	ডারউইনের মতবাদ
1. জিরাফের পূর্ব-পুরুষদের গ্রীবা ছিল হ্রস্ব। গাছের উপর দিকের কচি পাতা ও ডাল পাওয়ার জন্য তারা ক্রমাগত গ্রীবাকে উপর দিকে বাড়ানোর চেষ্টা করতো। এর ফলে গ্রীবায় টান পড়ে তার দৈর্ঘ্য হয়তো কিছুটা বৃদ্ধি পায় (চিত্র 8.19)।	1. জিরাফের পূর্ব-পুরুষদের গ্রীবার দৈর্ঘ্য নানা রকমের ছিল। এই পরিবৃত্তিগুলি (Variations) ছিল উত্তরাধিকারযোগ্য।
2. পূর্ববর্তী প্রজন্মের দীর্ঘ গ্রীবা-বিশিষ্ট এইসব জিরাফের সন্তান-সন্ততি জন্ম থেকেই দীর্ঘ গ্রীবা-বিশিষ্ট হয়। তারাও একইভাবে গ্রীবাকে উপরদিকে বাড়ানোর চেষ্টা করার ফলে তা আরও দীর্ঘ হয়।	2. প্রতিযোগিতা ও প্রাকৃতিক নির্বাচন দীর্ঘ গ্রীবাবিশিষ্ট জিরাফগুলিকে অস্তিত্ব রক্ষার সুযোগ দেয়।
3. প্রজন্মের পর প্রজন্মের এইরূপ অবিরত চেষ্টায় দীর্ঘ গ্রীবাবিশিষ্ট জিরাফের আবির্ভাব ঘটে।	3. এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রতিযোগিতা ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে কালক্রমে দীর্ঘ গ্রীবাবিশিষ্ট জিরাফের আবির্ভাব ঘটে।

C. **দ্য ভ্রিসের মতবাদ** (Theory of de Vries) **বা পরিব্যক্তিবাদ** (Mutation theory) ঃ হুগো দ্য ভ্রিস (Hugo de Vries) ছিলেন একজন ওলন্দাজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী (চিত্র 8.20)। তিনি জীব-বিবর্তনের কারণ হিসেবে 1901 খ্রীষ্টাব্দে **পরিব্যক্তিবাদ** বা **মিউটেশন মতবাদের** প্রবর্তন করেন।

দ্য ভ্রিস ইভ্নিং প্রিমরোজ (Evening primrose : *Oenothera lamarckiana*) নামক উদ্ভিদকে নিয়ে বংশগতি সংক্রান্ত নানাপ্রকার গবেষণা করেন। এই গবেষণা কাজে ব্যাপৃত থাকার সময় তিনি লক্ষ্য করেন, অধিকাংশ বীজ থেকে পূর্ববর্তী প্রজন্মের মত উদ্ভিদ সৃষ্টি হলেও কতিপয় বীজ থেকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ধরনের উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটছে এবং উক্ত পরিবর্তনগুলি খুবই বিরাট ধরনের—যেমন, দ্বিগুণ মাপের ফুল, সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙের কান্ড, সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের (shape)

পাতা ইত্যাদি। তিনি আরও লক্ষ্য করেন, উক্ত নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি বংশ-পরম্পরায় প্রবাহিত হচ্ছে। দ্য ভ্রিস এই বিরাট পরিবর্তনের নাম দেন মিউটেশন (Mutation) বা **সলটেশান** (Saltation)। ইভ্‌নিং প্রিমরোজ উদ্ভিদে উক্ত মিউটেশনের ঘটনা থেকে দ্য ভ্রিস জীব-বিবর্তনে মিউটেশন মতবাদের প্রবর্তন করেন। এই মতবাদের মূল কথা—(i) বৃহৎ পরিবর্তন বা মিউটেশনের মাধ্যমে উদ্ভিদ বা প্রাণীদের মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়। (ii) উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বংশ-পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করে।

ডারউইনের মতে ক্রমিক (continuous) স্বল্প-মাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু দ্য ভ্রিসের মতে আকস্মিক বিরাট পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

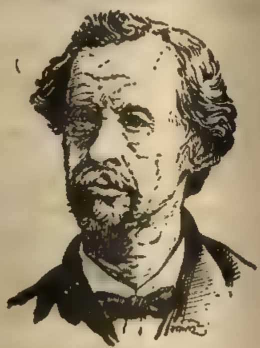

চিত্র 8.20 : হুগো দ্য ভ্রিস।

***D. বিবর্তনের মিশ্রতত্ত্ব বা সিন্থেটিক থিওরি** (Synthetic Theory) : আধুনিক যুগে দেখা যাচ্ছে যে কোষ ও জীনের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। ডারউইনের মতবাদকে সমর্থন করে ডবঝান্‌স্কি (Dobzhansky) কোষ ও জীনতত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা করেন। সেই গবেষণার ফলাফলের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে বলে **বিবর্তনের মিশ্রতত্ত্ব**।

বিজ্ঞানী **স্টেবিন্স** (Stebbins, 1974)-এর মতে বিবর্তনের মূল কারণগুলি হল নিম্নরূপ :

(a) জীন পরিব্যক্তি (Gene Mutation) অর্থাৎ বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক জীনের আকস্মিক স্থায়ী পরিবর্তন,

(b) ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা এবং তার আকৃতির রূপান্তর ঘটা,

(c) বংশগতির (Heredity) উপাদানের বিভিন্ন সংযোগ হওয়া,

(d) প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) এবং

(e) সর্বশেষ জনন-সংক্রান্ত স্বাতন্ত্র্য বজায়।

স্টেবিন্সের মতে উপরিউক্ত প্রথম তিনটি বিষয় জীনের প্রকারণ ঘটাতে (Variation) এবং শেষের দুটি বিবর্তন পদ্ধতির নির্দেশকরূপে কাজ করতে পারে।

বিষয়-সংক্ষেপ

1. যে প্রক্রিয়ায় অনুন্নত ও সরল আকৃতির পূর্ব-পুরুষ বা উদ্‌বংশীয় জীবগোষ্ঠী থেকে নানা প্রকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতি মন্থর গতিতে জটিল দেহযন্ত্র-বিশিষ্ট উন্নত জীবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, তাকে বলা হয় **জীব-বিবর্তন** (বা জীব-অভিব্যক্তি)।

2. বয়সের ভিত্তিতে পাললিক শিলার এক-একটি স্তরকে এক-একটি ভূ-তত্ত্বীয় পর্যায় (Geological period) রূপে চিহ্নিত করা হয়। উক্ত এক-একটি পর্যায়

* উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

কয়েকটি উপপর্যায়ে (Epoch) বিভক্ত। আবার কয়েকটি ভূ-তত্ত্বীয় পর্যায়কে নিয়ে এক-একটি ভূ-তত্ত্বীয় যুগ (Geological era)।

3. ভূ-তত্ত্বীয় বিভিন্ন যুগ, পর্যায় ও উপপর্যায়ের শিলাস্তরে পাওয়া জীবাশ্ম থেকে বোঝা যায় যে, সরল আকৃতির জীবগোষ্ঠী থেকে ধীরে-ধীরে উন্নত ও জটিল দেহবিশিষ্ট জীবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে।
4. পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে পুরাকালের কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের অথবা দেহাংশের শিলীভূত রূপকে, অথবা তাদের অস্তিত্বের নিদর্শক কোন চিহ্নকে **জীবাশ্ম** বলে।
5. জীবাশ্ম থেকে জানা যায়, 'ক্যামব্রিয়ান' পর্যায়ের গোড়ার দিকে, অর্থাৎ আনুমানিক 50 কোটি বছর আগে, অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের অস্তিত্ব ছিল।
6. চোয়ালবিহীন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটে 'অর্ডোভিসিয়ান' পর্যায়ে অর্থাৎ আনুমানিক 42·5 কোটি বছর আগে।
7. চোয়ালযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীরূপে মাছেদের আবির্ভাব ঘটে 'সিলুরিয়ান' পর্যায়ে অর্থাৎ 36 কোটি বছর আগে।
8. সিলুরিয়ান এবং তৎপরবর্তী ডেভোনিয়ান পর্যায়ে প্রাণিরাজ্যে মাছেদের প্রাধান্য দেখা যেতো বলে ঐ সময়কে **মৎস্য যুগ** বলা হয়।
9. সিলুরিয়ান পর্যায়েই প্রথম স্থলচর উদ্ভিদ ও প্রাণীদের (যথা—কাঁকড়া বিছা, পতঙ্গ ইত্যাদির) আবির্ভাব ঘটে।
10. ফার্ণ ও অন্যান্য টেরিডোফাইটা জাতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তি হয় ডেভোনিয়ান পর্যায়ে।
11. উভচর প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটে ডেভোনিয়ান পর্যায়ের শেষ দিকে অর্থাৎ প্রায় 32·5 কোটি বছর আগে।
12. কার্বনিফেরাস পর্যায়ে, অর্থাৎ আনুমানিক 28 কোটি—23 কোটি বছর আগে পর্যন্ত, উদ্ভিদরাজ্যে টেরিডোফাইটাদের প্রাধান্য দেখা যেতো—তাই উক্ত পর্যায়কে 'টেরিডোফাইটাদের যুগ' বলা হয়।
13. কার্বনিফেরাস পর্যায়ে পৃথিবীতে কয়লার ভাণ্ডার গড়ে ওঠার জন্য ঐ পর্যায়ের অপর নাম **অঙ্গার যুগ**।
14. ব্যক্তবীজী উদ্ভিদদের এবং সরীসৃপদের আবির্ভাব ঘটে কার্বনিফেরাস পর্যায়ের শেষ দিকে।
15. মেসোজোয়িক যুগে (আনুমানিক 20·5 কোটি—13·5 কোটি বছর আগে) প্রাণিরাজ্যে সরীসৃপদের আধিপত্য দেখা যেতো—তাই ঐ যুগকে **সরীসৃপদের যুগ** বলা হয়।
16. পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের এবং গুপ্তবীজী উদ্ভিদদের আবির্ভাব ঘটে মেসোজোয়িক যুগে।
17. মায়োসীন উপপর্যায়ে, অর্থাৎ আনুমানিক 3 কোটি বছর আগে, মানবরূপী বানরদের বা বনমানুষদের আবির্ভাব ঘটে।
18. আদিম মানুষের উৎপত্তি হয় প্লায়োসীন উপপর্যায়ে, অর্থাৎ আনুমানিক 1 কোটি বছর আগে।
19. জীব বিবর্তনের সপক্ষে যেসব প্রমাণ আছে সেগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রেণীগুলি হচ্ছে—(i) অঙ্গসংস্থানঘটিত প্রমাণ—এই শ্রেণীর প্রমাণগুলি কয়েক রকমের হতে পারে, যথা—(a) সমসংস্থ

অঙ্গঘটিত প্রমাণ, (b) তুলনামূলক শারীরস্থানঘটিত প্রমাণ, (c) লুপ্তপ্রায় অঙ্গঘটিত প্রমাণ ও (d) সংযোগকারী যোগসূত্রঘটিত প্রমাণ ; (ii) প্রত্নজীববিদ্যাঘটিত প্রমাণ, (iii) ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ ইত্যাদি।

20. জীবদেহের যেসব অঙ্গের উৎপত্তিস্থল এক এবং গঠন-কাঠামোয় যথেষ্ট মিল দেখা যায়, সেইসব অঙ্গকে **সমসংস্থ অঙ্গ** বলে। উদাঃ সরীসৃপদের অগ্রপদ, মানুষের হাত, তিমির ফ্লিপার, পাখি ও বাদুড়ের ডানা।

21. জীবদেহের যেসব অঙ্গ একই রকমের কাজ করে, কিন্তু উৎপত্তিস্থল ও গঠন-কাঠামো এক নয়, তাদের **সমবৃত্তীয় অঙ্গ** বলে। উদাঃ পাখির ডানা ও পতঙ্গের ডানা।

22. বিভিন্ন জীবের দেহে এমন কতকগুলি অঙ্গ থাকে যেগুলি আকারে খুব ছোট এবং নিষ্ক্রিয়, অথচ ঐ অঙ্গগুলিই অন্যান্য কতিপয় জীবের দেহে আকারে বেশ বড় এবং সক্রিয় অবস্থায় দেখা যায়। প্রথমোক্ত জীবদের ক্ষেত্রে অঙ্গগুলিকে **লুপ্তপ্রায়** বা **ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গ** বলে। উদাঃ মানুষের অ্যাপেন্ডিক্স, কক্সিক্স বা ত্রিকাস্থি, নিক্‌টিটেটিং মেমব্রেন ইত্যাদি।

23. যেসব জীবের দেহে দুটি ভিন্ন জীবগোষ্ঠীর কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাদের **সংযোগকারী যোগসূত্র** বা **অন্তর্বর্তী জীব** বলে। উদাঃ প্লাটিপাস (সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীদের অন্তর্বর্তী জীব), আর্কিওপটেরিক্স (সরীসৃপ ও পক্ষীদের অন্তর্বর্তী জীব) ইত্যাদি।

24. সুদূর অতীত যুগে উৎপন্ন যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় এখনও পৃথিবীর বুকে বিরাজ করছে, কিন্তু তাদের সমগোত্রীয় উদ্ভিদ বা প্রাণীরা বহুকাল আগেই পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়েছে, সেইসব উদ্ভিদ ও প্রাণীকে **জীবন্ত জীবাশ্ম** বলে। উদাঃ নিটাম উদ্ভিদ, প্লাটিপাস, পেরিপেটাস প্রভৃতি প্রাণী।

25. অভিব্যক্তি সম্পর্কে ল্যামার্কের মতবাদ দুটি মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত—(i) অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র এবং (ii) জীবনকালে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার-সূত্র।

26. অভিব্যক্তি সম্পর্কে ডারউইনের মতবাদ 'প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব' নামে পরিচিত।

27. প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব কয়েকটি দৃষ্টিগ্রাহ্য সত্য এবং সেগুলি থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রচিত। উক্ত সত্য ও সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপঃ

সত্য	সিদ্ধান্ত
(i) মাত্রাতীত জন্মহার। (ii) যে কোন প্রজাতির জীব-সংখ্যা মোটামুটি ধ্রুবক।	(a) বাঁচার জন্য সংগ্রাম।
(iii) বাঁচার জন্য সংগ্রাম। (iv) পরিবৃত্তি বা ভেদ।	(b) যোগ্যতমের জয়।
(v) যোগ্যতমের জয়। (vi) প্রাকৃতিক নির্বাচন।	(c) নতুন প্রজাতির উদ্ভব।

28. অভিব্যক্তি সম্পর্কে দ্য ভ্রিস-এর মতবাদ 'পরিব্যক্তিবাদ' নামে পরিচিত।

অনুশীলনী

A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Eassy type questions) ঃ

1. জৈব অভিব্যক্তিবাদের সমর্থনে অঙ্গসংস্থানের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উঃ 534—540 পৃঃ দেখ]
2. জৈব অভিব্যক্তির সপক্ষে ভ্রূণতত্ত্বভিত্তিক প্রমাণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উঃ 546—548 পৃঃ দেখ]
3. জৈব অভিব্যক্তি বলতে কি বোঝ ? ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ কিভাবে জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে বুঝিয়ে দাও। [উঃ 528 ও 546—548 পৃঃ দেখ]
4. প্রত্নজীববিদ্যা থেকে জৈব অভিব্যক্তির সপক্ষে প্রমাণ দাও। অভিব্যক্তির সাক্ষ্য হিসেবে জীবাশ্মের ভূমিকা আলোচনা কর। [উঃ 540—543 পৃঃ দেখ]
5. ল্যামার্কের মতবাদটি বিবৃত কর এবং এটি অনুসরণ করে জিরাফের গ্রীবা প্রলম্বিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। [উঃ 550—551 পৃঃ দেখ]
6. অভিব্যক্তি-সম্বন্ধে ডারউইনের মতবাদ আলোচনা কর। [উঃ 554—557 পৃঃ]
7. দ্য ভ্রিস (de Vries)-এর মিউটেশন তত্ত্বের বর্ণনা দাও। [উঃ 561-562 পৃঃ]
8. (ক) ল্যামার্কের ও (খ) ডারউইনের মতবাদ অনুসারে জিরাফের গ্রীবা ও সম্মুখের পদ দুটি ক্রমশ প্রলম্বিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। [উঃ 561পৃঃ]
9. ল্যামার্ক কিভাবে অভিব্যক্তিবাদ ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং কেন তাঁর মতবাদ পরিত্যক্ত হয়েছিল ? [উঃ 550—552 পৃঃ দেখ]
10. অনুকূল প্রকারণ, পরিবৃত্তি বা মিউটেশন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্পর্কে তোমার সুস্পষ্ট ধারণা সংক্ষেপে উল্লেখ কর। [উঃ 556—557 পৃঃ দেখ]
11. মিউটেশন বা পরিব্যক্তিবাদ কি ? এই তত্ত্বের প্রবর্তক কে ? 'নতুন প্রজাতির উদ্ভব' ব্যাখ্যা করতে এই তত্ত্ব কিরূপে সহায়তা করেছে ? [উঃ 561-562 পৃঃ]

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer type questions) ঃ

1. অভিব্যক্তি কাকে বলে ? [উঃ 528 পৃঃ দেখ]
2. জৈব অভিব্যক্তির বিভিন্ন প্রমাণগুলি উল্লেখ কর। [উঃ 8.3 অংশ দেখ]
3. ল্যামার্কের মতবাদ পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ সম্বন্ধে যা জান লিখ। [উঃ 551—552 পৃঃ দেখ]
4. সমবৃত্তীয় অঙ্গ এবং সমসংস্থ অঙ্গ বলতে কি বোঝ ? উদাহরণ দ্বারা বোঝাও। [উঃ 534—536 পৃঃ দেখ]
5. নয়া-ডারউইনবাদ সম্বন্ধে যা জান লিখ। [উঃ 559 পৃঃ দেখ]

C. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short Answer type questions) ঃ

1. Evolution শব্দটির উৎপত্তি কোথা থেকে ? [উঃ 528 পৃঃ দেখ]
2. কয়েকটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গের নাম কর। [উঃ 537—538 পৃঃ দেখ]
3. নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কাকে বলে ? [উঃ 538 পৃঃ দেখ]
4. সংযোগকারী প্রাণী বা মিসিং লিঙ্ক বলতে কি বোঝ ? দুটি উদাহরণ দাও। [উঃ 539 পৃঃ]
5. জীবন্ত জীবাশ্ম কাকে বলে ? দুটি উদাহরণ দাও। [উঃ 546 পৃঃ]
6. ঘোড়ার পূর্ব-পুরুষের নাম কর। [উঃ 544—545 পৃঃ দেখ]

7. পরিব্যাপ্তিবাদ কার মতবাদ ? পরিব্যাপ্তি বলতে কি বোঝ ? [উঃ 561 পৃঃ]
8. বিবর্তনের মিশ্রতত্ত্ব বলতে কি বোঝ ? [উঃ 562 পৃঃ দেখ]
9. মিউটেশনের সংজ্ঞা লিখ, মিউট্যান্ট কি ? [উঃ ঐ]
10. জীবাশ্ম এবং জীবন্ত জীবাশ্ম বলতে কি বোঝ ? [উঃ 531 ও 546 পৃঃ]
11. জীবন সংগ্রাম কি ? [উঃ 556 পৃঃ]
12. ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী নতুন প্রজাতির উদ্ভব কিভাবে হয় ? [উঃ 557 পৃঃ]
13. লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বলতে কি বোঝ ? [উঃ 537-538 পৃঃ]
14. সংযোগ রক্ষাকারী প্রাণী কাদের বলে ? [উঃ 539 পৃঃ]
15. সমসংস্থ ও সমবৃত্তীয় অঙ্গের পার্থক্য নির্দেশ কর। সমসংস্থ অঙ্গ কাকে বলে ? [উঃ 534—536 পৃঃ]
16. পরিবৃত্তি বা প্রকারণ বলতে কি বোঝ ? [উঃ 556 পৃঃ]
17. জীবন সংগ্রাম কি ? জীবকে কত রকম ভাবে এই সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় ? [উঃ 556 পৃঃ]
18. বাঁচবার জন্য সংগ্রাম বলতে কি বোঝ ? [উঃ ঐ]

D. এক কথায় উত্তর দাও ঃ

1. প্রাকৃতিক নির্বাচন কার মতবাদ ? [উঃ 552 পৃঃ]
2. অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার কার মতবাদ ? [উঃ 550 পৃঃ]
3. অ্যাপেনডিক্স সমসংস্থ অঙ্গ না নিষ্ক্রিয় অঙ্গ ? [উঃ 538 পৃঃ]
4. জীবন সংগ্রাম—এই মতবাদটি কে প্রচার করেন ? [উঃ 556 পৃঃ]

E. টীকা লিখ (Write notes on) ঃ

1. নিষ্ক্রিয় অঙ্গ [উঃ 538 পৃঃ] 2. জীবাশ্ম [531 পৃঃ]
3. জীবন্ত জীবাশ্ম [উঃ 546 পৃঃ] 4. মিসিং লিঙ্ক [উঃ 539 পৃঃ]
5. পরিবৃত্তি [উঃ 556 পৃঃ] 6. সমবৃত্তীয় অঙ্গসমূহ [উঃ 535 পৃঃ]
7. সংশ্লেষ তত্ত্ব [উঃ ঐ] 8. আরকিওপ্‌টেরিক্স [উঃ 541 পৃঃ]

F. শূন্যস্থান পূরণ কর (Fill up the blanks) ঃ

1. মানুষের অ্যাপেনডিক্স, কক্সিস ইত্যাদি —— অঙ্গ।
2. পক্ষী ও সরীসৃপের মধ্যে সংযোগকারী প্রাণী ——।
3. একটি জীবন্ত জীবাশ্ম হল ——।
4. জীবদেহে যে সকল অঙ্গ আকৃতি ও কার্যগতভাবে পৃথক কিন্তু উৎপত্তিস্থল একই সেই সকল অঙ্গকে —— বলে।
5. অমেরুদণ্ডী প্রাণী অ্যানিলিডা ও আর্থ্রোপোডার মধ্যে সংযোগকারী প্রাণী হল ——।
6. ব্যবহার ও অব্যবহার সূত্রটির প্রবক্তার নাম ——।
7. সিলাকান্থ একটি ——।
8. একটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গের নাম ——।
9. অর্জিত গুণাবলী বংশানুক্রমে সন্তান-সন্ততিতে —— হয়।
10. পাখীর ডানা, বাদুড়ের ডানা, ঘোড়ার অগ্রপদ —— অঙ্গ।

শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যা বা ট্যাকসোনমি 9

[TAXONOMY]

Syllabus : Taxonomy : Brief idea about principle and basis of classification. Binomial nomenclature.

9.1. সূচনা (Introduction)

আমাদের এই বিশাল পৃথিবীতে রয়েছে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগৎ। সেখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে একটি সুন্দর পরিবেশ। উদ্ভিদজগতের সমস্ত উদ্ভিদদের ও প্রাণিজগতের সমস্ত প্রাণীদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কয়েকটি দলে বা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদগোষ্ঠী ও প্রাণিগোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট যোগসূত্র বা আত্মীয়তা স্থাপন করা; তাদের বিস্তার ও আবাসস্থল সম্বন্ধে এবং অভিব্যক্তির ধারাবাহিকতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব দেখা যায়। তাদের সঠিক সংখ্যা বের করা খুবই কষ্টকর। তা সত্ত্বেও জীববিজ্ঞানীরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার। তাছাড়া, অতীতে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী ছিল যাদের অস্তিত্ব এখন আর এই পৃথিবীতে নেই। তারা সকলেই অধুনা লুপ্ত ও জীবাশ্মে পরিণত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, জীববিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতি বছরই কোন-না-কোন নতুন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে। যার ফলে জীবের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছে। তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, সমস্ত বর্তমান এবং জীবাশ্মে পরিণত প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা যেমন সময় সাপেক্ষ তেমনই পরিশ্রমসাধ্য। তবে জীববিজ্ঞানীরা তার জন্য বসে না থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসা চালিয়ে যাওয়ার ফলেই আজকের শ্রেণীবন্ধবিদ্যা প্রকৃত রূপ নিয়েছে।

সাদৃশ্য ও সম্পর্কের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের গোষ্ঠীভুক্ত করে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই কাজে লক্ষ্য রাখা হয়েছে জীবদের বর্ণনা ও সনাক্তকরণের সঠিকতার উপর।

জীববিজ্ঞানের যে শাখাটিতে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের সদস্যদের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচিত হয়, তাকেই বলে **শ্রেণীবন্ধবিদ্যা** (*Taxonomy*)। এই শাখার প্রধান উদ্দেশ্যই হল বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার যোগসূত্র নির্ণয় করা। প্রকৃতপক্ষে জীবের শ্রেণীবিন্যাসই হল **শ্রেণীবন্ধবিদ্যা** বা **ট্যাকসোনমি** (Taxonomy) ঃ

(Taxis = বিন্যাস (arrangement) + nomos = আইন (law))

ফরাসী উদ্ভিদবিজ্ঞানী **এ. পি. ডি. ক্যানডোল** (A. P. D. Candole) 1813 খ্রীষ্টাব্দে 'ট্যাকসোনমি' শব্দটির প্রথম প্রচলন করেন।

9.2. শ্রেণীবদ্ধবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Taxonomy)

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় পৃথিবীর অন্তর্গত বিভিন্ন রকমের জীবদের (উদ্ভিদ ও প্রাণীদের) সনাক্তকরণ, নামকরণ এবং শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদির উপর নির্ভর করে তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্থাপন করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচিত হয়, সেই শাখাটিকেই বলে **শ্রেণীবদ্ধবিদ্যা** বা **ট্যাকসোনমি** (Taxonomy)।

অভিব্যক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের সঙ্গে আত্মীয়তার যোগসূত্রে আবদ্ধ কিনা তাও শ্রেণীবদ্ধবিদ্যার মধ্যে বিবেচিত হয়।

উদ্ভিদ বিষয় নিয়ে যে শ্রেণীবদ্ধবিদ্যা, তাকে **সিস্টেমেটিক বোটানি** (Systematic Botany) বা **উদ্ভিদ শ্রেণীবদ্ধবিদ্যা** (Plant Taxonomy) বলে।

আবার প্রাণীদের বিষয় নিয়ে যে শ্রেণীবদ্ধবিদ্যা, তাকে বলে **সিস্টেমেটিক জুলজি** (Systematic Zoology) বা **প্রাণী শ্রেণীবদ্ধবিদ্যা** (Animal Taxonomy)।

অনেক সময় সিস্টেমেটিক্স এবং ট্যাকসোনমি—এই দুটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। তাহলেও ওদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। একটি গ্রীক শব্দ থেকে সিস্টেমেটিক্স শব্দটিকে নেওয়া হয়েছে। (systema = একত্রীকরণ)। **সিস্টেমেটিক্স হল এমন একটি বিষয় বা বিজ্ঞান, যা সমস্ত উপায়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মিল ও অমিল বিবেচনা করে প্রকারভেদ, বৈচিত্র্য এবং পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে।**

আবার যে সমস্ত রীতি-নীতি ও পদ্ধতির সাহায্যে জীবের শ্রেণীবিন্যাসকরণ করা হয়, তাকে সাধারণভাবে ট্যাকসোনমি বলা যায়। **ট্যাকসোনমির জন্য যে প্রয়োজনীয় তথ্য দরকার তার আহরণের শাখাই হল সিস্টেমেটিক্স** (Systematics)। এই তথ্যগুলি বিশেষভাবে অঙ্গসংস্থানজনিত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদবিদ্যার যে শাখায় শ্রেণীবদ্ধকরণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি তাদের অঙ্গসংস্থানগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসহ কোষবিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব, শারীরস্থান, রেণুবিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে সমাধান করা হয়, তাকে **উদ্ভিদ শ্রেণীবদ্ধবিদ্যা** (Systematic Botany) বলে।

● **শ্রেণীবিন্যাসের সংজ্ঞা** (Definition of Classification): যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবদের গোষ্ঠীভুক্তি ও বিন্যাসকরণের মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক খুব সহজেই নির্ধারণ করা যায় সেই পদ্ধতিকে বলে **শ্রেণীবিন্যাস** (Classification)। এর উদ্দেশ্য হল সাদৃশ্যযুক্ত জীবদের একত্রিত করা।

বিজ্ঞানী **মেয়ার** (Mayer, 1969)-এর মতে মিল ও সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সুসংবদ্ধভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গোষ্ঠীভুক্তিকরণ পদ্ধতিই আসলে শ্রেণীবিন্যাস।

● **শ্রেণীবিন্যাসের প্রকারভেদ** (Types of Classification):
সাধারণত শ্রেণীবিন্যাস তিন প্রকারের, যথা—

(a) **কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস** (Artificial Classification): এই শ্রেণীবিন্যাস

একটি বা কতিপয় **উপরিগত** (*Superficial*) বৈশিষ্ট্যের (আকার-আকৃতির) উপর ভিত্তি করে করা। জীবের সম্পর্কের উপর কোন গুরুত্ব এই শ্রেণীবিন্যাসে দেওয়া হয়নি। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ক্যারোলাস লিনিয়াসের শ্রেণীবিন্যাস।

(b) **স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস** (Natural Classification) : এই শ্রেণীবিন্যাস কতিপয় সাধারণ ও স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে করা। জীবদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনেক সময় এই শ্রেণীবিন্যাসে বিবেচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বেন্থাম ও হুকারের শ্রেণীবিন্যাস।

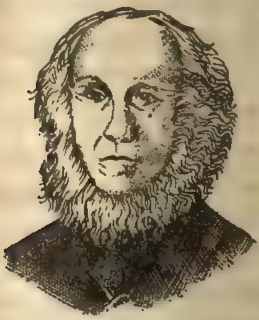

হুকার

এঙ্‌লার

(c) **জাতিজনিগত শ্রেণীবিন্যাস** (Phylogenetic Classification) : এই শ্রেণীবিন্যাস অভিব্যক্তিবাদের ধারা (evolutionary sequence) ও জাতিজনির (Phylogeny) উপর ভিত্তি করে করা। এই শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিতেই পূর্ব-পুরুষদের সঙ্গে যে বর্তমান জীবদের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার যোগসূত্র আছে তা বোঝা যায়। তাছাড়া, একাধিক লক্ষণের উপর ভিত্তি করে এই শ্রেণীবিন্যাস করা। উদাহরণ—এঙ্‌লার ও প্রান্টলের শ্রেণীবিন্যাস।

● **শ্রেণীবিন্যাসের একক** (Units of Classification) :

শ্রেণীবিন্যাসের সর্বোচ্চ এককে বলে **সর্গ** বা **রাজ্য** (Kingdom)। প্রতিটি একক আবার ট্যাক্সন (taxon) [বহুবচনে ট্যাক্সা (taxa)] নামে অভিহিত। উদ্ভিদদের নিয়ে যে সর্বোচ্চ একক তাকে **উদ্ভিদজগৎ** (Plant Kingdom) বলে, যার মধ্যে রাখা হয়েছে পৃথিবীর সব রকম উদ্ভিদদের। আবার প্রাণীদের নিয়ে যে সর্বোচ্চ একক, তাকে বলে **প্রাণিজগৎ** (Animal Kingdom)। সে জগতের মধ্যে সব রকম প্রাণী অন্তর্ভুক্ত। উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগতের মধ্যে এমন কতকগুলি জীব বর্তমান যাদের **প্রোক্যারিওটস্** (Prokaryotes) বা **প্রোটিস্টা** (Protista) বলে। আজকাল **প্রোটিস্ট জগৎ** (Protist Kingdom) নামে অপর একটি জগৎ নথিভুক্ত করে তার মধ্যে ওদের রাখা হয়েছে। উদাহরণ—ব্যাকটিরিয়া। উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগৎকে আবার বিভিন্ন প্রকার গোষ্ঠী (Groups) ও উপগোষ্ঠীতে (Sub-groups) ভাগ করা হয়।

শ্রেণীবিন্যাসের সবচেয়ে নিচের একক হল **প্রজাতি** (Species)। এদেরকেই শ্রেণীবিন্যাসের মৌলিক এককরূপে গণ্য করা হয়। একই প্রজাতির অন্তর্গত সমস্ত রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণী তাদের দেহের আকার-আকৃতি ও স্বভাবে একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হয়। তাছাড়া, তাদের আচার-আচরণ, জীবন যাপন পদ্ধতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি একই ধরনের হয়। এরা আবার জনন কাজ নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। কখনও অন্য প্রজাতির সঙ্গে মিলিত হয়ে বংশবিস্তার করে না। এদের জীন সম্পদ অন্য প্রজাতির জীবদের থেকে আলাদা। এইরকম কতিপয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমষ্টিকে **প্রজাতি** (Species) বলে। জবা, আম, বট ইত্যাদি উদ্ভিদ, রুইমাছ, ব্যাঙ, টিকটিকি, মানুষ ইত্যাদি প্রাণী এক-একটি প্রজাতির উদাহরণ। একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কতিপয় উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে যদি কোন কিছু বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখা যায় তবে তাদের **অধো-প্রজাতি** (Sub-species) রূপে গণ্য করা হয়।

আবার কতিপয় প্রজাতি নিয়ে গঠিত হয় একটি **গণ** (Genus)। অনেক সময় একটি মাত্র প্রজাতি নিয়েও একটি গণ গঠিত হতে পারে। যে সমস্ত প্রজাতি একই পূর্ব-পুরুষ (ancestor) থেকে সৃষ্টি হয়, তাদের আচার-ব্যবহার ও জননের সঙ্গে জড়িত (reproduction) প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রায় একরকমের হয়। ঐরূপ প্রজাতির মিলিত গোষ্ঠীকে **গণ** বলে। উদাহরণ—আলু, বেগুন পৃথক পৃথক প্রজাতির হলেও তাদের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এক ধরনের হওয়ায় এবং একই পূর্ব-পুরুষ হতে সৃষ্টি হওয়ায় ঐ উদ্ভিদদ্বয়কে **সোলানাম** (*Solanum*) নামক একই গণের মধ্যে রাখা হয়েছে।

এইভাবে এক বা একাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ গণের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের বিশেষ মিল থাকলে তাদের একসঙ্গে একটি **গোত্রের** বা পরিবারের (family) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একটি গোত্র অপর গোত্র হতে সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা।

সরিষার গণ—**ব্রাসিকা** (Brassica)-র সঙ্গে মুলার গণ **র‍্যাফানাস** (Raphanus)-এর সাদৃশ্য দেখা যায়। সুতরাং **ব্রাসিকা, র‍্যাফানাস** ইত্যাদি গণকে একই গোত্র **ক্রুসীফেরীর** অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আবার নিম্নলিখিত গণগুলির মধ্যে, যথা—**সোলানাম** (Solanum) [আলু, বেগুন], **লাইকোপার্সিকন** (Lycopersicon) [টম্যাটো], **ক্যাপসিকাম** (Capsicum) [লঙ্কা] ইত্যাদির মধ্যে সাদৃশ্য থাকায় তারা **সোলানেসী** (Solanaceae) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

আবার এক বা একাধিক একই ধরনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত গোত্রকে একটি **বর্গ** (Order)-এর মধ্যে রাখা হয়।

এইরূপে কিছু কিছু সামঞ্জস্যবিশিষ্ট এক বা একাধিক বর্গ নিয়ে গঠিত হয় এক-একটি **শ্রেণী** (Class)। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি শ্রেণীর সমষ্টি নিয়ে প্রাণীদের ক্ষেত্রে **পর্ব** (Phylum) এবং উদ্ভিদদের ক্ষেত্রে **বিভাগ** (Division) সৃষ্টি হয়। সকল বিভাগ নিয়ে **উদ্ভিদজগৎ** (Plant Kingdom) এবং সকল পর্ব নিয়ে **প্রাণিজগৎ** (Animal Kingdom) গঠিত হয়েছে।

কুনো ব্যাঙের দৃষ্টান্ত দিয়ে নিচে প্রাণিজগতের শ্রেণীবিন্যাসে উক্ত প্রাণীটির অবস্থান দেখানো হল :

- প্রাণিজগৎ—(Animal Kingdom)
- পর্ব (Phylum)—কর্ডাটা (Chordata)
- উপপর্ব (Sub-phylum)—ভার্টিব্রাটা (Vertebrata)
- অধিশ্রেণী (Super Class)—ন্যাথোস্টোমাটা (Gnathostomata)
- শ্রেণী (Class)—উভচর (Amphibia)
- বর্গ (Order)—সালিয়েনশিয়া (Salientia)
- গোত্র (Family)—বিউফোনিডি (Bufonidae)
- গণ (Genus)—বিউফো (Bufo)
- প্রজাতি (Species)—**মেলানোস্‌টিক্‌টাস** (melanostictus)

অনেক ক্ষেত্রে প্রজাতি, গোত্র, বর্গ, শ্রেণী, পর্ব ও বিভাগকে যথাক্রমে উপ-প্রজাতি (Sub-species), উপগোত্র (Sub-family), উপ-বর্গ (Sub-order), উপশ্রেণী (Sub-class), উপ-পর্ব (Sub-phylum) এবং উপ-বিভাগ (Sub-division)-এ ভাগ করা হয়।

- উদ্ভিদ সর্গটি পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত বিভিন্ন এককে বিভেদিত, যেমন দুটি উদাহরণ দেওয়া হল : (A) গোলাপ, (B) সরষিন।

(A)

সর্গ—উদ্ভিদজগৎ (Plant Kingdom)
উপসর্গ (Sub-kingdom)—এ্যাম্‌ব্রিওফাইটা (Embryophyta—ভ্রূণযুক্ত উদ্ভিদ)

বিভাগ (Division)—ট্র্যাকিওফাইটা (Trachaeophyta) (দেহে সংবহন কলা, যথা—জাইলেম ও ফেলায়েম থাকে)

উপ-বিভাগ (Sub-division)—টেরপ্‌সিডা (Pteropsida) (ফার্ণ জাতীয়, বীজযুক্ত উদ্ভিদ)

শ্রেণী (Class)—অ্যান্‌জিওস্পার্মী (Angiospermae) (সপুষ্পক উদ্ভিদ)
উপ-শ্রেণী (Sub-class)—ডাইকটিলিডোনী (Dicotyledoneae) (দুটি বীজপত্র সমন্বিত ভ্রূণ)

বর্গ (Order)—রোজেলিস (Rosales)
উপ-বর্গ (Sub-order)—রোজিনী (Rosinea)
গোত্র (Family)—রোজেসী (Rosaceae)
উপ-গোত্র (Sub-family)—রোজয়ডী (Rosoideae)
গণ (Genus)—**রোজা** (Rosa)
প্রজাতি (Species)—**সেন্টিফোলিয়া** (centifolia)

(B)

সর্গ—উদ্ভিদজগৎ (Plant Kingdom)
উপসর্গ (Sub-kingdom)—এ্যাম্‌ব্রিওফাইটা (Embryophyta)

বিভাগ—টেরোফাইটা (Pterophyta)
শ্রেণী—লেপ্টোস্পোর‍্যানজিওপসিডা (Leptosporangiopsida)
বর্গ—মারসিলিয়েলিস (Marsileales)
গোত্র—মারসিলিয়েসী (Marsileaceae)
গণ—**মার্সিলিয়া** (সুষনি) (Marsilea)—ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ
প্রজাতি—**কোয়াড্রিফোলিয়া** (quadrifolia)

● প্রাণি সর্গটি পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত বিভিন্ন এককে বিভেদিত, যেমন একটি উদাহরণ দেওয়া হল : গলদা চিংড়ি।

সর্গ (Kingdom)—প্রাণিজগৎ (Animal Kingdom)
উপসর্গ (Sub-kingdom)—মেটাজোয়া (Metazoa) (বহুকোষী প্রাণী)
পর্ব (Phylum)—আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) (সন্ধিপদ প্রাণী)
শ্রেণী (Class)—ক্রাস্টেসিয়া (Crustacea) (শক্ত শিরোবক্ষ আবরণীবিশিষ্ট প্রাণী)
বর্গ (Order)—ডেকাপোডা (Decapoda) (দশপদী)
গোত্র (Family)—প্যালিমোনিডি (Palaemonidae) (চিংড়ি গোত্র)
গণ (Genus)—ম্যাক্রোব্র্যাকিয়াম (Macrobrachium)
প্রজাতি (Species)—রোসেনবার্গি (rosenbergi)

শ্রেণীবিন্যাসের রীতি অনুযায়ী বেশীর ভাগ উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বর্গ নাম—'ales' ও গোত্র নাম—'aceae' দিয়ে এবং প্রাণীদের ক্ষেত্রে গোত্র নাম—'idae' ও উপ-গোত্র নাম—inae দিয়ে শেষ করা হয়।

গ্রীক দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** (Aristotle) (384-322 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) প্রাণিরাজ্যের একটি কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস করেন। সেই শ্রেণীবিন্যাসের ছক নিচে দেওয়া হল :

প্রাণিরাজ্য (Animal Kingdom)

বিভাগ ↓

অ্যানাইমা (Anaima)
(এই বিভাগের অন্তর্গত প্রাণীদের রক্তের রঙ লাল নয়)
উদাহরণ—এককালীদেহী প্রাণী (হাইড্রা ইত্যাদি)।
সন্ধিপদ প্রাণী (চিংড়ি ইত্যাদি)।
শামুকজাতীয় প্রাণী

ইনাইমা (Enaima)
(এই বিভাগের অন্তর্গত প্রাণীদের রক্তের রঙ লাল)

শ্রেণী ↓

(a) অণ্ডজ প্রাণী (Oviparous)
(মেরুদণ্ডী প্রাণী—যেমন মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখী ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত ; এরা ডিম পেড়ে বংশবিস্তার করে)।

(b) ভ্রূণজ প্রাণী (Viviparous)
(মেরুদণ্ডী প্রাণী—যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণী গিনিপিগ, কুকুর ইত্যাদি), এরা সন্তান প্রসব করে বংশবিস্তার করে)।

উদ্ভিদদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে থিওফ্রেস্টাস্ (Theophrastus) (370—285 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) পৃথিবীর সব উদ্ভিদকে **বীরুৎ** (herbs), **অধোগুল্ম** (under shrubs), **গুল্ম** (shrubs) ও **বৃক্ষ** (trees)—এই চারটি বিভাগে ভাগ করেন।

জন রে (John Ray, 1628-1705) নামক একজন ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী উদ্ভিদের আকৃতি ও অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদজগৎকে 'হার্বি' (Herbae) এবং 'আর্বোরিয়া' (Arborea)—এই দুটি প্রধান দলে ভাগ করেন। তাঁর শ্রেণীবিন্যাসের প্রধান দলগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

(1) **হার্বি** (Herbae)—সমস্ত বীরুৎ (herbs) এর অন্তর্গত।

A. **ইম্‌পারফেক্‌টি** (Imperfectae)—অপুষ্পক উদ্ভিদ দল (Cryptogams) এর অন্তর্গত।

B. **পারফেক্‌টি** (Perfectae)—সপুষ্পক উদ্ভিদ দল এর অন্তর্গত।

(i) ডাইকটিলিডোনস্ (Dicotyledons)—দুটি বীজপত্র সমেত ভ্রূণ।

(ii) মনোকটিলিডোনস্ (Monocotyledons)—একটি বীজপত্র সমেত ভ্রূণ।

(2) **আর্বোরিয়া** (Arborea)—বৃক্ষ এবং গুল্মেরা এই দলের অন্তর্গত।

(i) ডাইকটিলিডোনস্ (Dicotyledons)

(ii) মনোকটিলিডোনস্ (Monocotyledons)

সুইডেন দেশীয় বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী **ক্যারোলাস লিনিয়াস** (Carolus Linnaeus, 1707-1778) প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্পূর্ণ শ্রেণীবিন্যাস প্রবর্তন করেন। এই শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি কৃত্রিম হলেও আসলে আধুনিক শ্রেণীবিন্যাসের জনক। ক্যারোলাস লিনিয়াসই প্রথম দ্বিপদ নামকরণের ভিত্তি স্থাপন করেন। লিনিয়াসের উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাস কেবল যৌন জনন অঙ্গের, যথা—পুংকেশর ও গর্ভকেশরের সংখ্যা, বিন্যাস ইত্যাদির উপর নির্ভর করে করা। তাই এই শ্রেণীবিন্যাসকে **যৌন শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিও** বলে। তিনি সমগ্র উদ্ভিদজগৎকে 24টি শ্রেণীতে ভাগ করেন। সর্বপ্রথম শ্রেণী মোন্যান্ড্রিয়া (Monandria) এবং শেষ শ্রেণী ক্রিপ্টোগ্যামিয়া (Cryptogamia)।

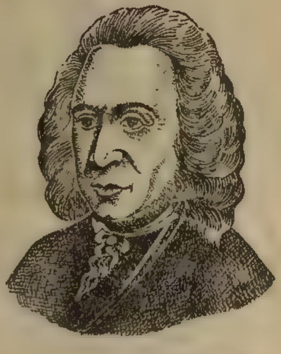

ক্যারোলাস লিনিয়াস

প্রাণিজগৎকে লিনিয়াস নিম্নলিখিত ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেন, যথা—

শ্রেণী 1. ম্যামালিয়া (Mammalia) 4. পিসেস (Pisces)
2. আভিস (Aves) 5. ইন্‌সেক্টা (Insecta)
3. অ্যাম্ফিবিয়া (Amphibia) 6. ভারমিস্ (Vermis)

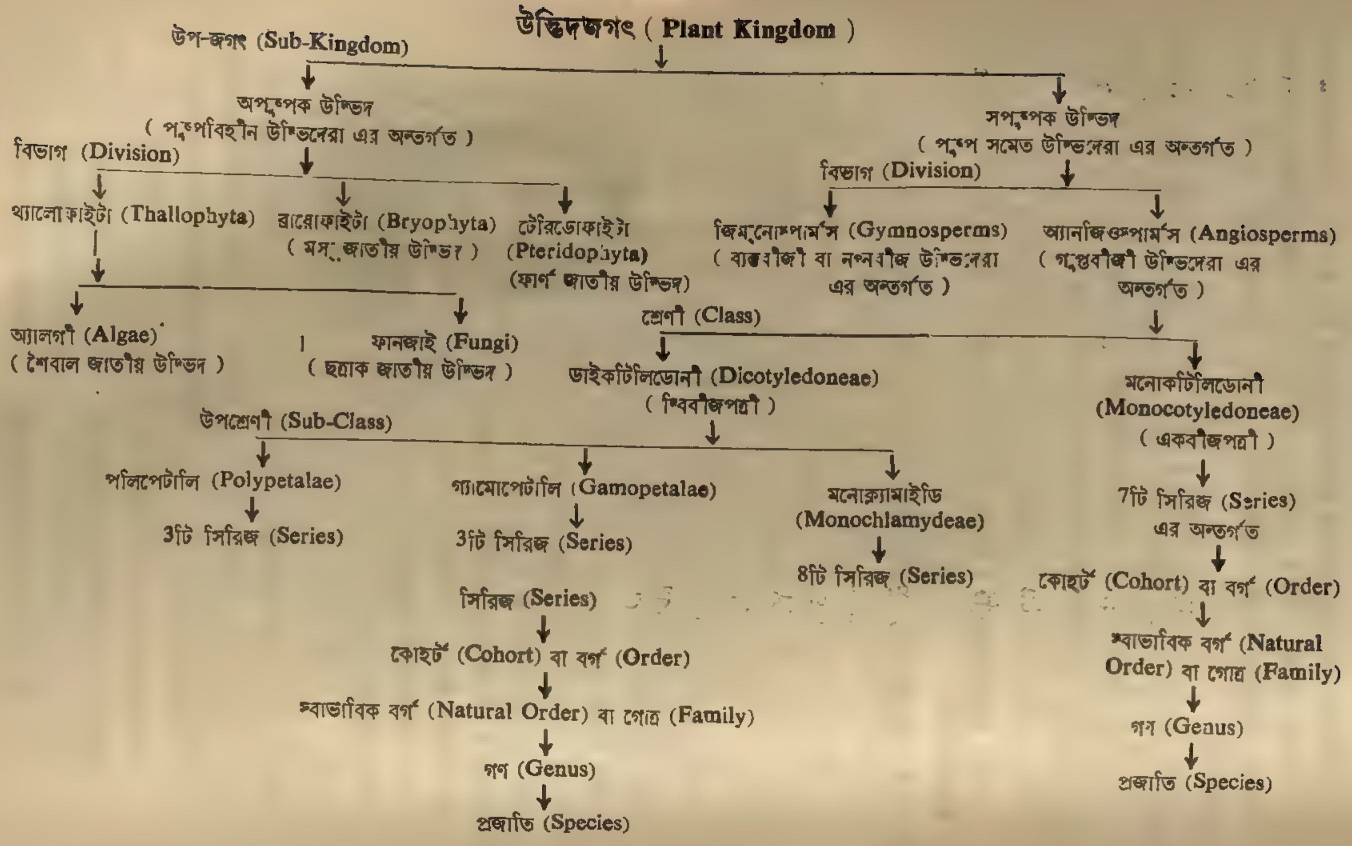
উদ্ভিদজগৎ (Plant Kingdom)
উপ-জগৎ (Sub-Kingdom)
অপুষ্পক উদ্ভিদ
(পুষ্পবিহীন উদ্ভিদেরা এর অন্তর্গত)
বিভাগ (Division)
থ্যালোফাইটা (Thallophyta)
ব্রায়োফাইটা (Bryophyta)
(মস্ জাতীয় উদ্ভিদ)
টেরিডোফাইটা
(Pteridophyta)
(ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ)
অ্যালগী (Algae)
(শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ)
ফানজাই (Fungi)
(ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ)
সপুষ্পক উদ্ভিদ
(পুষ্প সমেত উদ্ভিদেরা এর অন্তর্গত)
বিভাগ (Division)
জিমনোস্পার্মস (Gymnosperms)
(ব্যক্তবীজী বা নগ্নবীজ উদ্ভিদেরা এর অন্তর্গত)
অ্যানজিওস্পার্মস (Angiosperms)
(গুপ্তবীজী উদ্ভিদেরা এর অন্তর্গত)
শ্রেণী (Class)
ডাইকটিলিডোনী (Dicotyledoneae)
(দ্বিবীজপত্রী)
মনোকটিলিডোনী
(Monocotyledoneae)
(একবীজপত্রী)
উপশ্রেণী (Sub-Class)
পলিপেটালি (Polypetalae)
3টি সিরিজ (Series)
গ্যামোপেটালি (Gamopetalae)
3টি সিরিজ (Series)
মনোক্ল্যামাইডি
(Monochlamydeae)
8টি সিরিজ (Series)
7টি সিরিজ (Series)
এর অন্তর্গত
সিরিজ (Series)
কোহর্ট (Cohort) বা বর্গ (Order)
স্বাভাবিক বর্গ (Natural Order) বা গোত্র (Family)
গণ (Genus)
প্রজাতি (Species)
কোহর্ট (Cohort) বা বর্গ (Order)
স্বাভাবিক বর্গ (Natural Order) বা গোত্র (Family)
গণ (Genus)
প্রজাতি (Species)

ভারমিস্ (Vermis) শ্রেণীকে ক্যারোলাস লিনিয়াস নিম্নলিখিত পাঁচটি বর্গে (Order) ভাগ করেন, যথা—

বর্গ 1. ইণ্টেস্টাইনা (Intestina) 4. লিথোফাইটা (Lithophyta) এবং
2. মোলাস্কা (Mollusca) 5. জুফাইটা (Zoophyta)
3. টেস্টাসিয়া (Testacea)

লিনিয়াসের পর বিভিন্ন প্রকৃতিবিদ্ উদ্ভিদজগতের শ্রেণীবিন্যাস করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—ডি ক্যান্ডোল (De Candole, 1778—1841), জর্জ বেন্থাম (G. Bentham, 1800—1884) ও জোসেফ ডালটন হুকার (J. D. Hooker, 1817—1917); এডল্ফ এঙ্গলার (Adolph Engler, 1844—1930) এবং কার্ল এ. ই. প্রান্টল (Karl A. E. Prantl, 1849—1893); জন হাচিন্সন (J. Hutchinson, 1884—1978) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা।

আবার প্রাণিজগতের শ্রেণীবিন্যাসে যে সব বিজ্ঞানীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে তাঁরা হলেন—ল্যামার্ক (Lamarck, 1744—1829), কুভিয়ের (Cuvier, 1769—1832), হেকেল (Haeckel, 1834—1911), রে ল্যাঙ্কেস্টার (Ray Lankester, 1847—1929) প্রভৃতি।

ইংরেজ উদ্ভিদবিদ্ জি. বেন্থাম (G. Bentham) এবং জে. ডি. হুকার (J. D. Hooker)-এর উদ্ভিদজগতের প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস ছকের সাহায্যে দেখানো হল।

শ্রেণীবদ্ধবিদ্যার বিভিন্ন প্রতিপাদ্য বিষয় :

● **সনাক্তকরণ** (Identification) : যে রীতিতে নতুন উদ্ভিদ বা প্রাণী সংগ্রহ করার পর কোন নির্ভরযোগ্য পুঁথিপত্রের বিবরণ থেকে অথবা কোন সংগ্রহশালায় আগের থেকে সংগ্রহ করে রাখা উদ্ভিদ বা প্রাণীর নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে বা তুলনা করে তারা কোন্ প্রজাতি, গণ বা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তা নির্ণয় করা হয় তাকেই বলে **সনাক্তকরণ** (Identification)। শ্রেণীবন্ধবিদ্যার প্রথম কাজ হল কোন উদ্ভিদের বা প্রাণীর সঠিক বর্ণনা করে, তার ভিত্তিতে তাকে সনাক্ত করা। এর সঙ্গে শ্রেণীবিন্যাস (Classification) বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। কারণ সনাক্তকরণ করার পরই সেই উদ্ভিদ বা প্রাণীটিকে শ্রেণীবিন্যাসের বিভিন্ন এককের বা ট্যাক্সনের মধ্যে রাখা উচিত।

● **নামকরণ** (Nomenclature) : আমাদের এই পৃথিবীতে অগণিত প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে। একই উদ্ভিদ বা একই প্রাণী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে, আবার একই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে পরিচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ যে প্রাণীকে আমরা বাংলায় 'বাঘ' বলি, হিন্দীতে সেই প্রাণীর নাম হল 'শের', আবার ইংরেজীতে 'টাইগার' (Tiger)। বাংলায় আমরা যে শস্যটিকে 'গম' বলি বিহার ও উত্তর প্রদেশের লোকেরা তাকে বলে 'গেঁহু', আসামে 'ঘেন্হু', আবার ইংরেজীতে 'হুইট' (Wheat)। অতএব দেখা যাচ্ছে একটি বিশেষ প্রাণীর বা উদ্ভিদের নাম বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাষায় পৃথক। এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য বিজ্ঞানিগণ

এগিয়ে আসেন এবং প্রত্যেক জীবের একটি নির্দিষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ করেন। তাছাড়া, সনাক্তকরণের সুবিধার জন্যও প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ (Scientific name) করা প্রয়োজন। যার ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীরা পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞানীমহলে একই নামে পরিচিত হয়। এই নামকরণের ব্যাপারে যে বিজ্ঞানীর অবদান অসামান্য তিনি হলেন **ক্যারোলাস লিনিয়াস**।

একই জীব দেশভেদে এবং ভাষাভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত থাকার ফলে তাদের সঠিকভাবে চেনার ব্যাপারে বিজ্ঞানীমহল যে অসুবিধা বোধ করতেন তা দূর করার জন্য 1753 খ্রীষ্টাব্দে সুইডেন দেশীয় বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রস্তাব করেন। লিনিয়াসের প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি উদ্ভিদ বা প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নামের দুটি **পদ** বা **অংশ** থাকবে। পদ দুটিই হবে ল্যাটিন এবং অর্থবহ। যেমন—'আম গাছ' যার বৈজ্ঞানিক নাম **ম্যাঙ্গিফেরা ইণ্ডিকা** (*Mangifera indica*), সে নামে পৃথিবীর যে কোন দেশের বিজ্ঞানীদের এবং জীববিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে আম গাছ পরিচিত। আবার কুনো ব্যাঙের বিজ্ঞানসম্মত নাম **বিউফো মেলানোস্টিক্‌টাস** (*Bufo melanostictus*)। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি পদ বা ল্যাটিন শব্দের সমন্বয়ে নামকরণ করা হয়েছে। দুটি পদের সমন্বয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নামকরণ করার রীতিকে বলে **দ্বিপদ নামকরণ** বা **বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার** (Binomial Nomenclature)। এই দ্বিপদ নামের প্রথম পদ বা অংশকে বলে **গণ** (Genus) এবং দ্বিতীয় পদ বা অংশকে বলে **প্রজাতি** (Species)। আম গাছের প্রথম পদটি 'ম্যাঙ্গিফেরা' ও ব্যাঙের প্রথম পদটি হল 'বিউফো' যাকে বলে **গণগত নাম** (Generic name)। দ্বিতীয় পদটি আম গাছের ক্ষেত্রে 'ইণ্ডিকা' ও ব্যাঙের ক্ষেত্রে 'মেলানোস্টিক্‌টাস', যাকে বলে **প্রজাতিগত নাম** (Specific name)। **ক্যারোলাস লিনিয়াসকে দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রবক্তা বলা হয়**।

অনেক সময় উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ত্রিপদ নামকরণও করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় সিংহের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বসবাসকারী সিংহের থেকে এদের মধ্যে অনেক চারিত্রিক পার্থক্য দেখা যায়। তাই একে উপপ্রজাতি (Sub-species)-ভুক্ত করে ত্রিপদ নামকরণ করা হয়েছে (Trinomial Nomenclature), নামটি—**প্যান্থেরা লিও পার্সিকা** (*Panthera leo persica*)।

নিচে কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম দেওয়া হল :

উদ্ভিদ (Plants)

(i) আলু—**সোলানাম টিউবেরোসাম** (*Solanum tuberosum*)
(ii) মটর গাছ—**পিজাম স্যাটাইভাম** (*Pisum sativum*)
(iii) জবা—**হিবিসকাস রোজা-সাইনেন্‌সিস** (*Hibiscus rosa-sinensis*)
(iv) ধান—**ওরাইজা স্যাটাইভা** (*Oryza sativa*)
(v) বট—**ফাইকাস্‌ বেঙ্গালেন্‌সিস্‌** (*Ficus bengalensis*)
(vi) লজ্জাবতী লতা—**মাইমোসা পুডিকা** (*Mimosa pudica*)
(vii) ব্যাঙের ছাতা—**অ্যাগারিকাস কেম্‌পেস্ট্রিস** (*Agaricus campestris*)

প্রাণী (Animals)

(i) অ্যামিবা—**অ্যামিবা প্রোটিয়াস** (*Amoeba proteus*)
(ii) হাইড্রা—**হাইড্রা ভুলগারিস** (*Hydra vulgaris*)
(iii) আরশোলা—**পেরিপ্লানাটা আমেরিকানা** (*Periplanata americana*)
(iv) কুনো ব্যাঙ—**বিউফো মেলানোস্টিক্‌টাস** (*Bufo melanostictus*)
(v) রুইমাছ—**লেবিও রোহিতা** (*Labeo rohita*)
(vi) পায়রা—**কলাম্বা লিভিয়া** (*Columba livia*)
(vii) গিনিপিগ—**কেভিয়া পোরসেলাস** (*Cavia porcellus*)
(viii) বাঘ—**প্যান্থেরা টাইগ্রিস** (*Panthera tigris*)
(ix) মানুষ—**হোমো সেপিয়েন্‌স** (*Homo sapiens*)

নামকরণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত নিয়ম অনুযায়ী (International codes of nomenclature) কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর দ্বিপদ নামকরণ করতে হবে এবং প্রথম পদ অর্থাৎ গণের আদ্যক্ষরটি লিখতে হবে বড় হরফে (capital letter) ও দ্বিতীয় পদ অর্থাৎ প্রজাতির আদ্যক্ষরটি লিখতে হবে ছোট হরফে (small letter)। যে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীকে সনাক্ত করে দ্বিপদ নামকরণ করেন, সেই বিজ্ঞানীর নাম বিজ্ঞানসম্মত নামের শেষে যুক্ত করার রীতির চলন আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞানী **লিনিয়াস** (*Linnaeus*) গোলাপ গাছের নাম **রোজা সেণ্টিফোলিয়া** (*Rosa centifolia*) এবং বিজ্ঞানী **স্নাইডার** (*Schneider*) কুনো ব্যাঙের নাম **বিউফো মেলানোস্টিক্‌টাস** (*Bufo Melanostictus*) রাখেন। তাই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানীর নামসহ ওদের বিজ্ঞানসম্মত দ্বিপদ নাম হবে যথাক্রমে **রোজা সেণ্টিফোলিয়া** লিনিয়াস (*Rosa entcifolia* Linnaeus) ও **বিউফো মেলানোস্টিক্‌টাস স্নাইডার** (*Bufo melanostictus Schneider*)। নামকরণের শেষে বিজ্ঞানীর নাম পুরো না লিখে সংক্ষেপেও লেখা যায়, যেমন—বিজ্ঞানী লিনিয়াসের নাম সংক্ষেপে অনেক সময় লিন্‌ (Linn) অথবা শুধুমাত্র 'এল' (L) লিখলেও চলে।

গণ ও প্রজাতির নাম দুটি ইংরেজীতে ছাপার সময় বাঁকা অক্ষরে (Italicised) ছাপা হয়। খাতায় গণ ও প্রজাতির বিজ্ঞানসম্মত নাম হাতে লেখার পর তার নিচে রেখা টানতে (underlined) হয়।

কিন্তু দ্বিপদ নামের পর বিজ্ঞানীর নাম কখনও বাঁকা অক্ষরে ছাপা হবে না বা তার নিচে রেখাও টানা হবে না।

9.3. বৈজ্ঞানিক নামকরণের নিয়মকানুন (Rules or Codes of Scientific Nomenclature)

বিজ্ঞানসম্মত নামকরণের কয়েকটি বিশেষ নিয়মাবলী নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

(1) উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম পুরোপুরি আলাদা হবে। কোন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত একাধিক গণ (Genus) বা একই গণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত একাধিক প্রজাতির (Species) নাম কখনও এক রাখা যাবে না। কোথাও কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত নাম এক হলে সেই নামের পরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন।

(2) অনেক সময় অগ্রাধিকার আইন (Law of priority) অনুসারে বিজ্ঞান-সম্মত নামের পরিবর্তন করা হলে ঐ আইন অনুযায়ী প্রথম প্রকাশিত নামটিকেই শুধুমাত্র বৈধ (Valid) বলে গণ্য করা হবে। যেমন লিনিয়াস (1753) 'স্পিসিস্ প্লান্টেরুম' (Species Plantarum) নামক বইয়ে একটি উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত গণনাম দেন **জাইরিস** (Xyris) কিন্তু পরবর্তী কালে অপর এক বিজ্ঞানী স্টুডেল (Studel, 1856) সেই গণনামকে পাল্টে রাখেন **চিস্ম্যাক্সো** (*Schismaxow*)। কিন্তু অগ্রাধিকার আইন অনুসারে লিনিয়াস কর্তৃক দেওয়া প্রথম প্রকাশিত **জাইরিস** গণনামটিই কেবলমাত্র বৈধ এবং গ্রহণযোগ্য।

(3) ক্যারোলাস লিনিয়াসের **সিস্টেমা নাচুরী** (Systema Naturae) দশম সংস্করণ (1758) প্রকাশিত হবার আগে উদ্ভিদ বা প্রাণীর যে বিজ্ঞানসম্মত নামই থাকুক না কেন তা অবৈধ বলে গণ্য হবে অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য হবে না।

(4) উদ্ভিদ বা প্রাণীর অর্থাৎ প্রতিটি জীবের নামকরণ সবসময় ল্যাটিন ভাষায় করতে হবে এবং ঐ নাম সবসময় বাঁকা অক্ষরে ছাপতে হবে।

(5) উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞানে নামকরণের নিয়মাবলী আলাদা। তাই উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে একই নাম রাখার মধ্যে কোন বাধা নেই। তবে তাতে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। তাই যতদূর সম্ভব উদ্ভিদ ও প্রাণীর একই নাম না রাখাই ভাল।

(6) সবসময় গণের নাম (Generic name) একটি শব্দ দ্বারা গঠিত হবে এবং সেই নামের প্রথম অক্ষরটি হবে বড় হরফের।

(7) একটি বা বেশী শব্দ দিয়ে প্রজাতির নাম (Specific name) রাখা যাবে এবং এর প্রথম অক্ষর সবসময় ছোট হরফের হবে।

(8) কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর নামকরণ করার সময় সেই উদ্ভিদ বা প্রাণীটির সম্পূর্ণ বা আংশিক ছবি সহযোগে বিশদভাবে বর্ণনা করতে হবে, তারপর বিবরণসহ কোন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় তা প্রকাশ করতে হবে। যে বিজ্ঞানী প্রথম কোন জীবকে আবিষ্কার করে উপরিউক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন শুধুমাত্র তিনিই ঐ উদ্ভিদ বা প্রাণীর নামকরণের স্রষ্টা হবেন।

(9) আবিষ্কার ও বিশদ বিবরণসহ নামকরণ করার পর উদ্ভিদ বা প্রাণীর নমুনা (Specimen) পরিচিত কোন সংগ্রহশালায় (যেমন—মিউজিয়াম, হার্বেরিয়াম ইত্যাদি স্থানে) সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। ঐ রকম জীবের প্রথম সংরক্ষিত নমুনাকে বলে **টাইপ স্পেসিমেন** (type specimen) বা **টাইপ প্রজাতি**।

(10) প্রাণীদের ক্ষেত্রে গণের পরে -idae যোগ করে গোত্রের নাম এবং -inae যোগ করে উপগোত্রের নাম তৈরি করতে হবে।

(11) যদি কখনও একটি গণ বা প্রজাতি অনেকবার বিভিন্ন বিজ্ঞানী দ্বারা বর্ণিত হয় তবে **পূর্বিতার** বা **অগ্রাধিকারের** আইন (Law of Priority) অনুসারে প্রথম বিজ্ঞানী দ্বারা দেওয়া নামকরণ অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

Eichler 1886 খ্রীষ্টাব্দে জীবকুলকে নিম্নলিখিত দুটি ভাগে ভাগ করেন :

জীবকুল
↓
সর্গ (Kingdom)
- প্লান্টি (Plantae)
- অ্যানিম্যালিয়া (Animalia)

বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভিদরাজ্যের শ্রেণীবিন্যাস নিচের ছক অনুযায়ী করা হয়ে থাকে :

উদ্ভিদ সর্গ (Plant Kingdom)
বিভাগ (Division)

- থ্যালোফাইটা (Thallophyta) বা সমাঙ্গদেহী
  - দল (Group)
    - শৈবাল (Algae) উদাঃ স্পাইরোগাইরা (*Spirogira*)
    - ছত্রাক (Fungi) উদাঃ অ্যাগারিকাস (*Agaricus*)
- ব্রায়োফাইটা (Bryophyta) বা মস্ বর্গীয় উদ্ভিদ উদাঃ—পোগোনেটাম (Pogonatum)
- টেরিডোফাইটা (Pteridophyta) ফার্ণ বর্গীয় উদ্ভিদ উদাঃ—ড্রায়প্টেরিস (Dryopteris)
- স্পারমাটোফাইটা (Spermatophyta) বীজ
  - উপ-বিভাগ (Sub-division)
    - জিমনোস্পার্মস (ব্যক্তবীজী) উদাঃ—পাইনাস (*Pinus*)
    - অ্যানজিওস্পার্মস (গুপ্তবীজী)
      - শ্রেণী (Class)
        - ডাইকটিলিডোনাস (দ্বিবীজপত্রী) উদাঃ—আম (*Mangifera*) ছোলা (*Pisum*)
        - মনোকটিলিডোনাস (একবীজপত্রী) উদাঃ—ধান (*Oryza*) নারিকেল (*Cocos*)

● বিষয়-সংক্ষেপ ●

জীব ও জীবনের সমবায়ে গঠিত হয়েছে আমাদের চারপাশে একটি সুন্দর পরিবেশ। এই বৈচিত্র্যময় জীবজগতে অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীকে নির্দিষ্টভাবে সনাক্তকরণ করার জন্য যে বিষয়বস্তুর প্রয়োজন তা হল ট্যাক্সোনমি বা শ্রেণীবদ্ধবিদ্যা। যে বিষয়বস্তুর মূল উদ্দেশ্য হল জীবদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে তাদের সনাক্তকরণ ও পরে নামকরণ করে তাদের উদ্ভিদ বা প্রাণিজগতের যথাস্থানে বিন্যস্ত করা। অতএব শ্রেণীবদ্ধবিদ্যার উদ্দেশ্যই হল বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার যোগসূত্র নির্ণয় করা।

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় পৃথিবীর অন্তর্গত বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণীর

সনাক্তকরণ, নামকরণ এবং শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদির উপর নির্ভর করে তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্থাপন করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচিত হয় বিজ্ঞানের সেই শাখাটিকেই বলে **শ্রেণীবন্ধবিদ্যা** বা **ট্যাক্সোনমি**।

উদ্ভিদ বিষয় নিয়ে যে শ্রেণীবন্ধবিদ্যা, তাকে **সিস্টেমেটিক বোটানি** বা **উদ্ভিদ শ্রেণীবন্ধবিদ্যা** এবং প্রাণীদের বিষয় নিয়ে যে শ্রেণীবন্ধবিদ্যা, তাকে **সিস্টেমেটিক জুলজি** বা **প্রাণী শ্রেণীবন্ধবিদ্যা** বলে।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের সময় হতে বস্তুতপক্ষে জীবজগতের শ্রেণীবিন্যাসের সূত্রপাত। যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবদের গোষ্ঠীভুক্ত বা বিন্যাসকরণের মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক খুব সহজেই নির্ধারণ করা যায় সেই পদ্ধতিকেই বলে **শ্রেণীবিন্যাস**।

শ্রেণীবিন্যাস তিন প্রকারের যথা—(i) কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস (একটি বা কতিপয় উপরিগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে করা)। উদাহরণ—ক্যারোলাস লিনিয়াসের শ্রেণীবিন্যাস।

(ii) স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস—(কতিপয় সাধারণ ও স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে করা এবং অনেক সময় জীবদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিবেচিত) উদাহরণ—বেন্থাম ও হুকারের শ্রেণীবিন্যাস।

(iii) জাতিজনিগত শ্রেণীবিন্যাস (অভিব্যক্তিবাদের ধারা ও জাতিজনির উপর ভিত্তি করে করা, তাছাড়া একাধিক লক্ষণ এবং জীবদের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার যোগসূত্র এই শ্রেণীবিন্যাসে বিবেচিত)। উদাহরণ—এঙ্গলার ও প্রান্টলের শ্রেণীবিন্যাস।

শ্রেণীবিন্যাসের সর্বোচ্চ একককে বলে সর্গ। প্রতিটি একক আবার ট্যাক্সন নামে অভিহিত। লিনিয়াস প্রবর্তিত শ্রেণীবিন্যাসে প্রজাতি, গণ, গোত্র, বর্গ, শ্রেণী, পর্ব ও রাজ্য—এই সাতটি ট্যাক্সা (একবচনে—ট্যাক্সন) বর্তমান। শ্রেণীবিন্যাসের সবচেয়ে নিচের একক হল প্রজাতি। কতিপয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমষ্টিকে **প্রজাতি** বলে। আবার কতিপয় প্রজাতি নিয়ে গঠিত হয় গণ। একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কতিপয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে যদি কোন কিছু বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখা যায় তবে তাদের অধো-প্রজাতি রূপে গণ্য করা হয়। এক বা একাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ গণের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের বিশেষ মিল থাকলে তাদের একসঙ্গে একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ক্যারোলাস লিনিয়াস শ্রেণীবন্ধবিদ্যায় দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। দুটি পদ বা ল্যাটিন শব্দের সমন্বয়ে নামকরণ করা হয়। তার মধ্যে প্রথম পদটি হল গণ এবং দ্বিতীয় পদটি হল প্রজাতি। দুটি পদের সমন্বয়ে একটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর নামকরণ করার রীতিকে বলে **দ্বিপদ নামকরণ** বা **বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার**। উদাহরণ—**ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা** (আম) এবং **বিউফো মেলানোস্টিকটাস** (কুনো ব্যাঙ)। অনেক সময় একই গণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে চারিত্রিক পার্থক্য দেখা যায়। তখন এই ভিন্নতার জন্য তাদের উপ-প্রজাতি রূপে গণ্য করা হয়। তাদের নামকরণ তিনটি পদের দ্বারা করা হয় বলে **ত্রিপদ নামকরণ** বলে। উদাহরণ—**প্যান্থেরা লিও পার্সিকা** (ভারতীয় সিংহ)।

একটি বিশেষ প্রাণীর বা উদ্ভিদের নাম বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাষায় পৃথক। আঞ্চলিক বা বিভিন্ন দেশের নামকরণের জটিলতা ও অসুবিধাগুলিকে দূর করার জন্য সমগ্র পৃথিবীতে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। যার ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীরা পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞানী মহলে একই নামে পরিচিত হয়। ঐ আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মেনে সবরকম উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মতভাবে নামকরণ ও তাদের শ্রেণী-

বিন্যাস করা হয়। উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উদ্ভিদবিদ্যা মহাসভা (International Commission of Botanical Nomenclature) এবং প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রাণিবিদ্যা মহাসভা (International Congress of Zoology) বৈজ্ঞানিক নামকরণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মকানুন প্রবর্তন করেন।

অনুশীলনী

A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন : (Essay type questions) :

1. দ্বিপদ নামকরণ বলতে কি বোঝ ? নিম্নলিখিত নামগুলির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। (a) ট্যাক্সোনমি, (b) সিসটেমেটিক্স, (c) শ্রেণীবিন্যাস, (d) সনাক্তকরণ। [উঃ 576, 567, 568 ও 575 পৃঃ দেখ]
2. শ্রেণীবিন্যাস কাকে বলে ? শ্রেণীবিন্যাসের প্রধান এককগুলি কি কি ? শ্রেণীবিন্যাসের স্বাভাবিক প্রণালী (Natural system) বর্ণনা কর। [উঃ 568-570 পৃঃ দেখ]
3. সনাক্তকরণ, নামকরণ ও শ্রেণীবিন্যাস বলতে কি বোঝ ? শ্রেণীবিন্যাসের একক কি ও এর উদ্দেশ্য কি ? [উঃ 575, 568-570 পৃঃ দেখ]
4. বিন্যাসবিধির (Taxonomy) নীতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রস্তাবক কে ? [উঃ 568-570 ও 576 পৃঃ দেখ]
5. শ্রেণীবন্ধবিদ্যায় নামকরণের আন্তর্জাতিক নীতিগুলি বল। [উঃ 577-578 পৃঃ দেখ]
6. শ্রেণীবিন্যাস কাকে বলে ? এর উদ্দেশ্য কি ? শ্রেণীবিন্যাসের প্রকারভেদের বিবরণ দাও। [উঃ 568, 567 ও 569 পৃঃ দেখ]
7. উদাহরণ সহযোগে ছকের মাধ্যমে অ্যারিস্টটলের মতে প্রাণিজগতের শ্রেণীবিন্যাস কর। [উঃ 572 পৃঃ দেখ]
8. ছকের সাহায্যে উদ্ভিদজগতের শ্রেণীবিন্যাসটি দেখাও। [উঃ 574 পৃঃ দেখ]

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer type questions) :

1. শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা বল। [উঃ 567 পৃঃ দেখ]
2. দ্বিপদ নামকরণ কাকে বলে ? একটি গাছের ও একটি প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখ। [উঃ 576-577 পৃঃ দেখ]
3. কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস বলতে কি বোঝ ? একটি কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাসের নাম কর। [উঃ 568-569 পৃঃ দেখ]
4. প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস বলতে কি বোঝ ? একটি প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাসের নাম কর। [উঃ 569 পৃঃ দেখ]
5. শ্রেণীবন্ধবিদ্যা কাকে বলে ? শ্রেণীবন্ধবিদ্যার উদ্দেশ্য বল। [উঃ 567 পৃঃ দেখ]

C. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short Answer type questions) :

1. বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার কাকে বলে ? [উঃ 576 পৃঃ দেখ]
2. প্রোটিস্ট জগৎ বলতে কি বোঝ ? [উঃ 569 পৃঃ দেখ]
3. 'টাইপ' প্রজাতি বলতে কি বোঝ ? [উঃ 578 পৃঃ দেখ]

D. টীকা লিখ (Write notes on) :

1. গণ ও প্রজাতি [উঃ 570 পৃঃ দেখ]
2. সিস্টেমেটিক্স [উঃ 568 পৃঃ দেখ]
3. দ্বিপদ নামকরণ [উঃ 576 পৃঃ দেখ]
4. ত্রিপদ নামকরণ [উঃ 580 পৃঃ দেখ]
5. ট্যাক্সোনমি [উঃ 580 পৃঃ দেখ]
6. সনাক্তকরণ ও নামকরণ [উঃ 575 পৃঃ দেখ]
7. অগ্রাধিকারের আইন [উঃ 578 পৃঃ দেখ]

E. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা বাক্যগুলি সম্পূর্ণ কর (Complete the sentences with suitable words) :

1. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম ——— ।
2. দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির জনক হলেন ——— ।
3. জীববিদ্যার যে শাখায় সনাক্তকরণ, নামকরণ ও শ্রেণীবিন্যাস আলোচিত হয়, তাকে বলে —— ।
4. অনেক সময় প্রাণীর নামকরণ তিনটি শব্দ নিয়ে করা হয়। তখন ঐ নামকরণ পদ্ধতিকে বলে,———— ।
5. শ্রেণীবিন্যাসের প্রতিটি একককে বলে ——— ।
6. ডিম প্রসব করে যে সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী, তাদের বলে ——— ।
7. সন্তান প্রসব করে যে সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী, তাদের বলে ——— ।
8. শ্রেণীবিন্যাসের সর্বাপেক্ষা নিম্ন একককে বলে —— ।
9. কতকগুলি প্রজাতি নিয়ে গঠিত হয় ——— ।
10. ট্যাক্সোনমি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসী উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ——— ।

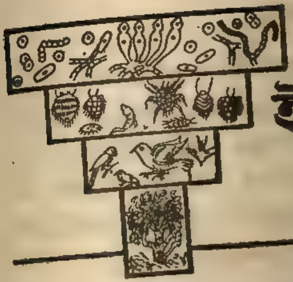

ইকো-সিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র 10

[ECO-SYSTEM]

Syllabus : (a) Ecosystem Explanation : General idea about food chain and energy flow. (b) Conservation—Definition ; Conservation of Soil, Water, Forest and Animals (Examples—Rhinoceros in West Bengal) ; (c) Pollution—in reference to human being (Mention Air, Water and Noise).

10.1. সূচনা (Introduction)

জীব যেখানে বাস করে তার চারপাশের সবকিছু নিয়েই গঠিত হয় তার **পরিবেশ** (Environment)। **ভৌত পরিবেশ** (Physical environment) এবং **জৈব পরিবেশ** (Biotic environment) উভয়কে নিয়েই পরিবেশ। মাটি, জল, বাতাস ইত্যাদি নিয়ে জীবের চারপাশের ভৌত পরিবেশ গঠিত। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নিয়েই গঠিত হয় জৈব পরিবেশ। উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণী তাদের ভৌত পরিবেশের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে না।

জীব ও তার পরিবেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং আন্তঃক্রিয়া বর্তমান। বিজ্ঞানের যে শাখা থেকে জীব এবং তাদের পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে জানা যায়, তাকে **বাস্তু সংস্থান** বা **বাস্তুব্যবিদ্যা** (Ecology) বলে। **রাইটেয়ার** (Reiter) 1865 খ্রীষ্টাব্দে ইকোলজি শব্দটি সর্বপ্রথম চয়ন করেন। বিজ্ঞানী **ফিলিপসন** (Phillipson, 1970)-এর মতে বিজ্ঞানের যে শাখায় জীব-জগতের সঙ্গে ভৌত পরিবেশের আন্তঃক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাকে **ইকোলজি** (Ecology) বলে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণী তাদের ভৌত পরিবেশের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। পৃথিবীর জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলের যে অংশে জীবের অস্তিত্ব বা লক্ষণ দেখা যায় সেই সমুদয় স্থানকে একসঙ্গে **জীবমণ্ডল** বা **বায়োস্ফিয়ার** (Biosphere) বলে। পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণীর) অথবা একটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠস্তরের জীবের মোট ওজনকে **বায়োমাস** (Biomass) বলে। যে ভৌত পরিবেশে জীব বাস করে, তাকে জীবের **বসতি** (Habitat) বলে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের জীব জন্মায়। মরুভূমির রুক্ষ অঞ্চলে যে ধরনের জীব বাস করে তাদের চিরহরিৎ বনাঞ্চলে দেখা যায় না। আবার মিঠা জলে যে জাতীয় মাছ বা অন্যান্য জীব বাস করে তাদের লোনা জলে পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট ধরনের জীব শুধু নির্দিষ্ট ধরনের বসতিতেই জন্মায়।

উদ্ভিদ পরিবেশ হতে নানা উপাদান সংগ্রহ করে খাদ্য তৈরি করে। তৃণভোজী বা শাকাশী প্রাণীরা সে সব উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। মাংসাশী প্রাণীরা

পরোক্ষভাবে উদ্ভিদদেহের উপরেই খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল। আবার মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেহ এবং প্রাণীদের মলমূত্রকে মাটিতে বসবাসকারী মৃতজীবী ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ারা খাদ্য হিসেবে কাজে লাগায়। এর ফলে এসব জৈব পদার্থ হতে নানারকম মৌলিক পদার্থ মুক্ত হয়ে পরিবেশে ফিরে যায়। উদ্ভিদ পুনরায় ঐসব উপাদান নিজের প্রয়োজনে পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে। সুতরাং, যে কোন জীব ও তার পরিবেশের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে সহাবস্থান চলে, তাই একে অন্যকে প্রভাবিত করে।

একই প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সব জীব জন্মায় তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য থাকে এইরকম জীবসমষ্টিকে **জীব সম্প্রদায়** (Biotic community) বলে। কোনও বসতিতে বসবাসকারী বিভিন্ন ধরনের জীবের মধ্যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সাহচর্য গড়ে ওঠে। প্রায় সব জীব সম্প্রদায়েই উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবেরা (microbes) থাকে। এরা দলগতভাবে পরস্পরের সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকে। আবার, কোন নির্দিষ্ট স্থানের উদ্ভিদেরা সেই জায়গার প্রাণীদের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবর্তে সেই অঞ্চলের প্রাণীরাও সেখানকার উদ্ভিদদের উপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করে। আবার নির্দিষ্ট এলাকার ভৌত পরিবেশ এবং সেখানকার সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর অর্থাৎ সেখানকার জীব সম্প্রদায়ের মধ্যেও পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। পরস্পরের মধ্যে 'শক্তি' ও অন্যান্য বস্তুর দেওয়া-নেওয়া চলে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কোন নির্দিষ্ট এলাকার ভৌত পরিবেশ ও সেখানকার জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ধরনের সম্পর্ক থাকে। কোন এলাকার ভৌত পরিবেশ ও সেখানকার জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পারস্পরিক সম্পর্ককেই **ইকোসিস্টেম** বা **বাস্তুতন্ত্র** বা **বাস্তুরীতি** (Ecosystem) বলে। **ই. পি. ওডাম** (E. P. Odum)-এর মতে "ইকোসিস্টেম হল জীবজগৎ ও তার চারপাশের পরিবেশ সহ একটি মূল কার্যকর একক (basic functional unit)।" এই ইকোসিস্টেম শব্দটি সর্বপ্রথম 1935 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ট্যানস্‌লে (Tansley) ব্যবহার করেন।

অবস্থান অনুযায়ী বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম নানা রকমের হতে পারে। যেমন—পুষ্করিণীর ইকোসিস্টেম, অরণ্যের ইকোসিস্টেম, নদীর ইকোসিস্টেম, সমুদ্রের ইকোসিস্টেম ইত্যাদি।

ইকোসিস্টেমের প্রকারভেদ দুটি, যথা—জলজ (Aquatic) ও স্থলজ (Terrestrial)। জলজ ইকোসিস্টেম আবার দু রকমের হয়, যথা—মিঠা জলের ও সামুদ্রিক জলের ইকোসিস্টেম। স্থলজ ইকোসিস্টেমের মধ্যে দেখা যায় বনভূমি, তৃণভূমি, মরুভূমি ইত্যাদির ইকোসিস্টেম।

ইকোসিস্টেম ছোট-বড় নানা আকারের হতে পারে। যেমন, পুষ্করিণীর কিনারা, বড় জলাশয়, একটি অরণ্যের অংশ, কয়েক বর্গ মিটার তৃণভূমি, নদী, সমুদ্র ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম প্রকৃতিতে খুব কমই দেখা যায়।

পৃথিবী-পৃষ্ঠের বিভিন্ন ইকোসিস্টেম একে অন্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। অরণ্যের ইকোসিস্টেমের সঙ্গে নদীর ইকোসিস্টেমের যোগ দেখা যায় এবং নদীর

ইকোসিস্টেম ক্রমে সমুদ্রের লোনা জলের ইকোসিস্টেমের সঙ্গে মিশে যায়। এভাবে বিভিন্ন ইকোসিস্টেম একে অপরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে। জীবমণ্ডলে ইকোসিস্টেম সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্যকর একক। ভূ-পৃষ্ঠে জৈব ও অজৈব বস্তুর একে অন্যের সঙ্গে এবং নিজেদের উপাদানের ভিতর পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মিথঃক্রিয়ার (interaction) ফলে যে ইকোসিস্টেম গড়ে ওঠে তার জন্যই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা এবং জীবের স্থিতি সম্ভব হচ্ছে।

● **ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র কি?** ইকোসিস্টেম হচ্ছে জীবজগৎ ও তার চারপাশের ভৌত পরিবেশকে নিয়ে গঠিত একটি 'কার্যকর একক', যেখানে উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগৎ পরস্পরের সঙ্গে এবং তাদের ঘিরে যে ভৌত পরিবেশ তার সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে।

10.2. ইকোসিস্টেমের জড় বা অজীব ও সজীব উপাদান (Abiotic and Biotic factors of Ecosystem)

ইকোসিস্টেমের গঠন-প্রকৃতি নির্ণীত হয় জড় বা অজীব ও সজীব—এই দুই প্রকার উপাদান দ্বারা।

ইকোসিস্টেমের (a) **জড় বা অজীব উপাদানগুলি** হল—

(1) **অজৈব উপাদান :** নানারকম খনিজ লবণ, যেমন ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার ইত্যাদি এবং অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল, মাটি ইত্যাদি হল ইকোসিস্টেমের অজৈব উপাদান। তাছাড়া অ্যামাইনো অ্যাসিড, হিউমিক অ্যাসিড ইত্যাদিও এই পর্যায়ে পড়ে। অজৈব উপাদানগুলি উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদের খাদ্যের প্রাথমিক বস্তু।

(2) **জৈব উপাদান :** মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের বিভিন্ন রকমের জৈব বস্তুর পচনের ফলে উৎপন্ন পদার্থসকল পরিবেশের জৈব উপাদানের অন্তর্গত।

(3) **ভৌত অবস্থা :** নিম্নলিখিত কয়েকটি শর্তের উপর পরিবেশের ভৌত অবস্থা নির্ভরশীল।

(i) **আবহাওয়া** (Climate) **:** কোন পরিবেশের আবহাওয়া সূর্যালোক, উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর চাপ, বায়ুর আর্দ্রতা, বছরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, তুষারপাত ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(ii) **মাটি সংক্রান্ত কারণ** (Soil factors) **:** কোন স্থানের পরিবেশ সেই স্থানের মাটির জলের পরিমাণ, মাটির মধ্যে জলের অণুস্রবণ (Percolation), মাটির উপরিভাগের জলের বাষ্পীভবন, মাটির নিচের জলের তল, মাটির কণার কৈশিকত্ব, মাটির উষ্ণতা, মাটির বায়ু, মাটির রসের প্রকৃতি অর্থাৎ মাটির রস অম্ল, ক্ষারীয় অথবা প্রশমিত (neutral) কিনা ইত্যাদির উপর অনেকটা নির্ভরশীল।

(iii) **ভূ-সাংস্থানিক কারণ** (Physiographic or Topographic factors) **:** কোন স্থানের উচ্চতা, ঢাল অথবা খাড়া অবস্থা, ঐ স্থান কি রকম সূর্যের আলো পায় ও বায়ুপ্রবাহের সম্মুখীন হয় এবং পর্বতশ্রেণীর বিস্তৃতির দিক ইত্যাদিও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে।

সুতরাং আবহাওয়া, মাটি সংক্রান্ত কারণ এবং ভূ-সাংস্থানিক কারণ ইকোসিস্টেমের জড় বা অজীব উপাদানের ভৌত অবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

(b) **সজীব উপাদান** : জীবমাত্রই ইকোসিস্টেমের সজীব উপাদানের অন্তর্গত।

বিজ্ঞানী **ওডাম** (Odum) ইকোসিস্টেমের জীব সম্প্রদায়কে কার্যকর দিক হতে দুটি অংশে ভাগ করেছেন। যথা—

(i) **স্বভোজী অংশ** (Autotrophic components) : জীব সম্প্রদায়ের যে সমস্ত সজীব সদস্য নিজেদের খাদ্য তৈরি করার জন্য জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি অজৈব উপাদান ও আলোকশক্তি সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে, তারা গণ্য হয় **স্বভোজী অংশরূপে**। ক্লোরোফিলযুক্ত সবুজ উদ্ভিদগুলি এই অংশের অন্তর্ভুক্ত।

(ii) **পরভোজী অংশ** (Heterotrophic components) : জীব সম্প্রদায়ের যে সমস্ত সজীব সদস্য স্বভোজীদের সংশ্লেষিত যৌগগুলি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে অর্জিত যৌগের পুনর্বিন্যাস ও রূপান্তর ঘটায়, তাদের **পরভোজী অংশ** বলে। কতিপয় উদ্ভিদ ও প্রায় সব রকম প্রাণীই পরভোজী অংশের অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণভাবে, ইকোসিস্টেমের সজীব বা জীবিত উপাদান চার প্রকার। যেমন—

(1) **উৎপাদক** (Producer), (2) **খাদক** বা **ভক্ষক** (Consumer), (3) **বিয়োজক** (Decomposer) এবং (4) **পরিবর্তক** বা **রূপান্তরক** (Transformer)।

(1) **উৎপাদক** : ক্লোরোফিলযুক্ত সবুজ উদ্ভিদ, যারা সূর্যের আলোকশক্তির সাহায্যে পরিবেশ হতে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের মধ্যে রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈরি করে, তাদের **উৎপাদক** বলে। এই প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ হয়। উৎপাদকদের আবার **স্বভোজীও** বলে, কারণ এরা নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরি করতে পারে। পৃথক পৃথক ইকোসিস্টেমের উৎপাদক অংশ হল—তৃণভূমির তৃণ, অরণ্যের বৃক্ষরাজি, পুষ্করিণীর সবুজ উদ্ভিদ ও সমুদ্রের শৈবাল ইত্যাদি।

(2) **খাদক** : ইকোসিস্টেমের উৎপাদক যে সব খাদ্যবস্তু তৈরি করে, সেই সব খাদ্য খেয়ে যারা বেঁচে থাকে, তাদের **খাদক** বা **ভক্ষক** বলে। সকল প্রাণীই খাদক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। খাদক আবার নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হয় :

(a) **প্রথম সারির খাদক বা প্রথম পর্যায়ভুক্ত খাদক** (First order Consumers or Primary Consumers) : বিভিন্ন শ্রেণীর-তৃণভোজী, শস্যভোজী এবং শাকাশী প্রাণী সরাসরি নানাপ্রকার উদ্ভিদ ও তাদের অংশবিশেষ (উৎপাদক) খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের **প্রথম সারির খাদক** বলে। এই সারির অন্তর্গত হল তৃণভূমির বাইসন, অরণ্যের হরিণ, পুষ্করিণীর কবচি প্রাণী (Crustaceans)

ইত্যাদি, তাছাড়া রোমন্থক প্রাণী (যেমন—গরু, মহিষ, ভেড়া ইত্যাদি) এবং ইঁদুর, বানর, পায়রা, চড়ুই, প্রজাপতি ইত্যাদি।

চিত্র 10.1 : ইকোসিস্টেমের খাদ্য-খাদক সম্পর্কের চিত্ররূপ।

(b) **দ্বিতীয় সারির খাদক বা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক বা গৌণ খাদক (Second order Consumers or Secondary Consumers) :** প্রথম সারির খাদকদের খেয়ে যারা বেঁচে থাকে, তাদের দ্বিতীয় সারির খাদক বলে। এই শ্রেণীর উদাহরণ হল—বাঘ, সিংহ, সাপ, ব্যাঙ, সারস, মাকড়সা ইত্যাদি।

(c) **তৃতীয় সারির খাদক বা তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক (Third order Consumers or Tertiary Consumers) :** দ্বিতীয় সারির খাদকদের যারা খায়, তাদের তৃতীয় সারির খাদক বলে। বাজপাখি, শকুন ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আবার মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন কোন প্রাণী একাধিক সারির খাদক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ময়ূর যখন উদ্ভিদজাত খাবার খায় তখন তারা 'প্রথম সারির খাদক' কিন্তু যখন তারা ছোট ছোট সাপ ধরে খায় তখন তারা 'তৃতীয় সারির খাদক'।

নিচে একটি ছকের সাহায্যে বিভিন্ন শ্রেণীর খাদকদের সম্পর্ক দেখানো হল :

শাকাশী পতঙ্গ ⟶ ব্যাঙ ⟶ সাপ
(প্রথম সারির খাদক) (দ্বিতীয় সারির খাদক) (তৃতীয় সারির খাদক
↓
ময়ূর (চতুর্থ সারির খাদক)

দ্বিতীয় সারি হতে চতুর্থ সারির খাদক পর্যন্ত সবাই **মাংসাশী** (Carnivores)। কারণ এরা নানা ধরনের প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সাধারণত চতুর্থ সারির খাদকদের শীর্ষ শ্রেণীর মাংসাশী (Top Carnivores) বলে।

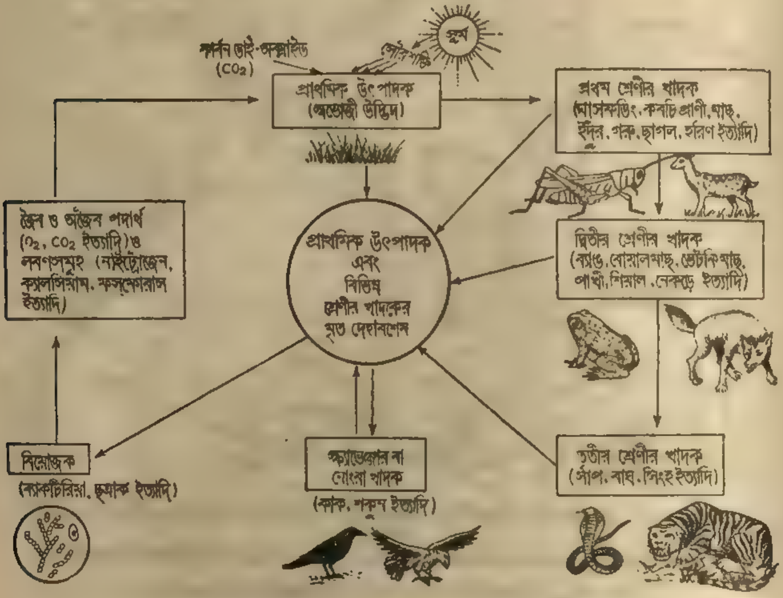

চিত্র 10.2 : খাদ্য-শৃঙ্খলের সঙ্গে সম্পর্কিত বাস্তুরীতির নানান অংশ।

উক্ত প্রাণীরা ছাড়া, ইকোসিস্টেমের **পরজীবী** (Parasites) এবং **মৃতজীবী** (Saprophytes) জীবরাও খাদক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পরজীবী উদ্ভিদ ও প্রাণী, সজীব উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ হতে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে। আবার মৃতজীবীরা মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ হতে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে। কাক, শকুন ইত্যাদি নোংরা খাদক প্রাণীরা বা স্ক্যাভেঞ্জাররা (Scavangers) মৃত জীবদেহ ও আবর্জনাকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে।

(3) **বিয়োজক :** কয়েক শ্রেণীর ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা উৎপাদক ও খাদকদের মৃতদেহ হতে পুষ্টি লাভ করে। এর ফলে উক্ত জীবদের মৃতদেহের বিশরণ ঘটে সেখানকার জটিল জৈব যৌগ সরল জৈব যৌগে পরিণত হয়।

(4) **পরিবর্তক বা রূপান্তরক :** কয়েক শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়া এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এরা বিয়োজক দ্বারা পরিবর্তিত সরল জৈব যৌগের আরও বিশরণ ঘটিয়ে তাদের অজৈব যৌগ অথবা মৌলে পরিবর্তিত করে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। এইসব পরিবর্তিত উপাদান পুনরায় উৎপাদকদের গ্রহণযোগ্য হয় এবং উৎপাদক উদ্ভিদ ঐ উপাদানগুলিকে পরিবেশ হতে সংগ্রহ করে।

সুতরাং, বিয়োজক ও পরিবর্তক বা রূপান্তরক ইকোসিস্টেমকে সক্রিয় রাখে (চিত্র 10.3)। খাদক, বিয়োজক ও পরিবর্তক শ্রেণীভুক্ত সকল জীব পরভোজী

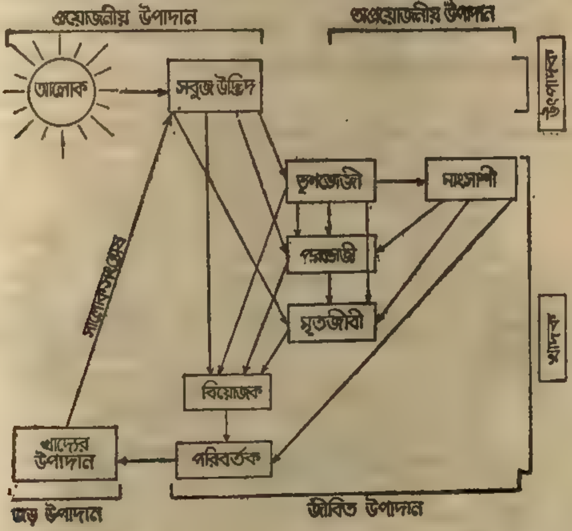

চিত্র 10.3 : ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।

(Heterotrophs) নামে পরিচিত। কারণ, এরা সকলেই খাবারের জন্য উৎপাদকদের অর্থাৎ স্বভোজীদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।

10.3. ইকোসিস্টেমের কার্য পদ্ধতি (Operation of Ecosystem)

ইকোসিস্টেমের কার্যধারার মূল পর্যায়গুলি হল নিম্নরূপ :

(i) সূর্যের আলোকশক্তি শোষণ ;

(ii) উৎপাদক দ্বারা পরিবেশ হতে সংগৃহীত অজৈব উপাদান সংগ্রহ এবং তা দিয়ে জৈব পদার্থ তৈরি করা ;

(iii) বিভিন্ন সারির খাদক দ্বারা ক্রমান্বয়ে উৎপাদক ও নিম্ন সারির খাদককে খাদ্যরূপে গ্রহণ এবং গৃহীত বস্তুর আত্তীকরণ ;

(iv) মৃত উৎপাদক ও খাদকদের দেহের জটিল জৈব যৌগের বিশরণ ও পরিশেষে তা থেকে উৎপাদক উদ্ভিদের পুনরায় গ্রহণযোগ্য অজৈব বস্তুর উৎপাদন।

10.4. স্বয়ংসম্পূর্ণ পুষ্করিণীর বাস্তুতন্ত্রের বিবরণ (Description of self-sufficient Ecosystem of a Pond)

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ হল পুষ্করিণী। একটি পুষ্করিণীর বাস্তুতন্ত্রের কার্যকর উপাদানগুলি সম্পর্কে পরপৃষ্ঠায় আলোচনা করা হল।

(a) **অজীব পদার্থ** (Abiotic substances) ঃ পুষ্করিণীর বাস্তুতন্ত্রের অজীব অংশ নানা মৌলিক জৈব ও অজৈব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলি হল—জল, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, নাইট্রোজেন জাতীয় লবণ, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও হিউমিক অ্যাসিড। বিভিন্ন জীব তাদের পুষ্টি লাভ করে অজীব পদার্থগুলি হতে।

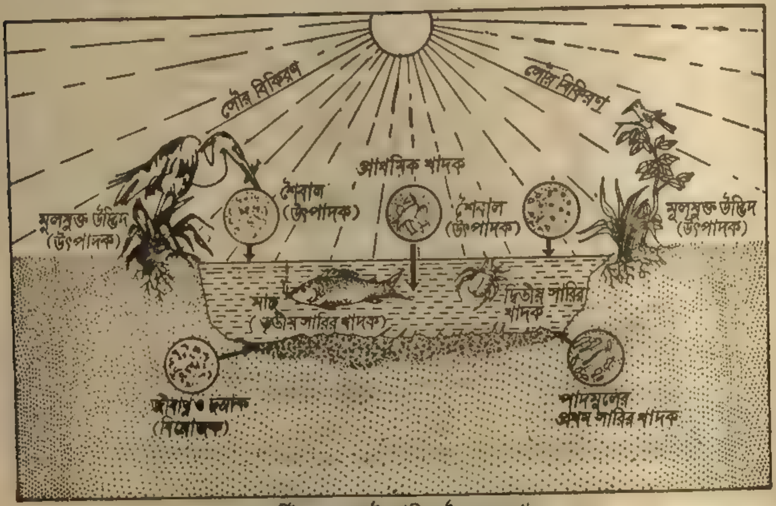

একটি পুকুরের ইকোসিস্টেমের নক্শা

চিত্র 10.4

(b) **উৎপাদক জীব** (Producers) ঃ পুষ্করিণীর জলে দু রকমের উৎপাদক জীব দেখা যায় ঃ

(i) বড় আকারের উদ্ভিদগুলি অপেক্ষাকৃত কম জলের নিচে মাটির মধ্যে মূল দ্বারা আবদ্ধ থাকে, যেমন—হাইড্রিলা, পাতাশ্যাওলা, স্যাজিট্টারিয়া ইত্যাদি। আবার (ii) কিছু উদ্ভিদ জলে ভাসমান অবস্থায় থাকে, যেমন—কচুরিপানা, টোপাপানা, ক্ষুদিপানা, ফাইটো-প্ল্যাংকটন (Phyto-plankton) ইত্যাদি।

(c) **খাদক ঃ** কিছু জলজ পতঙ্গ, কবচি প্রাণী (Crustaceans), জু-প্ল্যাংকটন, শাকাশী পতঙ্গ, শূককীট (Larvae of insects) প্রভৃতি হল পুষ্করিণীর **প্রথম শ্রেণীর বা প্রথম স্তরের খাদক**।

আবার কিছু জলজ পতঙ্গ ও ছোট ছোট মাছ প্রথম শ্রেণীর খাদকদের ভক্ষণ করে। সুতরাং এরাই পুষ্করিণীর **দ্বিতীয় শ্রেণীর বা দ্বিতীয় স্তরের খাদক**।

আবার পুষ্করিণীর ছোট ছোট মাছকে ভক্ষণ করে শোল, শাল, বোয়াল, লেঠা প্রভৃতি বড় বড় মাছ। এদের বলে **তৃতীয় শ্রেণীর বা তৃতীয় স্তরের খাদক**।

পুষ্করিণীতে নানা প্রকারের পরজীবী ও মৃতজীবী বাস করে। বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া পুষ্করিণীর মধ্যে **বিয়োজকের** কাজ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত দেহাবশেষের উপর এরা জন্মায় এবং পচনক্রিয়া সম্পন্ন করে। ফলে মৃতকলার জটিল যৌগগুলি ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত হয়।

(d) **পরিবর্তক বা রূপান্তরক** : কয়েক শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়া পরিবর্তকের অন্তর্গত। এরা বিয়োজক দ্বারা পরিবর্তিত সরল জৈব যৌগের আরও বিশরণ ঘটিয়ে সেগুলিকে অজৈব যৌগ অথবা মৌলে পরিবর্তিত করে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। এইসব পরিবর্তিত উপাদান পুনরায় উৎপাদকদের গ্রহণযোগ্য হয়।

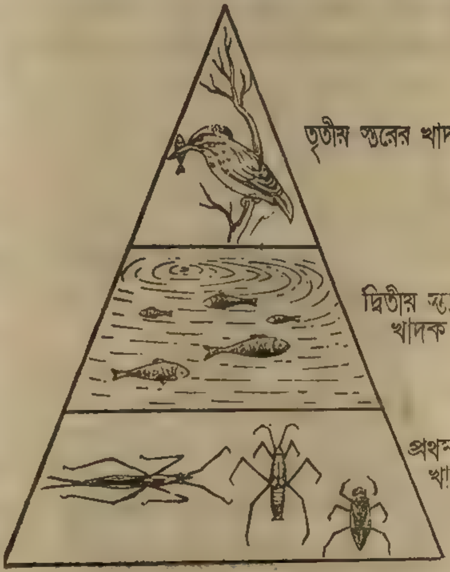

চিত্র 10.5 : জলজ পরিবেশের বিভিন্ন খাদকস্তরের চিত্র।

তারপর ঐ সকল সরল জৈব, অজৈব পদার্থ ও লবণসমূহ স্বভোজী উদ্ভিদেরা গ্রহণ করে নিজেদের খাবার তৈরি করে।

সুতরাং ইকোসিস্টেমকে সক্রিয় রাখে বিয়োজক ও পরিবর্তক শ্রেণীর অন্তর্গত সকল জীব।

জলে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদকে **ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন** (Phyto-plankton) এবং জলে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীকে **জু-প্ল্যাঙ্কটন** (Zoo-plankton) বলে।

পুষ্করিণীর তলদেশে মাটির বুকে যে সকল জীব বসবাস করে, তাদের **বেনথস** (Benthos) বলে।

সাঁতারু জলজ প্রাণীদের (যথা—মাছ, তিমি, অক্টোপাস, সিপিয়া, চিংড়ি ইত্যাদিকে) **নেকটন** (Nekton) বলে।

স্বভোজী ও পরভোজী জীবদের জলের তলদেশে থিতিয়ে পড়া দেহাংশগুলিকে বলে **কর্কর** (Detritus)। যারা কর্কর ভক্ষণ করে, তাদের বলা হয় **কর্করভুক** (Detritivores)।

10.5 খাদ্য-শৃঙ্খল (Food Chain)

জীবজগতে কেবলমাত্র ক্লোরোফিল কণাযুক্ত উদ্ভিদরাই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করতে পারে। উদ্ভিদ যে খাবার তৈরি করে, তার কিছু অংশ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং বাকী অংশ তৃণভোজী প্রাণীদের জন্য সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে নিজেদের দেহে সঞ্চয় করে রাখে। আবার, মাংসাশী প্রাণীরা তৃণভোজীদের খাদ্যরূপে খায়। সুতরাং, কোন একটি বসতির উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে **খাদ্য-খাদক সম্পর্ক** থাকে, এই খাদ্য-খাদক সম্পর্ক হতেই 'খাদ্য-শৃঙ্খলের' উৎপত্তি। খাদ্য ধারাবাহিকভাবে এক খাদক হতে অন্য খাদকে পৌঁছায়। উৎপাদক এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির খাদক এরা প্রত্যেকেই এই খাদ্য-শৃঙ্খলের এক-একটি আংটি। প্রথম সারির খাদক উৎপাদককে খায়। দ্বিতীয় সারির খাদক খায় প্রথম সারির খাদককে। আবার দ্বিতীয় সারির খাদকেরা তৃতীয় সারির খাদকের খাবার।

চিত্র 10.6 ঃ একটি শিকারজীবী খাদ্য-শৃঙ্খল।

● **খাদ্যের ভিতরকার শক্তি উৎপাদক উদ্ভিদ হতে একের পর এক খাদ্য-খাদক সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে বাহিত হয়। খাদ্য-শক্তি প্রবাহের এরূপ ধারাবাহিকতায় উৎপাদক হতে শুরু করে শেষ খাদক পর্যন্ত যে শৃঙ্খল রচিত হয়, তাকে খাদ্য-শৃঙ্খল বলে** (ওডাম, 1966)। খাদ্যের মধ্যস্থিত শক্তি জীব হতে জীবে প্রবাহিত এবং রূপান্তরিত হয়ে বাস্তুতন্ত্রকে স্থিতিশীল রাখে। অন্যভাবে বলা যায়, **খাদ্যের বন্ধনে আবদ্ধ কয়েক প্রকার জীবের এক-একটি দলই হল 'খাদ্য-শৃঙ্খল'।**

খাদ্য-শৃঙ্খল প্রধানত তিন রকমের হয়। যেমন – (1) **শিকারজীবী শৃঙ্খল** (Predator chain)—এই শৃঙ্খল উৎপাদক উদ্ভিদ হতে শুরু হয় এবং এর পরবর্তী ধাপগুলিতে জীবের আকার ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং সংখ্যা কমতে থাকে (চিত্র 10.6)। (2) **পরজীবী শৃঙ্খল** (Parasitic chain)—এটি বৃহৎ জীব হতে শুরু হয়ে ক্ষুদ্র জীবে শেষ হয়। পরজীবীরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। (3) **মৃতজীবী শৃঙ্খল** (Saprophytic chain)—এটি মৃতজীবী হতে শুরু হয়ে ব্যাকটিরিয়াতে শেষ হয়।

উৎপাদকই সব খাদ্য-শৃঙ্খলের গোড়া এবং সেজন্য খাদ্য-শৃঙ্খলের অন্যান্য পর্যায়ের অস্তিত্ব উৎপাদকের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। তাই, উৎপাদককে ভিত্তি করে বিভিন্ন স্তরের খাদক খাদ্য-শৃঙ্খলের অন্যান্য পর্যায় গঠন করে। উৎপাদক ছাড়া খাদ্য-শৃঙ্খলে থাকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিন সারির খাদক।

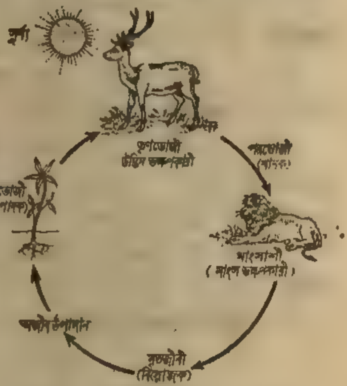

চিত্র 10.7 একটি খাদ্য-শৃঙ্খলের চিত্র।

নিচে খাদ্য-শৃঙ্খলের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল:

(1) শস্য (উৎপাদক)→ইঁদুর (প্রথম সারির খাদক)→সাপ (দ্বিতীয় সারির খাদক)→ঈগল পাখি (তৃতীয় বা সর্বোচ্চ সারির খাদক)।

(2) শ্যাওলা→মশার শূককীট বা জলের পোকা→ব্যাঙ বা ছোট ছোট মাছ→বক বা মাছরাঙা বা বড় বড় মাছ।

(3) ঘাস→ঘাস ফড়িং→ব্যাঙ→সাপ→বাজপাখি বা ময়ূর।

(4) ঘাস→হরিণ→বাঘ বা সিংহ।

খাদ্য-জাল (Food web): একটি ইকোসিস্টেমে অনেক খাদ্য-শৃঙ্খল থাকে। বিভিন্ন প্রজাতির জীবের মাধ্যমে এইসব খাদ্য-শৃঙ্খল একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এইভাবে সংযুক্ত খাদ্য-শৃঙ্খলগুলিকে বলা হয় **খাদ্য-জাল** (Food web)। নিচে অরণ্যের ইকোসিস্টেমে কয়েকটি খাদ্য-শৃঙ্খলের সংযোগে রচিত খাদ্য-জাল দেখানো হল:

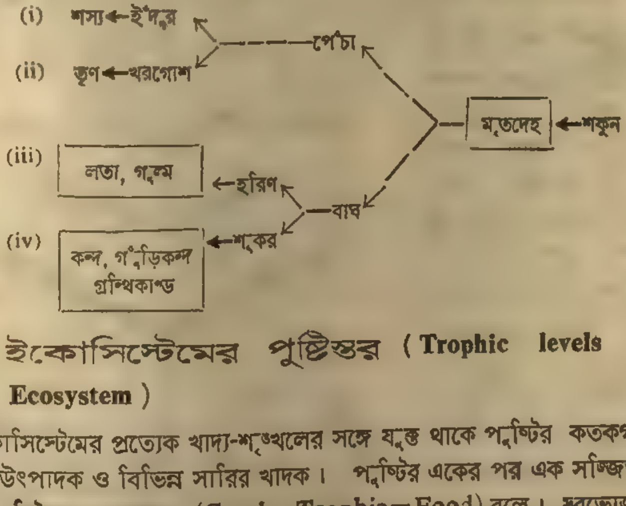

10.6. ইকোসিস্টেমের পুষ্টিস্তর (Trophic levels of an Ecosystem)

ইকোসিস্টেমের প্রত্যেক খাদ্য-শৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত থাকে পুষ্টির কতকগুলি স্তর, যেমন—উৎপাদক ও বিভিন্ন সারির খাদক। পুষ্টির একের পর এক সজ্জিত প্রতিটি স্তরকে **পুষ্টিস্তর বা খাদ্যস্তর** (Greek : Trophic=Food) বলে। স্বভোজী সবুজ

উদ্ভিদদের দ্বারা গঠিত হয় প্রথম পুষ্টিস্তর। শাকাশী খাদকেরা গঠন করে দ্বিতীয় পুষ্টিস্তর। আর মাংসাশী খাদকেরা হল তৃতীয় পুষ্টিস্তর। কোন ইকোসিস্টেমের পুষ্টি-গঠনকে (Trophic structure) বলে **বাস্তু-সাংস্থানিক শিখর** বা **ইকোলজিক্যাল পিরামিড** (Ecological pyramid)।

প্রত্যেক ইকোসিস্টেমের **খাদ্য-জাল** বা **খাদ্যচক্র** এক-একটি পিরামিডের আকার ধারণ করে [**এলটন** (Elton),1939]।

এলটন কর্তৃক বর্ণিত এরূপ পিরামিডকে **এলটনের পিরামিড** (Eltonian Pyramid) বলে। খাদ্য ও খাদক সম্পর্ক নিয়ে এ ধরনের পিরামিড গঠিত হয় বলে এদের আবার **খাদ্য পিরামিড** (Food pyramid)-ও বলে।

যে কোন জীব-সম্প্রদায়ে (Community) বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের জীবদের নিয়ে তিন রকমের পিরামিড রচিত হয়। নিচে ঐ তিন প্রকার পিরামিডের বিবরণ দেওয়া হল ঃ

(a) **সংখ্যাভিত্তিক পিরামিড** বা **শিখর** (Pyramid of numbers) ঃ এক্ষেত্রে প্রতি পুষ্টিস্তরের প্রতি একক ক্ষেত্রফলযুক্ত স্থানে জীবদের সংখ্যাভিত্তিক সম্পর্ককে বোঝায়। প্রাথমিক উৎপাদক শ্রেণীর জীবেরা এই ধরনের শিখরের ভূমিতে অবস্থান করে। ইকোসিস্টেমের অন্যান্য সারির জীব, যথা—প্রথম সারির খাদক, দ্বিতীয় সারির খাদক, তৃতীয় সারির খাদক ইত্যাদি সংখ্যাভিত্তিক ক্রমপর্যায় অনুযায়ী নিচ হতে উপরের দিকে সাজানো থাকে। সংখ্যাভিত্তিক শিখরের ভূমি থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত প্রতিটি পুষ্টিস্তরে জীবের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। উৎপাদকদের সংখ্যা প্রথম সারির খাদকদের তুলনায় হয় অনেক বেশী। আবার, প্রথম সারির খাদক অপেক্ষা দ্বিতীয় সারির খাদকদের সংখ্যা কম হয়। তেমনি দ্বিতীয় সারির খাদকের চেয়ে তৃতীয় সারির খাদকের সংখ্যা হয় আরও কম। ইকোসিস্টেমের প্রতিটি পুষ্টিস্তরে জীবের সংখ্যার উপর নির্ভর করে এই রকম যে পিরামিড বা

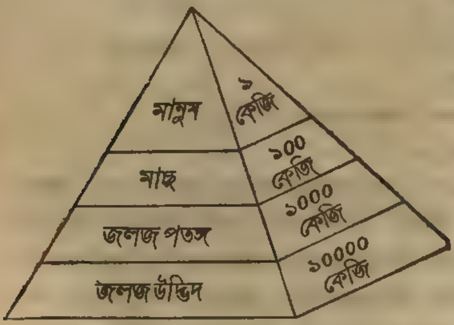

চিত্র 10.8 ঃ খাদ্য পিরামিড।

চিত্র 10.9 ঃ খাদ্য পিরামিড—স্থলজ ও সামুদ্রিক।

শিখর গঠিত হয়, তাকে বলে **সংখ্যাভিত্তিক শিখর বা সংখ্যার পিরামিড** (Pyramid of numbers) (চিত্র 10.10)।

(b) **শক্তিজনিত পিরামিড বা শিখর** (Pyramid of energy)ঃ শক্তিজনিত শিখর বলতে ইকোসিস্টেমের নির্দিষ্ট খাদ্য-শৃঙ্খলের প্রতিটি পুষ্টি-স্তরের সর্বমোট শক্তির পরিমাণকে বোঝায়। এই শিখরের ভূমিতে অবস্থিত সবুজ উৎপাদক শ্রেণীর পুষ্টিস্তরের সবশুদ্ধ শক্তির পরিমাণ সবার চেয়ে বেশী এবং শিখরের শীর্ষদেশে অবস্থিত পুষ্টি-স্তরের শক্তির পরিমাণ সবার চেয়ে কম। এর কারণ হল, একটি পুষ্টিস্তর হতে অপর একটি পুষ্টি-স্তরে শক্তির স্থানান্তরণের সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির অপচয় বা হ্রাস ঘটে। সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির সময় স্বভোজী সবুজ উদ্ভিদেরা আলোকশক্তির প্রায় শতকরা 20 ভাগ গ্রহণ করে। আবার শ্বসন পদ্ধতির সময় সবচেয়ে নিচের পুষ্টিস্তর হতে শীর্ষ পুষ্টিস্তর পর্যন্ত শক্তির পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। উৎপাদক হতে শুরু করে সর্বোচ্চ খাদক স্তর পর্যন্ত প্রতি ধাপে শক্তির স্থানান্তর হবার সময় 80—90 শতাংশ শক্তির তাপ-শক্তিরূপে অপচয় ঘটে। ফলে একটি খাড়া পিরামিড এক্ষেত্রে গঠিত হয় (চিত্র 10.11)।

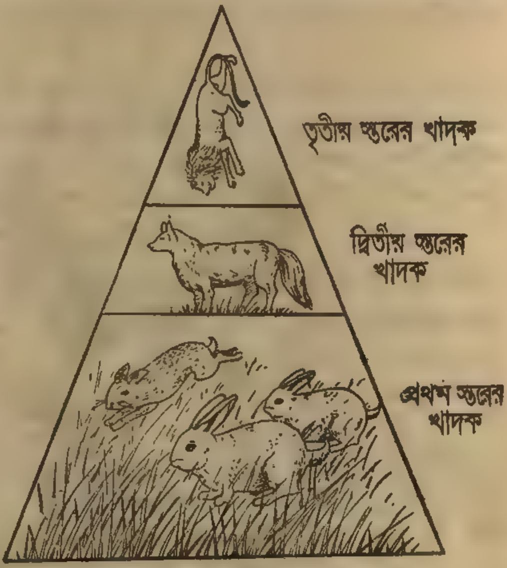

চিত্র 10.10 : সংখ্যার পিরামিড।

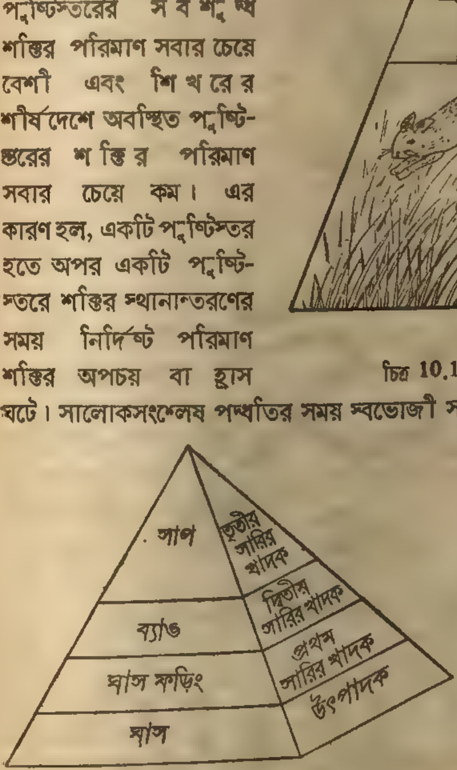

চিত্র 10.11 : শক্তিজনিত শিখর।

(c) **জীব-ভরভিত্তিক পিরামিড বা শিখর** (Pyramid of Biomass)ঃ কোন ইকোসিস্টেমের নির্দিষ্ট খাদ্য-শৃঙ্খলের প্রতিটি খাদ্যস্তরের বা পুষ্টিস্তরের জীব-ভরের (Biomass) ভিত্তিতে গঠিত পিরামিডকে বলে **জীব-ভরভিত্তিক পিরামিড**।

চিত্র 10.12. জীব-ভরভিত্তিক শিখর।

সংখ্যাভিত্তিক ও শক্তিভিত্তিক শিখরের মত জীব-ভরভিত্তিক বা শিখরের পিরামিডের ক্ষেত্রেও ভূমি হতে শীর্ষস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের জীব-ভর ক্রমশ কমতে থাকে (চিত্র 10.12)।

প্রাথমিক উৎপাদকের ওজন বেশী হলে এবং বিভিন্ন খাদক স্তরের ওজন ক্রমান্বয়ে কম হলে একটি খাড়া পিরামিড গঠিত হয়। উদাহরণ—বনভূমির ইকোসিস্টেম।

ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন পুষ্টিস্তরে জীববস্তুর ওজনের উপর নির্ভর করে এই পিরামিড গঠিত। তাই একে **জীব-ভরভিত্তিক শিখর** বা **বায়োমাসের পিরামিড** (Pyramid of Biomass) বলে। প্রতিটি পুষ্টিস্তরে অংশগ্রহণকারী সজীব বস্তুগুলির ওজনকেই বলে **বায়োমাস** (Biomass)। কিন্তু পরজীবীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় জীব-ভরভিত্তিক শিখর বিপরীতমুখী (inverted)।

10.7. ইকোসিস্টেমে শক্তিপ্রবাহ (Energy flow in Ecosystem)

ইকোসিস্টেমের সভ্যদের মধ্যে যে সব সম্পর্ক দেখা যায় (যেমন এক জীবের সঙ্গে অপর জীবের এবং তাদের সঙ্গে আবার নির্জীব বা জড় পরিবেশের) তাদের মূলে আছে শক্তি। যে কোন ইকোসিস্টেমের শক্তির মূল উৎস হল 'সূর্য'। সবুজ উদ্ভিদ অর্থাৎ ইকোসিস্টেমের উৎপাদক ভিন্ন আর কোন জীব ঐ সৌরশক্তিকে কাজে লাগাতে পারে না। ঐ উদ্ভিদরা সৌরশক্তিকে জীবজগতের ভিতর নিয়ে আসে। সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে সবুজ উদ্ভিদরা সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে উৎপন্ন খাদ্যবস্তুর মধ্যে **স্থিতি শক্তি** হিসেবে জমা রাখে। উৎপাদক হতে ঐ শক্তি খাদ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন সারির খাদকের দেহে পরিবাহিত হয়।

থার্মোডায়নামিক্সের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র জীবজগতে শক্তির প্রবাহে পুরোপুরি কার্যকর। থার্মোডায়নামিক্সের (Thermodynamics) প্রথম সূত্র অনুযায়ী শক্তি সৃষ্টি বা বিনষ্ট হয় না। উপরন্তু এক ধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর। দ্বিতীয় সূত্রটি হল, একপ্রকার শক্তি যখন অন্য-প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তখন প্রয়োজনের তাগিদে কিছু শক্তির অপচয় ঘটে।

ইকোসিস্টেমে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শক্তিপ্রবাহ। এতে শক্তির আবর্তন কখনও ঘটে না। তার পরিবর্তে শক্তি অনবরত ও দ্রুত রূপান্তরিত হয়। তাছাড়া, ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ শক্তি পুষ্টিস্তরের ক্রমপর্যায়ে অর্থাৎ এক স্তর হতে অন্য স্তরে পরিবাহিত বা স্থানান্তরিত হয়। প্রত্যেক পুষ্টিস্তরে কিছু পরিমাণ শক্তির অপচয় ঘটে। তাই বাইরের পরিবেশ থেকে ইকোসিস্টেমের মধ্যে শক্তি অর্জনের প্রয়োজন দেখা দেয়। উৎস থেকে শুরু করে শেষ পুষ্টিস্তর পর্যন্ত শক্তি পরিবাহিত হওয়ার ঘটনাকে বলে **শক্তিপ্রবাহ** (energy flow)। শক্তির প্রবাহ তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যেমন শক্তির অর্জন, সেই শক্তির ব্যবহার ও তার স্থানান্তরণ। এই তিনটি পর্যায় পৃথক পৃথক ভাবে নিচে আলোচিত হল ঃ

(a) **শক্তির অর্জন** (Acquisition of energy) ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে ইকোসিস্টেমে বিভিন্ন পুষ্টিস্তর বর্তমান। সেইসব পুষ্টিস্তরের শক্তির প্রাথমিক

উৎস হল **সৌর বিকিরণ** (Solar radiation)। $12{\cdot}3 \times 10^{22}$ ক্যালোরি সৌরশক্তি প্রতি বছর পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। তার মধ্যে বেশীর ভাগ সৌর বিকিরণ মেঘ, ধোঁয়া, ধূলোবালি ইত্যাদির উপস্থিতিতে প্রতিফলিত হয়ে আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। জার্মান বিজ্ঞানী **রুডলফ গাইগার** (Rudolf Geiger)-এর মতে, পৃথিবীর দিকে অন্তর্গামী সৌরশক্তির প্রায় 42 শতাংশ মেঘ ও ধূলোবালির দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। আর 10 শতাংশ সৌরশক্তি বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ওজোন, অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, কার্বনিক অ্যাসিড ইত্যাদি বস্তুকণা দ্বারা শোষিত হয়। দিনের বেলায় সৌর বিকিরণের কেবলমাত্র শতকরা 48 ভাগ ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। ভূ-পৃষ্ঠ হতেও কিছুটা আলোকশক্তি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। অবশিষ্ট আলোকশক্তি পরবর্তীকালে শোষিত হয় ক্লোরোফিলযুক্ত সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা। ফলে আলোকশক্তি রূপান্তরিত হয় রাসায়নিক শক্তিতে, যে রাসায়নিক শক্তি স্থৈতিক শক্তিরূপে শর্করার মধ্যে সঞ্চিত থাকে। অতএব বোঝা গেল যে, সূর্যই ইকোসিস্টেমের শক্তির প্রাথমিক উৎস।

শক্তি সংবন্ধনের পরিমাণ সর্বক্ষেত্রে সমান হয় না। উন্নত মানের কৃষিক্ষেত্রে দেখা যায় এর পরিমাণ শতকরা 5 ভাগ। আবার জলের ইকোসিস্টেমের পরিমাণ শতকরা 0·2 ভাগ।

সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয় শর্করা। উদ্ভিদের শ্বসনকালে ঐ শর্করার জারণের ফলে উৎপন্ন হয় শক্তি, যে শক্তি উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে প্রয়োজনীয় শক্তিরূপে ব্যবহার হয়। সাধারণত দিনের বেলায় উদ্ভিদের উৎপন্ন শর্করার পরিমাণ শ্বসনকালে জারিত শর্করার পরিমাণের চেয়ে বেশী থাকে। অন্ধকারে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতি বন্ধ থাকা-কালীন কিন্তু শ্বসনকার্য চলে। তখন শর্করার পরিমাণ কমে যায়।

উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদেরা সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির সময় সৌরশক্তির সাহায্যে যে পরিমাণ শর্করা (গ্লুকোজ) উৎপন্ন করে তা হল ইকোসিস্টেমের **প্রাথমিক উৎপাদন** (Primary production)। তাতে যে পরিমাণ শক্তির সংবন্ধন ঘটে, তাকে **মোট উৎপাদন** (Gross production) বলে। শ্বসন ও অন্যান্য জৈবনিক কাজে খরচ হয়ে যে পরিমাণ শক্তি অবশিষ্ট থাকে, তাকে **আসল** বা **প্রকৃত উৎপাদন** (Net Production or NP) বলে। সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির মৌল সমীকরণটির দ্বারা উৎপাদক কর্তৃক শক্তি-সংবন্ধনের পরিমাণ এবং হার নির্ণয় করা যায়। যেমন—

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{673 কিলো ক্যালোরি}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

(b) **শক্তির ব্যবহার** (Use of energy)ঃ ইকোসিস্টেমে উৎপাদকেরা আলোকশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য আলোক বর্ণালী, জল ও CO_2 দ্বারা কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে। উৎপাদকদের দেহে যে স্থৈতিক শক্তি থাকে তাকে প্রাথমিক স্তরের ব্যবহারকারীরা পেয়ে থাকে। আবার

সেভাবেই প্রথম সারির খাদকদের আসল স্থৈতিক শক্তিকে দ্বিতীয় সারির খাদকরা গ্রহণ করে নিজেদের বিপাকীয় কাজে ব্যয় করে। স্থানান্তরিত ও ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ প্রতিটি পুষ্টিস্তরের **জীব-ভরের** (Biomass, সংক্ষেপে B) সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় যে, প্রাণীদের শক্তি অর্জনের উপায় হল খাদ্য। ঐ অর্জিত শক্তির পরিমাণকে **আসল অর্জিত শক্তি** (gross energy intake, সংক্ষেপে I) বলে।

যখন কোন ইকোসিস্টেমে ক্রমান্বয়ে এক পুষ্টিস্তর থেকে অন্য পুষ্টিস্তরে শক্তি স্থানান্তরিত হয় তখন কিছু পরিমাণ শক্তির তাপশক্তি হিসেবে সব সময়ই অপচয় ঘটে। অর্থাৎ এক পুষ্টিস্তর থেকে অন্য পুষ্টিস্তরে শতকরা 100 ভাগ শক্তির স্থানান্তরণ কখনও ঘটে না। উৎপন্ন ঐ তাপশক্তি কোন কাজে লাগে না।

1942 খ্রীষ্টাব্দে **রেমন্ড লিন্ডেম্যান** (Raymond Lindemann) শক্তির স্থানান্তরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য **দশ শতাংশের সূত্র** (10 per cent Law) নামে একটি মতবাদ প্রচলন করেন। অর্থাৎ এক পুষ্টিস্তর হতে অপর পুষ্টিস্তরে কত পরিমাণ শক্তি প্রবাহিত হয় এবং কত শক্তি নষ্ট হয় তা বোঝানোর জন্য এই মতবাদ। লিন্ডেম্যানের উক্ত সূত্র অনুযায়ী কোন পুষ্টিস্তরের শক্তির একটি ভগ্নাংশ, যা শতকরা 10 ভাগের সমতুল্য, তা অপর একটি পুষ্টিস্তরে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ এক-একটি খাদ্যস্তর হতে কেবলমাত্র 10% শক্তি পরবর্তী খাদ্যস্তরে প্রবাহিত হয়। প্রথম সারির ব্যবহারকারীরা যত পরিমাণ উৎপাদককে খায় তার 10 শতাংশ প্রথম স্তরের জীবদের দেহ গঠনে লাগে। একটি উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে, ঘাসের মধ্যে অবস্থিত 100 কিলোগ্রাম জৈব খাদ্য শাকাশী প্রাণীর $\frac{100}{10}$ কিলোগ্রাম বা 10 কিলোগ্রাম এবং মাংসাশী প্রাণীর $\frac{10}{10}$ কিলোগ্রাম বা 1 কিলোগ্রাম জীব-ভর গঠন করবে। লিন্ডেম্যানের দশ শতাংশ সূত্র অনুসারে তৃণভূমির ইকোসিস্টেমের 100 কিলোগ্রাম তৃণজাতীয় খাদ্য হরিণের দেহে মাত্র 10 কিলোগ্রাম মাংস গঠন করবে। আবার ঐ হরিণের মাংস বাঘের দেহে গঠন করবে মাত্র 1 কিলোগ্রাম মাংস। অর্থাৎ একটি বাঘ 10 কিগ্রা. মাংস খেলে তার 1 কিগ্রা. বাঘের দেহ গঠনে ব্যয় হবে। এর ফলে দেখা যায় যে শক্তিপ্রবাহের ক্রমশ অবনতি ঘটে। যে পরিমাণ শক্তি জীব গ্রহণ করে তার বেশীর ভাগই বিপাক, খাদ্য-পরিপাক ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যয় হয়। তাছাড়া, জীবদেহ থেকে শক্তি অনবরত তাপশক্তি হিসেবে নষ্টও হয়। দেহের বিভিন্ন জৈবনিক কাজে যে পরিমাণ শক্তি অনবরত খরচ হয়, তাকে **শ্বসন শক্তি** (Respiratory energy, সংক্ষেপে R) বলে। অর্থাৎ R শ্বসনের ফলে যে পরিমাণ শর্করা অর্থাৎ খাদ্য ব্যয় হয় তার পরিমাণকেই নির্দেশ করে।

ইকোসিস্টেমে শক্তিপ্রবাহ একমুখী (In the Ecosystem Energy flow is unidirectional) ঃ উৎপাদক অর্থাৎ সবুজ ক্লোরোফিলযুক্ত উদ্ভিদেরা সূর্য হতে সংগ্রহ করে আলোকশক্তি। ঐ আবদ্ধ আলোকশক্তি কখনও আবার উৎপাদকদের কাছ থেকে সূর্যে ফিরতে পারে না। ব্যবহারকারীদের দেহ হতে তা পরিবেশে মুক্ত হয়। প্রথম সারির খাদকেরা শক্তি পায় উৎপাদকদের কাছ থেকে। কিন্তু ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে 'শক্তি' উৎপাদকেরা কখনও ফিরে পায় না। অর্থাৎ

শক্তি সব সময়ই এক খাদ্যস্তর হতে অপর খাদ্যস্তরে প্রবাহিত হয়ে থাকে কিন্তু পূর্বের খাদ্যস্তরে ফিরতে পারে না। ফলে দেখা যাচ্ছে শক্তিপ্রবাহ সর্বদা একমুখী।

(c) **শক্তির স্থানান্তরণ** (Transference of energy) : সমগ্র অর্জিত শক্তি (I) হতে শ্বসন শক্তি (R) বাদ দিলে যে শক্তি অবশিষ্ট থাকে তা খাদকের পুষ্টিস্তরের অর্জিত শক্তির পরিমাণ। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথম সারির খাদকের অর্জিত শক্তির পরিমাণ I এবং এদের শ্বসন শক্তির পরিমাণ R হলে, দ্বিতীয় সারির খাদকের অর্জিত শক্তির পরিমাণ হবে I − R।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, জীবদেহে যে পরিমাণ খাদ্য (I) গৃহীত হয় তার সবটাই পাচিত হয় না। আবার পাচিত অংশের সবটাই শোষিত হয় না। এই ব্যবহার না-করা খাদ্য বা শক্তি রেচন বা বর্জ্য পদার্থ হিসেবে জীবদেহের বাইরে রেচন পদ্ধতিতে বেরিয়ে যায়। এই রকম বর্জিত শক্তিকে **রেচনগত শক্তি** (Excretory energy, সংক্ষেপে E) বলে। যে পরিমাণ শক্তির আত্তীকরণ জীবদেহে ঘটে তা আসলে (I − E) − R এর সমান।

জীবেরা আবার শুধুমাত্র খাদক দ্বারা ভক্ষিত হয় না। তাদের মৃত্যু হতে পারে রোগ, বার্ধক্য, দুর্ঘটনা ইত্যাদির জন্যও। অন্য কোন জীব দ্বারা ভক্ষিত না হয়ে মৃত্যু (non-predatory death, সংক্ষেপে D) হলে পরের পুষ্টিস্তরের শক্তি লাভের উৎসের হার কমে। নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থায় অবশেষে জীবের মৃত্যুতে যে পরিমাণ শক্তির অপচয় ঘটে, তাকে **বিনষ্ট শক্তি** (Wasted energy, সংক্ষেপে W) বলে। বিভিন্ন রূপান্তরক (transformers, সংক্ষেপে T) জীবেরা ও বিয়োজকেরা (decomposers) পুষ্টিস্তরের বিভিন্ন সারির জীবদের মৃতদেহ, রেচনজাত পদার্থ ইত্যাদি হতে প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করে। তাছাড়া, জৈব-ভূ-রাসায়নিক চক্রের (Bio-Geochemical cycle) নিমিত্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থের উপাদান যোগায়।

শক্তির এরূপ স্থানান্তরণ এক পুষ্টিস্তর হতে যেভাবে অন্য পুষ্টিস্তরে ঘটে তা যে কোন খাদ্য-শৃঙ্খলেই বিশেষভাবে কার্যকর। দেখা যায় যে, প্রতিটি ইকোসিস্টেমে সামগ্রিকভাবে অক্সিজেনের খরচ ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎস সমান।

● **ইকোসিস্টেমে শক্তিপ্রবাহ বলতে কি বোঝায়?** বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক জীবেরই প্রয়োজন 'শক্তি'-র। খাদ্যের মাধ্যমে এই শক্তি অর্জিত হয়। যে কোন ইকোসিস্টেমের শক্তির মূল উৎস হল 'সূর্য'। ইকোসিস্টেমের উৎপাদকরা উক্ত সৌরশক্তিকে সংশ্লেষিত খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ করে। পরে উৎপাদক থেকে ঐ শক্তি খাদ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের খাদকের দেহে পরিবাহিত হয়। উৎস থেকে শুরু করে শেষ স্তরের খাদক পর্যন্ত শক্তি পরিবাহিত হওয়ার ঘটনা 'ইকোসিস্টেমে শক্তিপ্রবাহ' নামে পরিচিত।

বায়োম (Biome) : জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত এক-একটি বিশেষ বিশেষ চরিত্রের বায়োস্ফিয়ার বা জীবমণ্ডলকে **বায়োম** বলে। উদাহরণ : তুন্দ্রা বায়োম, উষ্ণমণ্ডলীয় চিরহরিৎ অরণ্যের বায়োম ইত্যাদি।

নিচ (Niche) : ইকোসিস্টেমের অন্তর্গত কোন জীবের সক্রিয় কার্যকর ভূমিকাকে **নিচ** বলে। উদাহরণ : গবাদি পশুর দেহ থেকে এঁটুলি (Ticks) খুঁটে খাওয়ার নিচ—ভারতবর্ষে এই নিচটির অধিকারী 'গোবক' (*Bubulens ibis*), অপরপক্ষে ইংল্যান্ডে এই নিচটির অধিকারী স্টারলিং (Starl ng) পাখি ; সর্পভুক সাপ কর্তৃক অন্য সাপ ভক্ষণের নিচ—ভারতবর্ষে এই নিচটির অধিকারী **শঙ্খচূড় সাপ** (Kingcobra—*Naia hannah*), অপরপক্ষে দক্ষিণ আমেরিকায় এই নিচটির অধিকারী **মুসারামা** (Mussarama) **সাপ**।

* অটিকোলজি (Autecology) ও সিনিকোলজি (Synecology)-র মধ্যে পার্থক্য :

অটিকোলজি	সিনিকোলজি
ইকোলজির মধ্যে স্বাধীনভাবে যখন এক-একটি প্রজাতিকে নিয়ে আলোচনা করা হয় তখন তাকে বলে **অটিকোলজি**।	ইকোলজির মধ্যে যখন কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই গোষ্ঠীভুক্ত জীবদের সম্বন্ধে অর্থাৎ সম্মিলিত গোষ্ঠীকে নিয়ে আলোচনা করা হয় তখন তাকে **সিনিকোলজি** বলে।

B. সংরক্ষণ (Conservation)

ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য কোন কারণে সামান্য বিঘ্নিত হলেও সময়ের ব্যবধানে আবার ভারসাম্য ফিরে আসে। কিন্তু আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বিধ্বংসী ভূমিকম্প, প্রবল বন্যা ইত্যাদি বড় ধরনের কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ইকোসিস্টেমের জীব-সম্প্রদায় ধ্বংস হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের ফলেও ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এবং সেজন্য জীব-সম্প্রদায় ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে।

যে উপায়ে সুপরিকল্পিতভাবে সুদীর্ঘ সময় ধরে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ, পুনরুদ্ধার, পরিচালন ইত্যাদি করা হয় এবং ঐ সম্পদকে ক্ষতিকারক প্রভাব, ধ্বংস, অপব্যবহার, আগুন ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করা হয়, তাকে সংরক্ষণ বলে (ওডাম)।

10.8. সংরক্ষণের গুরুত্ব (Importance of Conservation)

প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত নয়। প্রাকৃতিক সম্পদকে সুপরিকল্পিতভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যবহার করা, তার সব রকম অপচয় বন্ধ করা, প্রয়োজনীয় জীব ও প্রাকৃতিক সম্পদ বার বার ব্যবহার না করা এবং পরিবেশের গুণগত উৎকর্ষ বিধান করা সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক প্রয়োজন ছাড়া, সংরক্ষণের পর প্রয়োজনীয়তা হল মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে মানুষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে।

মানুষ যখন শিকারজীবী ছিল, তখন খাদ্য এবং আচ্ছাদনের প্রয়োজনে যথেচ্ছভাবে বিভিন্ন রকম তৃণভোজী ও লোমশ প্রাণী হত্যা করেছে। ক্রমে মানুষ

* উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

যখন কৃষিজীবী হল এবং পশু-পাখি পালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল, তখন নিজেদের ফসলের ও গৃহপালিত পশু-পাখির ক্ষতিকারক প্রাণীদের নির্বিচারে হত্যা করতে আরম্ভ করল। ফলে, বিভিন্ন রকমের প্রাণীর সংখ্যা অনেক কমে গেল।

মানুষ বনভূমি নিশ্চিহ্ন করে নগর পত্তন করেছে এবং এভাবে পশু-পাখির স্বাভাবিক বাসস্থল ধ্বংস করেছে, চাষের জমির জন্য জলাভূমির জল নিষ্কাশন করে জলচর প্রাণীর ক্ষতিসাধন করেছে, ফসল রক্ষার নামে কীটনাশক দ্রব্য অত্যধিক ব্যবহার করে পরিবেশ কলুষিত করেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া, নিজ স্বার্থে, জনসংখ্যার চাপে এবং সভ্যতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার তাগিদে মানুষ পরিবেশের সমতা বার বার নষ্ট করেছে। এখন মানুষ বুঝতে পারছে যে, প্রাকৃতিক সম্পদের অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার ক্রমেই পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করছে এবং এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে মানুষের নিজের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। তাই, জীবমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক সম্পদকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ভূমি, জল, বন, ধান, গম, বন্যপ্রাণী, মাছ ইত্যাদি সম্পদ একবার ব্যবহার করলেই শেষ হয়ে যায় না। এদের **পুনর্গঠনযোগ্য** বা **পুনরুজ্জীবনযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ** (Renewable natural resources) বলে। অপরপক্ষে, তামা, লোহা, সীসা, খনিজ তেল, লবণ, কয়লা ইত্যাদি সম্পদ একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এদের **অপুনর্গঠনযোগ্য** বা **অপুনরুজ্জীবনযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ** (Non-renewable natural resources) বলে।

সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ (i) সংখ্যায় কম এমন প্রাণীদের ও উদ্ভিদদের অস্তিত্ব বজায় রাখা, (ii) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সুদৃঢ় করা, (iii) মানুষের কল্যাণে প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক সুষ্ঠু ব্যবহার করা, (iv) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ দিয়ে মানবসমাজকে আনন্দ দান করা এবং (v) পরিবেশের সব রকম অপব্যবহার বন্ধ করে তার গুণগত উৎকর্ষ বিধান করা।

10.9. বিভিন্ন বস্তুর সংরক্ষণ (Conservation of various items)

নিচে বিভিন্ন বস্তুর সংরক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হল ঃ

(A) জল সংরক্ষণ

জীবনধারণের জন্য যে কোন জীবের পক্ষে জল অপরিহার্য। খরা ও বন্যা এই দুটি বিপরীত প্রাকৃতিক ঘটনা আমাদের দেশে প্রায়ই ঘটে। অতিরিক্ত বন্যায় জলের প্লাবনে খুব বেশী মাত্রায় ভূমিক্ষয় হয়, আবার বেশী খরায় জলের অভাবে উদ্ভিদের মৃত্যু হয়। ফলে, প্রাণিজগতেও বিপর্যয় দেখা দেয়। এইভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাই, বন্যা ও খরার প্রকোপ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন উপায়ে জল সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। মানুষ মিঠা জল ব্যবহার করে, তাই জল সংরক্ষণ বলতে মিঠা জল সংরক্ষণই বোঝায়।

মিঠা জল সংরক্ষণের উপায় : যে সকল উপায়ে মিঠা জল সংরক্ষণ করা যায়, নিচে তার উল্লেখ করা হল :

(1) **বাঁধ (Dam) নির্মাণ :** বর্ষার সময় যে অতিরিক্ত জল পাওয়া যায়, সেই জলকে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়। এর ফলে নদী-উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে প্লাবন রোধ করা সম্ভব হয়। গ্রীষ্মকালে এইসব জলাধার হতে প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত জল সরবরাহ করা হয়।

(2) **ক্যাচমেন্ট অঞ্চল (Catchment areas) গঠন :** নগ্ন মাটি বেশী জল ধরে রাখতে পারে না বলে বর্ষার সময় একসঙ্গে বেশী পরিমাণ জল নদীতে গিয়ে পড়ে এবং বন্যার সৃষ্টি করে। সেইজন্য, নির্বিচারে গাছপালা বনজঙ্গল না কেটে নতুন বৃক্ষ রোপণ করা হয়। একেই বলা হয় ক্যাচমেন্ট অঞ্চল গঠন। বর্তমানে সম্ভাব্য স্থানে **ক্যাচমেন্ট অঞ্চল** (Catchment areas) তৈরি করে বৃষ্টির জল ধরে রাখার চেষ্টা হচ্ছে।

(3) চাষের জন্য প্রয়োজনের বেশী জল ব্যবহার না করা।

(4) চাষের জমির আগাছা উপড়ে ফেলে আগাছা দ্বারা জল শোষণ বন্ধ করা।

(5) জমিতে অত্যধিক কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার কমিয়ে পানীয় জলের দূষণ (Pollution) বন্ধ করা।

● **জল সংরক্ষণের উদ্দেশ্য :**

(i) খরার প্রকোপ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বাঁচানো।

(ii) মানুষের দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় জলের সরবরাহ অব্যাহত রাখা।

(B) ভূমি সংরক্ষণ

সাধারণত ভূমি সংরক্ষণ বলতে বোঝায় (i) **ভূমির ক্ষয় রোধ করা** এবং (ii) **ভূমির উর্বরতা বজায় রাখা।**

মাটি ছাড়া সাধারণত গাছপালা বাঁচে না। প্রাণীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদগোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। সুতরাং সৃষ্টি রক্ষার্থে জলের মত মাটিও অপরিহার্য।

সাধারণত বৃষ্টির জল ও বাতাস ভূমি ক্ষয় করে। অত্যধিক বৃষ্টি অথবা বৃষ্টির তীব্রতা মাটিকে, বিশেষত বেলেমাটিকে সহজেই ধুয়ে মাটির ক্ষয় করে। ভূমিক্ষয়ের ফলে একদিকে চাষের জমি, বসতবাড়ী, পথ ইত্যাদি নষ্ট হয়, আবার অন্যদিকে নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদিতে ক্রমাগত মাটি জমে সেগুলি অগভীর হতে থাকে। এর ফলে কিছুদিন পরে ঐগুলি মজে যায় এবং সেইজন্য বৃষ্টির পর বন্যা হয়।

মাটির উপরের তল সমানভাবে ক্ষয় হতে পারে। একে **পৃষ্ঠ ভূমিক্ষয়** (Surface erosion) বলে। ভূমিক্ষয় যখন নালার আকারে হয় তখন তাকে **নালা**

ভূমিক্ষয় (Gully erosion) বলে। গাছপালা, বনজঙ্গল কেটে নগর পত্তনের ফলে সেখানকার নগ্ন মাটির ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ভূমিক্ষয় রোধের উপায় (Methods of checking soil erosion):

(1) **বৃক্ষ রোপণ:** বৃষ্টির জল ও বায়ুপ্রবাহে যাতে ভূমিক্ষয় না ঘটে সেইজন্য বৃক্ষ রোপণ করা হয়। নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঝাউ, পাইন ইত্যাদি বৃক্ষ রোপণ করে ভূমিক্ষয় নিবারণ করা হয়। এছাড়া দূর্বা ঘাস, মুথা ঘাস, নানা রকমের গুল্ম প্রভৃতি **মৃত্তিকা ধারক উদ্ভিদ** (Soil binders) লাগিয়ে মাটির ক্ষয় বন্ধ করা যায়।

(2) **সোপান চাষ** (Terrace cultivation): পর্বতগাত্রের ঢালু জমিতে সিঁড়ি বা সোপান আকারে জমি তৈরি করে চাষ করা হয়। প্রতিটি সোপানের ধারে পাথরের প্রাচীর মাটিকে ধরে রাখে। এই পদ্ধতিতে বৃষ্টির ফলে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।

(3) **বৃক্ষচ্ছেদ নিবারণ** (To avoid deforestation): অযথা যথেচ্ছভাবে গাছপালা কেটে ফেলা উচিত নয়। কেননা উদ্ভিদের মূল মাটিকে শক্তভাবে ধরে রেখে ভূমিক্ষয় রোধ করে।

(4) **বিশেষ ব্যবস্থা:** অনেক সময় বায়ুপ্রবাহজনিত ধুলোর ঝড় উঠলে প্ল্যাস্টিকের চাদর দিয়ে মাটি ঢেকে দিলে ভূমিক্ষয় রোধ হয়।

ভূমির উর্বরতা বজায় রাখার উপায় (Methods for retaining fertility of the soil):

(1) **শস্য আবর্তন** (Rotation of crops): একই জমিতে পর পর একই ধরনের শস্যের চাষ না করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ধরনের শস্যের চাষকে বলা হয় **শস্য আবর্তন**। একই জমিতে বছরের পর বছর ধান, গম বা ভুট্টার চাষ করলে জমিতে ঐ ধরনের উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির ঘাটতি হয়; অর্থাৎ ভূমির উর্বরতা হ্রাস পায়। তাই ধান ও গম জাতীয় উদ্ভিদের চাষের পর সাধারণত শিম্বীজাতীয় গাছের (যথা—মটর, ছোলা ইত্যাদির) চাষ করা হয়। এতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। কেননা শিম্বীজাতীয় গাছের মূলে বসবাসকারী **রাইজোবিয়াম** (*Rhizobium*) নামে নাইট্রোজেন স্থিতিকারী (Nitrogen-fixing) ব্যাকটিরিয়ারা মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

(2) **সার প্রয়োগ** (Use of fertilizers): মানুষ ও গৃহপালিত জীবজন্তুর রেচন পদার্থে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন-ঘটিত জৈব পদার্থ থাকে। তাই ঐসব বস্তু জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হয়।

(3) **ঝুম চাষ** (Jhoom cultivation): কোন কোন পাহাড়ী এলাকায় 'ঝুম চাষ' পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করা হয়। এই প্রথায় পুরাতন জমিতে বার বার চাষ না করে বন-জঙ্গল কেটে নতুন নতুন জমিতে চাষ-আবাদ করা হয়। তাই পুরাতন জমি আবার অরণ্যে পরিণত হয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

● **ভূমি সংরক্ষণের উদ্দেশ্য :**

(i) চাষ-আবাদের জন্য ভূমি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

(ii) দেশের অরণ্য সম্পদকে রক্ষার জন্য ভূমি সংরক্ষণ করা দরকার।

(iii) বাসগৃহ নির্মাণের জন্য এবং যানবাহন চলাচলের পথঘাটগুলিকে বজায় রাখার জন্যও ভূমি সংরক্ষণ প্রয়োজন।

(C) বন বা অরণ্য সংরক্ষণ

কোন দেশের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহুলাংশে নির্ভর করে সেই দেশের বনসম্পদের উপর। তার কারণ খাদ্য, বস্ত্র, কাগজ, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, ঔষধ, যানবাহন, আসবাবপত্র ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদানের উৎস হল উদ্ভিদ। তাছাড়া, বন-জঙ্গলই প্রকৃতপক্ষে পশু-পাখির আবাসস্থল। বহু পশু-পাখি ফলমূল, গাছের পাতা ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করে। বনের গাছপালা পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে। ফলে বায়ু শোধিত হয়। অতএব, জীবজগতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই বন সংরক্ষণ একান্ত দরকার। সাধারণভাবে বন সংরক্ষণ বলতে উদ্ভিদ সংরক্ষণ বোঝায়।

● **যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উদ্ভিদ সম্পদের রক্ষা, প্রতিপালন, অপচয় রোধ ও সুষ্ঠু ব্যবহার করা হয় এবং নতুন উদ্ভিদ রোপণ করা হয়, তাকে বন সংরক্ষণ বলে।**

সুস্থ পরিবেশ ও ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্য কোন ভূখণ্ডের অন্তত 33% বনাঞ্চল থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভারতে সমগ্র ভূখণ্ডের 24% এবং পশ্চিমবঙ্গে মাত্র 14% বনাঞ্চল।

বন সংরক্ষণের উপায় : বন সংরক্ষণের জন্য যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেগুলি নিচে উল্লেখ করা হল :

(1) পরিণত ও রুগ্ন গাছ ছাড়া অন্য গাছ কাটা বন্ধ করা।

(2) গাছ কাটার সময় অন্য গাছের ক্ষতি এড়ানো।

(3) রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে গাছকে রক্ষা করা।

(4) বনে যাতে দাবাগ্নির সৃষ্টি না হয় অর্থাৎ গাছে-গাছে ঘর্ষণের ফলে বনে আগুন না লাগে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

(5) কাঠ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা।

(6) নতুন নতুন গাছ রোপণ করে কেটে ফেলা গাছের ক্ষতিপূরণ করা ও বনভূমি সম্প্রসারণ করা।

● বন সংরক্ষণের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা :

(1) খাদ্য, বস্ত্র, কাগজ, ভেষজ ঔষধ এবং আসবাবপত্র, গৃহনির্মাণ ও যানবাহন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা।
(2) পশু-পাখিদের আবাসস্থল এবং তাদের খাদ্যের উৎসকে অক্ষুণ্ণ রাখা।
(3) উদ্ভিদের সাহায্যে বায়ু শোধন।
(4) বিচিত্র পত্রপুষ্পশোভিত বনভূমির সৌন্দর্য উপভোগ করে প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি লাভ।

(D) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (Conservation of wild life)

বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-প্রান্তরে, যে সব প্রাণী মানুষের উপর নির্ভর না করে জীবনযাপন করে, তাদের বলা হয় **বন্যপ্রাণী**। ঐসব প্রাণী ছাড়া নদী, হ্রদ ও সমুদ্রের স্বাভাবিক বাসিন্দাদেরও (যথা—মাছ, কুমীর, কচ্ছপ, তিমি, সীল, সিন্ধুঘোটক, চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদিকেও) বন্যপ্রাণী বলা হয়।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্য : আমাদের নিজেদের স্বার্থেই বন্যপ্রাণীগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি খুব সহজে বোঝা যাবে। যথেচ্ছভাবে বাঘ হত্যা করলে, বাঘ যে সব প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, যেমন হরিণ, শূকর ইত্যাদির সংখ্যা অস্বাভাবিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে অরণ্যে তাদের স্বাভাবিক খাদ্যে টান পড়বে এবং তারা অরণ্য-সংলগ্ন ক্ষেতখামারের শস্য বর্তমানের চেয়ে আরও অধিক পরিমাণে ধ্বংস করতে শুরু করবে। অপরপক্ষে, হরিণ, শূকর ইত্যাদিকে নির্বিচারে হত্যা করলে অরণ্যে বাঘের স্বাভাবিক খাদ্যে টান পড়বে। বাঘ তখন অরণ্য-সংলগ্ন গ্রামে হানা দিয়ে গরু-ছাগল ইত্যাদিকে হত্যা করে গৃহস্থদের ক্ষতি করতে থাকবে। অতএব দেখা যাচ্ছে, একপ্রকার প্রাণীর দ্বারা অন্যপ্রকার প্রাণীর সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখার জন্য, জীববিজ্ঞানের ভাষায় **প্রাকৃতিক ভারসাম্য** (Nature's balance) **রক্ষার জন্য** বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রয়োজন।

আমাদের **প্রয়োজনীয় প্রাণিজ সামগ্রীর** (যথা—মধু, মোম ইত্যাদির) **সরবরাহ যাতে** অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্যও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

তাছাড়া, দর্শনীয় বন্য পশু-পাখিগুলিকে তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে দেখবার সুযোগ পেলে আমাদের মন অবর্ণনীয় আনন্দে ভরে ওঠে। তাই সাংসারিক জীবনের দুঃখ-কষ্ট ভোলার তাগিদে মাঝে-মাঝে **আমোদ-প্রমোদ ও সৌন্দর্য উপভোগের জন্যও** বর্ণাঢ্য বন্যপ্রাণীগুলিকে তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

● **বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি ?**

(i) **প্রাকৃতিক ভারসাম্য** রক্ষার জন্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রয়োজন।

(ii) আমাদের **প্রয়োজনীয় প্রাণিজ সামগ্রীর** (যথা—মধু, মোম ইত্যাদির) **সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখার** জন্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রয়োজন।

(iii) বর্ণাঢ্য বন্যপ্রাণীদের **সৌন্দর্য উপভোগ** করে প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমি কাটানোর জন্যও প্রাণীগুলির সংরক্ষণ প্রয়োজন।

● **বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপায় (Methods of wild life conservation) :** বর্তমানে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশে কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলি বর্তমানে প্রায় সব দেশেই অবলম্বন করা হয় :

(i) জাতীয় বনভূমি (National Park), অভয়ারণ্য (Sanctuary), সংরক্ষিত অরণ্য (Reserve forest) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা।

(ii) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন। প্রত্যেক দেশই নিজ-নিজ দেশের বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের তালিকা তৈরি করেছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে উক্ত তালিকাভুক্ত কোন প্রাণীকে হত্যা করা বা বন্দী করা দণ্ডণীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে।

(iii) প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে বন্যপ্রাণীদের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে।

10.10. ভারতের সংরক্ষিত অরণ্য (Reserve forest), অভয়ারণ্য (Sanctuary) ও জাতীয় বনভূমি (National Park)

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষিত অরণ্য, অভয়ারণ্য, জাতীয় বনভূমি ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। সংরক্ষিত অরণ্য ও অভয়ারণ্য রাজ্য সরকারগুলির এক্তিয়ারভুক্ত। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কোন অরণ্যকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'সংরক্ষিত অরণ্য' বলে ঘোষণা করা হয়। এই ধরনের অরণ্যে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবে গবেষণার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের লিখিত অনুমতি নিয়ে সেখানে প্রবেশ করা যায় এবং সীমিত-সংখ্যক প্রাণিহত্যা করা যায়। যে সব অরণ্যে কোন কোন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী পাওয়া যায়, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার সেইগুলিকে 'অভয়ারণ্য' হিসেবে ঘোষণা করেন। অভয়ারণ্যে প্রাণিহত্যা, কাঠ কাটা, মাছ ধরা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। 'জাতীয় বনভূমি' নির্দিষ্ট হয় কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী। এটা অনেকটা অভয়ারণ্যের মত, তবে আয়তনে অনেক বড়।

● **ভারতের কয়েকটি অভয়ারণ্য ও জাতীয় বনভূমির তালিকা নিচে দেওয়া হল ঃ**

নাম	অবস্থান	উল্লেখযোগ্য প্রাণী
অভয়ারণ্য ঃ		
জলদাপাড়া	পশ্চিমবঙ্গ (জেলা-জলপাইগুড়ি)	গণ্ডার, বাঘ, হাতি, হরিণ, বন্য শূকর প্রভৃতি।
সজনেখালি	পশ্চিমবঙ্গ (জেলা দক্ষিণ ২৪-পরগনা)	ভোঁদড়, বন্য শূকর, কুমীর, শুশুক প্রভৃতি।
মহানদী	পশ্চিমবঙ্গ (জেলা-দার্জিলিং)	বাঘ, হাতি, চিতল হরিণ, বন্য শূকর, গউর* প্রভৃতি।
গির	গুজরাট	সিংহ, হরিণ, বন্যশূকর, নীলগাই** প্রভৃতি।
কাজিরাঙা	আসাম	গণ্ডার, বাঘ, বন্য মহিষ, হাতি ইত্যাদি।
দাচিগ্রাম	কাশ্মীর	কস্তুরী হরিণ, ভল্লুক ইত্যাদি।
পেরিয়ার	কেরালা	বাঘ, হাতি, গউর, হরিণ, বন্য কুকুর ইত্যাদি।
জাতীয় বনভূমি ঃ		
করবেট	উত্তর প্রদেশ	বাঘ, চিতাবাঘ, হাতি, ভল্লুক, হরিণ ইত্যাদি

10.11. কয়েকটি বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী

মানুষের অবিবেচনার জন্য বেশ কয়েক প্রকার বন্যপ্রাণী চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং অপর কয়েক প্রকার বন্যপ্রাণী বর্তমানে বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়েছে। যে সব বন্যপ্রাণী পৃথিবী থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—মরিশাস দ্বীপের **ডোডো পাখি**, পূর্ব-ভারতের **গোলাপী-মাথা হাঁস**, উত্তর-পশ্চিম ভারতের **পাহাড়ী বটের**, আমেরিকার **যাত্রী পায়রা** (Passenger Pigeon), **উত্তর আফ্রিকার ক্ষুদ্রকায় হাতি**, দক্ষিণ আফ্রিকার জেব্রার নিকট-আত্মীয় **কোয়েগা** (Quagga) ইত্যাদি। এ ছাড়া 300-রও বেশী রকমের বন্যপ্রাণীর সংখ্যা ভীষণ ভাবে কমে গেছে। এরা বর্তমানে অবলুপ্তির দিন গুণছে। এইসব বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **এশিয়ার দ্বিশৃঙ্গ গণ্ডার**, আফ্রিকার **সাদা গণ্ডার**, **ভারতের সিংহ ও বুনো গাধা†**, **এশিয়ার বাঘ**, বোর্ণিও-সুমাত্রার **ওরাংওটাং** (Orang-Utan), উত্তরমেরু অঞ্চলের **মেরুভল্লুক**, **সিন্ধুঘোটক** (Walrus) ইত্যাদি।

* অনেকে এদের **ভারতীয় বাইসন** বলেন। কিন্তু এরা একপ্রকার বন্য গরু।

** হরিণ ও গবাদি পশু এই দু জাতির প্রাণীদের সঙ্গে এদের কিছু কিছু মিল আছে।

† সাধারণ গাধার মত এদের দেখতে নয়। এদের গায়ের রং কালো এবং তার উপর হলুদ ডোরাকাটা।

আনন্দের বিষয়, বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে অথবা ঐরূপ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিন্তা করছে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন বন্যপ্রাণী-বিশেষজ্ঞ ও পশুপ্রেমীর উৎসাহে এবং ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় 1952 সালে **ভারতের বন্যপ্রাণী-পর্ষৎ (Indian Board for Wild Life)** প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ পর্ষৎ এবং ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বনবিভাগের যৌথ উদ্যোগে বিলুপ্তপ্রায় নানা প্রকার পশু-পাখিকে বাঁচিয়ে রাখার বিভিন্ন প্রকল্প (Project) ভারতে গৃহীত হয়েছে। এই ধরনের একটি প্রকল্প হচ্ছে, 'ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প' (Tiger Project)। অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'গন্ডার সংরক্ষণ প্রকল্প' (Rhinoceros Project), 'সিংহ সংরক্ষণ প্রকল্প', 'কুমীর সংরক্ষণ প্রকল্প' ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গে গণ্ডার সংরক্ষণ
(Conservation of Rhinoceros in West Bengal)

● **গন্ডার ঃ** গন্ডারের বলিষ্ঠ দেহটি বর্মের মত শক্ত মোটা চামড়ায় ঢাকা। দেহে লোম নেই বললেই চলে। কাঁধের সামনের দিকে ও পিছনদিকে এবং পিছনের পায়ের সামনের দিকে দেহের চামড়ায় মোটা-মোটা ভাঁজ দেখা যায় (চিত্র 10.13)। নাকের ডগায় একটি বা দুটি শিং থাকে। ঐ শিং গরু-মোষের শিং-এর মত নয়। ঐটি হচ্ছে চাপ বাঁধা, আঠা দিয়ে জোড়া লোমের একটি গোছা। ঐ শিং গজায়

চিত্র 10.13 ঃ গন্ডার।

চামড়ার উপর থেকে—জোরে ঘা দিলেই খসে পড়ে। খসে পড়ার ফলে প্রচুর রক্তপাত হয়, তবে তার জায়গায় বছরখানেকের মধ্যে নতুন একটি শিং গজাতে দেখা যায়। গন্ডারের শিং-এর কিছু ভেষজ গুণ আছে বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে ; তার জন্য চোরা শিকারীরা গন্ডার শিকার করে।

পৃথিবীতে পাঁচ প্রজাতির গন্ডার আছে। তার মধ্যে দুটি প্রজাতি আছে আফ্রিকায়, আর তিনটি এশিয়ায়। আফ্রিকার দুটি প্রজাতির মধ্যে একটির রঙ

কালো, অপরটির রঙ সাদা। উভয়েরই দুটি করে শিং আছে—একটির পিছনে আর একটি।

এশিয়ায় যে তিন প্রজাতির গন্ডার দেখা যায় সেগুলি হচ্ছে, (1) বৃহৎ একশৃঙ্গী গন্ডার (*Rhinoceros unicornis*), (2) ক্ষুদ্রতর একশৃঙ্গী গন্ডার ও (3) দুশৃঙ্গী গন্ডার। এর সবগুলিই একসময়ে ভারতবর্ষে পাওয়া যেতো, কিন্তু বর্তমানে প্রথমটি ছাড়া আর কোনটিই ভারতবর্ষে মেলে না। দ্বিতীয়টি দেখা যায় জাভা দ্বীপে এবং তৃতীয়টি বর্মা, মালয় ও সুমাত্রা দ্বীপে। একশৃঙ্গী গন্ডারদের একটি করে শিং, আর দুশৃঙ্গীদের দুটি করে শিং থাকে।

অতীতে ভারতবর্ষে গাঙ্গেয় উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গন্ডার পাওয়া যেতো, কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ নেপাল, উত্তর বিহার, উত্তরবঙ্গ ও আসাম ছাড়া অন্য কোথাও এদের সন্ধান মেলে না।

ভারতীয় গন্ডাররা ঘাস-ভরা জলা জায়গা পছন্দ করে, তবে ছোট-ছোট পাহাড়ের জঙ্গলেও তাদের দেখা যায়। ঘাস-ই এদের প্রধান খাদ্য। আফ্রিকার সাদা গন্ডাররাও ঘাস খায়। বাকী তিন রকম গন্ডার ডালপাতা খায়। আকারে আফ্রিকার সাদা গন্ডারই সবচেয়ে বড়। তারপর ভারতীয় গন্ডার। তারপর ক্রমান্বয়ে আফ্রিকার কালো গন্ডার, জাভা দ্বীপের গন্ডার ও সুমাত্রার গন্ডার।

বন্যপ্রাণী-বিশেষজ্ঞ মিঃ ই. পি. জী (E. P. Gee)-র মতে, "ভারতীয় গন্ডাররা সহজেই হাতিকে দৌড়ে হারাতে পারে। বুদ্ধিতে এরা খাটো এবং স্বভাবে গোঁয়ার। বেশীর ভাগ বন্য জন্তু বিপদের সময় পালিয়ে গিয়ে ঘন ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু গন্ডাররা লুকানো দূরে থাকুক, আক্রমণকারীকে তেড়ে এসে নিজেকে আরও বিপন্ন করে তোলে।"

ভারতীয় একশৃঙ্গী গন্ডার ও সুমাত্রার দুশৃঙ্গী গন্ডারদের একটা বিশেষ অভ্যাস আছে। সেটা হচ্ছে, তারা নির্দিষ্ট কয়েকটা জায়গায় মলত্যাগ করে। তার ফলে এদের বাসভূমির এক-একটা জায়গায় বিরাট-বিরাট বিষ্ঠার স্তূপ সৃষ্টি হয়। বিষ্ঠা ত্যাগের জন্য এরা পিছু হটতে-হটতে ঐসব জায়গায় আসে। চোরা শিকারীরা ঐসব জায়গায় বসে থেকে সহজেই এদের হত্যা করে।

● **গন্ডার সংরক্ষণ প্রকল্প ঃ** এক সময় ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গন্ডার দেখা যেতো, অথচ বর্তমানে কয়েকটিমাত্র অঞ্চলে তারা সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত জলদাপাড়ার অরণ্যাঞ্চলকে 1941 খ্রীষ্টাব্দ থেকে গন্ডার সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। গন্ডারের সংখ্যা এদেশে দ্রুত হারে হ্রাস পাওয়ার মূলে যে সব কারণ উল্লেখযোগ্য সেগুলি নিচে দেওয়া হল। গন্ডার সংরক্ষণের জন্য ঐ কারণগুলির প্রতিকারের দিকে বর্তমানে নজর দেওয়া হচ্ছে।

(1) **চোরা শিকারীদের উৎপাত ঃ** গন্ডারের দেহের বিভিন্ন অংশের ভেষজ গুণ সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে সাধারণ মানুষের মনে আজগুবি কতকগুলি ধারণা থাকার ফলে গন্ডার শিকারের প্রতি একদল সুযোগসন্ধানী মানুষের অহেতুক ঝোঁক দেখা

যায়। পূর্ব-ভারত ও পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষের ধারণা* 'গণ্ডারের শিং' মানুষকে বিষের হাত থেকে বাঁচাতে পারে, নষ্ট পুরুষত্ব উদ্ধার করতে পারে, সন্তান প্রসবকালে কোনও স্ত্রীলোকের বিছানার নিচে রেখে দিলে প্রসবে কোন বিঘ্ন ঘটে না ইত্যাদি। তাছাড়া, গণ্ডারের হাড় অথবা চামড়ার ছোট-ছোট টুকরো তাবিজের মত করে পরলে অনেক রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এইসব আজগুবি ধারণার জন্য গণ্ডার শিকার একদল মানুষের পেশায় পরিণত হয়েছে। এর উপর আছেন শখের শিকারীরা, যাঁরা সাধারণ মানুষের বাহবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অহেতুক প্রাণিহত্যা করেন।

(2) **বাসযোগ্য এলাকার আয়তন হ্রাসঃ** অতীতকালে ভারতবর্ষে গাঙ্গেয় উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, এমনকি সুন্দরবনেও গণ্ডার পাওয়া যেতো, কিন্তু কালে-কালে মানুষ নিজের প্রয়োজনে গণ্ডারের স্বাভাবিক বাসভূমি ঘন ঘাস বনের অপসারণ ঘটানোয় তার বাসস্থল এবং খাদ্য (ঘাস) দুটিরই অভাব দেখা দেয়, যার ফলে গণ্ডারের সংখ্যার যথেষ্ট হ্রাস ঘটে।

(3) **গণ্ডারের বাসভূমিতে অবাধ গোচারণঃ** গণ্ডারের বাসভূমিতে অবাধ গোচারণের ফলেও গণ্ডারের খাদ্যে টান পড়ছে। গণ্ডারের জন্য বর্তমানে ভারতবর্ষে যে তিনটি অভয়ারণ্য আছে তার একটা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের 'জলদাপাড়া'** আর বাকী দুটি আসামের 'কাজিরাঙ্গা' ও 'মানস'। এর মধ্যে জলদাপাড়া অরণ্যাঞ্চলে ব্রিটিশ আমল থেকে যে গোচারণ প্রথা চালু হয়েছে তা এখনও বহাল আছে। এর ফলে অসংখ্য গরু-মোষ প্রতিদিন গণ্ডারের খাদ্যে ভাগ বসাচ্ছে। এই গোচারণ প্রথা শুধু খাদ্যের অভাব ঘটিয়েই গণ্ডারদের ক্ষতি করছে না, গৃহপালিত পশুদের নানা রকম রোগ, বিশেষত মুখ ও পায়ের রোগ (সংক্রামক জীবাণু মারফত), গণ্ডারদের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনাও এর দ্বারা সৃষ্টি হচ্ছে।

জলদাপাড়া, কাজিরাঙ্গা ও মানসে গণ্ডার প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা চোরা শিকারীদের উৎপাত বন্ধের প্রতি এবং গণ্ডারের বাসযোগ্য এলাকার আর যাতে হ্রাস না ঘটে তার প্রতি বেশ কিছুকাল যাবত নজর দিয়েছেন, কিন্তু উপরিউক্ত তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে তাঁরা এখনও কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। এ ব্যাপারে সরকারী নিয়মকানুন পরিবর্তনের প্রয়োজন। সুখের কথা, এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি উদ্যোগী হয়েছেন।

গণ্ডার সংরক্ষণের জন্য ভারতবর্ষে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপঃ

(1) যে সব অরণ্যে গণ্ডার বাস করে (যথা—জলদাপাড়া, গরুমারা ইত্যাদি)† সেখানে অনুমতি ব্যতীত কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

---

* From "Wild Life of India"—E. P. Gee

** উত্তরবঙ্গের গরুমারা (জেলা—জলপাইগুড়ি) বনভূমির অল্প একটু এলাকাও গণ্ডার সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত হয়েছে। সেখানে বর্তমানে 6টি গণ্ডার আছে।

† এছাড়া আসামের 'কাজিরাঙ্গা' অভয়ারণ্য।

(2) অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা, এমনকি দর্শকরাও, যাতে কোনপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে উক্ত অভয়ারণ্যগুলিতে প্রবেশ করতে না পারেন, সেদিকে সতর্ক নজর রাখা হয়। এ ব্যাপারে আইন অমান্য করলে উপযুক্ত শাস্তির (জরিমানা বা কারাদণ্ড) ব্যবস্থা আছে।

(3) চোরা শিকারীদের হাত থেকে গণ্ডারদের রক্ষার জন্য বিপুল সংখ্যায় প্রহরী নিযুক্ত করা হয়েছে।

(4) গণ্ডারের শিং-এর যে কোন ভেষজ গুণ নেই, বিশেষ প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে তা মাঝে মাঝে জনগণকে জানানো হচ্ছে।

(5) গণ্ডারদের অ্যানথ্রাক্স (Anthrax) রোগ প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হচ্ছে।

1965 খ্রীষ্টাব্দ থেকে গণ্ডার সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এই প্রকল্প গ্রহণের সুফল পাওয়া গেছে। 1965 খ্রীষ্টাব্দে, সংরক্ষণ প্রকল্পের শুরুতে, গণ্ডারের সংখ্যা ছিল আনুমানিক 400 ; 1976 খ্রীষ্টাব্দে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, উক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 500-তে দাঁড়িয়েছে।

C. দূষণ (Pollution)

মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে যন্ত্রচালিত কলকারখানার সংখ্যাও বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে যানবাহনের সংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার সঙ্গে তাল রেখে, পরিবহণ-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু রাখার জন্য। একদিকে এই যান্ত্রিক সভ্যতা ও শিল্প-বিপ্লবের অগ্রগতির ফলে যেমন আমাদের লাভ হচ্ছে, অন্যদিকে আবার তেমনি দেখা দিচ্ছে তার এক বিষময় ফল—প্রকৃতিতে সৃষ্টি হচ্ছে দূষণকারক পদার্থ। তাতে পরিবেশ হচ্ছে দূষিত এবং ফল হচ্ছে ক্ষতিকারক। পৃথিবীর সব বাস্তুবিদ্‌গণের (Ecologists) কাছে আজকালকার দিনের একটি বড় সমস্যা হল দূষণ সমস্যা ; যার প্রতিকারের নিমিত্ত নানা ধরনের গবেষণামূলক কাজও পাশাপাশি চলছে।

আমাদের এই পৃথিবীতে দেখা যায় ছোট-ছোট বাস্তুতন্ত্র, যার মধ্যে অবস্থান করে খাদ্য-শৃঙ্খল। ক্লোরোফিলযুক্ত সবুজ উদ্ভিদেরা ঐ বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক, যারা সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য তৈরি করার সময় বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং তার পরিবর্তে উপজাত পদার্থ হিসেবে নির্গত করে অক্সিজেন গ্যাস। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অক্সিজেনের সমতা বজায় থাকে। এই সমতা নষ্ট না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহলেই বিঘ্নিত হবে জীবমণ্ডলের ভারসাম্য। আমরাই অবিবেচকের মত কোন দিক না ভেবে প্রাকৃতিক সম্পদকে যথেচ্ছভাবে খরচ করছি, ফলে পরিবেশ হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত। তাছাড়া, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কলকারখানা স্থাপন বিভিন্নভাবে পরিবেশকে করে তুলছে অস্বাভাবিক। ফলে এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে মানবের দৈহিক স্বাস্থ্যে। বাতাস থেকে দূষিত পদার্থ শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করছে, ফলে দেখা দিচ্ছে শ্বাসরোগ। বাতাসের দূষিত পদার্থ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে

শ্বাসরোগ এবং দূষণের মধ্যে সরাসরি সম্বন্ধ রয়েছে [**লাভে** এবং **সেসকিন** (Lave and Seskin), 1970]।

● **যে পদ্ধতিতে জীবমণ্ডলের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলির অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক পরিবর্তন হয় এবং মানবের সক্রিয় জীবন ধারণের পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর প্রতিকূল প্রভাব ছড়িয়ে দৈনন্দিন জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে সেই পদ্ধতিকেই বলে দূষণ বা পলিউশন** (*Pollution*)—(ওডাম, 1971)। যে সব পদার্থের দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয় তাদের, **দূষণ পদার্থ** (Pollutants) বলে।

● বাস্তুবিজ্ঞানী **সাউথ উইক** (1976-77)-এর মতে, **মানুষের বিভিন্ন কাজের ফলে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশকেই দূষণ বা পলিউশন বা দূষিতকরণ বলে।**

● **পরিবেশে মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রাধান্য বা সেই সমস্ত বস্তুর দেহের মধ্যে অনুপ্রবেশই** হল দূষণের অপর একটি সংজ্ঞা (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)।

10.12. দূষণের উৎপত্তি ও তার প্রতিক্রিয়া (Origin and effects of pollution)

বিভিন্ন আধুনিক বিজ্ঞানীর (**ওডাম**, 1971 ; **সাউথ উইক**, 1976-78) মতে দূষণের প্রধান কারণগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

(a) ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যার অত্যধিক হারে বৃদ্ধি ;

(b) বিজ্ঞানসম্মত রীতিনীতি না মেনে শহর-নগর ইত্যাদির পত্তন ;

(c) বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন না করে যথেচ্ছভাবে প্রাকৃতিক বন-সম্পদ নির্মূল করা এবং অমানুষিক উপায়ে প্রাণিকুলকে বধ করা ;

(d) আধুনিক যুগে যে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তার সঠিক ব্যবহার না করা ইত্যাদি।

পরিবেশ দূষণের উপরিউক্ত কারণগুলি হতেই মানবজীবনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, যেমন—

(a) বিভিন্ন রোগের, যথা—টাইফয়েড, যক্ষ্মা, ফুসফুসে ক্যানসার, স্নায়বিক রোগ ইত্যাদির ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি।

(b) অর্থের এবং শক্তির ক্ষয়, যার প্রকৃত ফল ধনসম্পদের ক্ষতি।

(c) তাছাড়া, যে সমস্ত প্রাকৃতিক উপকরণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খুবই প্রয়োজনীয় তাদের ক্রমাগত বিনাশ।

10.13. দূষণকারক পদার্থ ও তাদের শ্রেণীবিন্যাস (Pollutants and their classification)

বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হবার পর যে সব পদার্থ পরিবেশকে কলুষিত করে তারাই **হল দূষণকারক পদার্থ**।

বিজ্ঞানী ওডাম (Odum), 1971 খ্রীষ্টাব্দে দূষণকারক পদার্থগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেন, যথা—

(a) **অভঙ্গুর বা নন-ডিগ্রেডেবল** (Non-degradable) **:**

এই শ্রেণীর মধ্যে রাখা হয় এমন সব ধাতু বা বিষাক্ত পদার্থ যারা প্রাকৃতিক পরিবেশে ভাঙ্গে না, অর্থাৎ তাদের কোন পরিবর্তন হয় না, ভাঙ্গলেও তার পরিমাণ খুবই কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে অ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত, পারদ ইত্যাদি ধাতু। এছাড়া জৈব রাসায়নিক পদার্থ DDT, যা সামান্য ভাঙ্গতে পারে।

(b) **ভঙ্গুর বা ডিগ্রেডেবল** (Degradable) **:**

সহজেই ভাঙ্গে এমন জৈব পদার্থগুলিকে বলে ভঙ্গুর। বাড়ীর নোংরা ও আবর্জনাকে প্রাকৃতিক উপায়ে বা বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে ভেঙ্গে দেওয়া বা তার পরিবর্তন করাও সম্ভব। সেইরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই শ্রেণীর পদার্থগুলি থেকে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করা যায়।

নিচে কয়েকটি সাধারণ দূষণকারক পদার্থের নাম উল্লেখ করা হল, যেমন—

(a) ধোঁয়া, কুয়াশা, ধুলোবালি, আলকাতরা ইত্যাদি পদার্থ।

(b) লোহা, সীসা, দস্তা ইত্যাদি ধাতু।

(c) নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, অ্যামোনিয়া, সালফার ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসীয় পদার্থসমূহ।

(d) নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নামক অজৈব অ্যাসিডসমূহ।

(e) ফিউমারিক অ্যাসিড, অ্যাসেটিক অ্যাসিড ইত্যাদি জৈব অ্যাসিডসমূহ।

(f) বিভিন্ন কীটনাশক, আগাছানাশক রাসায়নিক বিষাক্ত পদার্থসমূহ, যেমন—ডাইক্লোরো-ডাইফিনাইল-ট্রাইক্লোরোইথেন (DDT)।

(g) তাছাড়া বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ, শহরাঞ্চলের নোংরা আবর্জনা, অস্বাভাবিক তীব্রতর আওয়াজ এবং বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক সার পরিবেশ দূষণের অপর কয়েকটি কারণ।

10.14. বায়ু দূষণ বা এয়ার পলিউশন (Air Pollution)

কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা মানুষের বিভিন্ন কাজের ফলে যখন বায়ুতে জীবের স্বাভাবিক জীবন যাপনের পক্ষে ক্ষতিকারক পদার্থসমূহের মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হয়ে পড়ে তখন ঐ বায়ুকে বলে **দূষিত বায়ু**। বিভিন্ন উপায়ে বায়ু দূষিত হওয়ার ঘটনাকে বলে **বায়ু দূষণ** (Air pollution)। দূষিত বায়ু পৃথিবীর সকল জীবের পক্ষে ক্ষতিকারক। একস্থানের বায়ু দূষিত হলে তার প্রতিক্রিয়া অন্যস্থানেও দেখা দিতে পারে। কারণ বায়ু কোন স্থানে স্থির থাকে না, সব সময় প্রবহমান।

1984 সালের 3-রা ডিসেম্বর ভূপালে অবস্থিত 'ইউনিয়ন কারবাইড' নামক কীটনাশক কারখানা হতে নির্গত মিথাইল আইসোসায়ানেট বা মিক্ গ্যাস (MIC) বায়ুতে মিশে যাওয়ার ফলে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে। তাৎক্ষণিক মৃত্যু ছাড়াও

উক্ত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে অনেক ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায় যেগুলির প্রকাশ ঘটে পরবর্তীকালে, যেমন—বহু বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত, স্বাভাবিক মানুষের মানসিক ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি।

● **বায়ু দূষণের কারণ ঃ**

(1) **ধোঁয়া ও ধোঁয়াশা বা স্মোক এবং স্মগ** (Smoke and Smog) ঃ

(a) বাড়ীতে রান্নাবান্নার জন্য উনানে এবং যানবাহন ও কলকারখানাতে ব্যবহার করা কয়লা, কেরোসিন, গ্যাসোলিন, পেট্রোল ইত্যাদির দহনের ফলে উৎপন্ন

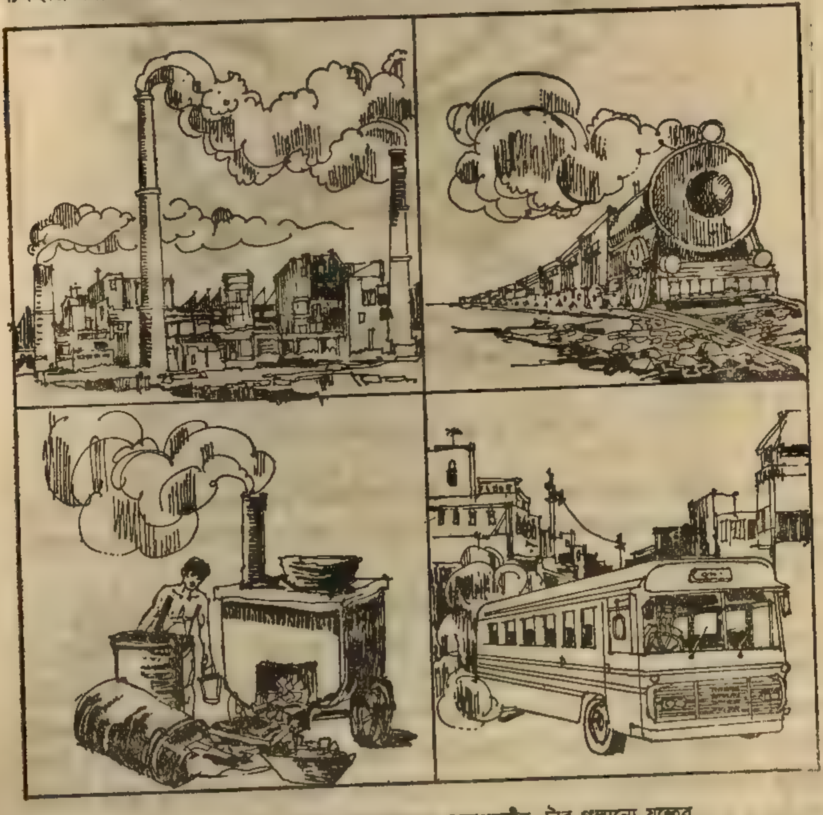

চিত্র **10.14** ঃ বায়ু দূষণ—কারখানার, রেলগাড়ীর, টার গলানো যন্ত্রের, যানবাহনের নির্গত ধোঁয়া।

পদার্থকে বলে **ধোঁয়া** বা **স্মোক** (Smoke)। তাছাড়া, বাষ্পচালিত রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ, রাস্তা মেরামত করার সময় আলকাতরা গলানোর যন্ত্র থেকে নির্গত ধোঁয়াও বায়ুকে দূষিত করে। বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক পদার্থ, বায়ু ও ধোঁয়া যখন একসঙ্গে মিশে মেঘের মত ঘন কালো হয় তখন তাকে বলে **ধোঁয়াশা** বা **স্মগ** (Smog) [illegible]

(b) জীবের পক্ষে ক্ষতিকারক যে সব বস্তু যানবাহন ও কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়ার মধ্যে থাকে সেগুলি হল সালফার ডাই-অক্সাইড, সালফাইডস, বেঞ্জোপাইরিন, নাইট্রোজেনের অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড (CO), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), নাইট্রিক অক্সাইড (NO), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) ইত্যাদি।

চিত্র 10.15 : বায়ু দূষণ—বিমানের ধোঁয়া।

(c) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কার্বন কণা বায়ুর মাধ্যমে ছড়ায়, ফলে বন্ধ হয় উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র। তাতে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতি এবং উদ্ভিদের সাধারণ বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

(d) শিল্পাঞ্চলে ধোঁয়ার চেয়েও আর একরকম ক্ষতিকারক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে **ধোঁয়াশা**। কতিপয় বিষাক্ত পদার্থ সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে ধোঁয়াশায় পরিণত হয়, যা জীবের পক্ষে আরও বেশী ক্ষতিকারক, তখন তাদের **আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা** বা **ফটোকেমিক্যাল স্মগ** (Photo-chemical smog) বলে। বায়ুর দূষিত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস দ্রুত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে মিশে অক্সিজেনের পরিমাণকে কমায়, ফলে দৈহিক স্বাস্থ্যের খুবই ক্ষতি হয়। কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের দহনের ফলে উৎপন্ন সালফারের অক্সাইড আর একটি দূষণকারক পদার্থ, এই গ্যাসের মাত্রাতিরিক্তের জন্য মানুষের চোখ, গলা এবং ফুসফুসে নানা রোগের সৃষ্টি হয়।

(2) **কুয়াশা ও ধুলোবালি** (Fog and dust) : বায়ু দূষণকারী পদার্থের মধ্যে আবার পড়ে কুয়াশা ও ধুলোবালি, যারা একসঙ্গে সৃষ্টি করে ধোঁয়াশার (Smog)। তখন সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে গঠন করে সালফার ট্রাই-অক্সাইড (SO_3)। উৎপন্ন সালফার ট্রাই-অক্সাইড পরবর্তী

কালে জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিডে (H_2SO_4) পরিণত হয়। সালফার ডাই-অক্সাইডের মত সালফিউরিক অ্যাসিড এবং সালফিউরাস অ্যাসিড (H_2SO_3) দূষণকারক পদার্থরূপে গণ্য হয়। বড় বড় মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মিত প্রাসাদ বা অট্টালিকার ক্ষয় ঐ অ্যাসিডগুলির দ্বারা ঘটতে পারে।

কয়লা দহনের পরে ক্লোরিন হাইড্রোক্লোরাইড নামক গ্যাসীয় পদার্থ বাতাসে এসে মেশে। এই গ্যাস অ্যালুমিনিয়াম কারখানা হতে নির্গত হয়, বায়ুতে এর পরিমাণ বাড়লে সাধারণ শাকসবজি জাতীয় পদার্থের ক্ষতি হয়। ঐ সকল দূষিত শাকসবজি খেয়ে গৃহপালিত পশুদের মধ্যে নানা রোগ, যেমন—দন্তক্ষয় এবং অস্থির রোগ দেখা দিতে পারে।

চিত্র 10.16 : পার্থেনিয়াম উদ্ভিদ এবং তার বিভিন্ন অংশ।

আবার, বিভিন্ন ছত্রাকের রেণু এবং সবুজ উদ্ভিদের পরাগরেণুর দ্বারা বায়ু দূষণ ঘটতে পারে। নির্গত রেণুগুলির পরিমাণ বায়ুতে বেশী হলে মানুষের অ্যালার্জি (Allergy) এবং হাঁপানি রোগের সৃষ্টি হতে পারে। পার্থেনিয়াম (*Parthenium*) নামক উদ্ভিদের পরাগরেণু মানুষের অ্যালার্জি ঘটায় এবং মারাত্মক চর্মরোগের সৃষ্টি করে।

(3) **যানবাহন হতে পরিত্যক্ত ধোঁয়া** (Automobile exhaust) : শহরাঞ্চলের যানবাহন বায়ু দূষণের অপর একটি প্রধান কারণ। বায়ু দূষণের শতকরা 60 ভাগ উপাদানই আসে যানবাহনের পরিত্যক্ত ধোঁয়া থেকে। যানবাহন হতে পরিত্যক্ত ধোঁয়া বায়ুতে যুক্ত করে কার্বন মনোক্সাইড, সিলিকন টেট্রাক্লোরাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বন জাতীয় গ্যাস। তাছাড়া, বিভিন্ন রকমের হাইড্রোকার্বন জাতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয় পেট্রোল দহনের ফলেও, যা খুবই ক্ষতিকারক। ঐ হাইড্রোকার্বন জাতীয় পদার্থ নাইট্রিক অক্সাইডের সঙ্গে মিশে তৈরি হয় আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা। নাইট্রিক অক্সাইড অস্বস্তিকর দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। তাছাড়া, বিভিন্ন শ্বাসরোগের কারণও হয়ে দাঁড়ায়। হাইড্রোকার্বন হতে নাইট্রিক অক্সাইডের অসম্পূর্ণ দহনের ফলে,

মানুষের ফুসফুসের ক্যানসার রোগ সৃষ্টিকারী বেঞ্জোপাইরিন (Benzopyrine) বের হয়। বায়ুতে নির্গত কার্বন-মনোক্সাইড (CO) রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে মিশে দেহে রক্তের স্বাভাবিক অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা কমায়। অপর বিষাক্ত ক্ষতিকারক দূষিত পদার্থগুলি হল পারঅক্সি-অ্যাসিটাইল নাইট্রেট (PAN) এবং সীসা, যা যানবাহনের পরিত্যক্ত ধোঁয়া হতে বায়ুমন্ডলে আসে। পারঅক্সি-অ্যাসিটাইল নাইট্রেট উদ্ভিদের পক্ষে সালোকসংশ্লেষ ব্যাঘাতকারী পদার্থ। ধুলা এবং কুয়াশা (mist) বায়ুতে খুব বেশী থাকলে আলোর প্রতিফলন বেশী হয় এবং স্বাভাবিকভাবে দেখার ক্ষমতা কমে। ফটোকেমিক্যাল স্মগ বা ধোঁয়াশা কিভাবে সৃষ্টি হয় তা নিচে দেখানো হল ঃ

$$\text{নাইট্রোজেন অক্সাইড} + \text{হাইড্রোকার্বনস্} \xrightarrow[\text{সূর্যালোক}]{*\text{uv} - \text{বিকীরণ}} \text{পারঅক্সি-অ্যাসিটাইল নাইট্রেট (PAN) এবং ওজোন } (O_3)$$

(4) **কীটনাশক** (Insecticides) ও **আগাছানাশক** (Herbicides) ঃ বর্তমান যুগে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ কীটপতঙ্গকে ধ্বংস করার জন্য ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হচ্ছে। তার মধ্যে হল ডাইক্লোরো-ডাইফিনাইল-ট্রাইক্লোরোইথেন (DDT) এবং বিভিন্ন ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন। ঐ পদার্থগুলির প্রয়োগে একদিকে যেমন আমাদের লাভ হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি বায়ু দূষণ সমস্যাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঐ সকল কীটনাশক পদার্থের বৈশিষ্ট্য হল ওরা জীবদেহে প্রবেশ করলেও কোন রকম ভাবে নষ্ট হয় না। উপরন্তু দেহস্থ কোষগুলির মধ্যে স্থায়ীভাবে সঞ্চিত থাকে। খাদ্য-শৃংখলে দেখা যায় যে, বড়-বড় প্রাণী ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ভক্ষণ করে বেঁচে থাকার জন্য শক্তি সঞ্চয় করে। তখন DDT ও অন্যান্য বিষাক্তকর রাসায়নিক পদার্থ এক প্রাণীর দেহ থেকে অপর প্রাণীর দেহে আসে এবং তথায় সঞ্চিত হতে থাকে। এই ঘটনা দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক। আবার দেখা যায় যে উদ্ভিদের উপর ব্যবহৃত কীটনাশক DDT (ডাইক্লোরো-ডাইফিনাইল-ট্রাই-ক্লোরোইথেন) বর্ষার জলে ধুয়ে পার্শ্ববর্তী পুকুর এবং নদনদীতে গিয়ে পড়ছে। ফলে দূষিত হচ্ছে জল, ক্ষতি হচ্ছে জলজ প্রাণিকুলের। DDT-র নানা রকম পার্শ্বীয় প্রতিক্রিয়া আজকাল দেখা যাওয়ায় এই রাসায়নিক পদার্থটির ব্যবহার পৃথিবীর অনেক দেশে নিষিদ্ধ হয়েছে।

যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে বিভিন্ন স্থানের আগাছা বা অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদের দমন করা হয়, তাদের বলে **আগাছানাশক** (Herbicide), যেমন—2-4-D (ডাইক্লোরো ফেনোক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড)। আগাছানাশক রাসায়নিক পদার্থগুলিও বায়ু দূষণের অপর কারণ। তাছাড়া, এরজন্য দায়ী অপর রাসায়নিক পদার্থ হল 2, 4, 5-T (ক্লোরিনেটেড ফেনোক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড), যে পদার্থ উদ্ভিদের ফেলায়েমের মাধ্যমে খাদ্য সংবহনে বাধার সৃষ্টি করে। আবার, এ থেকে মানুষের চর্মরোগও হতে পারে।

* uv = অতি বেগুনী রশ্মি।

(5) **তেজস্ক্রিয় পদার্থ** (Radio-active elements) : পৃথিবীতে মানুষ ঘটাচ্ছে আণবিক ও পারমাণবিক বিস্ফোরণ, যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় ভস্মের। ইকোসিস্টেমের খাদ্য-শৃঙ্খলে ঐ তেজস্ক্রিয় ভস্মের কণাগুলি প্রবেশ করে মানুষের বিভিন্ন ক্ষতি করে। এদের থেকে নানা রকমের বিপজ্জনক রোগ, দেহের বিকৃতি ইত্যাদি দেখা যায়।

● **বায়ু দূষণের জন্য দায়ী বিভিন্ন পদার্থ :**

(i) ধোঁয়া, টার, ধূলোবালি, কুয়াশা, ধোঁয়াশা ;
(ii) কার্বন মনোক্সাইড ;
(iii) সালফার ডাই-অক্সাইড ;
(iv) সালফিউরিক অ্যাসিডের কণা ;
(v) হাইড্রোজেন সালফাইড ;
(vi) ক্লোরিন এবং ক্লোরাইডস্ ;
(vii) অন্যান্য হ্যালোজেন, যথা—ফ্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন ;
(viii) ধাতু, যথা—সীসা, লোহা, দস্তা, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি ;
(ix) কৃষিকাজে ব্যবহৃত বায়ু দূষক—কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক এবং বিভিন্ন সার ;
(x) বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা থেকে নির্গত বিভিন্ন জৈব দূষিত পদার্থ—বেঞ্জোপাইরিনস্, বেঞ্জিন, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, ইথার ইত্যাদি ;
(xi) আলোক রাসায়নিক বা ফটোকেমিক্যাল পদার্থ, যা বিভিন্ন যানবাহন থেকে নির্গত হয়—ওজোন, পারঅক্সি-অ্যাসিটাইল নাইট্রেটস্, অ্যালডিহাইড, ইথিলিন ইত্যাদি। তাছাড়া, মিথেন (**Methane**) এবং ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (**Chloroflurocarbon**) উল্লেখযোগ্য।
(xii) তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

● **বায়ু দূষণে বিভিন্ন রোগ :**

বায়ু দূষণের ফলে সৃষ্ট প্রধান রোগ হল **নিউমোকোনিওসিস** (Pneumoconiosis)। তার মধ্যে পড়ে সিলিকোসিস (Silicosis), অ্যাসবেসটোসিস ইত্যাদি। যারা পাইপ তৈরি করে তাদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়।

লক্ষণ : এই রোগে (i) ফুসফুসীয় কলা বিনষ্ট হয়ে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।
(ii) রক্তের অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা কমে যায়, এবং
(iii) শ্বাসকষ্ট ও মাথাধরা উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয়।

বায়ু দূষণের ফলে সৃষ্ট অন্যান্য রোগ হল—

(iv) **ব্রঙ্কাইটিস**, (v) **হাঁপানি** রোগ—এই রোগে রোগী সহজে প্রশ্বাস গ্রহণ করতে পারে কিন্তু সহজে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারে না। (vi) নানা ধরনের অ্যালার্জি, (vii) **ফুসফুসের ক্যানসার**, (viii) **যক্ষ্মা** (Tuberculosis)।

আবার দেখা যায় সালফার-ডাই-অক্সাইড, ক্লোরাইড জাতীয় পদার্থ এবং ধোঁয়াশার দ্বারা আক্রান্ত অনেক উদ্ভিদে স্বাভাবিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। তাতে ফসলের ক্ষতি হয় এবং পাতাগুলি বিনষ্ট হয়ে ঝরে পড়ে। এতে মানুষ পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

● **বায়ু দূষণ প্রতিকারের উপায় (Control measures of Air Pollution) :**

বায়ু দূষণ প্রতিকারের বিভিন্ন উপায় নিচে দেওয়া হল, যেমন—

(a) দেহের পক্ষে বিষাক্ত পদার্থ যাতে বায়ুতে প্রবেশ করতে না পারে তার প্রতিরোধ করা। বায়ুকে শুদ্ধ করা এবং আবদ্ধ স্থানে স্বাভাবিক বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা। দূষিত বায়ুকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রেখে পরে উপযুক্ত স্থানে সরিয়ে দূষণমুক্ত করা।

(b) যে সকল পদার্থের দ্বারা বায়ু দূষিত হয় তাদের ব্যবহার যথাসম্ভব কমানো। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কয়লার ধোঁয়া ক্ষতিকারক, তার পরিবর্তে তড়িৎ-চালিত যান এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা।

(c) গাছপালার সংখ্যা বাড়িয়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলের বায়ু দূষণ অনেকটা কমানো সম্ভব। সেজন্য আমাদের চারপাশে এবং শিল্পাঞ্চলে প্রয়োজন মত স্থানে বেশী করে গাছপালা লাগানো উচিত। তার জন্য প্রতিবছরই পালিত হচ্ছে 'বনমহোৎসব এবং অরণ্য সপ্তাহ'। উদ্দেশ্য হল গাছপালা লাগিয়ে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করা।

(d) আইন প্রয়োগ করে বায়ু দূষণ বন্ধ করা। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই আইনকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

(e) বায়ু থেকে ধোঁয়া এবং ধুলোবালি অপসারণ করতে **ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর** ব্যবহার করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা যেতে পারে। তাছাড়া, **স্ক্রাবার** (Scrubber)-এর সাহায্যে জল ছিটিয়ে বাতাস থেকে NH_3 এবং SO_2 দূর করা যেতে পারে।

(f) কীটনাশক পদার্থের ব্যবহার যথাসম্ভব কমানো, পরিবর্তে জীবকে জীবের দ্বারা ধ্বংস করা। উদাহরণ—লেডীবার্ড বিটল এবং লেসউয়িং নামক পতঙ্গের চাষ।

(g) যে সকল রাসায়নিক পদার্থ ক্ষতিকারক তাদের অন্য রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা শোষণ করে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা।

(h) কলকারখানায় বহুল পরিমাণে ফিল্টারের ব্যবস্থা রাখা।

(i) যানবাহনের, যথা—বাস, লরি ইত্যাদির ধোঁয়া নির্গমনের নলের সঙ্গে একটি বায়ু শোধন যন্ত্র বসানো, বেরিয়াম (Barium) যৌগের অতিরিক্ত ব্যবহার।

(j) ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের জীবনচক্র অসম্পূর্ণ রাখার জন্য উপযুক্ত হরমোন কাজে লাগানো, যাতে কীটপতঙ্গ সহজেই বংশবিস্তার করতে না পারে।

(k) জমিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বিভিন্ন ফসলের চাষ করা, যাকে ফসলের আবর্তন বলে।

(l) কলকারখানা যতদূর সম্ভব শহরের ঘনবসতি অঞ্চল থেকে দূরে স্থাপন করা।

10.15 জল দূষণ বা ওয়াটার পলিউশন (Water pollution)

জলই জীবন। জল ছাড়া কোন জীব বাঁচতে পারে না। কলকারখানা, কৃষিক্ষেত্র, মৎস্যচাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জল খুবই প্রয়োজন। নদী, পুষ্করিণী, হ্রদ, খালবিল, সমুদ্র থেকে মানুষ নিজেদের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করে। তাছাড়া, বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পও জলের উৎস। আজকাল দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জলের উৎসগুলি কারখানাজাত রাসায়নিক এবং শহরের পয়ঃপ্রণালী বাহিত ময়লা আবর্জনার দ্বারা ক্রমশই দূষিত হচ্ছে।

● **জল দূষণের কারণ** (Causes of water pollution) **:** নিচেজল দূষণের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হল ঃ

চিত্র 10.17 ঃ জল দূষণ—কলকারখানার দূষিত জল নদীতে পড়ছে।

(a) শিল্প ও কলকারখানা জাত ময়লা ও আবর্জনা ক্রমাগত নদী ও সমুদ্রে পড়ার ফলে জল দূষণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়, ফলে মানুষের যেমন অসুবিধা হয় আবার বহু জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটে। শহরের পয়ঃপ্রণালীর নোংরা আবর্জনা নদী, খাল ইত্যাদির জলে পড়ার ফলে ভাসমান উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ জলে কমে। মৃত ভাসমান উদ্ভিদেরা (ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন) খুব তাড়াতাড়ি পচার ফলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে। তখন জলের মাছ ও অন্যান্য প্রাণী মারা যায় এবং দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

(b) শিল্প ও কলকারখানা থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলি জল দূষণের অপর একটি প্রধান কারণ। কাগজ, চিনি, বস্ত্রশিল্প, ইস্পাত শিল্প,

রাসায়নিক সার কারখানা ইত্যাদি হতে উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থগুলি নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী ইত্যাদির জলে নলের সাহায্যে এনে ফেলা হয়। ফলে জল দূষিত হয়ে মানুষের খুবই অপকার করে। জলজ প্রাণীদের পক্ষেও তার ফল হয় বিষময়। দূষিত পদার্থগুলি হল, ভারী ধাতু, অম্ল, ক্ষার, সায়ানাইড ইত্যাদি। ভারী ধাতুর মধ্যে উপজাত পদার্থগুলি জলকে দূষিত করে। পারদ, সীসা, তামা, দস্তা বিভিন্ন কারখানা থেকে নির্গত হয়।

অনেক সময় কলকারখানার গরম জল নদী বা বিভিন্ন জলাশয়ে পড়ে জলকে দূষিত করে। ক্ষতি হয় বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত জীবদের।

(c) কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক পদার্থ জলের উৎসের কাছে ব্যবহার করা হলে সেই জল দূষিত হয়, বাস্তুতন্ত্রের বিঘ্ন ঘটে। জীবদের পক্ষে সেই পরিবেশ অসুবিধার সৃষ্টি করে। সায়ানাইড (Cyanide), ফেনল (Phenol), অ্যামোনিয়া (Ammonia) ইত্যাদি রাসায়নিক মিশ্রিত জল বিভিন্ন জায়গায় নদীর জলে এসে পড়ে। DDT ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ জলকে দূষিত করে। আবার নদীর মাধ্যমে জল সমুদ্রে পড়লে সেখানকার জলও দূষিত হতে পারে। সেই দূষিত জলে সামুদ্রিক প্রাণীদের মৃত্যু ঘটতে পারে।

(d) আণবিক চুল্লী থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থযুক্ত উত্তপ্ত জল সমুদ্রে ফেলা হয়। বেশী তাপে জলের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে, তখন জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বেঁচে থাকার পক্ষে অসুবিধা হতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি নানা রকমের সামুদ্রিক প্রাণীর দেহে বিপাকীয় কাজের বিশৃঙ্খলা ঘটায়। মানুষের শরীরের পক্ষে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিষাক্ত, ক্যানসার রোগ সৃষ্টিকারী।

(e) পুষ্করিণী, হ্রদ, নদী প্রভৃতিতে মানুষ স্নান করে ও কাপড়-চোপড় কাচে। তাছাড়া, গবাদি পশুদেরও স্নান করানো হয়। এর ফলে জল হয় ঘোলাটে, দুর্গন্ধযুক্ত ও নানা সংক্রামক রোগের জীবাণুযুক্ত। ফলে নানা ধরনের সংক্রামক রোগ জলের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি মহামারির আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে সংক্রামিত রোগগুলির মধ্যে টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয়, হেপাটাইটিস (আন্ত্রিক রোগ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জলে উপস্থিত জীবাণু ও তাপমাত্রার উপর অক্সিজেনের অপচয় নির্ভর করে। জলে বর্তমান জৈব পুষ্টি পদার্থের পরিমাণ তার অক্সিজেনের ব্যবহারের ক্ষমতা দ্বারা নির্ণয় করা হয়, একেই বলে জলের **জৈব অক্সিজেন মাত্রা** (Biological oxygen demand) বা সংক্ষেপে BOD।

(f) জল দূষণের অপর একটি কারণ হল জামাকাপড় পরিষ্কার করার সাবান-জাতীয় পদার্থ বা ডিটারজেন্ট (Detergent)। সালফেটস্, নাইট্রেটস্ এবং ক্লোরাইডস্ দ্বারা জল দূষিত হয়। সাবানজাতীয় পদার্থগুলি খাদ্যরূপে জলে জীবাণুর সংখ্যা বাড়ায়।

(g) জল দূষণের জন্য জলজ আগাছাগুলিকে দায়ী করা যায়। এদের সংখ্যা বাড়লে ক্ষতি হয় মাছের। তাছাড়া, সেই জল পানীয় হিসেবে ব্যবহার করার অযোগ্য হয়।

(h) জল দূষণের জন্য দায়ী অন্যান্য দূষণকারক পদার্থের মধ্যে তেলবাহী জাহাজ হতে নির্গত খনিজ তেলকেও ধরা যেতে পারে। কোন কারণে তেলবাহী জাহাজে দুর্ঘটনা ঘটলে সমুদ্রের জলে তেল নির্গত হয়ে জল দূষিত হয়।

(i) কচুরিপানা ও অন্যান্য আগাছা পচে অনেক সময় পুকুর, ঝিল ইত্যাদির জলকে বিষাক্ত করতে পারে।

(j) বৃষ্টির জলে ধৌত নোংরা আবর্জনার মধ্যে অনেক সময় থাকে গুরু-ধাতু (Heavy metal), যেমন—আরসেনিক, অ্যান্টিমনি, ক্রোমিয়াম, তামা, কোবাল্ট, সীসা প্রভৃতি। ঐ সকল ধাতু মানুষের দেহে পানীয় জলের সঙ্গে প্রবেশ করে (বিশেষ করে শহরে) দেহের বৃদ্ধি ও বিপাকীয় কাজের ব্যাঘাত ঘটায়। অনেক সময় আবার জীবের মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

● জল দূষণের কয়েকটি রাসায়নিক নির্দেশক (Some Chemical indicators of Water Pollution)

(a) জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ 5 mg/লিটারের কম হলে বোঝা যায় যে জল দূষিত হয়েছে।

(b) জলে অ্যালবুমিনয়েড অ্যামোনিয়া (Albuminoid ammonia)-র পরিমাণ 0·1 mg/লিটারের বেশী হলে জল দূষণ হয়েছে বোঝা যায়।

(c) ক্লোরাইড (Chlorides) সব রকম জলে থাকে। সমুদ্রের জলে ক্লোরাইডের পরিমাণ থাকে অনেক বেশী। স্বাদু জলে ক্লোরাইডের পরিমাণ থাকে 200 mg/লিটার ; তার চেয়ে বেশী হলে বুঝতে হবে যে জল দূষিত হয়েছে।

● জল দূষণ প্রতিকারের উপায় (Control measures of Water Pollution)

(a) শিল্প ও কলকারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থসমূহ যাতে সরাসরি নদীতে ও অন্য জলাশয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

(b) দূষিত অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নালা-নর্দমার মধ্য দিয়ে নদীতে মেশার পূর্বে সেই দূষিত জলকে বিশোধনের ব্যবস্থা করা।

(c) নদী-নালা সব সময় আবর্জনামুক্ত রাখা।

(d) তেলবাহী জাহাজ হতে যাতে খনিজ তেল নদী বা সমুদ্রে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

(e) পয়ঃপ্রণালী (Sewage) ব্যবস্থা পদ্ধতির দিকে বিশেষ নজর রাখা।

(f) জল পান করার পূর্বে সেই জলকে ফুটিয়ে নেওয়া এবং পরিস্রুত করা।

(g) পানীয় জলে প্রয়োজন মত ক্লোরিন জাতীয় পদার্থ মিশিয়ে পান করা।

(h) পুষ্করিণী, খাল, বিল ইত্যাদিতে যাতে অযথা কচুরিপানা ও আগাছা না জন্মায় তার ব্যবস্থা করা।

(i) পানীয় জলের নলে যাতে কোন ছিদ্র না থাকে বা নোংরা আবর্জনা নির্গমন নলের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকে তার প্রতি নজর রাখা।

10.16. শব্দ দূষণ বা নয়েজ পলিউশন (Noise Pollution)

আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের শব্দ হয়। তার মধ্যে অনেক শব্দ সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের আছে। তবে বেশী মাত্রার তীব্রতর আওয়াজ মানুষের বিভিন্ন রকমের ক্ষতি করতে পারে। অন্যান্য জীবের মধ্যেও অস্বস্তি দেখা দিতে পারে।

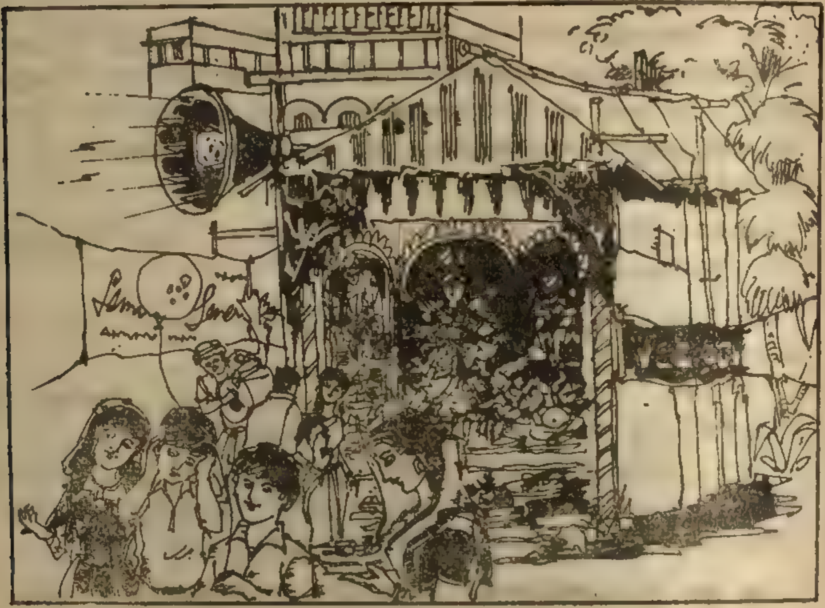

চিত্র 10.18 : শব্দ দূষণ—মাইক বাজছে।

অপ্রয়োজনীয় সুরবিহীন আওয়াজ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের পক্ষে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তখন সেই রকম শব্দ আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। বাতাস দ্বারা বাহিত হয় বলে শব্দকে দূষণের মধ্যে রাখা হয়েছে। নানা ধরনের তীব্রতর উচ্চ শব্দ শহরাঞ্চলে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করছে। তার কারণগুলি হল শিল্পাঞ্চলে কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন সংখ্যার বৃদ্ধি। কলকারখানা থেকে এবং যানবাহনগুলি থেকে নির্গত বিকট আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে উচ্চ গ্রামে রেডিও, টেলিভিশন, মাইক ইত্যাদি চালানোর ফলেও উৎপন্ন হচ্ছে বিরক্তিকর শব্দ।

শব্দ পরিমাপের একক হচ্ছে ডেসিবেল (Decibel or db)। কথোপকথনের সময় আমাদের উচ্চারিত শব্দের তীক্ষ্নতা 30-60 ডেসিবেলের মধ্যে থাকে। সাধারণত 85 ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দের তীক্ষ্নতা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। শব্দের তীক্ষ্নতা এর চেয়ে বেশী হলে 'শব্দ দূষণ' ঘটে।

● **শব্দ দূষণের উৎসগুলি হল :**

(a) কলকারখানার অসহ্য বিরক্তিকর আওয়াজ।

(b) বর্তমান যুগে যানবাহনের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় তাদের বিকট শব্দ।

(c) তাছাড়া, অন্যান্য অসহ্য বিরক্তিকর শব্দের উৎস হল মাইক, রেডিও, টেলিভিশন, জেটপ্লেন ইত্যাদি।

● **শব্দ দূষণের প্রতিক্রিয়া** (Effects of noise pollution) :

(i) ক্রমাগত কানে অস্বাভাবিক ও বিরক্তিকর শব্দ প্রবেশ করার ফলে শ্রবণে অসুবিধা দেখা দেয়—মানুষ বধির হয়ে যেতে পারে।

(ii) অন্য মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তার সময় অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

(iii) দুঃসহ অবস্থার উদ্রেক করে, ফলে ঘুমের ব্যাঘাত, উত্তেজনা ও স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দেয়।

(iv) শারীরবৃত্তীয় কাজের পরিবর্তন ঘটে, ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং হৃৎস্পন্দনের গতিও বাড়ে। হৃদরোগ সৃষ্টি, মাথা ধরা, দৈহিক অবসাদ, মাথা ঘোরা ইত্যাদি লক্ষণগুলিও দেখা দিতে পারে।

(v) রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় তীব্রতর বিরক্তিকর শব্দ, ফলে দেখা দেয় উচ্চ রক্তচাপ।

(vi) অস্বাভাবিক উচ্চ শব্দ ধীরে ধীরে মানুষকে, মানসিক রোগীর পর্যায়ে উপনীত করে।

● **শব্দ দূষণের প্রতিকারের উপায়** (Control measures of noise pollution)

পুরোপুরি আওয়াজ বন্ধ করা সম্ভব না হলেও তার তীব্রতা বিভিন্ন উপায়ে কমানো যেতে পারে, শব্দ দূষণের প্রতিকার হিসেবে। যেমন—

(a) মানুষকে সুনাগরিকের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই দায়িত্বগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেডিও, টেলিভিশন, মাইক ইত্যাদির আওয়াজ যথাসম্ভব নিম্নস্তরে রেখে সেগুলি শুনতে হবে।

(b) যে সব স্থান থেকে আওয়াজ আসে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা। যেমন—যে সব যন্ত্র থেকে উচ্চ শব্দ বের হয় তাদের আলাদাভাবে রাখা এবং শব্দ প্রতিরোধক যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা।

(c) শব্দ পরিবহণকে নিয়ন্ত্রণ করা, সম্ভব হলে শব্দ শোষণকারী দেওয়াল তৈরি করা।

(d) যে সমস্ত কলকারখানায় বেশী শব্দ হয় সেখানকার কর্মীদের কানে শব্দ-রোধক যন্ত্র (Ear plug) ব্যবহার করা ও শহরাঞ্চলে যে সকল যানবাহনের হর্ণ থেকে তীব্র আওয়াজ নির্গত হয় তা নিষিদ্ধ করা। যাতে আওয়াজ কম হয় সে রকম হর্ণ ব্যবহার করা। হাসপাতাল ও স্কুল-কলেজের কাছে যানবাহনের গতি কমানো এবং প্রয়োজন না হলে হর্ণ না বাজানো।

(e) যে সমস্ত অঞ্চলে লোকজনের বসবাস বেশী, সেইসব অঞ্চলে কলকারখানা স্থাপন না করা।

(f) পরিশেষে শব্দ দূষণ বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা এবং সেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

10.17. মৃত্তিকা দূষণ বা ল্যাণ্ড পলিউশন (Land pollution)

মৃত্তিকাও দূষিত হতে পারে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এবং কঠিন বর্জ্য পদার্থসমূহের দ্বারা। বিভিন্ন আবর্জনা, বড় বড় বাড়ী ভাঙার পর তার রাবিশ, প্রাণীদের মৃতদেহ এবং নানা রকমের শিল্প ও কলকারখানা থেকে উৎপন্ন উপজাত বর্জ্য পদার্থসমূহের সঞ্চয়ের ফলে মাটি দূষিত হয়। তাছাড়া, DDT ও অন্যান্য অভঙ্গুর পদার্থসমূহ মাটির সঙ্গে মিশে মাটিকে দূষিত করে। যার ফলে বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হয়। বিভিন্ন কীটনাশক ঔষধের সীমিত ব্যবহার এবং জৈবিক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা রাসায়নিক পদার্থ হতে মৃত্তিকা দূষণ রোধ করা যায়।

● বিষয়-সংক্ষেপ ●

● **বাস্তু সংস্থান :**

বিজ্ঞানের যে শাখায় জীব এবং তাদের পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে জানা যায়, তাকে **বাস্তু সংস্থান** বা **বাস্তব্যবিদ্যা** বলে।

পৃথিবীর জলভাগ, স্থলভাগ ইত্যাদি যেসব স্থানে অর্থাৎ জল ও বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে জীবের অস্তিত্ব বা লক্ষণ দেখা যায় সেই সমুদয় স্থানকে একসঙ্গে **জীবমণ্ডল** বা **বায়োস্ফিয়ার** বলে। পৃথিবীর কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণীর) মোট ওজনকে বলে **জীবভর** বা **বায়োমাস**। কোন এলাকার ভৌত পরিবেশ ও সেখানকার জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ককেই **বাস্তুতন্ত্র** বা **বাস্তুরীতি** বা **ইকোসিস্টেম** বলে। অবস্থান অনুযায়ী বাস্তুতন্ত্র নানা রকমের হয়ে থাকে, যেমন—পুষ্করিণীর ইকোসিস্টেম, অরণ্যের ইকোসিস্টেম, নদীর ইকোসিস্টেম, সমুদ্রের ইকোসিস্টেম ইত্যাদি।

বাস্তুতন্ত্রের গঠন-প্রকৃতি নির্ণীত করা হয় জড় বা অজীব ও সজীব এই দু প্রকার উপাদান দ্বারা। জড় বা অজীব উপাদানগুলি অজৈব (ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি)। জৈব উপাদান (মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাংশের বিভিন্ন রকমের জৈব বস্তুর পচনের ফলে উৎপন্ন পদার্থসকল) ও ভৌত (আবহাওয়া, মাটি সংক্রান্ত কারণ, ভূ-সাংস্থানিক কারণ) উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। সজীব উপাদান আবার স্বভোজী অংশ (ক্লোরোফিল রঞ্জক পদার্থযুক্ত উদ্ভিদ) ও পরভোজী অংশ (জীব সম্প্রদায়ের যে সমস্ত সজীব সদস্য স্বভোজীদের সংশ্লেষিত যৌগগুলি গ্রহণ করে অর্জিত যৌগের পুনর্বিন্যাস ও রূপান্তর ঘটায়) নিয়ে গঠিত। পরভোজী অংশ আবার খাদক বা ভক্ষক এবং বিয়োজকের সমন্বয়ে গঠিত। ইকোসিস্টেমের উৎপাদক সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় যে সব খাদ্যবস্তু তৈরি করে, এবং সেই সব খাদ্যবস্তু খেয়ে যারা বেঁচে থাকে তাদের **খাদক** বা **ভক্ষক** বলে। সকল প্রাণীই খাদক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। খাদকদের মধ্যে আবার নিম্নলিখিত কয়েকটি সারি দেখা যায় ; যেমন—প্রথম সারির খাদক, দ্বিতীয় সারির খাদক, তৃতীয় সারির খাদক এবং সর্বোচ্চ সারির খাদক। যেহেতু প্রথম সারির খাদক উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল সেজন্য এরা সব সময় হয় তৃণভোজী, শস্যভোজী বা শাকাশী প্রাণী, যেমন—তৃণভূমির বাইসন, অরণ্যের হরিণ ইত্যাদি। অন্যান্য সারির প্রাণী সব সময় হয় মাংসাশী প্রাণী ; যেমন—বাঘ, যারা প্রথম সারির খাদক হরিণকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

ক্লোরোফিলযুক্ত সবুজ উদ্ভিদ, যারা সূর্যের আলোকশক্তির সাহায্যে পরিবেশ হতে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের মধ্যে রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে কার্বোহাইড্রেট

জাতীয় খাদ্য তৈরি করে, তাদের **উৎপাদক** বলে। উৎপাদকেরা আবার দু প্রকারের হয়, যথা—ফাইটো-প্ল্যাংকটন (জলে ভাসমান আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ) এবং স্থলের ও জলের বড় আকারের উদ্ভিদ।

উৎপাদক উদ্ভিদদের শাকাশী প্রাণীরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মাংসাশী প্রাণীদের (দ্বিতীয় হতে সর্বোচ্চ সারির প্রাণীরা) দ্বারা শাকাশী প্রাণীরা ভক্ষিত হয়। পরিশেষে উৎপাদক এবং খাদকদের মৃত্যু ঘটলে কয়েক শ্রেণীর ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া বিয়োজক-রূপে উক্ত জীবদেহগুলির পচন বা বিশরণ ঘটিয়ে সেখানকার জটিল জৈব যোগ সরল জৈব ও অজৈব পদার্থে পরিণত করে। যার ফলে ঐ সকল অজৈব যৌগ পরিবেশে ফিরে যায়। এইসব পরিবর্তিত উপাদান পুনরায় উৎপাদকদের গ্রহণযোগ্য হয় এবং উৎপাদক উদ্ভিদ ঐ উপাদানগুলিকে পরিবেশ হতে সংগ্রহ করে। বিয়োজক ও রূপান্তরক ইকো-সিস্টেমকে সক্রিয় রাখে।

ইকোসিস্টেমের প্রকারভেদ দুটি, যথা—জলজ ও স্থলজ। জলজ ইকোসিস্টেম আবার দু রকমের হয়, যথা—মিঠা জলের ও সামুদ্রিক জলের ইকোসিস্টেম। স্থলজ ইকোসিস্টেমের মধ্যে দেখা যায় বনভূমি, তৃণভূমি, মরুভূমি ইত্যাদি ইকোসিস্টেম। একটি পুষ্করিণীর বাস্তুতন্ত্রের কার্যকর অজৈব উপাদানগুলি হল—জল, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, নাইট্রোজেন জাতীয় লবণ ইত্যাদি। উৎপাদকেরা হল—বড় আকারের জলজ উদ্ভিদগুলি, যেমন—হাইড্রিলা, পাতাশ্যাওলা ইত্যাদি। আবার কিছু উদ্ভিদ জলে ভাসমান অবস্থায় থাকে, যেমন—কচুরিপানা, খুদিপানা ইত্যাদি। তাছাড়া থাকে আণুবীক্ষণিক শৈবাল (ডায়াটম, ডেসমিড ইত্যাদি)। এরা পুষ্করিণীতে উৎপাদকের ভূমিকা পালন করে।

জলজ পতঙ্গ, কবচি প্রাণী, প্রাণী প্ল্যাংকটন, শাকাশী পতঙ্গ, শূক কীট ইত্যাদি হল প্রথম সারির খাদক. যারা উৎপাদকদের ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে। আবার কিছু জলজ পতঙ্গ, ছোট ছোট মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি প্রথম সারির খাদকদের ভক্ষণ করে বলে দ্বিতীয় সারির খাদকরূপে গণ্য। পুষ্করিণীর তৃতীয় বা সর্বোচ্চ সারির খাদকেরা হল বোয়াল, ভেটকি প্রভৃতি বড় মাছ, মাছরাঙা, বক, সাপ ইত্যাদি প্রাণী।

অবশেষে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটলে পুষ্করিণীর মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া ঐ মৃত দেহাবশেষের উপর জন্মে পচন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। অর্থাৎ বিয়োজকরূপে কাজ করে মৃতকলার জটিল যৌগগুলি বিশ্লিষ্ট করে সরল উপাদানে পরিণত করে সেইসব জৈব ও অজৈব পদার্থগুলিকে মুক্ত করে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। এইসব পরিবর্তিত উপাদান পুনরায় উৎপাদকদের গ্রহণযোগ্য হয়।

কোন একটি বসতির উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক থাকে, এই খাদ্য-খাদক সম্পর্ক হতেই খাদ্য-শৃঙ্খলের উৎপত্তি। খাদ্য ধারাবাহিকভাবে এক খাদক হতে অন্য খাদকে পেঁছায়। খাদ্য শক্তি প্রবাহের ধারাবাহিকভাবে উৎপাদক হতে শুরু করে শেষ খাদক পর্যন্ত যে শৃঙ্খল রচিত হয় তাকে **খাদ্য-শৃঙ্খল** বলে।

তৃণভূমির খাদ্য-শৃঙ্খলের উদাহরণ—শস্য (উৎপাদক)→ইঁদুর→সাপ→ঈগল পাখি। ঘাস→ঘাস ফড়িং→ব্যাঙ→সাপ→বাজপাখি বা ময়ূর।

পুষ্করিণীর খাদ্য-শৃঙ্খলের উদাহরণ—শ্যাওলা→মশার শূককীট→ব্যাঙ বা ছোট ছোট মাছ→বক বা মাছরাঙা বা বড় বড় মাছ (বোয়াল)।

বনভূমির খাদ্য-শৃঙ্খলের উদাহরণ—ঘাস→হরিণ→বাঘ।

খাদ্য-শৃঙ্খল বিভিন্ন প্রজাতির দ্বারা একে অপরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। অনেক-গুলি খাদ্য-শৃঙ্খলের বিভিন্ন প্রজাতির দ্বারা একসঙ্গে সুসংবদ্ধ হওয়াকে **খাদ্যজাল**

বলে। কোন জীব সম্প্রদায়ের খাদ্যজাল সেই স্থানের জীবের সংখ্যার পিরামিড সৃষ্টি করে। পুষ্টির একের পর এক সজ্জিত স্তরকে **পুষ্টিস্তর** বা **খাদ্যস্তর** বলে। খাদ্য ও খাদক সম্পর্ক নিয়ে যে পিরামিড গঠিত হয় তাকে **খাদ্য পিরামিড** বলে। বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ সারির খাদক পর্যন্ত যতই উপরের দিকে ওঠা যায় ততই দেখা যায় সংখ্যা, শক্তি ও ওজন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। খাদ্য পিরামিড তিন প্রকারের ; যেমন—সংখ্যাভিত্তিক শিখর, শক্তিজনিত শিখর ও জীব-ভরভিত্তিক শিখর।

বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রাথমিক উৎস হল সৌর বিকিরণ। সেই শক্তিকে ব্যবহার করে উৎপাদকেরা। বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকেরা আলোকশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য আলোক বর্ণালী, জল ও CO_2 দ্বারা কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে। উৎপাদক প্রথম পুষ্টিস্তরের আসল শক্তি, যাদের শুধু প্রথম সারির শাকাশী প্রাণীরা ভক্ষণ করে। বাস্তুতন্ত্রে ক্রমান্বয়ে এক পুষ্টিস্তর থেকে অন্য পুষ্টিস্তরে যখন শক্তি স্থানান্তরিত হয়, তখন কিছু পরিমাণ শক্তির তাপশক্তি হিসেবে সবসময়ই অপচয় ঘটে। অর্থাৎ এক পুষ্টিস্তর থেকে অন্য পুষ্টিস্তরে শতকরা 100 ভাগ শক্তির স্থানান্তরণ কখনও ঘটে না। এক-একটি খাদ্যস্তর হতে কেবলমাত্র 10% শক্তি পরবর্তী খাদ্যস্তরে প্রবাহিত হয়। শক্তিপ্রবাহ সব সময় একমুখী এবং শক্তির স্থানান্তরণ ঘটে। সমগ্র অর্জিত শক্তি হতে শ্বসন শক্তি বাদ দিলে যে শক্তি অবশিষ্ট থাকে তা খাদকের পুষ্টিস্তরের অর্জিত শক্তির পরিমাণ। শক্তির স্থানান্তরণ এক পুষ্টিস্তর হতে যেভাবে অন্য পুষ্টি স্তরে ঘটে তা যে কোন খাদ্য-শৃঙ্খলেই বিশেষভাবে কার্যকর। অতএব দেখা যাচ্ছে যে শক্তি অর্জন, শক্তির ব্যবহার এবং শক্তির স্থানান্তরণ—এই তিনটি পর্যায়ে শক্তিপ্রবাহ সম্পন্ন হয়।

● **সংরক্ষণ ঃ**

যে উপায়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষয় পূরণ, পুনরুদ্ধার, পরিচালন ইত্যাদি করা হয়, তাকে **সংরক্ষণ** বলে।

সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হল—(ক) মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে মানুষকে আনন্দ দেওয়া ; (খ) পরিবেশের সব রকম অপব্যবহার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পুনরায় ব্যবহার (গ) সংখ্যায় কম এমন প্রাণীদের ও উদ্ভিদদের অস্তিত্ব বজায় রাখা ; (ঘ) দেশের অর্থনৈতিক দিক সুদৃঢ় করা এবং (ঙ) মানুষের কল্যাণে প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক সুষ্ঠু ব্যবহার করা।

● **মৃত্তিকা-সংরক্ষণ ঃ**

মৃত্তিকা-সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হল—(i) মাটির ক্ষয় রোধ করা এবং (ii) মাটির হৃত উর্বরা শক্তিকে পুনরায় বাড়িয়ে দেওয়া—যাতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

মৃত্তিকা-সংরক্ষণের বিভিন্ন পন্থা হল—

1. ফসল ও শস্য আবর্তন এবং শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের চাষ।
2. ঘাসের চাষ করা।
3. প্রাণিজ সার (হাড়ের গুঁড়ো, শুকনো মাছ ইত্যাদি), সবুজ সার (ধঞ্চে ইত্যাদি), কম্পোস্ট সার ইত্যাদি প্রয়োগ করা।
4. ঢালু জমিতে বিশেষ করে পর্বতগাত্রে টেরাস নির্মাণ করে চাষ করা।
5. কণ্টুর প্রথায় চাষ করা।
6. পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করা।
7. প্ল্যাস্টিক বা পলিথিনের চাদর, ঘাস, পাতা ইত্যাদির দ্বারা মাটি ঢেকে দেওয়া।
8. নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঝাউ, পাইন ইত্যাদি উদ্ভিদ রোপণ করা।

9. পাথর দিয়ে বা পাকা কংক্রিটের দেওয়াল তুলে সমুদ্র ও নদীর তীরের ভূমিকে সংরক্ষণ করা।
10. অযথা অপ্রয়োজনীয় ভাবে উদ্ভিদ কেটে না ফেলা, বনাঞ্চল সৃষ্টি করে ভূমি সংরক্ষণ করা।
11. পাহাড়ী অঞ্চলে ঝুম চাষ পদ্ধতিতে চাষ করা। ফলে জমির উর্বরতা বাড়ে, ক্ষয় রোধ হয়।

● **জল-সংরক্ষণ:**

জল-সংরক্ষণের বিভিন্ন পন্থা হল—

1. বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল গঠন করা অর্থাৎ সম্ভাব্যস্থানে ক্যাচমেন্ট অঞ্চল তৈরি করা।
2. অতিরিক্ত জল ধরে রাখার জন্য বাঁধ তৈরি করা। ঐ সমস্ত বাঁধের সঞ্চিত জল হতে গ্রীষ্মকালে প্রয়োজন মত জল সরবরাহ করা।
3. যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী জল চাষের জন্য ব্যবহার করা।
4. উদ্ভিদ কাটা বন্ধ করা এবং গাছ লাগানো।
5. চাষের জমির অপ্রয়োজনীয় গাছগুলিকে উৎপাটন করে জমি হতে অতিরিক্ত জল শোষণ রোধ করা।
6. উদ্ভিদের যতদূর সম্ভব কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ইত্যাদি ঔষধের ব্যবহার কম করা অর্থাৎ জল যাতে শুদ্ধ থাকে সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখা।

● **বন-সংরক্ষণ:**

বন-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি হল—

(i) অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ গাছপালার সংখ্যা বাড়ানো,
(ii) কাষ্ঠ উৎপন্নকারী গাছপালার সংখ্যা বৃদ্ধি করা,
(iii) প্রাকৃতিক সম্পদ বাড়ানো ইত্যাদি।

বন-সংরক্ষণে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করা হয়:

1. বনজঙ্গলের গাছপালাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা। অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ গাছ লাগানো, অপ্রয়োজনীয় গাছের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমানো, অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিজনিত ও অপ্রয়োজনীয় শাখা-প্রশাখা কেটে ফেলা।
2. প্রতি বছর নতুন নতুন গাছ রোপণ করা।
3. আগুন যাতে বনভূমিতে না লাগে এবং ছত্রাক ও কীটপতঙ্গের দ্বারা গাছের রোগ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
4. গৃহপালিত পশুচারণ বন্ধ করে ও বনের উৎপন্ন প্রয়োজনীয় পদার্থ এবং ছোট ছোট ঝোপের মত গাছপালাগুলিকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করা।
5. বনাঞ্চলের আয়তন বাড়ানো, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন রক্ষা করা।
6. কাঠ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা।
7. চোরাচালানকারীর হাত থেকে বনাঞ্চল রক্ষা করা। বনজ সম্পদের অপচয় বন্ধ ও সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন করা।

বন-সংরক্ষণ প্রকল্পকে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে জীববিজ্ঞানী, বন-সংরক্ষণবিদ, প্রকৃতিবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ প্রভৃতি সকলের এক হয়ে কাজ করতে হবে। তবে বন-সংরক্ষণের আন্তঃশৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

● **দূষণঃ**

পরিবেশে মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রাধান্য বা সেই সমস্ত বস্তুর দেহের মধ্যে অনুপ্রবেশকেই দূষণ বলে।

দূষণের উৎপত্তিঃ (i) ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যার অত্যধিক হারে বৃদ্ধি, (ii) বিজ্ঞান-সম্মত রীতিনীতি না মেনে শহর-নগর ইত্যাদির পত্তন, (iii) বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন না করে যথেচ্ছভাবে প্রাকৃতিক বন-সম্পদ নির্মূল করা এবং অমানুষিক উপায়ে প্রাণিকুলকে বধ করা, এবং (iv) আধুনিক যুগে যে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তার সঠিক ব্যবহার না করা ইত্যাদি।

● **দূষণের প্রতিক্রিয়াঃ**

(a) বিভিন্ন রোগের, যথা—টাইফয়েড, যক্ষ্মা, ফুসফুসে ক্যানসার, স্নায়বিক রোগ ইত্যাদির ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি।

(b) আর্থিক এবং শক্তির ক্ষয়, যার প্রকৃত ফল ধনসম্পদের ক্ষতি।

(c) তাছাড়া যে সমস্ত প্রাকৃতিক উপকরণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খুবই প্রয়োজনীয় তার ক্রমাগত বিনাশ।

বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হবার পর যেসব পদার্থ পরিবেশকে কলুষিত করে তারাই হল দূষিত পদার্থ। উল্লেখযোগ্য দূষণকারী পদার্থগুলি হল—ধোঁয়া, কুয়াশা, ধুলোবালি, আলকাতরা ইত্যাদি সঞ্চিত পদার্থ। লোহা, সীসা, দস্তা ইত্যাদি ধাতু ; নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, অ্যামোনিয়া, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি গ্যাসীয় পদার্থসমূহ ; নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নামক অজৈব অ্যাসিডসমূহ ; ফিউমারিক অ্যাসিড, অ্যাসেটিক অ্যাসিড ইত্যাদি জৈব অ্যাসিডসমূহ ; বিভিন্ন কীটনাশক, আগাছানাশক রাসায়নিক বিষাক্ত পদার্থ, যেমন ডাইক্লোরো-ডাইফিনাইল-ট্রাইক্লোরোইথেন (DDT) ; তাছাড়া বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ, শহরাঞ্চলের নোংরা আবর্জনা, অস্বাভাবিক তীব্রতর আওয়াজ এবং বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক সার পরিবেশ দূষণের অপর কয়েকটি কারণ।

এই দূষণকারী পদার্থের মধ্যে কিছু বিষাক্ত পদার্থ প্রাকৃতিক পরিবেশে ভাঙে না। যেমন অ্যালুমিনিয়াম, পারদ ইত্যাদি। তাদের **অভঙ্গুর দূষণকারী পদার্থ** বলে। আবার কিছু দূষিত পদার্থ সহজেই ভাঙতে পারে, তাদের ভঙ্গুর দূষণকারী পদার্থ বলে।

আমাদের পরিবেশে নানা ধরনের দূষণ দেখা যায়, যেমন—বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ মৃত্তিকা দূষণ ইত্যাদি।

● **বায়ু দূষণের কারণঃ**

(a) ধোঁয়া ও ধোঁয়াশা এবং স্মগ ;

(b) কুয়াশা ও ধুলোবালি ;

(c) যানবাহন হতে পরিত্যক্ত ধোঁয়া ;

(d) কীটনাশক ও আগাছানাশক ;

(e) তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

বায়ু দূষণের জন্য দায়ী বিভিন্ন পদার্থ হল ধোঁয়া, টার, ধুলোবালি, কুয়াশা, ধোঁয়াশা : কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, সালফিউরিক অ্যাসিডের কণা, হাইড্রোজেন সালফাইড, ক্লোরিন এবং ক্লোরাইড, ওজোন, পারঅক্সি-অ্যাসিটাইল নাইট্রেটস, অ্যালডি-হাইড, ইথিলিন ইত্যাদি। তাছাড়া মিথেন, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন উল্লেখযোগ্য বায়ু দূষণে অক্সিজেনের মাত্রা কমে।

● বায়ু দূষণের ফলে বিভিন্ন রোগঃ

সিলিকোসিস, অ্যাসবেসটোসিস ইত্যাদি বায়ু দূষণের প্রধান রোগ। বায়ু দূষণের ফলে মানুষের ফুসফুসের ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস, হাঁপানী, শ্বাসকষ্ট ও মাথাধরা, যক্ষ্মা টাইফয়েড ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। উদ্ভিদের মধ্যেও বিভিন্ন উপসর্গ দেখা যায়। তাতে ফসলের ক্ষতি হয় এবং পাতাগুলি বিনষ্ট হয়ে ঝরে পড়ে।

জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য উপাদান হল জল। জল ছাড়া কোন জীব বাঁচতে পারে না। আজকাল দেখা যাচ্ছে সমুদ্র, নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী, খালবিল ইত্যাদির জল বিভিন্ন উপায়ে দূষিত হচ্ছে।

● জল দূষণের কারণঃ

(a) কলকারখানাজাত রাসায়নিক পদার্থ এবং শহরের পয়ঃপ্রণালী বাহিত ময়লা আবর্জনা ;

(b) কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক পদার্থ ;

(c) আণবিক চুল্লী থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থযুক্ত আবর্জনা ;

(d) পুষ্করিণী, হ্রদ, নদী ইত্যাদিতে মানুষের স্নান করা, কাপড়-চোপড় কাচা এবং গবাদি পশুদের স্নান করানো ;

(e) তৈলবাহী জাহাজ হতে নির্গত খনিজ তেল ;

(f) জলজ আগাছাগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি। আমাদের পরিবেশ বিভিন্ন বিরক্তিকর বিকট আওয়াজের জন্যও দূষিত হয়। যে শব্দ দূষণে নিম্নলিখিত প্রতিক্রিয়াগুলি ঘটে—

(i) শ্রবণে অসুবিধা দেখা দেয়—মানুষ বধির হয়ে যেতে পারে।

(ii) ঘুমের ব্যাঘাত, উত্তেজনা ও স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দেয়।

(iii) শারীরবৃত্তীয় কাজের পরিবর্তন ঘটে, ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং হৃৎস্পন্দনের গতিও বাড়ে।

(iv) হৃদরোগ সৃষ্টি, মাথা ধরা, দৈহিক অবসাদ, মাথা ঘোরা ইত্যাদি লক্ষণগুলিও দেখা দিতে পারে।

(v) তীব্রতর বিরক্তিকর শব্দ রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়, ফলে দেখা দেয় উচ্চ রক্তচাপ।

(vi) অস্বাভাবিক উচ্চ শব্দ ধীরে ধীরে মানুষকে মানসিক রোগীর পর্যায়ে উপনীত করে।

মৃত্তিকাও দূষিত হতে পারে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এবং কঠিন বর্জ্য পদার্থ-সমূহের দ্বারা, যার ফলে বিঘ্নিত হয় বাস্তুতন্ত্র।

অনুশীলনী

A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions)

1. ইকোসিস্টেম কাকে বলে? যে কোন একটি ইকোসিস্টেমের উপাদানের বর্ণনা দাও। [উঃ 584, 585-589 পৃঃ দেখ]

2. খাদক ও উৎপাদক কাকে বলে? এদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করার পরিণতিঃউল্লেখ কর। বায়োস্ফিয়ারের সংজ্ঞা দাও। [উঃ 586 ও 583 পৃঃ দেখ]

3. ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ। [উঃ 597-600 পৃঃ দেখ]

4. একটি পুকুরের ইকোসিস্টেম বর্ণনা কর। [উঃ 589-591 পৃঃ দেখ]
5. প্রাণীদের সংরক্ষণ করার কি প্রয়োজন? কিভাবে বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণ করা হয় উল্লেখ কর। [উঃ 606-607 পৃঃ দেখ]
6. বনসম্পদ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? কিভাবে এদের সংরক্ষণ সম্ভব তা সংক্ষেপে উল্লেখ কর। [উঃ 605-607 পৃঃ দেখ]
7. বাস্তু রীতিতে কিভাবে শক্তিপ্রবাহ বজায় থাকে তা উদাহরণ সহযোগে বিবৃত কর। উৎপাদক ও ভক্ষক বলতে কি বোঝায়? খাদ্য-শৃঙ্খল ও খাদ্য-জাল কাকে বলে? [উঃ 597, 586, 592, 593 পৃঃ দেখ]
8. সংরক্ষণ বলতে কি বোঝ? প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করার পরিণতি কি? মৃত্তিকা সংরক্ষণের উপায় কি? [উঃ 601, 606 ও 604 পৃঃ দেখ]
9. মৃত্তিকা ও বন সংরক্ষণের বিভিন্ন পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর। [উঃ 604 ও 605 পৃঃ দেখ]
10. গণ্ডার সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে যা জান লিখ। [উঃ 610-612 পৃঃ দেখ]
11. ভারতবর্ষের কোথায় গণ্ডার দেখা যায়? [উঃ 610 পৃঃ দেখ]
12. দূষণ কাকে বলে? কিভাবে বায়ু ও জল দূষিত হয়? এদের প্রতিকারের উপায়গুলি লিখ। [উঃ 613 ; 614 ও 621 ; 620 ও 623 পৃঃ দেখ]
13. দূষণ কাকে বলে? দূষণের উৎপত্তি এবং প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা কর। [উঃ 613 পৃঃ দেখ]
14. বায়ু দূষণ কাকে বলে? বায়ু দূষণের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। এর প্রতিকারের উপায় উল্লেখ কর। [উঃ 614-619, 620 পৃঃ দেখ]
15. জল দূষণ কাকে বলে? জল দূষণের বিভিন্ন কারণ আলোচনা কর। এর নিবারণের উপায়গুলি বল। [উঃ 621-624 পৃঃ দেখ]
16. শব্দ দূষণ কাকে বলে? শব্দ দূষণের উৎসগুলি কি কি? শব্দ দূষণের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকারের উপায়গুলি উল্লেখ কর। [উঃ 624, 624-625, 625 পৃঃ দেখ]

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer type questions) ঃ

1. ইকোসিস্টেম কাকে বলে? [উঃ 584 পৃঃ দেখ]
2. ইকোসিস্টেম শব্দটি কোন্ বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন? [ঐ]
3. বায়োস্ফিয়ার কাকে বলে? [উঃ 583 পৃঃ দেখ]
4. বায়োমাস বলতে কি বোঝ? [ঐ]
5. ইকোসিস্টেমের অজীব ও সজীব উপাদানগুলি উল্লেখ কর। [উঃ 585-586 পৃঃ দেখ]
6. ইকোসিস্টেমের জড় উপাদান সম্বন্ধে যা জান লিখ। [উঃ 585 পৃঃ দেখ]
7. উৎপাদক ও ভক্ষক বলতে কি বোঝ? [উঃ 586 পৃঃ দেখ]
8. বিয়োজক কাকে বলে? [উঃ 588 পৃঃ দেখ]

9. ইকোসিস্টেমে শক্তিপ্রবাহ বলতে কি বোঝ ? [উঃ 600 পৃঃ দেখ]
10. ইকোসিস্টেমের সজীব উপাদানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। [উঃ 586-589 পৃঃ দেখ]
11. একটি চিত্রের সাহায্যে খাদ্য-শৃঙ্খল এবং খাদ্য-প্রবাহ আলোচনা কর। [উঃ 592-593 পৃঃ দেখ]
12. একটি পুষ্করিণীর ইকোসিস্টেমের উপাদানগুলি উল্লেখ কর। [উঃ 589-591 পৃঃ দেখ]
13. দূষণের উৎপত্তি ও তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যা জান লিখ। [উঃ 613 পৃঃ দেখ]
14. অভঙ্গুর ও ভঙ্গুর দূষণকারক পদার্থ বলতে কি বোঝ ? কয়েকটি সাধারণ দূষণকারক পদার্থের নাম কর। [উঃ 613-614 পৃঃ দেখ]
15. বায়ু দূষণ ও জল দূষণের প্রতিকারের উপায়গুলি বল। [উঃ 620 ও 623 পৃঃ দেখ]
16. ধোঁয়া ও ধোঁয়াশা সম্বন্ধে যা জান লিখ। [উঃ 615-616 পৃঃ দেখ]
17. শব্দ দূষণ কাকে বলে ? [উঃ 624 পৃঃ দেখ]
18. শব্দ দূষণের প্রতিকারগুলি উল্লেখ কর। [উঃ 625 পৃঃ দেখ]
19. বায়ু দূষণ কাকে বলে ? [উঃ 614 পৃঃ দেখ]
20. সংরক্ষণ বলতে কি বোঝায় ? [উঃ 601 পৃঃ দেখ]

C. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short Answer type questions) :

1. ইকোসিস্টেমের সংজ্ঞা লিখ। [উঃ 584 পৃঃ দেখ]
2. ইকোসিস্টেম শব্দটির নামকরণ প্রথম কে করেন ? [ঐ]
3. ইকোলজি কাকে বলে ? [উঃ 583 পৃঃ দেখ]
4. বায়োস্ফিয়ার কাকে বলে ? [ঐ]
5. বায়োমাস কাকে বলে ? [ঐ]
6. প্ল্যাঙ্কটন বলতে কি বোঝ ? [উঃ 591 পৃঃ দেখ]
7. ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন ও জু-প্ল্যাঙ্কটন কাকে বলে ? [ঐ]
8. উৎপাদক কাকে বলে ? [উঃ 586 পৃঃ দেখ]
9. ভক্ষক কাকে বলে ? [ঐ]
10. বিয়োজক কাকে বলে। [উঃ 588 পৃঃ দেখ]
11. ইকোসিস্টেমে জড় উপাদানগুলির নাম উল্লেখ কর। [উঃ 585 পৃঃ দেখ]
12. ইকোসিস্টেমে সজীব উপাদানগুলির নাম উল্লেখ কর। [উঃ 586-588 পৃঃ দেখ]
13. ইকোসিস্টেমে শক্তিপ্রবাহ কাকে বলে ? [উঃ 600 পৃঃ দেখ]
14. কোন্ বিজ্ঞানী বাস্তুসংস্থান সম্বন্ধীয় পিরামিডের ধারণা দেন ? [উঃ 594 পৃঃ দেখ]
15. ইকোসিস্টেমের শক্তির উৎস কি ? [উঃ 600 পৃঃ দেখ]
16. শক্তিভিত্তিক পিরামিড কাকে বলে ? [উঃ 595 পৃঃ দেখ]

17. ইকোসিস্টেমের প্রকারভেদের নাম কর। [উঃ 584 পৃঃ দেখ]
18. ইকোসিস্টেমকে সক্রিয় রাখার পদ্ধতিগুলি উল্লেখ কর। [উঃ 589 পৃঃ দেখ]
19. খাদ্য-শৃঙ্খল বলতে কি বোঝ? [উঃ 592 পৃঃ দেখ]
20. খাদ্য-প্রবাহ বলতে কি বোঝ? [ঐ]
21. একটি সরল খাদ্য-শৃঙ্খলের উদাহরণ দাও। [উঃ 593 পৃঃ দেখ]
22. ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন এবং জু-প্ল্যাঙ্কটনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উঃ 591 পৃঃ দেখ]
23. প্ল্যাঙ্কটন ও বেনথস কি? [উঃ 591 পৃঃ দেখ]
24. বায়োস্ফিয়ার এবং বায়োমাসের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উঃ 583 পৃঃ দেখ]
25. ইকোসিস্টেমের প্রবাহিত শক্তির উৎস কি? [উঃ 600 পৃঃ দেখ]
26. সাপ, ফড়িং, ব্যাঙ ও ঘাস এদের খাদ্য-শৃঙ্খলের পর্যায় অনুসারে সাজাও। [উঃ 593 পৃঃ দেখ]
27. সংরক্ষণের সংজ্ঞা বল। [উঃ 601 পৃঃ দেখ]
28. পশ্চিমবঙ্গের দুটি অভয়ারণ্যের নাম লিখ। কোন্ কোন্ বন্যপ্রাণীকে উক্ত দুটি অভয়ারণ্যে সংরক্ষিত করা হয়? [উঃ 608 পৃঃ দেখ]
29. আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা বলতে কি বোঝ? [উঃ 616 পৃঃ দেখ]
30. শিল্পঘটিত দূষণ বলতে কি বোঝ? [উঃ 616 পৃঃ দেখ]
31. PAN কাকে বলে? কিভাবে সৃষ্টি হয়? [উঃ 618 পৃঃ দেখ]
32. জৈব অক্সিজেন মাত্রা কাকে বলে? [উঃ 622 পৃঃ দেখ]
33. দুটি জল দূষণের রাসায়নিক নির্দেশকের উল্লেখ কর। [উঃ 622 পৃঃ দেখ]
34. অটিকোলজি কাকে বলে? [উঃ 601 পৃঃ দেখ]
35. সিনিকোলজি কাকে বলে? [ঐ]

D. টীকা লেখ (Write notes on) :

1. উৎপাদক ও ভক্ষক [উঃ 586 পৃঃ দেখ]
2. বিয়োজক এবং পরিবর্তক [উঃ 588 পৃঃ দেখ]
3. খাদ্য-শৃঙ্খল [উঃ 592 পৃঃ দেখ]
4. ইকোলজিক্যাল পিরামিড [উঃ 594 পৃঃ দেখ]
5. শক্তিপ্রবাহ [উঃ 600 পৃঃ দেখ]

E. এক কথায় উত্তর দাও :

1. **PAN**-এর পুরো নাম উল্লেখ কর। [উঃ 618 পৃঃ দেখ]
2. **B.O.D.**-এর পুরো নাম উল্লেখ কর। [উঃ 622 পৃঃ দেখ]
3. ইকোসিস্টেমে শক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় না বৃদ্ধি পায়? [উঃ 690 পৃঃ দেখ]
4. রূপান্তরিত সৌরশক্তির একদেহ হতে অন্য দেহে স্থানান্তরকরণকে কি বলে? [উঃ 600 পৃঃ দেখ]
5. পরিবেশে মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বস্তুর অনুপ্রবেশকে কি বলে? [উঃ 613 পৃঃ দেখ]

পরিশিষ্ট

কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য :

A. রাইবোসোম ও লাইসোসোমের পার্থক্য :

রাইবোসোম	লাইসোসোম
1. কোন আবরণী থাকে না।	1. একক পর্দা দ্বারা ঘেরা থাকে।
2. কোষের মধ্যে মুক্ত ভাবে অবস্থান করে অথবা এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম বা অন্য কোন উপাংশের আবরণীগাত্রে (যথা—নিউক্লীয় পর্দায়) সংলগ্ন থাকে।	2. সজীব কোষের সাইটোপ্লাজমে মুক্ত ভাবে অবস্থান করে। কোনও কোষীয় উপাংশের আবরণী গাত্রে সংলগ্ন থাকে না।
3. রাইবোসোম প্রধানত **RNA** ও প্রোটীন দ্বারা গঠিত। তাছাড়া স্বল্প পরিমাণে লিপিড এবং ধাতব আয়নও এতে থাকে।	3. লাইসোসোমের আবরণী বেষ্টিত স্থানে নানা প্রকার আর্দ্র-বিশ্লেষক উৎসেচক থাকে। তাই এদের উৎসেচকের এক-একটি ক্ষুদ্র থলি বলে।
4. আয়তন অনুযায়ী রাইবোসোম তিন প্রকারের, যথা—80 S রাইবোসোম, 70 S রাইবোসোম, 55 S রাইবোসোম।	4. লাইসোসোম নিম্নলিখিত চারটি রূপে থাকে, যথা—প্রাথমিক লাইসোসোম, হেটেরোফ্যাগোসোম, রেসিডিউয়াল বডি এবং অটোফ্যাগিক গহ্বর।

B. সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন ও নন-সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন

সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন	নন-সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন
1. শুধুমাত্র প্রথম রঞ্জকতন্ত্র (PS I) কাজ করে, 700 nm আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দ্বারা সক্রিয়।	1. প্রথম রঞ্জকতন্ত্র (PS I) এবং দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র (PS II) উভয়েই কাজ করে। 680 nm আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দ্বারা সক্রিয়।
2. প্রথম রঞ্জকতন্ত্র (PS I) অনেক ক্লোরোফিল-a অণুর দ্বারা গঠিত।	2. প্রথম রঞ্জকতন্ত্র (PS I) অনেক ক্লোরোফিল-a অণুর দ্বারা গঠিত এবং দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র (PS II) সংখ্যায় কম ভিন্ন ধরনের ক্লোরোফিল-a, ক্লোরোফিল-b এবং ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল ইত্যাদি সহকারী রঞ্জক পদার্থ নিয়ে গঠিত।

সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন	নন-সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন
3. এই চক্রে জলের প্রয়োজন হয় না।	3. এই প্রক্রিয়ায় জলের প্রয়োজন হয়। জলের হাইড্রোজেন $NADP^+$-কে বিজারিত করে।
4. ক্লোরোফিল, ইলেকট্রন (e^-) দাতা ও গ্রহীতার কাজ করে।	4. ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দাতা ও গ্রহীতার কাজ করে।
5. দুটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ATP অণু সৃষ্টি হয়।	5. উচ্চ শক্তিসম্পন্ন এক অণু ATP ও $NADPH+H^+$ সৃষ্টি হয়।
6. এই চক্রে NADP-র বিজারণ ঘটে না।	6. এই প্রক্রিয়ায় $NADP^+$-এর বিজারণ ঘটে।
7. O_2 গ্যাস নির্গত হয় না।	7. O_2 গ্যাস নির্গত হয়।

C. প্রশ্বাস বায়ু, বায়ুস্থলীয় বায়ু ও নিঃশ্বাস বায়ুর অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ :

শ্বাস বায়ু	প্রশ্বাস বায়ু	বায়ুস্থলীয় বায়ু	নিঃশ্বাস বায়ু
অক্সিজেন (O_2)	20·95	13·8	15·4
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)	0·04	5·5	4·0
নাইট্রোজেন (N_2)	79·01	80·00	79·60

D. কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটের পার্থক্য :

কার্বোহাইড্রেট	ফ্যাট
1. কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত ; হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত জলে ওদের অনুপাতের মত 2 : 1, উদাঃ গ্লুকোজ = $C_6H_{12}O_6$	1. কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত, কিন্তু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত 2 : 1 নয়। অক্সিজেনের পরিমাণ থাকে কম। উদাঃ পামিটিক অ্যাসিড $[CH_3(CH_2)_{14}COOH]$
2. চিনি, মিছরি, মধু ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থ।	2. বীজের শস্য এবং বীজপত্রে ফ্যাট থাকে।
3. কার্বোহাইড্রেট তিন রকমের হয়, যথা— (i) মনোস্যাকারাইড —গ্লুকোজ $C_6H_{12}O_6$	3. ফ্যাট সরল অথবা জটিল—এই দু রকমের হয়। সরল ফ্যাট—টারপিন ; জটিল ফ্যাট—গ্লাইকোলিপিড।

কার্বোহাইড্রেট	ফ্যাট
(ii) অলিগোস্যাকারাইড —সুক্রোজ $C_{12}H_{22}O_{11}$ (iii) পলিস্যাকারাইড —স্টার্চ $(C_6H_{10}O_5)n$ 4. 1 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট দহনে 4·3 কিলো ক্যালোরি শক্তি নির্গত হয়।	4. 1 গ্রাম ফ্যাট দহনে 9·1 কিলো ক্যালোরি শক্তি নির্গত হয়।

E. তেল (oil) ও চর্বির (fat) পার্থক্য :

তেল	চর্বি
20°C-এ তরল	20°C-এ কঠিন
উদাহরণ : প্রাণিজ তেল—কড্‌লিভার তেল উদ্ভিজ্জ তেল—অলিভ তেল	**উদাহরণ :** প্রাণিজ চর্বি—মাখন উদ্ভিজ্জ চর্বি—মার্গারিন
পরীক্ষা : একটি পরীক্ষা নলে খানিকটা জলে অলিভ তেল মিশালে তেল জলের উপর ভাসবে, দুটি একসঙ্গে মিশবে না।	**পরীক্ষা :** চর্বি জাতীয় পদার্থ একটি পরিষ্কার কাগজে ঘষলে তৈলাক্ত দাগ পড়বে (grease spot)। অস্‌মিক অ্যাসিড দ্রবণে কালো রঙ হবে।

F. উৎসেচক

অ্যাপো-এন্‌জাইম, কো-এন্‌জাইম এবং আইসো-এন্‌জাইম-এর মধ্যে পার্থক্য :

অ্যাপো-এন্‌জাইম	কো-এন্‌জাইম বা সহ-উৎসেচক	আইসো-এন্‌জাইম
1. উৎসেচকের প্রোটীন অংশ—উদাহরণ : পেপসিন, ট্রিপসিন ইত্যাদি।	উৎসেচকের প্রোটীনবিহীন অংশ, প্রোটীনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে কিন্তু সহজেই পৃথক করা সম্ভব ; কো-এন্‌জাইম যখন প্রোটীনের সঙ্গে দৃঢ় ভাবে সংযুক্ত থাকে, তখন তাকে প্রোস্থেটিক বর্গ (Prosthetic group) বলে। উদাহরণ : ADP, NADP ইত্যাদি।	এরা এমন উৎসেচক যাদের আণবিক ওজন এক কিন্তু বাহ্যিক গঠন এবং রোগাদির অনাক্রম্যতা পৃথক। উদা : প্লাজমার ল্যাকটিক ডিহাইড্রোজেনেজ্ (Lactic dehydrogenase)। যে উৎসেচকের কাজ ল্যাকটেটকে NAD-এর উপস্থিতিতে পাইরুভেটে রূপান্তরিত করা।
2. উত্তাপে অস্থায়ী, কলয়েডল এবং ডায়ালাইজেবল নয়।	উত্তাপে স্থায়ী (heat stable), কলয়েডল নয়, ডায়ালাইজেবল (dialy-sable)।	

G. মানুষের লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকার পার্থক্য ঃ

লোহিত রক্তকণিকা (R.B.C.) বা এরিথ্রোসাইট	শ্বেত রক্তকণিকা (W.B.C.) বা লিউকোসাইট	অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট
1. প্রতি ঘন মি.মি. রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা 45-55 লক্ষ, অর্থাৎ সংখ্যায় বেশী থাকে।	1. প্রতি. ঘন মি.মি. রক্তে শ্বেত রক্ত কণিকার সংখ্যা 5-9 হাজার অর্থাৎ সংখ্যায় কম থাকে।	1. প্রতি ঘন মি. মি. রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা 2·5-4·5 লক্ষ, শ্বেত রক্ত কণিকার সংখ্যা থেকে বেশী।
2. উৎসস্থল — ভ্রূণ অবস্থায় যকৃৎ ও প্লীহা। জন্মের পর—লাল অস্থি-মজ্জা।	2. উৎসস্থল—লাল অস্থি-মজ্জা, লসিকা গ্রন্থি, প্লীহা।	2. উৎসস্থল—অস্থি-মজ্জার মেগাকেরিওসাইট কোষ।
3. লোহিত রক্ত কণিকা গোলাকার, দ্বি-অবতল, নিউক্লিয়াসবিহীন, ব্যাস 7-8μ	3. শ্বেত রক্ত কণিকা অনিয়তাকার, নিউক্লিয়াস-যুক্ত, সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত বা দানাবিহীন। ব্যাস 9-18μ	3. অণুচক্রিকা উভোত্তল নিউক্লিয়াস-বিহীন, ব্যাস 2—4μ
4. হিমোগ্লোবিন যুক্ত।	4. হিমোগ্লোবিনবিহীন।	4. হিমোগ্লোবিনবিহীন।
5. আয়ু গড়ে 120 দিন অর্থাৎ লোহিত রক্ত কণিকার আয়ু বেশী।	5. আয়ু গড়ে 1-15 দিন অর্থাৎ শ্বেত রক্ত কণিকার আয়ু কম।	5. আয়ু গড়ে 5-9 দিন।
6. লোহিত রক্তকণিকার কাজ হল—অক্সিজেন ও সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বহন করা; অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করা ইত্যাদি।	6. শ্বেত রক্তকণিকার কাজ হল—জীবাণু ধ্বংস করা, অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করা, হেপারিন নিঃসরণ করা, প্রতিবস্তু বা অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করা।	6. রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করা, হাইড্রক্সিট্রিপ্টোমাইন নিঃসৃত করে রক্তবাহকে সঙ্কুচিত করা ইত্যাদি।
7. লোহিতরক্তকণিকার কোনও প্রকারভেদ নেই।	7. শ্বেত রক্ত কণিকার প্রকারভেদ আছে, যথা— A. দানাযুক্ত–নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল, বেসোফিল। B. দানাবিহীন মনোসাইট, লিম্ফোসাইট।	7. অণুচক্রিকার কোনও প্রকারভেদ নেই।

H. বিভিন্ন শ্বেত কণিকার পার্থক্য :

শ্বেত রক্ত কণিকার প্রকার	সংখ্যা (প্রতি ঘন মি.মি. রক্তে)	উৎস	গঠনগত বৈশিষ্ট্য	কাজ
গ্র্যানুলো-সাইট নিউট্রোফিল	3-6 হাজার	লাল অস্থি মজ্জা	দানাযুক্ত সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস 2-7 খণ্ডযুক্ত, ব্যাস 10-12μ	ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করা।
ইওসিনোফিল	1·5-4 শত	লাল অস্থি মজ্জা	দানাযুক্ত সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস 2-3 খণ্ডযুক্ত, ব্যাস 9-12μ	অ্যান্টিটক্সিন নির্গত করে এলার্জি প্রতি-রোধে সাহায্য করা।
বেসোফিল	0-1 শত	লাল অস্থি মজ্জা	দানাযুক্ত সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস U বা S আকৃতির ব্যাস 10μ	হেপারিন নিঃসরণ করে ; ফলে রক্তবাহের মধ্যে রক্তের তঞ্চন ঘটে না।
অগ্র্যানু-লোসাইট মনোসাইট	3·5-8 শত	প্লীহা, লসিকা গ্রন্থি, লাল অস্থি মজ্জা	সাইটোপ্লাজম দানাবিহীন নিউক্লিয়াস বৃক্কাকার, ব্যাস 16-18μ	ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করা।
লিম্ফোসাইট	15-27 শত	প্লীহা, লসিকা গ্রন্থি, লাল অস্থি মজ্জা	সাইটোপ্লাজম দানাবিহীন, নিউক্লিয়াস বৃক্কাকৃতির অথবা গোলাকার, ব্যাস 7·5-12μ	অ্যান্টিবডি তৈরি করা। অনাক্রম্যতা বজায় রাখা।

I. কতিপয় প্রাণীর রেচন অঙ্গের নাম :

প্রাণীর নাম	রেচন অঙ্গের নাম
অ্যামিবা	কোষ পর্দা।
আরশোলা	ম্যালপিজিয়ান টিউবিউল।
চিংড়ি	সবুজ গ্রন্থি বা শুঙ্গ গ্রন্থি, বহিঃকঙ্কাল।
কেঁচো	নেফ্রিডিয়া, (ত্বক আনুষঙ্গিক)।
ফিতাকৃমি	ফেমকোষ।
শামুক	মেটানেফ্রিডিয়া।
কুনো ব্যাঙ	বৃক্ক (ফুসফুস, আনুষঙ্গিক)।
মানুষ	বৃক্ক (ত্বক, ফুসফুস, অন্ত্র, যকৃৎ আনুষঙ্গিক)।

J. (i) জীবনের আবির্ভাব সম্বন্ধে বিসৃষ্টিবাদ মতবাদ (Theory of special Creation) :

বিসৃষ্টিবাদ মতবাদটির মূল বক্তব্য হল ঈশ্বর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জীবজগৎ অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি করেছেন। এই মতবাদ অনুযায়ী জীবজগৎ সহ আদি পৃথিবী আগের মতই আছে। তার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনি।

জীবনের আবির্ভাব সম্বন্ধে বিসৃষ্টিবাদ মতবাদটি গ্রহণযোগ্য নয়, তার কারণ এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

(ii) সেরোলজী (Serology) :

জীব-বিজ্ঞানের যে শাখায় রক্তের সিরাম (Serum)-এর তুলনামূলক পর্যালোচনা করে প্রাণীদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বলে **সেরোলজী** (Serology)।

K. অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতি, সিম্প্যাট্রিক প্রজাতি, সিবলিং প্রজাতি ও টাইপ :

অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতি : বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে একই রকম প্রজাতি সীমাবদ্ধ থাকলে তাদের **অ্যালোপ্যাট্রিক** প্রজাতি বলে। যেমন—আফ্রিকার সিংহ ও ভারতীয় সিংহ।

সিম্প্যাট্রিক প্রজাতি : একটি সীমাবদ্ধ স্থানে দুটি প্রজাতি একসঙ্গে অবস্থান করলে তাদের **সিম্প্যাট্রিক প্রজাতি** বলে। যেমন—অ্যাস্কারিস নামক গোলকৃমি ও টিনিয়া নামক ফিতাকৃমি উভয়েই মানুষের অন্ত্রে বসবাস করে।

সিবলিং প্রজাতি : কোন একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির অন্তর্গত অধস্তন প্রজাতিগুলির মধ্যে যদি কোন দৈহিক পার্থক্য না থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে চারিত্রিক বা ব্যবহারগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তখন তাদের সিবলিং বা বায়োলজিক্যাল প্রজাতি বলে। যেমন—অ্যানোফিলিস মশার ম্যাকুলিপেনিস নামক প্রজাতির অন্তর্গত কিছু অধস্তন প্রজাতির পুরুষ মশাগুলি ম্যালেরিয়া রোগের বাহক কিন্তু স্ত্রী মশাগুলি নয়। তাই এরা **সিবলিং প্রজাতি**।

টাইপ : প্রজাতি হিসেবে সনাক্ত করার জন্য কোন একক প্রাণী বা উদ্ভিদের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাত্র বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করা হলে, তাদের **টাইপ** (Type) বলে। টাইপ তিন ধরনের, যথা—(i) **হলোটাইপ** (Holotype), (ii) **নিয়োটাইপ** (Neotype) এবং (iii) **জেনোটাইপ** (Genotype)।

L. ভূ-জৈব রাসায়নিক চক্র (Bio-geo chemical cycle) :

জীবকোষের প্রোটোপ্লাজম যে সব মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত, জীব সেইসব উপাদান নিজ নিজ পরিবেশ থেকে গ্রহণ করে। প্রোটোপ্লাজমের উপাদান-গুলি হল—কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস ইত্যাদি এবং এইসব উপাদান ছাড়া জলও প্রোটোপ্লাজমের একটি প্রধান উপাদান। জীবদেহ ও পরিবেশের মধ্যে এইসব মৌলিক উপাদানের প্রতিনিয়ত আদান-প্রদানকে **ভূ-জৈব রাসায়নিক চক্র** বলে। সুতরাং ভূ-জৈব রাসায়নিক চক্রের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, "যে নির্দিষ্ট আপন বৈশিষ্ট্যযুক্ত পথে পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে

পরিবেশে প্রোটোপ্লাজমের মৌলিক উপাদানগুলি চক্রাকারে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হয়, সেই চক্রাকার আবর্তন পথগুলিকে ভূ-জৈব রাসায়নিক চক্র বলে।"

ভূ-জৈব রাসায়নিক চক্রের মাধ্যমেই বাস্তুরীতির ভারসাম্য বজায় থাকে। ভূ-জৈব রাসায়নিক চক্রগুলির মধ্যে—(i) কার্বন-চক্র, (ii) হাইড্রোজেন-চক্র, (iii) অক্সিজেন-চক্র, (iv) নাইট্রোজেন-চক্র, (v) সালফার-চক্র, (vi) ফসফরাস-চক্র, ও (vii) জল-চক্র প্রধান।

M. রিজার্ভয়ার পুল ও সাইক্লিক্যাল পুল :

রিজার্ভয়ার পুল (Reservoir pool) ও সাইক্লিক্যাল পুল (Cyclical pool) কাকে বলে ?

ভূ-জৈব রাসায়নিক চক্রে রাসায়নিক পদার্থগুলি দুটি অবস্থায় থাকে। তার একটি অবস্থা হল **রিজার্ভয়ার পুল** (Reservoir pool) এবং অপর অবস্থাটি হল **সাইক্লিক্যাল পুল** (Cyclical pool)। গঠনে রিজার্ভয়ার পুল বড় কিন্তু তার আবর্তন গতি খুবই মন্থর। অপরপক্ষে গঠনে সাইক্লিক্যাল পুল ছোট, সক্রিয় এবং তার আবর্তন গতির হার দ্রুত। বলতে গেলে সাইক্লিক্যাল পুলই পরিবেশ থেকে সজীব বস্তুর দেহে, আবার সজীব বস্তুর দেহ হতে পরিবেশে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। ইকোসিস্টেমে রিজার্ভয়ার পুল দুটি দশায় বর্তমান থাকে, যেমন—**গ্যাসীয় দশা** (Gaseous type) (এর মধ্যে পড়ে বাতাস ও জল) এবং **পাললিক দশা** (Sedimentary type) (এর মধ্যে পড়ে বিভিন্ন শিলা)। রিজার্ভয়ার পুলের গ্যাসীয় দশা হতে কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি সজীব বস্তুর দেহে প্রবেশ করে। আবার পাললিক দশা হতে সজীব বস্তুতে প্রবেশ করে সালফার, ফসফরাস, আয়োডিন ইত্যাদি পদার্থ।

গ্রন্থপঞ্জী [Bibliography]

যে সব ছাত্রছাত্রীর অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহের আগ্রহ আছে তাদের হস্তধৃত পুস্তকটির সঙ্গে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির প্রয়োজনীয় অংশ পাঠ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে :

1. Altenburg, E. : Genetics (Henry Holt and Comp., New York).
2. BSCS Publications : High School Biology.
3. Burns, G. W. : The Science of Genetics—An Introduction to Heredity (Macmillan Publishing Comp., Inc., New York).
4. Chatterjee, C. C. : Human Physiology [Vol. I and II], (Medical Allied Agency, Calcutta).
5. Cohn, N. S. : Elements of Cytology (Harcourt, Brace and World Inc., New York).
6. Das, Debajyoti, : Biochemistry. (Academic Publishers, Calcutta.)

7. De Robertis, Saez, De Robertis : Cell Biology (W. B. Saunders Comp., Philadelphia, Toronto, London).
8. Ganong, W. F. : Review of Medical Physiology (Lange Medical Publications, California).
9. Jordan and Nigam : Animal Biology (Hindustani Book Depot, Lucknow).
10. Keeton : Biological Science (W. W. Norton and Comp., New York).
11. Kendeigh, S. C. : Ecology—With Special reference to Animal & Man (Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi).
12. Kimball, G. W. : Biology (Oxford and IBH Publishing Comp., New Delhi).
13. Kormondy. E. J. : Concepts of Ecology (Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi).
14. Lull, R. S. : Organic Evolution (Macmillan Publishing Comp., Inc., New York).
15. Meyer and Dryden (Editors) : Biological Science : An Enquiry into Life (Harcourt, Brace and World, Inc., New York).
16. Odum, E. P. : Fundamentals of Ecology (W. B. Saunders Comp. Philadelphia).
17. Sinnott, Dunn, Dobzhansky : Principles of Genetics (Tata McGraw-Hill Publishing Comp., Ltd., New Delhi).
18. Walter and Sayles : Biology of the Vertebrates (Macmillan Publishing Comp. Inc., New York).

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র—1984

BIOLOGICAL SCIENCES

First Paper

1. 'সংরক্ষণ' বলিতে তুমি কি বুঝ? বন ও বন্য প্রাণীর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি? প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করার পরিণতি কি?

অথবা, জল ও বায়ু কিভাবে দূষিত হয়? উহাদের প্রতিকারের উপায়গুলি লিখ।

2. জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্র কাহাকে বলে? ইহার তাৎপর্য কি? জলচক্র সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

অথবা, মাটির জৈব গুরুত্ব সম্বন্ধে তুমি যাহা জান লিখ। কেঁচোকে মাটির স্বাভাবিক কর্ষক বলা হয় কেন?

3. মিউটেশান বা পরিব্যাক্তিবাদ কি? এই তত্ত্বের প্রবর্তক কে? 'নতুন প্রজাতির উদ্ভব' ব্যাখ্যা করিতে এই তত্ত্ব কিরূপে সহায়তা করিয়াছে?

অথবা

নিম্নলিখিত যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(a) মেণ্ডেল কে ছিলেন? (b) অ্যালিল্ বলিতে কি বুঝ? (c) জেনেটিক পদার্থ কি? (d) হোমোজাইগাস ও হেটারোজাইগাস জীব কি? (e) ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ বলিতে তুমি কি বুঝ?

4. মাইটোসিসকে সমবিভাজন বলা হয় কেন? প্রাণিকোষে মাইটোসিসের মেটাফেজ ও অ্যানাফেজ দশার চিত্র অঙ্কন কর। মাইটোসিসের তাৎপর্য কি?

অথবা, হৃৎপেশী ও অস্থিপেশীর যে কোন তিনটি পার্থক্য লিখ। হৃৎপেশী সংকোচনের কারণ কি? তরুণাস্থি কাহাকে বলে?

5. ফোটো-ফসফারিলেশান কি? ইহা কোন্ জীবনক্রিয়ায় এবং কোন্ দশায় ঘটে? উক্ত বিক্রিয়ার তাৎপর্য কি?

অথবা, 'শ্বসনে স্থৈতিক শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়'—ইহার অর্থ কি? মানুষের ফুসফুসে গ্যাসের আদান-প্রদান পদ্ধতি বর্ণনা কর।

6. মানবদেহের কোথায় কোলেস্টেরল পাওয়া যায়? রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে মানুষের কোন্ কোন্ রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে?

অথবা, ভিটামিন ও অ্যান্টিভিটামিন কি? ভিটামিন সি ও ডি-এর উৎস কি? এই দুইটি ভিটামিনের অভাবে কোন্ কোন্ রোগ হয়?

7. নিম্নলিখিত যে কোন **পাঁচটির** পার্থক্য নির্ণয় কর ঃ

(a) অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাক। (b) মোনোস্যাকারাইড ও ডাইস্যাকারাইড। (c) মুক্ত ও রুদ্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্র। (d) প্রাথমিক ও গৌণ বৃদ্ধি। (e) স্বতঃস্ফূর্ত ও আবিষ্ট চলন। (f) একলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গ প্রাণী। (g) অক্সিন ও থাইরক্সিন।

অথবা, নিম্নলিখিত যে কোন **পাঁচটির** সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—

(a) পরিবৃত্তিতা, (b) প্রোক্যারিওটিক কোষ, (c) মাইটোকনড্রিয়া, (d) ফ্যাগোসাইটোসিস, (e) ইনউলিন, (f) ইনসুলিন, (g) লিনীয়াস।

8. নিম্নলিখিত যে কোন **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(a) পাট কোন্ ধরনের তন্তু ? (b) বিপাক বলিতে কি বুঝ ? (c) সেন্ট্রোজোমের কাজ কি ? (d) গ্লুকাগন কোথা হইতে নিঃসৃত হয় ? ইহার কাজ কি ? (e) মধুমেহ বা বহুমূত্র রোগের কারণ কি ? (f) ফুলের পাপড়ির রং নানা রকমের হয় কেন ? (g) পশ্চিমবঙ্গের দুটি অভয়ারণ্যের নাম লিখ। কোন্ কোন্ বন্যপ্রাণীকে উক্ত দুইটি অভয়ারণ্যে সংরক্ষিত করা হয় ? (h) জীবন সংগ্রাম কি ? জীবনকে কত রকমভাবে এই সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয় ? (i) লসিকা কি ? ইহার কাজ কি ? (j) অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির উপর নির্ভর করিয়া মানুষের রক্তের শ্রেণীবিন্যাসের সার্থকতা কি ? (k) একটি মিঠা জলের মাছকে সমুদ্রের জলে রাখিলে মাছটির পরিণতি কি হইবে তাহা ব্যাখ্যা কর। (l) উদ্ভিদদেহে রসের উৎস্রোত বলিতে তুমি কি বুঝ ? (m) বহুবিভাজন কি ? কোন্ প্রাণীতে ইহা সংঘটিত হয় ? (n) সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক কি ? (o) শিল্পঘটিত দূষণ বলিতে তুমি কি বুঝ ?

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র*—1985

BIOLOGICAL SCIENCES [First Paper]

1. জীবনের সংজ্ঞা কি ? জীববিদ্যার গুরুত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

অথবা, নিম্নলিখিত যে কোন **চারিটির** পার্থক্য নির্ণয় কর ঃ

(a) প্রোক্যারিওটিক কোষ ও ইউক্যারিওটিক কোষ ;

(b) অভিস্রবণ ও শোষণ ;

(c) সেন্ট্রোজোম ও গল্গি বডি ;

(d) প্যারেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা ; এবং

(e) ক্রোমোপ্লাস্ট ও অ্যামাইলোপ্লাস্ট।

2. জৈব অভিব্যক্তির ইতিহাসে নিম্নলিখিত যে কোন **দুইটির** ভূমিকা বুঝাইয়া লিখ ঃ

(a) লুপ্তপ্রায় অঙ্গসমূহ ; (b) সমবৃত্তীয় অঙ্গসমূহ ; (c) জীবাশ্ম।

অথবা, নিম্নলিখিত যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর লিখ ঃ

(a) বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম বলিতে কি বুঝ ?

(b) সমসংস্থ অঙ্গ কাহাকে বলে ?

(c) প্রাকৃতিক বিপর্যয়বাদ কি ?

(d) 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশপরম্পরায় সঞ্চারণ' বলিতে কি বুঝ ?

3. বাস্তুরীতিতে কিভাবে শক্তি-প্রবাহ বজায় থাকে তাহা উদাহরণ সহযোগে বিবৃত কর। উৎপাদক ও ভক্ষক বলিতে কি বুঝায় ? খাদ্য-শৃঙ্খল ও খাদ্য-জালক কাহাকে বলে ?

4. চিহ্নিত চিত্র সহযোগে একটি আদর্শ প্রাণিকোষের গঠন বর্ণনা কর।

কোষ-আবরণী ও কোষ-প্রাচীরের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

অথবা, স্থায়ী কলা ও ভাজক কলায় পার্থক্য কি ? ফেলায়েম কি প্রকারের কলা এবং ফেলায়েমের কাজ কি ? ক্লোরেনকাইমা কি ও কোথায় পাওয়া যায় ?

5. বিন্যাসবিধির (**Taxonomy**) নীতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রস্তাবক কে ?

অথবা, কি কি জৈব উপাদান দ্বারা মৃত্তিকা গঠিত ? মৃত্তিকার জৈবনিক গুরুত্ব বিবৃত কর।

6. স্বাধীন বণ্টনের সূত্র বলিতে কি বুঝ ? মেণ্ডেল কিভাবে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন পরীক্ষাসহ ব্যাখ্যা কর। মেণ্ডেলের সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, অবাত ও সবাত শ্বসনের পার্থক্য উল্লেখ কর। গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ায় কি কি উৎপন্ন হয় ?

7. সংবহন বলিতে কি বুঝ ? বদ্ধ রক্ত সংবহন ও মুক্ত রক্ত সংবহন কাহাকে বলে ? স্তন্যপায়ীর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

অথবা, রেচন পদার্থ কাহাকে বলে ? উদ্ভিদদেহের রেচন ও রেচনজাত পদার্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

8. ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলনের মধ্যে পার্থক্য কি ? উদাহরণ সহযোগে বিভিন্ন প্রকার ট্রপিক চলন ব্যাখ্যা কর।

অথবা, যে কোন **তিনটির** টীকা লিখ ঃ

(a) নেফ্রন ; (b) মোটর নার্ভ ; (c) পরিবেশ দূষণ (d) লসিকা।

9. নিম্নলিখিত যে কোন **আটটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(a) ফটোলাইসিস বলিতে কি বুঝ ?

(b) বহিঃ অভিস্রবণ বলিতে কি বুঝ ?

(c) মুখ্য বৃদ্ধিকাল কাহাকে বলে ?

(d) অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম কাহাকে বলে ?

(e) জীবন্ত-জীবাশ্ম (**Living fossil**) কাহাকে বলে ?

(f) দুইটি হরমোনের নাম লিখ যাহার একটি প্রাণী ও অপরটি উদ্ভিদ দেহে পাওয়া যায়।

(g) মিথোজীবীয় পুষ্টি কাহাকে বলে ?

(h) অপুংজনি কি ?

(i) সিক্রিটিন কোথায় পাওয়া যায় ও উহার কাজ কি ?

(j) রাইবোফ্ল্যাভিন কি এবং ইহা কোথায় থাকে (উৎস কি) ?

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র—1986

BIOLOGICAL SCIENCES [First Paper]

১। কোষ কাহাকে বলে ? একটি আদর্শ উদ্ভিদ কোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর ও উহার গঠন বর্ণনা কর।

অথবা, যোগকলার সংজ্ঞা কি ? বিভিন্ন প্রকার যোগকলার বৈশিষ্ট্যগুলি ও উহাদের কার্যকারিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২। ভিটামিন কি ? যে কোন দুইটি ভিটামিনের প্রধান উৎস ও প্রয়োজনীয়তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

অথবা, বিপাক কাহাকে বলে ? যে কোন এক প্রকার খাদ্যের মানবদেহে বিপাক প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। দূষণ কাহাকে বলে ? পরিবেশ কিভাবে দূষিত হয় ? জল দূষণ নিবারণের উপায় কি কি লিখ।

৪। হরমোন কাহাকে বলে ? মানবদেহে যে কোন তিনটি হরমোনের কার্যকারিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

অথবা, জনন কাহাকে বলে ? উদাহরণ সহযোগে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার অযৌন ও অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৫। মেণ্ডেলিজম কি ? মেণ্ডেলের নির্বাচিত সাত জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। মেণ্ডেল কি কারণে পরীক্ষার জন্য মটরশুঁটি গাছকে নির্বাচন করেন ?

অথবা, জিনের সংজ্ঞা কি ? জিন সম্বন্ধে তোমার ধারণা লেখ। জিনের রাসায়নিক প্রকৃতি লেখ।

৬। ক্রোমোজোমের বহির্গঠন বর্ণনা কর। ক্রোমোজোমের বিভিন্ন উপাদানগুলি কি কি লেখ।

অথবা, নিম্নলিখিত যে কোন চারিটির পার্থক্য লেখ ঃ

(ক) সাইটোকাইনেসিস ও ক্যারিওকাইনেসিস ;

(খ) জনন কোষ ও দেহ কোষ ;

(গ) ইউক্রোমাটিন ও হেটেরোক্রোমাটিন ;

(ঘ) সেণ্ট্রোমিয়ার ও ক্রোমোমিয়ার ; এবং

(ঙ) ডি. এন. এ. ও আর. এন. এ.।

৭। ল্যামার্ক ও ডারউইনের মতবাদ অনুসারে জিরাফের গ্রীবা ও সম্মুখের দুইটি পদের প্রলম্বিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, খাদক ও উৎপাদক বলিতে কি বুঝ ? ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি ? প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাহত হইলে তাহার পরিণতি কি হইবে লেখ।

৮। নিম্নলিখিত যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর লেখ—

(ক) খাদ্য পিরামিড কাহাকে বলে ?

(খ) নাইট্রোজেন চক্রে ব্যাকটিরিয়ার ভূমিকা কি ?

(গ) আলুচাষের পক্ষে কোন্ প্রকার মৃত্তিকা উপযোগী ? এবং

(ঘ) অটোজোম (**autozome**) কি ?

অথবা, যে কোন **তিনটির** টীকা লেখ ঃ

(ক) ফিনপার ;

(খ) লিপ্তপদ ;

(গ) মাইটোকনড্রিয়া এবং

(ঘ) আবর্তন (cyclosis)

৯। নিম্নলিখিত যে কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) গ্রানা (grana) কাহাকে বলে ?

(খ) গ্লাইকোলিসিসের দরুন কি কি উৎপন্ন হয় ?

(গ) কি কারণে মিয়োসিসকে 'হ্রাসবিভাজন' বলে ?

(ঘ) সিনগ্যামী (syngamy) কাহাকে বলে ?

(ঙ) বাইভ্যালেন্ট কাহাকে বলে ?

(চ) পাট কি ধরনের তন্তু ?

(ছ) অন্তঃঅভিস্রবণ বলিতে কি বুঝ ?

(জ) সংযোগ রক্ষাকারী প্রাণী কাহাদের বলে ?

(ঝ) সালোকসংশ্লেষের জন্য অপরিহার্য একটি জৈব এনজাইম ও একটি কো-এনজাইমের নাম লেখ।

(ঞ) ইন্টারফেজ দশা কি ?

(ট) স্যাপ্রোজয়িক পুষ্টি কি ? এবং

(ঠ) অ্যালিল বলিতে কি বুঝ ?

JOINT ENTRANCE EXAMINATION—1986

সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

১। জিন কি ? প্রচ্ছন্ন ও প্রকট জিনের পার্থক্য বুঝাও। ৫

২। কোথায় এবং কখন জীবে মায়োসিস্ বিভাজন হয় ? ক্রসিং ওভার কাহাকে বলে ? ক্রসিং ওভারের তাৎপর্য বল। ৫

৩। সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ অ-বায়ুজীবী কাহাকে বলে ? অবাত শ্বসন ও কোহল শ্বসনের পার্থক্য নির্দেশ কর।

৪। কোষ আবরণীর ভেদ্যতা যে শর্তাবলীর উপর নির্ভরশীল তাহা আলোচনা কর। ৫

৫। "রিজারভার পুল" ও "সাইক্লিক্যাল পুল" বলিতে কি বুঝ ? ইকো-সিস্টেমে কারবন ও ফসফরাসের "রিজারভারের পুল" কোথায় থাকে ? ৫

৬। (ক) কোন্ প্রকার কোষে রুক্ষগাত্র এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম পাওয়া যায় ? ১

(খ) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম পাওয়া যায় না এইরূপ কোষের নাম লিখ। ১

(গ) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কার্যাবলী উল্লেখ কর। ৩

৭। (ক) সেন্ট্রিওলের গঠনের সচিত্র বর্ণনা দাও। ৩

(খ) সেন্ট্রিওলের কার্যাবলী উল্লেখ কর। ২

৮। (ক) পলিটিন ক্রোমোসোম কোথায় পাওয়া যায় ? ১

(খ) চিত্র সহযোগে একটি পলিটিন ক্রোমোসোমের গঠন বর্ণনা কর। ৪

৯। (ক) মানুষের অতিরিক্ত রেচন অঙ্গসমূহের নাম লিখ। ২
(খ) উহাদের প্রতিটির কার্য উল্লেখ কর। ৩

১০। (ক) পশ্চাৎ পিটুাইটারি নিঃসৃত হর্মোনগুলির নাম লিখ। ১
(খ) হর্মোনগুলির স্বাভাবিক ও অধঃক্রিয়াজনিত কার্য উল্লেখ কর। ৪

১১। (ক) 'টেস্ট-ক্রশ' কাহাকে বলে? ১
(খ) প্রকট অ্যালিল D লম্বা টোমাটো গাছ উৎপন্ন করে এবং বামন টোমাটো গাছ উহার অ্যালিল d উৎপন্ন করে। প্রকট অ্যালিল H টোমাটো গাছের রোমযুক্ত কান্ড উৎপন্ন করে এবং ইহার অ্যালিল h রোমবিহীন কান্ড উৎপন্ন করে। একটি দ্বিসংকর লম্বা ও রোমযুক্ত টোমাটো গাছের টেস্ট-ক্রশ করা হইল। পরীক্ষায় প্রথম জনুতে (F_1) 118টি লম্বা ও রোমযুক্ত; 121টি বামন ও রোমবিহীন; 112টি লম্বা ও রোমবিহীন এবং 109টি বামন ও রোমযুক্ত গাছ পাওয়া গেল।
(১) ক্রশে জনিতার জীনগত গঠন দেখাও। ১
(২) লম্বা ও বামনের এবং রোমযুক্ত ও রোমবিহীন গাছের অনুপাত নির্ণয় কর। ৩

১২। গ্লুকাগন কি? কোন্ গ্রন্থি এবং কোষ হইতে ইহা নিঃসৃত হয়? ইহার কার্য কি? ১+৩+১=৫

১৩। নেফ্রন কি? ইহার বিভিন্ন অংশের চিত্র অঙ্কন কর। ১+৪=৫

১৪। হিমোগ্লোবিন কি? ইহার কার্য কি? ২+৩=৫

১৫। রাইবোজোম কি? ইহা কোথায় পাওয়া যায়? ইহার আকৃতি ও কার্য কি? ১+১+৩=৫

১৬। পাখীর উড়িবার অভিযোজনগুলি উল্লেখ কর। ৫

১৭। মানবদেহে লোহিত কণিকার মুখ্য কার্যাবলী কি? লোহিত কণিকার সংখ্যা কিরূপে নির্ণয় করা যায়? ৫

১৮। হৃৎস্পন্দনের গতি কত? কিরূপে ইহা নির্ণয় করা যায়? স্বাভাবিক বিশ্রামাবস্থা হইতে পরিশ্রমে ইহার গতি পরিবর্তিত হয় কি এবং পরিবর্তনের কারণ কি? ৫

১৯। শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের উল্লেখ কর। ফুসফুসের বায়ু বিভাগ বলিতে কি বুঝ? প্রশ্বাস বায়ু ও বায়ুস্থলীর বায়ুর অক্সিজেনের শতকরা পরিমাণ কত? ৫

২০। চর্বিজাতীয় (স্নেহপদার্থ) খাদ্যের পচনক্রিয়া-উদ্ভূত দ্রব্যগুলি কি? পৌষ্টিক নালীর কোন্ অংশে চর্বিজাতীয় খাদ্যের পচনক্রিয়া-উদ্ভূত দ্রব্যগুলি শোষিত হয়? ৫

২১। গ্লুকোজ ও সুক্রোজ কি? স্টারচ্ কিরূপে পচন ও শোষণ হয়? ৫

২২। ডিম্বাশয়ের আণুবীক্ষণিক গঠন চিত্রসহযোগে বর্ণনা কর। ডিম্বাশয়ের হর্মোনগুলি কি কি? ৫

২৩। নেফ্রনের গঠন-বৈশিষ্ট্য কিভাবে মূত্র উৎপাদনে সাহায্য করে উহা আলোচনা কর। ৫

২৪। প্রতিবর্তক্রিয়া বলিতে কি বুঝ? একটি প্রতিবর্তক্রিয়ার নাম কর ও সেই প্রতিবর্তক্রিয়ার প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের বর্ণনা দাও। ৫

২৫। (ক) কর্ডাটার (chordate) প্রধান প্রধান চরিত্র-লক্ষণ কি কি? ২

(খ) একটি ছক প্রস্তুত করিয়া উহাতে নন-কর্ডাটা (non-chordate) ও কর্ডাটার মধ্যে ছয়টি পার্থক্য দেখাও। ৩

২৬। টিনিয়ার রেচনতন্ত্রের বিবরণ দাও। ৫

২৭। টিনিয়ার একটি পূর্ণগঠিত প্রোগ্লটিডের রেখিত চিত্র অঙ্কন কর। ৫

২৮। নিম্নলিখিত ধমনীর দ্বারা গিনিপিগের যে সমস্ত অঙ্গে রক্ত প্রবাহিত হয় সেই অঙ্গগুলির নাম লিখ: ১×৫

(ক) এক্সটারনাল ক্যারোটিড (খ) ইণ্টারকস্টাল (গ) ফ্রেনিক

(ঘ) সিলিয়াক (ঙ) পস্টিরিয়ার মেসেনটেরিক।

২৯। গিনিপিগের করোটিক নার্ভের নাম কর যেগুলি

(ক) চেষ্টীয় ২

(খ) মিশ্র। ৩

৩০। (ক) সিল্ক মথের লার্ভার কোন্ কোন্ দেহখণ্ডকের মধ্যে সিল্ক গ্রন্থি অবস্থান করে? ১

(খ) সিল্ক কি? ২

(গ) কোকুনে যে রঙ্গক পাওয়া যায় তাহাদের নাম কর এবং উহাদের উৎস উল্লেখ কর। ২

৩১। (ক) দুইটি ভেড়ির মাছ ও দুইটি আমদানি করা মাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখ। ২

(খ) আমদানী করা মাছের বৈশিষ্ট্য কি? ৩

৩২। (ক) একটি একভোজী পতঙ্গ পেস্টের বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখ। ১

(খ) ইহাকৃত ক্ষতির প্রকৃতি উল্লেখ কর। ২

(গ) ইহার নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি উপায় নির্দেশ কর। ২

৩৩। ব্যাক্টিরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাসের নাম বল। ইহার জননপ্রক্রিয়া সংক্ষেপে বল। ১+৪=৫

৩৪। জাইগোস্পোর কি? শৈবালে ইহার উৎপত্তি পদ্ধতি লেখ। ১+৪=৫

৩৫। আক্ষরিক চিত্রসহযোগে ড্রায়প্টেরিসের জনুঃক্রম দেখাও। ৫

৩৬। পাইনাসের পরাগযোগ পদ্ধতি উল্লেখ কর। ৫

৩৭। উদাহরণসহযোগে উদ্ভিদের আত্মরক্ষার প্রধান উপায়গুলি বর্ণনা কর। ৫

৩৮। একটি শাখা ও একটি যৌগিক পত্রের মধ্যে পার্থক্য বল। ৫

৩৯। পতঙ্গপরাগী পুষ্পের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর। ৫

৪০। সমপার্শ্বীয় ভাসকুলার বাণ্ডিল কি? মুক্ত ও বদ্ধ সমপার্শ্বীয় ভাসকুলার বাণ্ডিলগুলির ভিতর পার্থক্য উদাহরণসহযোগে বর্ণনা কর। ৫

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র—1987

BIOLOGICAL SCIENCES [First Paper]

১। কোষ কাহাকে বলে ? একটি আদর্শ প্রাণিকোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর ও গল্গি বডি ও রাইবোজোমের কার্য সম্বন্ধে লেখ।

অথবা, প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক কোষ কাহাকে বলে ? একটি ইউক্যারিওটিক কোষের মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজনের দশাগুলির চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

২। কলা কাহাকে বলে ? ভাজক কলা ও স্থায়ী কলার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। যে কোন এক প্রকার সরল কলার চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর ও উহা উদ্ভিদদেহের কোন্ অংশে থাকে তাহা লেখ।

অথবা, আবরণী কলা ও পেশীকলা কাহাকে বলে ? আবরণী কলা কয় প্রকারের লেখ। বিভিন্ন সরল আবরণী কলার চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

৩। জনন কাহাকে বলে ? অযৌন ও যৌন জনন প্রক্রিয়ার প্রধান পার্থক্য কি ? আইসোগ্যামাস, অ্যানাইসোগ্যামাস ও উগ্যামাস পদ্ধতিতে যৌনজনন প্রক্রিয়ার উদাহরণসহ বিবরণ দাও।

৪। ট্যাক্সোনমি (**taxonomy**) বলিতে কি বুঝ ? বাইনমিয়াল নমেনক্লেচার (**binomial nomenclature**) পদ্ধতির প্রবক্তা কে ? শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির নিয়মকানুন (**rules or codes**) সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।

অথবা, বাষ্পমোচন কাহাকে বলে ? বাষ্পমোচন কত প্রকারের হইয়া থাকে ? একটি সহজ পরীক্ষার দ্বারা বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

৫। রেচন কাহাকে বলে ? উদ্ভিদে কি ভাবে রেচন কার্য হয় ? প্রাণিদেহের যে কোন তিনটি রেচনপদার্থের উল্লেখ কর।

অথবা, পরভোজীপুষ্টি বলিতে কি বুঝ ? কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস ও প্রয়োজনীয়তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। উহার উপাদানগুলি কি কি ? যে কোন একটি বাস্তুতন্ত্রের গঠন বর্ণনা কর।

অথবা, দূষণ কাহাকে বলে ? বায়ুদূষণের কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে লেখ।

৭। গ্লাইকোলিসিস কি ? কোন্ প্রক্রিয়ায় ও কোথায় ইহা সংঘটিত হয় ? এই প্রক্রিয়ায় কি কি উৎপন্ন হয় ?

অথবা, হরমোন কি ? যে কোন একটি প্রাণী ও একটি উদ্ভিদ হরমোনের নাম লেখ ও উহাদের যে কোন দুইটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

৮। নিম্নলিখিত যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর লেখঃ

(ক) সালোকসংশ্লেষের তাৎপর্য কি ?

(খ) বহুকোষী উদ্ভিদদেহে কিভাবে সংবহন হয় ?

(গ) মেন্ডেলের সূত্রগুলি কি ?

(ঘ) সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝ?

অথবা, নিম্নলিখিত যে কোন **তিনটির** পার্থক্য লেখ ঃ

(ক) ট্যাকটিক চলন ও ন্যাসটিক চলন ;

(খ) অ্যান্ড্রোজেন ও ইস্ট্রোজেন ;

(গ) কোষপ্রাচীর ও কোষপর্দা ;

(ঘ) হিমোগ্লোবিন ও হিমোসায়ানিন।

৯। নিম্নলিখিত যে কোন **দশটি** প্রশ্নের উত্তর লেখ ঃ

(ক) লিউকোপ্লাস্ট কাহাকে বলে ও উহার কাজ কি?

(খ) কোষ কি প্রক্রিয়ায় জল শোষণ করে?

(গ) DNA-র রাসায়নিক উপাদানগুলি কি কি?

(ঘ) জাইলেম কি জাতীয় কলা ও উহার কাজ কি?

(ঙ) GTH ও ADH-এর সম্পূর্ণ নাম কি?

(চ) ফেনোটাইপ কাহাকে বলে?

(ছ) ভিটামিন-C-র উৎস ও উহার অভাব জনিত একটি রোগের নাম লেখ।

(জ) যে কোন দুটি আরগাসটিক পদার্থের নাম লেখ।

(ঝ) তরল যোগকলা কাহাকে বলে?

(ঞ) নিউক্লিওলাস কোথায় থাকে ও উহার প্রধান কাজ কি?

(ট) 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'—ইহা কাহার মতবাদ?

(ঠ) দুটি অপ্রধান খনিজ উপাদানের (micro-element) নাম ও খাদ্যে উহাদের উৎসের উল্লেখ কর।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র—1988

BIOLOGICAL SCIENCES [First Paper]
[New Syllabus]

১। নিম্নলিখিত যে কোন **দশটি** প্রশ্নের উত্তর লিখ ঃ ১০×২=২০

(ক) আর এন এ (RNA) অণুর চারিটি ক্ষারমূলকের (bases) নাম কর। (খ) দুইটি গ্রন্থির নাম কর যাহা হইতে যথাক্রমে অ্যান্ড্রোজেন (androgen) এবং ইস্ট্রোজেন (oestrogen) হরমোন নিঃসৃত হয়। (গ) সালোকসংশ্লেষীয় কার্য বর্ণালী কি? (ঘ) লাইসোজোম এবং রাইবোজোমের মধ্যে দুইটি পার্থক্য নির্দেশ কর। (ঙ) ফ্লোয়েম কি জাতীয় কলা এবং উহার কাজ কি? (চ) দ্বি-পদ নামকরণ পদ্ধতির প্রবক্তা কে? (ছ) মিথোজীবী পুষ্টি কাহাকে বলে? (জ) দুইটি ভিটামিনের নাম কর যাহার একটি চর্বিতে দ্রবণীয় (fat soluble) এবং অপরটি জলে দ্রবণীয় (water soluble)। (ঝ) মায়োসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের প্রধান

দুইটি তাৎপর্য কি কি? (ঞ) খাদ্য পিরামিড কাহাকে বলে? (ট) ইন্টারফেজ দশা কি? (ঠ) দ্বি-নিষেক বলিতে কি বোঝ?

২। অভিব্যক্তির সংজ্ঞা লিখ। জৈব অভিব্যক্তিবাদের পক্ষে ভ্রূণতত্ত্বজনিত (embryological) এবং প্রত্নতত্ত্বজনিত (palaeontological) প্রমাণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। ২+৪+৪=১০

৩। মেন্ডেলের দ্বিসংকর পরীক্ষাটি বর্ণনা কর এবং বংশগতি সম্বন্ধে মেন্ডেলের সূত্রগুলি ব্যাখ্যা কর। ৩+২½+২½=৮

অথবা, সংরক্ষণ বলিতে কি বোঝ? ভূমি এবং বন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি? পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের কোথায় গণ্ডার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে? ২+৪+২=৮

৪। বিন্যাসবিধি (taxonomy) বলিতে কি বোঝ? শ্রেণীবিন্যাসের নীতি এবং ভিত্তি (principle and basis) সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ২+৬=৮

অথবা, দূষণ কাহাকে বলে? বায়ু দূষণ, জল দূষণ এবং শব্দ দূষণ প্রতিটির একটি করিয়া কারণ এবং একটি করিয়া প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে লেখ। ২+৩+৩=৮

৫। 'জীবন' বলিতে কি বোঝ? জীববিজ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক নির্দেশ কর। ২+৬=৮

অথবা, কৃষিবিদ্যায়, চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং মহাকাশ গবেষণার অগ্রগতিতে জীববিজ্ঞানের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। ৪+৩+১=৮

৬। বৃদ্ধি কাহাকে বলে? উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি কি কি শর্তাবলী (factors) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? উদ্ভিদের মুখ্য বৃদ্ধিকাল কাহাকে বলে? ১+৪+১=৬

অথবা, প্রাণীর এবং উদ্ভিদের চলনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি? একটি জলজ এবং একটি খেচর প্রাণীর চলন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ১+২½+২½=৬

৭। খাদক ও উৎপাদক বলিতে কি বোঝ? ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। খাদ্য-শৃঙ্খল কাহাকে বলে? ২+২+২=৬

অথবা, অক্সিন কি? কৃষিকার্যে এবং বৃদ্ধিতে অক্সিনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ১+২½+২½=৬

৮। ক্রোমোজোমের বহির্গঠন বর্ণনা কর। ক্রোমোজোমের বিভিন্ন উপাদানগুলি কি কি? ৩+৫=৮

অথবা, একটি প্রোক্যারিয়টিক উদ্ভিদকোষের এবং একটি ইউক্যারিয়টিক প্রাণিকোষের চিত্র অঙ্কন কর এবং উভয়ের বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত কর। ৪+৪=৮

৯। নিম্নলিখিত যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর লেখ— ৩×২=৬

(ক) হলোজয়িক (holozoic) পুষ্টি কাহাকে বলে? (খ) ল্যামার্কের মতবাদটি

কি ? (গ) ভাইটাল ক্যাপাসিটি কাহাকে বলে ? (ঘ) বাষ্পমোচনে বায়ুর আর্দ্রতার ভূমিকা কি ?

অথবা, নিম্নলিখিত যে কোন **তিনটির** পার্থক্য নির্দেশ কর— ৩×২=৬

(ক) প্যারেনকাইমা কলা এবং স্ক্লেরেনকাইমা কলা ; (খ) লিপোপ্রোটিন ও গ্লাইকোপ্রোটিন (গ) নিকটিন্যাস্টি এবং সিসমোন্যাস্টি ; (ঘ) নেফ্রিডিয়া ও নেফ্রন

[Old Syllabus]

১। নিম্নলিখিত যে কোন **দশটির** উত্তর লিখ— ১০×২=২০

(ক) আর এন এ (**RNA**) অণুর চারিটি ক্ষারমূলকের (**bases**) নাম কর। (খ) দুইটি গ্রন্থির নাম কর যাহা হইতে যথাক্রমে অ্যান্ড্রোজেন (**androgen**) এবং ইস্ট্রোজেন (**oestrogen**) হরমোন নিঃসৃত হয়। (গ) জেনোটাইপ কাহাকে বলে ? (ঘ) কোষের দুইটি আরগাস্টিক পদার্থের নাম কর। (ঙ) ফ্লোয়েম কি জাতীয় কলা এবং উহার কাজ কি ? (চ) জীবন্ত-জীবাশ্ম কাহাকে বলে ? (ছ) খাদ্য-শৃঙ্খল কাহাকে বলে ? (জ) দুইটি ভিটামিনের নাম কর যাহার একটি চর্বিতে দ্রবণীয় (**fat soluble**) এবং অপরটি জলে দ্রবণীয় (**water soluble**)। (ঝ) দ্বিপদ নামকরণের প্রবক্তা কে ? (ঞ) গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ায় কি কি উৎপন্ন হয় ? (ট) অপুংজনি কি ? (ঠ) অন্ত-অভিস্রবণ বলিতে কি বোঝ ?

২। অভিব্যক্তির সংজ্ঞা লিখ। জৈব অভিব্যক্তির সপক্ষে বিভিন্ন প্রমাণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। ২+৮=১০

৩। বিন্যাস-বিধি (**taxonomy**) বলিতে কি বোঝ ? বিন্যাস-বিধির বিভিন্ন নীতি (**principles**)-গুলি সম্বন্ধে বিবরণ দাও। ২+৬=৮

অথবা, দূষণ কাহাকে বলে ? পরিবেশ দূষণের কারণ এবং প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ২+৬=৮

৪। সংরক্ষণ বলিতে কি বোঝ ? সংরক্ষণের লক্ষ্য কি ? ভূমি এবং জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি ? ২+২+৪=৮

অথবা, মেণ্ডেলের দ্বিসংকর পরীক্ষাটি বর্ণনা কর এবং বংশগতি সম্বন্ধে মেণ্ডেলের সূত্রগুলি ব্যাখ্যা কর। ৩+২½+২½=৮

৫। জীবনের সংজ্ঞা কি ? জীববিজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর। ২+৬=৮

অথবা, জিনের সংজ্ঞা কি ? জিনের রাসায়নিক প্রকৃতি এবং জিন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ২+২+৪=৮

৬। প্রাণীর এবং উদ্ভিদের চলনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি ? যে কোন দুইটি প্রাণীর চলন পদ্ধতি বিবৃত কর। ১+২½+২½=৬

অথবা, বৃদ্ধি কাহাকে বলে ? উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি কি কি শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ? উদ্ভিদের মুখ্য বৃদ্ধি কাল কাহাকে বলে ? ১+৪+১=৬

৭। খাদক ও উৎপাদক কাহাকে বলে ? ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। খাদ্যপিরামিড কাহাকে বলে ? ২+২+২=৬

অথবা, জনন কাহাকে বলে ? উদ্ভিদের অযৌন এবং যৌন জনন প্রক্রিয়ার পার্থক্য লেখ। ১+৫=৬

৮। ক্রোমোজোমের বহির্গঠন বর্ণনা কর। ক্রোমোজোমের বিভিন্ন উপাদানগুলি কি কি ? ৩+৫=৮

অথবা, একটি প্রোক্যারিয়টিক এবং একটি ইউক্যারিয়টিক কোষের চিত্র অঙ্কন কর এবং উভয়ের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। ৪+৪=৮

৯। নিম্নলিখিত যে কোন **তিনটির** পার্থক্য নির্দেশ কর ঃ ৩×২=৬

(ক) প্যারেনকাইমা কলা এবং স্ক্লেরেনকাইমা কলা ; (খ) অবাত শ্বসন এবং কোহল সন্ধান (fermentation) ; (গ) নিক্‌টিন্যাস্টি এবং সিস্‌মোন্যাস্টি ; (ঘ) সেন্ট্রোমিয়ার এবং ক্রোমোমিয়ার।

অথবা, নিম্নলিখিত যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর লেখ— ৩×২=৬

(ক) গ্লোমেরিউলাসের কাজ কি ? (খ) নার্ভকোষের বিভাজন হয় না কেন ? (গ) ল্যামার্কের মতবাদটি কি ? (ঘ) হলোজয়িক (holozoic) পুষ্টি কাহাকে বলে ?

ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র—1988

BIOLOGICAL SCIENCES [First Paper]

(New Syllabus)

ক—বিভাগ

যে কোন **দুইটির** উত্তর দাও।

১। প্রোক্যারিওটিক কোষ কাহাকে বলে ? একটি ইউক্যারিওটিক কোষ অঙ্কন করিয়া ইহার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। এই দুই প্রকার কোষের পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর। ২+৮+২=১২

২। বাষ্পমোচনের সংজ্ঞা লিখ। উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অঙ্গ ইহাতে অংশ নেয় ? উদ্ভিদ-জীবনে এই প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা কি ? চিত্রসহ বাষ্পমোচনের একটি পরীক্ষা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ২+১+৩+৬=১২

৩। বাস্তুতন্ত্র কাহাকে বলে ? একটি পুষ্করিণীর বাস্তুতন্ত্র বর্ণনা কর। ২+১০=১২

৪। অভিব্যক্তির পুরাতত্ত্ব ও ভ্রূণতত্ত্বের প্রমাণগুলি আলোচনা কর। সমসংস্থ ও সমবৃত্তিঅঙ্গ বলিতে কি বুঝ?

খ—বিভাগ

যে কোন **পাঁচটির** উত্তর দাও।

৫। উৎসেচক কি? আমাদের পুষ্টিতে নিম্নলিখিত উৎসেচকগুলির গুরুত্ব উল্লেখ কর: (ক) অ্যামাইলেজ; (খ) লাইপেজ; (গ) প্রোটিওলাইটিক এনজাইম। ২+৬=৮

৬। ধমনী, শিরা ও রক্তজালিকা বলিতে কি বুঝ চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ফুসফুসীয় ধমনী বাহিত রক্তের প্রকৃতি কারণসহ উল্লেখ কর। ৬+২=৮

৭। অক্সিন কি? কৃষিকার্যে ও উদ্যানবিদ্যায় ইহার ভূমিকা আলোচনা কর। ২+৬=৮

৮। মানুষের পৌষ্টিকনালীর বিভিন্ন অংশে শ্বেতসার খাদ্যের পরিপাক কিভাবে হয় বর্ণনা কর। ৮

৯। দিগনির্ণীত চলন ও ব্যাপ্তিচলনে প্রভেদ কি? যে কোন দুইটি দিগনির্ণীত চলন বর্ণনা কর। ২+৬=৮

১০। চিত্রসহ মানুষের সরল আবরণীকলার বিবরণ দাও। ৮

১১। পরিব্যক্তিবাদ (mutation theory) কি? এই তত্ত্বের প্রবর্তক কে? নতুন প্রজাতির উদ্ভব ব্যাখ্যা করিতে এই তত্ত্ব কিরূপে সহায়তা করে? ২+১+৫=৮

১২। পার্থক্য নির্ণয় কর: ২×৪=৮

(ক) কোষপ্রাচীর ও কোষ পর্দা; (খ) মৃতজীবী ও পরজীবী; (গ) ম্যাক্রোমৌল ও মাইক্রোমৌল; (ঘ) শ্বেতকণিকা ও লোহিতকণিকা।

গ—বিভাগ

যে কোন **চারিটির** উত্তর দাও।

১৩। লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বলিতে কি বুঝ? মানবদেহে এইরূপ অঙ্গের গুরুত্ব আছে কি? ২+২=৪

১৪। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমকে কত প্রকারে বিভক্ত করা যায় চিত্রাঙ্কন সহ উল্লেখ কর। ৪

১৫। একটি স্নেহ-দ্রাব্য ও একটি জল-দ্রাব্য ভিটামিনের নাম লিখ। কোন্ ভিটামিনের অভাবে স্কার্ভি ও রিকেট রোগ হয়? ২+২=৪

১৬। 'মিসিং লিঙ্ক' কাহাকে বলে? আর্কিওপটেরিক্স-কে মিসিং লিঙ্ক বলা হয় কেন? ২+২=৪

১৭। মাছ ও পায়রার গমন অঙ্গের ও গমন মাধ্যমের নাম লিখ। ৪

১৮। নিম্নলিখিত অন্তঃলক্ষণযুক্ত জীব হইতে কি কি ধরনের জননকোষ সৃষ্টি হইবে দেখাও।

(ক) AaBb; (খ) aaBb; (গ) AaBB. ২+১+১=৪

১৯। পতঙ্গের শ্বসনে রক্তের কোন ভূমিকা নেই কেন? তাহাদের কোষে কিভাবে অক্সিজেন পেঁছায়? ২+২=৪

২০। হরমোনের চারিটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। দুইটি উদ্ভিদ ও দুইটি প্রাণী হরমোনের নাম লিখ। ২+২=৪

JOINT ENTRANCE EXAMINATION—1988

BIOLOGICAL SCIENCES

১। (ক) প্রোটোপ্লাজমের দুইটি ট্রেস এলিমেন্টের নাম লিখ। ১

(খ) প্রোটোপ্লাজমের উল্লেখযোগ্য জৈব যৌগগুলি কি কি? ২

(গ) 'প্রস্থেটিক গ্রুপ' এবং 'কো-ফ্যাক্টর'-এর পার্থক্য নির্ণয় কর। ২

২। (ক) কোষ-আবরণীর ভেদ্যতা কোন্ কোন্ কারণের উপর নির্ভরশীল তাহা লিখ। ৩

(খ) পছন্দযুক্ত ভেদ্যতা কি? ২

৩। (ক) কি দশায় এবং কোথা হইতে নিউক্লিও আবরণী সৃষ্ট হয়? ৩

(খ) ইন্টার-জোনাল বেমতন্তু কাহাকে বলে? ২

৪। অপুংজনি ও নিওটেনির উদাহরণসহ পার্থক্য নির্ণয় কর। ৫

৫। (ক) সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গ বলিতে কি বুঝায়? ৪

(খ) মানুষের দুইটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গের নাম লিখ। ১

৬। মেণ্ডেলের স্বাধীন বিন্যাস সূত্র ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাও। ৫

৭। (ক) অভিস্রবণ ও ব্যাপন—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝাও। ২

(খ) অভিস্রবণের তাৎপর্য কি? ৩

৮। প্রকট জীন ও প্রচ্ছন্ন জীনের মধ্যে তফাত বুঝাইয়া লিখ। হোমোজাইগাস ও হেটারোজাইগাস বলিতে কি বুঝ? ৩+২

৯। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য বুঝাওঃ ৫

(ক) স্যাপ্রোজয়িক পুষ্টি ও হলোজয়িক পুষ্টি।

(খ) সরল স্থায়ী কলা ও জটিল স্থায়ী কলা।

(গ) রাসায়নিক সংশ্লেষ ও সালোক সংশ্লেষ।

১০। পার্থক্য দেখাওঃ ৫

(ক) কৈশিক জল ও জলকর্ষী জল।

(খ) লিম্ফোসাইট ও থ্রম্বোসাইট।

(গ) থাইরোক্সিন ও অক্সিন।

১১। (ক) ব্যাক্টিরিয়া ও ভাইরাসের মধ্যে তিনটি প্রধান পার্থক্য বর্ণনা কর। ৩

(খ) ডি-এন-এ ভাইরাস ও আর-এন-এ ভাইরাস বলিতে কি বুঝায়? প্রত্যেকের দুইটি করিয়া নাম কর। ২

১২। (ক) অনিয়ত শাখা-বিন্যাস ও নিয়ত শাখা-বিন্যাস বলিতে কি বুঝায়? ২

(খ) কাণ্ডের প্রধান কার্যাবলী বর্ণনা কর। ৩

১৩। পাতার সাধারণ কার্য ও বিশেষ কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৫

১৪। যদি কোন শৈবালে ক্লোরোফিল না থাকে, তাহাকে কি ছত্রাক বলা যায়?— যুক্তিপূর্ণ কারণ দিয়া বুঝাও। ৫
১৫। মিউকরের ইস্টের টরুলা অবস্থা কি? ৫
১৬। পার্থক্য দেখাওঃ ২+১+২
(ক) প্রান্তীয় অমরাবিন্যাস ও বেসাল অমরাবিন্যাস।
(খ) ক্ল্যাডোড ও পর্ণবৃন্ত।
(গ) বায়ুপরাগী পুষ্প ও পতঙ্গপরাগী পুষ্প।
১৭। চ্যাপ্টা কৃমি এবং গোল কৃমির পার্থক্য নির্ণয় কর। ৫
১৮। বাদুড় কেন পাখি নয় তাহার পাঁচটি কারণ দেখাও। ৫
১৯। (ক) একটি টিকটিকি একটি স্যালাম্যান্ডার হইতে কিভাবে পৃথক? ৩
(খ) চারটি দৌড় পাখির উদাহরণ দাও। ২
২০। (ক) গিনিপিগের গাত্র-আবরণীর কোন্ কোন্ অংশে লোম থাকে না? ২
(খ) গিনিপিগের ত্বক গ্রন্থির এবং উহাদের নিঃসৃত দ্রব্যের নামগুলি লিখ। ৩
২১। (ক) পুরুষ এনোফিলিস কেন রক্তপান করিতে সক্ষম হয় না? ২
(খ) 'সিগনেট-রিং' কাহাকে বলে? ২
(গ) কখন মাইক্রোফাইলেরিয়াগুলি উপরিভাগের রক্তস্রোতে পাওয়া যায়? ১
২২। নিম্নলিখিতগুলি কোন্ পর্বে পাওয়া যায় লিখঃ ৫
(ক) নির্মোচন, (খ) কোম্ব প্লেট, (গ) নেফ্রিডিয়া, (ঘ) টিউব ফুট, (ঙ) অস্কিউলাম।
২৩। (ক) অমেরুদণ্ডী-কর্ডাটা নামক প্রাণীদের উক্ত নামে অভিহিত করার কারণ কি? ২
(খ) উক্ত গোষ্ঠীর প্রাণীদের প্রতিটি উপ-পর্বের নটো-কর্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসহ একটি করিয়া উদাহরণ দাও। ৩
২৪। বিপরীত কলম হইতে শব্দ নির্বাচন করিয়া উপযুক্ত জোড় গঠন কর এবং জোড়বদ্ধ শব্দের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করঃ ১×৫

অ্যাস্কারিস, পরিফেরা, সিটা, সিপিয়া, আর্থ্রোপোডা, জেলী-ফিস, ইকাইনোডারমাটা	কাইটিন, পেরামেসিয়াম, অ্যানিলিডা, মায়োটোম; স্পিকিউল, মেসোগ্লিয়া মলাস্কা

২৫। ফিতাকৃমির পরিণত স্ত্রী-জননতন্ত্রের অংশগুলির নাম লিখ এবং উহাদের কার্য উল্লেখ কর। ২+৩
২৬। (ক) রেশম গ্রন্থির চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। ২
(খ) রেশমের নির্দিষ্ট উপাদান উৎপাদনকারী অংশগুলির উল্লেখ কর। ২
(গ) রেশম সুতার ঔজ্জ্বল্য কিভাবে হয়? ১
২৭। (ক) বিদেশাগত মাছ কাহাকে বলে? ১
(খ) কার্প মাছের নিবিড় মিশ্র চাষ উপযোগী এবং যোগ্য দেশী ও বিদেশাগত প্রজাতি গুচ্ছের নাম লিখ। ইহাদের নির্বাচনের কারণ লিখ। ২
(গ) নিবিড় মিশ্র চাষের সুবিধাগুলি লিখ। ২
২৮। (ক) 'ডেড হার্ট' এবং 'হোয়াইট ইয়ার হেড' কাহাকে বলে? ২
(খ) ইহারা কি কারণে সৃষ্টি হয়? ২
(গ) ধান গাছের এইরূপ ক্ষতিকারক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। ১

২৯। (ক) হার্দ উৎপাদ ও হার্দ সূচক-এর সংজ্ঞা লিখ। ২
(খ) ফিক্-বর্ণিত মূলনীতি কি? ৩

৩০। (ক) রক্তে সবচেয়ে বেশী দরকারী কোন্ মনোস্যাকারাইড থাকে? উপবাসী অবস্থায় স্বাভাবিক রক্তে উহা কি পরিমাণে থাকে? ২
(খ) তিনটি ডাইস্যাকারাইডের নাম কর এবং উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে কোন্ কোন্ মনোস্যাকারাইড থাকে লিখ। ৩

৩১। (ক) একটি ভাইটামিন ও একটি হর্মোনের মধ্যে পার্থক্য কি? ২
(খ) অগ্ন্যাশয় গ্রন্থিতে কি কি হর্মোন উৎপন্ন হয়? কোন্ কোন্ কোষ উহাদের প্রস্তুত করে? ১+২

৩২। (ক) বায়ু-ধারকত্বের সংজ্ঞা দাও। ২
(খ) ফুসফুসীয় বায়ু-প্রবাহ ও বায়ুস্থলীয় বায়ু-প্রবাহের মধ্যে তফাত কি? ৩

৩৩। (ক) পেশীকলার শ্রেণীবিন্যাস কর। ২
(খ) পেশীর সমটান সঙ্কোচন ও সমমাপ সঙ্কোচনের মধ্যে তফাত কি? ৩

৩৪। (ক) নিউরোন ও সাইন্যাপস্ কাহাকে বলে? ২
(খ) একটি মেডুলেটেড নার্ভতন্তুর চিত্র আঁক (আণুবীক্ষণিক) এবং অংশগুলি চিহ্নিত কর। ৩

৩৫। (ক) পিত্তরসের উপাদানগুলি লিখ। ৩
(খ) পিত্তরস কিভাবে খাদ্যবস্তুর পরিপাকে সাহায্য করে লিখ। ২

৩৬। (ক) রক্ততঞ্চন পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখ। ৩
(খ) রক্তবাহের অভ্যন্তরে রক্ততঞ্চন হয় না কেন? ২

৩৭। (ক) মানবদেহে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার নাইট্রোজেন-ঘটিত এবং নাইট্রোজেন-বিহীন রেচন-বস্তুগুলির নাম লিখ। ২
(খ) ঘর্ম-গ্রন্থি নিঃসৃত রেচন-বস্তুগুলির নাম লিখ। ২
(গ) সেরুমেন কি? ১

৩৮। 'হেনলীর লুপ চারটি অংশে বিভেদিত'ঃ
(ক) চারটি অংশের নাম লিখ। ২
(খ) ইহাদের বৈশিষ্ট্য ও কার্য লিখ। ৩

৩৯। (ক) ওভুলেশন বা ডিম্বাণু-নিঃসরণ কাহাকে বলে? ১
(খ) বিদীর্ণ ডিম্ব-থলির পরিণতি কি হয় লিখ। ২
(গ) ইস্ট্রোজেনের কার্যাবলী লিখ। ২

৪০। (ক) সন্ধিতন্ত্র কাহাকে বলে? ১
(খ) সন্ধির উপাদানগুলির কার্য লিখ। ২
(গ) একটি সন্ধির কৌণিক বিচলন কিভাবে হয় ব্যাখ্যা কর। ২

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র—১৯৮৯

BIOLOGICAL SCIENCES (First Paper)

1. নিম্নলিখিত যে কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর লেখ : $10 \times 2 = 20$

(a) অ্যানাইসোগ্যামী (anisogamy) কাহাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

(b) অক্সিপিটাল কনডাইল (occipital condyle) কি ? ইহা কোথায় পাওয়া যায় ?

(c) স্যাপ্রোজোয়িক (saprozoic) পুষ্টি কাহাকে বলে ?

(d) আই এ এ (IAA)-র সম্পূর্ণ নাম কি ? ইহার একটি প্রধান কার্য কি লেখ।

(e) একটি অ্যাক্রোসেন্ট্রিক (acrocentric) ক্রোমোজোমের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

(f) বিন্যাসবিধি (taxonomy) শব্দটির উদ্ভাবক কে ?

(g) মুক্ত সমপার্শ্বীয় নালিকা বাণ্ডিল কি ? উদাহরণ দাও।

(h) গণ্ডার সংরক্ষক দুইটি অভয়ারণ্যের নাম কর।

(i) এফ এস এইচ (FSH) ও এল এইচ (LH)-র সম্পূর্ণ নাম কি ?

(j) ফোলিক অ্যাসিড কি জাতীয় ভিটামিন ? উহার একটি কার্য উল্লেখ কর।

(k) ক্যালকেনিয়াম (calcanium) কাহাকে বলে ? ইহা কোথায় পাওয়া যায় ?

(l) ফেনোটাইপ কাহাকে বলে ?

2. শ্বসন বলিতে কি বোঝ ? কোষের কোন কোন স্থানে ইহা সংঘটিত হয় ? গ্লাইকোলিসিস বহিঃশ্বসন এবং অন্তঃশ্বসনের মধ্যে দুইটি পার্থক্য নির্দেশ কর। $1+2+2+5=10$ পদ্ধতিটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

3. রক্ত কি জাতীয় কলা ? রক্তের উপাদানগুলি কি কি ? হিমোগ্লোবিন এবং $1+4+3=8$ হিমোসায়ানিনের পার্থক্য নির্দেশ কর।

অথবা, পেশীকলার সংজ্ঞা কি ? বিভিন্ন প্রকার পেশীকলার বৈশিষ্ট্যগুলি এবং $2+3+3=8$ উহাদের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

4. জীবের যে কোন চারিটি বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। উদ্ভিদ ও $4+4=8$ প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

অথবা, শিল্পোদ্যোগে, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে, প্রাকৃতিক তৈল অনুসন্ধানে এবং বনসম্পদ রক্ষায় জীববিজ্ঞানের ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। $2+2+2+2=8$

5. মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের সচিত্র (চিহ্নিত) বিবরণ দাও। এই $6+2=8$ প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের দুইটি তাৎপর্যের উল্লেখ কর।

অথবা, মিয়োসিসকে হ্রাস বিভাজন (reduction division) বলা হয় কেন ? মিয়োসিস কোথায় এবং কখন সংঘটিত হয় ? এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি দশা ও উপদশার (phase and subphases) নাম উল্লেখ কর এবং এই প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের $1+2+5\,(3+2)=8$ তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

6. বাষ্পমোচনের (transpiration) সংজ্ঞা কি ? বাষ্পমোচনের নিয়ন্ত্রক একটি আভ্যন্তরীণ এবং একটি বাহ্যিক প্রভাবকের (factor) উল্লেখ কর। একটি পরীক্ষার সাহায্যে বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। 2+2+4=8

অথবা, অক্সিন কি ? আলোকবর্তী ও অভিকর্ষবর্তী (phototropic and geotropic) চলনে অক্সিনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। 2+3+3=8

7. রেচন কাহাকে বলে ? একটি অমেরুদন্ডী প্রাণীর রেচন প্রক্রিয়ার বিবরণ দাও এবং প্রাণীর যে কোন একটি রেচনজাত পদার্থের নাম কর। 1+4+1=6

অথবা, সংবহনের সংজ্ঞা কি ? আরশোলা এবং কেঁচোর সংবহনতন্ত্রের বিবরণ দাও। 2+4=6

8. সালোকসংশ্লেষের সংজ্ঞা কি ? এই প্রক্রিয়ার দুইটি দশার (two phases) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 2+4=6

অথবা, জননের সংজ্ঞা লেখ। অযৌন ও যৌন জননের পার্থক্য লেখ। জনুক্রমে যৌনজননের ভূমিকা কি ? 2+3+1=6

9. যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর লেখ :

(a) ডিকটিওজোমের (dictyosome) কার্য কি ?

(b) স্পাইরোমিটার কি ? উহার কার্য কি ?

(c) TSH-র সম্পূর্ণ নাম ও কার্য কি ?

(d) ফলকাকার উপপত্র কি ? উদাহরণ দাও। 3×2=6

অথবা, যে কোন **তিনটির** পার্থক্য নির্দেশ কর :

(a) অতিমাত্রিক মৌল এবং স্বল্পমাত্রিক মৌল (Macroelement and Microelement)

(b) জাইলেম এবং ফ্লোয়েম

(c) ক্রোমোপ্লাস্ট এবং লিউকোপ্লাস্ট

(d) হোমোজাইগোট এবং হেটারোজাইগোট। 3×2=6

ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র—১৯৮৯

BIOLOGICAL SCIENCES (First Paper)

(NEW SYLLABUS)

ক—বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। দ্বিসংকর জনন বলিতে কি বুঝ ? চেকার বোর্ডের সাহায্যে দ্বিসংকর জননের ফল নির্ণয় করিয়া বহিঃলক্ষণ ও অন্তঃলক্ষণের অনুপাত দেখাও। এই পরীক্ষার দ্বারা মেন্ডেলের কোন্ সূত্রটি প্রমাণিত হয় ? ৩+৮+১=১২

২। প্রাণীকোষে মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতির চিহ্নিত চিত্রসহ বিবরণ দাও। মিয়োসিস কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস হইবার তাৎপর্য কি ? ১০+২=১২

৩। বাস্তুরীতিতে কিভাবে শক্তি প্রবাহ বজায় থাকে উদাহরণ সহযোগে বিবরণ দাও। খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজালক কাহাকে বলে ? মানুষ বাস্তুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে—আলোচনা কর। ৮+২+২=১২

৪। গ্লাইকোলাইসিস কাহাকে বলে ? সজীবকোষে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পাইরুভিক অম্লের পরিণতি আলোচনা কর। শ্বসন ও শ্বাসকার্যের পার্থক্য কি ? ২+৮+২=১২

খ—বিভাগ

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

৫। মানবদেহে নিম্নলিখিত গ্রন্থিগুলির অবস্থান চিত্রের সাহায্যে নির্দেশ কর। প্রতিটি গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত একটি করিয়া হরমোনের নাম ও কার্য উল্লেখ কর।

(ক) থাইরয়েড ; (খ) অ্যাড্রিনাল ;
(গ) পিটুইটারী ; (ঘ) অগ্ন্যাশয়। ২+৬=৮

৬। বৃদ্ধির সংজ্ঞা লিখ। কোন্ কোন্ শর্তাবলীর উপর উদ্ভিদদেহের বৃদ্ধি নির্ভর করে ? উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির মৌলিক পার্থক্য কি ? ১+৫+২=৮

৭। রক্ত কি প্রকার কলা ? রক্তের উপাদানগুলির নাম লিখ। অক্সিজেন পরিবহনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা আলোচনা কর। ১+৪+৩=৮

৮। দূষণ কাহাকে বলে ? পরিবেশ কিভাবে দূষিত হয় ? জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায়গুলি লিখ। ২+৪+২=৮

৯। প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদটির প্রবক্তা কে ? কোন গ্রন্থে তিনি এই মতবাদটি প্রথম প্রকাশ করেন ? নূতন প্রজাতির উদ্ভব ব্যাখ্যা করিতে এই মতবাদটি কিভাবে সাহায্য করে ? ১+১+৬=৮

১০। ভিটামিন ও অ্যান্টিভিটামিন কি ? ভিটামিন সি ও ডি-র উৎসগুলি উল্লেখ কর। এই দুইটি ভিটামিনের অভাবজনিত রোগগুলির নাম লিখ। পুষ্টিতে খনিজ পদার্থের তাৎপর্য কি ? ২+২+২+২=৮

১১। মানবদেহের পৌষ্টিকনালীতে প্রোটিন খাদ্য পরিপাক প্রণালী বর্ণনা কর। ৮

১২। অযৌন ও যৌন জননের মধ্যে পার্থক্যগুলি কি ? উদাহরণসহ সমজনন ও অসমজনন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৪+৪=৮

গ—বিভাগ

যে কোন চারিটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১৩। পূর্ণবয়স্ক মানুষের ফুসফুসের মোট বায়ুধারণ ক্ষমতা কত ? অবশিষ্ট বায়ু ঘনমান কাহাকে বলে এবং ইহার পরিমাণ উল্লেখ কর। ১+২+১=৪

১৪। নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি মিয়োসিসের কোন্ কোন্ উপদশায় ঘটিয়া থাকে ?
(ক) বাইভ্যালেন্ট গঠন ;
(খ) টেট্রাড গঠন ;
(গ) ক্রসিংওভার ;
(ঘ) নিউক্লিয় পর্দা ও নিউক্লিয়লাসের অবলুপ্তি। ৪

১৫। জীবাশ্ম কাহাকে বলে ? প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের প্রত্যেকটি হইতে একটি করিয়া উদাহরণ দাও। ২+১+১=৪

১৬। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কি ধরনের চলন অথবা গমন দেখা যায় উল্লেখ কর ঃ
(ক) মসের শুক্রাণুর ডিম্বকের দিকে চলন ;
(খ) স্পর্শের ফলে লজ্জাবতীর পাতা মুড়িয়া যাওয়া ;
(গ) পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়া ;
(ঘ) মূলের জলের দিকে ধাবিত হওয়া। ৪

১৭। গলগি বস্তু ও রাইবোজোমের গুরুত্বপূর্ণ কার্যগুলি উল্লেখ কর। ২+২=৪

১৮। মিথোজীবীতা কাহাকে বলে ? উদাহরণ দাও। ৩+১=৪

১৯। অজীবীয় বস্তু কি ? তিনটি অজীবীয় বস্তুর নাম উল্লেখ কর। ১+৩=৪

২০। শ্বাস অনুপাত কাহাকে বলে ? জৈব অম্ল, জল অঙ্গার, স্নেহদ্রব্য ও আমিষের শ্বাস অনুপাতের হার উল্লেখ কর। ২+২=৪

(OLD SYLLABUS)

ক—বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। জৈব অভিব্যক্তি বলিতে কি বুঝ ? ল্যামার্ক বর্ণিত অভিব্যক্তিবাদ ব্যাখ্যা কর। ২+১০=১২

২। "শ্বসনে স্থৈতিক শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।"—ইহার অর্থ কি ? ক্রেবস (Kreb's)-এর TCA চক্রের বিভিন্ন ধাপগুলির বর্ণনা দাও। ২+১০=১২

৩। কোষের অঙ্গাণু বলিতে কি বুঝ ? নিউক্লিয়াস ও ক্লোরোপ্লাস্ট-এর গঠন ও কার্য বর্ণনা কর। উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের দুইটি পার্থক্য উল্লেখ কর। ১+৫+৫+১=১২

৪। সংবহন তন্ত্র কি ? চিত্রসহ মানুষের হৃৎপিণ্ডের ভিতরে রক্তপ্রবাহের বর্ণনা দাও। ২+৬+৪=১২

খ—বিভাগ

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

৫। 'ক্যারিওকাইনেসিস' ও 'সাইটোকাইনেসিস'-এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। কোষের মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজন বর্ণনা কর। ২+৬=৮

JOINT ENTRANCE EXAMINAT

৬। সালোকসংশ্লেষ উপচিতিমূলক বিক্রিয়া কেন? সালোকসংশ্লেষের অন্ধকার বিক্রিয়ার বর্ণনা দাও। ২+৬=৮

৭। ব্যাপন কাহাকে বলে? মানুষের একটি লোহিত-কণিকাকে সমসারক, অভিসারক ও লঘুসারক দ্রবণে ডুবালে কি ঘটনা লক্ষ্য করা যাবে। কারণসহ উত্তর লিখ। ২+২+২+২=৮

৮। রেচন পদার্থ কাহারা? বর্জ্যবস্তু রেচনে নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির ভূমিকা উল্লেখ কর: (a) নেফ্রন (b) ত্বক। ২+৩+৩=৮

৯। বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবহন বলিতে কি বুঝ? "জীব ভূ-রাসায়নিক চক্রের" সংজ্ঞা লিখ। ৬+২=৮

১০। মৃত্তিকার উৎপত্তি, উপাদান ও জৈবিক গুরুত্ব বর্ণনা কর। ২+৪+২=৮

১১। পার্থক্য নির্ণয় কর:

(a) অস্থিপেশী ও হৃৎপেশী (b) সিসটেমিক ও পোর্টাল সংবহন

(c) DNA ও RNA (d) হর্মোন ও নিউরো হর্মোন

৪×২=৮

১২। জননতন্ত্রের গুরুত্ব কি? উদ্ভিদের যৌনজনন পদ্ধতির বর্ণনা দাও। ২+৬=৮

গ—বিভাগ

যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১৩। আবিষ্ট ও ব্যাপ্ত চলনের মধ্যে প্রভেদ দেখাও। ৪

১৪। কার্য অনুযায়ী ভাজক কলার শ্রেণী বিভাগ কর। ৪

১৫। (a) MSH, (b) TSH (c) ADH (d) FSH
হর্মোনগুলির সম্পূর্ণ নাম লিখ এবং একটি করে কাজ লিখ। ৪

১৬। লিপিড কি? চর্বি পরিপাকে পিত্তরসের কাজ কি? ১+৩=৪

১৭। ভিটামিন বলতে কি বুঝ? স্কার্ভি (Scurvy) রোগ কোন্ ভিটামিনের অভাবে হয়? ইহার উৎস কি? ২+১+১=৪

১৮। টীকা লিখ: (যে কোন দুইটি)
(a) ট্যাক্সোনমি (b) সাইটোকাইনিন (c) জিন ২+২=৪

১৯। পাকস্থলি ও অগ্ন্যাশয়ে যে সকল প্রোটিনপরিপাককারী উৎসেচক আছে তাদের নাম লিখ। ১+৩=৪

২০। মানুষের রক্তে উপস্থিত বিভিন্ন প্রকার শ্বেত কণিকার নাম লিখ। ইহাদের কাজ কি? ৩+১=৪

JOINT ENTRANCE EXAMINATION—1989

(প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে)

1. প্রোক্যারিওটিক্ ও ইউক্যারিওটিক্ কোষের মধ্যে গঠন-পার্থক্য কি ? 5

2. পার্থক্য বোঝাও :

(a) নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিওড্ ;

(b) ক্রোমোমিয়ার ও ক্রোমোনিমা ;

(c) সাইনাপ্‌স্ ও সাইনাপসিস্ । 2+1+2

3. পেশী সঙ্কোচনের সময় রাসায়নিক পরিবর্তন কি কি হয় ? 5

4. 'হাইফি' বলিতে কি বোঝ ? এবং 'হাইফি'র কি কাজ ? 2+3

5. মানুষের পিঙ্গলাক্ষি (B) প্রকট ও নীলাক্ষি (b) প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। একটি পিঙ্গলাক্ষি পুরুষের সঙ্গে নীলাক্ষি মহিলার বিবাহের পর তাহাদের ছ'টি সন্তানের সবাই হয় পিঙ্গলাক্ষি। পরিবারের সকলের জেনোটাইপগুলি কি কি ? তোমার উত্তরের সপক্ষে কারণ দেখাও। 5

6. (a) সিনগ্যামি কাহাকে বলে ? 2

(b) বিভিন্ন রকমের সিনগ্যামির নাম লিখ। 3

7. (a) উন্নততর প্রাণিদেহের যোগকলার শ্রেণীবিন্যাস কর। 3

(b) রক্তকে যোগকলার অন্তর্গত করার কি কি যুক্তি দেখাইবে ? 2

8. (a) স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আনুষঙ্গিক রেচন অঙ্গগুলির নাম লিখ। 2

(b) উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলি কি কি ? 3

9. (a) ফ্যাগোসাইটোসিস ও পিনোসাইটোসিসের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। 3

(b) 'সক্রিয় পরিবহন' বলিতে কি বোঝায় ? 2

10. (a) 'আইসোটনিক' দ্রবণ বলিতে কি বোঝায় ? 2

(b) একটি সজীব কোষকে (i) আইসোটনিক দ্রবণে, (ii) হাইপোটনিক দ্রবণে এবং (iii) হাইপারটনিক দ্রবণে নিক্ষেপ করিলে এই তিনটি ক্ষেত্রে উহার কি দশা হইবে চিত্রযোগে দেখাও। 3

11. (a) ভাইরাসের একটি জড়ের বৈশিষ্ট্য ও একটি সজীব বৈশিষ্ট্য বল।

(b) 'ব্যাকটিরিওফাজ' কাহাকে বলে ?

(c) 'ভিরিয়ন' ও 'ভেক্টর' বলিতে কি বোঝ ? 2+1+2

12. (a) 'ব্যাক্‌টিরিয়া'কে উদ্ভিদ্ বলা হয় কেন ? 3

(b) 'গ্রাম নেগেটিভ' ও 'গ্রাম পজেটিভ' ব্যাক্‌টিরিয়া বলিতে কি বোঝ ? 2

13. পার্থক্য দেখাও :

(a) পুংরেণুপত্র ও স্ত্রীরেণুপত্র।

(b) মৃদ্‌বর্তী অঙ্কুরোদ্গম ও মৃদ্‌ভেদী অঙ্কুরোদ্গম।

(c) 'সাইজোজেনাস গ্রন্থি' ও 'লাইসিজেনাস গ্রন্থি'। 1+2+2

14. স্পাইরোগাইরাতে কোন্‌টি হ্যাপ্লয়েড এবং কোন্‌টি ডিপ্লয়েড লিখ : 2+3
স্পাইরোগাইরা উদ্ভিদ, গ্যামেট, অ্যাজাইগোস্পোর, জাইগোস্পোর। স্পাইরোগাইরার কনজুগেশন টিউব কি ?

15. নিম্নলিখিতগুলির প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও ঃ 3+2
শাখাকণ্টক, গাত্রকণ্টক, পর্ণকণ্টক।
ইহাদের কাহার মধ্যে ভাস্কুলার বাণ্ডিল আছে ?

16. অর্ধবায়ব কাণ্ড কি কি ? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও। 5

17. (a) মৌলবিপাক হার কি ?
(b) ইহার স্বাভাবিক মান কত ?
(c) কখন ইহা বাড়ে ও কমে ? 2+1+2

18. অস্থিকোষ ও তরুণাস্থি কোষের মধ্যে পার্থক্যগুলি দেখাও। 5

19. (a) প্রশ্বাসের প্রধান পেশী কি ? 1
(b) স্বাভাবিক ও বলপ্রযুক্ত নিঃশ্বাস কার্যের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। 4

20. (a) মানুষের হৃৎপিণ্ডে কি কি কপাটক আছে এবং তাহারা কোথায় অবস্থিত লিখ। 3
(b) 'সাইনো-অরিকুলার নোড' কাহাকে বলে ? 2

21. (a) আমাদের খাদ্যে থাকা অপরিহার্য এমন চারিটি অ্যামিনো অ্যাসিডের নাম লিখ। 2
(b) প্রোটিনের 'পুষ্টিগত মূল্য' বলিতে কি বোঝায় ? 3

22. (a) রক্তচাপ বলিতে কি বোঝায় ? 2
(b) সঙ্কোচনকালীন, সম্প্রসারণকালীন এবং স্পন্দনিক রক্তচাপের মধ্যে পার্থক্য কি ? 3

23. (a) লালার উপাদানগুলি লিখ। 3
(b) লালার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী কি কি ? 2

24. (a) নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিতে মোটামুটি কত পরিমাণ প্রোটিন থাকে লিখ ঃ 3
(i) চাল, (ii) গম এবং (iii) ডাল।
(b) সুষম খাদ্য কাহাকে বলে ? 2

25. (a) ইনসুলিন কি ? ইহা কোথায় উৎপন্ন হয় ? 2
(b) ইনসুলিনের কার্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত কর। 3

26 (a) হিমোগ্লোবিন এবং মায়োগ্লোবিন কি ? 2
(b) দেহে ইহাদের প্রধান কার্যাবলী লিখ। 3

27. (a) এক রক্তদান শিবিরে তুমি যদি 250 মিলিলিটার রক্ত দান কর, তাহা হইলে তোমার শরীরের মোট রক্তের শতকরা কত ভাগ রক্ত দেওয়া হইবে ? 2
(b) রক্তের শ্রেণী বিভাজন কি ? প্রধান শ্রেণীগুলির নাম লিখ। 3

28. (a) দুগ্ধ কি ? 1
(b) গরুর দুধের উপাদান লিখ। 2
(c) মানুষের দুধের সহিত গরুর দুধের প্রধান উপাদানগত পার্থক্য কি ? 2

29. পার্থক্য নির্ণয় কর ঃ 1×5
(a) হৃৎপিণ্ডের ভেন্ট্রিকল ও মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল।
(b) দ্বিপার্শ্বীয় ও অরীয় প্রতিসমতা।

(c) ক্যাটফিশ ও ডগফিশ।
(d) সিলোম ও সিলেণ্টেরন।
(e) অনুষ্ণ শোণিত ও উষ্ণ শোণিতবিশিষ্ট প্রাণী। 1×5

30. যে প্রাণীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি পাওয়া যায় তাহাদের নাম লিখ : 1×5
(a) ফেল্ম কোষ, (b) সঙ্কোচনশীল গহ্বর, (c) প্যারাপোডিয়া, (d) হিমোসিল, (e) মধ্যচ্ছদা।

31. নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির পর্বের নাম লিখ : 1×5
(a) সি কিউকাম্বার (সমুদ্র শসা), (b) সি হর্স (সমুদ্র অশ্ব), (c) সি মাউস (সমুদ্র মূষিক), (d) সি অ্যানিমোন (সমুদ্র কুসুম), (e) সি হেয়ার (সমুদ্র শশক)।

32. (a) ডেঙ্গুজ্বরের কারণ কি এবং এই রোগের ভেক্টর কে? 3
(b) মানবদেহের কোথায় ফাইলেরিয়ার জীবাণু থাকে? 2

33. গলফ্লাই এবং সোয়ারমিং ক্যাটারপিলারের বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখ। একভোজী পেণ্ট বলিতে কি বুঝায়? **ট্রাইগেরাইজা ইনসারটুলাসের স্ত্রী ও পুরুষ** মথের কিভাবে তফাৎ করিবে? 2+2+1

34. 'ফিলট্রাম' বলিতে কি বুঝ? গিনিপিগের দন্তসঙ্কেত লিখ। থেকোডণ্ট দন্ত কি? 1+2+2

35. রডকোষ ও কোনকোষ কোথায় থাকে এবং উহাদের কার্য কি কি? 'ব্লাইন্ড স্পট' কি? 4+1

36. (a) (i) মানুষের চোখ, (ii) আলোক বিচ্ছুরণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও (iii) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র-এর রিজলভিং পাওয়ার কত? 3
(b) পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম প্রাণী কি কি? 2

37. (a) অটোসোমবাহিত একটি সাধারণ বংশগত দোষের নাম লিখ। 1
(b) বার বডি (Barr body) কি? 1
(c) নিম্নলিখিত অবস্থার ক্রোমোসোম গঠন কি কি? 3
(i) টারনারের সিনড্রোম, (ii) ক্লাইনফেলটারের সিনড্রোম, (iii) ডাউনের সিনড্রোম।

38. (a) মানুষের পৌষ্টিক নালীর কোথায় টি. সোলিয়াম (T. Solium) বাসা বাঁধে? 1
(b) অ্যাপোলাইটিস্ কি? (c) সোলিনোসাইট্ কি কি? 2+2

39. (a) ব্যাঙের নিম্নচোয়ালের তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। 3
(b) ব্যাঙের জিহ্বার বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ। 2

40. (a) স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা যে প্লাসমোডিয়ামের বাহক তাহা কে আবিষ্কার করেন? কোথায় তাহা আবিষ্কার করেন? 2
(b) মশা মারিবার জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত তিনটি রাসায়নিক পদার্থের নাম লিখ। 3

TRIPURA JOINT ENTRANCE EXAMINATION—1989

BIOLOGICAL SCIENCES

'ক' বিভাগ

১। বিপাক বলিতে কি বুঝায়? বিপাক ও পুষ্টির সম্বন্ধ নির্দেশ কর। বিপাকজাত দুইটি রোগের নাম কর। ২+১+১

২। ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকনড্রিয়ার দুইটি সাদৃশ্যযুক্ত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। ৪

৩। অমসৃণ ও মসৃণ এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার কার্যত পার্থক্য উল্লেখ কর। ৪

৪। নিম্নলিখিতগুলির ব্যাখ্যা কর : ৪
(ক) মনোমার (খ) অলিগোমার (গ) পলিমার (ঘ) হেটারোমার।

৫। কনজুগেটেড প্রোটিন কাহাকে বলে? দুইটি কনজুগেটেড প্রোটিনের উদাহরণ দাও। ২+২

৬। কোষচক্র (cell-cycle) বলিতে কি বোঝ? ক্রসিং ওভারের তাৎপর্য উল্লেখ কর। ২+২

৭। মাইটোকনড্রিয়ন থাকে না এমন একটি কোষের নাম কর। মাইটোকনড্রিয়নের ডি. এন. এ.-র (DNA) বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ১+২+১

৮। মাইটোটিক মেটাফেজ দশার একটি আদর্শ ক্রোমোজোম অঙ্কন কর এবং উহার বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত কর। ১+৩

৯। সংকরায়ণ পরীক্ষায় অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলিতে কি বুঝায়? অসম্পূর্ণ প্রকটতার একটি উদাহরণ দাও। ৩+১

১০। 'অ্যাপোক্রাইন' ও 'হলোক্রাইন' গ্রন্থির পার্থক্য উল্লেখ কর। একটি অ্যাপোক্রাইন ও একটি হলোক্রাইন গ্রন্থির নাম দাও। ২+২

১১। ত্বরান্বিত ব্যাপন কি? এই পদ্ধতিতে পরিবাহিত হয় এমন দুইটি বস্তুর নাম কর। ২+২

১২। ভাইরাসের একটি করিয়া বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দাও যাহা ভাইরাস জীবিত, ভাইরাস নির্জীব ও ভাইরাস একটি বিশিষ্ট পৃথক ধরনের বস্তু প্রমাণ করে। ১+১+২

১৩। এম্বডেন-মায়ারহফ গ্লাইকোলিসিস পথে পরিচালিত গ্লুকোজের খণ্ডিতকরণে উদ্ভূত শেষ উপাদান কি? এই বস্তুটি সবাত শ্বসন, অবাত শ্বসন ও ফারমেনটেশন প্রক্রিয়ায় কি পরিণতি লাভ করে? ১+৩

'খ' বিভাগ

১৪। একটি করিয়া ব্যাকটেরিয়ার নাম লিখ যাহা— ১+১+১+১
(ক) দধি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়;
(খ) বিষাক্ত খাদ্য উৎপাদনের জন্য দায়ী;

(গ) কার্বন ডাই-অক্সাইডের সালোক-সংশ্লেষ ঘটাতে সক্ষম ;
(ঘ) অপর উদ্ভিদের সহিত পরস্পরের সহযোগী (সিমবাইওসিস) অবস্থান ঘটায়।

১৫। 'মস' ও 'ড্রাইঅপটেরিসের' স্পোরোফাইট দশার চারটি পার্থক্য লিপিবদ্ধ কর। ইহাদের মধ্যে কোন্ উদ্ভিদটির সহিত গুপ্তবীজী উদ্ভিদের সর্বাপেক্ষা বেশী সাদৃশ্য আছে এবং কিভাবে ? ৪+১+১

১৬। উদাহরণ সহ প্রকৃত ফল ও অপ্রকৃত ফলের পার্থক্য নির্দেশ কর। ২

১৭। জাইলেম ও ফেনয়েমের শারীরস্থানিক (anatomical) পার্থক্য নির্ণয় কর। ৪

'গ' বিভাগ

১৮। টিনিয়ার স্ত্রী জনন অঙ্গতন্ত্রের একটি রেখিত চিত্র অংকন কর। ৪

১৯। রেশম মথের স্ত্রী ও পুরুষ শুককীটের পার্থক্য নির্দেশ কর। রেশম মথ শুককীটের অণুজীবঘটিত চারটি রোগের নাম লিখ। ২+২

২০। স্তন্যপায়ী শ্রেণীর আটটি চরিত্র লক্ষণ উল্লেখ কর। ৪

২১। পেস্ট কাহাকে বলে ? 'সিস্টেমিক' কীটনাশক ও 'কনট্যাক্ট' কীটনাশকের পার্থক্য উল্লেখ কর এবং প্রতিক্ষেত্রে উদাহরণ দাও। ১+১+২

'ঘ' বিভাগ

২২। মানুষের রক্তের বিভিন্ন প্রকার শ্বেতকণিকার নাম লিখ। তাহারা কিভাবে দেহের সুরক্ষায় সাহায্য করে তা উল্লেখ কর। ২+২

২৩। হৃৎচক্রের সময় হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন শব্দের উদ্ভবদশা ও কারণ উল্লেখ কর। ৪

২৪। 'সম্পূর্ণ' ও 'অসম্পূর্ণ' প্রোটিন বলিতে কি বোঝ ? ঋণাত্মক নাইট্রোজেন সাম্য কি ? ২+২

২৫। 'গ্লোমারিউলাসের পরিস্রুত রস' বলিতে কি বোঝ ? অবিদিত স্বেদক্ষরণ কি ? এবং ২৪ ঘণ্টায় ইহার পরিমাণ কত ? ২+২

উচ্চ মাধ্যমিক জীববিদ্যা (১ম ও ২য় খণ্ড)

অধ্যাপক সলিলকুমার চৌধুরী, এম্‌. এস্‌-সি.

বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, আনন্দ মোহন কলেজ, কলিকাতা, শিক্ষক (আংশিক সময়) জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশান, কলিকাতা, 'জীবন বিজ্ঞান পরিচয়', 'মাধ্যমিক ঐচ্ছিক জীববিদ্যা', প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

অধ্যাপক অমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্‌. এস্‌-সি.

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার অফ্ জুওলজি, বারাসত গভর্ণমেন্ট কলেজ, ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার অফ্ জুওলজি, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা, 'মাধ্যমিক জীববিদ্যা' (নবম ও দশম শ্রেণী), প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

ও

সুপ্তীশ চন্দ্র নন্দী, এম্‌. এস-সি., বি. এড্

কনভেনার, জীববিদ্যা বিভাগ, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ (বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ) কলিকাতা; ভূতপূর্ব অধ্যাপক, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা, 'প্রাণ বিজ্ঞান', 'মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন (১ম ও ২য় খণ্ড)

অধ্যাপক প্রশান্তকুমার ভৌমিক, এম্‌. এস্‌-সি.

প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা, ভূতপূর্ব অধ্যাপক কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ, চন্দননগর কলেজ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, শান্তিপুর কলেজ। স্নাতক স্তরের 'ব্যবহারিক রসায়ন', 'মৌলের সন্ধানে' ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা।

অধ্যাপক অবিনাশ চন্দ্র সরকার, এম্‌. এস্‌-সি., পি. এইচ. ডি

অধ্যাপক পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ, ভূতপূর্ব শিক্ষক বালুরঘাট গার্লস হাই স্কুল।

ও

অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ, এম্‌. এস্‌-সি., পি. এইচ. ডি., রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ্।

ভূতপূর্ব অধ্যাপক হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজ, টাকী সরকারী কলেজ, চন্দননগর কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, দুর্গাপুর সরকারী কলেজ, স্নাতক স্তরের 'ব্যবহারিক রসায়ন' গ্রন্থের প্রণেতা।

প্রশ্নোত্তরে উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন (১ম ও ২য় খণ্ড)

Seven Examiners